সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
৬ বছরের পুরাতন

Greater Power
Extra Lather
Fresher Perfume
det
সবচেয়ে শক্তিশালী কাপড় ধোয়ার পাউডার
নতুন ফরমুলো ডেট
বেশী শক্তিশালী
অতিরিক্ত ফেনা
সতেজ সুগন্ধ
ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা
Shilpi dm 11b/76 ben

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : সজল রায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "শীতের আলো" (৪৫"×৩৩" তৈলচিত্র) — সজল রায়ের ছবিতে সবসময় একটা প্রতিবাদী ভঙ্গী থাকে। একটি শহরের বাড়িঘর পেছনে রয়েছে। সামনে ফুটপাত। অনেক রাত তাই লোক চলাচল নেই। একটি মেয়ে তার ছেলেপুলে নিয়ে কাঠকুটো জেলে আগুন পোয়াচ্ছে। পেছনের লাল, সবুজ, এমন কি নীল বাড়িগুলো খাড়া উঠে গেছে। কোন ফাঁকে একটুকরো আকাশ পতাকার মতো আটকে গেছে বাড়ির ছাদে। একপাশে রেলিং-এর আনুভূমিক রেখা আর তার ভেতর খাড়া শিক নির্মিতির একঘেয়েমি দূর করেছে। এই ছবির তিনটি মুখই বিকৃত ও সেই কারণে অধিক রূপারোপিত। মেয়েটির হাঁটু ভাঁজ ক'রে ব'সে থাকার সঙ্গে অগ্নিশিখার জ্বালাটার মধ্যে সংগতি আছে। এর মধ্যে সজলের উত্তেজনা অনুভব করা যায়।

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ।। সংখ্যা ১৫

শনিবার ২২ মাঘ ১৩৮৩

ভারতে ভূতত্ত্বের প্রগতি

ভারতভূমির প্রাকৃতিক বিচিত্রতা ও সৌন্দর্যের ছবি প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যের বক্ষেও অঙ্কিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতীয় কবিত্বের ঐতিহ্যে চেতনা এবং উপলব্ধির কোন অভাব নেই। একজন কালিদাসের কাব্যে ভারতের ভৌম রূপের যে প্রশস্তি দেখা যায়, সেটা বস্তুত দেশানুরাগের একটি অভিব্যক্তি এবং সুমহান এক বিস্ময়ের প্রতি কবিহৃদয়ের উপলব্ধির মঞ্জুভাষিত পরিচয়। প্রসঙ্গত ভারতীয় ভূতত্ত্বের কথা স্মরণ করা চলে। ভারতীয় কবিরা স্বদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁদের উপলব্ধির নিবেদন হিসাবে যে সব কথা লিখেছেন, তার মধ্যে স্বাদেশিক ভূ-তত্ত্বের পরিচয়ও প্রকাশ পেয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি করা হয়। কিন্তু একথা বলা চলে যে, ভারতীয় ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের প্রতি তাঁদের ভাব ভাষা ও কল্পনার বক্তব্যে ভারতীয় ভূতত্ত্বের সম্পর্কে কৃতজ্ঞতার ও আনন্দের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বাল্মীকি ও শংকরাচার্যের গঙ্গা-বন্দনা এবং কালিদাসের কণ্ঠে হিমগিরির বন্দনা এক হিসাবে গঙ্গা ও হিমালয়ের ভূ-প্রাকৃতিক মহত্ত্বের স্বীকৃতি।

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার একশত পঁচিশ বৎসর পূর্তির ঘটনা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক স্মরণোৎসবও উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত অনুধাবন করলে গবেষক কিংবা অ-গবেষক সাধারণ মানুষও সহজে উপলব্ধি করবেন যে, ভারতীয় ভূতত্ত্বের সম্বল গ্রহণ করে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার একশত পঁচিশ বসর এক হিসাবে ভারতীয় বৈষয়িক উন্নতিরও একশত পঁচিশ বৎসর বয়স। ভারতে কয়লার সন্ধান ও আহরণের প্রথম উদ্যমের সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক সন্ধানের প্রথম উদ্যমের সূত্রটি সংবদ্ধ বলে মনে করা চলে। সমীক্ষার প্রথম ডিরেক্টর ওল্ডহাম অবশ্য কয়লা ছাড়া অন্যান্য বহু খনিজ এবং আকরিক ধাতুর অনুসন্ধান ও আহরণের সূচনা করেছিলেন। স্বীকার করতে হয়, ভারতে যথার্থ ভূতাত্ত্বিক সন্ধানের প্রথম উদ্যোক্তা বলে যাঁরা অভিনন্দিত হতে পারেন তাঁদের প্রায় সকলেই বিদেশীয় কৃতী। কিন্তু একথাও সত্য যে, ভারতীয় ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় সধিৎসা ও কৌতূহল উদ্বোধিত হতে বেশী সময় নেয়নি। সিংভূমের সাকচি-কালিমাটি এবং ময়ূরভঞ্জের আকরিক লোহার সন্ধান দিয়ে শিল্প-ব্যবসায়িক জামসেদজী টাটাকে ভারতের প্রথম এবং সেদিনের এশিয়ার সর্ববৃহৎ লৌহ নিষ্কাশনী কারখানার পত্তন করতে সাহায্য করেছিলেন যিনি, তাঁর নাম অনেকেই জানেন—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার অস্থায়ী ডিরেক্টর পদে যিনি নিয়োগ লাভ করেছিলেন, তিনি রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত, মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানীজ যাঁর আবিষ্কার। সেদিনের নানা উদ্যোগের প্রথম থেকে বর্তমান উদ্যোগের প্রসঙ্গে এলে শুনতে পাওয়া যাবে, সবচেয়ে বেশী বিস্ময় এবং সবচেয়ে বেশী আশার মুক্তকণ্ঠ কলরব, বোম্বাই হাই-এ পেট্রোলিয়ামের বিপুল সঞ্চয়ের এবং একাধিক ভারতীয় অঞ্চলে ইউরেনিয়ামের আবিষ্কার। কোন সন্দেহ নেই, ভারতীয় ভূতত্ত্ব যেন নূতন স্নেহে অভিষিক্ত হয়ে আধুনিক ভারতকে বৈষয়িক সম্পদের অন্যতম বৃহৎ সম্বল অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের নানা নূতন অবস্থানের সন্ধান উপহার দিয়ে চলেছে। ভারতীয় জীবনের এই আশাকে এখন কেউ আর স্বপ্ন বিলাস বলে মনে করবে না যে, পেট্রোলিয়াম লোহা এবং কয়লার বিপুল সঞ্চয়ে সম্পন্ন এই ভারত অদূরভবিষ্যতে বিশ্ব-অর্থনৈতিক আসরের 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে' না হোক অন্তত অন্যতম বৃহৎ সম্পন্নতার দেশ হিসাবে অবশ্যই মর্যাদা লাভ করবে।

সম্প্রতি কলকাতায় আর একটি সম্মেলন হয়েছে, যার আলোচ্য বিষয় অবশ্য নিতান্ত ভারতীয় ভূতত্ত্ব নয়; পশ্চাদ্ভূত অতি-মহাদেশিক এক স্থলভূমির ভূতাত্ত্বিক সত্যের স্মৃতি। বিদেশীয় ভূ-বিজ্ঞানীদের উপস্থিতির গুরুত্বে বিশিষ্ট এই সম্মেলন বিশ কোটি বৎসর আগের অতি-মহাদেশ গণ্ডোয়ানা-ভূমির স্মৃতিতত্ত্বের সম্মেলন বলে অভিহিত হতে পারে। গণ্ডোয়ানা নামে অভিহিত এই অতি-মহাদেশ কালক্রমে টুকরো-টুকরো হয়ে বিভিন্ন দেশিক ও মহাদেশিক রূপ গ্রহণ করেছে। যথা—দক্ষিণ মেরুদেশ, দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া মাদাগাস্কার ও ভারত। ভারতের মধ্যপ্রদেশের যে অঞ্চলে গোণ্ড (গোঁড়) আদিবাসীর বসতি, সেই অঞ্চলের বিশেষ প্রকারের শিলা-পরিচয়ের সূত্র অনুসারে বলা চলে, ওইসব বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ একদিন একই অন্তরঙ্গ ভূসম্বন্ধে অখণ্ড রূপে অবস্থিত ছিল। তাই সেই প্রাচীন অতিমহাদেশকে গণ্ডোয়ানা-ভূমি বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার বাণী স্মরণ করা চলে। উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে—

> রুদ্র সমুদ্রের বাহু
> প্রাচী ধরিত্রীর বুক থেকে
> ছিনিয়ে নিয়ে গেল
> তোমাকে, আফ্রিকা।

ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার হয় না। কবির এই উপলব্ধির বাণীর মধ্যে যেন অতি-মহাদেশ গণ্ডোয়ানাভূমির ভূতাত্ত্বিক অদৃষ্টের বিবর্তন ও পরিবর্তনের সত্যটি উদগীত হয়েছে।

যেমন কবির উপলব্ধি তেমনই দার্শনিকের উপলব্ধিও একই বিস্ময়ের সাড়া বহন করে। ভূতত্ত্বের অনুশীলন যদিও বিশেষভাবে বৈষয়িক সম্পদের নূতন সন্ধান লাভ করবার প্রয়াস, তবু বলতে হয়, এই অনুশীলন নিতান্ত অর্থনীতিক গুরুত্বে মূল্যবান নয়। দার্শনিকের ভূমা, আত্মিক সত্য ও বিস্ময়ের দিব্য বৃহত্ত্বের যে আনন্দময় উপলব্ধির সম্পদ, তার স্বরূপ ও প্রকাশও ভূতত্ত্বের বিরাট অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। যাঁর যেমন অভিরুচি, যাঁর উপলব্ধির হিসাবে যে-সত্যটি মূল্যবান, তিনি তেমন করে তাই দিয়ে ভারতীয় ভূতত্ত্বের বিরাট গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করবেন। কেউ ভূতত্ত্বের অর্থনীতিক গুরুত্ব এবং কেউ বা ভূ-প্রাকৃতিক রূপের মতো ভূতত্ত্বেরও একটি রূপময় বিস্ময়কে গুরুত্ব প্রদান করবেন।

বৈদেশিকী

নাস্তিক

আলবানিয়ার নাম লোকে জানে ইউরোপে মাওবাদের একটি মাত্তর ঘাঁটি হিসেবে। গোটা পূব ইউরোপ লাল রঙে ছোপানো হলেও ও এলাকার সব দেশই প্রায় মস্কোপন্থী। বাদে যুগোস্লাভিয়া আর আলবানিয়া। রুমানিয়াও দিন কতক একটু বেসুরো গেয়েছিল—চেষ্টা করেছিল নিজের স্বাধীনতা জাহির করতে। কিন্তু চীনের দলে ভেড়েনি। যুগোস্লাভিয়া রাশিয়াকে মানতে চায়নি বটে, কিন্তু চীনকেও গুরু বলে মানেনি। সে কাজ করেছিল পশ্চিমী দুনিয়াতে কেবল আলবানিয়া। চীনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে গাল পেড়েছে রাশিয়াকে শোধনবাদী বলে—সঙ্গে সঙ্গে গেয়েছে স্টালিনের জয়গান। তাঁকে আর মাও সে তুংকে এক আসনে বসিয়ে পুজো করে চলেছেন আলবানিয়াকে যিনি হাতে গড়েছেন সেই এনভার হোজা। তিনি দেশের একটি মাত্তর দল লেবার পার্টির প্রধান সচিব।

আলবানিয়ার লেবার পার্টি অর্থাৎ শ্রমিক দলের সঙ্গে বিলিতী লেবার পার্টির কোনও সম্পর্ক তো নেই-ই, মিলও নেই। বিলিতী শ্রমিক দল সমাজতন্ত্রী কিন্তু সাম্যবাদী নয়। আলবানিয়ার শ্রমিক দল সাম্যবাদে বিশ্বাসী—তাদের মার্ক্স-লেনিনবাদে অচলা ভক্তি, সঙ্গে সঙ্গে স্টালিনবাদ আর মাওবাদেও। আসলে ওটাই আলবানিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টির পোষাকী নাম। আরও পাঁচটা কম্যুনিস্ট দেশের যেমন হয়ে থাকে আলবানিয়াতেও পার্টির সচিবই সবে সর্বা যদিও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আছেন, আছেন মন্ত্রিসভার প্রধান যাকে অন্য দেশে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী। দেশের বাইরে রাষ্ট্রপ্রধান কী প্রধানমন্ত্রীর নাম কেউ জানে কি না সন্দেহ। দেশের লোকেদের অবস্থাও প্রায় তাই। কিন্তু দুনিয়াতে এক ডাকে সবাই চেনে দলের মুখ্য সচিব এনভার হোজাকে। দেশটা তিনিই চালাচ্ছেন—তিনি যা চান তাই হয়, যা করার তিনিই করেন। তাঁর কথা দেশের ছেলে-বুড়ো সবায়ের কাছেই বেদবাক্য—যেমন ছিল বেঁচে থাকতে স্টালিনের রাশিয়ায় কিংবা মাও সে তুংয়ের চীনে।

ক্ষুদে দেশ হলে কী হবে আলবানিয়ার ভীষণ তেজ। দুনিয়াতে কাউকে সে পরোয়া করে না, না পুঁজিবাদীদের, না সাম্যবাদীদের। স্টালিনের আমলে তার সঙ্গে দিব্যি বনিবনা ছিল রাশিয়ার। কিন্তু যেই তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর গদিতে বসলেন ক্রুশ্চভ অমনিই চিড় ধরলো দু দেশের সম্পর্কে। খানিকটা ভয় দেখিয়ে খানিকটা তোয়াজ করে তাকে দলে রাখতে চেয়েছিল রাশিয়া। কিন্তু আলবানিয়া বেপরোয়া। মস্কোর তোয়াক্কা না করে সে ঢলে পড়লো পিকিংয়ের দিকে। কাটান ছাঁটান হয়ে গেল তার রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক। ব্রিটেন আর আমেরিকার সঙ্গে সে সম্পর্ক আগেই ঘুচেছিল কিন্তু তাতে আলবানিয়া ঘাবড়ায়নি। তাদের কলা দেখিয়ে সে দিব্যি ঢুকে গেছে জাতিপুঞ্জে। কিন্তু বাইরের জগতের সঙ্গে তার কাজকারবার নেই বললেই চলে। সামান্য একটু অবিশ্যি আছে চীনের সঙ্গে। তাও খুব বেশী নয়। আলবানিয়ার জেদ সে একলা চলবে—চলছেও একলা। এমন কী কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মধ্যেও তার দোসর নেই। সাম্যবাদের পথেও সে নিঃসঙ্গ—না মস্কোবাদী না পিকিংপন্থী। তার নীতি তার নিজেরই।

সে যে কতটা আলাদা তার প্রমাণ হচ্ছে তার নতুন সংবিধান। সাতাত্তরের জানুয়ারিতে সে সংবিধান চালু হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তা দেশের লোকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তার খসড়া তৈরি হয়েছে পঁচাত্তরের শেষাশেষি, সেটা দেশের লোকের কাছে পেশ করা হয়েছে ছিয়াত্তরের জানুয়ারিতে। এ সংবিধান দেশের লোক মেনে নিয়েছে। অবিশ্যি অন্য মত কারো যদি থাকে তা সে জানায়নি। সে স্পর্ধা কোনো কম্যুনিস্ট দেশেই মানুষের থাকে না। কিন্তু আলবানিয়ার সংবিধান আর পাঁচটা সাম্যবাদী সংবিধানের মতনও নয়, জগাখিচুড়িও নয়। এতে দেশের নাম পালটে করা হয়েছে কেবল প্রজাতন্ত্র নয়, সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র। বলা হয়েছে দেশ শাসন করবে শ্রমিক দল, তার মুখ্য সচিব প্রধান সেনাপতি আর প্রতিরক্ষা পরিষদের সভাপতি। তার মানে ফৌজ থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয়। সেটা অবিশ্যি নতুন কিছু নয়। কিন্তু মুখবন্ধে যে বলা হয়েছে আলবানিয়ার জনগণ তরোয়াল হাতে ইতিহাসের পথ উজ্জ্বল করে এগিয়ে চলেছে তাতে বেশ নতুনত্ব আছে। এ ধরণের বয়ান আর কোনো কম্যুনিস্ট দেশের সংবিধানে নেই।

ওই মুখবন্ধেই একই সঙ্গে মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পুঁজিবাদী পশ্চিমীদের আর সাম্যবাদী রুশীদের। অঙ্গীকার করা হয়েছে আলবানিয়া আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাবে সাম্রাজ্যবাদ, প্রতিক্রিয়া আর শোধনবাদের বিরুদ্ধে। তার মানে তার জেহাদ যেমন আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপের বিরুদ্ধে, তেমনই রাশিয়ার বিরুদ্ধেও। মাওবাদের নামগন্ধও কিন্তু সংবিধানে নেই। বলা হয়েছে আলবানিয়া সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলবে নিজের জোরে, কারুর ভরসায় নয়। অন্যের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখতেই সে চায় না। পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া কিংবা শোধনবাদীদের সঙ্গে মিলেমিশে শিল্প গড়ে তোলা সংবিধানে বারণ, ব্যবসা করাও, এমন কী টাকা ধার নেওয়াও। এতটা গোঁড়ামি আর কোনো সাম্যবাদী দেশের নেই। রাশিয়ার তো নয়ই, চীনেরও নয়। দুনিয়ার সঙ্গে ফলাও ব্যবসা ফেঁদেছে রুশীরা, টাকা ধারও নিচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে ব্যবসা চীনও চালাচ্ছে, টাকা ধারও নিচ্ছে। আলবানিয়া কিন্তু একেবারে সাঁচ্চা সাম্যবাদী, পুঁজিবাদীদের সংস্রব সে এড়িয়ে চলার শপথ নিয়েছে। দেশেও কারুর কোনো সম্পত্তি নেই। করও কেউ দেয় না।

দেশটা সবায়ের। দেশের সম্পত্তি সবাই ভোগ করে। সে সম্পত্তির মালিক সমাজ, জিনিসপত্তর বানায় সবাই মিলে। শিল্প বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার বালাই নেই। জমিতেও নয়। তবে খাটতে হয় সবাইকে। ঠিক এ রকম বিধান আর কোনো কম্যুনিস্ট দেশের শাসনতন্ত্রে দেখা যায় না। কিন্তু যাতে সবাইকে টেক্কা মেরেছে আলবানিয়া তা হচ্ছে ধর্মের ব্যাপারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তা আলবানিয়া নয়। সে হচ্ছে খোলাখুলি নাস্তিক। কোনো ধর্ম রাষ্ট্র মানে না—কোনো ধর্মকে পেয়ার করে না। এমন কী ধর্ম পালন করার অধিকারও কারু নেই। ধর্ম পালন করার অধিকার অনেক কম্যুনিস্ট দেশের নাগরিকদের আছে যদিও রাষ্ট্র কোনও ধর্মকে স্বীকৃতি দেয় না। কিন্তু আলবানিয়াতে সরকারী নীতি হচ্ছে নাস্তিকতা প্রচার করা। তার কথা হচ্ছে কম্যুনিজমের তেলের সঙ্গে ধর্মের জল মিশ খায় না। মন্দিরের বালাই ও দেশে ছিল না। কিন্তু ছিল মসজিদ আর গির্জে। সেগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। যেগুলো আছে সেগুলোতে কেউ যায় না—সে সবই আগাছায় ভরা পোড়ো বাড়ী।

দেবরাজ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

পরলোকে সুধীরচন্দ্র কর

গত ১৫ জানুয়ারী শান্তিনিকেতনবাসী কবি ও লেখক সুধীরচন্দ্র কর পরলোকগমন করেছেন। সংবাদটি দুঃখের। সুধীরচন্দ্রের বয়স হয়েছিল বাহাত্তর। এখনকার পাঠক সুধীরচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত বলে মনে হয় না; কিন্তু প্রবীণরা অনেকেই তাঁকে স্মরণে আনতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁর দীর্ঘকাল কেটেছে, রবীন্দ্র-স্নেহধন্যদের তিনি ছিলেন অন্যতম।

সুধীরচন্দ্রের জন্ম ১৯০৫ সালে, ফরিদপুর জেলায়। প্রথম জীবনে তিনি কুমিল্লা অভয় আশ্রমের কর্মী ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিব হিসেবে। তখন থেকেই সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। যতদূর মনে হয়, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সুরধুনী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কবি হিসেবে তাঁর একটি নিজস্ব রচনারীতি ছিল এবং দীর্ঘকাল তিনি কাব্যরচনায় সেই মেজাজ বজায় রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আছে—যেমন : জনগণের রবীন্দ্রনাথ, কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে 'ও পারেতে কালো রং' 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা', 'শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

সুধীরচন্দ্রের পরলোকগমনে আমরা ব্যথিত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

অসংলগ্ন সাহিত্য

বিদেশী সাহিত্যে এখন সাধারণত যা দেখা যায় তাতে বলা চলে—আতঙ্ক, হিংসা, যৌনতা এবং মৃত্যু—এই কয়েকটি বিষয়েরই প্রাধান্য বেশী। এমন নয় যে, আগে সাহিত্যে এ-ধরনের উপাদান দেখা যেত না। আগে যা দেখা যেত এবং এখন যা দেখা যায় এই দুইয়ের পার্থক্য হল, পূর্বের লেখকরা অকারণ এবং মাত্রাহীনভাবে এর কোনোটাই ব্যবহার করতেন না। তাছাড়া, মানুষের মধ্যে সৎ এবং অসৎ এই দুটি বিরোধী গুণ ও অ-গুণকে প্রকাশ করার জন্যে তাঁরা প্রয়োজন মতন হিংসা কিংবা যৌনতাকে ব্যবহার করেছেন। আতঙ্ক অথবা মৃত্যু তাঁদের আচ্ছন্ন করেনি। এখনকার লেখকরা সাহিত্যকে প্রায় প্রলাপের সীমানায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, একে লিটারেচার অফ্ হিস্টিরিয়া বললে ভুল বলা হবে না।

অভিযোগটি ইদানীং আমরা প্রায়ই শুনি, একই কথা নানা মুখে নানা ভাবে শুনলেও মোটামুটি সেই একই অভিযোগ : হালের লেখায় ঘৃণা, হিংসা, যৌনতা, মৃত্যু ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই সাহিত্য অসংলগ্ন, অস্বাভাবিক।

এই অভিযোগের একটি জবাব দিয়েছেন জনৈক বিদেশী লেখক। তাঁর কথা, এই সমাজটাই কৃত্রিম ও যান্ত্রিক, খুনে সমাজ। অনাজন বলেছেন, আমরা যে-সমাজে বেঁচে আছি সেই সমাজ মানুষের হৃদয়ের অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রকাশ করে, আর এই সমাজ নিজেই আমাদের ঘৃণা করতে শেখায়।

সমাজতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁরা লেখকদের এত বড় অভিযোগ স্বীকার করে নেবেন বলে আমার মনে হয় না। সমাজে ভুঁইফোঁড় থাকে, চোর থাকে, শয়তান থাকে এমন কি বহু খুনে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু এই সমাজেই শিষ্ট, জ্ঞানী, সজ্জন, সহান,ভূতিশীল, উদারপ্রাণ মানুষও আছেন। কাজেই সমাজ কাউকে বিশেষ করে মন্দ কিছু শিখিয়ে দেয় এ-বিশ্বাস আমার নেই।

আমার অনুমান, লেখকরা যা বলতে চেয়েছেন তার অন্য একটা অর্থ আছে। অর্থাৎ এই যে, সমগ্রভাবে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক সমাজটা ক্রমশই ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, হতে পারে পুরোনো ব্যবস্থা, ন্যায় ও নীতির ভগ্নদশা থেকে নতুন করে কোনো নীতিবোধ এখনও গড়ে ওঠে নি বলেই আমরা মনে করি—সমাজটা মরতে বসেছে। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, যে পরিবর্তন আমরা আমাদের দেশেই গত তিরিশ চল্লিশ বছরে দেখছি তাতে এই সমাজকে আশাপ্রদ বলে মনে হয় না। বরং আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক।

বিদেশী সমাজের অবস্থা বোধ করি আরও নড়বড়ে। সচ্ছল জীবন যদি বা সেখানে থাকে, সুস্থ জীবনের অভাব; অভাব এমন কিছু মানবিক বোধের যা বেঁচে থাকার সান্ত্বনা হতে পারে।

সম্ভবত আজ বিদেশী সাহিত্যে হিংসা, যৌনতা, ও মৃত্যুর এত বাড়াবাড়ির একটা কারণ এই যে, এঁরা মনে করেন সমাজটাই মরতে চলেছে বা মৃত। যদি মনে এই ধারণা জন্মায়, সমাজের জটিল শরীরের মধ্যে ক্ষয়ের ব্যাধি, কোনো শৃঙ্খলা নেই, নীতিও নয়—তবে হনন ও ধর্ষণ, প্রলাপোক্তি ও মৃত্যুচিন্তা ভিন্ন গতি নেই।

বিদেশী সমাজে যাই হোক, আমাদের বাঙালী সমাজের এমন হাল হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবু, লক্ষ করছি, আমাদের অধিকাংশ তরুণ লেখকরা কোনো কিছুই বিবেচনা না করে অসংলগ্নতার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। এটা বয়েসের দোষ হতে পারে। কিন্তু এই অপচয় কেন? প্রশ্নের এবং সামর্থ্যের?

অভিমন্যু

আমার ভিতরে কোনো দল নেই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমার পিছনে কোনো দল নেই, আমার ভিতরে
দলবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা নেই, আমি
সাদা কালো লাল নীল গাং-গেরুয়া জাফরান বাদামী
হরেক রঙের খেলা দেখে যাই।
একলা পথে হাঁটিতে-হাঁটিতে একলা আমি ঘরে
ফিরে যাব। যেতে-যেতে পালেবালি জঞ্জালে ও ঘাসে
খানিকটা প্রশংসা আমি রেখে যাই।
দেখি, শুকনো পাতা উড়ছে হিলিবিলি সন্ধ্যার বাতাসে।

আমার পিছনে কেউ নেই এখানে। কস্মিনকালেও
কাউকে আমি ডাক দিয়ে বলিনি,
চলো যাই রোদ্দুরে গলিয়ে নেব গিনি,
হাত বাড়িয়ে টেনে আনব অহংকারী বটগাছের মাথা।
আমি বলি, দশজনে পঁচিশটা পথে যেয়ো,
প্রত্যেকে আড়াইটে করে পেয়ে যাবে শুকনো শালপাতা।

তার মানে কি এই যে, আমি রাখিনি বিশ্বাস
সঙ্ঘবদ্ধ কাজে?
দেখিনি কীভাবে কল-কারখানায় বাঁধে ও ব্যারাজে
কিংবা পূর্তবিভাগীয় নির্মিতিমালায়
সভ্যতা নিষ্পন্ন হয়। বালিহাঁস
সরে গিয়ে জায়গা দেয় পৌরহিতসাধিনী সভাকে;
জলা ও জঙ্গল হটে যায়
চৌষট্টি ফ্ল্যাটের হর্ম্য মেঘের বালিশে মাথা রাখে।

সমস্ত দেখেছি আমি; বুঝেছি যে, মানুষের মিলিত উদ্যম
ব্যতিরেকে
ইটকাঠ-পাথরকুচি-ইস্পাতের থেকে
এমন সহস্রফণা
উপরন্তু একইসঙ্গে এমন বিষাক্ত-মনোরম
উল্লাসের আবির্ভাব সম্ভব হত না।

কিন্তু এই সম্ভবপরতা তাকে কী দেয়, কতটা
দেয়, যে সভ্যতা অর্থে অন্য-কিছু বোঝে?
সভ্যতার ভিতরে যে খোঁজে
অন্য চরিতার্থতা, সে অন্য পথে যায়।
দলবদ্ধতার ঘটাপটা
দুই পায়ে মাড়িয়ে তাকে একবার নিজের মধ্যে উঁকি
দিয়ে কথা বলতে হয় নিজস্ব ভাষায়,
একবার দাঁড়াতে হয় নিজস্ব ইচ্ছার মুখোমুখি।

আমার ভিতরে কোনো দল নেই, দলবদ্ধতার
আনন্দ অথবা গ্লানি কোনোটাই নেই।
আকাশে অস্তবর্ণ খেলধুলো সমাপ্ত হলেই
ফেরতি-পথে জঞ্জালে ও ঘাসে
খানিকটা প্রশংসা রেখে আমি দেখি, এন্তার...এন্তার
হিলিবিলি পাতা উড়ছে সন্ধ্যার বাতাসে।

॥ ১৫ ॥

ডাকোভা জায়গাটাই সুন্দর। অনেকটা মোকার মতন। মোকার সৌন্দর্য সম্প্রতি আরো বেড়েছে 'গান্ধী স্মৃতি সৌধটির' অসাধারণ স্থাপত্য-শিল্পের জন্যে। কিন্তু ডাকোভার তা তখনও হয়নি। কিন্তু ঠাকুরের নামে যে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তা সমাপ্ত হলে যারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারী তাদের তা তখন অপূর্ব লাগবে।

ভারতবর্ষে অনেক মন্দির আছে। ভারতকে তাই মন্দিরময় দেশ বলা হয়। এক বৃন্দাবনেই দেখেছি পাঁচশোর বেশি মন্দির। এমন-এমন মন্দিরও আছে সেখানে, পান্ডারা বলে না দিলে বোঝাই যাবে না যে সেগুলো মন্দির।

কমলা রঙীন দিদি এমনই এক সুরসিকা এবং সুপন্ডিতা যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় তা টেরই পাওয়া যায় না।

মনে মনে ভাবছিলাম কে সেই দেশাই ভদ্রলোক যিনি তার মূল্যবান সম্পত্তি আখের ক্ষেত, বাড়ি জমি এই মিশনকে দান করে পরিত্রাণ লাভ করেছেন?

কল্পনা করে নিতে পারি হয়ত সেই দেশাইজীর কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। কিংবা তিনি হয়ত চিরকুমার ছিলেন। অথবা আত্মীয়-পরিজনের বিয়োগ-ব্যথায় অধীর হয়ে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছেন।

আমাদের ভারতবর্ষের লালাবাবু কেন সংসার ত্যাগ করেছিলেন?

দেশবন্ধু সি-আর-দাশ কেন তাঁর বসত-বাড়িটা পর্যন্ত দেশকে দান করে গেলেন?

অনেকেরই ধারণা আমাদের দেশে মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ই দানের দিক থেকে অগ্রগণ্য। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। ত্যাগের প্রবৃত্তি বাঙালীদের মধ্যে যেমন আছে এমন আর অন্য কোনও প্রদেশবাসীর মধ্যে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুনেছি তাঁদের ভান্ডার বাঙালীদের দানেই পূর্ণ। এই কলকাতা শহরেই এমন একজন বদান্য দাতা ছিলেন যিনি তাঁর নিজের পৈত্রিক তিনশখানা বাড়ি এবং আনু-সঙ্গিক সম্পত্তি সমস্ত কিছু মিশনকে দান করে নিঃস্ব হয়ে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। শেষে একটা ভাড়াটে বাড়িতে নিজে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করে তৃপ্তি পেতেন। ডাক্তার বিধান রায় তাঁকে কোনও উচ্চপদে চাকরিও দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। সামান্য ব্যারিস্টারি পেশাতেই তিনি কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করে-ছিলেন। এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি যে এই মহৎ দান করেছিলেন তার সঙ্গে এই শর্ত ছিল যে কোথাও কোনও ভাবে তাঁর নাম প্রকাশিত হবে না।

তারপর তাঁর মৃত্যু হলে ঘটনাটির কথা প্রকাশ হয়ে যায় যে পরলোকগত সেই দাতার নাম নির্মলকুমার দে।

অর্থের অনর্থতা সম্বন্ধে সমস্ত মহা-পুরুষরা অনেক আগে থেকেই অনেক বাণী বলে গেছেন। অর্থনীতি বলে একটা শাস্ত্রই গজিয়ে উঠেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের নাম তো অনেকেই শুনেছেন, পড়ুন আর না-পড়ুন। বি-এ পড়বার সময় আমার একটা বিষয় ছিল অর্থনীতি। কিন্তু এখনও সে সম্বন্ধে কিছু বুঝি এমন গর্ব আমি করতে পারি না। সামান্য যোগ-বিয়োগ করতে গেলে এখনও দেখেছি ভুল করে বসি। কিন্তু জীবনে বহু কোটিপতি লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে আমার। এবং সেই সূত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বড় মর্মান্তিক। প্রয়োজনের বেশি অর্থকে ভারতবর্ষ বরাবর নিরুৎসাহ এবং নিরুদাম করে এসেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে আমি যদি তার প্রশংসা করি তাহলে সে অনেকটা আত্মপ্রশংসার মতন শোনাবে। ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে এই মিশনের অস্তিত্ব আছে সেখানকার অধিবাসীদের সে-সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার অবকাশ হবে না। আমি নিজে কলকাতার স্থায়ী অধি-বাসী, তাই কলকাতার এই মিশনের সেবা-প্রতিষ্ঠানের কথা নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এখানকার নরেশ মহারাজ, সুজিত মহারাজ, প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ মহারাজ, সত্যনারায়ণ মহারাজ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি চিকিৎসক যে আন্তরিকতা নিয়ে এখানে রোগীদের সেবা করে এসেছেন ভারতবর্ষের অন্য কোনও হাসপাতালে তা পাওয়া কি সম্ভব? আমি তো মনে করি এখানকার ডাঃ অমল চক্রবর্তী, ডাঃ বিশ্বজিৎ সেন বা শৌর্য ব্যানার্জি—এঁরা এক-একজন চিকিৎসক তপস্বী! তপস্বী বললেও বোধ-হয় এঁদের কম বলা হয়। এঁদের জন্যে সরকার থেকে কোনও পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ দেওয়া হয়নি, হবেও না, কারণ এঁরা তদ্বির-তদারক করতে ঘৃণা বোধ করেন।

না, এখানেই কলমের বল্গা টেনে ধরা ভালো নইলে আমি মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবো।

মরিশাসের এই রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক অবান্তর কথা বলে ফেললাম। এবার যদি আর একটা অবান্তর কথা বলি তো আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

কথাটা এই অর্থ-সম্পদ নিয়েই। কোন্ এক দেশাই সাহেব তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি এই রামকৃষ্ণ মিশনের নামে দান করে গিয়েছিলেন।

আমি অপরানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনাদের এই মিশনের খরচ চলে কী করে?
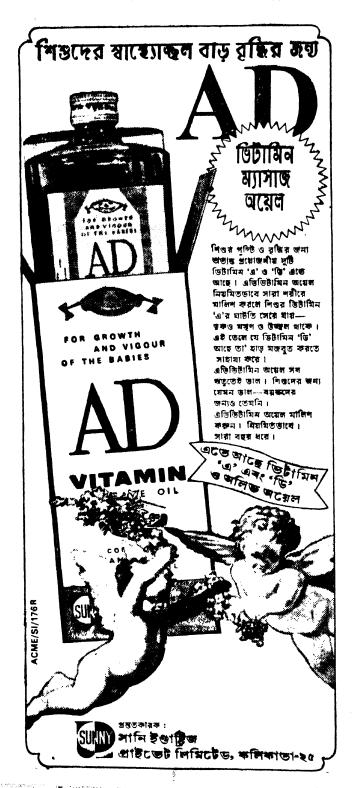
অপরানন্দজী বললেন—আমাদের কিছু আখের ক্ষেত আছে তাই থেকেই—

আবার জিজ্ঞেস করলাম—এক একর আখের ক্ষেতের দাম কত?

অপরানন্দজী বললেন—আগে জমির দাম কম ছিল, এখন চিনির দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জমির দামও বেড়ে গেছে। এখন এক একর আখের জমির দাম এখানে প্রায় বত্রিশ লাখ টাকা—

আমি চমকে উঠলাম। গরীব ইণ্ডিয়ার লোক আমি, চাষের ক্ষেতের এই দাম শুনে আমার তো চমকে উঠবারই কথা। আর যে দেশাইজী এই দান করতে পেরেছেন তাঁর কথাও মনে পড়লো। তাঁকে আমি চিনি না। তবু তাঁর উদ্দেশে আমি প্রণাম জানালাম।

অপরানন্দজী জানালেন—এখানে একবার আখ চাষ করলে আমরা আটটা ফসল পাই—আর যদি তার ওপর সেচ দেবার ব্যবস্থা করতে পারি তো একত্রিশটা পর্যন্ত ফসল পেয়ে যাই।

জালিম তখনও আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—চলুন স্যার, চলুন, বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে, নাথমলজী আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না—

বললাম—কিন্তু কে বললে তোমাকে যে আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ?

জালিম বললে—কিন্তু আমার কথা কে শুনবে? আপনি তো জানেন যশোবন্ত নাথমলজী কী-রকম খেয়ালী মানুষ? যখন যা খেয়াল চাপবে তা আর কেউ থামাতে পারবে না। তিনি যে জেনে গেছে এখানে ইণ্ডিয়া থেকে যত লোক এসেছে, তার মধ্যে আপনিই একমাত্র বাঙালী!

বললাম—তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি যে কায়স্থ। আমি কি আমার পাদোদক খাইয়ে অক্ষয় নরক-বাসী হবো নাকি?

—সে যা বলবার আপনি স্যার সেখানে গিয়ে বলবেন।

আমি বললাম—এই তো অপরানন্দজী রয়েছেন, ইনিও বাঙালী, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী মানুষ। আমার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তি। এঁকেই নিয়ে যাও না—

অপরানন্দজী চিনতেন নাথমলজীকে। বললেন—ওরে বাবা, ও-রকম খেয়ালী মানুষ এখানে আর দুটি নেই। আমি সেখানে যেতে পারবো না। তিনি বরাবর সাহেব-ঘেঁষা মানুষ। এককালে যেমন

স্বদেশী করে জেলে গেছেন তেমনি পরে আবার সাহেবদের সংগে কারবার করে পুরো সাহেব হয়ে গেছেন। একেবারে পাক্কা সাহেব!

—তাহলে মৃত্যুর সময় আবার এই বামুনের পাদোদক খাবার শখ হলো কেন?

—ওই যে বললুম—খেয়ালী মানুষ।

আমি বললাম—আচ্ছা চলো—

কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। আমি ব্রাহ্মণ নই, শেষকালে কি অকারণে পাপের ভাগী হবো?

কমলা রয়ম দিদিকে সব কথা বুঝিয়ে বিদায় নিলুম।

দিদি বললেন—আজকে লাঞ্চের সময় দেখা হবে আবার। আজকে ব্যাংক-অব্-বরোদা আমাদের মধ্যে সত্তর জনকে বেছে নিয়ে কন্টিনেন্টাল হোটেলে লাঞ্চ দিচ্ছে, মনে রাখবেন কিন্তু—

জালিম আমাকে নিয়ে পোর্ট লুইসের দিকে রওনা দিলে।

*

টাকা! যশোবন্ত নাথমলজীর কথা মনে পড়তেই আমার হেনরি ফোর্ডের কথা মনে পড়লো। বৃষ্টির কথা মনে পড়লেই যেমন চেরাপুঞ্জির কথা মনে পড়ে, পাহাড়ের কথা মনে পড়লেই বাঙালীদের যেমন দার্জিলিং-এর কথা মনে পড়ে যায়, তেমনি টাকার কথা মনে পড়লেই রকফেলার বা হেনরি ফোর্ডের কথা মনে পড়ে।

টাকার কথা মনে পড়ে যায় মানে টাকার অভিশাপের কথা মনে পড়ে যায়।

হেনরি ফোর্ড যে কেবল কোটি-কোটি টাকার মালিক ছিলেন তাই-ই নয়, হেনরি ফোর্ডের জন্যে মার্কিন সরকারও প্রচুর টাকা ট্যাক্স হিসেবে উপায় করতেন।

সেই হেনরি ফোর্ড যখন তাঁর কারখানায় যেতেন তখন দেখতেন তাঁর ইঞ্জিনীয়ার কর্মচারিরা গপ্-গপ্ করে লাঞ্চ খাচ্ছেন। ডিম-বেকন-চিকেন বীফ কোনও কিছুই বাদ নেই। যেমন দুহাতে টাকা উপায় করছেন তাঁরা তেমনি দুহাতে গপ্-গপ্ করে খাচ্ছেন। হুইস্কি, রাম, জিন্ খাচ্ছেন আর হজম করছেন। হেনরি ফোর্ডের কেমন ঈর্ষা হতো তাঁর কর্মচারীদের সেই খাওয়া দেখে। তিনি নিজে অত বড় কোম্পানীর মালিক হয়েও যা খেয়ে হজম করতে পারতেন না, তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা তাই গোগ্রাসে গেলেন।

তাঁর ডায়রিতে তিনি একদিনের একটি বিচিত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেই-টেই আমার এখানকার বক্তব্য।

তিনি লিখে গেছেন—আজ আমি একটি ডিম খাইয়াছি এবং তাহা হজম করিতে পারিয়াছি।

এর চেয়ে ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস হতে পারে তা আমার জানা নেই।

জালিমের সংগে পোর্ট লুইসের দিকে যেতে যেতে এই সব কথাই ভাবছিলাম। সত্যিই মানুষের জীবনের যে কী উদ্দেশ্য তা আজো পর্যন্ত জানা গেল না।

বইতে পড়েছি রামকৃষ্ণদেবের কাছে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন দেখা করতে। বঙ্কিমচন্দ্র মস্ত লেখক। ঠাকুর সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—জীবনের কী কর্তব্য বলুন তো?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—আহার নিদ্রা আর মৈথুন—

সংগে সংগে ঠাকুর বললেন—এঃ, তুমি কী ছ্যাঁবড়া—

মাইকেল মধুসূদন একবার দেখা করতে গেছেন ঠাকুরের সংগে। ঠাকুর কোনও কথা বললেন না। পাশে নারায়ণ শাস্ত্রী বসে-ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি তো একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি,

আপনি ধর্ম ত্যাগ করতে গেলেন কেন?

মাইকেল বললেন—পেটের দায়ে—

নারায়ণ শাস্ত্রী এ-কথার জবাবে আর কোনও কথা বললেন না। উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে তখন সবে বেরিয়েছি তাই তখনও মন থেকে মিশনের প্রভাব দূর করতে পারিনি। সেগুলো কেবলই মনের ভেতরে ঘুর-ঘুর করছিল।

জালিমকে জিজ্ঞেস করলাম—রায়নার খবর কী গো জালিম?

জালিম বললে—খুবই খারাপ স্যার, শিউপূজনকেও পাওয়া যাচ্ছে না কদিন ধরে—

—আর রায়না?

—রায়না তো কদিন ধরেই কেবল কাঁদছে।

কথাগুলো শুনে আমার বড় দুঃখ হতে লাগলো। সত্যিই, কেউই নিজের-নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট নয়। মানুষের লোভ, মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মানুষের অর্থলিপ্সা, ভোগলিপ্সা, এই সমস্তই মানুষের অশান্তির মূলে।

রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। সব কথার সার হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলে গেছেন—ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন না, দুঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়—সেবার মধ্যে কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে-প্রেমের পরিপাক হয়েছে সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

শিউপূজন আর রায়নার মধ্যে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তপস্যার মধ্যে দিয়ে তা পরিপাক হয়নি। তাই তাকে বিশুদ্ধ প্রেম বলা চলে না।

কিন্তু আমি তাদের ব্যাপারে কী সাহায্য করতে পারি? তবে কথা দিয়েছিলাম আর একদিন তাদের বাড়ি যাবো, সেই কথাটা আমাকে রাখতেই হবে।

আমি মরিশাসে এসেছি অতিথি হয়ে। তার মানে এ নয় যে তাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমি জড়িয়ে থাকবো।

যেমন কবি-সম্মেলন! আমি প্রথমত কবি নই, তারপর আধুনিক কবিতা বুঝতেই পারি না। অথচ কবিতার রস পাই না এমন তো নয়। ভালো কবিতা পড়তে গেলে কৃতার্থ বোধ করি।

সেদিন বাঙলাদেশ থেকে একটি কবিতার বই ডাকে এসে পৌঁছলো আমার কাছে।

পড়তে পড়তে অবাক হয়ে গেলাম। এ তো বাঙ্গ-কবিতা নয়, এই তো সত্যিকারের বর্তমান জীবন।

একটি কবিতা কবির বিনা-অনুমতিতে তুলে দিচ্ছি, আশা করি আমি মার্জনা পাবো। কবির নাম সৈকত আসগর—

জনৈক কন্যাদায়গ্রস্থ
পিতার বিজ্ঞাপন

নাক বোঁচা, কানে খাটো, চোখ টেরা
পা খোঁড়া, চুল ছোট, স্বাস্থ্য খারাপ
বাঙালী পাত্রীর জন্যে দান-দক্ষিণা ব্যতিরেকে
যে-কোন পাত্র চাই, যে-কোন পাত্র যে-কোন।
পাত্র খুব বুড়ো হলেও ক্ষতি নেই।
যোগাযোগ করুন; জনৈক কন্যাদায়গ্রস্থ
পিতা

অভাবী গ্রাম, ডাকঘর—সমস্যা নগর

এ না-হয় কবিতা। কিন্তু সত্যিই নিছক কবিতা কী? সমস্যা-নগর কি শুধু বাঙলাদেশেই আছে, পৃথিবীতে আর কোথাও নেই? মানুষ মানেই তো সমস্যা। পৃথিবীতে যত মানুষ, তত সমস্যা। কারোর মেয়ের বিয়ের সমস্যা, কারোর চাকরিতে মাইনে কম পাওয়ার সমস্যা।

তেমনি যাঁরা মহাপুরুষ তঁদের জীবনের সমস্যা আরো বৃহৎ, আরো জটিল।

টলস্টয়ের স্ত্রী চাইতেন স্বামী আরো টাকা উপায় করুন, তাতে তিনি আরো বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারবেন।

কিন্তু টলস্টয় শেষ জীবনে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভালো-ভালো বই লিখে তিনি মানুষের সমাজের কোনও কল্যাণ-সাধন করতে পারেন নি। তিনি যত ভালো বই লিখেছেন লোকে তাঁকে ততো বাহবা দিয়েছে। তার ফলে তাঁর কেবল টাকা হয়েছে আর টাকা হয়েছে তাঁর প্রকাশ-কের। অথচ টাকা উপার্জন করবার জন্যে তো তিনি বই লেখা আরম্ভ করেন নি। তিনি তো চেয়েছিলেন শুধু মানুষের মঙ্গল করতে।

তিনি বাড়িতে ঘোষণা করে দিলেন যে তিনি আর কোনও বই লিখবেন না।

এতদিন যে তিনি বই লিখেছেন তাতে লোকদের কেবল ঠকানো হয়েছে। তিনি বিবেকের কাছে সারাজীবন অপরাধ করেছেন।

স্ত্রী আপত্তি করে উঠলেন।

বললেন—তুমি টাকা উপায় না করলে আমি এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাবো কী করে? মেয়েদের বিয়ে দেব কী করে? ছেলেদের মানুষ করবো কী করে?

টলস্টয় বললেন—খরচ কমাও, বাড়িতে এত চাকর-ঝি রাখবার দরকার কী?

স্ত্রী বললেন—চাকর ঝি ছাড়িয়ে দিলে পাড়ার লোকে বলবে কী? বলবে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে—

টলস্টয় বললেন—লোকে কী বলবে তা নিয়ে অত ভাবছো কেন?

স্ত্রী বললেন—ভাববো না? একবার যদি রটে যায় যে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, তাহলে কি ভাবছো আমার মেয়েদের আর বিয়ে হবে? যাতে মেয়েদের ভালো-ভালো পয়সাওয়ালা পাত্র জোটে সেই জন্যেই তো বাড়িতে রোজ-রোজ পার্টি দিতে হয়। পার্টি দিতে কি খরচ কম হয় ভেবেছ?

—তা অত খরচ না করলেই পারো। কে তোমাকে পার্টি দিতে বলেছে আর কে-ই বা তোমায় খরচ করতে বলেছে? যারা বাড়িতে পার্টি দেয় না, তাদের বাড়ির মেয়েদের কি বিয়ে হয় না?

স্ত্রী বললেন—হবে না কেন, হয়, কিন্তু তেমনি তাদের বেলায় সব হা-ঘরে পাত্র জোটে—

সেই দিন থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে মত-বিরোধ শুরু হলো। টলস্টয় শেষ জীবনে একটা আশ্রম তৈরি করলেন। সেখানে তিনি সাধারণ শ্রমিকের মতই নিজের হাতে চাষ-বাস করতে লাগলেন। আর তাঁর চির-কালের সাধনা লেখা ত্যাগ করলেন।

টলস্টয় লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন এ-খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই মনঃক্ষুন্ন। ম্যাক্সিম গোর্কি'ই বিচলিত হলেন সবচেয়ে বেশি। তিনি ভাবলেন টলস্টয় যদি লেখা বন্ধ করে দেন তাহ'লে সাহিত্যের দিক থেকে রাশিয়া দরিদ্রতর হয়ে যাবে। তাই একদিন তিনি শহর ছেড়ে টলস্টয়ের আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আশ্রমে যখন তিনি পৌঁছালেন তখন তিনি দেখলেন টলস্টয় সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেঁষে সামনের দিক চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। একেবারে ধ্যান-নিবিষ্ট। তার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে বিরক্ত করতে বিবেকে বাধলো গোর্কির, তিনি তাঁর পাশে গিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। ভাবলেন যখন টল-

ষ্টয়ের ধ্যান ভাঙবে তখন তিনি তাঁর বিনীত অনুরোধটি জানাবেন। তখন বলবেন—আপনি লেখা বন্ধ করবেন না কাউণ্ট টলস্টয়—তাতে রাশিয়ান সাহিত্য দরিদ্রতর হবে, রাশিয়ান-সাহিত্যের ক্ষতি হবে—

কিন্তু অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল টলস্টয়ের ধ্যান ভাঙলো না। গোর্কির মনে হলো টলস্টয় এমই ধ্যাননিবিষ্ট যে যদি তিনি হুকুম করেন তো সমুদ্রের ঢেউগুলো এক মুহূর্তে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে যাবে।

তারপর গোর্কি আরো অনেকক্ষণ বসে রইলেন। এমনি করে আধঘণ্টা কাটলো, একঘণ্টা কাটলো, দু ঘণ্টা কাটলো, তিন ঘণ্টা কাটলো তখনও টলস্টয়ের ধ্যান ভাঙলো না।

তখন গোর্কি আর অপেক্ষা করলেন না। আস্তে আস্তে উঠলেন। উঠে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকেই আবার ফিরে গেলেন। এই ঘটনার কথা গোর্কি তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন—"I came back with the impression that as long as Tolstoi is alive under the sun, I am no orphan."

অর্থাৎ—আমি এই ধারণা নিয়েই সেদিন সেই স্থান ত্যাগ করলাম যে যতদিন টলস্টয় এই পৃথিবীতে বেঁচে আছেন ততদিন আমি অভিভাবকহীন নই।

টলস্টয়ের চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম, হঠাৎ জালিমের কথায় ধ্যান ভাঙলো।

সে বললে—এই আমরা পোর্ট লুইস এসে গিয়েছি স্যার, এবার উঠুন—

আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে বলতে গেলে আমার যেমন ক্লান্তি আসে না, টলস্টয় সম্বন্ধে তাই। মনে আছে একদিনের ঘটনা। সেদিনও টলস্টয়ের বাড়িতে পার্টি চলছিল। সুরা খানা-পিনা সমস্ত কিছুর অফুরন্ত আয়োজন। টলস্টয়-পত্নীর পার্টিতে কখনও চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয়র কোনও কার্পণ্য থাকে না এ-কাহিনী দেশের অভিজাত-সমাজের সবাই জানে। তাই অভিজাত সমাজের কাছে টলস্টয়ের পত্নীর আহূত পার্টিতে দেশের গণ্য-মান্য সকলের আমন্ত্রণ বহু-আকাঙ্ক্ষিত।

সেদিনও সবাই হাজির। আনন্দ আর উল্লাস আর উৎসবের আবহাওয়া অভিজাত স্ত্রী-পুরুষদের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত।

এমন সময় পেছনের দরজা দিয়ে গৃহকর্তা বাড়িতে ঢুকলেন। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি তার সব চেয়ে প্রিয় ছোট-কন্যাকে ডাকলেন। কন্যা বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক।

টলস্টয় বললেন —তুমি আমার একটা কথা রাখবে মা? তোমার মা যেন জানতে না পারেন—

কন্যা বললেন—কেউ জানতে পারবে না বাবা, বলো না তুমি কী কথা?

টলস্টয় বললেন—আমি গ্রামের দিকে গিয়েছিলুম, দেখলুম ক্ষেতের মধ্যে এক চাষী-মহিলা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করছে। বুঝলাম মহিলাটির প্রসব-বেদনা উঠছে। আমি পুরুষ-মানুষ, আমি তাকে কোনও সাহায্য করতে পারিনি। তাই তোমাকে ডাকতে এসেছি মা, তুমি আমার সঙ্গে এখন যেতে পারবে, যদি যাও তো একটা মানুষের প্রাণ অন্তত বাঁচে—

কথাটা শুনে কন্যা আর এক মুহূর্ত দেরি করলে না। টলস্টয়ের সঙ্গে সেই অবস্থাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইল পার্টির উৎসবমুখর আনন্দ-হুল্লোড় আর তার সঙ্গে মদ্যপানজনিত অস্বাভাবিক উত্তেজনা—

জালিম বললে—নামুন স্যার এসেছেন, নাথমলজীর বাড়িতে এসে গিয়েছি।

বাইরে চেয়ে দেখলাম বাড়ির সামনে আরো অনেকগুলো নতুন নতুন মডেলের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম মরিশসে যত ডাক্তার আছে সবাইকে শেষ সময়ে ডাকা হয়েছে। আর তাদের সঙ্গে যত আত্মীয়-স্বজন আছে তারা তো হাজির হয়ে আছেনই।

আমি বড় বিব্রত বোধ করছিলাম। এমন বিড়ম্বনায় তো আমি কখনও পড়িনি। আমি ব্রাহ্মণ নই অথচ আমাকে ব্রাহ্মণের কর্তব্য পালন করতে হবে, কর্তার এ-কী রকম খেয়াল?

আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

(ক্রমশ)

ঠাকরুণ

কণা বসু মিশ্র

বড় লোহার গেটটা ঠেলে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকলেন ঠাকরুণ। দীর্ঘদিন বিরতির পর এবার তাঁর আগমন। কোমরে প্রকান্ড বোঁচকাটি পূর্ববৎ। যার মধ্যে রয়েছে শতচ্ছিন্ন মশারিটা আর দুটো পুরনো আধছেঁড়া কাপড়। তার এক কোণায় বাঁধা কিছু খুচরো পয়সা, গোটা কয়েক আধুলি। ঠাকরুণের পরনের থানের রঙটা আজও কোরাই আছে। যেটা দয়া করে কিনে দিয়েছিল কোন এক পড়শী। মুখটা খুব বেশী ফুলো ফুলো লাগছে ওঁর। বেরী বেরীতে ধরেছে।

বাড়ির গিন্নীর কোন রকম অনুমতি না নিয়েই ভেতরের একখানা ঘর দখল করলেন ঠাকরুণ। বোঁচকাটা ধপ্‌ করে ফেললেন মেঝেতে। তারপর ঝুপ্‌ হয়ে বসে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে হাঁফাতে লাগলেন। তার চেহারায় আর আগের মতন জৌলুস নেই। রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়েছে ফর্সা গায়ের রঙ। কপালে বয়সের জোরালো কয়েকটি রেখা। আপেলের মতন ফুলো ফুলো মুখখানার ওপরে মরা মাছের মতন একজোড়া চোখ। ফ্যাকাশে চোখে তাকালেন ঠাকুরণ এ বাড়ির গিন্নী বিজয়ার দিকে। একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন, বীরভূম থেকে এলাম গো বউ।

কথা বললেন না বিজয়া। কুটনো কুটতে কুটতে শুধু একটু তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর মুখভরা কাঠিন্য। আশে-পাশের বাড়ির জানলায়, দরজায় তখন রীতিমত ভিড় জমে গেছে। ঠাকরুণকে দেখার অপরিসীম কৌতূহল। কতবারই তো আসেন ঠাকরুণ তবু এদের কৌতূহলের শেষ নেই। বিজয়া ভাবেন, আসলে এক ধরনের লোক থাকে যারা হুজুগে। কিছু একটা পেলেই হলো। কেউ জানে না, ঠাকরুণ যে কেন আসেন, আর কেনই বা যান। তবে প্রলাপের ঘোরে তিনি বলেন, যারা আমার সর্বনাশ করিছে, আমি তাগেরে অম্নই ধ্বংস করবো। তাই তো ভিটে মাটি ছাড়ে পথে পথে ঘুরি।

এত বড় কথায় চমকে উঠেছেন বিজয়া। চিৎকার করে বলেছেন, বেরিয়ে যান। —কোন লাভ হয়নি। খিক্‌খিক্‌ করে হেসে উঠেছেন ঠাকরুণ। তাঁর ওই নিষ্প্রভ চোখ দুটো তখন জ্বলে উঠেছে। খরচোখে তাকিয়ে ঠাকরুণ থুতু ছিটিয়েছেন এ বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে। তারপরই গান ধরেছেন, সাপের মুখি পাঠাইছিলে ওরে আমার হেঁয়ালী রে।...এ কথার অর্থ বোঝেন নি বিজয়া। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন অজয়ের দিকে। অজয় বলেছেন, পাগলের কথায় কেন যে কান দাও।

কি জানি তোমাদের জমিদারীর রক্তে রক্তে কত পাপ ছিল। সত্যি ওঁর কোন সর্বনাশ করেছিলে কি না?

চুপ করো।

অজয়ের খুব মায়া হয় ঠাকরুণের দিকে তাকালে। ওই দুটো হাত একদিন অনেক করেছে বড় বাড়ির। অজয়রা সব ভাই-বোনেরা মানুষ হয়েছে ওঁরই কাছে। বড় বাড়ির মানুষের জন্যে যে ঠাকরুণ একদিন বুক পেতে দাঁড়াতেন, আজ তাঁরই মুখে বড় বাড়ির নিন্দে। কিন্তু কেন?... অজয় খুব ভাল করেই জানেন তাঁর বাবার লোভ ছিল না ঠাকরুণের ওই ভিটে মাটির ওপর। ঠাকরুণের তো দায় ছিল না খাজনা দেবার। কুলপুরোহিতের স্ত্রী ঠাকরুণ। বড় বাড়িতে কয়েক পুরুষ ধরে যজমানি করেছিল অন্নদা ঠাকুররা। অজয়ের ঠাকুর্দা নিজে লিখে দিয়েছিলেন তাঁর নামে ওই ভিটের জমিটুকু। ঝড়ে সেবার ঘর পড়ে গেল, ঠাকুর্দা ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন। কামিন ডেকে ঘর তুলে দিলেন। এ সব কথা অজয় কতবার শুনেছেন ছেলেবেলায় ওই ঠাকরুণেরই মুখে। অথচ আজ উলটে বদনামই শুনতে হয় তাঁকে। অজয় বিজয়াকে বোঝাতে পারেন নি তাঁরা কোনো পাপ করেনি ন। ওটা স্রেফ পাগলামী।

ঠাকরুণ পুকুরে নাইতে গিয়েছিলেন ভর সন্ধ্যেবেলা। ভীমরতি ধরেছিল আর কি। ডুব দিলেন তিনি। তারপর কাঁখে করে এক কলসী জল নিয়ে সবে ঘাট পেরিয়ে এসেছেন, বনবাদাড়ের মধ্যে দিয়ে সরু একফালি পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঠাকরুণের ঘরে, ঝোপের মধ্যে কি যেন নড়ে উঠলো, হঠাৎ পায়ে কি বাধলো, হোঁচট খেয়ে পড়লেন ঠাকরুণ। অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলেন না জিনিসটা কি? মুহূর্তে ঠান্ডা স্রোতের শিহরন খেলে গেল তাঁর শিরায়, ধমনীতে। জ্বালা, জ্বালা, জ্বালা ব্যাপারটা অনুমান করতে না করতেই বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুতে লাগলো, সেই সাথে গোঙানি।

ভাদু মক্কেল গিয়েছিল পৃষ্ঠা [illegible]

[illegible] খ‍ুঁজতে। গোস্তানি শ‍ুনে এগিয়ে গেল। আরে ঠাকরুণ যে! হাতে ছাগলের দড়ি, আর ওরা তাই দিয়েই কষে বেঁধেছে ঠাকরুণের পা। চুরুট ধরিয়ে অজয়ের বাবা দেখছিলেন মামলার নথিপত্র। খবর গেল সেখানে। অজয় তখন ছোট। তব‍ু মনে আছে তার, সেদিন ওই বড় বাড়িতেই উঠেছিল কান্নার রোল। অজয়ের মা, ঠাকুমা থেকে শ‍ুরু করে ছোটরা পর্যন্ত। বড় কর্তা কিন্তু সেদিন আশ্চর্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। চুরুট মুখে পুড়ছে, চিন্তান্বিত বড় কর্তা এক এক করে তিনটি পায়রা পর পর চেপে ধরেছিলেন ঠাকরুণের ওই ক্ষতর মুখে। পায়রা শ‍ুষে নিল ঠাকরুণের বিষ। তারপরই ঢলে পড়লো। ঠাকরুণ পাগল হবার পর গাঁয়ের লোকেরা বলত অবলা প্রাণীগ‍ুলোর অভিশাপই কি শেষ পর্যন্ত কুড়োতে হল ঠাকরুণকে?

চৈত্রের চড়া রোদে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছেন ঠাকরুণ। তেষ্টায় গলার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। দু হাতের আঁজলা ভরে জল খেলেন কল থেকে। তারপর বোঁচকা খুলে বিড় বিড় করতে লাগলেন। মাথার চাঁদিটা যেন রোদে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শেয়ালদা ইস্টিশান থেকে এই এতটা পথ সোজা তো নয়।

বিজয়ার যেন মায়াই হলো। রমেশ মশলা বাটছিল, ডেকে বললেন, ও রমেশ, ওঁকে এক কাপ চা দে। আর দুখানা রুটিও দিস।

ঠক করে এক পেয়ালা চা রেখে গেল রমেশ। সেই সংগে একটু তরকারি, রুটি। বিড়বিড়ানি থেমে গেল ঠাকরুণের। হুপ-হাপ শব্দে মুহূর্তে শেষ করলেন চায়ের কাপ। তারপর গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন রুটি, তরকারি। বিজয়া সহ্য করতে পারলেন না ঠাকরুণের ওই লোলুপ দৃষ্টি, চোখ সরিয়ে নিলেন।

এখন তো চাকরের হাতেও মার খান ঠাকরুণ। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন নাকি তিনি স্বর্গকে ছুঁতেন। [illegible] বাজিকরের ছিল [illegible]। সেকালের হিন্দু ঘরের বিধবা। আচার নিয়মের অনুশাসনেই বাঁধের মত হয়েছিল। ঠাকরুণও তো ছিলেন তাঁদেরই একজন। এ সব কথা বিজয়া শ‍ুনেছেন তাঁর শাশ‍ুড়ীর মুখে। এ বাড়ির বউ হবার পর থেকে যদিও আজকের ঠাকরুণকেই দেখছেন বিজয়া। যাঁর লোভী চোখ দুটো কাঁচের মতন চকচক করছে এই মুহূর্তে। লক লক করছে রসনাসিক্ত জিভটাও। এই মানুষটাই একদিন নির্লোভ ছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে বিজয়ার।

খাওয়া শেষ হলো। ফাটা পায়ের পাতার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো এ-বাড়ি ও-বাড়ির কৌতূহলী জনতার ওপর। দপ্ করে জ্বলে উঠলেন ঠাকরুণ। চোখ পাকিয়ে তেড়ে গেলেন জানলার কাছে। কপালে হাত রেখে কোমর দুলিয়ে নেচে উঠে ঠাকরুণ বললেন, পাগল দেখতি আইচো বুঝি, না? দ্যাখো, দ্যাখো।

হই হই করে উঠলো বাচ্চারা, পাগল, পাগল, পাগল। —উৎসাহ বেড়ে গেল ঠাকরুণের। কোমরে হাত, কপালে হাত, খ্যামটা নাচ নাচতে লাগলেন তিনি। এই সময় চারণ কবির মতন অলৌকিক প্রতিভা লাভ করেন ঠাকরুণ। অন্য দিনের মত আজও বানিয়ে বানিয়ে গাইলেন:

খাস বিলিতি আমার পাতি
নকল হলে চলবে না।

তাঁর সেই বেসুরো রাগিণী প্রচুর হাসির রসদ জোগালো শ্রোতাদের। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়লো শিশ‍ুরা। দ্বিগ‍ুণ উৎসাহে তখন নেচে চললেন ঠাকরুণ।

পাশের ঘর নন্দনের। সামনেই পার্ট টু পরীক্ষা। কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারলো না নন্দন। সে চেঁচিয়ে বললো, জানলাগ‍ুলো বন্ধ করে দাও তো মা। নইলে ওঁর নাচ, গান থামবে না। একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে এলেন বিজয়া। ঠাস্ ঠাস্ করে বন্ধ করে দিলেন জানলাগ‍ুলো। তব‍ু কোন লাভই হল না। ঠাকরুণ তখন ভাবে বিভোর। চোখ তাঁর ঢুলু ঢুলু, মনের সবটুকু দরদ ঢেলে উনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সুরহীন কণ্ঠে সুর সৃষ্টি করতে। দীর্ঘাঙ্গী ঠাকরুণের শরীরে মেদ জমেছে। চেহারার ভাঁজে ভাঁজে বয়েসের ছাপ। কদম ছাট মাথায় কাঁচা পাকা চুল।

দেরি হয়ে যাচ্ছে বিজয়ার। এখন এই তাড়াতাড়ির সময় ঠাকরুণের পাগলামি। বিজয়া ধমক দেন, থামুন, থামুন বলছি।

ঠাকরুণের গান থেমে যায়। কিন্তু নাচ থামে না। নাচতে নাচতে ঠাকরুণ বললেন,

এক বেলায়, দুই বেলায়, তিন বেলায়। হ্যাঁ, এইবার আমি স্বামী ভিক্টোরিয়া পঞ্চম জর্জের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হলো, এ কি পুতুল জয়? বিলেত জয়।

দেওয়ালে ঝুলানো বিবর্ণ এক স্বদেশী নেতার ছবির দিকে তেড়ে গেলেন ঠাকরুণ। চোখের মণি দুটো লাট্টুর চাকার মতন ঘুরতে লাগলো বার বার। সে চোখে আগুন। যেন লক্ষ ভিসুভিয়াসের দাপাদাপি। ঠাকরুণ বললেন, এই সেই আমার সোয়ামী। মাথায় টুপি পরা, মুখে স্মিত হাসি সেই স্বদেশী মানুষটি এই মুহূর্তে ঠাকরুণের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। —জার্মান জয়, বিলেত জয়, হেঁয়ালী জয়। তুমি কি জানো না আমার বুকির মধ্যি কিসির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে! তোমার জন্যি একদিন বিলেতি কাপড় পুড়াইছিলাম।......হু হু করে কেঁদে উঠলেন ঠাকরুণ —তুমি বলিছিলে রক্ত দেও, আমি তুমাগেরে স্বাধীনতা দেব। কত মার পরানের ছেলে কাড়ে নিলে।...ঠাকরুণের কান্নার সুর চড়া হতে লাগলো। আমারে তুমি কি দিলে ওগো...।

বুলবুলি আর এক ঘর থেকে বলে উঠলো, মা, স্বদেশী যুগের কথা বলছেন, উনি।

বিজয়া বললেন, তোমার পড়ায় মন দাও। এদিকে কান পেত না।

খুন্তি নাড়তে নাড়তে বিজয়া ভাবছেন, এই পাগল কতদিন জ্বালাবে, কে জানে। কাঁহাতক আর ভাল লাগে, এ সব অসংলগ্ন কথাবার্তা। অজয়কে তিনি তো অনেক দিন বলেছেন, এটা তো বাপু তোমাদের দেশ গাঁয়ের বাড়ি নয় যে, যাকে তাকে জায়গা দিতে হবে ধর্মশালার মতন। এটা কলকাতা শহর। নিজের লোকদেরই মানুষ জায়গা দিতে পারে না, তায় আবার পরস্য পর।

আমার মা, ঠাকুমা ওঁকে কত ভালবাসতেন তা জানো? উনি আমাদের কাছে তো পরের মতন ছিলেন না।

—না থাকুন। আমার কাছে উনি পর। তোমার মা, ঠাকুমা যে সব ঝক্কি ঝামেলা নিয়েছেন আমি তা পারবো না।

কিন্তু অজয়ের সেই একই কথা, পারতে হবে। ইনি যখনই আসবেন, যতদিন খুশি থেকে যাবেন।

ব্যঙ্গের হাসি হাসেন বিজয়া। বলেন, তাও থাকতো যদি বাবুদের সেই জমিদারী।

কড়াতে তরকারি পুড়ে যায়। বিজয়া রান্নায় মন দেন। মেয়ের স্কুল, অজয়ের অফিস। ন'টার মধ্যে সব ভাত দিতে হবে। নইলে মিনিবাসের লাইনে জায়গা পাবে না।

বিজয়া বোঝেন, অজয় যে খুব প্রসন্ন মনে জায়গা দেন তা নয়। আসলে মানবতা বোধের পীড়ন। ঠাকরুণের কান্না ততক্ষণে সপ্তমে চড়ে গেছে। —চুপ করুন, চুপ। —ঠোঁটে অঙুল রেখে কড়া চোখে তাকান বিজয়া। —চুপ করবো? ক্যান? আমার হেঁয়ালি জয় হবে না তাতে? গ্যাসের মামলায় না জিতা পর্যন্ত আমার থামা নেই। আমি তো গ্যাসের হাতের পুতুল। ওরে, ডাক্তার আমার গেল মরে বিষির বড়ি খায়ে।

অবাক হলো নন্দন। ঠাকরুণকে ওর কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। নন্দন পর্দা তুলে গলা বাড়িয়ে বললো, মা, ওঁর স্বামী কি বিষের বড়ি খেয়েছিলেন?

তোমাদের নিয়ে আর পারা যায় না। —বিজয়া বললেন, ওঁর কথার কি কোন মাথামুণ্ডু আছে? তবু নন্দন অন্যমনস্ক হলো। গালে হাত রেখে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো। সামনের তিনতলায় জানলার একটা পাল্লা খুলে গেল। চড়াই পাখির মতন নন্দনের মনটা সুড়ুৎ করে উড়ে গেল সেদিকে। ওর বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ওখানে জুলি দাঁড়িয়ে। কি চায় জুলি? চিঠি?

নন্দনের মনে হলো, ইশারায় যেন সে তাই বললো।

জুলি সরে গেল। ওর বাবার গলার আওয়াজ এত দূর থেকেও শুনতে পেল নন্দন। প্রেমে পড়া মেয়েকে বাবার প্রচলিত শাসন। মুচকি একটু হাসলো নন্দন। জুলির চিঠিটার উত্তর লিখতে চেষ্টা করলো কাগজ কলম টেনে। চিঠিপত্র লেখায় সে মোটেই দক্ষ নয়। তারপর আবার ঠাকরুণের

এই চেঁচানি। জুলির লেখা পুরনো চিঠিটা বার কয়েক পড়ে নিল নন্দন। অনেক কেঁদেছে জুলি। ও দেখলো, তার সেই ঝাপসা মুখ। বারবারই কথা চেয়েছে সে। নন্দন জানে, কি সেই কথা। ইনিয়ে বিনিয়ে সেই এক ভালবাসা। যা লিখতে ও একেবারেই পারে না। তার চেয়ে জুলিকে একটা চুমু খাওয়া অনেক সহজ। কিংবা জুলির প্রাক্তন প্রেমিকের হাতে মার খেয়েও জুলির জন্যে লাইন দেওয়া। কলমের ডগায় দু এক কথা এসে ভিড় করছে। কিন্তু পণ্ডশ্রম। কলম বন্ধ করে নন্দন ছুটে গেল পাশের ঘরে। ঠাকরুণ হাসছেন, হা হা হা।

—চুপ করুন, চুপ করুন।

—কাকস্য পরিবেদনা। অনামনস্ক নন্দন ভাবলো, পাগলরা এমন হয় কেন? একজনের দারুণ সমস্যার মুহূর্তে এমন ঠাট্টার হাসি হেসে ওঠে।

ছেলে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজয়া ভয় পান। উঠতি বয়েসের ছেলে-ছোকরা। ওদের মেজাজই আলাদা। শেষকালে ঠাকরুণের গায়েটায়ে আবার হাত তুলবে না তো? বিজয়া বললেন, তুমি আবার এ ঘরে কেন? পড়তে যাও নন্দন।

আর পড়া? এই পাগলটাকে যত দিন রাখবে। ততদিন পড়াশুনো শিকেয় তুলতে হবে।...

নন্দন! তোমার বাবা শুনলে রাগ করবেন।

হাত নেড়ে নন্দন বললো, করলে করবেন। তাই বলে বাড়ির শান্তি নষ্ট করার রাইট বাবার নেই।

ছিহ্, ছিহ্। বাবাকে তুমি এমনি করে বলছো?

বিজয়া আজকাল লক্ষ করছেন, ছেলের মধ্যে বেপরোয়া ভাব। লঘুগুরু জ্ঞান নেই ছেলেটার। তার মনের কোণায় জমে উঠছে বাবার প্রতি এক ধরনের বিক্ষোভ। কিন্তু কেন? এ তো ভাল নয়? বিজয়া বললেন, বাবার সমালোচনা করার তুমি কে? —আরও কিছু হয়তো বলতেন বিজয়া। কিন্তু ছেলে বড় হচ্ছে, তার মধ্যে মাতব্বরী ভাব এখনি এসে গেছে। অতএব আর কথা বাড়ালেন না বিজয়া। বিরক্তি চেপে বললেন, দরজাটা না হয় বন্ধ করেই পড়লে।

চলে গেল নন্দন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন বিজয়া ওর সেই চলে যাওয়া পথের দিকে।

ঠোঁটের ওপরে কাঁচ একজোড়া গোঁফ। এখনো ওর মুখে চোখে ছেলেবেলার সেই দুষ্টুমিই যেন লেগে আছে। অবাধ্য হলেই যার কান ধরতেন বিজয়া। আজ তাকেই কি তোয়াজ করে কথা বলতে হবে?

ঠাকরুণের তখন কান্না থেমেছে। কিন্তু মুখে খই ফুটছে। বাড়িসুদ্ধ লোককে এখন শাপ শাপান্ত করে চলেছেন। —মিন্সে মরবি, ছেলেডার বউ মরবি। মেয়েডা বিধবে হবি। ভারি মজা হবে মোদের বিজয়া সুন্দরীর।

বুকের মধ্যে যেন ছ্যাঁকা খেলেন বিজয়া। —এই শুনছো? আচ্ছা, জ্বালা হল তো দেখছি। —বিজয়া জোরে চেঁচিয়ে বললেন। কাগজ পড়ছিলেন অজয় বাইরের ঘরে। শুনতে পেলেন না। বুলবুলি গিয়ে দাঁড়াল মায়ের পিঠ ঘেঁষে। আদুরে আধো গলায় বললো, উনি কিন্তু ভারি ইনটারেসটিং না মা? বিজয়া হাজার বিরক্তির দেওয়ালে মাথা কুটতে কুটতে দেখলেন মেয়েকে।

সামনের পাটির দুটো দাঁত নেই। পেছনের পাটিরও তিনটে। ঠাকরুণ মাড়ি বের করে হাসছেন। বীভৎস লাগছে।

বীভৎস লাগছে ও'র মুখগহ্বর। —অনাচার, অনাচার। —ঠাকরুণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, এই বড় বাড়ির ছেলের বউ, নতুন বিয়ের পর গাঁয়ের বাড়িতে যায়ে পুকুরে ডুবিছিল ক্যান, তা আমি জানিনে? ওই যে গো চাকর গুলবাহার টানে তুলবি বলে। —বিজয়ার কান পুড়ে যায়। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। এখন আর ও'র মনে হয় না, ঠাকরুণ পাগল। তবু এ কথা সবাই বলবে যে, তিনি পাগল! রাগ হয় অজয়ের ওপরে। রাগ হয় ঠাকরুণের ওপরে। ঠাকরুণ হেসে উঠলেন। যেন ভারি রসিকতা করলেন। ও'র সেই অসুস্থ, অস্বাভাবিক হাসি বিজয়াকে দগ্ধ করতে লাগলো। অথচ উপায় নেই। পাগলদের জন্যে এমন এক স্বাধীনতা তোলা যেখানে হাত বাড়ানোর উপায় নেই। বুলবুলি বললো, কার কথা বলছেন মা উনি? —বিজয়া বলতে পারলেন না মেয়েকে, আমি। আমারই কথা বলছেন উনি। বিজয়া ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন শুধু এক পলক তাকালেন ঠাকরুণের দিকে।

একই জায়গায় বেশী দিন থাকেন না ঠাকরুণ। আজ রানাঘাট, কাল মেদিনীপুর, পরশু বীরভূম করে বেড়ান। যদি কেউ প্রশ্ন করে, ট্রেনে আপনার টিকিট লাগে না?

ঠাকরুণ হাসেন, সেই মাড়ি বের করা বিকট হাসি। বলেন, না গো চেকার আলি পরে আমি পাগল সাজে থাকি।

তিনি কি তবে পাগল নন? তাঁর সমস্ত পাগলামিগুলোই কি তবে ভণ্ডামী? —স্তম্ভিত হন বিজয়া। এক আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে গেল সেবার। দশটি টাকা খোয়া গেল বিজয়ার। মনের ভুলে ফেলে রেখেছিলেন টেবিলে—অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় টাকাটার কথা মনে পড়লো অনেক পরে। কিন্তু টেবিল তো শূন্য। টাকা তখন হাওয়া হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে বাড়িতে নেই। আর থাকলেও বা তারা নেবেই বা কেন? রমেশও দেশে গেছে ছুটিতে। অতএব? তবে কি ঠাকরুণ? না না, তিনি পাগল হতে পারেন, তাই বলে চোর নন। তবু...। বার কয়েক চিন্তা করে বিজয়া ও'র বোঁচকা খুললেন। ঠাকরুণ তখন স্নানে গেছেন। বোঁচকা খুলেই তো ও'র মাথায় হাত। অনেক যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করা রয়েছে সেই দশটি টাকা। মনটা কঠিন হল বিজয়ার। কিন্তু এই নিয়ে তিনি আর কিছু বললেন না। শুধু টাকাটা সরিয়ে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরই ধড়ফড় করতে করতে ছুটে এলেন ঠাকরুণ। আড়ালে দাঁড়িয়ে বিজয়া দেখলেন, ঠাকরুণ বোঁচকা খুললেন। টাকাটা দেখতে না পেয়ে উনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন ওপরের সিলিঙের দিকে। বড় করুণ ও'র সেই বোবা, বিষণ্ণ দৃষ্টি। মায়া হয়েছিল বিজয়ার। ভেবেছিলেন টাকাটা দিয়েই দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দেওয়া হল না। কেমন যেন এক ঘেন্নায় মনটা বিষিয়ে গেল।

পরদিন ঠাকরুণ বক্ বক্ করতে করতে বললেন, দশটা টাকা চুরি করিছিলাম, তাও শুগেরে চোখ টাটালো। চুরির ধন চুরিতেই গেল। ওরে আমার পোড়া কপাল।

অজয়কে ব্যাপারটা বলতেই স্ত্রীর ওপরেই রাগ করলেন তিনি। বললেন, এবার উনি যাবার সময় টাকাটা দিয়ে দিও তুমি।

সংসারে স্বামীদের তো এই একটিই জোরের জায়গা। সে হল স্ত্রী। যত বীরত্ব সব এখানে। বিশেষ করে অজয়ের মত লোক। যিনি টাকা পয়সার ব্যাপারে সবার কাছেই উদার। শুধু উদার নন একজনের কাছে। তিনি হলেন বিজয়া। টাকাটা ঠাকরুণকে দেননি বিজয়া। যদিও অজয়কে বলেছেন দিয়েছি। সংসারে এই ছলটুকু তাঁকে মাঝে মাঝে করতে হয়। নইলে অজয়ের মতন স্বামীর ঘর করা যায় না।

পরদিনই চলে গেলেন ঠাকরুণ। বুলবুলি জিজ্ঞেস করেছিল, ও দিদা, আপনি আর আসবেন না? —ঠাকরুণ বলেছিলেন, আসফো, আসফো, বীরভূম, মেদিনীপুর জিলার হাড় জ্বালায়ে আবার আসফো।

পাঁচিল টপকে ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালো নন্দন। এতক্ষণ ও অপেক্ষা করেছে, কখন জুলিদের বাড়ির আলো নিভবে। জানলায় জানলায় দাঁড়িয়ে কথা হয়েছিল এই কিছুক্ষণ আগেও। জুলি আজকাল নজরবন্দী ওর বাবা মায়ের। নন্দনের সঙ্গে তার এই হৃদয়ঘটিত ব্যাপারের খবর পৌঁছে গেছে ও'দের কাছে। তাই ওরা একজন আর একজনের কাছে আসে অনেক রাত্তিরে, যখন দু বাড়িতেই দারুণ নির্জনতা।

দোতলার রেলিং টপকে নেমে এলো জুলি। ওর পরণে নাইলনের স্ল্যাকস। গায়ে গেঞ্জি। চোরের মতন নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়ালো নন্দনের পাশে। রোজই এমন হয়। জুলি এলেই নন্দন পৃথ্বীরাজের মতন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু সংযুক্তার মতন তাকে হরণ করতে পারে না। আজও জুলির চুলের গন্ধের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে নন্দন আবিষ্কার করলো, সে একটা কাপুরুষ। যখন আকাশে কাস্তের মতন একখানা চাঁদ, যদিও পাশের খাটালের মশাগুলি তাদের বড় বেশি বিরক্ত করছিল। ঠিক তেমনি মুহূর্তে হেসে উঠলেন পাগল ঠাকরুণ। ওরা দুজনেই শিউরে উঠলো সেই

খ্যাকখ্যাসে হাসির শব্দ। নন্দনের ইচ্ছে হল, গলা টিপে মারে পাগলটাকে। একদিন হয়তো জেগে যাবেন বাবা। যিনি প্রায়ই উনসমনিয়ায় ভোগেন। জানলা খুলে তাকাবেন কুঠির দিকে। ওরা একে অন্যকে দেখলো অসহায়ভাবে। তারপরই সরে গেল।

ঠাকরুণের তখন অস্ফুট বাকালাপ চলছে। বড় চুপি চুপি তিনি যেন কাউকে প্রেম নিবেদন করছেন। তাঁর স্বগোক্তির মধ্যেই ফুটে উঠছে প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান। আহত ফণিনীর মতন ফুঁসে উঠছেন ঠাকরুণ। দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন অন্ধকার ঘরের মধ্যে। কার উদ্দেশ্যে যে ঠাকরুণের এই ঘৃণা, অভিমান, আত্মদহন, কেউ জানে না। সে কি অন্নদা ঠাকুর? তিনি তখন নিতান্ত নাবালিকা। কোন এক শুভ লগ্নে বৈদিক মন্ত্র পড়ে অন্নদা ঠাকুরের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছিলেন ঠাকরুণ। কোন রোমান্সের স্বপ্ন দেখার বয়স তাঁর তখন নয়। তাই স্বামীকে একান্ত কাছে পেয়েও বাঁধতে চাননি। ঠাকরুণ যে তখন বড় ব্যস্ত, মাটির পুতুল আর খেলাঘরের মিথ্যে সংসার নিয়ে। আফিঙের নেশায় মজে গেলেন তিরিশ বছরের অন্নদা ঠাকুর।

পুতুল খেলার সঙ্গী হতে পারলেন না বালিকা বধূটি। মোলকপরা ছোট্ট বউটির মনে কি কোন ব্যথা ছিল? হয়তো ছিল। হয়তো ব্যথা ছিল যুবতী বউয়ের মনেও। সেই যুবতী বউ এখন কাঁদে। যখন দেখে দুই যুবক যুবতীর মিলন। সে হাসে, হাসতে হাসতে কাঁদে।

ঘুমের আমেজ আসছিল, সেটুকু কেটে গেল ঠাকরুণের হাসির আওয়াজে। একেই অজয়ের ঘুম খুব পাতলা। তিনি ভয়ই পেলেন। বিজয়া আবার না জেগে যায়। ঠাকরুণের জন্যে আবার কথা শোনাবে তাঁকে। অজয় খুব মুশকিলেই পড়লেন। রাতদুপুরে এই পাগলের উৎপাত। বিজয়াই তো বাড়ির সকলের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অজয় ওঁকে কি করে তাড়াবেন। ওই মানুষটার মধ্যে দিয়ে তিনি যে তাঁর মা, ঠাকুমাকে দেখতে পান। যাঁদের কোন অস্তিত্ব নেই আর এই পৃথিবীতে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় অজয়ের। গ্রামের বাড়িতে এই ঠাকরুণ গল্প বলতে বলতে ঘুম পাড়াতেন তাঁদের। সেই নীল-কমল, লালকমলের গল্প। ঠাকুমার ঝুলির রূপকথার গোটা দেশটাকে তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিতেন বড় বাড়ির ছেলেদের মনে। ঠাকরুণের মাটির ঘরের মাদুরে শুয়ে শুয়ে অজয়রা শুনতেন দুয়োরানী, সুয়োরানীর গল্প। শুনতে শুনতে অজয়ের মনে হত, ইনিই যেন সেই দুয়োরানী। দুঃখিনী মায়ের ছেলে অজয় একদিন সাত সমুদ্দুর তের নদীর পথ পেরোবেন, সোনার কাঠির দেশে যাবেন। সাত রাজার ধন এক মাণিক নিয়ে তারপর অজয়...। জীবনে খুব বেশি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি অজয়। তবু ওই মানুষটিকে দেখলে তিনি খুঁজে পান সেই বীর রাজপুত্তুরকে। দুঃখিনী মার দাওয়ায় শুয়ে যে সোনার কাঠির দেশের স্বপ্ন দেখেছিল। ওঁর সেই চোখে যে সাধারণ এক মানুষ অজয়কে দেখেন না অজয়। দারুণ সম্ভাবনাময় কোন এক অজয় এসে সে চোখে উঁকি মারে। ঠাকুমার দেওয়া আমসত্ত্ব শুকোয় বড় বাড়ির ছাদের কড়া রোদে। পা টিপে টিপে যায় সেই ছোট্ট অজয়...। মা পড়াতে বসান সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠন জেলে। লণ্ঠনের চিমনিতে কালি জমে। অজয় দুলে দুলে পড়েন, সুর করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে থাকেন অজয়। দেওয়াল ঘড়ির শব্দ হতে থাকে। আবার শোনেন তিনি ঠাকরুণের হাসির আওয়াজ। হাহা...হাহা...হাহা...। হাসতে হাসতেই কাঁদতে থাকেন ঠাকরুণ। অজয় শোনেন, কাঁদতে কাঁদতে ঠাকরুণ বলছেন, তুমি যাও, যাও, আমার সতীন।

আর ওঁকে ছাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। বড় বড় পা ফেলে অজয় এগিয়ে যান ঠাকরুণের ঘরে। দরজা খোলাই ছিল। সেই খোলা দরজার সামনে অজয় বিস্ময়ে হতবাক। ওঁর সেই দুঃখিনী মা, একেবারে উলঙ্গ। অজয় কি করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি একবার কাপড় টানছেন আর একবার ছুঁড়ে ফেলছেন। লাইট পোস্টের আলোর তির্যকরেখা জানলার শিকের মধ্যে দিয়ে ছিটকে পড়েছে ঘরে, সেই আলোতেও অজয় দেখলেন, ঠাকরুণের ভীত বিহ্বল চাহনি। খালি ঘরে বসে তিনি কার ভয়ে কাপড় খুলছেন আর পড়ছেন অজয় ভেবে পেলেন না। তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমন নিঃশব্দেই ফিরে গেলেন।

অজয়ের খুব দুঃখ হচ্ছিল। বৈধব্যের দীর্ঘ রাজপথে কঠিন সংযম, নিয়মের পথ বেয়ে এসে শেষ পর্যন্ত ঠাকরুণের এই পরিণতি। তাঁর এই কাপড় টেনে নেওয়া আর উলঙ্গ হওয়ার রহস্য তিনি অনুমান করতে পারছিলেন। অজয়ের আজও যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, ঠাকরুণ সেদিন সত্যি অসংযমী হয়েছিলেন, যেদিন একটা দেহাতী সিঁধ কেটে ঢুকেছিল তাঁর ঘরে।

গাঁয়ের রাত আটটা রাত বারোটার সমান। ঠাকরুণের বাড়ি ছিল পুরুত বাড়ীর শেষ সীমানায়। বাঁশবনে শেয়াল ডাকছে। অমাবস্যার রাত। ছিটেফোঁটা আলো নেই কোথাও। কুপি নিভিয়ে দিয়ে ঠাকুরণ সবে শুয়েছেন। তখন তিনি বয়স্ক হলেও শরীরের গঠন আকর্ষণীয়। একাদশী, পুজো পার্বণে উপোসী এই মানুষটি কঠোর নিয়ম পালনে তখনো অভ্যস্ত।

কিসের আওয়াজ আসে? কে? কে দাঁড়িয়ে? অন্ধকারে দেশলাই হাতড়ালেন ঠাকরুণ। মুহূর্তে শুরু হল ধর্ষণ। ঠাকরুণ চিৎকার করতে চাইলেন। মুখে কাপড় গোঁজা। ঠাকরুণের ছটফটানি থেমে গিয়েছিল। এক সময় তিনি অনুভব করেছিলেন, আশ্চর্য এক কামের স্বাদ চোদ্দ বছর বয়েসের পর আবার।

চরম পূর্ণতার পর উঠলো লোকটা। দেশলাই জ্বাললেন ঠাকরুণ। নিটোল স্বাস্থ্য, কালো কুচকুচে ওই দেহাতীটাকে দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। মুচকি হেসে চলে গেল সে। কিন্তু ঠাকরুণ? মিলনের পর প্রচণ্ড দাবানলে জ্বলতে লাগলেন তিনি। তাঁর অনেক অনেক দিনের সংস্কার শত শত আগুন শিখার মত ঘিরে ধরলো তাঁকে। ঠাকরুণ দেখলেন আগুন। ঘরে আগুন। বাইরে আগুন। জ্বলতে জ্বলতে ছুটে এলেন ঠাকরুণ। তখন তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন। বন-বাদাড় পেরিয়ে বেহুঁশের মতন ছুটতে লাগলেন তিনি। কিছু দিন এই-ভাবেই পথে পথে ঘুরেছেন। জোর করে তাঁকে কাপড় পরিয়েছে গাঁয়ের লোকেরা। উন্মাদ ঠাকরুণ কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে বলেছেন, তাঁর সেই রাতের কাহিনী। অজয়রা দেখেছেন, অমাবস্যার রাতে বাঁশ-বনের মধ্যে ওঁকে ছুটে বেড়াতে। মুখে সেই একই কথা, আগুন, আগুন, আগুনের পিণ্ড গো, আমার দেহে আগুন।

পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন

গত কয়েক বছর ধরে অধিক ফলনশীল বীজের কল্যাণে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দানা জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে অনেকেই যথেষ্ট আশান্বিত হয়ে উঠলেও এখনও পর্যন্ত একটা বড় রকমের চিন্তা কিন্তু থেকেই গেছে। চিন্তা প্রোটিন খাদ্য নিয়ে। বিশেষ ক'রে প্রাণীজ প্রোটিন। দৈহিক সুস্থতার ব্যাপারে যার ভূমিকা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

মাছ, মাংস, ডিম, প্রভৃতি থেকেই আমরা মূল্যবান এই সব বস্তু সংগ্রহ করে থাকি। মুশকিল এই, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। আগামী দিনগুলিতে আরও বাড়বে। চাহিদা মেটানর জন্যে নানা ভাবে মাছের চাষ বাড়ানর চেষ্টা চলছে। কিভাবে সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করে কম খরচে মানুষের মুখে প্রাণীজ প্রোটিন তুলে দেয়া যায় সে সম্পর্কেও পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে বিস্তর। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হাঁস, মুরগী এবং নানা রকম প্রাণী পালন করে যাতে বেশি পরিমাণ মাংস উৎপাদন করা যায় তারও চেষ্টা চলছে সর্বত্র। কিন্তু তাতেও বাধা অনেক। প্রথমত এ সব কাজ করতে গেলে প্রচুর পশুখাদ্যের প্রয়োজন। তার যোগান দিতে গিয়ে এখনই অনেকের হিমসিম অবস্থা। এ ছাড়া ওই সব প্রাণীর দৈহিক স্বাস্থ্য এবং যথাযথ প্রজনন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যেও দরকার নানা রকম ওষুধপত্র, সাজ সরঞ্জাম, প্রভৃতি। অর্থনৈতিক কারণে এ সব যোগান অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। এর জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতিরও প্রয়োজন। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির জন্যে চাই বড় বড় চারণক্ষেত্র। হাঁস মুরগীর খাবার তৈরির জন্যে দরকার বড় বড় কারখানা। এ সব করতে গেলে চাষের জমিতে টান পড়বে। সেই সঙ্গে আছে বড় রকমের অর্থনৈতিক দায়।

কেউ কেউ বলছেন, প্রোটিন উৎপাদনের বিকল্প পথ এখনই বের করা দরকার। ইতিমধ্যে এ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে নানা রকম পরীক্ষাও চলছে। সম্প্রতি বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, পথ একটি আছে। পেট্রোলিয়াম। কেন, পেট্রোলিয়াম থেকে আমরা প্রচুর প্রোটিন তৈরি করতে পারি!

প্রিয়দারঞ্জন রায় : ৯০

বিশিষ্ট রসায়নবিদ, দার্শনিক এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাবশিষ্য অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় ৯০ বছরে পদার্পণ করলেন। বয়সের ভারে কিছুটা শ্লথগতি। কিন্তু অবগুণ্ঠিত মনের অন্তর্দেশে এখনও তিনি চলন্ত মানসিকতা। রসায়নের স্থলে আঙিনা থেকে ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতি এই নিয়েই এখন তিনি আত্মমগ্ন। জীবনের প্রান্তমুখে দাঁড়িয়ে এ সব নিয়েই এখন তিনি গবেষণা করে চলেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'লাইফ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স' গ্রন্থে প্রিয়দারঞ্জন সম্পর্কে এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন, 'এমন নিরহঙ্কার, অথচ গুণী মানুষ খুবই বিরল। ...রসায়ন চর্চার সমিতিগুলিতে আমার লেখা প্রবন্ধগুলি পাঠানর আগে সব সময়ই একবার তাঁকে দেখিয়ে নিই, তাঁর সমালোচনা এবং বিচারের জন্যে পাঠাই।...প্রিয়দারঞ্জন এ পর্যন্ত প্রায় কুড়িটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাদের যে কোন একটির সাহায্যে যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনায়াসে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করতে পারতেন। তিনি তা করেননি।' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৩২।

ওই একই গ্রন্থে আচার্যের আর একটি মন্তব্য : তাঁর (প্রিয়দারঞ্জনের) সাম্প্রতিক কৃতিত্ব, তিনি থিওসালফিউরিক অ্যাসিডের আইসোমার পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন। এই একটিমাত্র কৃতিত্বেই তিনি উচ্চমানের গবেষকের সম্মান অর্জনে কৃতকার্য হয়েছেন।

কুড়িটি নয়, বিশ্লেষণী রসায়নে তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা দু'শরও বেশি। সেই সঙ্গে কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থ— 'বিশ্বের উপাদান', 'রসায়ন ও সভ্যতা', 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী', প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত 'হিস্টারি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'র আধুনিক সংস্করণ 'হিস্টোরি অফ কেমিস্ট্রি ইন অ্যানসিয়েন্ট অ্যান্ড মিডিয়ভাল ইন্ডিয়া'ও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরই সম্পাদনায়। ভারতে আধুনিক রাসায়নিক গবেষণার তিনি অন্যতম প্রবর্তক।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে

প্রিয়দারঞ্জন রায়

অধ্যাপকের পদে তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেই ১৯১৯ সালে, ১৯৩৫-এ ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়ান্স ফাউন্ডেশনের ফেলো, ১৯৩৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের খয়রা অধ্যাপক, ১৯৪৬-এ পালিত অধ্যাপক এবং বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের প্রধান, ১৯৪৭-এ ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, জীবনে এমন অনেক সম্মানই তিনি লাভ করেছেন। ইন্ডিয়ান সায়ান্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তিনি আজীবন সদস্য। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়ান্স অ্যান্ড কালচার'-এর তিনি দীর্ঘদিন সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন।

১৬ জানুয়ারি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁর নব্বই বছরে পদার্পণের প্রাক্কালে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। এই উপলক্ষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডঃ আর সি মেহরোত্রা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, অত্যন্ত নগণ্য সুযোগ-সুবিধের মধ্যে দিয়ে গবেষণা চালিয়েও যে বৃহত্তর কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব, প্রিয়দারঞ্জন তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ঋষিতুল্য।

ওই একই শ্রদ্ধাঞ্জলি আমাদেরও।

এই প্রোটিন দিয়েই তো সারা পৃথিবীর মানুষের প্রোটিন খাদ্যের ঘাটতি মেটান যেতে পারে।
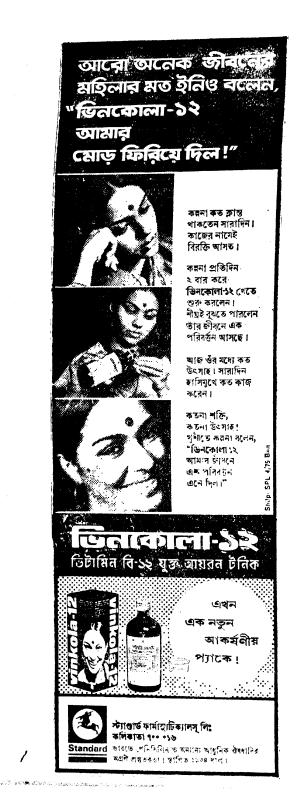
'ম্যান্ কান্‌নট লিভ বাই এনার্জি' অ্যালোন। তার নিজের বেঁচে থাকার কথাটাও সেই সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। ব্যাপারটা অনেক বেশি জরুরী। শুধু বর্তমানই নয়, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এখন থেকেই প্রোটিন খাদ্যের ব্যাপারে বিকল্প একটা কিছু ভাবতেই হবে। এই 'বিকল্প' বলতে আমি এখন পেট্রোলিয়ামের কথাই ভাবছি।' সম্প্রতি প্রোটিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে **ইউনেসকো ফিচার্স**-এর সম্পাদক পিয়েরেত পসমওস্কিকে এ কথা বলেছেন ১৯৭৬ সালের ইউনেসকো-বিজ্ঞান পুরস্কারে সম্মানিত ফরাসী বিজ্ঞানী আলফ্রেদ সামপাঁ।

সামপাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে মার্সেলিসে। কোন একটি পেট্রোলিয়াম কারখানায় কাজ করার সময় পেট্রোলিয়াম থেকে প্রোটিন তৈরির গবেষণায় তিনি হাত দেন। তাতে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছেন। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ইউনেসকো তাঁকে পুরস্কৃত করেছে।

পুরস্কার পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে সামপাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করেছিলেন পসমওস্কি। ওই সময় তাঁদের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর চলে এখানে সংক্ষেপে তা উদ্ধৃত করলাম।

প্রশ্ন : মাছ, মাংস ছাড়াও বিভিন্ন শাক-সব্জি এবং দানা জাতীয় খাদ্য কণা (গম, ইত্যাদি) থেকেও তো প্রোটিন পাওয়া যায়। ওই সব প্রোটিন এবং পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

সামপাঁ : একই প্রোটিন। [illegible] সব প্রোটিনের মধ্যে প্রধান প্রধান অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, বলতে গেলে সেই রকম। মুশকিল এই, গম, চাল প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান অ্যামাইনো অ্যাসিড খুব কম পরিমাণে থাকে, কখনও বা আদৌ থাকে না। যেমন ধরুন লাইসিন। বিশেষ ধরনের জীবাণু এই লাইসিন নামক বস্তুটির সংশ্লেষণে সাহায্য করে। বিশেষ করে ঈস্টের মধ্যে যেমন প্রচুর পরিমাণ লাইসিন পাওয়া যায়, ওই সব জীবাণুও তেমনি পেট্রোলিয়ামের স্পর্শে বরং বলি জটিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়াম থেকে লাইসিন এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রোটিন তৈরি করে।

'অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ব্যাপারটা এই : আমাদের সুষ্ঠু স্বাস্থ্যের জন্যে দরকার

কয়েক ধরনের প্রোটিন। এই সব প্রোটিনের কিছু কিছু আমরা পাই উদ্ভিজ্জ খাবার থেকে। এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্যে আমাদের মুখ্যত নির্ভর করতে হয় মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রাণীজ খাদ্যের ওপর। এই মাত্র লাইসিনের কথা বললাম। ঈস্টকোষে থাকে প্রচুর লাইসিন। অতএব আটার সঙ্গে যদি যথাযথ পরিমাণ ঈস্ট মেশান যায়, সেই আটার খাবার শরীরের লাইসিনের প্রয়োজনটা মেটাতে পারে এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু কিছু প্রয়োজনীয় প্রোটিনেরও। দেখা গেছে, এক শ ভাগ মিশ্রণের মধ্যে যদি ৮ ভাগ ঈস্ট এবং ৮৮ ভাগ আটা থাকে তাহলে মাংস না খাওয়ার জন্যে প্রোটিনের যে ঘাটতি ঘটে সেটা মিটিয়ে নেয়া যায়।'

প্রশ্ন: ঠিক কথা, জীবাণুর সাহায্যে প্রোটিন তৈরি হয়েছে, এ ধরনের কথা শোনার পর ওই সব প্রোটিন কি লোকে খাবে?

সামপাঁ: দেখুন, এ ধরনের কথা ভাবার মানে হয় না। ধরুন, পেট্রোলিয়াম থেকে ঈস্ট প্রয়োজনীয় প্রোটিনগুলি তৈরি করল। এর মানে এই নয়, ঈস্টের মধ্যে পেট্রোলিয়াম আছে। ধান, গম, অন্যান্য শাক-সবজীর কথাই ধরুন না। এদের উৎপাদনের জন্যে জৈব অজৈব মিলিয়ে কত রকম সারই তো আমরা কাজে লাগাই। কিন্তু খাবারে কি সে সব সার থাকে? পেট্রোলিয়াম থেকে ঈস্ট যে সব মূল্যবান প্রোটিন তৈরি করে তাদের পুষ্টিগুণ যাচাই করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে আমরা পরীক্ষাও চালিয়েছি। তাতে ক্ষতিকর কোন কিছু আমাদের চোখে পড়েনি।

সামপাঁর বক্তব্য, পৃথিবীর মোট পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের যদি শতকরা ২ থেকে ২·৫ ভাগ অংশও যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি তা হলে এই মুহূর্তেই পৃথিবীর পুরো প্রোটিন ঘাটতি দূর করা সম্ভব।

সামপাঁ প্রোটিন তৈরির পাইলট প্ল্যান্ট নিয়ে কাজ শুরু করেন ১৯৭২—৭৩ নাগাদ, মার্সেলিসের কাছাকাছি লাভেরা এবং স্কটল্যান্ডের গ্র্যাঞ্জেমাউথে। সম্প্রতি সারডিনায় একটি প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে। প্ল্যান্টটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে বছরে এক লক্ষ টন। ভেনিজুয়েলাতেও অনুরূপ একটি প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত দেশও তাঁদের প্রোটিন ঘাটতি মেটানর জন্যে পেট্রোলিয়ামের সাহায্য নিতে শুরু করেছেন। তাঁরাও একটি অতিকায় প্ল্যান্ট তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছেন যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে দশ লক্ষ টনের মত। উল্লেখ্য, পৃথিবীতে এখন বছরে প্রাণীজ প্রোটিনের মোট উৎপাদন দুই কোটি টন।

কথা বলার সময় পৃথিবীর বর্তমান প্রোটিন সমস্যাটি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সামপাঁ। তিনি বলেছেন, ধান, গম প্রভৃতির নতুন সংকরজাতের বীজ নিয়ে কাজ হচ্ছে। এই সব উদ্ভিদ থেকে যাতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে। লতাপাতা থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন সংগ্রহ করা যায় কিনা সে দিকটাও খতিয়ে দেখছেন অনেকে। মাছ এবং পশু-পালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ঘাটতি পূরণ অথবা সামুদ্রিক প্রাণী—অনেকে সে সব নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন। সমুদ্রে পুরো দমে

...বার কাজ চলছে। কিন্তু তারও তো সীমা আছে। এইভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে সামুদ্রিক প্রাণীজগৎ স্থিতি-স্থাপকতাও হারিয়ে ফেলতে পারে। এ সব দেখে মনে হয়, প্রোটিনের বিকল্প উৎস হিসেবে পেট্রোলিয়ামের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। চার কোটি টন পেট্রোলিয়াম থেকে বছরে দুই কোটি টন প্রোটিন উৎপাদন করা সম্ভব। পেট্রোলের এই পরিমাণটা পৃথিবীর মোট বাৎসরিক উৎপাদনের দুই শতাংশ।

সামগ্রিক এসব কথা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটাতেই সারা পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের ওপর এখন অনেক চাপ পড়ছে। পেট্রোলিয়ামের দাম দিন দিন বাড়ছে হু হু করে। পেট্রোলিয়ামকে এর পর যদি প্রোটিন তৈরির কাজে লাগানো হয় সেই প্রোটিন শেষ পর্যন্ত গরিব সাধারণের ভাগ্যে জুটবে তো?

সমরজিৎ কর

॥ ৩৫ ॥

কাতলা ছেড়ে মাতলা করার গল্প অর্থও মদনা আমাকে শুনিয়ে দিয়েছিল। সুন্দরী মেয়ে লেলিয়ে দিয়ে কোনো বড়লোককে কব্জা করা।

হাইকোর্ট পাড়ায় চাকরির সময় সেকালের এমন এক-আধটা কাহিনী শুনেছি বটে, কিন্তু তখন এ-ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। সেকালে কাতলা ছেড়ে মাতলা করার ব্যাপারটা মোটামুটি এক ছকে বাঁধা ছিল। লক্ষ্য একটাই—আলালের ঘরের দুলালকে কোনো সুন্দরীর মোহে মুগ্ধ করে ক্রমশ তাঁকে বশে আনা এবং যথাসময়ে তাঁকে ঋণজালে আবদ্ধ করা অথবা সুন্দরীর মোহ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় এমন সব আর্থিক প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেওয়া যাতে যথাসময়ে তাঁর মূল্যবান বিষয়সম্পত্তি জলের দামে কিনে নেওয়া সম্ভব হয়।

কাতলার প্রভাবে মাতলা হওয়া এক ধনীর দুলালকে হাইকোর্টের করিডরেও দেখেছিলাম। আমাদের জানা-শোনা এক বাবুর সায়েব তাঁর মামলা করছিলেন। এই দুলালটি সাবালক হওয়া মাত্রই তাঁর পিছনে কাতলা ছাড়া হয়েছিল; এবং ভবিষ্যতের খেয়াল না-রেখে এই কাতলার মান ভঞ্জনের জন্য যুবকটি সাদা কাগজপত্রে বেপরোয়া সই দিয়ে টাকা ধার করেছিলেন। উদ্দেশ্যঃ বাড়ির শুভানুধ্যায়ীদের কাছে গোপন রেখে সুন্দরী সান্নিধ্য উপভোগ করা এবং কাতলাকে তাকলাগানো একটি বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার দেওয়া। কাউকে যখন কিছু দেবার জন্যে মন আনচান করে তখন এইসব ধনীপুত্রদের নিজেদের হিতাহিত-জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং সেই অবস্থায় ধার পাবার জন্য যে কোনো কাগজে দস্তখত দিতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

এই দুলালটি যথাসময়ে যে জটিল মামলা জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাতে তাঁর সমস্ত মূল্যবান শহুরে সম্পত্তি অকস্মাৎ হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছিল। কাতলা ততদিনে নিজের কার্য সিদ্ধি করে অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়েছেন—অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হচ্ছিল না। অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ছে, সংসার-অনভিজ্ঞ চপলমতি সেই যুবকটি প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের প্রবল প্রচেষ্টায় সেবারে কোনোক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন। আইনের কোনো এক সরু গলিতে বিপক্ষকে পাক খাইয়ে প্রায় অবিশ্বাস্য উপায়ে ব্যারিস্টার মিস্টার ব্যানার্জি সেবার হাট-খোলার দুষ্ট এক তেজারতি কারবারীর সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্র বানচাল করেছিলেন।

বিরাট বিষয় সম্পত্তি কলমের এক আঁচড়ে বেচে দিতে বা বন্ধকী রাখতে পারেন এমন অপরিণতবুদ্ধি অভিভাবক-হীন যুবকের সংখ্যা এ যুগে গির অরণ্যের সিংহের মতোই ক্রমশ বিরল হয়ে উঠছেন—পরিস্থিতি এমন থাকলে তাঁদের নিশ্চহ্ন হতে যে আর সময় লাগবে না তাও সহজে ভাবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কাতলা ছাড়ার কাজে বিশেষজ্ঞরা তাই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলার জন্য নিজেদের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন করেছেন। এখন তরুণ জমিদার জীবনধন মল্লিক না থাকলেও মহাপরাক্রম-শালী অর্জুন চৌধুরী রয়েছেন।

এই অর্জুন চৌধুরী উচ্চ সরকারী কর্ম-চারি—তাঁর কলমের এক খোঁচায় কতকগুলো পারমিট যথাস্থানে স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়তে পারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ যুগে তেজারতি ব্যবসায়ে বড় হবার চেষ্টা করেন না—ওই ব্যবসায় হাঙ্গামার তুলনায় আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নেই। দূরদর্শীরা এখন যে সোনার হরিণটি ধরবার জন্যে উৎসুক তার নাম পারমিট। এ যুগে সরকারী শীলমোহরে মন্ত্রপূত বাদামী রঙের এক টুকরো পারমিটের অপার মাহাত্ম্য। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো পারমিটধারীর ইচ্ছা-নির্দেশে এই চিরকুট দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের বিরাট ঐশ্বর্য মালিকের সামনে হাজির করবে। কখনও সিমেন্ট, কখনও লোহা, কখনও চিনি, কখনও আটা, কখনও ভূষি—যে কোনো একটি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যই নিমেষে লক্ষ লক্ষ

মুদ্রা পারমিটধারীর তহবিলে স্বেচ্ছায় গচ্ছিত হবে।

দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র ছাড়াও পারমিটের অষ্টোত্তরী শতনাম আছে। এই পারমিট বলে কখনও রাজপথে বাস, ট্যাক্সি অথবা লরি চালনার অনুমতি পাওয়া যায়। এবং নিজে এইসব ব্যবসায়ে লিপ্ত না হয়েও কেবল এই অনুমতি পত্রের বকলমে প্রভূত সুখাজিত অর্থের মালিক হওয়া যায়।

জগদীশ জেঠমালানি এই মুহূর্তে সুলেখার মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে কী ধরনের পারমিট শিকারের আয়োজন করছেন তা এখনও আমার জানা হয় নি। শুধু নায়কের নামটি আমার কানে কয়েকবার বেজেছে। অর্জুন চৌধুরী—অর্জুন চৌধুরী। সুলেখা সেনের এখন একমাত্র ধ্যান ওই লক্ষ্যটি ভেদ করা। অর্জুন চৌধুরীকে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত সুলেখা কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না।

সুলেখার উদ্বিগ্ন হবার কারণও আছে। নির্মল চট্টরাজের ব্যাপারে জগদীশ জেঠমালানি যথেষ্ট সময় ও অর্থব্যয় করেছেন। সেই নাটকে সুলেখার অভিনয়ে কোনো ত্রুটি ছিল না—তার নির্দিষ্ট ভূমিকায় সে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। উদ্ধত নির্মল চট্টরাজ নরম হয়ে সুলেখার আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছেন; জগদীশের আতিথ্য গ্রহণে প্রাথমিক সন্দেহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তা সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে অবশ্যই সুলেখার অবদান রয়েছে। কিন্তু সুলেখার ভোলা উচিত নয় যে অপারেশন চট্টরাজ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। যে-উদ্দেশ্যে জেঠমালানি এত ব্যবস্থা করেছেন এবং ঝুঁকি নিয়েছেন তা সার্থক হয় নি।

জগদীশ জেঠমালানি মুখ ফুটে এ-ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করেন নি। কিন্তু রাজাবাবুর কাছে সুলেখা ও'র ভাবনা-চিন্তার কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছেন। রাজাবাবু দুঃখ করেছেন, নির্মলবাবুকে আমরা সামলাতে পারলাম না। অথচ আমাদের জাপানী প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার ইয়াসিকা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে কত সহজে আর একটা কেস ম্যানেজ করে ফেললেন। ওটাও খারাপ যন্ত্রপাতি সাপ্লায়ের প্রবলেম—ধানবাদের কোম্পানি চোখ রাঙাচ্ছিল ক্ষতিপূরণ চাইবে, মাল ফিরিয়ে নিতে বলবে। এসব ব্যাপারেই সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যে মিস্টার চট্টরাজের বড়কর্তা মিস্টার এস কে পণ্ডিত টোকিও গেলেন। এবং এয়ারপোর্টে নামার দেড় ঘণ্টা পরেই মিস্টার ইয়াসিকা কেসটা একজন জাপানী মহিলা এক্সপার্টের হাতে তুলে দিলেন।

সেই মহিলাই মিস্টার পণ্ডিতকে এমন ম্যানেজ করলেন যে সমস্ত গণ্ডগোল খুব সহজে মিটে গেল। শুধু মিস্টার পণ্ডিত আরও কয়েকদিন মিসেস ইয়ামাদার সান্নিধ্যসুখ উপভোগের লোভে মিস্টার ইয়াসিকাকে রিকোয়েস্ট করলেন আরও কয়েকদিন আলোচনা চালিয়ে যেতে। সেই সুযোগে মিস্টার পণ্ডিত স্বদেশে টেলিগ্রাম করলেন, 'আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় এসেছে, সমস্যার পাকাপাকি সমাধানের জন্যে আরও তিনদিন টোকিও অবস্থিতি বাড়িয়ে নিচ্ছি।'

হাসতে হাসতে রাজাবাবু খবর দিয়েছেন সুলেখাকে, সে সময় মিস্টার পণ্ডিত টোকিওতে অবস্থানই করেন নি। মিস্টার ইয়াসিকার এয়ার-কন্ডিশন গাড়িতে চড়ে মিসেস ইয়ামাদাকে নিয়ে তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কেসের ব্যাপারে মিস্টার ইয়াসিকাকে মাথা ঘামাতে হয়নি বললেই হয়—সব আলোচনা মিসেস ইয়ামাদা নিজেই নিভৃতে সেরে [illegible]ছিলেন। পাছে কোনো রকম অস[illegible] হয় বলে জাপানী মহিলাটিকে কো[illegible]নের সহকারী ম্যানেজারের পদ দেওয়া [illegible]ল—ভিজিটিং কার্ডে সে রকম ছাপাও ছিল।

রাজাবাবু সুলেখাকে বলেছেন, "ওয়াণ্ডারফুল সমাধান। সাপও মরলো অথচ লাঠিও ভাঙলো না। জাপানীরা ওই বিকল মেশিনে আরও কী বাড়তি যন্ত্রপাতি লাগবে তা দেখবার জন্যে বিনাপয়সায় লোক পাঠাতে রাজী হলেন এবং মিস্টার পণ্ডিতের মুখ রক্ষের জন্যে দু তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও সম্মত হলেন।"

সুলেখা তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। রাজাবাবু বললেন, "খুব সিম্পল। জাপানীদের সাতাশ লাখ টাকা জলে যেতে বসেছিল। সেটা বেঁচে গেল—পার্টিও হাতছাড়া হলো না। আর বিনা পয়সায় মেশিন দেখতে এসে যেসব নতুন স্পেয়ার পার্টস ওরা বেচে যাবে তার দামও দশ লাখ টাকা।"

সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "জানেন, মিস্টার পণ্ডিতের এই ভাল কাজের জন্যে প্রমোশন হয়ে গেল! কলা বেচার সঙ্গে রথ দেখাও হলো, অথচ কেউ কোনো সন্দেহ করলো না।"

এ দেশে সবই সম্ভব। আমি কী বলবো?

সুলেখা গম্ভীর হয়ে আমাকে বললো, "মিস্টার জেঠমালানির ধারণা—অল ক্রেডিট গোজ টু জাপানীজ উইমেন! মিসেস ইয়ামাদার মতো চৌকশ রমনীরা এদেশে অ্যাভেলেবল হলে মিস্টার জেঠমালানিদের

'জিজ্ঞাসা'-র নতুন প্রয়াস : স্বল্পমূল্যের নিবন্ধসাহিত্য

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

- এই গ্রন্থমালায় মানবিকী বিদ্যামূলক যাবতীয় বিষয়ের ওপর বিশিষ্ট গ্রন্থকারদের রচনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রতি মাসে একখানি ক'রে প্রকাশিত হবে।
- প্রতিটি গ্রন্থ ৮০ থেকে ২০০ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
- ইংরেজি ভাষায়ও অনুরূপ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে।
- গ্রন্থমালাভুক্ত উভয় ভাষার গ্রন্থাদি গ্রাহক-সদস্য ভিত্তিতেও বিপণনের ব্যবস্থা হয়েছে।
- যে-কোন ব্যক্তি এককালীন দশ টাকার বিনিময়ে এই গ্রন্থমালার গ্রাহক-সদস্য হতে পারবেন।
- গ্রাহক-সদস্যগণ গ্রন্থমালার বই ২৫% এবং 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনার বই ১৫% কমিশনে 'জিজ্ঞাসা'-র বিক্রয়কেন্দ্র থেকে সদস্যপত্র দেখিয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ কিনতে পারবেন।
- ডাকযোগে বই পেতে হলে গ্রাহক-সদস্যকে ডাকব্যয় বহন করতে হবে।
- **বিশেষ উপহার :** কোন গ্রাহক-সদস্য ১০০ থেকে ৫০০ টাকার বই (গ্রন্থমালার ও 'জিজ্ঞাসা'র প্রকাশনা মিলিয়ে) এক বছরে কিনলে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত নির্বাচিত গ্রন্থ উপহারস্বরূপ পাবেন।

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা : প্রকাশিত ও সত্বর প্রকাশিতব্য গ্রন্থের তালিকা

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস ৪·০০

ড. প্রবাসজীবন চৌধুরী
ঈশ্বর-সন্ধানে ৩·৫০

ড. সুকুমার সেন
রাম-কথার প্রাক্-ইতিহাস

ড. অতুল সুর
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ড. ভবতোষ দত্ত
অর্থনীতির পথে

—সম্প্রতি প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থ—

ড. নীলরতন সেন-সম্পাদিত
বাংলা প্রবন্ধ সংকলন ২৫·০০
উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তার বিবর্তনরেখাটি এই গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলা-বিদ্যা চর্চা ২০·০০
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ে বাংলা-বিদ্যার চর্চা সম্পর্কে একটি সেমিনারের উপাদান এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

ড. নীলরতন সেন
চর্যাগীতির ছন্দ পরিচয় ২০·০০
দীর্ঘকালের অভাব—প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থের ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনা এই গ্রন্থ দূর করল।

ড. অপূর্বকুমার রায়
উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্য : ইংরেজি প্রভাব ৩০·০০
উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের ওপর ইংরেজি গদ্যের প্রভাব সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাগ্রন্থ। বিষয়গৌরবে গ্রন্থখানি একক ও অনন্য।

ড. গোপেশচন্দ্র দত্ত
কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ২০·০০
বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

ড. অতুল সুর
বাঙলার সামাজিক ইতিহাস ৮·০০
প্রাক ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক পরিচয়সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

ড. জীবেন্দ্র সিংহরায়
শরৎ-সন্দর্শন ৬·০০
সাধারণভাবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যা কিছু বলার কথা তা বলা হয়ে গেছে; এখন তাঁকে তলিয়ে দেখার সময় হয়েছে। এ গ্রন্থে তারই প্রচেষ্টা লেখক করেছেন।

ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার ১০·০০
আশ্চর্য জনপ্রিয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার রহস্য ও শিল্পমূল্য এই গ্রন্থে নিরপেক্ষ বিচারবোধের সাহায্যে লেখক নিরূপণ করেছেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল
ডিরোজিও ৭·০০
নব্য বঙ্গের শিক্ষাগুরু, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উদ্গাতা ডিরোজিও-র জীবনী বাংলাসাহিত্যে না থাকাটা অত্যন্ত পরিতাপের। বর্তমান গ্রন্থ এ অভাব দূর করল।

ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য
বাগর্থ ১২·০০
বাংলা ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

জিজ্ঞাসা : প্রকাশন বিভাগ, ১এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯. ফোন ৩৪-৫৬৭৪
বিক্রয়কেন্দ্র : ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯, ফোন ৪৭-৭৭৯৫; ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

(সি ৫০৪২৩)

হাঙ্গামা নাকি অর্ধেক কমে যেতো!"

জাপানী উদাহরণে অনুপ্রাণিত জেঠ-মালানি কোম্পানির আশ্রয়ে সুলেখার যে চিন্তিত হবার কারণ হয়েছে তা সহজেই বলা যায়। এবারের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার জন্যে সুলেখা তাই এতো উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

অর্জুন চৌধুরীর সন্ধানে সুলেখা আজ তাই যথাসম্ভব কর্মতৎপরতা দেখিয়েছে। ফলাফল এখন পর্যন্ত কী হলো তা একমাত্র সেই জানে। সুলেখা এসব খবর নিজের কাছেই রাখুক, আমি চাই।

কিন্তু এই নিঃসঙ্গ জীবনে কারুর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে সুলেখা বিপন্ন বোধ করে। থ্যাকারে ম্যানসনের অপরিচিত পরিবেশে আমি ছাড়া আর কার সঙ্গেই বা সে কথা বলবে?

সুলেখা বললো, "রাজাবাবুও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে দিয়েছেন। "ইনসিওরেন্স এজেন্ট" মিসেস সুলেখা সেনের কার্ডখানা আমার দিকে সে এগিয়ে দিল। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর সেখানে জলজ্বল করছে।

সুলেখা বললো, "ওই 'মিসেস' কথাটায় আমার আপত্তি ছিল। ছাঁদনাতলায় যখন যাইনি তখন কথায় কথায় ওই জায়গাকে নোংরা করতে আমার ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কর্তাদের অন্য ধারণা। ও'রা ধরে বসে আছেন, কপাল ফাটা না হলে অভিজ্ঞ হাঙরেরা নাকি এগোতে দ্বিধা করে। মিসদের নিয়ে অনেক বিপদ—মিসেসরা সেদিক দিয়ে ডবল রিফাইনড অয়েলের মতোই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

ওই কার্ডের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে সুলেখা আজ অর্জুন চৌধুরীর সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিল। রাজাবাবু যতখানি সম্ভব সাহায্য করেছেন। টেলিফোনে অর্জুন চৌধুরীর কাছে ইনট্রোডাকশন দিয়েছেন। বলেছেন, "যদি দু মিনিট সময় দেন মিসেস সেনকে। খুবই ডিজার্ভিং কেস্গলী।"

সুলেখা বললো, "এই একটা পিক্যুলিয়র ব্যাপার জেঠমালানিদের। এমন ভাবে কথা বলবে যেন বাঙালীদের থেকেও কট্টর বাঙালী এ'রা। কলকাতার সুখ-দুঃখ ছাড়া এ'রা যেন কিছুই জানেন না—কলকাতার দুঃখ দেখলে এ'দের যেন রাত্রে ঘুম হয় না। একজন ডিজার্ভিং বাঙালী মহিলাকে সাহায্য করবার জন্যেই যেন আমাকে ও'রা মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর কাছে পাঠাচ্ছেন।"

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, নানা ছোটখাট বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সুলেখা কীভাবে শেষ পর্যন্ত অর্জুন চৌধুরীর চেম্বারে ঘরে হাজির হয়েছিল তা সুলেখা আমার কাছে প্রকাশ করে নি। অর্জুন চৌধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত কী বিশেষ অভিনয় সে করেছে এবং কী অব্যক্ত ইঙ্গিত নিঃশব্দে অর্জুন চৌধুরীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে তাও আমার জানবার অবকাশ হয়নি।

শুধু এইটুকু বুঝলাম, সাক্ষাতের ফলাফল এখনও অজ্ঞাত। নাম-ঠিকানা ও দূরভাষ-যন্ত্রের নম্বর দিয়ে এসে চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া সুলেখার গত্যন্তর নেই। অর্জুন চৌধুরী সেদিন বেশ ব্যস্ত ছিলেন—কেশীক্ষণ সময় সুলেখাকে দেন নি এবং সুলেখাও অফিসের ওই পরিবেশে এমন অস্বস্তি বোধ করেছিল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

এখন এই মুহূর্তে আর কী করবার আছে? টেলিফোনের নম্বর যখন তাঁর জানা, তখন ওই টেলিফোন কখন বাজবে তার প্রত্যাশায় বসে থাকা ছাড়া বোধ হয় দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

আমি বসে থাকতে থাকতেই সুলেখার ফোনটা একটু অস্বাভাবিক সুরেই যেন বেজে উঠলো। টেলিফোনটার সুর অন্য টেলিফোনের মতো নয়। রিসিভারের রঙটাও কাল নয়। সুলেখা বললো, "জেলকালিবাবুকে দিয়ে ইচ্ছে করেই আমি টেলিফোনের আওয়াজটা ওরকম করিয়ে নিয়েছি। উনি যন্ত্র এমন বেঁধে দিয়েছেন যে হৈ-চৈ করে বাজবার উপায় নেই—একটা ক্যার-ক্যার শব্দ হয়, তাতেই আমি বুঝতে পারি। ক্রিং ক্রিং করে গলা ফাটিয়ে টেলিফোন বাজলে আমার কেমন অস্বস্তি লাগে আজকাল।"

ঘরের এক কোণে টেলিফোন-ধরা সুলেখার মুখ দূরে থেকে দেখে বুঝতে পারলাম না, তার প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে কিনা। টেলিফোনের অপর প্রান্তে অর্জুন চৌধুরী না অন্য কে?

চাপা গলায় টেলিফোনে কথা বলার এমন শোভন কৌশল সুলেখা আয়ত্ত করেছে যে ঘরের অপর কোণে সোফায় বসে তার আলাপ আলোচনার কোনো ভগ্নাংশও আমার কানে ভেসে এল না। অথচ সুলেখার ভাবভঙ্গী সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক—আমার উপস্থিতিতে সে মোটেই সংকোচ বোধ করছে না। আমি একবার উঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু টেলিফোনের কাছ থেকেই ইঙ্গিতে সে আমাকে চলে না-যেতে অনুরোধ করলো।

বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সুলেখা একটু গম্ভীর মুখেই ফিরে এল। অর্জুন

চৌধুরী নয়। স্মরণ মিস্টার জেঠমালানি কলকাতায় ফিরে এসেই সুলেখার সঙ্গে সময় যোগাযোগ করেছেন। অর্জুন চৌধুরীকে আয়ত্তে আনবার সময় বেশী নেই। কাতলা ছেড়েই মাতলা সংবাদের জন্যে ছটফট করছেন জগদীশ জেঠমালানি।

সুলেখা নিজেও এই কয়েক মিনিটে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তার মুখ চোখের চঞ্চলতার কারণ সে নিজেই জানিয়ে দিল। জগদীশ জেঠমালানি তাকে বলেছেন, এই একই কেসে তিনি মিসেস পপি বিশোয়াসকে ব্রীফ দেবেন ঠিক করেছেন। "আমার কোনো পার্সোনাল প্রেফারেন্স নেই, সুলেখা," জগদীশ জেঠমালানি টেলিফোনেই জানিয়ে দিয়েছেন। "কাজটা যেহেতু আর্জেন্ট, সেহেতু আমার পক্ষে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তুমি অথবা পপি যে এই কাজটা আগে করিয়ে দিতে পারবে আমি তারই দলে।"

"পপি বিশোয়াস", নামটা সুলেখা নিজের মনেই পুনরাবৃত্তি করলো।

কে এই পপি বিশোয়াস? কী তাঁর পরিচয়, তা আমার মতো ক্ষুদ্রজনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

সুলেখা কিন্তু নিজের লাইনের খোঁজ-খবর রাখে। বললো, "ডেনজারাস মহিলা এই পপি বিশোয়াস। একদা জাঁদরেল এক রাজপুরুষকে বিবাহ করে কলকাতার হাই-সোসাইটিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাজপুরুষের রহস্যজনক অকালমৃত্যুর পরে পপি বিশোয়াস কিছুদিন বিখ্যাত শিল্পপতি মিস্টার তরফদারের চতুর্থা স্ত্রী হয়েছিলেন।" মিস্টার তরফদারের পঞ্চমাভার্যা গ্রহণের সময় আসন্ন হলে পপি কিছুদিনের জন্য কুমারী পর্যায়ে ফিরে গিয়ে অবসর যাপন করেন। এর পর পপি রায় যাঁর সান্নিধ্যে পপি বিশোয়াস হলেন তিনি এমন কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তি নন। তাঁর সম্বন্ধে নাকি বিশেষ কিছু শোনাও যায় না। কিছুকাল আগে গবেষণার কাজে অথবা মনের দুঃখে মিস্টার বিশ্বাস বিদেশবাসী হয়েছেন; কিন্তু পপি এই পরিচিত নগর কলকাতার মায়াবন্ধন কাটাতে পারেন নি। পপি বিশোয়াস এখন কলকাতার আর্ট কালচার জগতের সঙ্গেও কিছুটা জড়িয়ে আছেন।

সুলেখা এবার খিল খিল করে হেসে ফেললো। এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ইনসিওর এজেন্ট এবং ট্র্যাভেল এজেন্ট-এর টাগ-অফ-ওয়ারে কে জিতবে বলুন তো? অর্জুন চৌধুরী শেষ পর্যন্ত ইনসিওর করবেন, না রাউণ্ড দ্য ওয়ার্লড টিকিট কিনবেন?" পপি বিশোয়াস যে কোনো অখ্যাত ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছেন সে কথাটাও সুলেখা আমাকে জানিয়ে দিল। "আমি যেরকম ইনসিওর এজেন্ট উনি সেরকমই ট্র্যাভেল এজেন্ট!" খিল খিল করে হেসে ফেললো সুলেখা।

ট্র্যাভেল ও ইনসিওর—দুই এজেন্টের রাজকীয় লড়াই যে অচিরেই জমে উঠবে এই আশঙ্কা নিয়েই সেদিন নিরাপদে স্বস্থানে ফিরে এসেছিলাম। সুলেখাও তখন এক মনে কোনো এক চিন্তায় এমন মগ্ন হয়েছিল যে আমার নিঃশব্দ প্রস্থানে সে বাধা দেয় নি।

পরের দিন বিকেলে সুলেখা হাসি-মুখে আমার অফিস ঘরে ঢুকে পড়েছিল। সুলেখার হাতে কয়েকখানা সাহিত্য পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা লক্ষ্য করে আমি একটু বিস্মিত। তাতো ধরে নেওয়া ছিল না। সুলেখা প্রায় হুকুমের সুরে বললো, "এখনই আসুন আমার ঘরে। কাজ আছে।"

দুই এজেন্টের লড়াইয়ে সাময়িক বিরতি ঘটলো নাকি? সুলেখার ঘরে ঢুকতেই সে বললো, "আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি, তার বদলে আমাকে কয়েকটা কবিতা বোঝান!"

এই রকম বিনিময় বাণিজ্যের কথা অনেকদিন শুনিনি। সুলেখা বললো, "আমি খবর রাখি না ভাবছেন? মদনা আমাকে বলেছে, আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা পড়েন। ১১ নম্বরের মেমসায়েব তো আপনার কবিতার অন্ধ ভক্ত ছিলেন।"

"আমার নয়—উনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত। জীবনের সংশয় ও সংকট মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওই বৃদ্ধাকে সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান দিয়েছে।"

"এবার আপনি আধুনিক কবিতার কথা কিছু বলে যান আমাকে। আপনি ফাল্গুনী চৌধুরীর কবিতা পড়েছেন?"

সুলেখার এই আকস্মিক কাব্যপ্রীতির উৎসটি আমার কাছে রহস্যাবৃত হয়ে আছে এখনও। সুলেখা বললো, "এবারের কাব্য পত্রিকায় ফাল্গুনী চৌধুরীর কবিতা রয়েছে—মাথামুণ্ডু কী লিখেছে বুঝতে পারছি না, একটু মাস্টারি করুন।"

সুলেখা আমার হাতে ম্যাগাজিনের পাতাখানা খুলে দিয়ে বললে, "আপনি পড়ে যান, মানে করুন আমি ততক্ষণ চা বানাই।"

ফাল্গুনী চৌধুরীর কবিতা এমন কিছু অসাধারণ নয়—এতো কৃতী কবি থাকতে এই কবির ওপর সুলেখার সুনজর কেন?"

সুলেখা নিজেই এবার জানিয়ে দিল, "অর্জুন চৌধুরীই, ফাল্গুনী চৌধুরী ছদ্মনামে কবিতা লেখেন।"

অর্জুনেরই অপর নাম যে ফাল্গুনী তা শুনে চমকিত হলো সুলেখা। চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, "আমার নিজেরই তা হলে আন্দাজ করা উচিত ছিল।"

শুনলাম, রাজাবাবুর সঙ্গে সুলেখা গোপন যোগাযোগ করেছিল। এবং তিনিই অফিসে খোঁজ খবর নিয়ে অর্জুন চৌধুরীর এই বাড়তি পরিচয়টুকু সুলেখার কাছে পেঁছে দিয়েছেন। সুলেখা কয়েকখানা পত্র-পত্রিকা জোগাড় করে তাই বাড়ি ফিরেছে।

সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, "ঐ পপি বিশোয়াসের কাছে আমি কিছুতেই হারতে রাজী নই। রাজাবাবুর কাছেই শুনলাম, পপি নিজেও আরও খোঁজখবর নেবার জন্যে ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে একটা মেয়েকে মিস্টার চৌধুরীর অফিসে পাঠিয়েছিল।"

সুলেখা বললো, "রাজাবাবুকে আজ খুব শুনিয়ে দিয়েছি। আমার কাজের মধ্যে পপিকে আমদানী করাটা যে মোটেই ঠিক হয় নি, তা জগদীশবাবুর কানে তোলা উচিত।"

রাজাবাবু অবশ্য বলেছেন "অন্য কেস হলে, মামা তোমার ওপর নির্ভর করেই থাকতেন, সুলেখা। কিন্তু এখানে সময় খুব অল্প। বাহাত্তর ঘণ্টা পরেই মিস্টার চৌধুরীকে পারমিটের ফাইলটা সই করতে হবে।"

কাব্যপাঠে সুলেখা কী অদৃশ্যশক্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন তা ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু পরের দিন সকালেই সুলেখা আমাকে সুখবরটা জানিয়ে গিয়েছিল। পপি বিশোয়াসকে সে হারিয়ে দিয়েছে। আজ বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়েই অর্জুন চৌধুরী স্বয়ং চৌত্রিশ নম্বরে সুলেখার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

জয়ের আনন্দে ছটফট করছে সুলেখা। খবরটা সে জগদীশবাবুকে জানিয়েও দিয়েছে। জগদীশবাবু তো প্রথমে বিশ্বাসই করেন না। অর্জুন চৌধুরী খুব কড়া চরিত্রের লোক বলে তিনি রিপোর্ট পেয়েছিলেন। সুলেখাকে তিনি কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছেন এবং তাঁর কেসটার সমস্ত বিবরণ সুলেখাকে শুনিয়ে দিয়েছেন। অন্য ব্যবসায় আজকাল নানা অসুবিধা হচ্ছে, তাই জগদীশবাবু এই পারমিট লাইনে আসবার জন্যে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

সুলেখা বললো, "এখন একবার চলেছি মার্কেটে।"

মেয়েরা অবশ্যই ইচ্ছামতো নিউ মার্কেটে যেতে পারে। কিন্তু সুলেখা আমার কৌতূহলের অভাব দেখে তেমন খুশী হলো না।

বললো, "বাড়ি ভাড়ার তাগাদা দিয়ে দিয়ে আপনার মাথায় আজকাল কিছুই ঢুকছে না।"

আমি নিরুত্তর।

সুলেখা এবার বিজয়গর্বে বললো, "আজ মনের সুখে মার্কেটিং করবো, মিস্টার জেঠমালানির খরচে। মিস্টার চৌধুরী আসছেন শুনে মিস্টার জেঠমালানি বললেন, 'কোনো রকম আতিথেয়তার ত্রুটি হয় না যেন। সুলেখা, ইউ মাস্ট ড্রেস টু কিল! এমনভাবে সাজগোজ করবে যাতে পাখি নিজে এসে ধরা দেয়।' আমিও এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিশোধ নিলাম পপি বিশোয়াসকে লেলিয়ে দেবার। বললাম, 'তেমনভাবে ড্রেস করতে আজকাল অনেক খরচ হয়, মিস্টার জেঠমালানি।' জগদীশবাবুর তখন আর উপায় কী? সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি ভোজমালানির দোকানে ফোন করে দিচ্ছি। তোমার পছন্দ মতন শাড়ি এবং জামাকাপড় নিয়ে চলে এসো।'

"আর কসমেটিকস? ওসব তো ভোজমালানির দোকানে পাওয়া যায় না", তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল সুলেখা।

জগদীশবাবু প্রসন্ন হাসিতে টেলিফোন ভরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ভোজমালানিই ক্যাশের ব্যবস্থা করে দেবে, আমি বলে দিচ্ছি। ফিকর মত কীজিয়ে!"

জগদীশবাবুর কথার প্রতিধ্বনি তুলে নিউ মার্কেটের দিকে চলতে চলতে সুলেখা বললো, "আমি একটু পরেই ফিরে আসব। ফিকর মত কীজিয়ে!"

[ক্রমশ]

ভারতের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়

সাক্ষাৎকারী / রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্প্রতি শেষ হল। সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমেছিল পঁচিশটি কাহিনী-চিত্র। এদের মধ্যে কয়েকটি ছবি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যেমন : বেটোভেন, ডেজ অফ এ লাইফ (ইস্ট জার্মানি, পরিচালক : হার্স্ট সীমান) ম্যান অন দ্য রুফ (সুইডেন, পরিচালক : উইডারবারগ) ; হাউ টু গেট এ গুড নাইটস রেস্ট উইথ শারলট (ফ্রান্স, পরিচালক : ইভস রবার্ট) ; দ্য ম্যান হু ফলোজ দ্য বার্ডস (রাশিয়া, পরিচালক : খামেরেভ) ; সাইলেনট মুভি (ইউ এস এ, পরিচালক : মেল ব্রুকস) ; ফ্যামিলি প্লট (ইউ এস এ : হিচকক) ; রিফ্লেকশনস (হাংগেরি, পরিচালক : জর্দন) ; মৌসম (ভারত, পরিচালক : গুলজার) মন অ্যান্ড ইনো (জাপান, পরিচালক : ইমাই) প্রভৃতি। এই প্রতিযোগিতার বাইরে দেখানো হয়েছে বিখ্যাত পরিচালকদের এমন অনেক ছবি যা আগে কখনো এদেশে আসেনি। এসব ছবির মধ্যে ছিল ত্রুফো আর হিচকক-এর প্রায় সব ছবি। এছাড়া কুরোসোওয়ার থ্রোন অফ ব্লাড, লোয়ার ডেপথস, ইকিরু, রেড বেয়ার্ড এবং দ্য সেভেন সামুরাই ও রশোমন, ফ্রাঙ্কেনহাইমার দ্য ম্যান উইদাউট ফেস, ইভস রবার্ট-এর দ্য রিটার্ন অফ দ্য টল ব্লনড, গ্রীন-এর ওয়ানস ইজ নট এনাফ, পোলানস্কির চায়নাটাউন, ফরমান-এর ওয়ান ফ্লু ওভার দ্য কুকুজ নেসট প্রভৃতি। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন স্বয়ং কুরোসোওয়া, আনতোনিয়োনি এবং কাজান (যিনি আমাদের দেশে এখনো তাঁর অ্যারেনজমেনট উপন্যাসটির জন্যেই বেশি পরিচিত)। শ্রীসত্যজিৎ রায় ছিলেন বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি। প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার স্বর্ণ-ময়ূরটি পেয়েছে জাপানী ছবি মন অ্যান্ড ইনো। সোভিয়েত পরিচালক তাঁর ছবি দ্য ম্যান হু ফলোজ দ্য বার্ডস-এর জন্যে পেয়েছেন রৌপ্য ময়ূর। হাংগেরিয়ান ছবি রিফ্লেকশনস এবং সুইডেন-এর দ্য ম্যান অন দ্য রুফ-এ অভিনয়ের জন্যে জানা শিলশকোভা ও গুস্তাফ লিনসটেড যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ও অভিনেতার পুরস্কার দুটি পেলেন। ভারতীয় পরিচালক শুকদেবের ছবি আফটার দ্য সাইলেনস ছোটো ছবির প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় স্বর্ণ ময়ূর পেয়েছে।

সত্যজিৎ রায় ১৭ তারিখে কলকাতায় ফিরলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগী ছবিগুলি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। কুড়ি তারিখের সকাল-বেলায় তিনি লখনৌ চলে যাচ্ছেন তাঁর হিন্দি ছবি শতরনজ কে খিলাড়ির শুটিং শুরু করতে। কিন্তু তবু নানান কাজের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করলেন।

প্রশ্ন : প্রতিযোগী ছবিগুলি বিষয়ে আপনার সাধারণভাবে মতামত কি?

সত্যজিৎ : এবার প্রতিযোগিতায় যে-ছবিগুলো যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে খুব ভালো ছবি প্রায় ছিলই না। সেদিক থেকে প্রতিযোগিতার স্ট্যানডার্ড যে খুব উঁচু ছিল বলা যায় না। তবে কিছু ভালো ছবি তো ছিলই।

প্রশ্ন : মন অ্যানড ইনো কি প্রতিযোগিতায় খুব ভালো ছবি না থাকায় প্রথম হল?

সত্যজিৎ ঃ একেবারেই নয়। মন অ্যানড ইনো দারুণ পাকা কাজ। ইমাই জাপানের একজন নামকরা পরিচালক। শুনেছি এই কাহিনী নিয়ে আগেও ছবি হয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকে মন অ্যানড ইনোকে রিমেক বলতে পারো। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। ইমাইয়ের ট্রিটমেন্টটা একেবারেই নিজস্ব।

প্রশ্ন ঃ জাপানি ছবিটার সম্বন্ধে এখানকার ক্রিটিকসরা কিন্তু......

সত্যজিৎ ঃ আমি জানি। ক্রিটিকসরা তো ছবিটাকে একেবারে আমল দেয়নি। পরে দু-একজনকে বলতে শুনলাম, সেকি, সেই জাপানি ছবিটা! অথচ জুরিদের কিন্তু একেবারে ইউন্যানি-মাস ডিসিশান।

প্রশ্ন ঃ আমরা কিন্তু এখানে বোধ হয় বড় উইডারবার্গ সম্বন্ধে বেশি উৎসাহী ছিলাম।

সত্যজিৎ ঃ ম্যান অন দা রুফ কিন্তু খুব ভালো ছবি। [illegible]-এর [illegible] ছবিটা খুবই নাম করেছে। উইডারবার্গ-এর [illegible] সাহসী। [illegible]দের

মধ্যে কোন্... খুব ...
দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন : ফ্রানস-এর ছবিটা কেমন লাগলো?

সত্যজিৎ : কোনটা?

প্রশ্ন : হাউ টু স্টিল এ মিলিয়ন নাইটস বিজন উইথ শারলটি। তাই না?

সত্যজিৎ : বেশ মজার ছবি (হোলসেল-হাসতে)। কমেডি হিসেবে নিশ্চয় উৎরেছে। পিওর এনটারটেনমেনট বলতে পার। সেদিক থেকে তো প্রশংসা করতেই হয়। তবে তার বেশি কিছু নয়।

প্রশ্ন : ব্রুকস-এর সাইলেন্ট মুভি কিংবা নেদারল্যানডস-এর ছবি দ্য ম্যাড অ্যাডভেনচার অফ শারলক হোমস-এর চেয়ে ভালো?

সত্যজিৎ : নিশ্চয় অনেক ভালো ছবি। সাইলেনট মুভি তো স্ল্যাপস্টিক কমেডি হিসেবে বেশ কাঁচা। শারলক জোনসও বেশ গণ্ডগোলের ছবি। কোনোভাবেই পাকা হাতের কাজ নয়।

প্রশ্ন : প্রতিযোগিতায় তো বেটোভেন-এর ওপর একটা ছবি ছিল। আপনার নিশ্চয় ওটার ব্যাপারে খুব ইনটারেসট ছিল?

সত্যজিৎ : তা তো বটেই। বেটোভেন-এর ব্যাপারে আমার তো ইনটারেস্ট রয়েইছে। আমি তো সীমানকে (ছবির পরিচালক) দেখা হতে বললামও যে বেটোভেন-এর ওপর আমার নিজেরই ছবি করার অনেক দিনের ইচ্ছা। তবে অনেকগুলো কারণে ছবিটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। প্রথমত, বেটোভেন-এর জীবনটাকে টুকরো-টুকরো করে দেখানো হয়েছে। ফলে আমার মনে হয়েছে ছবিটা কখনোই দানা বেঁধে উঠে আমাদের মনে দাগ কাটে না। বেটোভেন-এর জীবনটা তো জটিল ব্যাপার। কিন্তু ছবিটার গোটা থেকে কোনো ইমপ্যাক্ট নেই। বিশেষত পরিচালক অনেক জায়গায় বড্ড বেশি স্বাধীনতা নিয়েছেন। ফলে বেটোভেন-এর জীবন-কাহিনী হিসেবেও ছবিটার মূল্য অনেক কমে গেছে। তাছাড়া কয়েকটি দৃশ্যে উলঙ্গ নারীর সঙ্গে বেটোভেন প্রেম করছেন দেখানো হয়েছে। বেটোভেন-এর ঐ ইমেজটা অ্যাকসেপ্ট করা যায় না।

প্রশ্ন : কিন্তু বেটোভেন তো যথা বললে...

সত্যজিৎ : জানি। দুজন নারী তো তাঁর জীবনে ছিলই। জুলিয়েটা আর থেরিসা। কিন্তু সেটাই তো বেটোভেন-এর মূল ব্যাপার নয়। সীমান-এর ছবিতে কিন্তু বেটোভেন-এর সেকস লাইফটাকে ডিসটর্ট করা হয়েছে। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। তবে একটা কথা, যে বেটোভেন-এর পার্ট করেছে তার সঙ্গে বেটোভেন-এর চেহারার খুব মিল।

প্রশ্ন : আপনি অ্যাবেল গানস-এর বেটোভেন দেখেছিলেন?

সত্যজিৎ : হ্যাঁ নিশ্চয়। ১৯৩৭ সালটালে বোধ হয় ছবিটা এসেছিল। গ্লোবে। আমি তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছি। ঐ ছবিটা দেখার ফলে বেটোভেন বিষয়ে আমার ইনটারেসট আরো বেড়ে গেল। সেদিক থেকে একটা মেজর ইনফ্লুয়েনস বলতে পার।

প্রশ্ন : সীমান-এর ছবির নায়কের সঙ্গে বেটোভেন-এর চেহারার মিল কি হ্যারি বর-এর চেয়ে বেশি?

সত্যজিৎ : মিলটা নিশ্চয় বেশি। কিন্তু হ্যারি বরকে তো বেটোভেন-এর চরিত্রে ভোলা যায় না। অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। তাছাড়া গানস-এর ছবিতে মিউজিক-এর ব্যাপারটা অনেক বেশি ছিল। গানস-এর ছবিটা তুলনায় অনেক উঁচু পর্যায়ের।

প্রশ্ন : প্রতিযোগিতার বাইরের ছবি ব্যারি লিনডন আপনার কেমন লাগলো?

সত্যজিৎ : কিউব্রিক-এর ছবি ইতিমধ্যেই তো ওদেশে খুব শোরগোল তুলেছে সুতরাং ছবিটা সম্বন্ধে স্বভাবতই আমার কৌতূহল ছিল। ব্যারি লিনডন ঠিক কেমন লাগলো সেটা তো এক কথায় বলে দেয়া যায় না। তবে ছবিটার টেকনিকাল কোয়ালিটি অসাধারণ। এ তাটাই ভালো যে ছবিটা দেখতে-দেখতে অন্য কিছু খেয়াল থাকে না। মোমবাতির আলোয় তোলা কয়েকটা দৃশ্য আছে। সেগুলো এতোটাই বাস্তব যে মনে হয় মোমবাতির আলোয় ... তুলতে আর কেউ ... করে ... করেন না। তারপর আউটডোরে অনেক দৃশ্যে কোনো রিফ্লেকটার না দিয়ে কাজ করেছেন। ... ঠিক না দেখলে বোঝানো যাবে না। ছবিটা শিল্পরূপ দিক ... হিসেবেও অসাধারণ।

প্রশ্ন : পেনেলোপি হুস্টন ব্যারির ক্ষেত্রে দৃশ্যাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "ক্রিউট্রিক বিংশায়ন ... হিজ ডেথ বেড উইথ পরেনগান্ট অ্যানড আনএকসপেকটেড সেনটি-মেনট।" আপনার নিজের কি মনে হয়?

সত্যজিৎঃ আনএকসপেকটেড তো বটেই। আশা করা যায় না, কেননা কিউব্রিক-এর আগের কোনো ছবিতে তো এই ধরনের সেন্টিমেনট্যালিটি দেখিনি। ব্যাপারটা একেবারে ন্যাকামির পর্যায়ে চলে গেছে। মর্ডালিন বলতে পার। আমার মনে হয় এই দৃশ্যটি সমস্ত ছবির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

প্রশ্নঃ পলিন কেল-এর মতে টম জোনস ছবিটা থেকে হাসির দিকটা বাদ দিলে ওটার সংগে ব্যারি লিনডন-এর মিল পাওয়া যাবে......

সত্যজিৎঃ তাতো বটেই। দুটোই তো এক জ্যং-এর ছবি। দুটোর মূলেই তো পিকারেসক নভেল। টমক জোনস-এর কথা তো আমার নিজেরই মনে হয়েছে। তবে টেকনিক্যালি ব্যারি লিনডন-এর সংগে কোনো তুলনাই হয় না।

প্রশ্নঃ সাধারণভাবে গত বছরের উৎসবে দেখানো ছবিগুলির সঙ্গে এ-বছরের ছবিগুলির কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে?

সত্যজিৎঃ এবছর ছবিতে সেকস-এর পরিমাণটা অনেক কম দেখলাম।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

একটি বার্ষিক প্রদর্শনী

গত বছর বিড়লা আকাদমীর বার্ষিক প্রদর্শনী বন্ধ ছিল। অথচ এটা এমন একটি প্রদর্শনী যাতে সমগ্র পশ্চিম বাংলা এবং ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের শিল্পীরা যোগদান করেন। ফলে, মোটামুটিভাবে সর্বভারতীয় শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা কঠিন হয় না (জানুয়ারী ৩—৩০)।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক শিল্পকলা সম্বন্ধে হতাশ হবার কারণ দেখি না। দিল্লি-বোম্বাইতে পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। কলকাতায় ছবি বিক্রী তেমন খুব হয় না। কিন্তু অবজ্ঞা-অবহেলার মধ্যে শিল্পীরা কাজ করছেন। নানা অভাব-অভিযোগের মধ্যে তাঁরা নিরুৎসাহ হচ্ছেন না। ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার নাট্য পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালকদের মতোই নিরন্তর তাঁরা কাজ করছেন। নগদ বিদায় নেই। এক ধরনের করুণা ও কুৎসা তাঁদের শিরোধার্য করে এগুতে হচ্ছে। অজ্ঞ দর্শক কটূক্তি বর্ষণ করছেন সুযোগ পেলেই। আর এরই মধ্যে পাঞ্জা লড়ে ওঁরা স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন। যেমন গত বছর দিল্লির ললিতকলা আকাদমী কাঞ্চন দাশগুপ্ত, শুভাপ্রসন্ন ও বরুণ সিমলাইয়ের কাজ সংগ্রহ করেছে—এ জন্যে আমি খুব গর্বিত। আমি পাঠকদের শুধু একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই, রামকিংকর, বিনোদবিহারী, প্রদোষ দাশগুপ্ত, চিন্তামণি কর, নীরদ মজুমদার পরিতোষ সেন কোনো অংশে সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, মৃণাল সেনের চেয়ে কম বড় শিল্পী নন। তেমনি সমরেশ বসু, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে মীরা মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ কর্মকার, সুনীল দাস, বিজন চৌধুরী, শর্বরী রায়চৌধুরী, বিপিন গোস্বামী কোনোভাবেই কম সৃজনশীল নন। গণেশ পাইন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভাল কবিতা আঁকেন। সামাজিক অস্বীকৃতি, অপপ্রচার সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার বহু শিল্পী যে নিষ্ঠার সঙ্গে কলাচর্চা করছেন এই জন্যে তাঁদের কাছে নম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের উচিত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে। হনুকরণ (Aping) অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু ভিন্নতর ঐতিহ্য থেকে আত্মসাৎ করা দোষণীয় নয়, যদি তা হয় সৃজনশীলতার প্রয়োজনে। পিকাসোর আফ্রিকার উপজাতীয় ভাস্কর্য থেকে ঋণ করাকে কেউ দোষ দেয় না। নন্দলালের চীন-জাপানের চিত্র ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে ভারতীয়করণকে একমাত্র কঠোর জাতীয়তাবাদী ছাড়া কেউ নিন্দা করে না। তাছাড়া উপন্যাস বা ফিল্ম বাইরে থেকে আমদানী করা শিল্পমাধ্যম, ছবি বা ভাস্কর্য তা নয়। শিল্পীদের কেউ যখন চৌর্যবৃত্তি করেন তখনই তিনি অপরাধী। কিন্তু স্বকীয় ধারায় পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের অনেক শিল্পীই যে কাজ করছেন এ কথার প্রমাণ বিড়লা আকাদমীর প্রদর্শনীতে পাওয়া গেল।

স্বকীয় শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন প্রায় সংঘবদ্ধভাবে অবাস্তব ও অতিবাস্তব ছবি আঁকছেন। যদিও অবাস্তবতার পুনরুত্থান ঘটিয়ে কাজ করার সার্থকতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। বিকাশ ভট্টাচার্য একরে প্যাস্টেল দিয়ে অতি দক্ষ হাতে সাঁইবাবার প্রতিকৃতি এঁকে মরুভূমিতে বসিয়ে তাঁর

সামনে বসিয়েছেন একটা পাথর। ক্ষয়ে যাওয়া একটা পুঁথির মালা—একটা অদ্ভুত পারলৌকিক ও মৃত জগৎ। প্যাস্টেলে এত যাঁর দক্ষ হাত তিনি ভিন্ন কোনো তাৎপর্যময় বিষয় নিয়ে কাজ করুন না। সমীর ঘোষের কালি-কলমে আঁকা ধূমায়মান আগ্নেয়গিরির ছবিটার মধ্যে পরিশ্রমের চিহ্ন আছে। গণেশ পাইনের ইলশেগুঁড়ি খুবই কাব্যময় টেম্পারায় করা একটি কাজ। একপাশে গাছের গুঁড়ি—বাকলে বলিরেখা—অন্যপাশে তালগাছ। মাঝখানে পেছন ফেরা একটি লোক। মাথায় তার কাগজের টুপি। পুষ্পপাতের মতো গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তেপান্তরে। হলুদ সবুজ আর শ্যাওলা রঙের বাহার। রূপারোপের জন্যে সূক্ষ্ম বিকৃতিকরণের আশ্রয় নিয়েছেন। খুবই রোমাণ্টিক কিন্তু পুরাণকল্পের যে ব্যঞ্জনা তাঁর ছবির বিশেষত্ব তা এখানে নেই। গণেশীয় ধারার দুই তরুণ শিল্পী হয়তো শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাবেন তাঁদের অন্বিষ্ট। অসিত মণ্ডল তরল নৃত্যশীল রেখা পটের ওপর ছেড়ে দেন। তারপর মানুষ আর জন্তুর আকার বাঁধেন সুতোর মতো রেখায়। বাবু ও বিবির শোবার ঘর নানা উজ্জ্বল রঙের মধ্যে মনোরম যদিও সচিত্রীকরণের ঝোঁক তাঁর টেম্পারার কাজে প্রবল। এইবার অসিত বাজারে পটের কাছে সরলীকরণের জন্যে গেছেন। পৃথ্বীশ সেন অভিমন্যু ছবিতে খাড়া ভাবে অভিমন্যুকে ঋজু বৃক্ষের মতো দীর্ঘায়িত করেছেন। চারপাশে কুটিল মহারথীদের মুণ্ডু দিয়েছেন। সবুজ, নীল আর হলুদে মারা সৃষ্টি হলেও পুরাণের খোলস ভেঙে ছবি কোনো আধুনিক তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়নি। শৈবাল ঘোষ এঁকেছেন জলরঙে মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার দৃশ্য। বাহকদের দেহ বরজের মতো পানের লতায়-পাতায় আচ্ছন্ন। মহাপ্রস্থানের পথের মতো এখানেও একটা কুকুর আছে যার মধ্যে থেকে হাড়গোড় বেরিয়ে এসেছে ছাল-চামড়ার ভেতর থেকে। নীল আর চাঁপা রঙের এই ছবিটা গণেশীয় কলমের কাজ।

ভিন্নতর কল্পনার স্বকীয়তা প্রকাশ করেছেন যোগেন চৌধুরী, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত এবং কার্তিক পাইন। যোগেন চৌধুরীর মিশ্র মাধ্যমের 'নটী বিনোদিনী'-তে অঙ্কনের প্রাধান্য। কালির ছোট ছোট আঁচড় কেটে যেভাবে জামায় ফুল তুলেছেন তার মধ্যে নৈপুণ্য আছে। শুধু জামা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা বিধ্বস্ত স্তন যেন অযথা চমক সৃষ্টির জন্যে বার করা হয়েছে। জরাকে মুখ রাঙিয়ে দিয়ে ঢেকে রাখা যায় এটা কি খুব বড় সত্য? ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত খেলনা ব্রক্সের বাড়ি-ঘরের ওপর আবছা নীল দিয়ে তার ওপর একটা পুরনো মান্ধাতার আমলের গাড়ি উড়িয়েছেন। কার্তিক পাইন লাউ মাচার ফাঁক দিয়ে লাল বাড়ির দেওয়ালের সামনে একটা দিশী ছোট্ট ছেলেকে খেলনা হাতে এঁকেছেন তেলরঙে। ছেলেটিকে ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। শুভাপ্রসন্নকল্পও সদবাস্তব ছবির সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে অঙ্গীকার করেছেন। চেয়ারে স্তূপীকৃত চাদর আর ছবির ফ্রেমে স্তনিল মেয়ের এই চিত্রকল্প একটু বেশি কাব্যিক। স্বপ্নেন্দু ভৌমিকের ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভাঙা নানা উষ্ণ ও শীতল রঙের উপজাতীয় মেয়ে স্বপ্নময়।

এছাড়া আর একটি সমাজসচেতন কিন্তু চিত্ররূপময় ধারায় ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে অনেকে কাজ করছেন। এর মধ্যে প্রকাশ কর্মকারের কালো আলো সিরিজের সাক্ষ্য প্রমাণ (দেশের মলাটে ব্যবহৃত) এবার পুরস্কৃত। কাঞ্চন দাশগুপ্তের অনবদ্য কাজ 'পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না' পূর্বেই আলোচিত। এই ধারার একটি মোটের ওপর ভাল কাজ হলো ঈশা মহম্মদের। একটি লাল মোটা রেখা পটের মাঝখানে রেখে উপরে তিনজন মারোয়াড়ী বৃদ্ধের প্রতিকৃতি এঁকেছেন—এদের একজনের উজ্জ্বল হলুদ পাগড়ী ওপরে উঠে গেছে—নীচে জলে প্রতিচ্ছায়া পড়ছে তিনজন কুৎসিত বন্য মানুষের। জোয়িন মুচালা খয়েরী পরিপ্রেক্ষিতে হুকে বাঁধা কুকুরের মুখ এঁকেছেন দক্ষ হাতে।
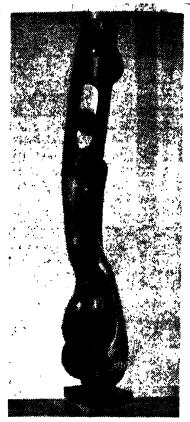
ক্রোরা-৭৬ প্রধান নিরঞ্জন

শিবপ্রসাদ করচৌধুরীর শুদ্ধ লাল নীল চৌকো ভূমি বিভাজন করে তৈলচিত্র 'সন্ধ্যার মেঘমালা' নিঃসীম আকাশের শূন্যতার মধ্যে আমাদের ছেড়ে দেয়। অশেষ মিত্রের অপূর্ব টিয়া সবুজ ঢেউয়ের মধ্যে কবন্ধ নারীদেহের ওপর বসে থাকা কালো পেঁচা সদ্‌বাস্তব ছবির ধার ঘেঁষে গেছে। তেমনি গণেশ হালুইয়ের অস্বচ্ছ জলরঙে আঁকা 'মরা মাছ'—সবুজ ঘাসের মধ্যে মরা মাছের কাঁটা আবহ তৈরী করেছে। চন্দ্র দোসী পাহাড় পর্বত কুয়াশা সূর্যের সম্মিলিত পরিবেশ রচনার প্রয়াস পেয়েছেন মোটা তুলিতে রঙ চাপিয়ে। নির্মল দত্তের 'লতাপাতা' তেল রঙের মুনোটের নানা খেলার জন্যে চমৎকার উৎরেছে। ধর্ম পালের 'গণেশ জননী'র সহজ লৌকিক আবেদন আছে। রবীন মণ্ডল কাগজ জুড়ে তেলরঙ ব্যবহার করে পরাজিত হাড়হাবাতে কুমারবাহাদুরকে এঁকেছেন মনের ভেতরে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে। বিশেষ রক্তপলাশের লালে চোখের নেশা ধরে যায়।

এবার ছাপা ছবিও কিছু ভাল ছিল। ছাপা ছবির মুশকিল হচ্ছে যে অনেকখানিই

কারিগরী বা অনেক বেশি অঘটনের ওপর নির্ভরশীল। সনৎ কর অবশ্য দক্ষ ছাপা ছবির শিল্পী। তাঁর সতী-র শায়িত নগ্নিকা ও সাপ প্রায় ছবির মতোই মায়া সৃষ্টি করে। মনোহর লালের নকশার মধ্যে আবদ্ধ রূপবন্ধের মায়া এবং অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ার্ত একটি মুখ সাধারণ ছাপা ছবির চেয়ে উন্নতমানের কাজ। তেমনি রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপা ছাগলের সরলীকরণ নয়নসুখকর। এ'রা অবশ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু বি আর পানেসারের মতো দক্ষ কাটা-কাগজে শিল্পীর এচিংও শক্ত কাঠ কাঠ ও কৃত্রিম হয়ে যায়। দারিদ্র্য সীমার নীচে—রাহুগ্রস্ত সূর্য, বড় বড় পাইপ ও দুটি অসহায় হাত নিপুণ আলোকচিত্রের খুবই কাছাকাছি। স্বপন দাসের লিনোকাটে অবশ্য রচনার দুর্বলতার জন্যে সীমায়িত অর্থে গোধূলির একটা পরিবেশ রচিত হয়েছে। আর রেবন্ত গোস্বামী কাঠের ছাপ তোলা ছবিতে সবুজ, হলুদ, নীল সমতল রঙের মধ্যে পরচর্চা-রত মুখগুলো মজাদার। অবশ্য ডুয়ারার, রেমব্রাঁ, গোইয়া থেকে পিকাসো পর্যন্ত অনেক নাম উঠবে। কিন্তু এ'রা দৈত্যসদৃশ শিল্পী। কোনো লিলিপুট হেঁটোর এ'দের সমকক্ষ হতে পারবেন না। অর্থাৎ ভাল গ্রাফিক আর্টিস্ট হতে গেলেও প্রথমে ভাল চিত্রকর বা ভাস্কর হওয়া দরকার।

ভাস্কর্য বিভাগে কিছু কিছু কাজ বেশ উন্নতমানের। প্রথমেই নাম করতে হয় ফুলচাঁদ পাইনের—বিশেষত অ্যালুমিনিয়ামের পাতে করা উদ্ধত পাখির ডানাকে অদ্ভুত-ভাবে গোল করে ঈষৎ বেঁকিয়ে গতির দৃশ্যময়তাকে ধরেছেন। তেমনি কাঠে করা ভাস্কর্যে মাধব ভট্টাচার্য খেলাধুলোর জয় উল্লাস-কে ধরেছেন (এই কাজটি দেশের প্রচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হবে)। নিরঞ্জন প্রধান উদ্ভিদ ৭৬-এ দীঘল রূপের ঊর্ধ্বপানে মোচড় দিয়ে উঠে যাবার সুঠাম মূর্তি গড়েছেন। ডিম্বাকৃতির নানা অংশের ছোট ছোট কাজগুলো এই সুদৃশ্য খেয়াল-গানকে জমিয়েছে। নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জে করা মাথা বেশ আধুনিক মেজাজের কাজ, যদিও নতুনত্ব এজন নেই এবং কোথায় যেন খানিকটা অস্বস্তি বর্তেছে। নিরঞ্জন ও নন্দদুলাল দুজনেই পুরস্কৃত শিল্পী।

রণেন্দ্র দত্তের ভাস্কর্য

রণেন্দ্র দত্ত বেশ খ্যাতিমান ভাস্কর। কিন্তু জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে তাঁর প্রদর্শনী (ডেকর সার্ভিস, ৩২ চৌরঙ্গী) তেমন জমেনি। পূর্বে প্রদর্শিত দু-চারটে কাজ ছিল। রূপবন্ধের সরলীকরণের দিকে তাঁর ঝোঁক। কিন্তু খুব একটা মনোযোগ দিয়ে করেছেন বলে মনে হলো না। তাড়া-তাড়ি প্রদর্শনী নামানোর দিকে নজর দিয়ে নান্দনিক দিকটা ঠিক যেন সামাল দিতে পারেননি। এরই মধ্যে রিলিফে করা এক সুন্দরী (প্লাস্টার। ১৬" ইঞ্চি আনুমানিক) তবু মন্দের ভাল। মাছের রূপ-বন্ধে (মাঝ-খানটা ফাঁক) বস্তুপুঞ্জের বলয়ের ইঙ্গিতটুকু অনুপস্থিত। কিছু রেখাচিত্রে তবুও দৃষ্টি-নন্দন ছান্দসিক রেখার খেলা ছিল। আর একটু মননশীলতা আর সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত কোনো ভাস্করের কাছে আশা করা কি অন্যায় হবে?

কথা ও চিত্ররূপ (১৯৭৪—৪৮"×৩৩" তেলচিত্র) —কে সি এস পানিকর

চিত্রকর কে সি এস পানিকরের মহাপ্রয়াণ

গত ১৫ জানুয়ারী মাদ্রাজে শিল্পী কে সি এস পানিকর ৬৬ বছর বয়সে হৃৎপিণ্ড রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

তাঁর জন্ম (৩১ মে ১৯১০) কোইম্বাটুরে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মাদ্রাজ চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সেখানে পানিকর ছাত্র ছিলেন এবং পরে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। দেবীপ্রসাদের অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৭ সালে পানিকর অধ্যক্ষ হন।

প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার সম্পর্ক স্থাপিত হবার মুখে তাঁর আকস্মিক পরলোকগমন আমাদের অভিভূত করেছে। আমরা শ্রদ্ধানত শিরে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

শিল্পমেলা

নিউ মার্কেটের পাশে পার্কে এ বছরে শিল্পমেলা শুরু হচ্ছে ১৯শে ফেব্রুয়ারী একপক্ষ কালের জন্যে। এবারের সভাপতি প্রখ্যাত শিল্পকলা সমালোচক ও 'কার্টুন' আঁকিয়ে শ্রীঅহিভূষণ মালিক। বিকেল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত রসিক সমাবেশে জমজমাট ব্যাপার। মাত্র পাঁচ টাকাতে নিজের প্রতিকৃতি আঁকানো যায়। স্বল্পমূল্যে ছবি সওদাও করা যায়।

সন্দীপ সরকার

কারণ আমরা চাই যে আপনিই জিতুন

প্রেস্টিজ প্রেশার কুকার নির্মাতাদের "বিরাট পুরস্কার" প্রতিযোগিতায়

আমরা প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭, পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম।

৪টি বিজয় স্কুটার—আর তাছাড়া
১০০ টিরও বেশি বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার
আপনারই জেতার অপেক্ষায়!

হ্যাঁ, আমরা চাই যে আপনি প্রেস্টিজ-এর সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ী হোন, আর সেই কারনেই প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ বাড়িয়ে দিলাম। আপনি নিশ্চিতভাবে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটা প্রেস্টিজ প্রেশার কুকার কিনুন ও আপনার প্রবেশপত্র আমাদের কাছে পাঠান, যা ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছানো চাই।

প্রতিযোগিতার বিশদ বিবরণ ও প্রবেশপত্রের জন্যে আপনার নিকটতম প্রেস্টিজ বিক্রেতার সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল শেষ তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

টিটি. (প্রাইভেট) লিমিটেড
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০১৬

SAA/TTP/2465 BN

আলোচনা

আধুনিক উপন্যাসে চরিত্র

অভিনন্দকে অসংখ্য অভিনন্দন। আজকাল উপন্যাসে চরিত্র থাকে না বলে তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ আর জটিল একটি প্রসঙ্গের দিকে আঙুল তুলেছেন। বিদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্য-ভাবনায় এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এদেশে অবশ্য এতটা কিছু হয়নি। কারণ, আমাদের চোখ এখনও বিশ-তিরিশের দশকের দিকে ঘুরে রয়েছে। যাই হোক, অভিনন্দের বক্তব্যের সঙ্গে আমি এক মত। এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে বড় কারণ বলতে যা বুঝেছি, তা এই:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ মানুষের দীর্ঘকালের অনেক ধারণা, সংস্কার আর আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অনেকানেক মোহ হয়েছে পর্যুদস্ত। বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা তো বটেই, তার আনুষঙ্গিক আধিব্যাধি, আবার তার সুফলগুলোও মিলে মিশে মানুষকে অনেকখানি বাস্তবমুখী করে তুলেছে। যাকে বলে প্র্যাকটিক্যাল হয়ে ওঠা। এদেশে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু তার সব কুফল ও সুফল আমাদের জীবনে পড়েছে এবং তা স্বাভাবিক। কুফল বলতে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশ ভাগ, অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। প্রযুক্তির সুফল হিসেবে অসংখ্য ভোগোপকরণ থরে বিথরে সামনে এসেছে। মানুষ যখন টের পেয়ে গেছে যে বস্তুত পৃথিবী, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আদর্শবাদ এবং মনুষ্যজীবনের সারবস্তা বলতে কী বোঝায়, তখন পুরনো মূল্যবোধে লাথি মেরে সে ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদেশে ব্যাপারটা আরও মজার। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে ভুখ-মিছিল বংশপরম্পরা ধুঁকতে ধুঁকতে হেঁটেছে, তাদের সামনে ওই নতুন ভোগোপকরণ প্রচুর হ্যাংলামি সৃষ্টি করবেই। তা আয়ত্ত করতে তারা যা খুশি করতে পারে—ন্যায়-নীতি আদর্শ এসব তাদের কাছে ইতিমধ্যে ফাঁকা বুলি হয়ে গেছে! দেশী সমাজতাত্ত্বিকরা এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন অবশ্য। আমরা চার পাশে যাদের দেখছি, তাদের মধ্যে সত্যি কোন বিরাট ব্যাপার নেই। যাদের দৈত্য বলে প্রচার করা হয়, তারা যে খড় বাঁশ জড়ানো কাকতাড়ুয়া, তা টের পাওয়া গেছে।

এই সামাজিক পরিবেশে, কী বিদেশে কী এদেশে, মানুষ বিরাটের ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন বিরাটের ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে, তেমনি নিজের ক্ষেত্রেও ওই ধারণা আর মেলানো যায়নি। বিরাট মানুষ বলতে বস্তুত আর কিছুই বোঝায় না। বিরাট মানুষ সৃষ্টি হয় না, এবং কস্মিনকালে হয়নি—সবই আরোপিত, এই নতুন ধারণা অসচেতনে মন জায়গা নিয়েছে। একদা মানুষ শিল্প ধর্ম—এক কথায় ভাবজগতে মানুষকে বিরাটের আসনে বসিয়ে ছিল। মানুষের অজস্র ভাল মন্দ সম্ভাবনা লক্ষ্য করে মানুষ সম্পর্কে গড়ে তোলা হয়েছিল এক প্রকান্ড রঙমহল। এর জন্য অবশ্য মধ্যযুগীয় ফিউডাল

সংস্কার : বীরপূজায় ছেরে থাকে আজও খানিকটা দায়ী। কথাশিল্পে স্মরণীয় চরিত্র অর্থাৎ বিরাট মানুষের ধারণায় প্রক্ষেপ ঘটানো হত অনেক চরিত্রে। তাদের মধ্যে পাঠক-মানুষের সেই চিত্তবৃত্তি ও আশা আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা ঘটত। আজকাল আর তা ঘটে না। ঘটার কোন কারণ নেই। মানুষের বিরাটত্বে অধুনা আমরা অবিশ্বাসী, মোহচ্যুত। যে-মানুষ শিল্পে ছিল সম্রাটের আসনে, তাকে টেনে নামিয়ে জনতার মধ্যে আনা হয়েছে। হবে নাই বা কেন? শিল্প-বোধে যুক্তিবাদ দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বাস্তব জীবনে যেমন, শিল্পেও যুক্তিবাদী ভাবনার চাপ প্রকট হয়েছে।

আরও ভাববার কথা আছে। ব্যক্তির নিছক একা একার কোন বিশাল দৈবী ক্ষমতা তো সত্যি নেই। ব্যক্তির অনন্য সাধারণ ক্ষমতা যা কিছু থাকে, তার প্রকাশ বা তার সৃষ্টি সামূহিক অর্থাৎ সমাজেরই সহায়তায় প্রতিষ্ঠা পায়। কোন হিটলার বা আইন-স্টাইন ভুঁইফোড় স্বয়ংসৃষ্ট স্বয়ংপ্রতিষ্ঠিত কিছু নয়। ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা অর্থাৎ তথাকথিত প্রতিভা স্বীকার্য। কিন্তু সময় ও সমাজ ছাড়া তা কাজে লাগে না। আধু-নিক সময়ে ব্যক্তি সম্পর্কে এই বিচার-প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। এ সবের ফলেও ব্যক্তিকে আগের তুলনায় খাটো করে দেখা হচ্ছে। আমরা তো ভুলেই গি[illegible]ছিলাম যে, শ্রেষ্ঠ মানুষরাও মল মূত্র [illegible]াগ করেন কিংবা আহার নিদ্রা মৈথুনে[illegible]ারঙ্গম।

ব্যক্তি মানুষ স[illegible] অধুনা ঔপন্যাসিকরা স[illegible]তন [illegible] অসচেতনভাবে ওই সব ধারণাই পোষণ করেন বলে মনে হয়। সত্যি তো! বর্তমান সামাজিক পরিবেশে আগের মতো অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চরিত্র সৃষ্টি করলে তাকে কি পাঠক বিশ্বাস করবেন? মনেই হয় না। এমন কি আগের উপন্যাসের স্মরণীয় অর্থাৎ বিরাট মানুষের ধারণা প্রক্ষেপিত করে তৈরি চরিত্রগুলোর প্রতি আজকের পাঠক যদি অবিশ্বাসে-সংশয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকান, অবাক হবার কিছু নেই। আজ বিজ্ঞানের জোরে মানুষের বিস্ময়কর কীর্তিকলাপ যা কিছু, তা মানুষের সামূহিক শ্রেষ্ঠত্বের পরিপোষক—ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তি কোন কৃতিত্ব পাচ্ছে না।

তবে আরও গুরুতর কথা এই : যন্ত্র-যুগের তথা প্রযুক্তির কল্যাণে অথবা অকল্যাণে অধুনা মানুষ প্রাতিস্বিকতার একবচন থেকে সামূহিকতার বহুবচনে পরিণত হয়েছে, তাতে কোন ভুল নেই। অনেক আগে অস্তিত্ববাদী হেইদেগার একেই বলেছিলেন, ফলন ফ্রম সেলফ। ব্যক্তিত্বের বিনাশ। ব্যক্তিত্ব না থাকলে চরিত্র থাকবে কী ভাবে? আমি

আমরায় পর্যবসিত হলো আর উপায় কী? মানসিকক্ষেত্রে বহুবকণতার প্রত্যাবর্তন সম্ভবত ইতিহাস ও মানবভাগ্যের অমোঘ পরিণতি। এর বিরুদ্ধে কিছু করার নেই।

একদা পৃথিবীব্যাপী মানুষের ধারণায় দৈত্য আর বামনদের রাজত্ব ছিল। এখন আর মনের দৈত্যগুলো নেই, শুধু বামন। ছোট মাপের মানুষ অনিবার্যভাবে গড্ডলপ্রবাহে ধুকুর ধুকুর হাঁটছে এবং সামনে আছে অতলান্ত খাদ—বিপুল শূন্যতার গহবর। এই উপমাটি সব সচেতন বুদ্ধিমান ঔপন্যাসিকের মাথায় ঢুকে গেছে, এজন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এই ঐতিহাসিক পরিণাম থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, এমন পয়গম্বর আর কি অবতীর্ণ হবেন? সেটা অন্য কথা।

সয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

প্রসঙ্গ ঃ চলচ্চিত্র

শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গোদার' সম্বন্ধীয় লেখাটি পড়লাম। শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আমার ভালো লাগে। তাঁর এই লেখাটি অনেকেরই কাজে লাগবে—যাঁরা গোদারকে বুঝে নিতে চান, তাঁদের।

গোদারের ছবি আমার বিশেষ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে 'Alfa Ville', 'Vivre savie' এবং 'Les carabiniers' আমি দেখেছি। ফিল্মি দুনিয়ায় আজ গোদার নানাভাবে অভিযুক্ত হন। বক্তব্যের দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে প্রায়ই আসে—এমন কী 'Lousy Philosopher' এই আখ্যাটিও তিনি পেয়েছেন। তবু

গোদার মননে আজও দৃঢ়—যেমন Cahier du Cinema-র পাতায় তিনি লিখেছিলেন যে দরকার হলে তিনি টেলিভিশনে যোগ দেবেন, দরকার হলে কাগজে কলমে...সেই একই শিল্প ভঙ্গিমায়।

আমরা যারা 'মার্কস ও কোকাকোলার সন্তান' (একটি গোদারীয় প্রবচন...নব্য বামপন্থীদের (উদ্দেশ্যে) দরকার হলে গোদারকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে নিতে ছাড়ি না, তাদের জন্যই গোদারের Les chinoises (অথবা La chinoise!) যেখানে তিনি বামপন্থী জীবনবোধের হাস্যকর, অমানবিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন (এই তাঁরা একে অন্যের আবেগ নিয়ে খেলা করে, ওই তাঁরা 'মাও সে-তুঙ' উদ্ধৃত করে) এবং একই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর ঘৃণা—প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি।

আনা কারিনার সাথে যাঁর সম্পর্কের অনেকটাই আজও আমাদের কাছে রহস্যময়, কিকেগার্ড মাত্র, বিপ্লব এবং মার্কস অনুভবে থাকা সত্ত্বেও প্রেমের প্রতি, ভালোবাসার প্রতি তাঁর এক প্রবল তৃষ্ণা। মাঝে মাঝে নির্লিপ্ততায় ডুবে যান তিনি, যেমন তাঁর চরিত্ররা—পথের পাশে হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে উদাসীনভাবে সিগারেট ধরায়, পথ হাঁটে।

শোনা যায় গোদার ছবিতে মধ্যে ধৈর্যবোধ খুব কম। অনেক অনেক বই তিনি পড়তে শুরু করেন। অর্ধেক পড়ে বাকিটা আর পড়েন না। অথচ মাঝে মধ্যেই নিজের ফিল্মে তাঁর সম্পূর্ণ না পড়া অনেক বই-এরই অংশবিশেষ স্থান পায়। সেই জন্যেই (কারো কারো মতে) 'Alfa Ville' ছবিটিতে Aldous Huxley George Orwell ইত্যাদি লেখকের রচনার ছাপ খেয়াল করা যায়।

পৃথিবীর ভবিষ্যত সম্পর্কে অহেতুক আশাবাদে তিনি ভোগেন না। অথচ অস্তিত্বের ভিতরে এক 'শীতরাতের' আশঙ্কা তাঁকে প্রতিনিয়ত কাঁপিয়ে চলে! স্নায়ুর রোগ যাকে ছাড় দেয়নি সেই গোদারের ছবি বুঝতে না পারার দায়িত্ব শ্রীসত্যজিৎ রায়ের মতানুসারে গোদারের নয়। 'পঞ্চাশ বছর ধরে যে মনোভাব সিনেমাকে আর্থিক লোকসানের ভয় দেখিয়ে, least resistance-এর পথে নিয়ে গেছে এবং দর্শককে চলতে বাধ্য করেছে, এটা তারই দোষ।'

দীপঙ্কর চক্রবর্তী
কলকাতা-২৯

বন্দে মাতরম্

"বন্দেমাতরম" সংক্রান্ত চিঠিপত্রের সূত্রে বন্দেমাতরম ও আনন্দমঠ-এর অনুবাদ বিষয়ে দুটি খবর জানাতে চাই। এক, ভাষাবিদ হরিনাথ দে ল্যাটিনে বন্দেমাতরম্ গানের অনুবাদ করেছিলেন। এ অনুবাদটি সম্ভবত সহজেই গবেষকরা উদ্ধার করতে পারবেন। দুই, ছত্রিশ বছর আগে (১৯৪১) মার্কিন দেশে 'আনন্দমঠ'-এর আর-একটি ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল। 'ডন ওভার ইন্ডিয়া' নামে এ অনুবাদটি করেছিলেন প্রবাসী বাঙালী সাংবাদিক বসন্তকুমার রায়, প্রকাশ করেছিলেন নিউ ইয়র্কের ডেভিন-অ্যাডেয়ার কম্পানি। এ বইয়ে ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় বন্দেমাতরম্-এর [illegible] অনুবাদ আছে। আমার সংগ্রহে বইটির প্রথম সংস্করণই আছে, কাজেই এটি তখন কী রকম জনপ্রিয় হয়েছিল, বা আদৌ হয়েছিল কিনা, জানবার উপায় নেই।

বসন্তকুমার রায় রবীন্দ্রনাথের শেষ মার্কিন ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন, মার্কিন পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে অজস্র প্রবন্ধ লেখা ছাড়া একটি বইও লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর, দ ম্যান অ্যান্ড হিজ পোয়েট্রি' নামে। এই সাংবাদিকটির বিচিত্র জীবনকথা পাওয়া যাবে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ' সংকলনে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের প্রবন্ধে!

পবিত্র সরকার
গড়িয়া

প্রয়াগ মহাকুম্ভ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

একান্নবর্তিতা, তীব্রতা ও ক্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দর্য ও সার্থকতা।

জীবনের সৌন্দর্য ও সার্থকতার সন্ধানী যারা তাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই ভাগবত বাক্যটি গভীর অর্থবহ। প্রতিটি মানুষই তার নিজের গুণ-কর্মের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য ও সার্থকতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশ্যই সৌন্দর্য ও সার্থকতার ধারণা সকলের সমান নয়, অন্বেষণপন্থার তারতম্যও ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিন্তু গোচরে বা অগোচরে, তীব্র কিংবা শ্লথ, অন্বেষণ একটা থেকেই যায়।

অন্বেষণের আর এক পদ্ধতির নাম আধ্যাত্মিকতা। আত্মাকে অধিকার করে যা থাকে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন। আর সেই থাকাগুলিকে অনুধাবন করে ক্রমকারণকে পারম্পর্যে বাস্তবতার ভিতর দিয়ে জেনে সার্থক হওয়ার ঝোঁককেই আধ্যাত্মিকতা বলা যেতে পারে। আর তাই যে ভাব ও কর্ম মানুষকে কারণমুখী করে দেয় তাই আধ্যাত্মিকতা। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের এই বাণীকে লক্ষ্য করে এগোলে ধর্মের মরকোচ (মেকানিজম) জানা সহজ হবে।

এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপ্রয়াগ। মকর রাশিতে এবার রবি ও চন্দ্রের সঞ্চার। এই মহাযোগে প্রয়াগরাজে পূর্ণকুম্ভের স্নান। তুলসীদাসের দোঁহাতে আছে—মাঘ মকরগত যব রবি হোই, তীর্থপতিহি আব সব কোই। অর্থাৎ সূর্য মকর রাশিতে সঞ্চারিত যখন হল, তখন সবাই তীর্থরাজ প্রয়াগে সমবেত হয়েছে। এরকমই এক লগ্নে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ভরদ্বাজকে রামায়ণ-কথা শুনিয়েছিলেন।

সমুদ্র মন্থনের কথা কারো অজানা নেই। সেই মহামন্থনের নায়ক ছিলেন সুরে ও অসুরবৃন্দ। অমৃতের অভিলাষী দুই অমিত্র দল। মন্থনদণ্ড ছিল মন্দার পর্বত, ডোর ছিল নাগরাজ বাসুকী। এই প্রতীকী কাহিনী আমাদের এক স্বার্থ অন্বেষণের কাহিনী শোনায়। রহস্যময় এবং অজানা সাগরগর্ভ মন্থনে একে একে উঠে আসছিল আশ্চর্য অলভ্য বস্তুসমূহ। উঠে এল ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ মণি, অপ্সরা-বৃন্দ, হলাহল, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, বিশ্ব-কর্মা, দেবী লক্ষ্মী, পূর্ণচন্দ্র এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে অমৃতের কুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন দেব ধন্বন্তরী।

অন্য সব বস্তুর কথা থাক। কিন্তু অমৃত মহার্ঘতম, দুর্লভতম সুধা। অমৃত জরাহারী, মৃত্যুগ্রাসী, যৌবনপ্রদ বহু আকাঙ্ক্ষার ধন। সেই অমৃতের পাত্র দেখে দৌড়ে গেলেন সুরাসুর। কাণ্ডজ্ঞানরহিত, জাগ্রতস্বার্থ অধিকারসচেতন। তাঁদের অন্তরে আর এক ধরনের মন্থন চলছিল। সেই মন্থন তুলে আনল স্বার্থরূপী হলাহল। অমৃত লাভের কাহিনীতে তাই একই সঙ্গে বিষ ও অমৃতের কথা বলা আছে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসুরবৃন্দ জয়ী হয়ে অমৃতের কুম্ভ অধিকার করলেও তাদের জয় বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত

কুম্ভমেলায় পুণ্যার্থীর সমাবেশ ফটো—অলক মিত্র

এক বিশাল কাকের রূপ ধরে এসে পলকে সেই কুম্ভ ছিনিয়ে নিয়ে চললেন নন্দন-কাননের দিকে। পথে চার জায়গায় তিনি কুম্ভ স্থাপনা করেছিলেন। যমুনা তীরবর্তী প্রয়াগে, গঙ্গার তীরবর্তী হরিদ্বারে, গোদাবরী তীরের নাসিকে আর শিপ্রা নদী-তীরে উজ্জয়িনীতে। কথিত আছে, এই চার জায়গায় স্থাপিত কুম্ভ থেকে খানিকটা করে অমৃত চলকে পড়েছিল। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও শিপ্রা সেই অমৃতবিন্দু ধারণ করে ধন্য হয়েছিল। সেই থেকে এই স্থান-চতুষ্টয় তীর্থের মহিমা পেয়েছে।

মৎস্য পুরাণের এই কাহিনী বলে, জয়ন্তর অমৃত বহন করে নন্দনকাননে নিয়ে যেতে লেগেছিল বারো দিন। দেবতাদের একদিনের সমান মানুষের এক বছর। তাই বারো বছর পর পর পূর্ণকুম্ভের যোগ আসে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম তীর্থ সম্মেলনগুলির একটি এই পূর্ণকুম্ভ তাই পূর্ণকুম্ভকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের কৌতূহল।

কুম্ভমেলার বৈশিষ্ট্য হল বিরল শ্রেণীর সাধু ও মহাত্মার সমাবেশ। এত সাধু-মহাত্মার সমাবেশ অন্য কোনো মেলায় হয় না। তার কারণ, আদি গুরু শংকরাচার্য কুম্ভ মেলাকে বর্তমান তীর্থমহিমা প্রদান করেছিলেন। তিনি ভারতীয় সাধক সমাজকে দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করেন এবং নিয়ম করে দেন যে প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রধানকে নিয়মিত কুম্ভে সমবেত হতে হবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। যেসব সাধু সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষের অগোচরে বনবাস করেন তাঁরাও এই কুম্ভ মেলায় জনসমক্ষে দেখা দেন। জনসাধারণ আসেন এই সব বিরল-দর্শন সাধু মহাত্মার সঙ্গ লাভের আশায়। পুণ্য স্নান তো আছেই। সাধারণ মানুষ এই সব সাধু মহাত্মার কাছ থেকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সাধু মহাত্মারা শুধু সাধারণ মানুষকেই পরি-চালিত করেন না, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও মঙ্গলজনক উপদেশ দিয়ে জাতিকে সার্থকতায় চালিত করেন। এঁদের উপদেশ এক সময়ে রাজার আদেশের চেয়েও শক্তি-শালী ছিল। আজকের রাজনীতিতে হয়তো তার শক্তি স্তিমিত হয়েছে।

পুরাণে উল্লিখিত আছে, বর্তমান প্রয়াগ হল আদিকালের কৌশাম্বি। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে গমনকালে দক্ষিণাভিমুখী পথে এই মহা সঙ্গম পার হয়ে যান। এই স্থান দিয়েই রামানুজ ভরত গিয়েছিলেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। আর এই সঙ্গম-স্থলের কাছেই ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে তাঁরা বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কথিত আছে এই স্থানেই ছিল যদুবংশীয় রাজাদের আদি শাসনক্ষেত্র। সঙ্গমের নিকটবর্তী এলাহাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দূরদর্শী সম্রাট আকবর। এলাহাবাদ শব্দের অর্থ আল্লার স্থান। যমুনাতীরে এখনো প্রাচীন কেল্লা এই স্থানের প্রাক্তন রাজকীয় মহিমা প্রকাশ করছে।

ত্রিবেণী সঙ্গম হলেও এখানে এখন সরস্বতী নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। পশ্চিমবাহিনী যমুনা ও দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গার ধারা দুটিই দৃশ্যমান। গঙ্গার জলে শুভ্রতার আভাস, যমুনার জলে স্নিগ্ধতার ছায়া। যমুনা পরিপুষ্ট নদী, গঙ্গা ক্ষীণতোয়া। কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম' কাব্যে এই মহাসঙ্গমের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল—যমুনার মিলিত ধারায় স্থানে স্থানে গঙ্গাকে যেন ভস্মাচ্ছাদিত শিবের

মতো প্রতীয়মান হয়। কণ্ঠে এক বিশাল কালো সাপ। এই সঙ্গমে যে স্নান করে সে জ্ঞানহীন হলেও মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করে।

(দুই)

এলাহাবাদের প্রয়াগ তীর্থে কুম্ভের প্রথম স্নান ছিল জানুয়ারির ৫ তারিখে। পৌষ মাসের শেষ পূর্ণিমার দিন, মকর সংক্রান্তির নয় দিন আগে। ভোর চারটে থেকে স্নানের যোগ শুরু।

বিশাল মেলার প্রাঙ্গণে তাঁবু আর বাঁশ-টিন-কাঠের তৈরী অস্থায়ী আবাস। উত্তর-প্রদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগ এইখানে তাঁদের অস্থায়ী আবাস তৈরী করেছেন। এক একখানা ছোটো তাঁবুর ঘরের দৈনিক ভাড়া আশি টাকা। তাঁবুর মধ্যে আছে দুখানা ছোটো ছোটো নেয়ারের খাট, দুখানা ভাঁজ করা চেয়ার, একটা নামকোবাস্তে টেবিল। মেঝে বলতে মাটির ওপর কার্পেটের বদলে শতরঞ্চী পাতা। তবু মেলায় এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্তের কথা ভাবাও যায় না। এলাহাবাদের তীব্র শীতে যে সব কল্পবাসী ও সাধুসন্তরা নদীর ধারে বা গঙ্গা দ্বীপের তাঁবুতে বসবাস করছেন তাঁদের শয়ন বালু-মিশ্রিত ভূমিতে তুচ্ছ চাটাই বা কম্বলের শয্যায়।

পৌষ পূর্ণিমা তিথি থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত কিংবা মকর সংক্রান্তি থেকে কুম্ভ সংক্রান্তি পর্যন্ত যাঁরা মেলা প্রাঙ্গণে বসবাস করেন তাঁরাই কল্পবাসী। অবস্থান-কালে তাঁরা এক পবিত্র জীবন যাপন করেন। সাধুসঙ্গ, ভজন-কীর্তন, পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের অভিযাত্রা বিশুদ্ধতার দিকে। কেল্লার তট থেকে সঙ্গম পর্যন্ত দীর্ঘ নদীতীর এক তাঁবুর নগরে রূপান্তরিত হয়েছে। কল্পবাসীদের অবস্থান এই সব তাঁবুতে। আর গঙ্গাদ্বীপে সাধুদের আস্তানাতেও তাঁরা আছেন বহু সংখ্যক।

কালকা মেলে যাওয়ার সময় আমাদের এক তরুণ বাঙালী সহযাত্রী জুটেছিল। দেখলেই বোঝা যায় সে বিপুল ধনীঘরের ছেলে। লম্বা, স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সঙ্গে গোটা চারেক বিশাল আকৃতির বিদেশী স্যুটকেস, বেডিং, বাস্কেট। আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের সঙ্গে তার চিত্ত ও দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ সুদূর। চৌকস ও বুদ্ধিমান ছেলেটির কথাবার্তায় সহজ সরলতা রয়েছে, তবু তাকে কিছুতেই আমাদের মানুষ বলে মনে হয় না। ফুটন্ত খৈয়ের মতো তার মুখে অবিরাম ইংরিজি। কদাচিৎ যা দু-একটি বাংলা বলছিল তাও অবাঙালীর মতো অসহজ উচ্চারণে। তার বাস কলকাতায়, কিন্তু কলকাতার কলেজে ভাল পড়াশুনো হয় না, পরীক্ষা পিছোয়, এই সব কারণে সে এলাহাবাদে দাদুর কাছে থেকে পড়াশুনো করে। আমরা কুম্ভে যাচ্ছি শুনে সে বলল—খবরদার, স্নান করবেন না ওখানে। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থের জল নিয়ে গিয়ে অ্যানালাইজ করে দেখা গেছে প্রয়াগের পার কিউবিক সেনটিমিটার জলে হাইয়েসট কনসেনট্রেশন অফ জারমস আছে।

তার কথায় এতটুকু মিথ্যে নেই। এই সব নদীসঙ্গমে বহু জন স্নান করে বলে জলবাহী জীবাণু তার জো পেয়ে যায়। আবার এও সত্য যে স্নানার্থীরা লক্ষ লক্ষ মরেও যাচ্ছে না। সাধারণ তীর্থযাত্রীদের জন্য কলেরার ইনজেকশন বা বসন্তের টীকা নেওয়া আবশ্যিক নইলে ভারতবর্ষের কোনো তীর্থ সমাগমেই প্রবেশাধিকার মেলে না। কিন্তু এ নিয়ম মানতে রাজি নন সাধু মহাত্মাবৃন্দ। তাঁরা মহা গোঁয়ার, একরোখা সম্প্রদায়। তাই তাঁদের টীকা বা ইনজেকশন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তপোপ্রভাব না হোক আত্মবিশ্বাসের জোরেই হবে, তাঁরা জীবাণুদের ভোঁতা বানিয়ে ছাড়ছেন।

সহযাত্রী বাঙালী ছেলেটির সঙ্গ আমাকে কিছু ঈর্ষাকাতর করেছিল। কত বয়স হবে ছেলেটির? বড় জোর সতেরো আঠারো। এই বয়সেই সে দুনিয়ার সব আধুনিক খবর রাখে, মাতৃভাষার মতো ইংরিজি বলতে পারে, হয়তো ইংরিজি গান বাজনা নাচও তার অধিগত। তা ছাড়া, জাগতিক সুখ বলতে যা কিছু সবই তার হাতের নাগালে। স্যুটকেস যখন খুলেছিল তখন তার মধ্যে খুব দামী বিদেশী টেনিস র‍্যাকেটও দেখেছি। মহার্ঘ জামাকাপড়, বিদেশী আরো নানা উপকরণ তো ছিলই।

বলতে কি আমার নিজস্ব ছেলেবেলা এর তুলনায় কত না দীন ছিল। ইংরেজ আমলে জন্মালেও আমার লেখাপড়া বাংলা স্কুলে। এই ছেলেটির মতো বয়সে আমি এত খবর রাখতাম না। টেনিস র‍্যাকেট ব্যবহার করবার সুযোগ তখনো আসেনি। কিন্তু ঈর্ষা আর এক কারণে। তা বিজ্ঞ-

—কখনো স্নান করবেন না ওখানকার জলে।

ছেলেটি যে ইংরিজি বইখানা ক্ষণে ক্ষণে খুলে পড়ছিল তার নাম—কফি, টী অর মী? বইটার কভারে লেখা এয়ার হোসটেসদের গুপ্ত জীবনের রোমাঞ্চকর গল্প।

ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে আমি এক নতুন প্রজন্মের পরিচয় পাচ্ছিলাম আভাসে। এ ছেলে বড় হবে, কমপিটিটিভ পরীক্ষা বা টেকনিক্যাল বিষয়ে পাশ করবে। প্রচণ্ড ভাল রেফারেন্স থাকায় পেয়ে যাবে উঁচু পদের চাকরি। হয়তো বিদেশেও ঘুরে আসবে এক ফাঁকে। এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্রুব তারার মত চেয়ে আছে মুখপানে। সবই ঠিক, কিন্তু এ ছেলে যেন এ দেশের মাটি থেকে জন্মায় নি। এর গায়ে আন্তর্জাতিকতার গন্ধ, এর চাউনি বা কথায় মিশে রয়েছে মার্কিন বা ফরাসী দেশ।

আমি কুম্ভের যাত্রী। সাধু সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সেই মেলা কি দেবর্ষির কাছে নেহাতই মাচ আডো অ্যাবাউট নাথিং?

সহযাত্রী কলকাতার আর একজন ব্যবসায়ী। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, অতি সুপুরুষ এবং মধ্যবয়স্ক এই লোকটি জলের মত বাংলা বলেন। ইংল্যাণ্ডে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে এসে প্রথমে চাকরি ও পরে ব্যবসা করতে শুরু করেন। এখন একডালিয়ায় ভাড়াটে বাসায় থাকেন, লেক গার্ডেনসে বাড়ি করবেন—জমি কেনা আছে। যাচ্ছেন জব্বলপুর। সদাহাস্যময় ও ভদ্র এই মানুষটিরও দেখলাম কুম্ভ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। ফ্লাস্ক থেকে বীয়ার এবং প্ল্যাসটিকের ব্যাগ থেকে ভাত আর মুরগী খেতে খেতে জানালেন—ভগবানটান আমি জানি না। কথায় কথায় বোঝা গেল, তীর্থযাত্রাও তাঁর কাছে অবোধ্য সংস্কার মাত্র।

খাঁটি ভারতীয় কাকে বলে তার সম্পূর্ণ ধারণা এখনো করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আবছা ধারণা একটা কবে যেন দানা বেঁধে উঠেছে। সেই নিরিখে আজকাল ভারতীয় বড় কম চোখে পড়ে। এমন নয় যে, ধর্মে অবিশ্বাসী বা নাস্তিকমাত্রই অভারতীয়। কিন্তু এটা সত্য নিশ্চয়ই যে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা কিছু উন্নত সমাজের মানুষ তাঁদের মধ্যে ভারতীয়ত্ব বা দেশজ যে কোনো কিছুর প্রতিই একটা উদাসীনতা জন্ম নিয়েছে।

তীর্থে গেলে পুণ্য হয়ই এমন তত্ত্ব আমি মানি না। কিন্তু এ তো ঠিক কথা যেখানে গেলে মনের বা প্রবৃত্তির গ্রন্থিমোচন হয় তা অবশ্যই তীর্থ। তীর্থাভিসারী লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কজনেরই বা এই জ্ঞান আছে যে, কেবল স্নানেই পুণ্য হয় না, মনের গ্রন্থিমোচনই তীর্থযাত্রার মূল কথা।

বেলা দশটা নাগাদ এলাহাবাদে যখন গাড়ি ঢুকছে তখনই রেলব্রীজের ওপর থেকে সংগমের আভাস পাওয়া গেল।

এলাহাবাদ একমুঠো শহর। দেবর্ষি বলেছিল—এই শহরে এখনো পুরোনো সব প্রথা চালু রয়েছে। শহরটা তেমন আধুনিক নয়। হিন্দুয়ানির কিছু বাড়াবাড়ি আছে। এবং সেটা দেবর্ষি পছন্দ করে না। সে চায়, যে কোনো শহরেই থাকবে আন্তর্জাতিকতার ছাপ।

কিন্তু এই কথা শুনে এলাহাবাদ সম্পর্কে আমার অন্য রকম একটা আগ্রহ জেগেছিল। স্টেশন থেকে সংগমের দিকে যেতে যেতে রিকশা থেকে চারদিকে উদগ্র আগ্রহে চেয়ে দেখছিলাম। কিন্তু মোটামুটি ভাল একটা জেলা শহর যেমনটি হয় এলাহাবাদ তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। একটা শহরের অন্তর্গত প্রবণতা বুঝবার জন্য যে সময়টুকুর দরকার তা হাতে নেই বলে শহর পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হল সংগমের দিকে।

যে ধু-ধু করা চাষজমি চৌরস করে মেলার চত্বর তৈরি হয়েছে তা এত বিশাল, এত ক্লান্তিকর রকমের বিস্তৃত যে, কোথাও পৌঁছোতে অনেক সময় লেগে যায়।

কুম্ভের গন্ধে গন্ধে রিকশা, টাঙ্গা, ট্যাকসির ভাড়া ম্যালেরিয়া জ্বরের মত বেড়ে বিকারে পৌঁছে গেছে। গাড়িওলারা এত ভাড়া চায় যে, প্রথমে মনে হবে বুঝি প্রলাপ বকছে।

আরো মুশকিল, কেল্লা, ক্যাণ্টনমেণ্ট প্যারেড গ্রাউণ্ড জুড়ে যে দীর্ঘ এলাকা তৈরি হয়েছে তার কোথায় কোন অফিস, হোটেল বা ঠিকানা তার হদিস কেউ দিতে পারে না। তা ছাড়া, যদিও মেলার ভিড় এখনো একদম জমে নি, তবু সব রাস্তাতেই যাতায়াতের কড়া বিধিনিষেধ। এক রাস্তা দিয়ে ঢুকলে সেই রাস্তায় আর উজিয়ে আসা যাবে না। আসতে হলে আধ বা এক পো মাইল পথ ঘুরে অন্য রাস্তায় আসতে হবে। বিধিনিষেধের মূল উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষের স্বস্তি ও হয়রানির উপশম। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, সাধারণ মানুষকেই সর্বদা সর্বত্র হয়রান ও বিপদাপন্ন হতে হচ্ছে। আর বিশেষ ব্যক্তিরা সর্বদাই নিয়মভাঙা সুবিধা উপভোগ করছেন। কুম্ভনগরও তার ব্যতিক্রম নয়। কর্তাব্যক্তিদের গাড়ি সর্বত্র যাতায়াত করছে, চলছে মিলিটারির মোটর। কিন্তু সেই সব চওড়া জনবিরল রাস্তাতে পায়ে হেঁটেও সাধারণ মানুষ অবাধে যাতায়াত করতে পারছে না। আমাদের রিকশাকেও গন্তব্য থেকে বহু দূরে পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হল এবং শেষ পর্যন্ত সে রিকশা এক জায়গায় হল আটক। সেখান থেকে লোক ধরে তাদের মাথায় মোট চাপিয়ে মাইলখানেক বেড়ুল হাঁটবার পর আবার

চিরুণ্যা ধরা, আবার বিধিনিষেধের খপ্পরে পড়া এবং অগাধ হয়রানি। খাদ্যশূন্যে চোপসানো পাকস্থলী, চাতকের মত জল-স্পর্শহীন কণ্ঠ, আর অকৃপণ ধূলার আচ্ছাদনে আবৃত শরীর নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে এমন আনাড়ী লাগছিল কী বলব!

অবশেষে ইউ পি সরকারের টুরিসট বাংলোর সুইস কটেজে যখন পৌঁছোনো গেল তখন বেলা পড়ন্ত। সেখানে সাহেব-সুবো গিজগিজ করছে। এক দুইজন বাউণ্ডুলে বাদ দিলে সাহেবদের অধিকাংশই সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার কিংবা পর্যটক। অবাক হওয়ার কিছু নেই, বিদেশীদের আজকাল ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। বিশেষত ধর্মীয় স্থানগুলিতে তাদের গতায়াত বিশেষ রকমে চোখে পড়ে। বেনারসের বিশ্বনাথ গলি, কালিঘাট, তারাপীঠ কোথায় তাঁরা যাচ্ছেন না?

সুইস কটেজের লাউনজে টেলিভিশন বসানো হয়েছে। হেটো ইংরিজি, মেঠো ইংরিজি, চোস্ত বা দেহাতী হিন্দী এবং ভাঙা বাংলায় বিস্তর কথা বলতে হল লোকজনের সঙ্গে। সুইস কটেজ থেকে শুরু করে ত্রিবেণী রোড হয়ে লাল সড়ক ধরে বিশাল এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখছি এক মহা আন্তর্জাতিক আয়োজন। ধর্মে কেউ বিশ্বাসী হোক বা না হোক পূর্ণকুম্ভে এবার যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মেলন হবে সেই জনসংখ্যার বিপুলতাই কুম্ভনগরকে এক আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছে। মেলার প্রাঙ্গণেই চমৎকার একখানা প্রশস্ত-ডাকঘর, টেলেক্স, টেলিফোন এবং টেলিগ্রামের আধুনিকতম যন্ত্র সুসজ্জিত তারঘর, প্রেসক্যাম্পে টেলিপ্রিন্টার বসানো সারি সারি।

প্রেস ক্যাম্প থেকেই আমাদের সঙ্গ নিল এ পি-র তরুণ সংবাদদাতা পল। টুরিসট বাংলোর ভাড়া-করা স্টেশন-ওয়াগনে সঙ্গম দেখতে গেলাম দুপুরের খর রোদে।

এই সেই পুরাণ-কথিত যমুনা আর গঙ্গার সঙ্গমস্থল। একদিকে কেল্লা, অন্য পাড় অড়েল নামে গঞ্জ, পূব-ঘেঁষা মুসী নামে একটি অঞ্চল। আর তিনের মধ্যখানে প্রবাহিত জলধারা।

কী আছে সঙ্গমে? কিসের সন্ধানে সারা ভারত, সারা বিশ্বের আনাচ কানাচ থেকে উঠে আসছে মানুষের তরঙ্গ এখানে?

জলের ধারে নেমে যাই। জল স্পর্শ করতে হাত বাড়াতেই মনে পড়ে, দেবর্ষি বলেছিল—এই সঙ্গমের পার কিউবিক সেণ্টিমিটার জলে হায়েস্ট কনসেনট্রেশন অব জারমস। তাকিয়ে দেখি, দুপুরে সঙ্গম-স্থলে অন্তত দু-তিন হাজার মেয়েপুরুষ স্নান করছে। সুদৃশ্য নৌকোয় যমুনাবক্ষে ভেসে ভেসে কত দেহাতী ধর্মার্থী গাইছে রামসীতার কথা, পুরাণের কাহিনী, প্রবচন।

জল স্পর্শ করতে আর দ্বিধা হয় না। অবশ্য দ্বিধা হওয়ার যথেষ্ট কারণও নেই। কলকাতার ত্রিকোণ পার্কে পৌরসভার টীকাদান কেন্দ্রে এক দয়াময়ী মহিলা সযত্নে আমার বাম বাহুতে যে কলেরার ইনজেকশন এবং বসন্তের টীকা দিয়েছিলেন তার ব্যথা এখনো টনটনে।

বিলাসপুরের চৈনুরাম আর তার বউয়ের ছবি তুলল পল। প্রথমটায় সাহেবের হাতে ক্যামেরা দেখে আর ইংরিজি কথা শুনে চৈনুরাম ভেবেছিল এই সাহেব বুঝি তাকে সুঁইয়া লাগাবে। তাই কঁকিয়ে উঠে বলেছিল—সাহেব, আমার হাতে এখনো সুঁয়ার দরদ, বোখার ভি।

পরে কিন্তু চৈনুরাম বেশ সহজ হয়ে গেল। হাসি মুখে ছবি তুলল। পল বলল—থ্যাঙ্কস। চৈনুও বলল—ধন্যবাদ।

পল আমাকে বলে—টেল হিম আই শ্যাল মেক হিম ফেমাস থ্রু অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

আমি সে কথা চৈনুকে বলিনি। বলে লাভ কি? সেই খ্যাতির কথা চৈনু কখনো টেরও পাবে না। তার অখ্যাত অজ্ঞাত জীবন যেমন ছিল তেমনি থেকে যাবে।

সে রাত ভাল করে পোহানোর অনেক আগে ভোর সাড়ে তিনটেতে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েছি পৌষ পূর্ণিমার স্নান দেখতে।

এতক্ষণ যে কেতাদুরস্ত নাগরিকতার নির্মোক ছিল সেটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সেই অন্ধকার ভোর-রাত্রে পায়ে-চলা অসংখ্য যাত্রীর সঙ্গ ধরেছি। চলেছেন গৃহস্থ, চলেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুরা। আর তাদের পিছনে, পাশে, আড়ালে আবডালে ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকদের সঞ্চার।

সঙ্গমের স্নান দৃশ্যের ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষেধ বলে ফিল্ম টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান ভোলা ম্রিয়মান। কানাডিয়ান ব্রডকাসটিং সারভিসের টেলিভিশন ক্যামেরা-ম্যান এক সুদর্শন ভারতীয় যুবক প্রেস ক্যাম্পে মহা ভাবনায় পড়েছেন। তাঁকে আজই স্নানের দৃশ্যের ছবি তুলে যেতে হবে দিল্লি, দিল্লি থেকে আজই পৌঁছবেন হংকং। আর আজই রাতে তাঁর তোলা ছবি প্রসেসড হয়ে সারা বিশ্বের টিভি নেট-ওয়ার্কে ছড়িয়ে পড়বে। অথচ ছবি এরা কিছুতেই তুলতে দেবে না। অন্তত বিশ ত্রিশ হাজার টাকার ঝুঁকি বৃথা যাবে। তিনি শেষ পর্যন্ত নৌকোয় নদী পার হয়ে অড়েলের দিক থেকে টেলি-লেনসে ছবি তোলার পরি-কল্পনা করছেন শুনে এলাম।

তীর্থযাত্রীরা জানেও না তাদের পুণ্য স্নানের দৃশ্য ক্যামেরায় তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক একজন ফটোওলার পিছনে কি বিপুল টাকা ও দুশ্চিন্তার তরঙ্গ।

আমি কি তীর্থযাত্রী? না কি নিতান্তই কৌতূহলী দর্শক?

বিচারের জন্য অপেক্ষা করিনি। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিশেছি। ভোর রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় লম্বা পদক্ষেপে মাইল দেড়েক পথ হেঁটে যাই।

স্নান শুরু হয়েছে ভোর চারটেয়। হিমশীতল জলে স্নান করে উঠে আসছে হাজার হাজার নির্বিকার মানুষ। নিউমোনিয়া, কলেরা বা নিতান্ত শীত-জ্বরের ভয় তাদের আটকাতে পারেনি। এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখি নড়বড় করে কাঁপছেন সেই ঠাণ্ডায়। স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করবার সময়ে আড়ষ্ট হাত থেকে কাপড়ের গিঁট স্খলিত হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দেখি এক পৃথুলা রমণী সিক্ত বস্ত্রে নির্বিকার হেঁটে চলেছেন ভেজা গায়ে উত্তুরে বাতাসের করাত-কামড় উপেক্ষা করে। মুখে স্মিত হাসি।

গঙ্গা নদীর মাঝখানে এক দীর্ঘ চর পড়েছে। নাম গঙ্গা দ্বীপ। মূল ভূখণ্ড থেকে পাঁচ সাতটা পনটুন সাঁকো তৈরি করে গঙ্গা দ্বীপের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। জলও খুব গভীর নয়। হাঁটু সমান জল হেঁটে পার হয়েও গঙ্গা দ্বীপে যাওয়া যায়। এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তেই প্রকৃত সঙ্গমস্থল। ভিড়ও সেইখানে বেশী।

পনটুন সাঁকো পেরিয়ে তিন পোয়া বালিয়াড়ি ভেঙে সঙ্গমের কিনারায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে স্নান দেখি। এক দশনামী সাধু আমাকে পাকড়াও করে বলল—বাচ্চা, আস্নান কর লেও। এইসা যোগ ফির কৈসে মিলেগা?

আলিগড়ের দশনামী আমাকে জলে নামাবার যে প্ররোচনা দিচ্ছিল তা এড়িয়ে গিয়ে পড়ি রেল-ইঞ্জিনের দুই ড্রাইভারের সান্নিধ্যে। তারা কালিঝুলি মাখা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, গায়ে রেলের পোশাক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—স্নান করবেন?

—জরুর। এহি পর কাল রাতমে ডিউটি খতম হুয়া। রামজী কি কৃপা। আস্নান জরুর করেঙ্গা।

স্নান চলছে। অবিরাম। অনন্ত জনস্রোত ধীরগতি নদীর মতই বহে আসে সঙ্গমের দিকে। অজানা মানুষ।

সাধুদের শিবিরে শিবিরে পতাকা উড়ছে। শোনা যাচ্ছে আরাত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি, প্রবচনপাঠ, রামলীলা, বেদমন্ত্র। নদীর তীরে বসে তুলসীদাসের রামচরিতমানস পাঠরত বহুজনাকে দেখেছি।

মূলত কুম্ভ হচ্ছে সাধুদের মেলা। এখানে লোক আসে সাধু-মহাত্মার দর্শন লাভের আশায়।

অযোধ্যা খালসার বড়ে ভক্ত মালজীর আখড়ায় ভক্তমালজী স্বয়ং রাম সীতা-লক্ষণের আরতি করছেন। চারদিকে ভক্তদের ভীড়। আরতি শেষে আশীর্বাদী ফুল পাতার জন্য কাড়াকাড়ি। ভক্ত মালজীর হাতে আশীর্বাদী ফুরিয়ে গেল মুহূর্তে তবু হাত এগিয়ে আসে কেবল। তিনি ধমক দিলেন—নেহি হ্যায়। আওর নেহি হ্যায়।

কে শোনে কার কথা?

ফিরে আসবার সময়ে দেখি এক সাধু মৃগীরোগের আক্রমণে বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরোনোর উপক্রম। তার গা ঘেঁষে বসা জনা ছয় সন্ন্যাসী যজ্ঞ করছেন, তাঁদের কোনো বিকার নেই। আমি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করায় একজন বিরক্তির সুরে বললেন—উও ঠিক হো যায়গা।

'নিম্বার্ক' নগরে তাঁবুর ধাঁধা। এ-তাঁবুর পিছন দিয়ে, সে-তাঁবুর সামনে দিয়ে ভিতরে সেঁধোতে গিয়ে বার বার মনে হচ্ছিল যদি কেউ চোর সন্দেহ করে মারে!

আশ্রম-প্রধান বালির ওপর শতরঞ্চি বিছিয়ে মোটা কাচের চশমায় গীতা পাঠ করছেন। পাঠ শেষ না হলে কথা বলবেন না। আমাকে হাতের ইংগিতে বসে থাকতে বললেন।

বসে আছি। এমন সময় এক ছোকরা সাধু এসে বলল—আপ আইয়ে।

ডেকে নিয়ে সে আমাকে এক ফাঁকা তাঁবুতে বসাল। একটা কম্বলাসন পাতা, আর কোণের দিকে গোটা দুই কাঠের বাক্স। কম্বলের শয্যায় বসতে দিয়ে বলল—আপ কিয়া জাননা চাহতে' হ্যায়?

সবিনয়ে বললাম—আমি খবরের কাগজের লোক। সাধুদের কথা লিখব। যদি কিছু বলেন।

তরুণ সাধু এর পর পরিষ্কার বাংলায় বললেন—ও, তাই বলুন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আর নড়ে চড়ে বসলাম। আমার হিন্দি এতই খোঁড়া যে, হিন্দিওলারা প্রায়ই বুঝতে পারে না। বাঙালী সাধু পেয়ে বর্তে যাই।

অন্যত্র শুকদেব দাসের কথা লিখেছি। প্রাক্তন নকশাল নেতা শ্যামল ব্যানার্জি কি করে শুকদেব দাসে রূপান্তরিত হলেন সে কাহিনী বড় দীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কখনো খুন করেছেন?

তিনি মৃদু হেসে বললেন—খুন হল নকশালদের ভিসা। খুন না করলে তারা আমাকে বিশ্বাস করবে কেন? শ্রেণীশত্রুকে

...কথাই ছিল আমাদের দীক্ষার প্রথম ...।

—এখন? আমি প্রশ্ন করি।

উনি চোখ বুজে বললেন—নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপ না শোষয়তি মারুতঃ। দ্বিতীয় অধ্যায়। পড়েছেন তো?

জবাব দিলাম না। তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ আমাকে এত বিমুগ্ধ করেছিল যে বলার নয়।

উরুতে বুলেটের দাগ, হাতে ছোরার ক্ষতচিহ্ন দেখালেন। তারপর বললেন—আমি কতদূরে সরে এসেছি এখন?

একাত্তর সাল পর্যন্ত তাঁর বিপ্লবী জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন। সে বছর জুন মাসে তাঁর এক বন্ধু চিড়িয়ার মোড়ে পুলিশের গুলীতে মারা যায়।

তার পর থেকেই সেই মৃত্যু তাঁকে তাড়া করেছে। কেবলই একটা ছোট্ট প্রশ্ন বড় হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। কেন এই মৃত্যু?

নকশালদের গীতা ছিল রেডবুক। রেডবুক সাক্ষী করে তাদের ক্যাডারদের বিয়ে হত। তখন শ্যামলের নিত্যপাঠ্য ছিল ভারতের কৃষক সমাজ, পিকিং রিভিউ। সে সব ছেড়ে পড়তে শুরু করলেন গীতা।

তিয়াত্তরে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন পুজো দিতে। স্নানের ঘাটে এক সাধুর দেহগন্ধে আকৃষ্ট হলেন। সেই সাধু বালযোগী দত্তাত্রেয় তখন নওদুর্গার উপবাস করছেন। কিন্তু তিনি দীক্ষা দেননি।

সাধুদের সঙ্গে মিশে দেখেছি তাঁদের মধ্যে এক অদ্ভুত সংকেত বিনিময় ঘটে থাকে। এক সাধু কোনো একজনকে হয়তো বিশেষ স্থানে চলে যেতে বলেন। সেইখানে গেলে হয়তো দেখা দেন আরেকজন সাধক। তিনি আবার আর কারো কাছে পাঠান। এইভাবে এক রহস্যময় চক্রে আবর্তিত হন নবীন সাধক।

শ্যামলকে দেখে এক সন্ন্যাসী বলেছিলেন তোর সময় হয়ে গেছে। জলদি লোটা-কম্বল উঠা লে আওর জগন্নাথ ঘাট মে চলা যা।

জগন্নাথ ঘাটে গিয়ে শ্যামল এক বিশাল মহাত্মাকে রুটি পাকাতে দেখেন। দুই দিন তাঁর সান্নিধ্যানে যাওয়ার পর তাঁর আদেশ হয় নর্মদা কিনারা চলা যা।

তখন নর্মদা যাওয়া হয়নি। কাশীতে গিয়েছিলেন। কাশীর ঘাটে বসে মায়েদের রামায়ণ পাঠ করে শোনাতেন। কলকাতায় ফিরে এলেন যখন তখন তাঁর অন্য চেহারা। ভোর রাত থেকে গায়ত্রী, গীতা-পাঠ, কথামৃত পাঠ, ভজন কীর্তন চলত সারাদিন। তবু এই অবস্থায় হঠাৎ পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।

যখন লক-আপে ছিলেন তখন প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে তাঁর উপলব্ধি হয়—আকাঙ্ক্ষার সীমা ... বলে লোকের কত কষ্ট।

ছাড়া পেলেন অল্পদিনেই। চুয়াত্তর সালে বেরিয়ে পড়লেন নর্মদা পরিক্রমায়। নর্মদার নাভিস্থল নেমাওর, জেলা—দেবাস, মহকুমা—খাতেগাঁও, সেখানে বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারীজীর দীক্ষা নিলেন। মুণ্ডন হল। শুরু হল নর্মদা পরিক্রমা। আর এই পরিক্রমার পথে পথে অতি দ্রুত শিখতে লাগলেন শাস্ত্র। কখনো পরিক্রমা স্থগিত রেখে পাঠ করেছেন অদ্রু প্রস্থানত্রয়। অর্থাৎ বেদান্ত (ব্রহ্মসূত্র), উপনিষদ, গীতা, গীতার শ্লোক 'নৈনং ছিন্দন্তি...' অবলম্বন করে করছেন নিদিধ্যাসন।

এ বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রা করলেন উত্তরাখণ্ডের দিকে। অদ্বৈতবাদী শ্যামল বৃন্দাবনে এসে গুরু বদল করলেন।

তবে এখনো শ্যামলকে আকর্ষণ করে নর্মদাতটের সেই আশ্রম। সেই অসামান্য পরিক্রমার পথ।

শ্যামল মাঝে মাঝেই আমাকে বললেন আমি এখন স্থির হয়ে গেছি। খুব স্থির হয়ে গেছি।

নর্মদা পরিক্রমাকালে শ্যামল ছিলেন অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদীদের সাধনায় ভাবের স্থান কম, কঠোরতা বেশী। এখন তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পথিক, যে পথে ভাবাধিক্য রয়েছে।

একাত্তর সাল থেকে শ্যামলের পথ বিপ্লব থেকে সন্ন্যাসের পথে বাঁক নেয়। এই দুই জীবনের মাঝখানে কিছুদিন তিনি ডকে চাকরি করেছেন, এম-এ আর ল'

ক্লাসে ভর্তিও হয়েছিলেম। অবশেষে বহি-র্জগতের বিশাল মুক্ত জীবনের টানই জয়ী হয়েছে। শ্যামলের পথ আমি খানিকটা চিনি। আর চিনি তার রক্তের অন্তর্গত চঞ্চলতাটিক।

বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই, তার সন্ন্যাস ধর্মের আড়ালে যে রোমান্টিক মনটি অভিসারমুগ্ধতায় চলেছে সে একদিন একটি স্থিরভূমির আশ্রয় খুঁজবে। সে ভূমি ঘর-গৃহস্থালী নয়, দাম্পত্য জীবন নয়, জীবিকা তো নয়ই। তার আত্মানুসন্ধান অবশ্যই তাকে এমন কোনো মতাদর্শের দিকে ঠেলে দেবে যার মধ্যে রয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ ধর্মের বীজ।

শ্যামল এখনো উৎসুক পথিকমাত্র।

টুরিস্ট লজের বর্মন সাহেবকে অনেকেই বাঙালী বলে জানে। এই অনেকেই মানে যারা বাঙালী নয়। কয়েকজন আমাকে বলল—বর্মনসাহেব আগাগোড়া বাঙালী।

সদাহাস্যময়, অতিব্যস্ত এবং অতিথি-পরায়ণ বর্মনসাহেবের সময় কম। অনবরত বিদেশী আর বিদেশিনীর আগমনে তিনি খানিকটা দিশেহারা। কিন্তু কথা বলতে গেলেই লাফিয়ে উঠে অভ্যর্থনা করে বসাবেন, সুখ সুবিধার খোঁজ করবেন, আর সর্বদাই তার রসিকতা করবার অভ্যাস।

এক সুযোগে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কি বাঙালী?

—বিলকুল নহি। আই স্টাডিড ইন ক্যালকাটা, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড বেঙ্গলী। তারপরই এক গাল হাসি।

দিন তিনেক লাগাড়ে খোঁড়া হিন্দি আর মেঠো ইংরিজি বলে গলা শুকিয়ে এসেছে। হতাশ হলাম।

তীর্থে সাধু মহাত্মা ছাড়া কল্পবাসী-দের মধ্যে বাঙালী খুঁজে পাওয়া খুব ভার। তার মানে কি বাঙালী এখন ধর্ম-বিষয়ে সেয়ানা হয়ে উঠছে? না কি টাকা আর ভীড়ের ভয়ে কেউ আসেনি? বাস্তবিক এই বিশাল স্নানযাত্রায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালীর উপস্থিতি নেই বললেই হয়। তবু যে দু-একজনকে খুঁজে পেয়েছিলাম বা যাঁদের বাঙালী বলে সন্দেহ হয়েছিল তাঁরা আমার মতোই সংবাদশিকারী। তীর্থযাত্রী নয়। তাদের হাবভাবে এত গাম্ভীর্য মেশানো বুদ্ধির দীপ্তি এবং এত দূরত্বের পরিমণ্ডলে আবৃত তাঁদের ব্যক্তিত্ব যে কাছে ঘেঁষতে সাহস হয়নি।

একমাত্র গঙ্গাদ্বীপে সাধকদের আখড়ায় আমি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করি। সাধুরা কতটা ধর্মের পথিক তা জানি না, কিন্তু এঁদের মধ্যে অধিকাংশই যে ভারত-পথিক সে বিষয়ে সংশয় নেই। এঁদের পদব্রজে বিভিন্ন রকমের পরিক্রমায় যেতে হবেই। আর এই যাত্রায় একমাত্র সম্বল হল কম্বল, কৌপীন, চিমটে, কখনও বা কম্বলও নয়, একখানা চাদর মাত্র। ভিক্ষা করার অভ্যাস অধিকাংশেরই নেই। তবে কেউ অযাচিতভাবে কিছু দিলে বিচার করে গ্রহণ করেন। সাধুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম ও সদাচারের মাত্রা অপরিসীম। কখনো এঁরা অজ্ঞাতকুলশীলের হাতের অন্ন গ্রহণ করেন না। বেশীরভাগ ভ্রমণরত সাধুরই আহার্য ফল ও দুধ, তাও জুটলে। কখনো স্বপাক।

পরিক্রমার পথে এক একজনকে যে দুঃসহ কষ্ট স্বীকার করতে হয় তা বিস্ময়কর। খুব বাচ্চা এক সাধু বৃন্দাবন থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে দেখে অবাক হয়েছি, সে তো হেসে অস্থির। সে বলল—এ তার বেশী পথ কি! আমি গোটা উত্তরাখণ্ড পায়দল ঘুরেছি।

কুম্ভমেলায় বড় বড় সাধুর আগমন এক দেখবার মতো জিনিস। স্টেশন বা রাজপথ থেকে সুসজ্জিত হাতি, উট, গাড়ি, বাদ্যবৃন্দ এবং ভক্তের জয়ধ্বনিতে সে এক রঙিন মিছিল।

প্রয়াগরাজে এসে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ছে হাতি আর উট। রিক্সা, যানবাহন সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিনা বাধায় চলেছে হাতি। মুখটি তুলে উট।

কুম্ভের প্রধান প্রধান স্নানের দিন-গুলিতে এক অনন্য সাধারণ মিছিলে সম-বেত হন বিভিন্ন আখড়ার সাধকরা। তাঁদের শোভাযাত্রার পথের দুই পাশে সমবেত হন লক্ষ লক্ষ মানুষ। সাধুদের স্নানের আগে সাধারণ মানুষের স্নান করার নিয়ম নেই।

এই মিছিলের পুরোভাগে থাকেন নির্বাণী বা নাগা সম্প্রদায়ের সাধকরা। নাগা গোঁসাইরা শৈব উপাসক। তাঁরা দিগ-বসন, হাতে ঘণ্টা, মাথায় জটা। তাঁরা ভিক্ষা করেন না। এঁদের পরেই থাকেন নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের সাধক। তাঁরাও শৈব এবং নগ্নদেহ। এঁদের পর আসেন রামা-মণ সাধক সম্প্রদায়, যাঁদের নাম বৈরাগী। এরপর থাকেন ছোটো পঞ্চায়তি আখড়ার উদাসী সম্প্রদায়। এরপর উদাসী সম্প্র-দায়ের আর এক শাখা বড় পঞ্চায়তি আখড়ার নানকশাহী সাধকেরা। এ-রকম বহু সম্প্রদায় ও বহু সাধকের এই বিচিত্র মিছিল অসামান্য বর্ণাঢ্যতায় ভরা। মিছিলে সমবেত হয় গায়ক ও বাদকবৃন্দ, সুসজ্জিত হাতি চলে হেলেদুলে, তাদের পিঠে হাওদার সিংহাসনে আসীন তীর্থ পুরোহিত বা সম্প্রদায়ের প্রধান। আরো আসেন রামানুজী ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা।

সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত আল্লার শহর এই এলাহাবাদের কাছেই মহাসংগমে মানুষের স্রোত বহুদিক থেকে এসে সমবেত হচ্ছে ক্রমে। গরীব, অজ্ঞ, উদাসী মানুষের পাশে পাশে বাঁকা হাসি মুখে নিয়ে সংগে মিশে ভিখিরি কাঙাল। ধর্মার্থীদের পাশে পাশে বাঁকা হাসি মুখে নিয়ে আধুনিক অবিশ্বাসী। সাধুর আখড়ায় ঘুরে ঘুরে জীনস ও বেলবটম পরা মেয়েরা গো-গো চশমার রঙিন পরকলার ভিতর থেকে ভস্ম-মাখা সাধুদের কেমন দেখছে?

পিপাসার্ত হয়ে এক দুপুরে কলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। যে দেহাতী বৌটি এক গোছা বাসন বালি দিয়ে মাজতে বসে-ছিল, সে তাড়াতাড়ি বাসনের ডাঁই সরিয়ে নিয়ে বলল—পী লেও বাবা। খর-দুপুরের রোদে সেই মিষ্টি জল আমার যতটা পিপাসা মিটিয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী হৃদয়কে স্নিগ্ধ করেছিল ঐ বাক্যটি —পী লেও বাবা। আমি এখানে এসে যেখানে আশ্রয় নিয়েছি, তা অত্যন্ত সাহেবী কেতায় দুরন্ত টুরিস্ট লজ। সেখানে সন্ধ্যার পর লাউঞ্জে টেলিভিশন দেখানো হয়। শুধু থাকবার জন্যই দিনে

আমি টাকা গুনছি। চেনা মুখের পরস্পর দেখা হলে বলে ওঠে—হাই। মেলা থেকে যখনই ফিরে আসি নিজের তাঁবুতে, তখনই উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা আর একাকীত্ব এসে মুখ বাড়িয়ে আমাকে উঁকি মেরে দেখে। কারো সংগে কথা বলতে পারি না উপযাচক হয়ে। বার বার ইচ্ছে করে এই সব ছেড়ে কেল্লার নীচে কল্পবাসীদের তাঁবুতে গিয়ে পড়ে থাকি। তারা কত সহজে চেনা দেয়, চিনে নেয়। হাজার বার সেখানে প্রেস কার্ড বের করে দেখানোর ঝামেলা নেই। সেই বার বার নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার ক্লান্তি। সেখানে আমার একমাত্র পরিচয় আমি তীর্থযাত্রী, আমি দেশের লোক। অনজান বটে, কিন্তু অনাত্মীয় নয়।

আমাকে খুব সহজভাবেই ডেকেছিলেন কল্পবাসী দু-একজন লোক। বলেছিলেন—আপনার এখানে থাকতে হয়তো অসুবিধে হবে, কিন্তু যদি থাকেন তো বড়ি খুশী কি বাত।

মেলার দোকানে এক সন্ন্যাসীকে নিয়ে খাবার খেতে বসেছি। যে ছেলেটি পুরী-তরকারি শালপাতায় সাজিয়ে দিয়ে গেল, তাকে সন্ন্যাসীটি ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—আরে রাম, তোমার ভাড়ার টাকা উঠে গেছে ?

—অভি নহি।

সন্ন্যাসী আপনমনে কি যেন গুন গুন করলেন খানিক, তারপর আমাকে বললেন—বাপু শোনো, একবার গঙ্গোত্রীর পথে আমি কয়েকজন মূর্তির সংগে পথ চলছিলাম। চলতে চলতে দুই মূর্তি অন্যদিকে গেল। আমি আর এক মূর্তি চলতে থাকলাম। শেষে আমার সংগী সেই মূর্তি পিছিয়ে পড়ল। আমি ঘোড়া উটের মতো পথ চলি, সে মূর্তি বুড়ো মানুষ, তাল রাখতে পারল না। তা আমি তখন তার চেয়ে দুই ক্রোশ এগিয়ে। যারা উল্টো দিকে যাচ্ছে তাদের বলে দিচ্ছি, পিছনে এক সাধু আসছে দেখবে। তাকে বোলো আমি এই পথে গেছি। যত হাঁটি তত পিছনের মূর্তির জন্য চিন্তা হয়। ভাবি, সে বুঝি পৌঁছোতে পারল না। ওদিকে সেই পিছনের মূর্তিও আমার এগোনোর খবর পাচ্ছে। শেষে সে যখন বুঝতে পারল যে, সে খুব চোটে হেঁটেও আমাকে ধরতে পারবে না, তখন সে একটা বাসে উঠে পড়ল। আমার পাশ দিয়ে যখন বাসটা গেল, তখন সে জানালা থেকে চেঁচিয়ে আমাকে জানান দিয়ে গেল যে, সে যাচ্ছে। ব্যস, যেই তাকে এগিয়ে যেতে দেখলাম, সংগে সংগে কী যে তৃপ্তি আর শান্তি এল মনে। মনে হল এতক্ষণ একটা পিছু টান থাকায় আমি যেন পাথরের ভার বইছি। যেই পিছুটান খসল, অমনি যেন

সঙ্গমে স্নানের দৃশ্য ফটো—অলক মিত্র

পুরো পাক্কা সাধু হয়ে গেলাম। সাধুদের পিছু টান থাকতে নেই, জানো তো?

—জানি। মাথা নেড়ে বললাম।

—ঐ যে খাবারওলার দোকানে কর্মচারী রামকে দেখছ ও বোমবাই থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। পথে সব জিনিস চুরি হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে কুম্ভে এসে দোকানে চাকরি করছে। টিকিটের পয়সা উঠে গেলেই কলকাতা ভাগবে। ওর ভাগ্য যে ওকে মহ কুম্ভে এনে ফেলেছে, এ যে ওর মহা-সংযোগ তা ও জানেও না। হাজার পিছুটান ওকে টেনে নিচ্ছে জীবনের উল্টোদিকে। আমি বলি কি, বচ্চা, জিনিস গেছে তো যাক। এই প্রয়াগ থেকেই কেন দুনিয়ার মহাতীর্থে বেরিয়ে পড়ো না। ফিরবে কোথায়। সবটাই তো তোমার জায়গা তামাম দুনিয়া।

সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে যখন টুরিস্ট লজে ফিরেছি তখন বর্মণ সাহেব রিসেপশনে ডেকে বসালেন। মেলা কি রকম দেখলাম তার খোঁজ নিচ্ছিলেন।

দু-জন লোক বসেছিলেন সেখানে। তাদের একজন ইংরিজিতে বললেন—বর্মণ টয়োটা গাড়িটা আমাকে ভাড়া দিন। দু হাজার অ্যাডভান্স দিচ্ছি।

অন্যজন মৃদু স্বরে বললেন—আমার সংগে কথা হয়ে আছে।

বর্মণ সাহেব মৃদু হাসছেন। জবাব দিচ্ছেন না।

টুরিস্ট লজের একখানা জীপ স্টেশন ওয়াগনের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে আড়াই টাকা। একজন ফোটোগ্রাফার বেমরৌলি বিমান বন্দরে যাওয়া আসা বাবদ আমার চোখের সামনে কড়কড়ে সাড়ে আটশো টাকা গুণে দিয়েছেন। কিন্তু সে হিসেবও সস্তা। কারণ, যে জাপানী টয়োটা গাড়িটা টুরিস্ট লজ ভাড়া দেন সেটাতে দিতে হয় প্রতি কিলোমিটারে পাঁচ টাকা। তার ওপর সব রকম খরচ। তেল, মবিল, সার্ভিস সব আলাদা। হিসেব করলে বোধ হয় পুরো একদিনের জন্য টয়োটা গাড়ির ভাড়া হাজার দুইয়ের কাছাকাছি।

তবু ঐ দুটি মনুষ্য সেই টয়োটা গাড়িটার জন্য পাগল। একজন বলল—যা কিছু লাগে আমি এক্ষুনি ক্যাশ পেমেন্ট করে দিচ্ছি। টয়োটা আমার চাই। বুকড ফর দি ফোর্টনাইট, ও কে?

বর্মণ সাহেবের ডানদিকে মুখোমুখি বসে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বী বিত্তবান অন্য লোকটি বলে ওঠে—মানি ইজ নো ফ্যাক্টর। আমি বর্মণ সাহেবকে বলেছি, গিভ মি দি টয়োটা ফর এ মানথ। আনড আই অ্যাপ্রোচড ফার্স্ট।

বর্মণ সাহেব আমাকে চোখ টিপে একটু হাসেন।

বড় ক্লান্ত লাগছিল মনটায়। একটা মহার্ঘ টয়োটা গাড়ির জন্য দুটি বয়স্ক লোক খেলনালোভী শিশুর মতো বায়না করছে। কি হবে টয়োটা গাড়িতে? পথচারী মানুষেরা বাবুকে চোখ দেখবে, কম দামী গাড়ির যাত্রীরা একটু হিংসে করবে। এর চেয়ে বেশী আর কি ?

যখন উঠে আসছিলাম তখন শুনি, একজন নীলামের মতো দর বাড়িয়ে বলল, আমি তার ওপর পাঁচশো দেব।

—মাই অফার ইজ থাউজানড মোর। অন্য জনের গলা।

টয়োটা কার গলায় মালা দেবে কে জানে!

গানের আসর

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক বাংলার সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রকৃত পক্ষে এই দশকেই বাংলা নিজের তাবৎ সংস্কৃতির একটা যাচাই করে নিয়েছে, মূল্যায়ন যাকে বলে। এই দশকেই বহু শিল্পী বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে গেলেন, এই দশকেই বাংলার লোকসংগীত, কাব্যসংগীত নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের উপস্থাপিত করল,—এই দশকেই বাংলার সংস্কৃতি একটা নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। মজা এই যে, এই যে বিরাট স্বীকৃতি, দেশবিদেশের শিল্পীরা বিশ্বশিল্পী হয়ে উঠলেন, তার মাধ্যম কিন্তু কলকাতা। আজও দেখা যায় যাঁর কলকাতায় খ্যাতি বিস্তৃত হল, স্বীকৃতি মিলল, তিনি সমগ্র ভারতের চোখে ভাস্বর হয়ে উঠলেন,—অবশেষে পেলেন আন্তর্জাতিক পরিচিতি।

পঞ্চাশের দশকেরই মাঝামাঝি কালে (বোধ হয় ১৯৫৪ সাল হবে) একদিন কয়েকজনের পরিকল্পনায় দেখা দিল একটা আইডিয়া—এই কলকাতাতেই বাংলার সংস্কৃতির একটা মূল্যায়ন করতে হবে। মুখ্যভূমিকায় অগ্রণী হয়ে এলেন তাঁরা যাঁরা প্রতি বৎসর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করতেন। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আরও অনেকে। বহুল পরিমাণে ছোট আকৃতির হলেও পরিকল্পনার বহর নেহাৎ অল্প ছিল না, খরচও নিতান্ত সামান্য নয়, অথচ এঁরা সকলেই অগ্রসর হতে লাগলেন অকুতোভয়ে। প্রত্যক্ষ কর্মের পিছনে যাঁরা বুদ্ধি, প্রেরণা বা উপদেশ দিয়ে সাহায্য করছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ স্বনামধন্য ব্যক্তি, তাঁদের সুযোগ্য সহায়তা না পেলে সেই অনুষ্ঠান আজ একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হতে পারত না। সারা বাংলা এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকেও সাড়া পাওয়া গেল অভূতপূর্ব। লোকসংগীতের দিক থেকে সম্ভাবনা যথেষ্ট আশানুরূপ হলেও অন্যান্য কাব্যসংগীতের নিদর্শন স্থাপন করবার মত শিল্পী আদৌ যথেষ্ট ছিল না। এঁদের অনেককে কলকাতা থেকেই খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাব যেটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রচারের অভাব। প্রথম দিকে কোনও কাগজই তেমন আগ্রহ প্রদর্শন করেননি। তাঁদের মনোভাবটা ছিল এটা হয়তো একটা হুজুগেই পর্যবসিত হবে শেষ পর্যন্ত। অতএব তাঁরা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে রইলেন, যদিচ তাঁদের কর্মী-দের অনেকে সক্রিয়ভাবে এই কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। পরিশেষে অবশ্য তাঁরাও এই প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে এসেছিলেন। সেই সহায়তা আজও অব্যাহত আছে। এই যে প্রতিষ্ঠান আজ কলকাতাবাসীদের হাজারে হাজারে আহ্বান করে আনছে, এইটিই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন নামে সর্বজনবিদিত।

কলকাতার মোহম্মদ আলী পার্কে যে দু তিন বৎসর প্রথম ভাগের অনুষ্ঠান হয়েছিল তাকেই বোধ করি সবচেয়ে সার্থক অনুষ্ঠান বলা যাবে, কারণ যাঁরা আজ সংগীতজগতে স্বীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে সসম্মানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা সেই ক'টি অনু-ষ্ঠানেই গৌরব অর্জন করেছিলেন। নানা কারণে আজ আমাদের অনেকেই তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পোষণ করেন, কিন্তু তাঁরা যে শক্তিশালী সঙ্গীতশিল্পী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজিতে "অ্যাসেট" শব্দে যা বোঝায় তাঁরা নিঃসংশয়ে আমাদের সংগীতজগতে তাই হয়ে রয়েছেন এবং থাকবেন।

এই ক'টি মাত্র অনুষ্ঠান কেন সার্থক হয়েছিল তার কারণ নির্ণয় করতে গেলে বলতে হয় এই কয়েক বৎসরেই সমগ্র বাংলা-দেশে প্রচলিত তাবৎ সংগীতের আকৃতি, প্রকৃতি শহরবাসীর কাছে প্রত্যক্ষ হতে পেরেছিল। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের এইটাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বলা যেতে পারে। নানা প্রকার লৌকিক সঙ্গীতের ধারা তো বাংলায় অনেক স্থলেই প্রদর্শিত হয় বা হয়ে আসছে, কিন্তু সেটা সেখানকার লোকের কাছে "এন্টারটেনমেন্ট" বা প্রমোদের অঙ্গীভূত। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় আগে যখন সাঁওতালরা নৃত্যের অনুষ্ঠান করত তখন তারা নিজেরা আমোদ উপভোগ করত, শান্তিনিকেতনবাসীদের কাছে সেটা আগে থেকেই পরিচিত বস্তু। বীরভূমের কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলায় যে বাউল সম্প্রদায়গণ গান গাইতেন, তাও স্থানীয় লোকদের কাছে কোনও নূতনত্ব বহন করে আনত না, তাঁরা প্রত্যক্ষ করতেন চিরন্তন বস্তুকে, কিন্তু বাইরের লোক যখন তাঁদের গান শোনেন তখনই তাঁরা একটি নূতন এস্থেটিক আনন্দের আস্বাদলাভ করেন। তেমনি কলকাতার লোকেরা যখন বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র সঙ্গীতানু-ষ্ঠান শুনলেন তখন তাঁরা পেলেন একটি স্বতন্ত্র রসের আস্বাদ যা তাঁদের একটা মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করল। এই মূল্যায়নই হচ্ছে যথার্থ মানসিক লাভ, বৃহত্তর দেশের এক-একটি শিল্পকে রসসমন্বিতভাবে উপলব্ধি করা। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন শহরবাসীকে এই তৃতীয় নেত্রটি প্রদান করেই গৌরব অর্জন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত বলি কিছু কাল আগে কলকাতার বেতারে যখন "জেলাদিকস"-এর ঘোষণা শুনেছিলুম তখন অত্যন্ত উৎসাহিত

(দি ৩০৮৯৬/১)

বোধ করেছিলুম, ভেবেছিলুম হয়ত এটি বঙ্গসংস্কৃতির একটি ধারক ও বাহক হয়ে দেখা দেবে। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা এই আসরের নিয়মিত পাঠক তাঁরা হয়ত জানেন এই লেখকও বার বার বলেছিলেন লোকসঙ্গীত শহরের আর্টিস্টদের দিয়ে কৃত্রিমভাবে প্রচার না করিয়ে সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে এনে প্রচার করা হোক। বেতার কর্তৃপক্ষ সেদিকে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু কার্যত করলেন কি? সেই একই জিনিস—জেলাসংস্কৃতির ক্যামোফ্লেজে উপস্থাপিত হয়ে চলেছে কয়েকটি তথাকথিত আঞ্চলিক অনুষ্ঠান যা নাগরিক সফিস্টিকেশনের রেখায় রেখায় নিয়ন্ত্রিত বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রথম দিকে সামান্য ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু এখন আর সেটাও নেই। আজকালকার দিনে স্পষ্ট কথা বলতে ভয় হয়, কিন্তু তবু সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই অকুতোভয়ে বলব আকাশ-বাণী আদর্শচ্যুত হয়েছেন, আর্টকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করছেন। তাঁরা নিজেরা গ্রামের নামে, লোকসাহচর্যের নামে যা প্রচার করছেন তা আর যাই হোক শিল্প বলে সমাদৃত হবার মত বস্তু নয়। যাঁরা বছর বছর মোটা রকমের ট্যাক্স দেন তাঁরা এক-ঘেয়ে, কৃত্রিম, অবাস্তব, বহুলাংশে অপল্লী-সম্ভূত, লোকধারা পরিত্যক্ত কতকগুলি অনুষ্ঠান শুনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ নীতি আর যাই হোক শ্রোতাদের সমর্থিত নয় এটা একজন শ্রোতা হয়ে আমি স্বীকার করতে বাধ্য। এখন ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যে কোনো ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার পড়লে এই প্রচারের চেয়ে অনেক ভাল শিক্ষা লাভ করা যায় এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। বরঞ্চ সন্ধ্যার দিকে যে কিছু-কাল পল্লী বিচিত্রার প্রোগ্রাম হয় তাতে কিছু উৎকৃষ্ট জিনিসের সন্ধান মেলে। তাও তর্জা নামক বস্তুটি দ্রুত যে ধরনের পাঁচালীতে পরিণত হচ্ছে তা তর্জার দ্যোতক নয়।

যাক—বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনকে ধন্যবাদ যে একদা তাঁরা আমাদের আত্মোপলব্ধির অনেক অবকাশ দিয়ে উপকৃত করেছেন। আজ তাঁদের অনুষ্ঠান বহুধা ব্যাপ্তিলাভ করেছে, কিন্তু তাঁরাও কিছুটা আদর্শের বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁদের অনুষ্ঠান এত দীর্ঘ করবার কোনও যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। যা শহরের লোকেরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন তার প্রয়োজনা বাহুল্য মাত্র। আজ একটা গ্ল্যামার তাঁদের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে বিপুল-ভাবে আকর্ষণ করছে বলে মনে হয়। মনে হয় বঙ্গসংস্কৃতি আজ "দুই পুরুষ"-এর দ্বিতীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের বহু অনুষ্ঠান আজ কৃত্রিম প্রমোদ পরিবেশনের কাজে উন্মুখ হচ্ছে। একদা যে মূল্যায়নের আদর্শ তাঁদের ঈপ্সিত ছিল আজ তা "এন্টারটেনমেন্ট"-এর সহজ পরি-তৃপ্তিতে পর্যবসিত হচ্ছে। তাই বলব বোধ করি আর একবার এই বঙ্গ সংস্কৃতি নামক সংস্থার একটি সুগভীর আত্মসমালোচনার সময় আসন্ন হয়েছে।

রবিবাসরে ভক্তিগীতি

১৬ই জানুয়ারি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের আহ্বানে তাঁদের ঐতিহাসিক বাসভবনে রবিবাসরের অনুষ্ঠান হয়। তাঁদের পারিবারিক সুপ্রাচীন সিংহ বাহিনীর মূর্তিটি এই সময় সকলে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পান। অনেকেই জানেন এই মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদা সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই পরিবেশে প্রখ্যাত গায়ক শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে তাঁর বহু ভক্তিগীতিতে পরিতৃপ্ত করেন। এর মধ্যে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিকের রচিত একটি ভক্তিগীতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয় পরম-হংসদেব ও যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে যে কথোপকথন এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল সেই লিখিত বৃত্তান্তটি চমৎকার নাটকীয়ভাবে পড়ে শুনিয়েছিলেন। অনু-ষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বনফুল এবং পরি-চালক ছিলেন কবি শ্রীকালীকিঙ্কর সেন-গুপ্ত। সভায় রমেনবাবু তাঁদের পারিবারিক এই দেবী মূর্তির ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিষয়টিকে বিশদভাবে আলোচনা করেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে কিছু আলোচনা হয়। সভায় কিছু কবিতাপাঠ ও একটি গল্প পাঠ হয়।

শার্ঙ্গদেব

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প সংকলন

এই দশকের ছোট গল্প। সম্পাদক, ভাস্কর বসু। সমতট প্রকাশনী, ৫/১/বি দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট, কলকাতা-২৯। ১২·০০

লেখকের নাম অচেনা কিন্তু তাঁর লেখায় হাত পাকা, অন্তত সম্ভাবনাময়, এরকম দেখলে কার না খুশি লাগে। এই সংকলনের এগারোজন লেখকের কিছু-কিছু লেখা আগেও ছাপা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, আমিও দু-একজনের লেখা পড়েছি মনে পড়ছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এ'রা কেউই তেমন পরিচিত নন। অথচ এ'দের গল্পগুলি পড়তে-পড়তে মাঝে-মধ্যেই নড়ে-চড়ে বসতে হয়, এখানে-ওখানে কিছু-কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও মনে হয়—দিব্যি লিখেছেন তো।

গোল বাধায় বইয়ের নাম। এই দশকের ভালো-ভালো গল্প এখানে-ওখানে যা পড়েছি কিংবা এখনকার পরিচিত ও শক্তিশালী লেখকদের কিছু দুর্ধর্ষ ছোটগল্প এ-বইয়ে দেখবো বলে আশা তৈরি হয়। কিন্তু সংকলনের গল্পগুলি একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা আয়োজিত প্রতিযোগিতা থেকে বাছাই করা. বইয়ের নামে তার কোনো ইঙ্গিত নেই কেন? পুরস্কৃত এগারোজন লেখক ছাড়াও বইয়ের প্রথমে অসীম রায়ের একটি ষাট পাতার 'ছোটগল্প' ও সবশেষে মনোজিৎ মিত্রের একটি গল্প ছাপা হয়েছে, তার ফলে ব্যাপারটা আরো এলোমেলো লাগে। পুরস্কৃত প্রতিযোগীদের বাইরে এই দুজনই কি শুধু সত্যিকার ছোটগল্প লেখক? এই দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় ছোটগল্পের সংকলন তাহলে নয় এটি. সম্পাদকের পরিকল্পনাও তা নয়, আবার সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত কিছু গল্পের সংকলনও একে পুরোপুরি বলা যাবে না। বইয়ের নামও সেরকম নয়, বরং তার চেয়ে বেশিই দাবি করছে।

সম্পাদক ভাস্কর বসু 'এই দশকের বাঙলা ছোটগল্প' নিয়ে একটি চমৎকার ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তবে ওই বিষয়ে তিনি যেসব সমস্যা দেখেছেন, আগের দশকগুলিকে যেভাবে নম্বর দিয়েছেন ও পুরো ব্যাপারটাকে যতো সরল করে নিতে পেরেছেন তাতে পাঠক হিসেবে আমি কিছুটা অস্বস্তি এড়াতে পারি নি। তিনি যে লিখেছেন, 'একালের সুনীল-শ্যামল-সিরাজের ছোটগল্প-বড়গল্প-উপন্যাস শুধু আয়তনের ইতরবিশেষ মাত্র।' সেকথা না মানবার মতো তথ্য অনেক পাঠকই এক্ষুনি হাজির করতে পারেন। সব সময় বিষয়ের দীনতা ঢাকবার জন্যই 'নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা দিয়েছে' কি-না কিংবা ওই গোপন উদ্দেশ্যেই 'ছোটগল্প আন্দোলনের নামে বুহত্তর খুদে ম্যাগাজিনের কোলাহল' কি-না সে-বিষয়েও সম্পাদকের সঙ্গে আমার খুব একটা মতের মিল হবার আশা দেখি না। 'ছোটগল্পের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ আগন্তুক অভ্যর্থনার জন্য' খুব তাড়া-হুড়ো করে, খুব সহজে পনেরো-কুড়ি বছরের, এমন কী এই দশকের বাংলা ছোট-গল্পের অন্যান্য গৌরবের দিক, প্রতিষ্ঠিত লেখক ও এখনকার আন্দোলন, প্রায় সব-কিছুকেই তুচ্ছ করা কতোটা জরুরী আমি সত্যিই জানি না। সংকলনটির সত্যিই প্রতিশ্রুতিময় লেখকদেরই বা এতে কী উপকার করা হবে! তবে সম্পাদক ও প্রকাশকের এই উদ্যোগের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে হয়। একে তো ছোটগল্পের বই চট করে কেউ ছাপতেই চান না, তার ওপর নতুন লেখক!—এরকম অবস্থায়, ঝকঝকে বইয়ের আকারে এদের আত্মপ্রকাশের আয়োজন করে প্রকাশক একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন। তরুণ এই লেখকদের কলমের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, বেশ কয়েক বছর একটু বেশিই দয়ের দক্ষে।

অমরেন্দু চক্রবর্তী

কবিতা

শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলকাতা-৯। দাম : পাঁচ টাকা।

স্বাভাবিক সারল্যের জন্যে বিশেষ সংলাপ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের এই কাব্যগ্রন্থে বারেবারেই উচ্চারিত। চালাকি বা ভঙ্গুরভঙ্গির ভ্রম এখানে নিশ্চিত অনুপস্থিত। ভোরবেলাকার তাজা লাবণ্যে টলটল করছে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতার শরীর। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে তাঁর কবিতার আপাত-নিরীহ শব্দগুলি মেধাবী মনস্কতার কাছে উন্মোচন দাবী করে।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই কবি বলেছেন—'মানুষের পাশ থেকে সরে যায় সঠিক মানুষী/ভাষা না শেখার জন্য, ভাষা না জানার জন্য/শুধু ভাঙাভাঙা' কিন্তু আমার মনে হয় প্রণবেন্দু সেই সঠিক ভাষা আয়ত্ত করেছেন। কারণ তিনি জানেন

'ঘুরিয়ে বললেই কিছু ভুল হয়' এবং তাই কবির উচ্চারণ 'এখন সহজ কিছু খেলা চাই, স্বাভাবিক, ডিরেক্ট ডায়ালে কথা বলা।' কবি সহজ হতে চান 'জালসুরকির পথে বই হাতে চলে যাওয়া কিশোরীর মত।

আরোপিত শিল্প কবিকে ক্লান্ত করে। বানানো ব্যঞ্জনার প্রতিধ্বনি অবাঞ্ছিত নুপুরের মত সরিয়ে নিতে চান। তাই বলে ওঠেন 'শব্দ থেকে ঘুঙুর খুলে নিই,/ বাজুক একেলা।' কিংবা 'বেজে উঠুক শুধু পায়ের খেলা।' একটু সচেতন শ্রবণ 'শুধু-পা' শব্দটির নিপুণ ব্যবহারে নিশ্চয় রোমাঞ্চিত হবে।

কবির পরিহাসপ্রবণতা শরতের মেঘ-রোদের খেলার মত চমৎকার। সৌন্দর্য জড়িয়েছে কয়েকটি কবিতায়। 'সুতো ছিঁড়বার পর' কবিতায় কবি লিখেছেন— 'বাড়ির বু-প্রিন্ট হাতে প্রেমিকা ও এঞ্জিনিয়র—/কিছু দর কষাকষি!' পংক্তি দুটির নির্মলতা আনন্দে ভরে দেয় তার পাঠককে।

প্রণবেন্দু খুব সহজেই বাকপ্রতিমা নির্মাণ করতে পারেন। অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যায় এ প্রসংগে এবং যে কোনো পাঠকই সেই প্রতিমার নির্মিত অসতর্কতায়ও দেখতে বাধ্য হবেন। আমি এখানে শুধু একটি উদ্ধৃতি দেওয়ার ইচ্ছেকে গোপন রাখতে পারলাম না—'সবুজ ঢালুর মুখে ডাকটিকিটের মতো/লাগানো হরিণী/যেখানে বাংলোর ছাত উড়ে যায় শতভিষা ছাড়িয়ে আকাশে,/মৃদু গুম খুন ব'লে মনে হয় মর্মর ছড়ানো অবসর:/পাহাড়ে উঠবার আগে হাঁটু পায় শোভন লঘুতা;/' প্রণবেন্দু অন্ত্যমিলের খেলায়ও যে কত সক্ষম তার প্রমাণ রেখেছেন 'প্রতীক্ষিত', 'স্বর্ণকুমারী', 'পুরাতনী' প্রভৃতি কবিতায়।

সবশেষে বলতে চাই প্রণবেন্দু এক মার্জিত ভারসাম্যের কবি। সহজ করে কথা বলতে গিয়ে কখনো মাত্রা ভুল করেন নি—পদক্ষেপে বিচ্যুতি আসেনি। আর এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। প্রণবেন্দু একটি কবিতায় লিখেছেন 'ভয় পাই/ভয় পাই, সময় তোমাকে'। তাঁকে বলি সময়কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তাঁর মত কবির। তিনি নিশ্চিত বাঞ্ছিত শিল্প-ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রোজ্জ্বল থাকবেন।

মন্মথ দাশগুপ্ত

জ্যোতিষ চর্চা

জ্যোতিষ মহাচয়ন। স্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য সম্পাদিত। এম পি জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং। কলকাতা-৭। ত্রিশ টাকা।

সাড়ে আট শো পৃষ্ঠার এই বিশালায়তন বইটি ফলিত জ্যোতিষ ও করেরেখা সম্পর্কিত রচনাবলীর একটি সুবৃহৎ সংকলন। বইটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাতাশটি বাংলা রচনা, তৃতীয় অংশে ত্রিশটি ইংরাজী রচনা, এবং চতুর্থ অংশে আটচল্লিশ জোড়া করতলের ফটোগ্রাফ আছে।

ইংরাজী ও বাংলা রচনাগুলি লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের নানা প্রদেশের খ্যাতনামা জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদ এবং নানা স্তরের মনীষীরা। রচনাগুলির সবগুলিই যে জ্যোতিষ সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ, মননশীল আলোচনা, বা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর নতুন আলোকপাত তা নয়; কিছু কিছু এমন রচনাও আছে যেগুলির সংগে জ্যোতিষের গবেষণা, বিচার, আলোচনা প্রভৃতির কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্কই নেই—জ্যোতিষের সংগে সম্পর্ক সেগুলির কেবল নামে মাত্র। তা সত্ত্বেও, এতে এমন কয়েকটি প্রবন্ধ আছে যেগুলি জ্যোতিষে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে মূল্যবান বলে মনে হবে। বিশেষ করে দ্বাদশ ভাব বিচারের দ্বাদশটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, গান্ধী, জওহরলাল, দেশবন্ধু, মুজিবর রহমান, মাও সে তুং, স্ট্যালিন, হিটলার, মুসোলিনী, বার্নার্ড শ, মোপাসাঁ, ভিক্টর হুগো, ইয়েটস, আইনস্টাইন, লুই পাস্তুর, নিউটন, মাদাম কুরী, পিকাসো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রুশো, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, কার্ল মার্ক্স, ইমানুয়েল কাণ্ট, মোৎসার্ট, শুম্যান, আব্রাহাম লিংকন প্রভৃতি বিশ্বের উনসত্তরজন মত গুণী ব্যক্তির রাশিচক্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলি নিঃসন্দেহে জ্যোতিষী ও জ্যোতিষী-শিক্ষার্থীদের কাছে অমূল্য সম্পদস্বরূপ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশস্বী আটচল্লিশজন সমকালীন ব্যক্তির দু' হাতেরই করতলের সুন্দর ফটোগ্রাফ এ বইয়ের চতুর্থ অংশে সংযোজিত হয়েছে। এইসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমা চৌধুরী, বনফুল, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্তামণি কর, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, গোষ্ঠ পাল, চুনি গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জি, পংকজ রায় প্রমুখ। করেরেখা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের এই আলোকচিত্রগুলি খুবই কাজে লাগবে।

বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে প্রায় অর্ধশত আর্ট প্লেট সমেত ডাবল ক্রাউন অক্টেভো আকারের সমুদ্রিত এই বিরাট গ্রন্থটি দামের দিক থেকে যৎপরোনাস্তি সস্তা—এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

রাধাকান্ত শর্মা

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'ওরা চারজন' বলতেই চকিতে যে চারটি মুখ মনে পড়ে যায়—সূর্য, অভয়, বুলোদি আর কৃপাময়ের—সেই যদুবংশীয় চারজনকে নিয়েই তরুণ ঔপন্যাসিক অজিত হাজরা যে নতুন করে কাহিনী রচনা করেননি, বলা বাহুল্য। তবু তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যে চারটি যুবা তাদের হাঁটাচলায়, কথা-বার্তায়, ভাবেভঙ্গিতে এবং উন্মার্গগামিতায় যদি যদু-প্রজন্মের চারটি স্মরণীয় যুবককে কারো মনে পড়ে যায়, তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তফাত নিশ্চিত অনেক। পঞ্চমুখী প্রদীপের অন্তরালে পুরনো মূল্যবোধ ঝিকিয়ে দেবার রূপক কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে দুই স্তরে আখ্যানাংশকে ছড়িয়ে দেওয়া, অথবা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো দক্ষতা এই তরুণ কথাকার অবশ্যই দেখাতে পারেননি। তাঁর কাহিনী কলকাতার পটভূমিতে আরম্ভ, বিস্তার পেয়েছে কাশ্মীরে। গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে, অন্যভাবে বাঁচতে চাওয়ার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে উপন্যাসের পরিণতিতে অপরিণতির চূড়ান্ত। কাহিনীর নিজস্ব যুক্তি বহু ক্ষেত্রেই খর্ব হয়েছে। সুরঞ্জনের চিঠি, ইরার ট্রাঙ্ক-কল—সম্পূর্ণ অর্থহীনভাবে উপস্থাপিত। কাহিনীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না এ দুটি ঘটনার অনুল্লেখে।

কেতকীর উপাখ্যানও এলোমেলো। সমীর কেতকীকে বলেছিল : 'চুপ করো, নইলে আমি সেই রকম—বাকী কথা শোনা যায় নি। এই অসমাপ্ত বাক্যাংশ বিজন আর রথীকে ভাবনায় ফেলেছে। ভাবনায় পড়েন আধুনিক কবিতার মনস্ক পাঠকও। 'গল্পের সবটা যিনি নাগালে পান না' সেই বিব্রত কবির একটি কবিতার প্রতিধ্বনি এই অংশটি। সেখানেও ছিল—"কিংবা সেই ছেলেটা, যে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে পাশের/মেয়েটিকে অদ্ভুত কঠিন স্বরে বলেছিল,/'চুপ করো, না হলে আমি/সেই রকম শাস্তি দেব আবার—' কে জানে/'সেই রকম' মানে কী রকম।"

এ সত্ত্বেও স্বীকার্য, বর্ণনার এক ধরনের সপ্রতিভতা অজিত হাজরার ওরা চারজন (করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, দশ টাকা) উপন্যাসে লক্ষ করা গিয়েছে।

*

দর্শন ও ইতিহাসের সুপরিচিত লেখক মনোরঞ্জন রায়। প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে 'অগ্রণী' পত্রিকায় তাঁর শেষ বাল্য-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর আবার তিনি কাব্যচর্চায় মন দিয়েছেন, দ্বিতীয় শৈশবে ফিরে। সাম্প্রতিক রচনার কিছু নমুনা নিয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ উদ্ভট শ্লোক (অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলকাতা ৭, তিন টাকা)।

ভূমিকা থেকে এ-ও জানা গেল, তিনি কবিতা চর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন এই কারণে যে, "কবিতা অপরিণত মনের বহিঃপ্রকাশ।" পরিণত বয়সের এই রচনাবলী পড়ে পাঠকেরও যদি সেই ধারণাই হয়, বোধ করি, দোষের হবে না।...

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

খেলার মাঠে

ইংলন্ডের আবার রাবার

পর পর তিনটি টেস্টে ভারতকে হারিয়ে ইংলন্ড আবার রাবার পেল এবং ১৯৭৪-এর সিরিজ নিয়ে টানা জিতল ছয়টি টেস্ট। এই সিরিজের বাকি দুটি টেস্ট প্রায় নিয়মরক্ষার খেলা হয়ে পড়েছে। যেভাবে ভারত খেলছে তাতে ভারতীয় সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনাও মিইয়ে গিয়েছে। মনে হয় না ভারতের ব্যাটসম্যানরা আর কোমর শক্ত করে দাঁড়িয়ে লড়তে পারবে।

ভারত বহু টেস্টেই হেরেছে। পর পর পাঁচটি টেস্ট হারারও নজির আছে। কিন্তু এই সিরিজের মত এমন প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণ আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ। ক্রমেই যেন লড়াইয়ের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দিল্লিতে প্রথম টেস্টে ইনিংস এবং ২৫ রানে হারলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৪ রান করার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় এবং দৃঢ়তার কিছুটা ছাপ ফুটে উঠেছিল। কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংস ১৫৫ ও ১৮১ রান করার পর হেরেছিল ১০ উইকেটে। মাদ্রাজে তৃতীয় টেস্টে ২০০ রানে হেরেছে দুই ইনিংসে ১৬৪ ও ৮৩ রান করে। কোন টেস্টই পুরো পাঁচ দিন খেলা হয়নি। একইভাবে প্রতি টেস্ট শেষ হয়েছে পঞ্চম দিন লাঞ্চের আগে।

এবং বলবার কথা ও লজ্জার কথা, মাদ্রাজে দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৩ রান দেশের মাঠে সবচেয়ে কম রানের ইনিংস। এবারের ইংলন্ড দলের বোলিং কি এত শক্তিশালী যে, ভারতের ব্যাটসম্যানরা এভাবে ব্যর্থ হবে? তিনটি টেস্টে পরাজয় সত্ত্বেও আমি বলব, আমাদের বোলাররা তাদের সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করে গেছে, যার ফলে ইংলন্ড মাদ্রাজে বড় ইনিংস গড়তে পারে নি। ডুবিয়েছে ব্যাটসম্যানরাই। এবং বলা বাহুল্য, যাদের উপর আমরা বেশী নির্ভরশীল সেই নামী ব্যাটসম্যানরাই। তিনটি টেস্টের ছয় ইনিংসে বিশ্বনাথের রান কত? ৩ : ১৮; ৩৫ : ৩ ও ৯ : ৩। মহীন্দার অমরনাথের দুটি টেস্টে ০ : ২৪ এবং ০ : ১২। শুধু গাভাসকর এবং ব্রিজেশ কিছুটা ব্যাট করেছে। তাও গাভাসকারের ৩৮ : ৭১ : ০ : ১৮ এবং ৩৯ : ২৪ রান, আর ব্রিজেশের ৩২ : ১৪; ২১ : ৫৬ এবং ৩২ ও ৪ রান তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী রান নয়। অন্য ব্যাটসম্যানদের কথা না বলাই ভাল। স্পিং বলের বিরুদ্ধে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে বা বাজে স্ট্রোক করে উইকেট দিয়েছে।

বলা যেতে পারে, ভারত নিজের ফাঁদেই নিজে গলা দিয়েছে। সিরিজ আরম্ভের অনেক আগে থেকে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি রামপ্রকাশ মেহেরা গলা উঁচু করে বলতে আরম্ভ করেন—"আমাদের স্পিনারদের উপযোগী করে পিচ গড়ার জন্য সব টেস্ট কেন্দ্রে আমরা নির্দেশ দিয়েছি। সেটা অন্যায় নয়। সব দেশই নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পিচ তৈরি করে থাকে।"

এখন দেখা যাচ্ছে স্পিনারদের সুবিধা অনুযায়ী পিচে ইংলন্ডই সুবিধা বেশী পাচ্ছে। চিত্তাকর্ষক এবং প্রাণবন্ত ক্রিকেটও মুখের ও কেতাবের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলা হচ্ছে একেবারেই জলো খেলা। আমাদের স্পিনারদের সহায়ক উইকেটের সুবিধা নিচ্ছে ইংলন্ডের পেসার ও স্পিনাররা। না হলে ডেরেক আন্ডারউড কি মাদ্রাজে দুই ইনিংসে ১৬ রানে ৩টি এবং ২৮ রানে ৪টি উইকেট পায়?

প্রথম টেস্টে হারার পর থেকে খেলোয়াড় বদলের কথা উঠেছে। দ্বিতীয় টেস্টের পর বদলের প্রশ্ন বেশী করে দেখা দেয়। কিন্তু কাদের বদল করা হয়েছে? সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। নতুন প্রতিভার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। ইংলন্ড কিন্তু তিনটি টেস্টের মধ্যে চারজনকে খেলিয়ে তিনজনকে তৈরি করে নিয়েছে।

পরিচালকদের সাহস, দূরদৃষ্টি এবং পরিকল্পনার অভাব। অন্যদিকে ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীন খেলার জন্যই আজ ভারতীয় ক্রিকেটের এই হাল।

মাদ্রাজ টেস্টের বিশদ পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না। শুধু সংক্ষিপ্ত স্কোরই দিচ্ছি।

ইংলন্ড প্রথম ইনিংস **২৬২** (মাইক ব্রিয়ার্লি ৫৯, টনি গ্রেগ ৫৪, অ্যালান নট ৪৫, জন লিভার ২৩, ডেরেক আন্ডারউড ৩২; বেদী ৪-৭২, প্রসন্ন ২-৪৫, মদনলাল ২-৪৩)।

ভারত—প্রথম ইনিংস **১৬৪** (গাভাসকর ৩৯, ব্রিজেশ প্যাটেল ৩২, সৈয়দ কিরমানি ২৭; লিভার ৫—৫৯, আন্ডারউড ৩—১৬, ওল্ড ২—১৯)।

ইংলন্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লে) **১৮৫** (ডেনিস অ্যামিস ৪৬, টনি গ্রেগ ৪১, মাইক ব্রিয়ার্লি ২৯; চন্দ্রশেখর ৫—৫০, প্রসন্ন ৪—৫৫)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস **৮৩** (গাভাসকর ২৪, মহীন্দার অমরনাথ ১২; আন্ডারউড ৪—২৮, উইলিস ৩—১৮, লিভার ২—১৮)

অস্ট্রেলিয়াকে হারাল পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়াকে শেষ টেস্টে ৮ উইকেটে হারিয়ে এবং সিরিজ ড্র রেখে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছে। সেখানে খেলবে পাঁচটি টেস্ট এবং কয়েকটি আঞ্চলিক ম্যাচ।

অস্ট্রেলিয়া নিঃসন্দেহে এখন বিশ্ব ক্রিকেটে এক নম্বর দেশ। পেস বোলিংয়েও সবার সেরা। সেই অস্ট্রেলিয়াকে তাদের দেশের মাঠে পরাজিত করা পাকিস্তানের পক্ষে খুবই কৃতিত্বের ব্যাপার। বিশেষ করে টসে হেরেও। পাকিস্তানের জয়ের নায়ক পেস বোলার ইমরান খাঁ, যে দুই ইনিংসে ৬টি করে মোট ১২টি উইকেট পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে বড় কৃতিত্ব সেঞ্চুরীকারী আসিক ইকবালের। উল্লেখ্য অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের এটাই প্রথম টেস্ট জয়। এবং জয় ১৭ ঘণ্টা সময় হাতে রেখে। ৬ দিনের টেস্ট চতুর্থ দিনের সকালেই শেষ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা অতীত খেলোয়াড় অ্যালান ডেভিডসন ইমরানের বোলিং সম্পর্কে বলেছেন—তাঁর দেখা বোলিং কৃতিত্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস **২১১** (কোজিয়ার ৫০, গিলমোর ৩২, ওয়াকার নট আউট ৩৪, গ্রেগ চ্যাপেল ২১, ডেভিস ২০; ইমরান খাঁ ৬—১০২, সরফরাজ নওয়াজ ৩—৪২)

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ৩৬০ (আসিক ইকবাল ১২০, হারুন রসিদ ৫৭, জাভেদ মিয়াঁদাদ ৬৪, মাজিদ খাঁ ৪৮, সাদিক মহম্মদ ২৫; ওয়াকার ৪—১১২, গিলমোর ৩—৮১, লিলি ৩—১১৪)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস **১৮০** (বর্ডান মার্শ ৪১, ডাগ ওয়াল্টার্স ৩৮, ডেনিস লিলি ২৭, ইয়ান ডেভিস ২৫; ইমরান খাঁ ৬—৬৩, সরফরাজ নওয়াজ ৩—৭৭)

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ২ উইঃ **৩২** (মাজিদ খাঁ নট আউট ২৬; লিলি ২—২৪)।

একলব্য

ব্যারিংটন কতবড় ব্যাটসম্যান ছিলেন

বিখ্যাত ক্রিকেট লেখক অ্যালেক্স ব্যানিস্টার লিখেছেন, ব্যারিংটনের ব্যাটিংয়ে হয়তো হ্যামণ্ড বা কাউড্রের সৌন্দর্য ছিল না। কিন্তু তার সমসাময়িককালে আর কোন্ ব্যাটসম্যান তার মত চোখ ঝলসানো স্কোয়ার কাট বা রাজকীয় কভার ড্রাইভ করতে পেরেছেন ?

অনেকের মতে টম গ্রেভনির খেলায়ও যে লালিত্য ছিল ব্যারিংটনের খেলায় তা ছিল না। তাদের কাছে ব্যানিস্টারের প্রতি প্রশ্ন : ব্যারিংটনের মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, দলকে জয়ের অবস্থায় পৌঁছে দেবার জন্য যে ইস্পাত-কঠিন মনোবল ছিল তা আর কারো ছিল কি ?

১৯৫৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে শূন্য করায় ব্যারিংটনকে দীর্ঘ ৪ বছর কঠিন অনুশীলন করতে হয়েছিল আবার টেস্টে সুযোগ পাবার জন্য। ১৯৫৯ সালে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট রিজে করেছিলেন ৮৬ লর্ডসে ৮০, হেডিংলেতেও ৮০, ওল্ড ট্রাফোর্ডে ৪৬ এবং ওভালে ৮ রান। তারপর থেকে ১৯৬৭-৬৮ মরসুমে হৃদরোগে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যারিংটন ছিলেন ইংলণ্ডের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। হ্যাঁ, ১১৩টি টেস্টের কষিত কাঞ্চন ক্রীড়ানট কলিন কাউড্রের চেয়েও নির্ভরযোগ্য। ১১৩টি টেস্টে কলিন কাউড্রের মোট রান ৭৭০০।৮২ টেস্টে ব্যারিংটনের ৬৮০৬। কাউড্রের গড় ৪৪·৭৬। ব্যারিংটনের গড় ৫৮·৬৭। ১০০ বছরের টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে সাটক্লিফের ৬০,৭০ পরে ব্যারিংটনের গড়। হবস, হাটন, কম্পটনও পেছনে। তাই ক্রিকেট মহলে ব্যারিংটনের নাম হয়ে গিয়েছিল মিঃ রিলায়েবল এক ভারতীয় ক্রিকেট লিখিয়ে নাম দিয়েছিলেন, রান-গধ্রু জমিদার।

১৯৬১-৬২ সিরিজে ভারতে এসে বোলারদের সংগে যথেচ্ছ আচরণ করেছিলেন। ৯৯ অ্যাভারেজে ৫৯৪ রান করেছিলেন পাঁচটি টেস্টে। বড় বড় স্কোরগুলির মধ্যে বোম্বাইতে নট আউট ১৫১, কানপুরে ১৭২, দিল্লিতে নট আউট ১১৩। কলকাতাতেই শুধু ব্যাটে রান পাননি। ১৪ ও ৩ রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তার ফলেই ইডেনে সর্বপ্রথম ভারত দলের টেস্ট জয় সম্ভব হল।

ব্যাটসম্যান কীভাবে ব্যাট করছে, তার ডিফেন্স কতখানি নিশ্ছিদ্র, কতটা দায়িত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠছে তার ব্যাটিং থেকে—এসব বোঝার সবচেয়ে বেশী সুবিধা উইকেট কিপারের। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত উইকেট কিপার ওয়ালী গ্রাউট বলেছেন, আমি যখনই ব্যারিংটনের পেছনে দাঁড়িয়েছি আমার মনে হয়েছে ওর ব্যাট গলে বল কখনো আমার হাতে আসবে না। মনে হয়েছে, সব সময় ওর মাথার উপর উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

ব্যারিংটনের জন্ম ১৯৩০ সালের ২৪ নভেম্বর রিডিং শহরে, যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় পিটার মে এবং বেডসার ভ্রাতৃযুগল—অ্যালেক ও এরিক।

পুরনো কাঠের ব্যাটে ক্রিকেট শুরু হয়েছিল ৮ কি ৯ বছর বয়সে। ১৪ বছর বয়সে

স্কুল ছেড়ে এক একটি মোটর গ্যারেজে কাজ জুটে যায়। মোটামুটি ভাল মেকানিক ছিলেন। পুরনো গাড়ির কলকব্জা নিয়ে কাজ করতে ভালবাসতেন। একদিন এক পুরনো রোলস রয়েস চেপে সোজা প্রশস্ত হবস গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ওভাল মাঠে। তার আগে রিডিং ক্লাবে ক্রিকেট খেলেছেন, গ্রাউণ্ডসম্যানের কাজ করেছেন। মুখ্যত বোলার ছিলেন। ডান হাতে লেগ-ব্রেক বল করতেন। ৮ কিংবা ৯ নম্বরে ব্যাট করার সুযোগ পেলেই খুশী হতেন। ষোলো-সতের বছর বয়সে সারে কাউন্টিতে যখন গেলেন তখন সেই বিখ্যাত স্পিনার লেকার ও লক সারের খেলোয়াড়।

অ্যালেক্স ব্যানিস্টার লিখেছেন : লেকার জেলোটিকে দেখে আমাকে ফোন করে বলল, আমরা প্রতিশ্রুতিবান এক ইংলণ্ড খেলোয়াড়কে পেয়েছি। জেলোটিকে আমি বোলার হিসাবে জানতাম বলেই রসিকতা করে বলেছিলাম, সারের তো আর স্পিনারের দরকার নেই। জেলোটিকে ইংলণ্ডের জন্য রিজার্ভ রাখো। লেকার উত্তরে বলেছিল, না, আমি ওর বলের কথা বলছি না। আমরা ভবিষ্যতের এক ব্যাটসম্যানকেই পেয়ে গেছি। দেখো একদিন ও ইংলণ্ড দলে খেলবে।

সেই ব্যাটসম্যানই এই ব্যারিংটন। পুরো নাম কেনেথ ফ্রাঙ্ক ব্যারিংটন। চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বক্ষ এবং পেলব অথচ শক্তিশালী বাহুর বিরাট ক্রিকেটার।

১৯৪৯ সালে সামরিক দায়িত্ব পালনে ব্যারিংটন চলে যান জার্মানিতে। কিন্তু তার আগেই ক্রিকেটকে ভালবেসে ফেলেছেন। সুতরাং জার্মানীতে ম্যাটিং উইকেটে অনুশীলন করেছেন সারের বড় দলে খেলার আশায়। ১৯৫১ সালে অ্যান্ডি স্যান্ডহাম ওকে ব্যাটিংয়ে তালিম দিতে শুরু করেন। ৫৫ সালে কাউন্টি ক্যাপ পান এবং ১৫৮০ রান করে ক্রিকেট লিখেয়েদের ভোটে বেস্ট ইয়ং ক্রিকেটার-এর সম্মান পান। এম সি সি 'এ' দলের সংগে ওই বছরই পাকিস্তান সফরের সুযোগ ঘটে। তার পর থেকেই খ্যাতির সোপানে চড়ে শীর্ষে আরোহণ।

বলকে মাঠের বাইরে পাঠাবার জন্য ব্যাটসম্যানের হাতের ব্যাট—প্রথমে এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। বিপদজনক স্ট্রোক করতেন। উইকেটের চারদিকে সব রকমের স্ট্রোক করে দর্শকদের আনন্দ দিতে চাইতেন। লেকার ওকে বোঝালেন, বোলাররা তো বোকা নয়। তুমি যদি রিস্কি শট পরিহার না কর কতক্ষণ দর্শকদের আনন্দ দিতে পারবে? ক্রিকেট হঠকারিতা বা ঝুঁকি নেবার খেলা নয়। সংযম, সাধনাই বড় কথা। আর এক ক্রিকেট লিখিয়ে এবং সারে কাউন্টিতে ব্যারিংটনের সহ খেলোয়াড় মিকি স্টুয়ার্ট লিখেছেন, লেকারের এবং অন্যান্যদের পরামর্শে ব্যারিংটন খেলার স্টাইল বদলে ক্রিকেটের ক্ষতিই করেছে। রান অবশ্যই বেশী পেয়েছেন কিন্তু হাতের শিল্পসৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে। অপরদিকে বহু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞর ধারণা, স্টাইল বদলের ফলেই ব্যারিংটন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। কেন ব্যারিংটন হয়তো বিশ্ব ক্রিকেটকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন যদি অসুস্থতা ও'র ক্রিকেট জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করত।

ভদ্র ও মার্জিত রুচির একজন সত্যিকার ক্রিকেটার কেনেথ ফ্রাঙ্ক ব্যারিংটন।

মধুকুল

বলুন
এস. সি. ডি
অমনি
একটি স্টেশন খুলে যাবে

আমাদের স্ট্রীট কলেকশন এ্যাণ্ড ডেলিভারি সার্ভিসকে ডাকুন, দেখবেন, আপনার বাড়িতে মালের একটি বুকিং স্টেশন খুলে গিয়েছে। সেখানে আপনার মালপত্র 'বুক' ক'রে তক্ষুনি রেলওয়ে রসিদ দেওয়া হবে। যদি প্রেরকে বলে দেন তাহ'লে বাইরে থেকে পাঠানো মালপত্রও আপনার দোরগোড়াতেই আপনি পেতে পারেন।
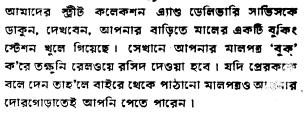
নীচের যে কোন একটি নম্বর ধরুন; দেখবেন, কত তাড়াতাড়ি আপনার মাল পাঠানোর সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

স্ট্রীট কলেকশন এ্যাণ্ড ডেলিভারি সার্ভিস-এর জন্য

৩৪-৮৩৬৭ ট্রান্সপোর্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন
পি ৩ নিউ সি.আই.টি. রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

গুড্‌স বুকিং অফিস : ১২৮ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৭

৬৬-৪০৭৭ চীফ পার্শেল এ্যাণ্ড লাগেজ ইনস্পেক্টর, হাওড়া

৬৬-৩৩৫৬ গুডস্ ইনস্পেক্টর, হাওড়া

৩৫-১২১১ চীফ লাগেজ ইনস্পেক্টর, শিয়ালদহ
গুডস্ সুপারভাইজার, শিয়ালদহ

২৩-০২১১ এস-সি-৩, মার্কেটিং এ্যাণ্ড সেল্‌স্
৩ কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-১

মাল খালাসের সময় : সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
মাল তুলবার সময় : সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা

কনটেইনার-এর জন্য

৬৬ ৫১৭৮ কনটেইনার টার্মিনাল, হাওড়া

২৩ ০২১১ এস-সি-৩, মার্কেটিং এ্যাণ্ড সেল্‌স্
৩ কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-১

পূর্ব রেলওয়ে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নির্বাচিত গত বছরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র 'জন অরণ্য'/ পরিচালনায় নির্দেশরত সত্যজিৎ রায়

রঙ্গজগৎ

সব্যসাচী/উষা ফিল্মস

সব্যসাচীকে দেখতে কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র: 'এইটেই ভারি আশ্চর্য। এত বড় একটা ভয়ংকর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত।' ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে 'পথের দাবী' রচনার প্রায় ৫০ বছর পরে মনে-মনে পীযূষ বসু: ১৯২৭ সালে যে-সবধারণাটারনা চলতো ১৯৭৭-এও তাই চলবে নাকি? শরৎবাবুটরৎবাবু তো আর উত্তমকুমারকে অ্যানটিসিপেট করতে পারেন নি। তা হলে 'পথের দাবী'র মত ব্লকবাস্টার-এ নায়কের বর্ণনায় অন্তত দু-একটা চাবুক-চাবুক বিশেষণ না দিয়ে পারতেন না। যাই হোক, ভাগ্যের কৃপায় আমরা গুরুকে পেয়েছি এবং ভাগ্যের পরিহাসে যেহেতু এ

চলচ্চিত্র

ছবিটি ৫০-এর দশকে না হয়ে (যখন উত্তমকুমারের চেহারায় গড়িয়ে যাওয়া বছরের শিথিল বাহুল্যের কোনো আশ্রয় ছিল না) ৭০-এর দশকে তৈরি হল, আমি এবং আমার দলবল সব্যসাচীকে এইভাবে ভাবি—তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান ব্রতে দীক্ষিত বলে তাঁর পুণ্যের শরীর শত দুঃসহ পীড়নের মধ্যেও নধর, তাঁর ঘাড়ের গভীর চিকন খাঁজে খাঁজে ব্যক্তিত্ব ও সাফল্যের ঘোষণা এবং তাঁর গালের মেকআপ-ফাউনডেশন তাঁর দেশপ্রেমের মতই গভীর। এক কথায়, সব্যসাচীকে দেখতে রাজবংশের মাতাল নায়কের মত, চাঁদের কাছাকাছির পাগল প্রফেসার-এর মত, এমন কি বাঁহাঁশিথার ক্রিমিনাল বা বিকৃত প্রেমিকের মত। শরৎচন্দ্রর শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কাছে আমাদের ঋণ স্বীকারের এর চেয়ে অব্যর্থ উপায় আর কি হতে পারতো?

শরৎচন্দ্র থেকে আর একটি উদ্ধৃতিতে আসা যাক: "ছেলেটি (সব্যসাচী) দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে, বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারী পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেচে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে—তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে।" এ-জিনিস সেলিম-জাভেদ রচিত স্ক্রিপ্টকেও লজ্জা দেয়। যাই হোক, এবার দেখা যাক পীযূষবাবুরে সব্যসাচী শরৎচন্দ্রীয় মাপকাঠিতে কতটা কসমোপলিটান। পীযূষবাবুর সব্যসাচী একেবারে বাঙালী উচ্চারণে ইংরেজি বলেন এবং শব্দের ভুল জায়গায় অথবা জোর দেন। এবং তিনি ফরাসী বলেন জার্মানদের মত, এবং তাঁর জার্মান তাঁর ফরাসীর গা ঘেঁষে থাকে, টিউটনিক ভ্রাতৃত্বে সব এত দূরে একাকার। অর্থাৎ তিনি যখন ক্রমাগত ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ) চীনে

নেজেসেজে পুলিসের নাকের ওপর দিয়ে ঘুরতে থাকেন, তখন তাঁকে বিকাশ রায় ও পুলিস-বাহিনীর অন্যান্যরা চিনতে না পারলেও, আমাদের তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যেও ফরাসী বা জার্মান মনে হয় না। এমন কি উত্তমকুমার ছাড়া তাঁকে অন্য কিছুই মনে হয় না আমাদের, কেননা, সেই ঘাড় ফিরে তাকানো, মাথার চুল আজও তেমনি নিখুঁত 'ইউ', সেই ডান হাতের তর্জনী নেড়েনেড়ে কথা আর সেই মাঝে-মধ্যে মিলিয়ন-ডলার হাসি। কিন্তু একটা কথা, 'সব্যসাচী'র চরিত্রে উত্তমকুমারকে যে কেন ফরাসী, জার্মান, চীনে প্রভৃতি ভাষায় আলাপের অত্যাচার সহ্য করতে হল, আমার মাথায় ঢুকছে না, যেহেতু পীযূষবাবুর ছবির জার্মান সাহেব (তরুণ রায়) অনর্গল বাংলা বলেন ও আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, মাঝেমধ্যে ইংরেজিও বলেন। এবং যেহেতু হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (ইংরেজ পুলিশ চীফ) 'আই কাণ্ট ডু ইট' ছাড়া ইংরেজিতে আর বিশেষ কিছু বলেন না। তবে হ্যাঁ, রেঙ্গুনের অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা প্রায় এক-একজন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিদেশী ভাষায় এমনি তাঁদের সাবলীল বিচরণ।

শরৎচন্দ্র থেকে তৃতীয় উদ্ধৃতি: "পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের অধিক নয়। কিন্তু যেমন রোগা তেমনি দুর্বল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। মনে হয় না যে, সংসারের মেয়াদ আর তার দীর্ঘদিন আছে, ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে।" পীযূষবাবুর ছবিতে এ দৃশ্যটি আছে। এবং আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি উত্তমকুমারকে একটি কৃশকায়, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অসুস্থ যুবক হিসেবে ভাবতে। যদি না পারি, আমাদের কল্পনা করুণার যোগ্য।

পীযূষবাবু ছবির একেবারে গোড়াতেই আমাদের জানান যে, 'সব্যসাচী' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অবলম্বনে তৈরি। এই ছোট্ট অনুত্তাজ্ঞলটি ঠিকঠাক করে দিয়ে বলতে হয়, 'উত্তম অবলম্বনে'। তবে কোনো রকম অবলম্বনেই আমাদের আপত্তির কোন কারণ থাকতো না যদি এই আধুনিক চিত্রায়িত 'পথের দাবী' অন্তত সিনেমার মূল দাবীগুলিকে মোটামুটি আমল দিত। পীযূষবাবু শরৎচন্দ্রের উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি ঘটনাকে চিত্রায়িত করেছেন মাত্র এবং সেই চিত্রায়নে মূল কাহিনীর পারম্পর্য নেই। আমরা জানি, চিত্র-পরিচালক হিসেবে এই স্বাধীনতা নেবার অধিকার তাঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু তিনি কিসের দাবীতে 'পথের দাবী'র ওপর

সব্যসাচী/উত্তমকুমার বিভিন্ন রূপসজ্জায়

এমন স্বেচ্ছাচারিতা করলেন? সিনেমার দাবীতে? দেখা যাক, সে দাবী কতটা এবং কিভাবে মেটে।

এক : তাঁর স্বরচিত চিত্রনাট্যে আর যাই থাক সিনেমা নেই। ১৭ রীল ধরে আমরা ঘটনার পর ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটতে দেখি যেগুলি কোনো অনিবার্য সমগ্রতায় দানা বেঁধে ওঠে না। কেন যে এতগুলি লোক ক্রমাগত হুড়োহুড়ি করতে থাকে এবং উত্তমকুমার প্রতি দৃশ্যে পোশাক পালটানোর খেলায় মেতে ওঠেন আমরা প্রথম প্রথম বুঝতে পারি না, এবং কিছু পরে বোঝবার চেষ্টাও করি না। যেহেতু সব্যসাচী মূলত কাহিনীচিত্র, এর ঢংটা আপাদমস্তক কনভেনশনাল, তাই এই দানা বেঁধে ওঠার ব্যর্থতাটা মারাত্মক।

দুই : সব্যসাচীর মূল ঘটনাটি ঘটে বর্মায়। এবং সব্যসাচীকে আমরা ম্যাকাসার, অ্যাকাব ও বেম্বুলা বন্দরেও দেখতে পাই। সিনেমার প্রাথমিক ব্যাকরণের দাবি হল, যে কোনো ঘটনার জায়গাকে—বিশেষ করে সেটা যদি বিদেশ হয়—খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা। এই ধরনের দৃশ্যকে বলা হয় এসট্যাবলিশিং শটস। বিশ্বাস করুন, এ ছবির ১৭ রীল-এর কোথাও বিদেশকে এসটাবলিশ করার কোনো চেষ্টা নেই। যেমন ধরুন, বর্মার বাজারহাট, রাস্তা, বাড়ি, লোকজন কিছুই আমরা দেখি না। এবং ক্রমাগত সুলতা চৌধুরীকে বর্মী মেয়ে বলে বিশ্বাস করতে-করতে আমাদের কল্পনায় ছাতা পড়ে যায়। ঠিক তেমনি পরিচিত খিদিরপুর ডকটি একই পিপের গায়ে লেখা নামটি পালটে-পালটে কখনো হয় বেম্বুলা, আর কখনো ম্যাকাসার কিংবা অ্যাকাব। আমি জানি। অত কম টাকায় লোকেশান শুটিং সম্ভব নয়। কিন্তু, এটা কি পীযূষবাবু জানতেন না যে, 'পথের দাবী'র দাবিটা অনেক বড় অঙ্কের? দুধের তৃষ্ণা কি সাবান জলে সত্যিই মেটে?

তিন : এ ছবির অভিনয় প্রসঙ্গে এলে যেটা সবচেয়ে কষ্টকর বলে মনে হয়, তা হল, এমন কি উত্তমকুমারের অভিনয়েও যাত্রা-থিয়েটারের পাঞ্চ, অন্যান্যদের কথা ছেড়েই দিন। দুঃখ হয় এ-একথা ভাবতে যে উত্তমকুমার তাঁর সত্যিকার ক্ষমতা সম্বন্ধে চিরদিন কি উদাসীন, এবং কতিপয় পরিচালকদের প্রতি কি অপার তাঁর করুণা! ভারতী চরিত্রে জয়শ্রী রায় মিশরের প্রাচীন মমিদের মত। তাঁর অসীম শৈত্য আমাদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে।

শুধু সব্যসাচী ছবির একমাত্র 'কাঁচোয়া' সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয়। দৃশ্যের পর দৃশ্যকে শুধু তাঁর অভিনয়ের জোরে তিনি বাঁচিয়ে দেন। দু-একটি দৃশ্য বাদ দিলে আগাগোড়া তাঁর অভিনীত সুমিত্রাকে আমাদের ভালো লাগে। কি জিনিস তাঁর মধ্যে আজও আছে ও নষ্ট হচ্ছে সেটা আমরা মাঝেমধ্যেই এ ছবিতে বুঝতে পারি। কিন্তু সবটুকু বার করে আনতে একজন ঋত্বিকের প্রয়োজন।

চার : 'সব্যসাচী' ছবির আর একটি দারুণ দুর্বলতা হল এ ছবিতে ব্যবহৃত থিয়েটারী বা স্টেজি মেকআপ। মেকআপের ত্রুটির জন্যেই সব্যসাচীর বিভিন্ন মূর্তিতে উত্তমকুমার এতটুকুও অস্পষ্ট হতে পারেন না এবং ফলে তাঁকে চিনতে পুলিসী অপারগতা হাস্যকর হয়ে পড়ে। ভারতী ও সুমিত্রার উইগ বিন্যাস প্রায় কমিকের পর্যায়ে চলে যায়। এবং এই কেশ-বিন্যাসের মনমুগ্ধকর খেলায় পরিচালক এমনি মেতে ওঠেন যে, একাধিক দৃশ্যে হেয়ার-স্টাইল-এর কনটিনুয়িটি থাকে না। এবং যে জজসায়েব সব্যসাচীর বিচার করলেন তাঁর দাড়ি ও গোঁফের নারকেল-ছোবড়া আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে যে, তিনি রাত্রে ঘুমোন কি করে!

শুধু সুমিত্রার (সুপ্রিয়া দেবী) পোশাক কল্পনা অবিরলভাবে প্রশংসার্হ। সুমিত্রাকে আমরা একাধিক পোশাকে দেখি। এবং প্রতিবারেই লক্ষ করি, সেই দৃশ্যের মুড অনুযায়ী পোশাক ভাবা হয়েছে, যা বাংলা ছবিতে কদাচিৎ হয়। শ্রীমতী বিবি রায় এ-জন্যে দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন। এবং ভবিষ্যতে বাংলা ছবি তাঁর কাছে অনেক আশা করবে।

পরিশেষে একটি বিনীত নিবেদন আছে। পীযূষবাবুর 'সব্যসাচী' দেশ প্রেমের ছবি। অন্তত সে ছবিতে পোড়া বাংলা ভাষার ওপর আর একটু দরদী হতে পারতেন পরিচালক। ছবির টাইটেলস-এ বানান ভুল থাকা টালিগঞ্জের মহান ট্রেডিশন। কিন্তু দুঃখ হয়, যখন দেখি পীযূষবাবুর ছবিটি বাঙালী শহীদদের পুণ্য স্মৃতির 'উদ্দেশ্যে' নিবেদিত। জানি, শুধু একটি য-ফলার পার্থক্য, তবু সেখানেই আছে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার অভাব। —রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে—৩

বিজ্ঞান ভবনে আলোচনাচক্র একই সময়ে চলতে থাকলেও কৃষ্ণ শার সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ লোক হয়েছিল। "দ্য গ্রেট হোয়াইট হোপ" ছবির দুজন অভিনয় শিল্পী আর্ল জোনস ও সিসেলি টাইসনের সঙ্গে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। ভারতীয় বলে যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে কোন বাধা পেয়েছেন কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশা জানান যে, বরং উলটোটাই ঠিক। যুক্তরাষ্ট্রের এক টেলিভিশন স্টেশন ভারতীয় চরিত্র নিয়ে চিত্রনাট্য রচনার লোক খুঁজছিলেন এবং তাঁরাই কৃষ্ণ শাকে আবিষ্কার করেছেন। টেলিভিশন থেকে চলচ্চিত্র তো ছোট্ট একটা ধাপ মাত্র। শ্রীশা জানান যে, রবীন্দ্রনাথের "কিং অব দ্য ডার্ক চেম্বার" নাটকটি মঞ্চস্থ করা ছাড়া মঞ্চে বা চলচ্চিত্রে তিনি ভারতীয় চরিত্র নিয়ে কিছুই করেন নি। শ্রীশা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, যে ভারত বছরে পাঁচ শতাধিক ছবি তৈরি করে, সে-দেশ কেন অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে আফ্রিকার উন্নতিকামী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যৌথভাবে চিত্র প্রযোজনায় নামে না!

জেমস আর্ল জোনস এবং সিসেলি টাইসন প্রখ্যাত দুজন নিগ্রো শিল্পী।

ওঁদের সঙ্গে সাংবাদিকদের আলোচনাটা ছিল আমেরিকান ছবিতে কৃষ্ণকায়দের ভূমিকা নিয়ে। জোনস বললেন, প্রথম প্রথম আমেরিকান ছবিতে কৃষ্ণকায়রা বৎসামান্যই সুযোগ পেতেন। পরে আমেরিকান চিত্র-নির্মাতারা আবিষ্কার করলেন যে কৃষ্ণকায়-দের নিয়ে তোলা ছবির একটা বিরাট বাজার আছে সারা পৃথিবীতে। ফলে একটা নূতন যুগের সূচনা হল। এখন নিগ্রোদের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর ছবি হচ্ছে এবং কৃষ্ণকায়রা শ্বেতাঙ্গদের মতই সুযোগ পাচ্ছেন। জোনস এবং সিসেলি টাইসন দু'জনেই শ্রদ্ধা জানালেন সিডনি পইটিয়ারের (ডাকা হয় 'পয়-টে' নামে। ও'রাই আমাদের জানালেন) উদ্দেশ্যে—যিনি আমেরিকান ছবিতে কৃষ্ণকায়দের মর্যাদা এনে দিয়েছেন। সিসেলি টাইসন বললেন, আবেগের কোন রং নেই। আমি যদি ঠিকমত আবেগ প্রকাশ করতে পারি তবে অন্যের চেয়ে ভাল অভিনেত্রী বলে স্বীকৃতি পাবই। ইয়াংকি চিত্র প্রযোজকরা যখন কৃষ্ণকায়দের অমর্যাদা-সূচক ছবি তুলতেন তখন সেসব ছবিতে অভিনয় করতে রাজী হননি শ্রীমতী টাইসন। তিনি জানান যে, কোন অমানবিক ঘটনায় সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে একান্তই অনিচ্ছুক। শ্রীমতী টাইসন জানান তিনিই প্রথম নিগ্রো অভিনেত্রী যিনি টি-ভি-তে একটি সিরিয়াল অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছেন। সিরিজটির নাম "ইস্ট সাইড, ওয়েস্ট সাইড"। তিনি আরও জানালেন যে, তিনি কৃষ্ণকায় শিল্পী এই অজুহাতে কোন সুযোগ পেতে অনিচ্ছুক। তিনি সুযোগ চান, ভাল অভিনেত্রী হিসেবেই। তিনি "ব্লুবার্ড" নামে একটি রুশ-আমেরিকান যুগ্ম প্রযোজনায় নির্মিত ছবিতে এলিজাবেথ টেলরের সংগে অভিনয় করেছেন। এর আগে 'কমেডিয়ানস' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকায় ও'র সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তিনি বললেন, ফ্যান ম্যাগাজিনগুলি যাই বলুক না কেন, এলিজাবেথ একজন উত্তপ্ত ও স্নেহশীল ব্যক্তিত্ব। ও'র সঙ্গে কাজ করে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়।

সিসেলি টাইসন যখন মন্তব্য করলেন যে, আমেরিকায় ছবির বিরাট ব্ল্যাক মার্কেট আছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড হাস্যরোল। ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ না রেখে উনি জানিয়ে দিলেন, ওটি আসলে ব্ল্যাক পিপলের মার্কেট। কৃষ্ণ শা শীগগির ইনডো-আমেরিকান যুগ্ম প্রযোজনায় হিন্দী এবং ইংরিজিতে একটি ছবি করছেন। নামঃ শালিমার। ছটি বড় চরিত্রের তিনটিতে ভারতীয় শিল্পী এবং বাকি তিনটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাত শিল্পী থাকবেন।

এখন পর্যন্ত আমি উৎসবের সাতখানি ছবি দেখেছি। কোনটিই তেমন উচ্চ মানের নয়। তবে দুখানি কমেডি ছবি দেখে আনন্দ পেয়েছি। প্রথমটি ফ্রান্সের ছবি "হাউ টু গেট এ গুড নাইটস রেস্ট উইথ শার্লট"। অপরটি আমেরিকান ছবি "সাইলেন্ট মুভি"। তবে ফেস্টিভ্যালে সাধারণত কমেডি ছবি পুরস্কৃত হয় না।

—সুরঞ্জন

বদনাম/গান্ধর্ব

কিছু কিছু শিল্পকর্ম সময়লেখী নয়। এই শহরে যখন 'কিমিতিবাদী' নাটককে 'কিম্ভূতবাদী' বলার প্রবণতায় আমাদের আত্মতুষ্টি ছিল, তখন নিরলস নিষ্ঠায় যাঁরা অবিচল থেকে নতুন ধরনের নাটকের জন্য নতুন দর্শক তৈরী করেছিলেন, সেই গোষ্ঠীর নাম 'গান্ধর্ব'।

বহুরূপী 'রক্তকরবী' প্রযোজনা করে প্রমাণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দুরূহ নাটকেরও সফল মঞ্চায়ন সম্ভব। কিন্তু এখনও রবীন্দ্র নাটক অথবা গল্পের নাট্য-রূপে আমরা সব সময়েই একটা দূরত্ব রচনা করি। আড্ডায়, কলহাস্যে যাঁরা। অনায়াস, সাবলীল, স্পষ্ট, রবীন্দ্র সংগীত গাইতে বললেই তাঁদের উচ্চারণ ভঙ্গী পালটে যায়, যেন রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বাংলা নয়—ব্রজবুলি জাতীয় অন্য কিছু। সম্প্রতি এমন একটি প্রযোজনা দেখা গেল, সেখানে রবীন্দ্রনাথের গল্প সমকালীন চেহারা নিয়ে সকলের কাছাকাছি চলে আসে দক্ষ নির্দেশনায়। আমরা আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের 'বদনাম' গল্প অবলম্বনে, দুঃসাহসে ভর করে, আবারও মোড় ফেরবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সেই একই গোষ্ঠী, নাম 'গান্ধর্ব'।

রবীন্দ্রনাথের শেষতম পর্বের গল্প 'বদনাম'। ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। ভাষাকে অবিকৃত রেখে এর আগেও ওই গল্প নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নাট্য প্রযোজনা হয়েছে, মঞ্চে ও বেতারে। দর্শক এবং শ্রোতারা হয়ত 'সাধু, সাধু' বলে মৃদু বাহবা দিয়েছেন, কিন্তু ক ম্যুনিটি-কেশন ভেঙে এত একাত্ম, এত ভাসিত কখনও হতে পারেননি। নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও সংলাপে ও ঘটনায় সেই দূরত্ব রচনা করেননি, যা নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। নির্দেশক দেবকুমার ভট্টাচার্য তাঁর অভিনেতাদের নিয়ে সব সময় সেই অভিনয় করিয়েছেন, যা বাস্তবিক। চরম আবেগের মুহূর্তেও শিল্পীদের সংলাপ যুক্তিগ্রাহ্য। যে কোন অস্পষ্টতা, ধোঁয়াটে ভাব মূল উদ্দেশ্য বিচ্যুতি ঘটাত, দর্শককে স্পর্শ করতে পারত না। নির্দেশক সার জেনেছেন 'আলোরে যে লোপ করে খায়/সেই কুয়াশা সর্বনেশে'।

মূল কথক চরিত্রে মুকুর ভট্টাচার্য (বিজয় চৌধুরী) তাঁর কথা বলার স্টাইলে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত রাবীন্দ্রিক ঢং (শব্দটি আমরা ইচ্ছাকৃত নির্বাচন) ভেঙে দিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ কথা ভেঙে উচ্চারণ

করা, গিরিশকে [illegible] কিছুতেই তিনি দর্শকের [illegible] মুখোপাধ্যায় সৌদামিনী চরিত্রে রবীন্দ্র-নাথের নায়িকার অন্তরের যন্ত্রণা আরোপ করেছেন। তাঁর [illegible] পরিচিত জগতের। শিল্পী [illegible] তার আন্তরিকতা [illegible] আবার স্বামীর প্রতি [illegible] তার বুদ্ধি পরিষ্কার, [illegible] কেন যাবায় ফেলে না। অমিল চরিত্রে জগন্নাথ হালদারের আরও সহজ হওয়া দরকার—দরকার চরিত্রের গভীরে যাওয়ার জন্য। তিনি অন্তত সেই শিল্পী নন, যে 'হাওয়ার পথা, ঢেউয়ের সাথী'। নিতাই চরিত্রে মিনু চৌধুরীও একটি টাইপ চরিত্র যা আমাদের অত্যন্ত পরিবেশের। অসাধারণ অভিনয়ে সমৃদ্ধ আর একটি ছোট্ট ভূমিকা ছেদীলাল। শিবাজী সেন এক কথায় সামান্য অবকাশেই কামাল করে দিয়েছেন। একটি সার্থক টাইপ চরিত্র হিসেবে এই ভূমিকা বহুদিন আলোচিত হবে। অন্য দুটি চরিত্রে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিরুত দাশগুপ্ত কাজ চালিয়ে গেছেন। বিভিন্ন কম্পোজিশনের সুষময়, ছিমছাম মঞ্চসজ্জা (পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আলোর বৈচিত্র্য (মিনু চৌধুরী) গন্ধর্বের ঐতিহ্যকেই সুদৃঢ় করেছে।

প্রচলিত অভ্যাস বা বদভ্যাস ভাঙ্গার যে অফিসার ইংরাজী নিষিদ্ধ বই সম্পর্কে প্রবণতা সময় বিশেষে বিপর্যয়জনক। পুলিস অফিসার বিজয় চৌধুরী অনেক জায়গায় অতি অভিনয়ে ভাঁড় হয়ে গেছেন। যে অফিসার ইংরাজি নিষিদ্ধ বই সম্পর্কে খোঁজ রাখেন, তাঁর শেকস্পীয়র সম্পর্কে অজ্ঞতা বা 'বৃহস্পতি' উচ্চারণ নিয়ে বাড়া-বাড়ি (অলীকবাবু?) নিতান্তই রসিকতা। সৌদামিনী, ভাই ফোঁটায় অনিলকে দুর্লভ ফুলকপির সিঙাড়া খাওয়ায় এবং গত আট দিনের উপোসী অনিল প্লেটে খাবার দেখেই উঠে পড়ে। ঘটনাকাল ইংরেজ আমল, ঘরের এক দিকে লক্ষ্মীর আসন অন্যদিকে ইংরেজ সম্রাটের ছবি। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিতাই যে চলতি গানটি গায় 'নীলপরী স্বপনে জাগালে জাগল', সম্ভবত পঞ্চাশ দশকের 'দম্পতি' ফিল্মের গান (পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, সুর কমল দাশগুপ্ত, শিল্পী রবীন মজুমদার)। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে বিষয় মহিমা না বুঝে অনেকেই ভাঁড়ামী অথবা মেলোড্রামা করছেন কিন্তু দেবকুমার ভট্টাচার্য সেই জাতের নির্দেশক, বিষয় মহিমা রূপায়ণের দক্ষতা যাঁর অধিগত এবং দুঃসাহসে যাঁর সহজাত উত্তরাধিকার। এই ত্রুটিগুলি সহজেই শোধরানো যায়, যখন দেবকুমারবাবু নির্দেশক। এই উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা একালের দুঃসাহসী নাটকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হোক—স্পর্ধিত হিসেবে নয়। অন্যথায় রবীন্দ্রনাথের 'বদনাম' নিয়ে সংঘর্ষের বদনাম ঘটবার আশঙ্কা থাকে।

বহুদিন বাদে গন্ধর্বের পুনরাগমন। গন্ধর্বের আর এক নাম রুচি। অনেক দিন পরে হলেও প্রবেশপত্র থেকে প্রযোজনা পর্যন্ত সেই স্বকীয়তা অব্যাহত। —শুভায় ভবতু!

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

পিপাসা হায়...

গল্পে বস্তুত যত না ছিল চমক, অভি-নবত্ব ছিল অন্যত্র। রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা কি কাহিনীর নাট্যরূপও নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি উপাখ্যান নিয়ে রচিত নৃত্যনাট্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নেওয়া হল তাঁরই কিছু গানের। 'নীলাঞ্জনা' নামের নতুন সংস্থার নতুন ধরনের প্রয়াস 'পিপাসা হায়' (রবীন্দ্র সদন : ৩০ ডিসেম্বর)। নতুন এবং সাহসী এই প্রযোজনা উন্মোচিত করল একটি অপরূপ দিগন্ত। নতুন করে আর রচিত হবে না রবীন্দ্রনাথের কোনো গীতি বা নৃত্য-নাট্য। এই দুর্ভাগ্যময় সত্যকে মনে রেখেই বুঝি নীলাঞ্জনার এই নবতর প্রয়াস।

সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে মানসিক-তার দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত এই নৃত্যনাট্যের আখ্যানবস্তু কিছুটা [illegible]। [illegible]-মন্ডিত অন্ধকারে এক [illegible] পথিক এল জনপদবধূ বিশাখার [illegible]। বিশাখার অচরিতার্থ অতৃপ্ত [illegible] যৌবনে মুক্তির স্বাদ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল সেই পথিক। কিন্তু অন্ধ অনুশাসনে শৃঙ্খলিত বিশাখা সে-আহ্বানে সাড়া দিতে পারে নি। ফিরিয়ে দিয়েছে তার হৃদয়ের রাজাকে। এই অতৃপ্ত পিপাসার কাহিনী 'পিপাসা হায়'। এই কাহিনীর রচয়িতা সঞ্জয় বসু। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুষম ব্যবহারে এই প্রয়োগপ্রধানের কৃতিত্ব সব-ছাপিয়ে উজ্জ্বল।

অনুষ্ঠানটি নিশ্চিত শেষ মুহূর্তেও সম্পাদিত হয়েছে। 'শিবস্তোত্র' ছিল নৃত্য-নাট্যেরই অঙ্গ। সেটি বর্জিত। বদলে সুশীল চট্টোপাধ্যায়-এর কণ্ঠের একক সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল সে-দিনের অনুষ্ঠান।

বিশাখার দ্বন্দ্ব নৃত্যের ছন্দে নিপুণ-ভাবে তুলে ধরেছেন পলি গুহ। 'পথিক' বেশী সাধন গুহর সুযোগ তেমন দেখা গেল না। শম্ভু ভট্টাচার্যের 'সঙ্গী' ভঙ্গি-সর্বস্ব। বরং কৃষ্ণা দে (প্রথমা) প্রতি-শ্রুতিবাহী।

সাগর সেনের কণ্ঠে পথিকের গান অনায়াসে মাধুর্যমণ্ডিত। সতেজ গম্ভীর কণ্ঠের ঈষৎ ইশারা রেখে গেলেন অশোক বটব্যাল। পার্থ ঘোষের সংলাপ ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য স্বচ্ছন্দ। কিন্তু বড়ো বিস্ময় লেগেছিল সুমিত্রা বসুর সবময় নৈপুণ্য। সংগীত পরিচালনায় ও সহকারী সম্পাদনের গুরুভার ছিল তাঁর স্কন্ধে। সংলাপে তিনি মার্জিতা, সঙ্গীতে তিনি সম্পন্না। বিশাখার আকুল অন্ত-বেদনাকে আশ্চর্য গভীর করে নিবেদন করে-ছেন তিনি লাবণ্যময় ব্যাকুল উদাত্ত কণ্ঠের সুনিপুণ কারুকৃতিতে। বিশাখার দীর্ঘ-শ্বাস সুরের ভ্রমর হয়ে যেন গুনগুনিয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠে। —প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু (?) দ্বারা
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৫১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়, সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

অরণ্যদেব লী ফক

কোথায় বিক্রি করেছিস আমার বন্ধুকে?
ঐ নৌকোর মালিকের কাছে...

চল, ওকে ফিরিয়ে আনতে হবে।
আমরা দুজনেই তাহলে মারা পড়ব।

সপ্তদশ শতাব্দীর অরণ্যদেবের কাহিনী...
সমস্ত গ্রাম খুঁজেছি...
জঙ্গলও বাদ রাখিনি...
জুনকারকে কোথাও পেলে না?

এ লোকটা বড্ড বেয়াড়া, মালিক।
সুস্থ হয়ে না-উঠলে সমুদ্রে ফেলে দিবি!

এই জলটুকু খাও! সুস্থ না-হলে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে!
উঃ!

সত্যিই কি আমি কখনো সম্রাট ছিলাম? নাকি সবই স্বপ্ন?

6/20
এই বিপদে একমাত্র অরণ্যদেবই আমাকে সাহায্য করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তো কিছুই জানেন না।

জেমি তার বন্ধুকে সাহায্য করতে চলেছে।
আপনার বন্ধুকেও ফেরত পাবেন না... আপনিও মরবেন!
তাড়াতাড়ি লগি ঠেল তো!
৬০

চকলেট একটি—স্বাদের মজা দু'টি

ক্যাডবেরিস্

চকলেট এক্লেয়ার্স

বাচ্চারা খেতে খুব ভালবাসে
বড়দের মুখেও জল আসে

ক্যারামেলে ঘেরা
পুষ্টিকর মিষ্ট চকলেট

C-1 BEN

প্রদীপ্ত

ল্যাকমে স্যাটিন গ্লো লিকুইড মেক-আপ।

চমকপ্রদ

মৃদু বা মোহিনী, কিন্তু
সবসময় নয়নাভিরাম।

ল্যাকমে আই মেক-আপ।

সৌন্দর্যের সাধনায় ল্যাকমে

daCunha/L

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
দুলালের
তালমিছরি
৪ দত্ত পাড়া লেন কলিকাতা-৬ ফোন ৩৩৫৬৭৩

মেয়েদের
মনের কথা
প্রকাশ পায়
অনেক সুন্দর
পন্থায়
বিমল
তাদের
মধ্যে
একটি
VIMAL
A RELIANCE PRODUCT

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ মাধব ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "বিজয় উল্লাস" (কাঠ—২½'×১'×১')—ফুটবল মাঠের আনন্দের অভিব্যক্তি মাধব ধরেছেন সহজে কিন্তু চমৎকারভাবে। একটি মূল মূর্তি যেন ক্রমশ বড় হয়ে গেছে এবং তাকে ঘিরে আগে পিছে, উপরে আর নীচে ছেলে বুড়োর অধীর উত্তেজনা যেন উল্লাসে ফেটে পড়ছে। মানুষ-গুলোর বাস্তবানুগ রূপকে সরল করে নিয়ে একটি ছন্দময় সামঞ্জস্য ও গতিশীল নৃত্যভঙ্গিমার ওপর জোর দিয়েছেন। নাটকী মুহূর্তের সুষমাই তাঁর অন্বিষ্ট।

টোপাজ
প্রযুক্তিবিদ্যা এবং গুণোৎকর্ষের
ক্ষেত্রে সবার আগে
TOPAZ
STAINLESS
ক্রোম স্পাটারিং প্রক্রিয়া
টোপাজকে করে তুলেছে অনন্য এবং
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত…তাই অনেক
অনেক দেশের, অনেক অনেক
লোক টোপাজ পছন্দ করেন।
প্রতি ব্লেড
মাত্র
২৫
পয়সা*
* সর্বাধিক মূল্য
কর আলাদা
টোপাজ চলেছে অগ্রগতির পথে
বাকী সবাইকে পেছনে ফেলে

বিমল মিত্রের উপন্যাস

পতি পরম গুরু ৩৫·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

দিন যায় ৮·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দা-উপন্যাস

আলোকে আঁধারে ৭·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

সঙ্কট ৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর কাহিনী-সংকলন

তুমি কেমন আছো ৬·০০

বিমল করের উপন্যাস

যদুবংশ ৮·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প-সংকলন

হর্ষবর্ধন, নিত্যনূতন ৪·০০

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

[illegible] ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

বহু যুগের ওপার হতে ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

সূর্যসাক্ষী ২০·০০

নারায়ণ চক্রবর্তীর রহস্য-উপন্যাস

হলদে সবুজ ক্রিষ্ট্যাল ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

তুমি কে? ৪·০০

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম গোয়েন্দা-উপন্যাস | সপ্তদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বাদশাহী আংটি ৫.০০

প্র কা শি ত হ ল

সমসময়ের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক বললেই দিব্যেন্দু পালিত সম্পর্কে সব বলা হয় না। জীবন, মানুষ ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি এমনই অন্তর্ভেদী ও অন্যান্য লেখকদের চেয়ে এতই আলাদা যে, যে-কোনো গল্প-উপন্যাসেই পাঠকদের তিনি টেনে নিয়ে যান নতুন অভিজ্ঞতার ভেতরে—যেখানে সস্তা ও নাটুকে প্রেম-বিনিময়ের পরিবর্তে নারী ও পুরুষ বিনিময় করে তাদের দেহমনের অন্ধকার ও শূন্যতা, স্মৃতি-বিস্মৃতি নিয়ে আকাঙ্ক্ষা করে পরস্পরকে, তবুও অদৃষ্ট ও ঘটনাচক্রের টানা-পোড়েনে খেই হারিয়ে একা ও অসহায় চলে যায় কোনো অনমুভূত উপলব্ধির দিকে।

তাঁর সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস 'একা' এই সামগ্রিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবু, বিষয়, চরিত্র-চিত্রণ কিংবা কাহিনী ও পরিবেশের নতুনত্বে এই উপন্যাস এ-যাবৎ প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য ও বহু-আলোচিত উপন্যাসগুলি থেকে একেবারেই আলাদা; সমসাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমসূচক। এবং তা শুধু ইতিপূর্বে না-পাওয়া ওপরতলার সমাজের চাকচিক্যময় পটভূমি ও চরিত্র নির্বাচনের জন্যেই নয়। বস্তুত, এই উপন্যাসে পাওয়া ও হারানোর সূত্র ধরে দিব্যেন্দু পালিত স্ত্রী ও পুরুষের রক্ত-মাংস-মন-ও-আবেগময় সম্পর্ককে দান করেছেন এমনই এক তাৎপর্য, যা প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে ভাবাবে, করে তুলবে অন্যমনস্ক। হয়তো প্রত্যেকেই নিজেকে, নিজের ভূমিকা সম্পর্কে, নতুন করে জানতে শুরু করবেন।

কি নারী, কি পুরুষ, নিজের মধ্যে প্রত্যেকেই যে একা—বড় বেশী একা! ॥ দাম ৬·০০ ॥

দিব্যেন্দু পালিতের

নতুন উপন্যাস

একা

গিরিধারী কুণ্ডুর

ছোটদের জন্যে নতুন ধরনের কাহিনী

টংসা চু

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপন্যাস

নুনের পুতুল সাগরে ১০·০০

সমরজিৎ করের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী

একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস

আমরা ৪·০০

মতি নন্দীর উপন্যাস

কোনি ৬·০০

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬

শনিবার ২৯ মাঘ ১৩৮৩

সাংস্কৃতিক বিপদের সংকেত

শুধু সাংস্কৃতিক বিপদ নয়, সাধারণভাবে বলা চলে যে, সামাজিক জীবনের উপর একটি নতুন অনাচারের আধিপত্য অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিণামের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। জাতির সামাজিক ঐতিহ্যের অনুগত অনেক প্রথা বৃহত্তর জনস্বার্থ ও কল্যাণের সহায়ক না হলে সমাজ এবং সরকার উভয়েই সে-সব প্রথার উচ্ছেদ সাধন করতে প্রযত্নবান হয়ে থাকেন। সামাজিক সৌষ্ঠব এবং শান্তির এই সুরক্ষার কর্তব্যের মধ্যে প্রতিষেধক বিধি-নিষেধের প্রবর্তনও একটি প্রধান বিষয়। সামাজিক জীবনের আঘাত এবং ক্ষতির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর প্রতিকারে তৎপর হবার প্রয়োজন থাকলেও সেটা বিজ্ঞোচিত তৎপরতা নয়। যথাকালে, বিপদের সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠতেই প্রতিষেধক বিধি-নিষেধ কঠোর রূপে ও প্রকারে নির্দেশিত করা উচিত। যদি ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ঐতিহাসিক দুর্দৈবের নানা ঘটনার তথ্য বিচার এবং বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এই শিক্ষণীয় সত্যটিই প্রকট হয়ে পড়বে যে, সমাজ ও সরকারের নেতৃত্বক্ষমতার পদ অধিকার করে, জাতীয় কল্যাণের রথরজ্জু যাঁরা ধারণ করেছিলেন, তাঁদের ঔদাসীন্য অনিষ্ঠা এবং সামাজিক হিতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে শিক্ষার অভাবই অনাচারের উদ্ধত ক্রিয়াশক্তিকে যথাকালে দমন করবার উৎসাহ উজ্জীবিত হতে দেয়নি।

সমাজহিতের সুরক্ষা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক সত্যের এইটুকু উল্লেখ করে নিয়ে এইবার প্রসঙ্গের কথাটি বলে ফেলতে হয়। প্রসঙ্গ হলো, পূজা ও উৎসবের ক্ষেত্রে অশিক্ষা, যথেচ্ছাচার এবং লঘু উচ্ছৃংখলতার বিপুল আধিপত্য। সাম্প্রতিক সরস্বতী পূজার আনুষ্ঠানিক সমারোহের উল্লেখ করা চলে। পূজার আনুষ্ঠানিক রূপ এবং আনুষঙ্গিক উৎসবের রূপ-বৈচিত্র্য দুই-ই সমাজজীবনের পক্ষে সর্বনাশক কোন ক্ষতিকারক দৃশ্য বলে বিবেচিত হবে না, যদি দুই অনুষ্ঠানের ভিতর ও বাহিরের নিয়ামন নিতান্ত অনধিকারী কোন সংহতির অধীন হয়ে না পড়ে। কিন্তু কী দৃশ্য দেখা গেল, এই কলকাতা সহরে? কী দৃশ্য দেখা যায় প্রতি বৎসর? শহরের সমগ্র পূজা ও উৎসবের প্রায় পনের-আনা অংশ শিক্ষা-দীক্ষায় অর্বাচীন অথবা নিতান্ত নিঃস্ব এক শ্রেণীর যুবক ও কিশোরদের কোলাহল এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছার নানা অনাচারের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে সব চেয়ে গর্হিত দৃশ্য হলো, পল্লীর গৃহস্থদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ নামক এক দুঃসহ উৎপীড়নের নানা প্রগল্‌ভ ব্যস্ততা। এরা নিজেরাই শিক্ষায় ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান-ধারণায় যথোচিত পরিণতির নিকটসীমার কাছেও পৌঁছয়নি। তবু এরাই হলো ধর্মীয় উৎসবের প্রধান বিধায়ক। এদের উপর বিভিন্ন ধর্মীয় পূজা-অনুষ্ঠানের বাৎসরিক উদ্‌যাপনের কর্তব্য অর্পিত হয়েছে। কে যে কোন্‌ আইন এবং কোন্‌ নীতিতে এই শ্রেণীর দায়িত্ববোধে নিতান্ত খর্বতাগ্রস্ত এক শ্রেণীর ছোকরাকে ধর্মানুষ্ঠানের নেতা হবার অধিকার দিয়েছেন, সেটা বুঝতে পারা যায় না। তাই দেশের সরকারী নেতৃত্বকেই জিজ্ঞাসা করতে হয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সদাচারশীল সৌষ্ঠব বিকৃত করবার অবাধ এবং যথেচ্ছ অধিকার এ ধরনের নিতান্ত অযোগ্য জনতার উপর বর্তিয়ে গেল কেমন করে? দেশের সরকার এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন জানি না, কিন্তু দেশের শতকরা নব্বই জন পারিবারিক গৃহস্থ ব্যক্তির শিষ্ট অভিমতের বাণীতে এই অভিযোগই মুখরিত হয়ে থাকে যে সরকারের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সৌষ্ঠবের বিকার ও বিপদ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও দিনক্ষণ সমাপ্ত হয়ে যাবার পরেও দেখা যায় সারা শহর জুড়ে দেবতার মূর্তিকে বিসর্জনের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াচার ও বিধানের নির্দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অদ্ভুত এক হল্লাময় উল্লাসের প্রদর্শনীতে অচল করে রেখে দেওয়া হয়েছে। কেউ যথাবিহিত পূজাবসানের সাত দিন, কেউ বা দশ দিন, কেউ বা পনের দিন পরে প্রতিমার বিসর্জন সম্পন্ন করেন। উল্লাসের উৎকট ইচ্ছার হিসাবে দিন-ক্ষণের সমাপ্তি বলে কোন সত্য নেই। এ ধরনের অনাচার পাঁচ বছর আগেও ছিল না। এই অনাচার নতুন একটি সৃষ্টি। পথের উপর যাতায়াতের সুযোগ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করে, এক-একটি অনাচারী বাধার দুর্গের মতো পূজার মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে, এমন দৃশ্যের সংখ্যা অজস্র। চাঁদা সংগ্রহ করতে গিয়ে গৃহস্থ ব্যক্তিকে দাবির অংক শুনিয়ে বিরক্ত না করেছে, এমনতর সুষ্ঠু সংগ্রহের সংখ্যা কিন্তু অজস্র নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে যে দৃশ্য দেখা দেয়, সেটা এই যে, পাড়ার ছেলেরাই যেন ভাগে ভাগে দলবদ্ধ হয়ে পাড়ার জীবনকে অবমানিত করবার অভিযানে মত্ত হয়ে উঠেছে। অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলা হয় যে, পূজার নামে চাঁদা আদায় করবার কাজটি রূঢ় ও উদ্ধতরূপে পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে হাজার-হাজার তরুণ ও কিশোর মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি এক রকমের অত্যাচারিতায় অভ্যস্ত হবার শিক্ষা পেয়ে চলেছে। সন্ধান করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, পূজার অনুষ্ঠানে পূজার তুলনায় কোলাহলদানব মাইকের মর্যাদা ও সমাদর বেশি। পাড়ার কয়েকটি ছোকরা সম্মিলিত হয়ে একটা পূজা-পূজো আড়ম্বরের ভাব দেখালেই কি স্থানীয় শান্তির ঘাতকতা করবার অধিকার তারা পেয়ে যাবে? মাইকের অনাচার স্তব্ধ করে দেবার মতো যথার্থ ও বাস্তবতাসম্মত সাহস কেন যে সরকারের হয় না, সে এক গূঢ় রহস্য। অথচ এক্ষেত্রে জনমতের নিরানব্বই ভাগের দাবি এই যে, মাইকের অনাচার কঠোরভাবে দমন করা হোক। তিনটি প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সরকারকে আজ বুঝে দেখতে হবে (১) যাকে-তাকে পূজার বারোয়ারী অনুষ্ঠান করবার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না? (২) চাঁদা সংগ্রহের অনুমতি অত্যন্ত বিরল করবার এবং চাঁদার হিসাব সরকারী পরীক্ষার অধীন করা দরকার কি না? (৩) মাইক নামক চিৎকার-যন্ত্রের অপব্যবহার ও অনাচারের প্রতিকার সম্বন্ধে কঠোর বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন অপরিহার্য কি না? •

দৃশ্যপট

অবশেষে আচমকাই লোকসভার সাধারণ নির্বাচনটা এসে গেল। ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই অনবরত কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে প্রধানমন্ত্রী ৭৭-এর মার্চের মধ্যে নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করেননি। অনেকেই বলেছিলেন, বহু ভিত্তিহীন গুজবের মত এটাও একটা, এরকম গুজব মাঝেমধ্যেই বাজারে ছাড়া হয় ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই। দিল্লির একজন বিশিষ্ট অবাঙ্গালী সাংবাদিকের সঙ্গে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদিন কথা হচ্ছিল এই হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণার সম্ভাবনা নিয়ে। তিনি পুরোপুরি অবিশ্বাস করেছিলেন খবরটা এবং এটা কতটা অবিশ্বাস্য সংবাদ নির্বাচনী কমিশনের অফিসে গিয়ে সে খোঁজও নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, দেখে এলাম ওরা সব ঘুমোচ্ছে—ওরাও কেউ বিশ্বাস করেন না নির্বাচন ৭৭-এর গোড়ায় হতে পারে। তেমন কোনও সংবাদ বা প্রস্তুতি নির্বাচনী কমিশনে নেই।

শুধু যে বহু সাংবাদিক আচমকা লোকসভার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনাটা অবিশ্বাস করেছিলেন তাই নয়, বহু বিরোধী নেতা, এমন কি কংগ্রেস নেতাও বলেছিলেন নির্বাচন হচ্ছে না। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী আর চট করে নির্বাচনে যাবেন না। নির্বাচন ছাড়াই দীর্ঘদিন চালিয়ে যাবেন।

একথা অবশ্য গোপন নয় যে, শাসক দলের সর্বোচ্চ মহলে নির্বাচন নিয়ে মতভেদ ছিল। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, এখনই নির্বাচন করতে গেলে হয়তো জরুরী অবস্থার বাঁধুনী শিথিল হয়ে যাবে এবং সেটা সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। অন্যদের আবার বক্তব্য ছিল, নির্বাচন না করলে দেশে বিদেশে বিরূপ সমালোচনা বাড়বে। আর, এবার যা ফসল হয়েছে তাতে ৭৭-এর গোড়ায় নির্বাচন না করলে ৭৭-এর শেষে বা ৭৮-এ নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। সুতরাং, তাঁরা বলছিলেন, এ বছরের গোড়ায়ই নির্বাচনটা সেরে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

শেষ পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচন মারচে হতে চলেছে।

*

এই হঠাৎ ঘোষিত নির্বাচনে সব বিরোধী দল যোগ দেবেন কি না তা নিয়েও সন্দেহ ছিল গোড়ায়। এমন একটা কথা অনেকেই বলেছিলেন যে বিরোধী দলগুলি একজোট হয়ে নির্বাচন বয়কট করতে পারেন। সরকার কিন্তু জানতেন এ কথাটা সত্য নয়। সরকারের খবর ছিল যে নির্বাচন হলে বিরোধীরা তাতে যোগ দেবেনই—যদিও মুখে অনেক কথা বলবেন।

বিরোধী দলগুলির ভেতরে যে এই নির্বাচনে যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুটা কিছুটা মতভেদ আছে তারও অনেকটাই এখন পরিষ্কার। প্রায় প্রত্যেক দলের ভেতরেই এ নিয়ে কম-বেশি ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। কারু কারু বক্তব্য, এ নির্বাচন বয়কট করা উচিত। কেউ কেউ আবার বলছেন, নির্বাচন বয়কট করলেই বরং প্রধানমন্ত্রীর সুবিধা করে দেওয়া হবে। তার চেয়ে বরং নির্বাচনে যোগ দিয়ে দেখা উচিত নির্বাচন কতটা অবাধ হয়। যদি দেখা যায় নির্বাচন অবাধ হচ্ছে না তখন তাও দেশের সবাইকে জানান যাবে। বিদেশকেও দেখান যাবে। নির্বাচন বয়কট করলে সে সুযোগই মিলবে না।

বিরোধীদের অধিকাংশ বড় বড় নেতাও ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে যোগ দেওয়ার পক্ষে।

এই নির্বাচন অবশ্য ইতিমধ্যেই বিরোধীদের একটা খুব বড় উপকার করেছে। তাঁরা কার্যত একটা নতুন পারটি গঠন করেছেন। এই ধরনের বিরোধী দল গঠন নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক কথা হচ্ছিল। কিন্তু কাজের কাজ তেমন কিছু এগোচ্ছিল না। নির্বাচন হঠাৎ এভাবে ঘোষিত না হলে এবং হাতে এত কম সময় না থাকলে এত চট করে বিরোধীরা একজোট হতে পারতেন না। এখন যদি জনতা পারটি নির্বাচনে মোটামুটি একটা ভাল ফল করতে পারে তা হলে এই পারটি টিকে যাবে। এবং, ফলে ভারতের বিরোধী রাজনীতির চেহারা অনেকটা পালটে যাবে। ভারতের রাজনীতিতে একটা নতুনত্বও আসবে। আর যদি নির্বাচনী ফলাফল জনতা পারটির পক্ষে খুব খারাপ হয় তা হলে এই জোট ভেঙে যাবেই। জনতা পারটিরও মহাজোটের দশা হবে।

*

জনতা ফ্রনট এই নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীকে হারিয়ে দেবে একথা স্বদেশে বিদেশে খুব কম লোকই বিশ্বাস করছেন। জনতা পারটির নেতারাও তা আশা করছেন না। তবে, তাঁরা ভাবছেন মোটামুটি একটা ভাল ফল করবেন এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস দলের ভেতরে ও বাইরে শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা অনেকটা কমে যাবে।

দিল্লিতে যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, তাঁরা অবশ্য আশা করছেন কংগ্রেস ৪০০-র কাছাকাছি আসনে জিতবেই। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যতটুকু খারাপ হবে অন্যান্য রাজ্য তা পুষিয়ে দেবে। তাঁদের বক্তব্য এত অল্প সময়ের মধ্যে বিরোধীরা নির্বাচনী সংগঠন গড়ে তুলতে পারবেন না। তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা জোগাড় করাও অসম্ভব হবে। লোকসভার নির্বাচনে এবার প্রতি কেন্দ্রে অন্তত দু লক্ষ করে টাকা লাগবে।

জনতা পারটির নেতারা কিন্তু বলছেন, কংগ্রেস কিছুতেই ৩০০-র ওপরে যেতে পারবে না। বাকির অধিকাংশই জনতা ফ্রনট পাবে।

সবচেয়ে মজার জিনিস হল, কংগ্রেসের ভেতরে যাঁরা সি পি আই-পন্থী বলে পরিচিত তাঁরা এবং সি পি আই পারটিও চাইছে না কংগ্রেস ৩০০-র বেশি আসনে জিতুক। কারণ, কংগ্রেস ৪০০-র মত আসন পেলে শ্রীমতী গান্ধীর এবং সঞ্জয় গান্ধীর ক্ষমতা আরও বাড়বে। এবং, সি পি আই ও কংগ্রেসের ভেতরের সি পি আই-পন্থীদের অবস্থা তাতে আরও খারাপ হবে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সি পি আই ও সি পি আই-পন্থী কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হয়েছিল তা আরও জোরে আবার আরম্ভ হবে।

এই জন্যই জনতা ফ্রনটের মতই সি পি আই এবং সি পি আই-পন্থী কংগ্রেসীরাও চাইছেন যেন কংগ্রেস কিছুতেই ৩০০-র বেশি আসনে না জিততে পারে। কংগ্রেসের আসন যত বাড়বে ততই, যেমন জনতা পারটির ক্ষতি তেমনি ক্ষতি সি পি আই ও সি পি আই-পন্থী কংগ্রেসীদের।

৩০।১।৭৭

নবারুণ গুপ্ত

দুর্দিনের ঝড়

কী কাণ্ডই না দিন দুই হয়ে গেল মিশরে জানুয়ারি মাসের শেষ পক্ষে। মেহনতী মানুষ আর ছাত্ররা মিলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিল ১৮ জানুয়ারি গোড়ায় আলেকজান্দ্রিয়ায়; তারপর কায়রোতে। পরের দিন হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়লো বলতে গেলে গোটা দেশটায়। আলেকজান্দ্রিয়াতে ছ হাজার বন্দরকর্মী নেমে পড়েছিল পথে। তাদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল কায়রোর কাছাকাছি শিল্পকেন্দ্র হেলওয়ানের মজদুরেরা। বিকেল নাগাদ অশান্তির ঢেউ আছড়ে পড়েছিল কায়রোর বুকের ওপর। সেখানকার আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও হাত মিলিয়েছিল মেহনতী মানুষদের সঙ্গে। পুলিস হাঙ্গামা রুখতে পারেনি। ফৌজরাও না। অনেকের সন্দেহ তারা ইচ্ছে করেই আলগা দিয়েছিল, খুব বেশী কড়া হতে তারা চায়নি—কেন না খোলাখুলি হাঙ্গামাতে যোগ না দিলেও মনে মনে তারা সায় দিয়েছে হাঙ্গামায় মেতে ওঠা মজদুর আর পড়ুয়াদের কাজে। তারা আইন ভেঙে খুব একটা অন্যায় করছে এটা পাহারাদার পুলিস কী ফৌজীদের মনে হয়নি।

হাঙ্গামা অবিশ্যি অকারণে হয়নি। খামখাই হাজার হাজার মিশরী রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ দেখায়নি; সে-বিক্ষোভ সব সময় শান্তিপূর্ণও ছিল না। নাইট ক্লাব পুড়েছে, বড় হোটেলে আগুন লাগানো হয়েছে, বিস্তর বাড়ির জানলা দরজা ভেঙেছে। বোঝা যায় আক্রোশটা ছিল বড়লোকদের ওপর। হামলা তাদের পাড়ায় ওপরই বেশী হয়েছে। ছাত্ররা সরকার বিরোধী আওয়াজ তুললেও বিক্ষোভটা পুরোপুরি রাজনৈতিক ছিল না। 'নাসের ফিরে আসুন' বলে লোকে যে চেঁচিয়েছে তা রাজনৈতিক পালা বদল ঘটাবার জন্যে নয়, নিজেদের মনের জ্বালা বাইরে প্রকাশ করতে। নাসেরপন্থী কোনো কোনো নেতা অবিশ্যি লোককে তাতাতে চেষ্টা করেছেন—তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন বলেই হাঙ্গামা অতটা দানা বেঁধেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তারা রাজনীতির প্যাঁচ কষতে চায়নি—তারা পেটের জ্বালায় হন্যে হয়ে হল্লা বাধিয়েছিল প্রতিকারের প্রত্যাশায়। সে প্রত্যাশা তাদের পুরেছেও।

গোলটা বেধেছিল জিনিসপত্তরের দাম বাড়ানো নিয়ে। সে দাম কারবারীরা রাতারাতি মুনাফা লুটতে, বাড়িয়েছিলেন সরকার নিজে বাজেটে ঘাটতি কমাতে। মিশর গরিব দেশ। অন্য সব গরিব দেশের মতো সেও ভেবে পাচ্ছে না কী করে গরিবিয়ানা হটাবে। বিদেশী বন্ধুরা সাহায্য না করলে তার পক্ষে গরিবিয়ানা কাটিয়ে ওঠা শক্ত। এককালে তাকে সাহায্য দিয়েছে রুশিরা। তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন আদায়-কাঁচকলায়। নাসেরের সাবেক নীতি পালটে হালের রাষ্ট্রপতি সাদাত ঝুঁকেছেন পশ্চিমী দেশগুলোর দিকে। আরব রাষ্ট্রগুলোর সাহায্যও তিনি চাইছেন। আরব দোস্তরা তাঁকে বিমুখ করেনি। কিন্তু যতটা তিনি চান ততটা তাদের কাছ থেকে পাচ্ছেন না। তাঁর নীতি পালটানোতে পশ্চিমীরা খুশী। সাহায্য তাঁকে তাঁরা করতে অরাজী নন। কিন্তু তাদের টাকা দরিয়াতে ফেলতে নারাজ। সাদাত যদি ঘর সামলাতে না পারেন তা হলে তাঁকে একটি পয়সাও সাহায্য তারা দেবে না এই হচ্ছে তাদের সাফ কথা।

তার মানে হচ্ছে সাদাতকে চাপ কমাতে হবে সরকারী খরচাপাতি কমিয়ে। পশ্চিমীরা উপদেশ দিয়েছে প্রতিরক্ষা বাবদ খরচ কমাতে। তবে তিনিও জানেন, পশ্চিমীরাও জানে যদ্দিন ইস্রায়েলের সঙ্গে পাকাপাকি আপস একটা না হচ্ছে তদ্দিন সেটা সম্ভব নয়। তাই পশ্চিমীরা টাকা দিয়েছে দয়া-দাক্ষিণ্যের মাত্রা একটু কমাতে। মিশরে অনেক দরকারী জিনিসের দাম কমিয়ে রাখা হয়েছে সরকারী ভরতুকি দিয়ে। লোকে সে সব জিনিস সস্তায় পেলেও বিস্তর টাকা ও বাবদ বেরিয়ে যাচ্ছে সরকারী তহবিল থেকে। পশ্চিমী বন্ধুরা সাদাতকে পরামর্শ দিয়েছে ও বাবদ খরচ বন্ধ করতে—তা হলে বিস্তর টাকা বেঁচে যাবে। তাঁর অর্থমন্ত্রী আবদুল মোনেম কায়সুনিরও তাই মত। তাই জানুয়ারি মাসের সতেরোই সাদাত ঘোষণা করলেন, দরকারী জিনিসের ওপর ভরতুকি তুলে নেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মীদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হলো দশ টাকায় এক টাকা হিসেবে। সাদাত ভেবেছিলেন মাইনে বাড়ানো চিনি দিয়ে দরের তেতো ওষুধ লোককে তিনি গেলাতে পারবেন।

তা কিন্তু হলো না। ভরতুকি তুলে নেওয়ার দরুন চড়ে গেল রুটি, ডাল, চিনি, চা, সিগারেট, পেট্রোল আর রান্নার প্যাকেটের দাম। আর যায় কোথা। আগুন জ্বলে উঠলো গোটা দেশেই প্রায়। সাদাত তখন কায়রোতে ছিলেন না, গিয়েছিলেন আসওয়ানে হাওয়া বদলাতে। ব্যাপার দেখে তিনি দৌড়ে এলেন রাজধানীতে। বেগতিক দেখে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। আর জল ঘোলা না করে তিনি হুকুম দিলেন ভরতুকি তুলে নেওয়ার নির্দেশ খারিজ করে দিয়ে। তবে মাইনে বাড়ার হুকুম বহাল রইলো। তখন লোকের বুকে প্রাণ এলো—হাঙ্গামার আগুনও নিবে গেল, এক নিমেষে শান্তি আর স্বস্তি ফিরে এসেছে গোটা মিশরে। সাদাত গদিয়ান রাষ্ট্রপতি হয়েই রইলেন মিশরে। তাঁর ওপর লোকের রাগ নেই। আজ তাঁকে তারা বীর পুরুষ বলে মনে করে। ১৯৭১-এর লড়াইয়ে তিনি মিশরীদের মান বাঁচিয়েছেন একথা লোকে এখনও ভোলেনি। তবে তাঁর খাতিরেও তারা বড় দরের চাবুক বরদাস্ত করতে নারাজ।

উপস্থিত বিপদ কাটিয়ে উঠলেও সাদাতের ফাঁড়া কাটেনি। দেশের আর্থিক ব্যবস্থা যদি ভেঙে পড়ে তা হলে তো আর লোকে তাঁকে রেয়াত করবে না। কিন্তু তা তিনি সামলাবেন কী করে? কে তাঁর পাশে, এসে দাঁড়াবে তাঁকে রক্ষে করতে? মরে গেলেও রুশীদের দরজা তিনি মাড়াবেন না। তিনি তো বলে বেড়াচ্ছেন, যত নষ্টের মূল হচ্ছে দেশী কম্যুনিস্টরা—লোককে তারাই ভুল বুঝিয়ে ক্ষেপিয়েছে। গতিক দেখে পশ্চিমীরাও খানিকটা নরম হয়েছে। পশ্চিমী দাওয়াই যে মিশরে খাটবে না তা তারা বুঝেছে। সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে এমন একটা উপায় তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পথে এসেছে মিশরের আরবী বন্ধুরাও। অর্থাৎ আরব আর কুয়ায়েতও এখন মিশরকে আরও সাহায্য দিতে তৈরি। মিশরের জানুয়ারি মাসের দু দিনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ বিফলে গেছে বলে মনে হলো না—টনক নড়েছে তাতে ঘরে বাইরে অনেকেরই।

দেবরাজ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

মালায়লম ছোট গল্প

কেরালা সাহিত্য আকাদমি মালায়লম ছোট গল্পের একটি চমৎকার সংকলন প্রকাশ করেছেন। সংকলনটি অবশ্য ইংরেজী ভাষাতেই করা হয়েছে যাতে মালায়লম ভাষা জানেন না এমন পাঠক সহজেই ওই ভাষার ছোট গল্প সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারেন। আমার মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে মালায়লম ছোট গল্পের প্রাচীন ও নবীন ধারাটির পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই কেরালা সাহিত্য আকাদমির প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হোক।

মোট সাতাশটি গল্প নিয়ে এই সংকলন। সম্পাদনা যিনি করেছেন তাঁর নাম অবশ্য নেই, এমন কি বোঝা যায় না যিনি এই গ্রন্থের কুড়ি বাইশ পাতার দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন—অধ্যাপক সুকুমার আঝিকোদে—সম্পাদনার কাজটি করেছেন কিনা! ভূমিকা লেখককেই সব সময় সম্পাদনা করতে হবে—এমন কোনো কথা নেই; আবার হতেও পারে এই দায়িত্বের ঝারো আনাই এক্ষেত্রে অধ্যাপক আঝিকোদেকে বইতে হয়েছে।

ভূমিকাটি কিন্তু চমৎকার। আমরা যারা অধিকাংশই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর রাখতে পারি না—ভাষাগত বাধা ও ব্যবধানের জন্যে তেমন পাঠক এই ভূমিকাটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন। যেমন আমরা জানতে পারি, মালায়লম ভাষায় প্রথম ছোট গল্প লেখা হয় ১৮৯১ সালে। যদি তার আগে হয়ে থাকে—তার কোনো প্রমাণ এ-যাবৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মালায়লম ভাষায় সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা যদিও ১৮৪৭ সাল থেকে ছাপা হতে শুরু হয়েছিল তবু আরও প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে 'বিদ্যা বিনোদিনী' পত্রিকায় কেশরী কুনহীরামন নায়ানার 'বাসনা বিকৃতি' নামে যা রচনা করেন সেটিই ঐতিহাসিক ভাবে প্রথম মালায়লম ছোট গল্প। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে—ওই সময় বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি লেখা শেষ করে ফেলেছেন, ১৮৬৫ সাল বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ হয়ে গেছে, কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল আনন্দমঠ রাজসিংহ এবং আরও একাধিক লেখা বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় যখন এত ঘটনা ঘটে গেছে মালায়লম সাহিত্যে তখন ছোট গল্পও দেখা দেয়নি। অবশ্য বাংলা ভাষায় কবে, কোন পত্রিকায় প্রথম ছোট গল্প ছাপা হয়েছিল তা গবেষণা করার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা ছোট গল্পের লেখক হিসেবে ধরি না।

মালায়লম সাহিত্যে ছোট গল্পের বয়েস বেশী নয়, বছর আশি পঁচাশি। এর মধ্যে প্রথম পনেরো কুড়ি বছর এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কেউ কেউ গল্প লিখেছেন, ছাপাও হয়েছে কিন্তু বিশেষ কোনো আলোড়ন দেখা যায়নি। তিরিশ দশক থেকে মালায়লম ছোট গল্পের সুদিন আসে। কৃষ্ণ পিল্লাই, পদ্মভান, ও কে মেনন প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকরা ছোট গল্পকে তাঁদের সাহিত্যে স্থায়ী করে রেখে যান।

গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে মালায়লম ছোট গল্পের অগ্রগতি ঘটেছে নানাভাবে, পুরাতন লেখকদের ধ্যান ধারণা, সামাজিক বোধ, সাহিত্যরুচিকে পাশ কাটিয়ে নতুন লেখকরা দেখা দিয়েছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যাঁরা সব প্রখ্যাত লেখক আসর জমিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের পাশাপাশি নতুন একদল লেখক আসেন যাঁরা ভীষণভাবে সমাজসচেতন হয়ে তাঁদের লেখা শুরু করেন। বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা, গোঁড়া ধর্মীয় সংস্কার, আচার, অনাচারের বিরুদ্ধে ওই লেখকরা প্রতিবাদ জানালেন প্রতিবাদ সাহিত্য যদি বা নাই বলি—বলা দরকার এই সাহিত্য একটি নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ বালকৃষ্ণ পিল্লাই কিংবা ভি মহাম্মদ বসিরকে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পর আবার একদল তরুণ লেখক মালায়লম সাহিত্যে দেখা দিয়েছেন যাঁরা আমাদের বাঙালী আধুনিক লেখকদের সগোত্র। এঁরা আমাদেরই মতন হতাশায় ভুগছেন। হতাশার কারণ, তাঁদের সব মোহ দূর হয়ে গেছে। কাজেই বাইরের পৃথিবী বাতিল করে নিজেদের অন্তরের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন, এই সমাজের রীতিনীতি আচার সম্পর্কে তাঁদের কোথাও কোনও মমতা বা মোহ নেই। বাসুদেব নায়ার, এম পি মুহাম্মদ, রাজলক্ষ্মী, জি এন পানিকর প্রভৃতিকে আমরা সব সময়েই মনে রাখব।

গ্রন্থে সংকলিত সাতাশটি গল্পের মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্পই আমাদের ভাল লাগে। যেমন ভি এম বসিরের 'দি গোল্ড রিং', বাসুদেব নায়ারের 'দি এলিফ্যান্ট ট্র্যাপ', এন পি মুহাম্মদের গল্প 'দি কক রু প্রাইস'। ডি কে এন এবং সরস্বতী আম্মার গল্পটিও সুন্দর।

অভিনন্দ

Malayalam Short Stories, (An anthology). Kerala Sahitya Akademi. Sole Distributors: Orient Longman. Rs 25/-

দৃষ্টিকোণ

নিয়মিত কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে 'দৃষ্টিকোণ' নামে একটি নতুন বিভাগ দেশ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা থেকে সংযোজিত হল। 'দৃষ্টিকোণ'-এর রচনাগুলি সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে, এগুলি প্রধানত হালকা প্রবন্ধের মেজাজে লেখা। বিষয়ের বৈচিত্র্য অবশ্যই এর অন্যতম আকর্ষণ হবে। বিশেষ কোনো লেখকই এই বিভাগের সমস্ত রচনা লিখবেন না, বিভিন্ন লেখক নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলি লিখবেন। তত্ত্ব বা তথ্য দিয়ে সাধারণত কোনো রচনাই ভারাক্রান্ত করার ইচ্ছে লেখকদের না থাকলেও এই জাতীয় রচনাকে শুধুমাত্র রম্য করাও তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। হয়ত বিতর্কিত বিষয়ও থাকবে। মতান্তর ঘটার অবকাশও।

কবে কতকাল আগে কোন সুদূর কৈশোরে শেষ রাতে জেগে উঠে শোবার ঘরের টিনের চালে আর বাগানে ঝরে-পড়া শুকনো পাতায় শিশিরের শব্দ শুনেছিলাম, আজো মন থেকে খারিজ হয়ে গেল না। মহানগরীর দিনরাত্রির কোমল-কর্কশ ধ্বনিতরঙ্গ ছাপিয়ে সুদূরে শিশিরের শব্দ রয়ে গেল কানের মধ্যের পরিমিত বাতাসে।

সারা জীবন দুটো কানের ভিতরে দুটো ছোট চাকা ঘুরতেই থাকে, অজস্র শব্দ টেপ করে রাখি। তার বেশির ভাগই মুছে যায়। অনেক শব্দ আবার প্রিয় প্রতিবেশী পেয়ে, অনুষঙ্গ পেয়ে গিয়ে পরস্পরের অঙ্গে-অঙ্গে মিশে যায়, মিলেমিশে একাকার হয়ে অস্পষ্ট অলৌকিক হয়ে যায়। শুধু একটি-দুটি শব্দ কখনো মুছে যায় না, মৌল চরিত্রে তাজা থাকে, মাঝেমাঝেই রিনরিন করে বেজে ওঠে।

একটি কবিতায় এক নির্জন দ্বীপবাসিনী নারী একখানা ছোট নৌকোয় বসে আছে রাজহংসীর মতন। তার সাদা সিল্কের পোশাকের ওপর মৃদু জ্যোৎস্না। নৌকোয় মাঝি নেই। নদীর স্রোতে আলতো ভেসে যাচ্ছে নৌকো। কবি বললেন, কুয়াশার
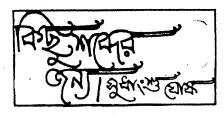
ভিতর দিয়ে যাওয়ার মতন রাত্রির রহস্যময় শব্দমালার ভিতর দিয়ে নৌকো ভেসে যায়। কিসের শব্দ, কেমন শব্দ কবি খুঁটিয়ে বললেন না। বলতে নেই। বললে জাদু থাকে না। আর জাদু না থাকলে কবিতা কোথায়? যেহেতু কুয়াশার সঙ্গে তুলনা, ওই শব্দমালা যতটা শোনবার তার থেকে অনেক বেশি দেখবার। ওই বিদেশী কবিতায় বাঙালী পাঠকের সঙ্গত কারণে মনে পড়ে যায় —'প্রথম আলোর চরণধ্বনি।' সেখানে অবশ্য আলো যতটা দেখবার তার থেকে বেশি শোনবার। ওই বিখ্যাত বিদেশী কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কানের টেপ থেকে 'রাত্রির রহস্যময় শব্দমালা' চট করে মুছে যায় না, যদিও সেই শব্দ স্পষ্ট শোনা যায় নি। অনেক শব্দই তো স্পষ্ট শোনা যায় না। যেমন একালের বাংলা গল্প-উপন্যাসে প্রায়শই পড়ি—'অনুচ্চারিত চিৎকার।' স্পষ্ট শুনতে পাই না, তবু তো কথাটা সানন্দে গ্রহণ করি।

কুড়ি বছর বয়েস পর্যন্ত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তারপর আর সব শুধু স্মৃতি। তাই তো বারবার ঘাঁটা পুরনো কাসুন্দি।

তখনো দেশভাগ হয় নি। পূর্ব বাঙলার প্রান্ত থেকে গান্ধীজী ডেকেছেন কলকাতায় কংগ্রেস-ইউনিয়নের সম্পাদকদের। রাতের ট্রেন যাচ্ছে ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে দিয়ে। কামরায় অসম্ভব ভিড়, আলো নেই। ছোট স্টেশনে ট্রেন থামছে না, তবে স্টেশন পেরিয়ে যাবার সময় এক-একবার আলোর ঝাপটা লাগছে কামরায়। সেই আলোয় দেখেছি, কোণের বেঞ্চিতে একটি মেয়ে বসে আছে। তার মুখ খুব ফরসা, তার গায়ে জড়ানো কুচকুচে কালো চাদর। আমরা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। বসেছি অন্যদের পায়ের কাছে। বেঞ্চিতে আমরা কেউ বসতে পারি নি। দারুণ শীত, ট্রেনের গর্জন, চাপাচাপি ভিড়, অন্ধকার। এরমধ্যে একটি সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। কোণের বেঞ্চির তরুণীটি গানের মতন টানাটানা কয়েকটি কথা বলেছিল : 'বসুন, কম্বলটা দি-তা-ম।' আমার পাশে মেঝের-বসা আমার বয়েসী একটি ছেলে গলা চড়িয়ে বলেছিল : 'না লাগে।' তারপর থেকে জীবনে যতবার রুক্ষ ভূমিতে ধুলো ময়লায় বসতে হয়েছে ততবারই কানের মধ্যে বেজে উঠেছে ওই কয়েকটি কথা : 'কম্বলটা দি-তা-ম।' সত্যিই কি আর বেজে উঠেছে? আমিই কেবল চেয়েছি, বেজে উঠুক। ধুলোময়লায় কম্বলের আধখানা পেতে তার ওপর বসি, আর আধখানা গায়ে জড়িয়ে শীত থেকে বাঁচি।

একজনকে জানি, একটি মাত্র শব্দ যার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। দূরে পাহাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল, যেখানে তখনো ভ্রমণবিলাসীরা দলে দলে যেত না। এক রাত্তিরে সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় সে একা বেরিয়েছে। বাইরে খুব ঠান্ডা, যদিও রাত মোটেই বেশি হয় নি। ছোট্ট দোকানটা থেকে সিগারেট কিনে পাইন গাছের পাতায় ফাঁক দিয়ে প্রায় গোল চাঁদ দেখতে পেল আকাশে। একশো গজ এগিয়ে গেলেই পাহাড়ী রাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালে সামনে পাহাড়ের বরফে ঢাকা তিনটে চুড়ো দেখা যাবে যার ওপর জ্যোৎস্না ঝলসাচ্ছে। পায়ে পায়ে বাঁকের কাছে যেতে সে দেখতে পেল, ঠিক সেখানেই একা দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। দূরের বরফে ঢাকা চুড়োর দিকে তাকিয়ে আছে। আশপাশে মানুষজন নেই। কেমন যেন অলৌকিক। তার পায়ের আওয়াজ শুনেছিল মেয়েটি। তার দিকে ফিরল। সে তো বুঝতে পারে নি, বরফের ওপর থেকে প্রতিফলিত আলো তার নিজের মুখে এসে পড়েছে। থামাল। আর তখনই একটি শব্দ—'আপনি?' প্রশ্নসূচক শব্দটিতে সানন্দ বিস্ময় মেশানো ছিল। একটানা ঝিঁঝির ডাক যেন থেমে গেল, সেই একটি মাত্র শব্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বনস্থলী।

পাঁচ ছ' বছর আগে চেনা ছিল। আজকের আগে এর মধ্যে আর দেখা হয় নি। মেয়েটি তার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। হোটেলের ঘরে তাদের একটু নিরিবিলি [illegible] সুযোগ দিয়ে সে স্নো-পিক দেখতে এসেছে একা।

এর পর আর একা নয়। দুজনে মিলে জীবন কাটাতে গিয়ে অনেক শীতগ্রীষ্ম মাখতে হল গায়। প্রতিদিনের ধুলোবালিতে ছিমছাম শৈলাবাসের শৌখিনতা থাকে না। কর্কশ কথা হয়, প্রতিফলিত আলো মুছে গিয়ে ছায়া নামে ম্লান মুখে। তবু

এখনো রাত্তির এবং দিনেও কোনো কোনো বিরল সময়ে সে একটি সানন্দ বিস্ময় মেশানো প্রশ্নসূচক শব্দ শুনতে পায়—'আপনি?'

রাত্তিরে ঘুম না হওয়া বড় খারাপ অসুখ। তথাপি সবারই বোধ হয় এই অসুখ অন্তত সাময়িকভাবে হওয়া একরকম ভালো। তাহলে অনেক বিচিত্র শব্দের সঙ্গে চেনাশোনা হয়ে যায়। শরীর বেড়ে ওঠার সময়ে বছর দশেক রাত জাগার চাকরি করেছিলাম। ফলে এখনো নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে অকারণে রাত জাগি। সারাদিনের অভিজ্ঞতার ছেঁড়াছোঁড়া টুকরো চড়ুই পাখির মতন জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে, আবার উড়ে যায় ফুড়ুত করে। খবর কাগজের স্তূপের ওপর দিয়ে একটা আরশোলা হেঁটে গেলে কানের ভিতরের রেকর্ডে গ্রামোফোনের পিন ঘষার শব্দ পাই। রাতের রহস্যময় শব্দমালার কারো কারো সঙ্গে আমার অনেক কালের দোস্তি। আমার শোবার ঘর থেকে গঙ্গার দূরত্ব আধ মাইলের বেশি নয়। মধ্যরাতে আমি গঙ্গার দিক থেকে একটি চেনা শব্দ আসবার অপেক্ষায় থাকি। কপাল ভালো হলে শব্দটা আসে। টহলদার লঞ্চের গম্ভীর ভোঁ। শব্দটা আমাকে টেনে নিয়ে যায় শৈশবে। যেন আজো শুয়ে আছি টিনের চালের তলায় মাটির মেঝের ওপর তক্তপোশে। কাছেই নদীর ঘাটে ভোরবেলার স্টিমারের ভোঁ। লাফিয়ে উঠে চোখ মুছতে মুছতে ছুটে যাই। স্টিমারের আশপাশে ছোট ছোট ডিঙি নৌকো থেকে নামে অজস্র রুপোলি ইলিশ। পুরো চোখ মেলে তাকাই। এই সব ছেলেমানুষি ভাবনা বোজা চোখের ভিতর দিয়ে ভেসে যায়, টহলদার লঞ্চের গম্ভীর ভোঁ আর শোনা যায় না। তখন এক অদ্ভুত তৃপ্তি আসে, বাকী রাতটুকু মোটামুটি ঘুমোই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফোর্ট উইলিয়ম আর দমদমের মধ্যে অবিরাম মিলিটারি ট্রাক চলাচল করত। সেই যুদ্ধের শেষাশেষি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে সন্ধ্যের পর বাঁই বাঁই করে সাইকেল চালিয়ে ফিরছি। ব্ল্যাক-আউট, আমার সাইকেলের আলোটা বড় কৃপণ। কী যে হল! বোধ হয় একটা খাঁজের মধ্যে সাইকেলের সামনের চাকা সেঁধিয়ে গেল। একটা উঁচু সেতু থেকে নেমে আসছিলাম বলে গতি তীব্রতর হয়েছিল। ডান দিকে কাত হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলাম। মিলিটারি ট্রাক আসছিল দারুণ বেগে, তবে তখনো বেশ দূরে। কিন্তু যেহেতু তিন সেকেন্ড রাস্তায় আসফল্টের ওপর আমার ডান কান পাতা, মনে হল মিলিটারি ট্রাকের ভারী বীভৎস চাকা যায় দু গজ দূরে। সেই চাকার মারাত্মক শব্দটা খুলিতে রয়ে গেছে, ঝেড়ে ফেলা যায়নি।

সার্থক সিনেমা-থিয়েটারে নাকি সত্যিকার জীবনের খণ্ডিত অংশের প্রতিভাস উপস্থাপিত, যার ফলে ড্রামাটিক ইলিউশন তৈরী হয়। এসব তত্ত্বকথায় না গিয়েও বলা যায়, সিনেমা-থিয়েটারের কিছু শব্দও আমাদের কানের মধ্যের টেপ থেকে চট করে মুছে যায় না। অল্প দিন আগে আরো কয়েকটি পুরনো ছবির সঙ্গে 'মুক্তি' ছবিটি দেখানো হল। দেখলাম। প্রায় শুরুতেই প্রমথেশ বড়ুয়া ছবি আঁকার তুলির উলটো দিক দিয়ে বন্ধ দরজায় দুটো আলতো ঘা দিলেন—ঠক ঠক। যার মানে—'আমি!' বেশ ভালো, চমৎকার। শব্দটা রয়ে গেল। একটি নাটকে তৃপ্তি মিত্রের গলায় একটি তীক্ষ্ণ বিলম্বিত ডাক শোনা গিয়েছিল—'রাধু-উ-উ!' কয়লাখনির খাদে নেমেছিল রাধু, আর ওঠে নি। প্রচুর দাপাদাপির পর খনি এলাকা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, এখানে-ওখানে কয়েকটা বাতি দপদপ করে জ্বলছে, তার মধ্যে দিয়ে রাধুর কণ্ঠের ওই ডাক ভেসে বেড়াচ্ছে ক্রমবিলীয়মান তরঙ্গে। নতুন নাট্য আন্দোলনের প্রথম দিকের ঘটনা। তারপর বেশ কিছু ছবি ও নাটকে এই ধরনের ডাক কারণে এবং অকারণেও প্রযুক্ত হতে শুনেছি।

শেকসপীয়রের 'অথেলো' নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে একাধিকবার। ওই নাটক নিয়ে একবার একটি ছবি নির্মাণ করেছিলেন অরসন ওয়েলস। সাদা এবং কালো, রঙিনও ছিল না। সেই ছবিতে প্রযুক্ত একটি ধ্বনিতরঙ্গ সহজে মুছে যাবে না। ডেসডিমোনার ঘরের দরজার পর্দা বড় বড় ধাতুনির্মিত আংটি থেকে ঝুলছে। পর্দাটি মাঝখানে কেটে দু ভাগ করা। অথেলো সেই পর্দা দু হাতে দুদিকে সরিয়ে ডেসডিমোনার ঘরে ঢোকে। গোড়ার দিকে অথেলো আলতো আঘাতে পর্দা সরায়। আংটিগুলো পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে টুংটুং করে মধুর শব্দ তোলে। যেন জলতরঙ্গ বাজে। ক্রমে বিষাক্ত হতে থাকে অথেলোর মন, আর ওই শব্দটা প্রতিবারই আরো-আরো কর্কশ হয়ে ওঠে। প্রিয়তমাকে খুন করার আগে তার ঘরে ঢোকার সময় অথেলো দু হাতের দারুণ ক্ষিপ্র আঘাতে দু দিকে পর্দা সরায়। ধাতব আংটিগুলো তখন যে-ধ্বনি শোনায় তা দুটো তীক্ষ্ণ তলোয়ার পরস্পরের গায়ে ঘষার শব্দের মতন। সেই শব্দ কেটে বসে যায় হৃৎপিণ্ডে। পুরো ছবিটার আর সব দর্শকরা ভুলে গেলেও ওই শব্দের রেশ থেকে যায় কানের ভিতরে।

'পথের পাঁচালী'-র শেষ দিকে হরিহরের বুক থেকে একটি চিৎকার উৎসারিত—'দুর্গা-আ-আ!' সেই চিৎকারের দীর্ঘ বিন্দুতে তারসানাই। সেই চিৎকার তো একাধিক বাংলা গল্পে ধরে রাখা হয়েছে। আর কবে সিনেমায় সংযুক্ত শব্দ সাহিত্যে এমন স্থান পেয়েছে মনে পড়ে না। একটু অন্যরকম দৃষ্টান্ত অবশ্য অগুনতি। এক তরুণ কবিকে জানি, যে রাত জেগে সরোদ শুনে এসে সকালবেলায় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাটি লিখেছে।

এ যুগের চলচ্চিত্র যেহেতু সরব, ছবিতে স্মরণীয় শব্দ প্রয়োগের নজির নিশ্চয়ই বিরল নয়। কিন্তু সত্যজিত রায়ের 'অপরাজিত' ছবিটিতে সংযুক্ত একটি ক্ষণস্থায়ী শব্দের তুলনা আমি দেশী-বিদেশী কোনো ছবিতে আজ পর্যন্ত পাই নি। অপুর ঘরের কাছেই একটি খেলা চলছে। খেলাটির লৌকিক নাম—'মাদারি কা খেল।' বছর দশেকের একটা রোগা কালো ছেলে—হাতখানেক লম্বা ময়লা ন্যাকড়ায় লজ্জা ঢেকেছে—দু পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ওপর দিকে তোলা—হাঁটুর নিচের অংশ কাঁধের পাশ দিয়ে তলায় ঝুলছে—দু হাতের তালু মাটিতে পাতা—হাতের ওপর ছোট্ট শরীরের ভার রেখে স্বল্প পরিসরে ঘুরঘুর করছে, ঘুরঘুর করছে। তার চলার তালে তালে ডিমিডিমি ঢোলক বাজাচ্ছে একজন। প্রতিবেশীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই খেলা। একখানা ধুতির এক পাশ পরে, অন্য পাশ গায়ে জড়িয়ে অপু এগিয়ে এল। ভিড় ঠেলে উঁকি দিয়ে একবার দেখল ছেলেটাকে। চোখে বিরক্তি, ঘৃণা এবং অনুকম্পা মেশানো। খেলোয়াড় ছেলেটাকে একটা বাঁদরের থেকেও কুৎসিত দেখাচ্ছিল। মানুষের এমন অপমান খুব ভোঁতা মন না হলে চোখ খুলে দেখা যায় না। অপু ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছে। যেতে যেতে ভাবছে, এই ছোট গণ্ডি পেরিয়ে দূরে চলে যাবে যেখানে জীবন অনেক বড়। তার এই ভাবনা ছবিটিতে একটি অনন্য শব্দে রূপ পেয়েছে। উঁচু মাটির ঢিবির ওপর অপুর খড়োঘর। যেখানে উঠোন শেষ এবং ঢালু জমি শুরু সেখানে একসার কলাগাছ। অপু তীব্র ক্ষোভ এবং বিরক্তির সঙ্গে একটা কলাগাছে হাতের সবটুকু জোর দিয়ে ধাক্কা দিল। তখন সেই অনন্য শব্দ। মাটির তলায় কলাগাছের একটা শিকড় ছিঁড়ে গেল। কটাং করে একটি ক্ষণস্থায়ী চাপা শব্দ উঠে এসে ঘা মারল দর্শকদের কানে।

'অপরাজিত' ছবিটির যত বাংলা-ইংরেজী আলোচনা আমি পড়েছি তার কোথাও ওই শব্দটির উল্লেখ দেখি নি। অবশ্য সব লেখা তো আমি পড়ি নি। হয়ত কেউ ওই শব্দটির বিষয়ে লিখেছেন।

॥ ১৬ ॥

দেখে বুঝতে পারলাম সত্যিই যশোবন্ত নাথমলজীর মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর সময়ে অনেকে বিচিত্র রকমের ব্যবহার করে। সক্রেটিসের মৃত্যুর সময়ের ব্যবহার জানি। মানে বইতে পড়েছি। টলস্টয়ের মৃত্যুর সময়ের ব্যবহারটাও বইতে পড়েছি।

কিন্তু এই যশোবন্ত নাথমলজীর মৃত্যুর প্রাক্কালে এ কী বিচিত্র ব্যবহার? কেন হঠাৎ বাঙালী ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করবার ইচ্ছে হলো? তবে কি তিনি অতীত জীবনে অনেক পাপ করেছেন?

জালিম কিছু বলতে পারলে না।

ঢোকবার মুখেই দেখা হয়ে গেল ডাঃ সুরেশ রামফলের সঙ্গে।

বললাম—ডাক্তার রামফল...

ডাঃ রামফল বললে—নো ডাক্তার, নো রামফল, ওন্লি সুরেশ—

দেখলাম রামফল ঠিক সেদিনকার সেই রাত্রের রামফলই আছে।

জিজ্ঞেস করলাম—তুমি এখেনে?

রামফল বললে—আমার বাবার খুব বন্ধু এই নাথমলজী, তাই আজ সকালে খবর পেয়েই চলে এসেছিলুম, এখন যাচ্ছি—

—এখন কেমন আছেন যশোবন্তজী?

রামফল বললে—এখন লাস্ট স্টেজ—কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আমি একজন বাঙালী ব্রাহ্মণকে ডেকে আনতে যাচ্ছি—তার পায়ের ছোঁওয়া গঙ্গাজল না খেয়ে উনি মরবেন না—

আমি বললাম—আরে আমাকে তো এই জন্যেই এই জালিম এখানে নিয়ে এসেছে—

জালিমও আমার কথায় সায় দিলে। বললে—কোথাও বাঙালী ব্রাহ্মণ পাওয়া যাচ্ছে না, তাই বড়বাবু আমাকে কথাটা বলতেই আমি স্যারকে ধরে আনলুম—

রামফল আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি ব্রাহ্মণ নাকি?

আমি বললাম—না—

রামফল বললে—তা হলে তো আপনাকে দিয়ে কাজ চলবে না।

বললাম—কিন্তু বাঙালীর ওপর অত জোর দিচ্ছেন কেন নাথমলজী?

রামফল বললে—এককালে যশোবন্তজীর ফোরফাদার্স এসেছিলেন বেঙ্গল থেকে সেইটে তিনি এখনও ভুলতে পারছেন না আর কী! আপনি 'পল অ্যান্ড ভার্জিনিয়া' পড়েন নি? তাতেই তো আছে এখানে অনেক বাঙালী ছিল—

তারপর আর বেশি কথা বলবার সময় ছিল না। রামফল তার নিজের গাড়িটাতে গিয়ে উঠলো।

বললে—আমি এখন চলি—

জিজ্ঞেস করলাম—বাঙালী ব্রাহ্মণ এখানে পাবে তুমি?

রামফল বললে—এখানে একটা শিব-মন্দির আছে, শুনেছিলাম সেখানকার পুজোরী বামুন যে সে নাকি বাঙালী। তবে অনেকদিন সে শিব-মন্দিরে যাইনি, জানি না বামুনটা বেঁচে আছে কিনা—

বলে আর দাঁড়াল না। গাড়িটাতে স্টার্ট দিয়ে ধোঁওয়া উড়িয়ে ঝড়ের বেগে কোন্ দিকে উধাও হয়ে গেল! আমি জালিমকে বললাম—তাহলে? তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আর কী করবো?

জালিম বললে— আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না।

আমরা দুজনেই খানিকক্ষণ সেখানে সেই রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সেই পোর্ট লুইস।

লুই নেপোলিয়নের নামে তখন এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছিল। বলতে গেলে মরিশাসের সব চেয়ে সমৃদ্ধশালী অঞ্চল। এখানে আর আগের কোনও নেই। শুধু বাড়ি। মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং। লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি হাউস। এককালের সাহেবসুবোরা এখানে বাস করতো এর বড় বড় বাড়িতে, কাছেই বন্দর। শুধু ইংরেজ আমলেই কিন্তু ইন্ডিয়ানরা অনেকেই এখানে বাড়ি করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন মহাত্মা হননি, তখন এখানে এসেছিলেন। তাঁর এখানে অবস্থানের তারিখ হচ্ছে ৩০-১০-১৯০১ থেকে ১৯-১১-১৯০১ পর্যন্ত। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে যে অভ্যর্থনা সমিতি তৈরি করা হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদেরই বেশি নাম। যেমন ইব্রাহিম বহেরিয়া, ইসমাইল জুমাব, কাসিমজী জীবনজী, এ আই পিপারজী, হাজী জাকেরিয়া, জান মোহম্মদ, আবদুল গুলাম হুসেন, আবুবকর, মোহম্মদ তাহির এবং বালজী মোহম্মদ যাকির। এতেই বোঝা যায় তখনকার মরিশাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। মরিশাসের সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে মুসলমান পরিবারের লোকজনদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ঐক্যবোধ ছিল মরিশাসের অবদান। মরিশাসে হিন্দু মুসলমান-বৌদ্ধ-তামিল প্রভৃতি সম্প্রদায়

মধ্যে কোথাও কোনও আচরণ-বিচরণগত ভেদাভেদ ছিল না। মরিশাসের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ ছিল দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে। বিশেষ করে গোস্বামী তুলসীদাসজীর 'রামচরিত-মানস'। আর মাসে মাসে 'শ্রীমদভাগবত' কথা পাঠ করা হত। সমস্ত গ্রামের লোক সন্ধ্যেবেলায় একটি স্থানে জুটতো আর পণ্ডিতমশাই 'শ্রীমদভাগবতে'র ব্যাখ্যা করতেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, খৃষ্টানদের সব চেয়ে বড় পরব ক্রীসমাসের সময়েই 'শ্রীমদভাগবত' পাঠ বেশি করে করা হত। তার কারণ, বোধ হয় এই যে, সে সময়ে সাদা চামড়ার সাহেবদের ছুটি থাকত। তারা তখন যত যিশু খৃষ্টকে নিয়ে মাতামাতি করতো, ইণ্ডিয়ানরাও তত মাতামাতি করতো তাদের দেব-দেবীদের নিয়ে। আর তার সঙ্গে ছিল নাটক অভিনয় 'রামলীলা' আর 'ইন্দ্রসভা'।

আর, আরো আশ্চর্য, মুসলমানদের 'মোহরম' উৎসব ছিল মরিশাসের সব সম্প্রদায়ের উৎসব। হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য-সমাজী, সকলের। মহরমের দিন উৎসবটা হত আখের ক্ষেতের মধ্যে। হিন্দুরা যেমন দেওয়ালি বা বিজয়া দশমীর দিন পরস্পরকে মিষ্টি বিতরণ করে, সেও তেমনি। সেদিন তুমি হিন্দুই হও আর বৌদ্ধই হও আর খৃষ্টানই হও তোমাকে সেই আখের ক্ষেতে যেতেই হবে। তোমাকে দেওয়া মিষ্টি খেতেই হবে, আবার তোমাকেও আমাদের মিষ্টি খাওয়াতেই হবে।

এই সব দেখেই অনেকে বলেছে—ইণ্ডিয়াটা হচ্ছে বড় মরিশাস, আর মরিশাস হচ্ছে ছোট ইণ্ডিয়া।

মরিশাসে যখন এই সব চলছে তখন ইণ্ডিয়ায় ইংরেজদের চেষ্টা চলছে কী করে হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া যায়।

আর মরিশাসেও যে সে চেষ্টা সে করে নি তা নয়। মরিশাসের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধরা তখন লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু চাকরি পাচ্ছে তারাই যারা খৃষ্টান। তোমরা নিজেদের ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান হও আমাদের মত, তাহলে তোমরাও চাকরি পাবে।

কিন্তু তোমার চাকরির কে পরোয়া করে? আমরা যারা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি তারা ভগবানে বিশ্বাসী। আমরা আমাদের আখের ক্ষেতে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটি, আর সন্ধ্যে থেকে রাম-নাম জপ করি। আর খাটুনি খেটে যা কিছু টাকা-পয়সা কামাই সব জমাই। আফ্রিকা থেকেও আমাদের মত কুলী-মজুর মরিশাসে আখের ক্ষেতের কাজ করতে এসেছিল। লোকের ধারণা ইণ্ডিয়ান-দের চেয়ে আফ্রিকার লোকরাই বুঝি বেশি খাটিয়ে।

কিন্তু ভুল। ইণ্ডিয়ানদের যেটা সবচেয়ে বেশি জোর সেটা আফ্রিকার অধিবাসীরা পাবে কোথায়? সেটা হলো ইণ্ডিয়ানদের মাটির টান। ইণ্ডিয়ানরা তাই মাটিকে তো জড় পদার্থ বলে না, বলে মা। তাই চাষীরা বিশেষ করে এক-একটা বিশেষ উৎসবে এখনও ক্ষেতের মাঝখানে গিয়ে সেই মা'কে পুজো করে। তাদের কাছে ক্ষেতই হচ্ছে ভূমিলক্ষ্মী। এই বোধ তারা পেয়েছে রামায়ণ থেকে, মহাভারত থেকে, শ্রীমদভাগবত কথা থেকে। পুরুষানুক্রমে যে সংস্কৃতির ধারা ভারতীয়দের রক্তের মধ্যে দিয়ে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে তা তা[illegible] শিখিয়েছে যে, ভূমিরও প্রাণশিখা [illegible] আর তা আছে বলেই প্রকৃতির রোদ [illegible] সাহায্য পেয়ে দেবী তাঁর ভক্তদ[illegible]ণ বাঁচান। যিনি এইভাবে প্রাণদাত্রী [illegible]কে অবহেলা করতে নেই, অনাদর করতে নেই, কারণ সে জড়পদার্থ নয়। তাকে পুজো করতে হয়। সেই প্রাণদাত্রী দেবী জলে আছেন, অগ্নিতে আছেন, বাতাসে আছেন, তিনি যে কেবল ব্যাপ্ত [illegible] নয়, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তাঁর অনুভূতির মধ্যে রয়েছে। শিশুকে তার মা যে কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরে থাকে তা কেবল বাহু দিয়ে নয়, শরীর দিয়ে নয়, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। আমাদের এই প্রকৃতিও আমাদেরও তেমনি তাঁর সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বেষ্টন করে আছেন। যাতে আমরা ক্ষুধায় অন্ন পাই, তৃষ্ণায় জল পাই, নিঃশ্বাসে বাতাস পাই।

ভারতীয় নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়কে এ কথা কেউ শিখিয়ে দেয়নি, এ তাদের রক্তের মধ্যে যুগ যুগ ধরে সঞ্জাত হয়ে আছে। তাই তারা ভারতবর্ষেই থাকুক আর মরিশাস কি জাম্বিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা মেক্সিকো যেই থাক এ কথা তারা ভুলতে পারে না। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেই

দণ্ডকারণ্যে গিয়েও তো দেখে এসেছি সেই কাঁকুড়ে জমিতে কেমন করে তারা স্নেহ দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে মমতা ভালবাসা দিয়ে মিতব্যয়িতা দিয়ে সোনা ফলিয়েছে।

এই কারণেই যে ভারতীয়রা একদিন 'গির্মিটি-লেবার' হয়ে মরিশাসে গিয়েছিল তারাই আবার একদিন মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুই-এর বারো আনা জমির মালিক হয়ে উঠলো। আজকের এই পঁচাশি বছর বয়েসের বৃদ্ধ যশোবন্ত নাথমলজীর পূর্ব পুরুষরাও তাদেরই একজন। তাই হাজার বড়লোক হয়েও তিনি বোধ করি সেই সত্যটি মৃত্যুকালে ভুলতে পারছেন না। কারণ তাঁর পিতা, পিতামহ প্রপিতামহও হয়তো মৃত্যুর প্রাক্কালে এই বিশ্বাস নিয়েই পরলোকে যাত্রা করেছেন।

কতক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। জালিমও আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা এ যুগের মানুষ, শহরে মানুষ হয়েছি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিটাকেও আমরা ঘৃণা করতে শিখেছি। তাই আমাদের কাছে এ ঘটনাটা শুধু হাস্য উদ্রেক করা ছাড়া তো আর কিছুই করবে না।

হঠাৎ দেখি ডাক্তার রামফলের গাড়িটা আবার ফিরে এল। তার গাড়ির ভেতরে আর একজন মানুষ। বয়োবৃদ্ধ, খুবই বয়েস হয়েছে। গায়ে কুর্তা, পরনে আমার মতই ধুতি। তাহলে কি বাঙালী ব্রাহ্মণ পাওয়া গিয়েছে?

তখন আর আমাদের দিকে চেয়ে দেখবার সময় ছিল না রামফলের। সে গাড়ি থেকে নেমেই লোকটিকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণটি আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। হয়তো আমার পোশাক দেখে বুঝতে পেরেছিল যে, আমি বাঙালী।

—আপনি বাঙালী আছেন?

বললাম—হ্যাঁ, আপনি? আপনিও কি বাঙালী?

পণ্ডিতমশাই বললেন—এখন আর আমি বাঙালী নেই, আগে বাঙালী ছিলাম।

ওদিকে রামফল তাড়া দিতে আর বেশিক্ষণ কথা হতে পারলো না। পণ্ডিত-মশাইকে তাড়াতাড়ি রামফলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়তে হলো।

জালিমের ইচ্ছে ছিল না আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ায়। কারণ আসল উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আর অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? তা ছাড়া, দুপুরের লাঞ্চ খাবার ব্যবস্থা আছে কন্টিনেন্টাল হোটেলে মরিশাসের ব্যাঙ্ক অব বরোদার পক্ষ থেকে।

কিন্তু আমার ইচ্ছে হলো ভেতরে গিয়ে দেখতে। ইচ্ছে, কী হয় ভেতরে গিয়ে দেখবো।

জালিমকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কী বলো, ফিরে যাবো?

জালিম বললে—তাই চলুন—তা ছাড়া বাঙালী ব্রাহ্মণ তো পেয়ে গেছেন ওঁরা। আগে পাওয়া যায়নি বলে আমাকে খুঁজে আনতে বলেছিলেন—

বললাম—তা হলে চলো, ফিরেই যাই—

সত্যিই তো, যশোবন্ত নাথমলজীর সঙ্গে আমার তো মাত্র আধঘণ্টার পরিচয়। কিংবা তাও হয়তো নয়। আমি তাহলে কেন তাঁর মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলের অপ্রীতি-ভাজন হই। এখন তো আমি অবাঞ্ছিত! বরং এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের স্পর্শ থেকে যখন বেঁচে গিয়েছি তখন তো এখান থেকে আমার চলে যাওয়াই উচিত!

মৃত্যুকালে এই পাদোদক খাওয়া আমি ইণ্ডিয়াতে একবার দেখেছি। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার। আমি তখন চাকরি করি। আমার লেখক-জীবন শুরু হয়নি। অথবা আমাকে তখন শখের লেখক বলা যায়। দিনের বেলা চাকর, আর অবসর সময়ের লেখক।

সেই সময়ে আমার কর্মস্থানের যিনি মালিক, তিনি ছিলেন পাক্কা সাহেব। তখন বিবেকানন্দ-গান্ধী-সুভাষ প্রভৃতির প্রভাবে ভারতবর্ষে রীতিমত ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে সবাই। কিন্তু যেহেতু সকলকে চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাই কর্ম-স্থলে সবাই ভিজে বেড়াল। সেখানে সুভাষ বোস কি মহাত্মা গান্ধীর নাম উচ্চারণ করা পর্যন্ত পাপ! আমরা তখন এমনভাবে থাকি যেন জীবনে কখনও ওঁদের নাম পর্যন্ত শুনিনি। মালিকের নাম ধরুন কে সি সেনগুপ্ত। শুনলাম তাঁর চৌদ্দ পুরুষ নাকি বিলেতে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে। কথাটা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ মিস্টার সেনগুপ্তর হাব-ভাব-চাল-চলন-কথা-বার্তায় সব সময়েই প্রকট হত। নিখুঁত সাহেবী পোশাক, নিখুঁত ইংরিজী উচ্চারণ। আর তাঁর চাপরাশির মুখে সবাই শুনেছিল যে, তাঁর লাঞ্চ বা ডিনারে নাকি বীফ বা হ্যাম্ চাই-ই চাই। নইলে নাকি তাঁর খাওয়াই হতো না। তার ওপর আনুষঙ্গিক যা আছে তা তো ছিলই। যেমন তাঁর মুখে সব সময়ে খাস বিলিতি সিগারেট লেগেই থাকতো। তিনি লাঞ্চ খেতে খেতেই নাকি মাঝে মাঝে সিগারেট টেনে নিতেন।

সেই সেনগুপ্ত সাহেব একবার বদলি হয়ে গেলেন অন্য ডিস্ট্রিক্টে। সেখানে প্রভি-শনের দোকানে চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা সমস্তই পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে টিনের

কৌটোয় আঁটা হ্যাম্ বা বীফ্ পাওয়া যায় না। মহা মুশকিলে পড়লেন সেনগুপ্ত সাহেব।

সেখান থেকেই হেড অফিসের জেনারেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করলেন সেনগুপ্ত সাহেব। —মিস্টার হাগিন্স, দিস ইজ সেনগুপ্ত স্পিকিং—

জেনারেল ম্যানেজারও জবাব দিলেন—ইয়েস সেনগুপ্ত, হোয়াট ইজ ইট?

ওধার থেকে সেনগুপ্ত বললেন—তুমি কোথায় পাঠিয়েছ আমাকে হাগিন্স? এখানে কোনও ভদ্রলোক থাকতে পারে?

—কেন! কেন? হোয়াই? হোয়াটস্ দ্য ট্রাবল? অসুবিধেটা কী হচ্ছে? স্টাফ কাজ করছে না?

সেনগুপ্ত সাহেব বললেন—না না, স্টাফদের আমি শায়েস্তা করে দিয়েছি। নেটিভরা আমার কাছে সবাই জব্দ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, আমি এখানে স্টার্ভ করছি—যাকে বলে আমার একেবারে উপোস চলছে এখানে—

—কেন? কেন?

সেনগুপ্ত সাহেব বললেন—এখানে আমাদের অফিসের স্টোর্সে বিফ্ পাওয়া যায় না, হ্যাম পাওয়া যায় না, আমি কী খেয়ে এখানে বাঁচবো?

তা এই হলো সে যুগের সেনগুপ্ত সাহেবের নমুনা।

কিন্তু তার পরেই ১৯৪৭ সালেই ইণ্ডিয়া স্বাধীন হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষটারই বা কী অদ্ভুত পরিবর্তন! পরিবর্তন অনেকেরই হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রয়েসয়ে। কিন্তু সেনগুপ্ত সাহেবের পরিবর্তনটা হলো বড় রাতারাতি। সেই স্বাধীনতা উৎসবের দিন কর্মস্থলে ছুটি ছিল। পরের দিন গিয়েছি। দেখি প্রধান গেটের সামনে অবাক কাণ্ড! এক ভদ্রলোক অফিসের গুর্খা দারোয়ানকে ধরে বেদম প্রহার দিচ্ছে। অত শক্তিশালী গুর্খা দারোয়ান অম্লান বদনে সেই প্রহার সহ্য করছে। আমার দেখাদেখি আরো অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। শুনলাম গুর্খা দারোয়ানটির অপরাধ খুব গুরুতর। সে নাকি ভদ্রলোককে সেলাম করেনি—এই তার অপরাধ।

কিন্তু কে এমন ভদ্রলোক যে যাকে দেখে সেলাম না-করা অপরাধ হয়েছে? তাঁর দিকে চেয়ে দেখি তিনি আর কেউ নন আমাদের সেনগুপ্ত সাহেব! একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত চেহারা। সেই স্যুট-টাই সিগারেট কিছু নেই। পায়ে একজোড়া সাদা নাগরা, পরনে ফিনফিনে জরিপাড় খদ্দরের ধুতি, গায়েও ঠিক তেমনি খদ্দরের পাঞ্জাবি। আর মাথায় বাঁকা করে বসানো খদ্দরের টুপি। আর টুপির গায়ে কাগজে ছাপানো তে-রঙা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পিন দিয়ে আটা। গুর্খা দারোয়ান কেন, ওই পোশাকে সেনগুপ্ত সাহেবকে দেখলে কারোর চৌদ্দ পুরুষও চিনতে পারত না। এমনি কিম্ভূতকিমাকার সেই চেহারার পরিবর্তন।

কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র ঘটনা ঘটলো পরে। অত্যধিক মদ্য পান আর সিগারেট খাওয়ার জন্যে সেনগুপ্ত সাহেব তার পরে আর বেশি দিন বাঁচলেন না। অফিসে আর আসতে পারেন না। একদিন কর্মস্থলের আমরা তাঁকে নার্সিং-হোমে দেখতে গেলাম। গিয়ে শুনি তিনি নাকি মুমূর্ষু। ডাক্তার শেষ জবাব দিয়ে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কোনও রকমে তাঁর কেবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেনগুপ্ত সাহেবের ছেলেমেয়ে কিছু ছিল না। কিন্তু নিকট আত্মীয় তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তখন খুবই ব্যস্ত সবাই! বুঝতে পারলাম না ব্যস্ততা কিসের জন্যে। একটু আগেই ডাক্তার তার রায় তো দিয়ে চলে গেছে।

আসল খবরটা পরে জানতে পারলাম। সেনগুপ্ত সাহেব নাকি হঠাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় চোখ খুলে একবার বলে ফেলেছিলেন—তোমরা কেউ একজন রাম-খেলাওনকে এখখুনি এখানে ডেকে নিয়ে এসো। আর একটা পাথর বাটিতে করে একটু গঙ্গাজল—

এই রাম খেলাওন্ হলো সেনগুপ্ত সাহেবের বাড়ির দারোয়ান। সে গেটের সামনে বসে পাহারা দিত। আর সেনগুপ্ত সাহেব বাড়ি থেকে বেরোলে কিংবা বাড়িতে ঢুকলে ডান-হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে সেলাম করতো। মাথা ন্যাড়া, খালি-গা পরনে ধুতি, পা খালি। নাদুস-নুদুস্ দেহ। মাথার পেছন দিকে একটা ইয়া মোটা টিকি। রাম খেলাওন্ খুব যত্ন নিত টিকিটার ওপর। টিকিটাকে সে গঙ্গা মাটি দিয়ে রোজ ঘষে ঘষে মাজতো। তারপর স্নান সেরে সেই টিকিতে আবার তেল মাখাতো সযত্নে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সমস্ত দুপুর ধরে তার বিশেষ আর কোনও কাজ থাকতো না। তখন সে নিজের জন্যে ডাল রুটি বানাতো আর মহা ভক্তি ভরে গোস্বামী তুলসী-দাসজীর 'রামচরিত-মানস' পড়তো। মত্ত

করে। মাসে মাইনে পেত সে চল্লিশ টাকা। তা থেকে দশ টাকা রেখে বাকি টাকাটা সে দেশে পাঠিয়ে দিত।

এই হলো মোটামুটি রামখেলাওনের জীবনী। সেনগুপ্ত সাহেব যে রামখেলাওনের দিকে কখনও ভালো করে দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন এমন অসম্ভব কল্পনাও সে কখনও করেনি।

হঠাৎ সেনগুপ্ত সাহেবের মৃত্যুর সময়ে যে তার মত তুচ্ছ একজন লোকের ডাক পড়বে তা সে আগে ভাবতে পারেনি। তাকে সেদিন অত্যন্ত সমাদরে নার্সিং-হোমে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা পাথর বাটিতে করে গঙ্গাজল আগেই এনে রাখা হয়েছিল। মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে পাওয়া রাম খেলাওন গিয়ে সেই পাথরবাটিতে রাখা গঙ্গাজলে নিজের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছোঁয়ালো আর মাসে তিন-হাজার টাকা মাইনে পাওয়া সেনগুপ্ত সাহেব সেই গঙ্গাজল ভরা পাথরবাটিটা পরম যত্ন-সহকারে সবটুকু চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করে দিলেন। যেন সেইটুকু তাঁর পরলোকের পরম মূল্যবান পাথেয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে টলস্টয়ের মৃত্যু বড় মর্মান্তিক। টলস্টয় তখন পাশ্চাত্য জগতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং মনীষী বলে সম্মানিত। কিন্তু তিনি সাত্ত্বিক-জীবন শুরু করেছিলেন মধ্য বয়েসে। তাই তাঁর জীবনের সমস্যা ছিল বড় বিচিত্র। তিনি জীবনের মূলধন করেছিলেন ব্রহ্মচর্য আর দারিদ্র্য। কিন্তু তাঁর স্ত্রী পুত্র-কন্যা চাইতেন বিলাস-ব্যসন আর সাংসারিক ভোগ-সুখ। বিরোধ বাধলো দুই পক্ষতে। সেই বিরোধে তিনি পরাজিত হলেন। গত্যন্তর না পেয়ে তিনি স্থির করলেন তিনি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। তখন তাঁর বয়েস বিরাশি।

এ শুধু যে নিরুদ্দেশ হওয়া তাই-ই নয়, এ এক-রকম পালিয়ে যাওয়া। নিজের কাছ থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। সেই অন্তরের সংগে বাইরের, পারিপার্শ্বিকের সংগে আদর্শের লড়াই'তে তিনি যখন প্রায় ক্ষত-বিক্ষত তখন তাঁর মনে হয়েছিল এ ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও পথ নেই।

সে রাত্রে তুষার-পাতের মাত্রাটা একটু বেশি ছিল। সমস্ত রাত তিনি মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। রাত্রের তৃতীয় প্রহরে সেই বিরাশি বৎসর বয়েসের বৃদ্ধ গৃহত্যাগ করলেন। তারপর নিকট-বর্তী একটা রেল-স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলেন।

পৃথিবীর তাবৎ মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য, তখন পৃথিবীর মানুষেরই মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে ক্লান্ত মনীষী একটা ট্রেনে চড়ে কোথায় চলেছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। জানেন না কখন তাঁকে জ্বর আক্রমণ করেছে। তিনি জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে চলন্ত ট্রেনে চড়ে চলেছেন। নজরে পড়ে প্রথম একজন রেলওয়ের টিকিট-চেকারের।। তিনি যাত্রীর কাছে টিকিট চাইতে গিয়ে দেখেন যে এক অসাধারণ অসামান্য যাত্রী। মহামতি টলস্টয়। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল টলস্টয়-এর মুমূর্ষু অবস্থা। একটা স্টেশন আসতেই টলস্টয়কে সেখানে নামিয়ে স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে রাখা হলো। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হলো। কিন্তু তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর আগে এক মুহূর্তের জন্য বোধ-হয় একটু অস্পষ্ট জ্ঞান হয়েছিল। তিনি জড়ানো অস্পষ্ট গলায় শুধু একটা কথাই বলতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন—আমার বাড়িতে যেন কোনও খবর না দেওয়া হয়—

আর কোনও কথা তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়নি। বলতে গেলে সেই-ই তাঁর শেষ কথা।

আর সক্রেটিস?

তাঁর মৃত্যুও বড় মর্মান্তিক। তিনি তখন জেলখানায় বন্দী। তাঁর ওপর হুকুম হয়েছে বিষপান করে প্রাণত্যাগ করতে হবে। তিনি বিষপান করেছেন, কোনও আপত্তি করেননি। মৃত্যু আসছে না। মৃত্যু যেন সক্রেটিসের মত লোককে গ্রহণ করতে একটু দ্বিধা করছে। তিনি শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন আর শিষ্যদের বলছেন—তোমরা সৎ হও, সৎ-ভাবে জীবন যাপন করো, তোমাদের কোনও বিপদ আসবে না। মৃত্যুকে ভয় কোর না। কারণ মৃত্যুর চেয়ে সত্য আরো বড়। সত্য রক্ষার জন্যে প্রাণ দিলে অমৃত-যোগ লাভ হয়। তোমরা সেই সত্যকে আশ্রয় কোর, তোমরা মৃত্যুকে জয় করতে পারবে—

শিষ্যরা হতবাক হয়ে গুরুদেবের কথা গিলছে।

এমন সময় জেলখানার প্রহরী এল। বললে—অমন করে শুয়ে থাকলে চলবে না, মৃত্যু আসতে দেরি হবে—

সক্রেটিস জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আমাকে কী করতে হবে, বলো? আমি তাই-ই করবো।

—আপনাকে এই ঘরের মধ্যে ঘন-ঘন পায়চারি করতে হবে, তবেই বিষটা রক্তের সংগে মিশে মাথায় গিয়ে ঠেকবে, তা না হলে তো আপনি মরবেন না—

—তথাস্তু, বলে সক্রেটিস তাই-ই করতে লাগলেন। ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন ঘন ঘন। তখনও তিনি বলে চলেছেন—তোমরা সৎ হও, সৎ ভাবে জীবন-যাপন করো, তোমাদের কোনও বিপদ আসবে না—

হঠাৎ শিষ্যরা দেখলেন জেলখানার বাইরে সক্রেটিসের স্ত্রী এসে হাজির।

দু'চোখ কান্নায় ছলছল। তিনি একবার শেষবারের মত চোখের দেখা দেখতে চান তাঁর স্বামীকে। তিনি তাঁর বৌদ্ধসেবী ভবঘুরে পাগল স্বামীর জন্যে কোনওদিন এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি পান নি। সুখ পান নি। তবু তিনি তাঁর স্বামীকে ভালবাসেন, কারণ তিনি তো তাঁরই স্ত্রী।

কিন্তু শিষ্যরা ভুল বুঝলেন। বললেন —না মাদাম, আপনার স্বামীকে আপনাকে দেখতে দেওয়া হবে না, আপনি তাঁকে জীবনে কোনও দিন শান্তি দেন নি, মৃত্যুর সময়ে আপনাকে দেখলেও তাঁর পাপ হবে—

তা তাই-ই হলো। স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। আর সক্রেটিসও তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। বিষটা তাঁর শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশে একেবারে মাথায় গিয়ে ঠেকেছে—

*

সেই যশোবন্ত নাথমল রায়জীর পোর্ট লুইসের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তখন আমার মাথায় আরো নানারকম চিন্তা আসতে লাগলো। মনে হলো কোথায় সেই পোর্ট লুইসের 'ওরিয়েন্ট হোটেল'টা খুঁজে দেখলে হয়। সেই ১৯০১ সালের তিরিশে অক্টোবর তারিখে তরুণ ব্যারিস্টার এম-কে-গান্ধী যে 'ওরিয়েন্ট হোটেল'টাতে উঠেছিলেন।

গান্ধীজী যে এই মরিশাসে নামবেন এবং এখানে ১৯০১ সালের ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত থাকবেন তাও তিনি কল্পনা করেন নি। যখন তিনি শুনলেন যে জাহাজটা মরিশাসে কিছুদিন থাকবে তখন ডাঙায় নেমে দেখলেন একটা হোটেল রয়েছে, তার নাম 'ওরিয়েন্ট হোটেল'। তিনি ওই হোটেলেই এসে উঠলেন। ভাবলেন দেশটা ক'দিন ঘুরে দেখা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকার মত এই মরিশাসেও তো কিছু ইণ্ডিয়ান কুলি কাজ করতে এসেছিল, তাদের অবস্থাটা একটু দেখা যাক। হোটেলে উঠে তিনি রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। পরনে কোট-প্যাণ্ট-টাই, কিন্তু মাথায় গুজরাটি পাগড়ি পরা। রাস্তার লোক তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এ আবার কোন্ দেশ থেকে এলো? কে এ?

একজন সাহস করে তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

গান্ধী বললেন—আমি একজন ইণ্ডিয়ান ব্যারিস্টার। সাউথ-আফ্রিকা থেকে আসছি, যাবো ইণ্ডিয়ায়।

—আপনার নাম?

—আমার নাম এম-কে-গান্ধী।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ব্যাপারে এম-কে গান্ধীর নাম তখন সংবাদপত্রের 'হেড লাইন' হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে তেত্রিশশো বিঘের একটি খামার এক ভদ্রলোক নিজের পয়সায় কিনে সত্যাগ্রহী পরিবারদের বসবাসের জন্যে বিনা ভাড়ায় গান্ধীকে দিয়েছিলেন আশ্রম করবার জন্যে। গান্ধী সেই আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন 'টলস্টয় ফার্ম'।

কিন্তু সে-সব তো অনেক পরের কথা। তার আগেই মরিশাসের পাড়ায়-পাড়ায় কথাটা রটে গেল যে ব্যারিস্টার এম-কে-গান্ধী, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা-আদমিদের পক্ষে লড়াই চালাচ্ছেন তিনি সশরীরে মরিশাসে এসেছেন।

লোকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় উঠেছেন তিনি?

—ওরিয়েন্ট হোটেলে—

সকলেই যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। যাক, মহাপুরুষ এসে গেছেন মরিশাসে।

এ-ঘটনা ৩০শে অক্টোবর ১৯০১ সালের। আর আশ্চর্য, এখানে এই ইণ্ডিয়ায় কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে লিখছেন "মনে হইতেছে, আমাদের মধ্যে কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন, যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোনও কারণ নাই। যিনি ঘোষণা করিবেন ভারতের কাম্য মুক্তি।"

হঠাৎ জালিমের কথায় আমার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়লো।

বললে—স্যার, একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—

বললাম—কী কথা? কনটিনেন্টাল হোটেলে ব্যাঙ্ক অব বরোদা'র ব্যাপারে কথা?

জালিম বললে—না, সে তো আছেই, এটা অন্য কথা।

—কী কথা?

জালিম বললে—শিউপূজন স্যার বাড়ি ফিরে এসেছে—

—তাহলে রায়নার সঙ্গে তার ঝগড়া মিটে গেছে তো?

—না স্যার, রায়নার খুব অসুখ। সে বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে—

(ক্রমশ)

মিছিমিছি

বুদ্ধদেব গুহ

মানুষটি নরম লাজুক ভীরু চোখ তুলে বলেছিল, আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম একটা।

তারপর একটু থেমে, দম নিয়ে বলেছিল, অনেকদিন আগে।

আসলে যাকে সে মনে মনে বহুদিন ওড়িশী ফিলিগ্রির সূক্ষ্ম কাজের মতো সূক্ষ্মতায় ভালোবেসেছে, যাকে কামনার অক্টোপাশের বহুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কালীন্ কামনায়, কত না কথা বলেছে যার সঙ্গে, নির্জন জঙ্গলের পাখি-ডাকা লাল মাটির পথে কতদিন যার হাতে হাত রেখে হেঁটেছে স্বপ্নে, এতদিন পর তারই মুখোমুখি বসে, তার কাছে এসে; সে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

মানুষটি কখনও ভালো কথা বলতে পারত না, তাই চিঠিতে সে নিজেকে নিরাবরণ নিরাভরণ করতে ভালোবাসত, সহজে সহজ হতো সেখানে।

এই সামান্য ক'টি কথা বলায় সময়ও তার বড় দ্বিধা, ভয়; লজ্জা হল।

সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না, আত্মবিশ্বাসী ও বুদ্ধিমতী সেই নায়িকা বনলতা সেনের চোখ তুলে মৌটুসী পাখির গলায় শুধোলেন, চিঠিটি পাঠালেন না কেন? লিখেছিলেনই যদি, পাঠালেন না কেন?

মানুষটি মুখ নামিয়ে নিল।

অনেক কথা বলতে পারত, বলতে পারত কতদিন ধরে কতবার করে চিঠিটিকে লিখেছিল; কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না।

বলল, এমনিই...।

মেয়েটি বলল, আরেকটা লিখুন তাহলে এখন।

বড় নিষ্ঠুরের মতো শোনালো কথাটা মানুষটির কানে।

মেয়েটি এমনভাবে কথাটি বলল, যেন মনের ভাঙা টুকরোগুলোকে যখন তখন জুড়ে দেওয়া যায় অ্যারালডাইট দিয়ে। তারপর ভাবল যে, ঐ মেয়ে তা তো বলবেই। এই সামান্য মানুষটির কী-ই বা আছে ঐ অসামান্যা মানুষীর মনে দাগ কাটতে পারার মতো? একটি বিশুদ্ধ বিমুগ্ধ হৃদয় ছাড়া আর কিছুই তো নেই তার অঞ্জলিতে। কিন্তু একজন মানুষের সুগন্ধী পদ্মহৃদয়ের বাজার দর কতটুকু? পাঁঠার হৃদয়ের দামও তার চেয়ে বেশী।

গল্পটির আরম্ভ এইরকম। অতি সাধারণ। এমন ঘটনা সকলের জীবনেই ঘটে, কখনও না কখনও।

ঘটে নিশ্চয়ই। কিন্তু একের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যের অভিজ্ঞতায় মিল থাকে না কারণ প্রত্যেক মানুষের অনুভূতি প্রবণতা ও তার তীব্রতা এবং সংবেদনশীলতা বিভিন্ন পর্দায় বাঁধা।

যে মানুষটির কথা বলতে বসেছি তার নিজের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তার নেই। তার ব্যক্তিত্বের প্রধান দোষ অথবা গুণ অস্থিরতা। ঘাস ফড়িং-এর সঙ্গে তার মানসিকতার তুলনা করা চলে। বাথরুমের আয়নায় প্রতিফলিত মানুষটির প্রতিবিম্বর সঙ্গে এই অলজ্য অভব্য অস্থিরতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে সে নিজে। করেছে ঘুম-না-আসা অনেক রাতের স্তব্ধ অবসরে। কিন্তু কোনো স্পষ্টতায় পৌঁছনো সম্ভব হয়নি কখনো। সে কারণে মানুষটি এবং মানুষটির সবচেয়ে কাছের যে জন, তার প্রতিবিম্ব তাকে বোঝার চেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়েছে।

এই মানুষটির গল্প অনেকটা ডোরিয়ান গ্রের ছবির গল্পের মতো। তফাৎ এইটুকুই যে, ডোরিয়ান গ্রের ছবিতে তার দুষ্কৃতির ছাপ পড়েছিল। কিন্তু এ-মানুষটির ভিতরের ছবিটি দিনের পর দিন উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

কোনো সাধারণ মানুষের উত্তরণের ডকুমেন্টারী ছবি হয় না। ঢাকঢোল হয় না। কিন্তু আয়নার মধ্যের ক্রমবিবর্তমান ছবিটি মানুষটিকে উত্তরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলেছে।

তুলেছে, এ কারণে যে, জীবনে এযাবৎ যাই-ই সে তীব্রভাবে কামনা করেছে; তাই-ই সে পায়নি। কিন্তু সে কৃতজ্ঞচিত্তে চিরদিন স্বীকার করেছে যে, এই না-পাওয়াটাও বড় কম পাওয়া নয়।

যে ছেঁড়া চিঠিটি এই গল্পের অনুপ্রেরণা, তা লেখা হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে, সেই অনুপ্রেরণার জন্মের সঙ্গে মুক্তোর জন্মের তুলনা করা চলে। যে অনুপ্রেরণার মূলে ভালোবাসা তা কখনও রাতারাতি জন্ম নেয় না। সমুদ্রের তলার জলজ সবুজ পেলব অন্ধকারের মতো, সামুদ্রিক শীগালের জলস্পর্শের কোমল রেশমী উজ্জ্বল উষ্ণতার মতো, তা বহুদিন ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠে। শ্যাওলার উপর শ্যাওলা জমে, দুপুরের উত্তাল রোদ এসে তার বুকের ফুলকির মতো পিছলে যায় চঞ্চল মাছের আঁশে, মসলিনের মতো সূক্ষ্ম শ্বেতা লালিমায় ভরা চিকণ লোম গজিয়ে ওঠে একে একে
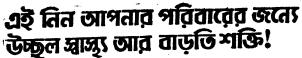
পাখির তলপেটে। সেই-ই—ভালোবাসার পাখি।

ভালোবাসার জন্মের বোধ হয় কোনো সময় নেই। আবহমানকাল ধরে সে জন্মেছে, জন্মাবে; ঠাঁই পাবে মানুষ-মানুষীর বুকে, ঝরে যাবে চৈত্রশেষের আম-লকির মতো মনের বনে, আবার মুকুলিত হবে নাম-না-জানা ফুলে পাতায়, নাম-না জানা অনুভূতিতে। ভালোবাসার কোনো অবয়ব নেই, আধার নেই, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। সে ধমনীর মধ্যে দৌড়ে যায়, অথচ তার পা নেই। তার গতি আছে অথচ সে শব্দহীন, সে চোখের তারায় জ্বলে ওঠে অথচ সে আগুন নয়; সে আশ্রয় দেয় নিবিড় ছায়ায় কিন্তু সে গাছ নয়। ভালোবাসা; ভালোবাসাই। যে জানে, সেই-ই জানে, যার বুকে তার ধুনুক বাজে, শুধু সেই-ই তা শুনতে পায়।

মানুষটি অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে থাকল।

এতদিনের বন্ধ আবেগ হঠাৎ অর্গলমুক্ত হয়ে তার আনন্দিত হৃদয় থেকে ফোয়ারার মতো উৎসারিত হতে চাইছিল। আনন্দের কষ্টে মানুষটি বুঁদ হয়ে ছিল।

সে হঠাৎ বলল, ঐ চিঠি আর লেখা যাবে না।

মুখে শুধুই বলল, লেখা যাবে না। কিন্তু মনে মনে অনেক কথা বলল, মেয়েটি শুনতে পেলো না।

মানুষটি নিরুচ্চারে বলল, জানো, আমার স্বপ্নের প্রেয়সী, আমার মনে মনে তোমার একটি ছবি ছিল। ডুরে-শাড়ি পরা একটি মেয়ে, গাছ গোড়ায়, বর্ষাকালের গাঁয়ের দুপুরে, সামনে জল-কাদা-মাটির পথ, পরিবেশে সোঁদা গন্ধ; দাঁড়িয়ে আছো তুমি। দুটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ঘন কালো চোখ। মুখে কোনো প্রসাধন নেই—শুধু-মাত্র বুদ্ধির প্রসাধন ছাড়া।

মানুষটি বলল, সেই ছবিটি মনের ফ্রেমে এঁটে গেছিল। তোমারই অনেক ছবি জমেছিল তার উপর পরতে-পরতে, কিন্তু সেই প্রথম ছবিটি মুছতে পারেনি অন্য কোনো ছবি। তুমি দেখতে-দেখতে কত বড় হয়ে গেছ, বড় হতে হতে এত বড় হয়ে গেছ যে, আমার সামান্য নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছ তুমি।

তুমি যতই বড় হয়েছ খ্যাতিতে, নিজেকে করেছ সুষমামণ্ডিত যৌবনে; আমি তত ছোট হয়েছি। জঙ্গলের মধ্যের, চাঁদের রাতে আলোছায়ার বুটিকাটা গাল-চেতে তাকিয়ে তোমার শাড়ির ডুরে পাড়ের রঙ দেখেছি। বাঘ মারার সাহস হয়েছে, কিন্তু তোমাকে চাইবার সাহস হয়নি নিজেকে বকেছি, মেরেছি; বলেছি, পাগ-

দুঃস্থ হয়েছে তো। ভীষণ অসভ্য। বলেছি, যা পাওয়ার নয়, যা তোমার নাগালের বাইরে, তা না-চাওয়াটাই সভ্যতা।

সময় ধরে থামিছল। মানুষটির বিপরীতে তার জন্ম-জন্মের প্রেমিকা বসেছিল। ঘরের মধ্যে আরো অনেকে ছিলেন। অনেক কথা, অনেক হাসি, পাখার শব্দ। কিন্তু ঘরটি কী অসম্ভব নিস্তব্ধ, নির্জন।

মানুষটি আবার নিরুচ্চারে মেয়েটিকে শুধোলো, তুমি কখনো নিজেকে চাবুক মেরেছো মনে মনে? নিজেকে ঘৃণা করেছো কখনও আমার মতো করে? নিজেকে জেনেছো অনুভূতির ছুরির ফলায় চিরে-চিরে—আমি যেমন করে জেনেছি? তুমি জানোনি। তোমার দরকার কি? তাছাড়া অবকাশই বা কোথায়? তুমি তো এক দারুণ দৌড়ে নেমেছিলে। এই দৌড় কখনও তোমাকে ক্লান্ত করে না? মাঝে মাঝে তোমার জন্য বড়ো কষ্ট হয় আমার। তুমি যতই আমাকে আবিষ্ট করেছো, আমি ততোই যন্ত্রণা পেয়েছি, ততোই ঘৃণা করেছি নিজেকে।

ঘৃণা করেছি, কারণ ভেবেছি, কি আমার যোগ্যতা, রূপ; গুণ। কি নিয়ে আমি গিয়ে দাঁড়াব তোমার কাছে? যদি ফিরিয়ে দাও? পদাঘাত করো?

পারিনি। তোমার সম্মুখীন হয়ে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে তোমার সম্মুখীন না হয়ে দুঃখ পাওয়া ভেবেছি অনেক ভালো।

তুমি পাদ-প্রদীপের আলোকিত জ্যোতির্ময়ী দেবী! আমি অন্ধকারের কীট। তোমার সুন্দর মুখ আমি চিনি, সবাই চেনে, কিন্তু তুমি আমার মুখ চেনো না; মানে চিনতে না তুমি। অন্ধকারে কালো কালো মাথাগুলো অডিটোরিয়ামের সাধারণত্বে মিশে যায়। আমার মতো নগণ্য নির্গুণ মানুষেরা স্তুতিকার তোমার। আমাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব নেই; অস্তিত্ব নেই। আমি অন্ধকারে বসে তোমায় করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করেছি, তুমি উদ্ভাসিত ডায়াসে দাঁড়িয়ে আমার মুখ না-চিনেও আমার স্তুতি গ্রহণ করেছো। ধন্য করেছো আমায়। আমার মতো লক্ষ লক্ষ দর্শকদের একমাত্র যোগসূত্র স্তুতি। আমরা সাধারণ, সামান্য দর্শক—আমি অন্যদের সঙ্গে তোমার স্তুতিতে একাকার। কিন্তু তুমি একা; এবং অনন্যা। তোমার কারণে আমি তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি, তোমার সঙ্গেও, কিন্তু তুমি তা জানতেও পারোনি।

কত লোককে বলব ভেবেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু বলতে গিয়েও পারিনি। কাউকে যদি বলেওছি, তারা আলাপে করিয়ে দেয়নি। ভীষণ লজ্জা করেছে। ভেবেছি, তোমার তুলনায় আমি তো ছোটই, কিন্তু নিজেকে আরও ছোট করে লাভ কি?

কিছুদিন আগে এই বোকা মানুষটি তার মনের দুর্গম পথের এক বড় নির্জন জায়গায় পৌছে একদল ঠগীর পাল্লায় পড়েছিল। ঠ্যাঙাড়ের দল তাকে মেরে ধরে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। তার পুঁটলিতে পার্থিব ধন যা ছিল, তা হারানোর জন্যে তার দুঃখ হয়নি। কিন্তু বড় ভয় হয়েছিল যে, তার বুকের মধ্যে সযত্নে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার ক্ষমতাটুকুও বুঝি ঠগীগুলো কেড়ে নিয়ে গেল।

এই ভয়টা তাকে সম্পূর্ণ অবশ ও অসহায় করে তুলেছিল। মানুষটি যে-ভালোবাসার উপরে নির্ভর করে এবং ভালোবাসা অবলম্বন করেই বেঁচেছিল, বাঁচতে চেয়েছিল, চিরদিন। ভালোবাসার শরিক দুটি নরম উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, চিকন গলায় মৌটুসী-স্বর; স্তন-সন্ধির সুগন্ধি শীতল স্নিগ্ধতা, তার চেয়েও যা বড়, বুকের মধ্যে ভালোবাসার নিবিড় বোধ—এই সবই সে ভেবেছিল অপহৃত হল চিরদিনের মতো। গুহার মধ্যে তাড়া-খাওয়া দিনের বেলায় বাদুড়ের মতো সে তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছিল ঠগীদের খপ্পরে পড়ে। চোখে কিছু দেখতে পায়নি, মস্তিষ্ক কাজ করেনি, আছড়ে ফিরেছিল সে জীবনের এ-দেওয়ালে ও-দেওয়ালে। তার ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়েছিল, চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছিল অবিরল; সে মরে যেতে চেয়েছিল।

মরা অতি সোজা ছিল একসময়। হাতের মুঠোয় পিস্তল, ম্যাগাজিন ভর্তি গুলি। ট্রিগারে আঙুল, কিন্তু সেদিন মরলে সে মরে যাওয়া আর বেঁচে থাকার পার্থক্য জানত না।

মরেনি বলেই, আজ নিজেকে সে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারল, জানল যে, তার ধনরত্নই নিয়ে গেছে লুটেরারা দস্যুরা। ভালোই করেছে তারা, ভালোবাসাহীন ও জোচ্চোরের মধ্যে তফাৎ করতে তারাই শিখিয়েছে কিন্তু তার হৃদয়ের সাধ, স্বাদ, স্পন্দন তা যা ছিল সব তারই আছে।

ভালোবাসার ক্ষমতা যখন তার এখনও হৃদয়ে আছে তখন সবকিছুই তো আছে তার।

এ-সংসারে যার ভালোবাসবার ক্ষমতা আছে তার কি নেই? মানুষটি মনে মনে মেয়েটিকে বলল।

আজ দুপুরে সে বড় প্রগল্ভ হয়ে পড়েছিল। মেতেছিল কথায়, কথায়; এখন কি বিনা কথায়; প্রথম শীতের শান্ত দুপুরের নীল চিকচিকে আকাশে সুখী পায়রার মতো সে উড়েছিল। বড় সুখী হয়েছিল সে।

একজনের চোখে তার চোখ পড়েছিল; মনে মনে। বার বার। আনন্দে, বিষাদে, কান্নায়, হাসিতে তার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে

গেছিল। বহু-বহুদিন পর তার মনে হয়েছিল যে, আবার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে নতুন করে বড় হয়, নতুন করে শিশু থেকে কিশোর; কিশোর থেকে যুবক। তারপর তার হৃদয়ের পুরোনো ও ব্যবহৃত প্রেমের সব মলিন ছোপ বিস্মৃতির খড়খড়ে শিরিষ কাগজে ঘষে ফেলে সেই নরম মেয়ের দুপুর ঘরের আসবাবের রঙের মতো নরম সাদা রঙ লাগায় তাতে নিজে হাতে।

মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর স্বগোতোক্তির মতো বলল, আমি কিন্তু চোখ দেখে বুঝতে পারি কে কি চায়। আমার কাছে কে কি চায়।

মানুষটি এই কথায় গুলিবিদ্ধ হরিণের মতো চমকে উঠল।

তারপর নিরুচ্চারে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মেয়েটিকে বলল, সত্যিই পারো বুঝতে? তাহলে তো বুঝেইছ সব কিছু। আর যদি ভুল বুঝে থাকো?

তারপর অনেকক্ষণ মানুষটি চুপ করে রইল। আনন্দে স্তব্ধ হয়ে বসে তার সামনে অন্য একজনের স্নিগ্ধ, সজীব সুন্দর উপস্থিতিকে সমস্ত অনুভূতি দিয়ে কোনো দুর্মূল্য আতরের মতো অনুভব

করতে লাগল।

মেয়েটি মাঝে মাঝে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিল, ঝর্ণার মতো হাসছিল, উঠে দাঁড়াচ্ছিল, লঘু পায়ে হরিণীর মতো হেঁটে যাচ্ছিল ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত— অ্যাসট্রে, এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ মানুষটি অব্যর্থভাবে বলল, এবার উঠি; অনেক দেরী হয়ে গেল।

মেয়েটি বলল, একটু বসুন, আমার ভাবী স্বামী এসে যাবেন একটু পর। আলাপ করিয়ে দেব।

হরিণটি আরও একটি হার্ড-নোজড় গুলি খেল। ওর বুকের মধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, রক্তাক্ত; ক্ষতবিক্ষত সব কিছু।

মানুষটি ... আহত মনটা টেনে টেনে নিজেকে ফিসফিস করে বলল, এলামই অবশেষে—কতদিন কত বছর পরে এলাম; কিন্তু বড় দেরী করে এলাম।

মেয়েটি কাকে যেন আমায় বলল, কাঁধের চুল ঝাঁকিয়ে, "আমি চোখ দেখে সব বুঝতে পারি।"

মানুষটি মনে মনে বলল, তাই-ই যেন সত্যি হয়। আমি বাঁচি তাহলে মুখ ফুটে বলার দায় থেকে।

কিংবা ও হয়তো জানে না, হয়তো মেয়েটি মিথ্যা বলল।

মানুষটি ভাবল, যারা অভিনয় করে, তারা যখন সত্যি কথা বলে তখন মনে হয় মিথ্যে বলল, আর যখন মিথ্যে বলে তখন মনে হয় সত্যি!

কবি মানুষটি তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত সত্তাকে একত্রিত করে কোনক্রমে সমস্ত শক্তি সামিল করে উঠে দাঁড়াল।

হাত জোড় করে নমস্কার করল, বলল, চলি; সত্যিই বড় দেরী হয়ে গেল। বড় দেরী হয়ে গেছে আমার।

মেয়েটি বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল তাকে।

সপ্রতিভভাবে বলল, খুব খুশী হলাম এলেন বলে, আপনার সঙ্গে আলাপ হল বলে।

কিন্তু একবারও বলল না যে, আবার আসবেন।

শেষ দুপুরের চিল চিঁ চিঁ করে উড়ছিল ঝিকমিকে শান্ত শীতের আকাশে। নারকোল গাছের চিরুনি চিরুনি পাতায় রোদ চমকাচ্ছিল। এই শেষ দুপুরের মতোই ভবিষ্যৎহীন, একা মানুষটি পথে নামল।

ফুটপাথের বাঁদিকে অনেকখানি কাগজ ডাই করে ফেলা ছিল। আশেপাশের বাড়ির ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট শূন্য করা হয়েছে এখানে। কাছে যেতেই মানুষটি দেখল যে, কাগজ নয় ওগুলো, ছিঁড়ে ফেলা চিঠি, খাম, এই-ই সব। কেউ কাউকে লিখেছিল কখনও। ছেঁড়া খামের উপরে ডাক টিকিটের ছাপ দেখতে পেল ও।

ঐদিকে চেয়ে ওর মনে হল, কিছু কিছু চিঠি থাকে যা চিরজীবন ধরে লিখেই যেতে হয় শুধু; তারপর কাটাকুটি করতে হয়; ছিঁড়তে হয় বারে বার আবার নতুন করে লিখতে হয়; কিন্তু সেসব চিঠি ডাকে পড়ে না কখনও। সব চিঠি বোধ হয় ডাক-বাক্সের জন্যে নয়। যাকে লেখা, তার ডাক মনে মনে শুনতে না পেলে কাগজের চিঠি ডাকে দেওয়া নিরর্থক।

জীবনের একটি অত্যন্ত জরুরী ও দামী চিঠি পোস্ট অফিসের লাল বাক্সে না ফেলে যে মস্ত বড় লজ্জা ও গ্লানির হাত থেকে সে বেঁচেছে একথা বুঝতে পেরে ও মনে মনে খুব খুশী হল। আশ্বস্তও।

কিন্তু পথের বাঁকে এসে পিছন ফিরে গর্বিনীর বাড়ির বন্ধ গেটে চোখ পড়তেই ওর মনটা চিলের চিৎকারের মতো, ঘূর্ণি ঝড়ের মতো, এক উৎসারিত উদাস, তীক্ষ্ণ রুক্ষতার বিবশ বিষণ্ণতায় ভরে গেল।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে, পথের পাশের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনতে কিনতে মানুষটি হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই ঠিক করে ফেলল যে, এবার থেকে ও শুধু নিজেকেই ভালো-বাসবে।

অথবা, নিজের হৃদয়ের মধ্যের ভালো-বাসার ক্ষমতাকে।

ওর মনে হলো যে, কোনো ভালবাসারই কোনো পরিণতি থাকে না। এক ভালোবাসা অন্য ভালোবাসাকে ঠুকরোয়, কামড়ায় চুমু খায়, শেষে গিলে ফেলে পিরানহা মাছেদের মতো। মৃত ভালোবাসার গর্ভেই আবার নতুন ভালোবাসা জন্ম নেয়। চিরদিন।

বাস স্টপেজের উল্টোদিকে একটি হোর্ডিং-এ সেই নায়িকার একটি বিরাট প্রতিকৃতি দেখতে পেল মানুষটি।

বাস আসছিল পথে ধুলো উড়িয়ে। ক্যানভাসে আঁকা সেই সুন্দরী নায়িকার আবক্ষ ছবিটি হাওয়ায় কেঁপে উঠল। মানুষটি মুখ তুলে চাইল, মনে হল, মেয়ে-টির বুকের মধ্যে বড় কষ্ট, চাপা কষ্ট, যে কষ্ট সেই মানুষটির নিজের কষ্টের চেয়েও বেশী।

মানুষটি বলল, তোমার সব কষ্ট আমাকে দেবে? দেবে তুমি? সুখের ভাগী-দার নাই-ই বা হলাম, আমায় তোমার কষ্টের ভাগীদার কোরো।

মানুষটি দু'চোখ ভরে তার কল্পনার প্রেমিকার দিকে পৃথিবীর সমস্ত শুভ-কামনা নিয়ে চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই ঘড়-ঘড় শব্দ করে কুৎসিত কর্কশ বাস্তবতার বাসটা এসে দাঁড়াল সামনে। তার নায়িকাকে আড়াল করে।

ডিজেলের পোড়া গন্ধে তার নাক ভরে উঠল। বাস্তবতার বাসে চড়ে মানুষটি ছুটে চলল দূরে; তার সুন্দর ... সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে।

মানুষটি ভাবল, কি লাভ হল, এত-দিন পর তাকে দেখে; ... মিছি-মিছি?

তারপরই ওর মনে হল সমস্ত জীবন-টাই বোধহয় মিছিমিছি, ... সে উদ্দেশ্যে তা ... কেন?

মিছিমিছি ভালোবাসা, মিছিমিছি ... খাওয়া, মিছিমিছি কাছে যাওয়া; ... জীবনই মিছিমিছি।

আনন্দমুখর তরুণদের পোশাক
জিয়াজী কাপড় জীবনকে করে
আধুনিক ডিজাইন,
অপূর্ব মনোহর রঙে—কটন স্যুটিং, শাড়ি আর
উৎকৃষ্ট কাপড় আপনার জন্যে
জিয়াজী
বিরলানগর, গোয়ালিয়র (ম.প্র.)
MAPP JCP 7610 Ben

গ্রামের মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে এখন কতখানি সচেতন? অথবা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার দিক দিয়ে কারা বেশি নিজস্ব উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছে—গ্রামের, না শহরের ছেলেমেয়ে? কিংবা, বিজ্ঞানকে জীবনমুখী করে তোলার প্রবণতা কোথায় প্রকট—গ্রামে না শহরে?

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর সভাপতি ডঃ রাজা রামান্নার উত্তর: শহরে নয়, গ্রামে। 'সায়েন্স ইন রুরাল এরিয়াজ প্রোডিউসেস মোর ইমপ্যাক্ট।' আর এটা করার জন্যে কোন কৃত্রিম উপগ্রহের দরকার হয় না। তথাকথিত জটিল যন্ত্রপাতিও লাগে না। বিজ্ঞানের যা কিছু গ্রামের ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরা হয়, আমি লক্ষ করেছি তার সব কিছুতেই তাদের সমান কৌতূহল। বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের মধ্যে ওদের মধ্যেই আমি সবচেয়ে বেশি নিজস্ব চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর লক্ষ করেছি। কেন? সম্প্রতি দিল্লিতে সারা দেশের ছেলেমেয়েরা মিলে যে বিজ্ঞান-প্রদর্শনী করল তার দিকে চাইলেই তো ব্যাপারটা বোঝা যায়। ওই প্রদর্শনীতে বেশির ভাগ পুরস্কারই এবার পেয়েছে গ্রামের ছেলেমেয়ে। কারণ তাদের প্রদর্শিত সামগ্রীর মধ্যেই স্বকীয় উদ্ভাবনার ব্যাপারটা অনেক বেশি ফুটে উঠেছিল। ওদের কাজকর্ম দেখে, ওদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, এতকাল শহরের মানুষ গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষকে বিজ্ঞান শেখাত। এবার গ্রামের ছেলেমেয়েরাই শহরে এসে শহুরেদের বিজ্ঞান শিক্ষার ভার নেবে। শহর কি ভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়, শহরের স্বাস্থ্য এবং নানা রকম সমস্যা কি করে দূর করা যায় তার পথ হয়ত তারাই দেখাবে।

হ্যাঁ, ২২ জানুয়ারি কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর একস্ট্রাকারিকিউলার অ্যাকটিভিটিজ-এর বাৎসরিক সভায় সমবেত বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-সংগঠকদের উদ্দেশ্যে এটাই ছিল ডঃ রামান্নার মূল বক্তব্য।

সভার শেষে গ্রামকে সংগঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞানমুখী করে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা কি সে সব নিয়ে ডঃ রামান্নার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনাও করেছিলাম।

ডঃ রামান্না বললেন, দেখুন, আমরা যারা শহরে বাস করি অথবা শহরে মানুষ,

গ্রামীণ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে একটি নতুন উদ্যোগ

গ্রামের মানুষের সমস্যা দূরীকরণের নেতৃত্ব এতকাল তাঁরাই দিয়ে এসেছেন। মুশকিল এই, এই প্রচেষ্টা যতখানি না বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত, তার চেয়ে বেশি পরিচালিত অদ্ভুত এক মনগড়া ধারণায়। তাতে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই, এযাবৎকাল আমাদের ভাবনা চিন্তার বোঝাটাই তাদের মাথায় আমরা চাপিয়ে দিয়েছি, তাদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তা যাতে বিকশিত হয় সে কথা কেউ একবার ভাবিনি। কিন্তু সময় পাল্টেছে। গ্রামের মানুষ এখন নিজেদের সমস্যাবলী দ্রুত বুঝতে শিখেছে। এবং এ ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্যোগ এবং কল্পনাশক্তিরও পরিচয় দিয়েছে।

*

উদাহরণ, সবুজ বিপ্লব।

অভিযোগ ছিল এদেশের চাষীরা ঘুমোয়। কাজ করে কম। শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের পেটে ভাত যোগানোর দায়িত্ব পড়ল তাদেরই ওপর। যে করেই হোক কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। এল নতুন নতুন নামের অচেনা সার। ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফসফেট। শুধু অচেনা নাম এক একটি রাসায়নিক সারের। এল নতুন নতুন নামের অধিক ফলন বীজ। তাদেরও নাম অপরিচিত। কত অদ্ভুত নামের সব কীটনাশক ওষুধ এল। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়ুয়ারা, নতুন নতুন কৃষি উপকরণ সম্পর্কে গ্রামের চাষীদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব পড়ল যাঁদের ওপর, তাঁরা ভাবলেন, এ সব খটমট বাঘা বাঘা নাম, লিটার, কিলোগ্রাম, হেক্টোয়ারে মাপের হিসেব, অশিক্ষিত চাষীর পক্ষে এ সব বোধগম্য করাই অসম্ভব।

কিন্তু ধারণাটা যে ভুল, তার উত্তর দিয়েছেন চাষীরা। ভারতের শতকরা ৮০জন মানুষের বাস গ্রামে। এখন গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে সবুজ বিপ্লবের গোড়ার দিকের চেয়ে। চাষীদের মধ্যে অনেকেই তখন ছিলেন নিরক্ষর। অক্ষর চিনে নিতে মোটেই পিছিয়ে ছিলেন না। দরকারটাই আসল সামনে তুলে ধরল সঙ্গে সঙ্গে তার অংশটাই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন সহজে অপরিচিত ইংরেজি নাম, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি বুঝে নিতে তাঁদের দেরি হয় নি। ফল, সবুজ বিপ্লব। তার সাফল্যের শুধু গ্রামের মানুষই নয়, শহরের মানুষও পেয়েছে।

ডঃ রামান্না বললেন, [illegible] চাই, এক্সপেরিমেন্ট। তাহলেই [illegible] বৈজ্ঞানিক প্রবণতা [illegible]—শহরের, না গ্রামের মানুষের?

এক্সপেরিমেন্ট। অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা আর কি।

কথাটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ [illegible]

শহরের কথাই ভাবুন। এখানে ইঁটের তৈরি বাড়ি, মাথার ওপর ইলেকট্রিক পাখা, জীবনকে আয়াসসাধ্য করার মত হরেক জিনিসের ছড়াছড়ি। যাদের বেশিরভাগ আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলেরই অবদান। এগুলিও যেমন আছে, সেই সঙ্গে আছে, নোংরা পথঘাট, ধোঁয়াশার রাজত্ব, ক্লেদপূর্ণ নালা নর্দমা, এবং ইত্যাদি। শহরের মানুষ শিক্ষিত, মাথা পিছু রোজগারও তাঁদের বেশি। বিজ্ঞান-শিক্ষা তাঁদের মধ্যে অনেকেই গুলে খেয়েছেন। অন্তত ডঃ রামাপ্পার ভাষায় গ্রামের মানুষের চেয়ে তাঁরা এক্ষেত্রে অনেক বেশি 'একস-পোজড্'। কিন্তু এ সব সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা বা উদ্যোগ, কই চোখে পড়ে না তো?

মাঝে মাঝে দেখি ঘটা করে আলোচনা-চক্র বসে। পুষ্টির ওপর। অথবা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে। একজন মন্ত্রী এসে আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন, নিদেন পক্ষে শিখরদেশের একজন আমলা। এর তাৎপর্য অবশ্য সহজ। আলোচনাচক্র বসাতে গেলে পয়সা চাই। ও'রা না এলে পয়সা জোটে না। তারপর চলে তত্ত্বের ফোয়ারা। মনগড়া তথ্যের পরিবেশন।

কিন্তু তারপর?'

গত পাঁচ বছরে শহর কলকাতার কথাই ধরুন? এ শহরে পরিবেশ দূষণের ওপরই কয়েক ডজন আলোচনাচক্র বসল। বক্তারা বুক চাপড়ে বললেন, গেল, গেল। শহরের মানুষের ফুসফুস নোংরা ধোঁয়ায় ফোঁপরা হয়ে গেল। কারখানার ধোয়ানি গঙ্গায় ইলিশ সাবাড় করে ফেলল।

কিন্তু তারপর?

উল্টোডাঙ্গা এবং মাণিকতলার ব্যাপক অঞ্চলে মাথা উঁচু করে চিমনিরা ঠিক আগের মতই নিকষ কালো ধোঁয়ার পর্দা ছড়িয়ে দিচ্ছে শহরের বুকে। কলকাতার গঙ্গার দুপাশের হাজার কারখানার ধোয়ানি এবং পৌর এলাকার ক্লেদাক্ত জল গঙ্গার ইলিশের ঝাঁক আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, মোহানারও ওপারে।

এত বড় একটি সমস্যা সম্পর্কে শহরের মানুষ মাথা ঘামান কতখানি? তাঁরা তো একসপোজারের মধ্যে রয়েছেন। সমাধানের রাস্তাও তাঁদের জানা। জেনেও এ ব্যাপারে এ সব সমস্যার সমাধানের সংগঠিতভাবে এখনও তাঁরা কিছু করেন না কেন?

প্রশ্ন করলেই কেউ হয়ত বলবেন, এ সব কাজ তো সরকারের মশায়। নালা নর্দমার জল নিয়ে মাথা ঘামাবে কর্পোরেশন, পথের জঞ্জাল তাদের সমস্যা। শহরের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্যে তো আইন রয়েছে।

কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় সংগঠন গড়ে তুলে ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের আইন যাতে ঠিক পালিত হয়, প্রতিটি পরিবারের জঞ্জাল রাস্তায় ছড়িয়ে না রেখে নির্দিষ্ট একটি আধারে জমিয়ে রাখলে যে জঞ্জাল সরিয়ে নেয়ার কাজ সহজ হয়—কই, এটুকু দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে শহরে কোন নজির তো এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে না?

*

বরং আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কয়েকটি বড় রকমের সমস্যার সমাধান করেছেন গ্রামের মানুষ। যাঁদের অনেকেরই হয়ত অক্ষর পরিচয় নেই, তাবা জ্ঞান আছে। উদাহরণ সবুজ বিপ্লব। আজকের চাষীকে আর বলে দিতে হয় না, কোন জমিতে কোন বীজ বসাতে হয়, কোন ফসলে কি সার দরকার হয় এবং কতটা। গভীর এবং অগভীর নলকূপ থেকে জল তুলে

কি ভাবে ছড়িয়ে দিলে জলসেচের সুযোগ পাওয়া যায় বেশি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে এ অভিজ্ঞতাও তাঁরা অর্জন করেছেন। তাঁরা জানেন ক্ষার-মাটি আর টক-মাটি কদের বলে, চাষবাসের ব্যাপারে তাদের নিয়ে সমস্যাই বা কি। ফসলের ওরা রোগ ধরতে শিখেছেন, ক্ষেতে অজানা পোকা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞদের যে সাহায্য নিতে হয়, সে কথাও তাঁরা জানেন। এবং বসে না থেকে কি ভাবে এ সব সমস্যার সমাধান করা যায় তার চেষ্টাও করেন। কখনও একক, কখনও সমবেতভাবে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গ্রামে ঘুরে অন্তত এই বিশ্বাস আমার হয়েছে, কখন সরকার করে দেবেন এর জন্যে বসে না থেকে অনেক গ্রামের মানুষ তাঁদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিচ্ছেন। এ ধরনের উদ্যোগ শহরে দেখি না।

*

গত দুই বছর কয়েক ডজন বিজ্ঞান প্রদর্শনী দেখেছি। শহরে এবং গ্রামে। বলতে বাধা নেই, এ ব্যাপারে শহরের ছেলে মেয়েরা আমাকে নিরাশ করেছে সব চেয়ে বেশি। তাদের বেশির ভাগ দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে ধরিকরা চিন্তা ভাবনার ভূমিকা প্রকট। পুঁথিগত অথবা জটিল যন্ত্রপাতির চমক।

তুলনায় গ্রামের বিজ্ঞান প্রদর্শনীগুলিতে অনেক বেশি সৃজনী শক্তির পরিচয় মেলে। যেমন একটি বিজ্ঞান ক্লাবে দেখলাম স্কুলের একটি ছেলে একটি ঘানি তৈরি করেছে। কম পরিশ্রমে এই ঘানির সাহায্যে তেল উৎপাদন করা যায়, দেখলাম। সুন্দরবন অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার সাহায্যে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে তার একটি চমকপ্রদ মডেল তৈরি করেছে আর একটি গ্রামের একটি ছাত্র। তাক লাগান কলকব্জা নেই। নিজের চেষ্টায় সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করেছে। জোয়ারের সময় যেমন জলের গভীরতা বাড়ে, সেই জল কোন পদ্ধতিতে টারবাইন ঘোরায়—বিশদ দেখিয়েছে ছেলেটি। আর একটি বিজ্ঞান ক্লাবের একটি ছেলে তার স্থানীয় অঞ্চল থেকে ১১০ রকমের মাকড়সা সংগ্রহ করে দেখাল। দর্শকরা তো অবাক। সত্যিই এক জায়গায় এত রকমের মাকড়সা পাওয়া যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব দেখে মনে হয়েছে গ্রামের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের এতটুকু কিছু জানলে নিজেরা তা নিয়ে ভাবে। সেই ভাবনার মধ্যে অনেক বেশি নিজস্বতার পরিচয় দেয়।

*

ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর একস্ট্রাকারিকিউলার অ্যাকটিভিটিজ-এর সভায় সেদিন এ কথারই সমর্থন করলেন ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ পি কে আয়েঙ্গার।

ডঃ আয়েঙ্গার বললেন, প্রকৃতিতে নেই, এমন জিনিস মানুষ কবে আবিষ্কার করেছে? আমাদের চারপাশে উদ্ভিদ জগৎ। তারা জন্মায়, বাড়ে, ফল দেয়। এ সবের কায়দাকানুন লক্ষ করেই তো আমরা গড়ে তুলেছি আমাদের উদ্ভিদ সংক্রান্ত জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করেই আবার আমরা কৃত্রিম পদ্ধতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক পদ্ধতির নকল করে উদ্ভিদের চাষ করি আমাদেরই প্রয়োজন মেটাতে। পারমাণবিক বিভাজন করে এখন আমরা বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করি, করছি। না, এটা কোন আবিষ্কার নয়। আফ্রিকার ইউরেনিয়ামের একটি খনিতে প্রকৃতি এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কতকাল ধরে, কে জানে? সূর্যতে নিয়ত চলছে তাপ পারমাণবিক সংযোজন বা থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন। এখন পৃথিবীর বুকে এই পদ্ধতি নকল করার চেষ্টা চলছে শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে জানুন। তার কার্য-কারণ সম্পর্কটি বুঝে নিন। এই বোঝার মধ্যে দিয়েই জীবনকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা সম্ভব। এ কাজ পুঁথিগত শিক্ষায় হয় না। দরকার ভিন্নতর পদ্ধতি।

*

অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনন্দমোহন ঘোষের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। অধ্যাপক ঘোষ বললেন, তিনটি বিষয়ের কথা আমরা ভাবছি এখন। এক, আগামী পনের বছরে ভারতের জনসংখ্যা আরও কয়েক কোটি বাড়বে। দুই, সে তুলনায় স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ান সম্ভব হবে না। তিন, আমরা এমন কিছু কিছু পদ্ধতি কাজে লাগাতে চাই, যা প্রচলিত স্কুল-কলেজীয় শিক্ষা ছাড়াই আগামী দিনের ছেলে-মেয়েদের মনে এবং কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে একটি প্রত্যয় সৃষ্টি করে।

প্রতিষ্ঠানটির অফিস এখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। একে সাহায্য করার জন্যে সম্প্রতি এগিয়ে এসেছেন দিল্লির ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এবং বোম্বাই এ মিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি বিজ্ঞান ক্লাব এবং সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই সব ক্লাবের বেশির ভাগই গ্রামে অবস্থিত। কাজ করছেন গ্রামের ছেলেমেয়ে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষক। পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, কৃষি-প্রকৌশল প্রভৃতি সমস্যা

নিয়ে তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে সমীক্ষা চালাচ্ছেন। গত তিন মাসে এইসব সমীক্ষা থেকে যে সব তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, দেখলে অবাক হতে হয়। জনৈক শিক্ষক কর্মী বললেন, এর ফলে সমস্যাগুলির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আমরা হাতে কলমে বুঝতে পারছি। শুনলাম, এর পর তাঁরা ওই সব তথ্যের ওপর নির্ভর করে স্থানীয় কয়েকটি সমস্যা দূরীকরণের ব্যাপারে হাত দেবেন।

প্রশ্ন করেছিলাম, স্থানীয় অধিবাসীরা আপনাদের কাজকর্মে কতটা সাড়া দিচ্ছেন। ভদ্রলোক বললেন, প্রথমে অনীহা ছিল। এখন তাঁরা বুঝছেন, আমরা উপকারে লাগব। তাই কেউ কেউ সাহায্যও করছেন।

বিজ্ঞানকে গ্রামীণ স্তরে ফলপ্রসূ করে তুলতে, হলে এ ধরনের পদ্ধতির ওপরই জোর দিতে হবে বেশি। গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলে সুচিন্তিত এবং বাস্তবধর্মী প্রকল্প নিয়ে কাজে হাত দিলে এ ব্যাপারে সাহায্যকারীরও হয়ত অভাব হবে না।

সমরজিৎ কর

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাণ্ডারী সুধীরচন্দ্র কর

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

"লেখার যত আবর্জনা, জেনে রেখো সকলে
সমস্ত হয় কর মশয়ের দখলে।"
—রবীন্দ্রনাথ

সুধীরচন্দ্র কর ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের লেখার ভাণ্ডারী এবং রবীন্দ্র-রচনা মুদ্রণ কার্যে কবির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। সুদীর্ঘ কাল তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের গভীর এবং অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই মানুষটির প্রতি গুরুদেবেরও সর্বদা বিশেষ প্রীতি ও স্নেহ দৃষ্টি ছিল।

গত ১৫ জানুয়ারি ১৯৭৭ শান্তিনিকেতনে ৭৪ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের সাহিত্য জীবনের সহকারী সুধীরচন্দ্র কর পরলোকগমন করেছেন।

শান্তিনিকেতনে সুধীরচন্দ্র প্রথম কর্ম-সূত্রে যোগ দেন ১৩৩৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে। তখন তিনি এসেছিলেন শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের নিতান্ত একজন সাধারণ কর্মীরূপে। কিন্তু ছয় মাস যেতে না যেতেই রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে আহবান করে আনলেন কবির খাস দপ্তরের কাজে। কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে কাজের সমস্ত দায়িত্বভার বুঝে নিলেন সুধীর কর।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতা রচনার প্রেরণায় সুধীর করের ভূমিকা কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' বইয়ের অনেক কবিতা লিখিয়ে নেওয়ার মূলে ছিলেন সুধীর কর। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন আত্মমগ্ন হয়ে, আর সেগুলি সযত্নে কপি করে সঞ্চয়ের ঝুলিতে জমা করে নেবার ভার ছিল সুধীর করের। ভাণ্ডারে দশটি কবিতা জমা হয়েছে,

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য-ভাণ্ডারী সুধীরচন্দ্র কর
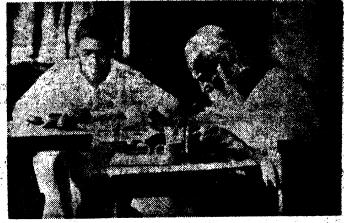
সুধীরচন্দ্র গুরুদেবের কাছে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন—বলছিলাম আর দুটো হলেই এক ডজন হোত। কবি বলতেন—তোমার ফরমাস মেনে বুঝি কবিতা লিখতে হবে আমাকে?—পালাও। তারপর সত্যিই যখন বারো নম্বরের কবিতা লেখা শেষ হোত, তখন হেসে কবি বলতেন—এবার হোলো তো তোমার এক ডজন! সুধীরচন্দ্র তখন ইতস্তত করে বলতেন—এক ডজন হোলো ঠিকই, কিন্তু সবাই বলছিল এবার অন্তত পঁচিশটা চাই।

দপ্তরের কাজে সুধীরচন্দ্র সব সময়ই থাকতেন কবির কাছাকাছি। সামান্য সুযোগ পেলেই তিনি কবির নিকট গুনগুন করে আব্দার জানিয়ে আসতেন আরো আরো আরো লেখার জন্য। সেজন্য কবির কাছ থেকে মাঝে মাঝে তাঁকে গঞ্জনাবাক্যও শুনতে হোত। কিন্তু এ ব্যাপারে সুধীরচন্দ্রের অধ্যবসায় ছিল অদম্য। গুরুদেব বলতেন—বাঙালের গোঁ।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই সুধীরচন্দ্রকে কৌতুক করে 'বাঙাল' বলে ডাকতেন। লেখার ব্যাপারে এই 'বাঙালের গোঁ'কে কবি অবহেলা করে থাকতে পারতেন না, কলম তাঁকে হাতে তুলে নিতেই হোত। 'বাঙালের' আবেদন কবির স্নেহ পরিপূর্ণ মনকে অচিরেই স্পর্শ করতো। এ বিষয়ে কবি নিজেই স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন তাঁর শেষ বেলাকার একটি কবিতায়। শেষ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে রচিত সেই কবিতাখানি—

বাঙাল যখন আসে মোর গৃহদ্বারে
নূতন লেখার দাবি লয়ে বারে বারে
আমি তারে হেঁকে বলি সক্রোধ গলায়
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি কাব্যের কলায়।
মনে মনে হাসে
তবুও সে ফিরে ফিরে আসে,
তারপর এ কী।
সকালে উঠিয়া দেখি
নির্লজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে
গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিমবঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নাই জেদের অপ্রতিহত
জোর।

কবিতাটির রচনাকাল ২ [illegible]

১৯৪০। এর কয়েক দিন পরেই গুরুদেব সুধীর করের নাম দিয়ে একটি ছড়া লিখলেন—

সুধীর বাঙাল গেল কোথায়
সুধীর বাঙাল কৈ?
সাতটা থেকে আমার মুখে
নেই কথা এই বৈ!

তারপরে কবি আরও একটি ছড়া লিখলেন—

নাকে ভগা বাঁসিয়া হাসে
দেয় না স্পষ্ট জবাব বাঙাল
কাজ করে সে খোল আনায়
খাতা এবং ছাপাখানায়
মাঝখানে সে বাঁধে জাঙাল।

অতঃপর কবি আরও একখানি ছড়া লিখলেন সুধীর করকে নিয়ে—

সুধীর যখন কর্ম করেন সুধীর করক্ষেপে
ধৈর্যহারা কবি থাম যে ক্ষেপে।
রেগেমেগে কানুরামকে বলেন—
'সুধীর কর-কে' খোলাও জলদি করকে।'
মাথা চুলকে বাঙাল যখন সামনে এসে
দাঁড়ায়
তখন তাঁহার মুখের ভাবটা উষ্মা তাঁহার
তাড়ায় ॥

রবীন্দ্রনাথের রচনা কপি করতে করতে শেষের দিকে সুধীর করের হস্তাক্ষর একেবারেই রবীন্দ্রনাথের মত হয়ে গিয়েছিল। সুধীর করের কপি-করা কাগজকে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের মূল পাণ্ডুলিপি বলে ভ্রম হয়।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কবির সুরের ভান্ডারী আর সুধীরচন্দ্র কর ছিলেন কবির শেষ বয়সের যাবতীয় রচনার ভান্ডারী। শান্তিনিকেতনে ৮।২।৪১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি কাগজে সই করে লিখে গেছেন—

লেখার যত আবর্জনা জেনে রেখো সকলে
সমস্ত রয় কর মশায়ের দখলে।

সুধীরচন্দ্র ব্যক্তিত্বে ছিলেন অমায়িক শান্ত এবং ধীর। আজ মনে পড়ছে, তাঁর কাছে বসে গুরুদেব সম্পর্কে কত দিন তাঁর কত স্মৃতিকথাই না শুনেছি। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর আনুকূল্যে 'প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে কাজ হাতে নিয়ে বারে বারেই তাঁর কাছে গেছি, তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশাদি নিয়ে এসেছি। দেখেছি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আকুলতার অন্ত ছিল না।

সুধীরচন্দ্র সমগ্র জীবনে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। প্রথম জীবনে তিনি বিশেষভাবে কাব্যচর্চায় নিরত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে ১৩৩৪ অগ্রহায়ণে তিনি আসেন এবং তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ সুরধনী প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ চৈত্র মাসে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ পাঠ করে যে অভিমত লিখে দেন কাব্যগ্রন্থে সেটি মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'ইহার অনেকগুলি কবিতা আমার ভালো লাগিল।. ভাষা, ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যে এগুলি সুন্দর হইয়াছে।' সুধীরচন্দ্রের অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ : ওপারেতে কালো রং, আগামী সেদিন নয় দূরে, টুকরো-টুকরো, অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু, চিত্রভানু। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : কবিকথা, জনগণের রবীন্দ্রনাথ, কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা, রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র পরিচয় এবং জনগণমন-অধিনায়ক।

সুধীরচন্দ্রের জন্ম তারিখ ৩ বৈশাখ ১৩০৯ (এপ্রিল ১৯০৩); জন্ম স্থান পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার ঝিকারী গ্রাম।

অবিস্মরণীয় এক সাহিত্যিক প্রেমকাহিনী

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

বলদেশে, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এই শেষাশেষি পর্যন্ত, কত রকমের প্রেমের ঘটনা দেখা ও শোনা গেল, এবং বাংলাভাষার ঔপন্যাসিক গল্পকারেরা বিভিন্ন ধরনের নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে কত কাহিনীই যে লিখলেন তার সীমা সংখ্যা হয় না।

কিন্তু বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদিকা ও নবীন উঠতি লেখকের প্রণয়ের ঘটনা ঐ একবার। গল্প উপন্যাসে নয়, বাস্তবে।

কবে ঘটেছে এমন ব্যাপার? দু'চার বছরের মধ্যে? নাকি খোদ একেবারে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে? প্রায় ৭৭ বছর আগে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল সেই অনবদ্য প্রণয় পর্ব। সময়কালটা আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, তখন মহারাণী ভিকটোরিয়ার রাজত্ব।

নায়ক-নায়িকার নাম গোড়াতেই বলব না। বরং কাহিনী আরম্ভ হোক। মাঝে মাঝে কিছু ইংগিত, যাকে বলে হিন্টস দেওয়া থাকবে। শেষ পাতা উলটে দেখে নেওয়ার আগে পাঠক নিজেই মাথা খাটিয়ে বার করুন না নায়ক-নায়িকার পরিচয়।

অতি চিত্তাকর্ষক পটভূমিকা একটু বুঝে নেওয়া যাক। অভিজাত মাসিকপত্রটির নাম সবাই চেনে একডাকে। প্রণয় পর্বের সময়ে পত্রটি নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে একটানা প্রায় ২৩ বছরে পদার্পণ করলো বলে। অবশ্য, একক কোনো ব্যক্তি এই দীর্ঘ সময় ধরে মাসিকপত্রটির সম্পাদক পদে আসীন থাকেন নি। সম্পাদক বদলী হয়েছেন বেশ কয়েকবার। আমাদের উচ্চ-শিক্ষিতা তরুণীটি সম্পাদনার হাল ধরেছেন অতি সম্প্রতি, ১৮৯৯র ঘটনা যখন, তখন তো আর না বললেও চলে, বঙ্গ ভারার সবচেয়ে খ্যাত ব্যক্তি ৩৮ বছরের রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র নেই। হেমচন্দ্র নবীন-চন্দ্র থাকলেও তাঁদের লেখার জেল্লা ও খ্যাতি দ্রুত কমে আসছে। তাই, পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল বাদানুবাদ চললেও—রবীন্দ্রনাথ নামক এক অসামান্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সকলের কাছেই পরিষ্কার। বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরো কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম দিকে, প্রধানত আলোচ্য মাসিকপত্রটির মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে-ছিলেন।

এবার নবীন লেখকের খোঁজ নেওয়া যাক। ও'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ প্রায় ৭ বছর আগে থেকে। গোড়া থেকে তিনি গোঁড়া রবীন্দ্র ভক্ত। শুরুতে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়নি। উদগ্র আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে লম্বা চিঠি পাঠিয়ে জানাতেন মতামত। চিঠিগুলিতে ভক্তের উচ্ছ্বাস ছিল—ঠিক, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল অসাধারণ সাহিত্য প্রীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ খানিক নির্ভুল ধারণা। রবীন্দ্রনাথ এ কারণে চিঠিগুলির নিয়মিত জবাব দিতেন।

নবীন লেখকের আর্থিক অবস্থা সুবিধের নয় মোটেই। দরিদ্রই বলা যায় হয়তো বা। বাবা রেলওয়ের সিগনালার। সে যুগের প্রথা অনুযায়ী ২০ বছরের মাথায় নবীন লেখকের বিয়েও হয়ে গেছে এক ত্রয়োদশীর সঙ্গে। কয়েক বছর পরে দুটি সন্তানের পিতা।

আমরা "নবীন লেখক" বলছি বটে, উনি কিন্তু তখন নিজেকে লেখক হিসেবে গণ্য করেন না। নিজের পরিচয় দেন—'সাহিত্য অনুরাগী'। টুকটাক কবিতা লেখার অভ্যেস আছে। রোমান্টিক কবিতা। গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হতে আদৌ সাহস নেই। ওঁর দৃঢ় ধারণা, সার্থক গদ্য লেখা তাঁকে দিয়ে হবার নয়। কারণ ওঁর মতে, "ভাষার পাঁচুনির কাজ বড়ই শক্ত।"

উনি তো আর জানতেন না—পরবর্তী কালে তাঁকে গদ্যেরই লেখক হতে হবে। গদ্য রচনায় কি দুর্দান্ত খ্যাতি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে, সে কথা তাঁর তখন কল্পনারও বাইরে ছিল। যাই হোক, খুচরো রোমান্টিক কবিতা লেখার ফাঁকে নবীন লেখক ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের যে মাসে "দাসী" মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা লিখলেন। চমৎকার লেখা। বিশেষত, অতি সরস ভঙ্গীটি ভালো লেগেছিল অনেকের। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি তৎকালীন সাহিত্য-রসিকদের অনুরাগ-বিরাগ প্রসঙ্গে যে সব অম্লমধুর মন্তব্য আছে তা অত্যন্ত উপভোগ্য। একটুখানি উদ্ধৃত করি—"যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল, রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিত রুচি নব্য যুবক—ইঁহারা সকলেই এক-প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—অনুব্যের চিড়িয়াখানা।

(ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কানে দাশু রায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দ পারিপাট্য এমনই লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়...। তদ্ভিন্ন ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মস্ত

দোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। যাহাকে এখন উলঙ্গ অবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিতেছি, আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে—দেখুন, অমুক এমন হইয়াছে। হয়তো আমি তখন বলিব—কে অমুক? আরে না, না, ওসব বাজে কথা...। বৃদ্ধের কাছে, যাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় মনে হয়। নূতন কিছুই (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) ভালো লাগে না। সুতরাং, নব্য কবির রচনা কেমন করিয়া ভালো লাগিবে?

(খ) প্রৌঢ়—ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাহার কারণ হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়-বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়া টুং টাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রী-গুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড় ছড় শব্দমাত্র করিয়া থামিয়া যায়।

(গ) যুবক—যুবকদের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ হইয়া থাকে—এটা নিতান্ত স্বাভাবিক।...কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জ্যাঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এই সকল যুবককে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়ে দেখিলে কুৎসিত হাসি তামাশা করে। (৩) কোনো নূতন ভালো বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে।

দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা রবিভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ...রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে, যদি কাহারও হৃদয় বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়, আরও বড়, আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয় বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোনও লাঠিই নাই। তাহার ভিতর এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করিতে পায় না। এমন লোক তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা তো করিবেই।"

"দাসী" মাসিক পত্রিকা বেশ চালু। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কাজেই গদ্য রচনার প্রথম আবির্ভাবেই নবীন লেখকের একটুখানি নাম হয়ে গেল। এবার মহিলা নামের আড়ালে দুটি ছোটো গল্প পাঠালেন। ছাপাও হলো। প্রায় এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। নবীন লেখক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ১২ বছরের ছোট। শান্ত ভদ্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী তরুণ সহজে স্নেহেই আদায় করে নিলেন অকৃত্রিম স্নেহ। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেই নবীন লেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন প্রায়শঃ। নিভৃতে বসে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। প্রকৃত ছোটো গল্পের বিশেষত্ব কেমন হওয়া উচিত এবং লেখার কলাকৌশলই বা কি রবীন্দ্রনাথ তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। প্লট কিভাবে সাজাতে হয়, সে সম্বন্ধেও নবীন লেখক অনেক কিছু শিখলেন।

নবীন সাহিত্যিক যদিও সব সময়ে হাসিমুখে থাকেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর পারিবারিক জীবনে গুরুতর বিপর্যয়ের পালা শুরু হয়েছে। দুটি সন্তান রেখে স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটলো। বাবারও মৃত্যু হলো। সংসারের সমস্ত ঝক্কি এখন নবীন সাহিত্যিকের কাঁধে। সামান্য চাকরি। তবে, মা এবং নিজের দুটি শিশুসন্তান নিয়ে ছোট্ট সংসার, তায় আবার শস্তাগণ্ডার দিন তো—অল্প আয়েও কোনো রকমে চলে যায়।

নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফলে জোড়া-সাঁকোর বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। সাদামাটা অথচ বুদ্ধিমান এই তরুণ সকলেরই প্রীতিভাজন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাইয়ের অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় এলেন ফিরে। উঠেছেন বিরজিতলাও-এর বাড়িতে। [বাড়িটি এখন আর নেই। সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালের উলটো দিকে আজ যেখানে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালের জমি—সেখানেই ছিল এই বিখ্যাত বাড়িটি।] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীন সাহিত্যিক এ বাড়িতেও আসেন বেশ কয়েকবার।

এবার তরুণী সম্পাদিকার খোঁজ নিতে হয়। ওঁর মায়ের কথা অবশ্যই আগে বলে নেওয়া চাই। তরুণী বিদুষী মায়ের বিদুষী কন্যা। মা দুর্দান্ত খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা—একবাক্যে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। প্রকৃতি অত্যন্ত রাশভারি। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যটি এই যে, তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লেখা তাঁর উপন্যাসের নাম "দীপ নির্বাণ।" এ ছাড়া বাংলা মাসিকপত্রের তিনিই প্রথম মহিলা সম্পাদক। মাসিক পত্রটি অনেক বছর আগে (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) একবার ডুবুডুবু হয়েছিল, তিনিই সে সময়ে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে অসামান্য কৃতিত্বে রক্ষা করেছিলেন সেটি। ডাকসাইটে রূপ যাকে বলে চোখ-ধাঁধানো সুন্দরী। কন্যা অবশ্য মায়ের রূপ অতখানি পাননি। সুন্দরী নন—সুশ্রী বলা যায়। কিন্তু গুণ অনেকগুলি পেয়েছেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্না অতি

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা নবীন সাহিত্যিকের কয়েকটি চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। অতি সরস চিঠিগুলির সামান্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করি।

(১) "আজ সন্ধ্যায়—দেবী আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন 'একপাত্র সরবৎ' গ্রহণ করিবার জন্য। আপনার বিদ্রোহিতা দমনের জন্য তাঁহাকে একটা পরামর্শ দিয়া আসিব কি? নাহিলে কিছু ঘুষ দিন। যদি না দেন, তবে বারান্তরে নিশ্চয়ই বলিয়া আসিব।" (২৪ আষাঢ় ১৩০৬)

(২) "চৈত্রের বিজ্ঞাপনে ব্যাপারটা এইরূপে ঘোষণা করা হইতেছে। 'বৈশাখে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ধারাবাহিক গল্প আরম্ভ করিবেন। উহা উপন্যাস ও প্রহসনের মধ্য জাতীয়। বঙ্গ সাহিত্যে উহা সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী হইবে।' আশা করি আপনি সম্পাদিকা [illegible] বিপন্ন করিবেন না। বেশি দেরি হইলে আপনার নামে টেলিগ্রাম যাইবে। এই গোপনীয় সংবাদ আপনাকে ফাঁস করিলাম।"

অবশেষে 'চিরকুমার সভা'র পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার টেবিলে এসে পৌঁছল। নবীন সাহিত্যিক ঔৎসুক্য সামলাতে না পেরে,

তরুণী সম্পাদিকাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] আগেই পঁচিশকুমার [illegible] [illegible] [illegible] পরে। তারপর লিখলেন "—[illegible] [illegible] দিয়া পঁচিশকুমার [illegible] পাণ্ডুলিপিতেই পাঠাইয়া লইয়াছি। উহা [illegible] ও [illegible] কোনও কোটাতেই পড়ে নাই বটে—কারণ উহা লেখা দেওয়া [illegible] দেওয়া দরকার।"

নবীন সাহিত্যিক নিজের লেখা যে সব গল্প ও প্রবন্ধ তরুণী সম্পাদিকার হাতে দিতেন—সম্পাদিকা, দরকার মতো, এর্‌টু-খানি কলম চালিয়ে এডিট করে সেগুলি প্রকাশ করতেন তাঁর মাসিকপত্রে। নবীন সাহিত্যিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে হল নবীন সাহিত্যিক তাঁর লেখায় এডিটিং-এর প্রশ্নে কিছু ক্ষুব্ধ। তাই এ সম্বন্ধে তিনি তরুণী সম্পাদিকার কাছে চিঠি লিখলেন। তরুণী সম্পাদিকা অবশ্য, ঐ চিঠি পড়ে, নবীন সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করায়, পুরো ব্যাপারটাই ফাঁস হয়ে যায়। কেননা মহা অপ্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠালেন, "আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আপনি সম্পাদিকা মহাশয়াকে বলিয়াছেন যে, আমার লেখা কাগজে প্রকাশ করিবার সময়ে তাহাতে কিছু সম্পাদকীয় পরিবর্তনাদি করিলে আমি ক্ষুব্ধ হই। যদিও সে ক্ষেত্রে কোনো মত প্রকাশ করিতে চাহি না। —আপনার প্রতি আবেদন এই যে, আমাকে জানিতে দেওয়া হউক, কবে আপনার নিকট এ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি?"

অবশেষে 'দেবী' 'মহাশয়া' ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু নামটিই এলো রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা নবীন সাহিত্যিকের চিঠিতে —"আমি আজ দুটো অবধি একটা গল্প লিখে '—'কে পাঠালাম। লিখে লিখে হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তাই আমার লেখা এত খারাপ হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না।"

প্রণয়ের সংবাদ ক্রমে ক্রমে গুরুজনদের কানে পৌঁছলো। নবীন সাহিত্যিককে মেয়ের পক্ষের অভিভাবকেরা পছন্দ তো করতেনই। বুদ্ধিমান, রুচিসম্পন্ন, স্বভাব চরিত্র অতি নির্মল। আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু নবীন সাহিত্যিককে বাড়ির জামাই-রূপে মেনে নেওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা হল ওঁর আগের পক্ষের দুটি সন্তান। এমন পাত্রের সঙ্গে আদরিণী কন্যার বিয়ে দেবেন নাকি দেবেন না—অভিভাবকরা ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, স্বয়ং কন্যাই, নবীন সাহিত্যিকের দুই সন্তানের প্রশ্নে আপত্তির কোনো কারণ দেখছে না, এমনকি এ বিয়ের সম্মতি স্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করেছে, তখন অভিভাবকরা আর বাধা দিলেন না।

কিন্তু আরেক জটিল সমস্যাও সামনে

এসে দাঁড়ায়। নবীন সাহিত্যিকের অনেক গুণ থাকলেও চাকরি করেন যে অতি সামান্য। আর্থিক সম্পত্তি খুবই কম। এ হেন পরিস্থিতিতে বিদুষী কন্যার সঙ্গে এ বিয়ে ঠিক খাপ খাবে কি? আর্থিক অসচ্ছলতা এদের দাম্পত্য জীবনে অসন্তোষ টেনে আনবে না তো? কন্যা যথেষ্ট সচ্ছল পরিবেশে ও নানা আদবকায়দার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে, তার পক্ষে হঠাৎ দরিদ্র জীবনে মানিয়ে নেওয়া প্রকৃতপক্ষে কতখানি সম্ভব।

গুরুজনেরা নানা শলাপরামর্শ করেন। কিন্তু মুশকিলের আসান করে দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তিনি নবীন সাহিত্যিককে ইংলণ্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসার প্রস্তাব দিলেন। বছর তিনেক খেটে পড়লে পাশ না করার কারণ নেই। সমস্ত খরচ খরচার দায়িত্ব তাঁর।

চমৎকার প্রস্তাব। কিছুটি বলবার নেই। বিদুষী তরুণী ও নবীন সাহিত্যিক—দুজনেই কয়েক বছর অপেক্ষায় রাজী। বিলেত যাত্রার দিনক্ষণ-ও স্থির হয়ে গেল।

সকলেই খুশী। কিন্তু নবীন সাহিত্যিক মনে মনে জানতেন, এই বিয়ে অতো সহজে হবার নয়। কারণ, তার পক্ষের একমাত্র অভিভাবকা যিনি, অর্থাৎ তার মা—তাকে রাজী করানো খুব কঠিন। সেকেলে অতিরক্ষণশীলা মা ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়েতে মত দেবেন কি? তার ওপর, বয়স্থা, এতো লেখাপড়া জানা কন্যা বলে কথা! পুত্রবধূরূপে মা বরণ করবেন কি?

ছেলে আবার মাকেও খুব ভালো বাসেন। তাই, ও'র মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষায় তাঁকে হেনস্থা করেন-ই বা কি ভাবে?

মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন নবীন সাহিত্যিক, অর্থাৎ মা-কে আপাতত কিছুই জানালেন না। বিয়ের কথা তো নয়ই—এমন কি বিলেত যাত্রার কথাও নয়। ঠিক করলেন ব্যারিস্টারি পাশ তো করে আসি, তারপর দেখা যাক।

কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিলেন। হিসেব করে দেখেন, তিনি যে সময়টা থাকবেন না—খুব সাধারণভাবে চালালে মা ও দুটি সন্তানের খরচা কুলিয়ে যায় কোনোরকমে। দুটি একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে তাঁর অনুপস্থিতিতে এদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখার-ও ভার দিলেন। বেশি চিন্তায় আর লাভ নেই। এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে।

বিলি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি জাহাজযোগে বিলেত রওনা হয়ে গেলেন তিনি। সমুদ্র বক্ষ থেকে চিঠি লিখে মাকে খবর দিলেন—ব্যারিস্টারি পড়তে তিনি বিলেত চললেন। মা যেন দুশ্চিন্তা না করেন। তিনি যথা-সময়ে ঠিক ফিরে আসবেন।

লম্বা পথ। ফ্রান্স ঘুরে তারপর ইংলণ্ড। দীর্ঘ যাত্রাপথে সমুদ্রপীড়া খুব কাবু করতে পারেনি তাঁকে। অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে পারেন, এইজন্য জাহাজেই শুরু করলেন গল্প লিখতে। টুকটাক করে লেখা-ও হয়ে গেলো পরবর্তীকালের একটি বিখ্যাত গল্প—"কাশিবাসীনি"।

লণ্ডনে পৌঁছে জনৈক সদাশয় ইংরেজের গৃহে পেয়িংগেস্ট রূপে রইলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও চিন্তাবিদ মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন কর্মক্ষেত্র থেকে সাময়িক অবসর নিয়ে বিলেতে। ও'র কাছে নানা পরামর্শ নিতে যেতেন প্রায়ই। ব্যারিস্টারি পড়া আরম্ভ হলো। পড়াশুনো পুরোদমে চালালেও সাহিত্যচর্চা একেবারে বন্ধ করেননি। বিলেত থেকেই একটি দুটি গল্প পাঠাতেন তরুণী সম্পাদিকার কাছে। বিলিতি সাহেব-মেমসাহেবদের নিয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ বেদনা আনন্দ অবলম্বনে পরবর্তীকালে কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাংলা গল্প লিখেছিলেন তিনি—সেই বিদেশী চরিত্রগুলির পর্যবেক্ষণের সূচনা-ও হলো এই সময়ে। শুধু নিজের লেখা
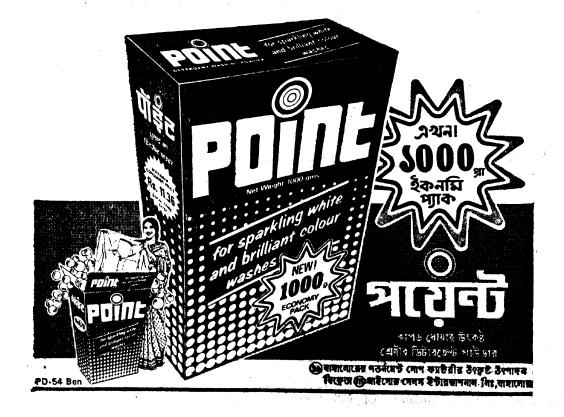
পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, মাসিক পত্রটির ওপর তাঁর মনের টান কতোখানি ছিলো, বোঝা যায় যখন দেখি রমেশচন্দ্র দত্তের কয়েকটি সদ্য রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ তিনি পাঠাচ্ছেন। পাছে কোনো গোলমাল থাকে, এজন্য তিনি অনুবাদের পর পাণ্ডুলিপি স্বয়ং রমেশচন্দ্রকে পড়িয়ে এবং শেষ পাতায় সই করিয়ে নিতেও তাঁর ভুল হতো না।

যথাসময়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে এলেন দেশে। সময়টা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর। পরিচয়গুলো এবার পর পর দিয়ে দিই।

নবীন সাহিত্যিক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ খৃঃ—১৯৩২ খৃঃ), বিদুষী তরুণী—ভারতী মাসিকপত্র সম্পাদিকা সরলা দেবী (১৮৭৩ খৃঃ—১৯৪৫ খৃঃ)-এর কুমারী পদবী ঘোষাল। মায়ের নাম স্বর্ণকুমারী দেবী (ঘোষাল)। অর্থাৎ সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী।

এবার নির্ঘাত প্রশ্নটি মনে জাগে—প্রভাতকুমার ও সরলা দেবীর বিবাহ হয়েছিলো কি?

—না।

প্রভাতকুমার ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসবার পর প্রায় দু বছর ধরে বিবাহ হচ্ছে-হবে কানাঘুষো এগোলেও শেষে পাকাপাকি জানা গেলো, এ বিয়ে হবে না।

বিয়ে না হবার কি কারণ ছিলো, সে সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা কঠিন। অনেকেই এ সম্বন্ধে নানা অভিমত

দিয়েছেন। সবচেয়ে ... উল্লেখযোগ্য সর্বাধিক প্রচলিত অভিমত হলো এ
প্রভাতকুমারের মা এ বিয়েতে একে
বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি, এই
হলে তিনি জলস্পর্শ না করে প্রাণ বিস
দেবেন সে দৃঢ় সিদ্ধান্তও জানিয়ে দে
বহু অনুনয় বিনয়ে মাকে রাজী করাতে
পেরে প্রভাতকুমার নতমস্তকে জোড়াসাঁকো
ঠাকুরবাড়ির কর্তাদের কাছে মার্জনা ভি
করেছিলেন।

মাকে খুব ভালোবাসতেন তো, মা
মনে নিদারুণ আঘাত দিতে চাননি, ব
দুঃসহ মানসিক দুঃখ নীরবে বরণ ক
নেয়াই সেদিন তাঁর কাছে শ্রেয় ম
হয়েছিলো।

একথা কিন্তু সত্যি যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ এবং গোটা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে প্রভাতকুমারের মধুর হৃদ্য সম্পর্ক এ ঘটনায় কিন্তু চিড় খায়নি। সম্পর্ক অটুট মধুর ছিলো চিরদিন। প্রভাতকুমার বরাবর এঁদের গভীর শ্রদ্ধা করতেন, বিনিময়ে পেয়েছিলেন পরমাত্মীয়ের স্নেহ। তাঁর সাহিত্যজীবন এঁদের আশীর্বাদ ও উৎসাহে অভিষিক্ত ছিলো।

ঐ বিবাহ প্রস্তাব যখন চূড়ান্তভাবে ভেঙে গেলো তখন সরলা দেবীর বয়েস ৩৩। যদি অন্যত্র বিয়ে করতে রাজি হন তাহলে আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। অভিভাবকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন আবার। ঠিক এই সময়েই সৌভাগ্যক্রমে এক অতি সুপাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী যুবক রামভজ দত্ত চৌধুরী। বয়েস ৪০। অত্যন্ত সুদর্শন, উচ্চ-শিক্ষিত, রুচিসংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। ঠাকুর পরিবারের প্রতি এঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা—তাছাড়া পাঞ্জাব ও বঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহী।

আত্মীয় পরিজন সকলে সরলা দেবীকে এ বিয়েতে রাজি হবার জন্য অনুরোধ করেন। সরলা দেবীর মা ও বাবা (স্বর্ণকুমারী দেবী, জানকীনাথ ঘোষাল) তখন বৈদ্যনাথে। তাঁরা মেয়ের কাছে রামভজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহে তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছের কথা জানালেন পত্র মারফৎ।

সরলা দেবী চিন্তা করবার জন্য কয়েক-দিন সময় নিলেন। এই সময়ের ফাঁকে তিনি চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে খোঁজখবর নেন। ঐ ব্যক্তিরা চৌধুরী মহাশয়কে চিনতেন জানতেন। এঁদের মুখে এক বাক্যে প্রশংসা শুনে সরলা দেবী আর বিয়েতে আপত্তি করলেন না। বৈদ্যনাথ স্টেশনে নেমে দেখলেন তাঁকে বধূবেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুসজ্জিত পাল্কি দাঁড়িয়ে। আর সুন্দর সুন্দর পোশাক ও অন্যান্য
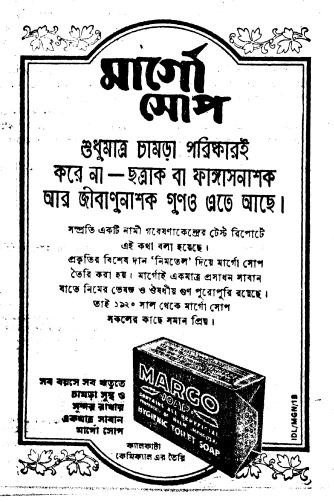
সরলা দেবী

আত্মীয় মহিলারা। বৈদ্যনাথে দুজনের বিয়ে হয়ে গেলো মহাসমারোহে।

এর পর সরলা দেবী স্বামীর সঙ্গে লাহোর চলে যান। দু বছর পরে তাঁদের একমাত্র সন্তান দীপক জন্মগ্রহণ করে।

রামভজ দত্ত চৌধুরী স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, স্ত্রীর কাছ থেকে প্রেমপ্রীতি পেয়েছেনও অনেক। এ'দের দাম্পত্য জীবন মোটামুটি সুখেই কেটেছে। 'মোটামুটি' কথাটা ব্যবহার করলাম এই কারণে যে, পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর থাকলেও, রাজনীতি-আদর্শগত প্রশ্নে শেষ পর্বে দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা মতভেদের সৃষ্টি হয়। সরলা দেবী প্রথম জীবনে রাজনীতি প্রশ্নে ছিলেন চরমপন্থী। বিয়ের পরে গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে অসহযোগ আদর্শে বিশ্বাসী হন। স্বামী কিন্তু আগাগোড়াই ছিলেন চরমপন্থী। তাই সরলা দেবীর মত পরিবর্তনে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদও হয়েছিলো। অবশ্য চৌধুরী মহাশয় স্ত্রীর সংকল্পে হস্তক্ষেপ করেননি কোনোদিন। কিছুদিন দুজন দূরে দূরে কাটাবার পর চৌধুরী মহাশয় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, খবর পাওয়া মাত্র তখনি স্বামীর কাছে ছুটে এলেন সরলা। আবার দুজনের মিল হয়ে গেলো, কিন্তু হায়! বেশি দিনের জন্য নয়। স্বামীর সেই শয্যা ছিলো—শেষ শয্যা।

সরলা দেবীচৌধুরানী [এই নামেই তিনি বিখ্যাত]। স্বাদেশিকতার বাণী প্রচারে ও দেশের যুবশক্তি সংগঠনে যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন সে কথা সকলেরই জানা।

আর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়? তিনি আর বিয়ে করেননি। একলাই জীবন কাটিয়ে গেছেন।

এতো কাণ্ড করে যে ব্যারিস্টারি ডিগ্রি—সেটিরও তেমন ব্যবহার করেননি। ব্যারিস্টারি ব্যবসা যে কিছুকাল চালাননি, এমন কথা নয়, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে তাঁর আদৌ মন ছিলো না। সাহিত্যের কমল মধুর আস্বাদ যিনি পেয়েছেন, তাকে নিছক টাকা উপার্জন করার পেশায় কতোদিনই বা আটকে রাখা যায়! নিজেকে পুরোপুরি সাহিত্য সেবায় নিমজ্জিত করে দিলেন তিনি। সাহিত্যই হলো তাঁর নেশা এবং পেশা। ছোট গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লেখা ছাড়া প্রখ্যাত মাসিকপত্র 'মানসী ও মর্মবাণী' সম্পাদনা করেছেন একটানা প্রায় ১৪ বছর। জীবনের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করলেও তা তাঁর মূলজীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে বেশ খানিকটা প্রক্ষিপ্তই ছিলো বলা উচিত।

সাহিত্যের মাধ্যমে একদা তিনি যে কি বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তা নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'নবকথা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর অনবদ্য গল্প সংকলন 'ষোড়শী'র মধ্য দিয়ে জয়যাত্রা শুরু। তাঁর উপন্যাস 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদ্বীপ'ও জনপ্রিয় হয়। কিন্তু তাঁর ছোট গল্পের জনপ্রিয়তা ছিলো ঢের-ঢের বেশি। একটানা ১৪ বছর রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই ছিলো তাঁর স্থান। পরে অবশ্য শরৎচন্দ্র আপন প্রতিভায় প্রভাতকুমারকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানটি অধিকার করে নেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

একটা কথা প্রায়ই ভাবি। 'লেডি ডাক্তার' হীরালাল ইত্যাদি দু-চারটি নিষ্ঠুর গল্প বাদ দিলে প্রভাতকুমারের অধিকাংশ রচনাই হাস্যরসোজ্জ্বল, মজার চরিত্র, কৌতুক টইটম্বুরে পরিস্থিতির বিন্যাস ও অতি সরস সংলাপ-ই তাঁর প্রধান বিশেষত্ব। এছাড়া, গল্পে দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা যেখানে এসেছে তখন যেন প্রভাতকুমারের কলমে উপচে পড়েছে মাধুর্য, ভালোবাসা।

ব্যক্তিগত জীবনে এতোখানি যে বেদনা পেলেন, কাটালেন নিঃসঙ্গ জীবন—কই সেই দুঃসহ বেদনার ছায়াপাতও দেখা গেলো না কেন তাঁর রচনায়?

তবে কি প্রভাতকুমার হৃদয়ের নিভৃতে রক্তাক্ত গভীর গোপন বেদনার কাঁটা, হাসির উচ্ছ্বাসের আবরণের আড়ালেই লুকিয়ে রেখে গেছেন?

এ প্রশ্নের জবাব কেউ কোনোদিন জানবে না!

॥ ৩৬ ॥

নিউ মার্কেট থেকে ফেরার পথেই আমার সঙ্গে সুলেখার আবার দেখা হয়েছিল। ওর হাতে মাঝারি সাইজের একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। তারই মধ্যে যে পছন্দ মতো শাড়ি এবং জামা রয়েছে তা আন্দাজ করতে পারছি।

সুলেখা সমস্ত সময়টুকু অবশ্যই শপিং-এ ব্যয় করেনি তার ঘন কালো চুলগুলো যে একটু আগেই কোনো হেয়ার ড্রেশারের সুনিপুণ হাতে পড়েছিল তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। আঁটো করে খোঁপা বেঁধেছে সুলেখা—বেশ আধুনিক স্টাইলে। অভিনব এই কবরী বন্ধনে সুলেখার মুখের ভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। তাকে রীতিমত সুন্দরী মনে হচ্ছে। অনেক দিন আগে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার বিবাহদিনের কথা মনে পড়লো। বিবাহের অপরাহ্ণে গাড়ি চড়ে তাকে কলকাতার এক বিখ্যাত চুলের দোকানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর। বিয়ের দিনে এইভাবে পাত্রীর সাময়িক গৃহত্যাগের ব্যাপারটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য লেগেছিল। সমবয়সিনী এই মাসীর সঙ্গে রসিকতা করেছিলাম, "বিয়ের দিনে চুল নিয়ে এত মাথা না ঘামালেই নয় ?"

সুরসিকা মাসী চটপট জবাব দিয়েছিলেন, "বাঃ! যে বিয়ে করে সে চুল বাঁধে না, কোথায় লেখা আছে ?"

ক্লাশিক স্টাইলের স্পেশাল কবরী-বন্ধন সুলেখাকে অবশ্যই আরও ব্যক্তিশালিনী করে তুলেছে। সুলেখার এই নবলব্ধ শ্রী আমি হয়তো একটু বেশী আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করেছি। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়েও সুলেখা সহজ হতে পারলো না। কোনো চাপা দুঃখের আগুন যে এই মুহূর্তে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেল।

সুলেখা গম্ভীরমুখেই আমার দিকে তাকাল। তারপর বললো, "আপনি কী ভাবছেন তা আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।"

সুলেখার মুখ বন্ধ করবার জন্যে বলতে গেলাম, "এই ধরনের খোঁপায় আপনাকে সুন্দর মানিয়েছে।"

সুলেখা বললো, "রাখুন, ওসব কথা। আমাদের সাজগোজ দেখলে ভদ্রলোকদের মনে যে ঘেন্না হয়, তা আমি ঠিক বুঝতে পারি।"

সুলেখার কথায় আমি বেশ লজ্জা পেলাম। বললাম, "বিশ্বাস করুন, এইভাবে আপনাকে দেখলে মনে নানা দ্বিধা এবং প্রশ্নের উদ্রেক হয়, কিন্তু কখনও ঘেন্না হয় না। বিশ্বসংসারে কাউকে ঘেন্না করবার ফরমান তো আমাকে দেওয়া হয় নি।"

সুলেখার চটপট জবাব, "প্রশ্নটা কী বলে দেবো ?"

"বলুন," সুলেখাকে অনুমতি দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সুলেখার ধারালো মুখ একটু কঠিন হয়ে উঠলো। তারপর বেপরোয়াভাবে বললো, "গোধূলি লগ্নে যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সে এখন থেকে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে নিচ্ছে কেন ?"

লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা। বিকেলে অর্জুন চৌধুরীর আসন্ন আগমনের কথা আমার খেয়ালই ছিল না।

সুলেখা বললো, "আপনার কাছে আমি কিছুই ঢেকে রাখবো না, শংকরবাবু। আমার এখন অনেক টাকা চাই। তাই অন্য এনগেজমেন্টও নিয়েছি। রাজাবাবু এখনই আসবেন চুপি চুপি—মামাকে না জানিয়ে। সঙ্গে ওঁর একজন ফ্রেন্ডও থাকবেন। অনেকদিন থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছেন, এতোদিন জগদীশবাবুর কথা ভেবে পাত্তা দিইনি। এখন যখন জগদীশবাবু পপি বিশোয়াসের সঙ্গে আমাকে লড়িয়ে দিয়েছেন, তখন আমিও যা-ইচ্ছে তাই করবো।"

ঘড়ির দিকে তাকালো সুলেখা। বললো, "আজকে সমস্ত দিনটা খুব ব্যস্ত যাবে। লাঞ্চের আগেই রাজাবাবুকে বিদেয় করবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর একটু জিরিয়ে নিতে হবে। আপনি তো আমার মাস্টারি করবেন না!"

অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথাগুলো কেমন সহজে সুলেখা বলে যাচ্ছে। কোথাও কোনো জড়তা নেই। এইসব কথা কোনো বাঙালী বিনোদিনীর মুখে এইভাবে শুনতে হবে তা কোনোদিন আমি কল্পনাও করি নি।

সুলেখা বললো, "চুল বেঁধেছি রাজাবাবুর গেস্টের জন্য। আজ আমাকে বেশ কিছু টাকা আদায় করতেই হবে। জগদীশবাবুর মাস মাইনেতে আমার চলবে না। তাছাড়া, আমাকে কয়েকদিন ছুটিও নিতে হতে পারে।"

সুলেখা এবার জামাকাপড় ও প্রসা-

করের প্যাকেট হাতে করে গম্ভীরমুখে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে চললো।

কর্পোরেশন আপিসে কিছু কাজকর্ম ছিল। কলকাতায় ফ্ল্যাটবাড়ি আছে অথচ কর্পোরেশন আপিসে কোনো কাজ নেই এমন লোক আজও এই বিচিত্র নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন নি।

কর্পোরেশন আপিসের বনবিহারীবাবু আমাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারলেন না। ঠোঁট উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, "থ্যাকারে ম্যানসন তো! বরদাবাবু কী দেহ রেখেছেন? আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন—আমাদের পাওনা-গণ্ডা দিতে বড্ড খিটখিট করতেন, কিন্তু মানুষটা একেবারে সাচ্চা ছিলেন।"

"বালাই ষাট! বরদাবাবু কেন দুঃখে মরতে যাবেন। তিনি তীর্থ-ধর্মে বেরিয়েছেন।" আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানালাম।

বনবিহারী হাজরা বললেন, "তা যে-বাড়িতে কাজ কর্ম, সেখানে তীর্থধর্ম মাঝে মাঝে দরকার বটে! বরদাবাবুর মতো সাত্ত্বিক লোক কীভাবে ওখানে ব্যাটিং করছেন তাই বুঝতে পারি না।"

বনবিহারী হাজরা অভিজ্ঞ লোক। এই কর্পোরেশনের চাকরিতে বহু বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, "কালে-কালে কলকাতার যে কী দশা হবে তা ভাবতে আমার গা শিউরে ওঠে। সদর স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট এসব তো এককালে ভদ্দরলোকদের আস্তানা ছিল। স্বয়ং রবি ঠাকুর ওখানে বসে পদ্য লিখেছেন। আর কালে কালে কী হতে চলেছে।'

বনবিহারী হাজরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন ও'র কথাবার্তায় আমি খুব খুশী হচ্ছি না। উনি কানে উড পেন্সিল গুঁজে বললেন, 'ওসব জায়গায় ভদ্দরলোকেরা এখন থাকে না, শেষ পর্যন্ত, ওখানে আপনারা কেউ টিকতে পারবেন না।'

বনবিহারীবাবু আমার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। বরদাপ্রসন্ন একবার টোটকার জোরে তাঁর কোমর-ব্যথা সারিয়েছিলেন। সেই সুবাদে থ্যাকারে ম্যানসনের কাজটা আজও তিনি তাড়াতাড়ি সেরে দিলেন। বললেন, "বরদাবাবু ফিরলেই আমাকে একটু খবর দেবেন। আমার বেয়ানের কোমরের ব্যথাটাও ইদানীং খুব বেড়েছে—ও'কে দিয়ে একটা ওষুধ করিয়ে নেবো।'

রেকর্ড টাইমে কর্পোরেশনের কাজ সেরে থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরতেই শুনলাম টেলিগ্রাফ পিওন আমার খোঁজ করে গিয়েছে।

টেলিগ্রাম! তাও আমার নামে। বেশ চিন্তিত হবারই কথা। সাধারণ মানুষের জীবনে টেলিগ্রাম সাধারণত দুঃসংবাদ বহন করে আনে। মদনা বললো, "পিওনটা মোটেই সুবিধে নয়, স্যার। এতো করে বললাম, আমার হাতে কাগজটা দাও—সায়েব আসা মাত্রই সটাসট পেঁাছে যাবে। তা আমাকে বিশ্বাস হলো না কর্তার।"

আমার ব্যস্ততা দেখে মদনা আশ্বাস দিল, "ভাববেন না স্যার। অন্য টেলিগ্রাম বিলি করে এখনই ফিরে আসবে বলেছে। আসতেই হবে চাঁদকে—না হলে এপাড়ায় আর করে খেতে হবে না।"

মদনাদের বিশ্বাস নেই—হয়তো সরকারী কর্মচারিকেই মারধোর করে বসবে।

মদনা বললো, "গায়ে হাত তোলা আমরা কোন্‌কালে ছেড়ে দিয়েছি। আমরা শুধু পিওনের সাইকিলের হাওয়া খুলে দিই। পাংচার সাইকেল কাঁধে নিয়ে যতখুশি টেলিগ্রাম বিলি করে বেড়াও!"

মদনার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপই হয়তো টেলিগ্রাম পিওন আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে

এল। এবং গোলাপী রঙের টেলিগ্রামটা হাতে পেয়ে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম।

টেলিগ্রামটা আমার জন্যে নয়। আমার কেয়ারে পাঠানো হয়েছে এই জরুরী বার্তা।

সই করে টেলিগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছি—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। সীমা চ্যাটার্জি কেয়ার অফ...। পরবর্তী নম ঠিকানা সব নির্ভুল। কিন্তু কে আমার ঠিকানায় এই অপরিচিতা সীমাকে তার-বার্তা পাঠালেন?

সীমা চ্যাটার্জি। আমি নামটা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো সীমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলে স্মরণ করতে পারছি না।

সীমা চ্যাটার্জিকে মদনাও চিনতে পারলো না। এ-পাড়ার সব দিদিমণির পরিচয় তার মুখস্ত। মদনা নিজেও এক-বার তেলকালি এবং কলকালির কাছে খবর নরে এল। কিন্তু সীমাকে এখানে কেউ চনে না। একটু রাগও হচ্ছিল—এতো লাক থাকতে আমার ঠিকানাতেই বা সীমার খবর পাঠানোর কী অর্থ হয়?

কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেই সব পাপ কে যায়। কিন্তু টেলিগ্রাম বলে কথা। ভতরে কী খবর আছে কে জানে।

মদনা আমার অবস্থা দেখে বললো,

"টেলিগ্রামটা খুলে ফেলুন স্যর। খত পড়লে হয়তো সব বুঝতে পারবেন।"

কিন্তু টেলিগ্রামটা ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে না, কে জানে হয়তো আরও কোনো ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে।

খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ আমার চৈতন্যোদয় হলো। সীমা...সীমা তো আমার অপরিচিত নয়। সুলেখা সেন আমার এতো চেনা, অথচ সীমাকে কত সহজে ভুলে বসে আছি। ধানবাদের সীমাই তো আমাদের এই ঘরের মধ্যে ঘরে এসে সুলেখা হয়েছে।

টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে সুলেখার ফ্ল্যাটের দিকে এগোতে নিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। রাজাবাবুদের তো এই সময়েই চৌত্রিশ নম্বরে থাকবার কথা?

কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলাম। তারপর আপিসঘরে চলে এলাম সুলেখার ফ্ল্যাটে একটা টেলিফোন করবার জন্যে।

টেলিফোনটা ব্যস্ত নাকি? এতোক্ষণ ধরে কী কথাবার্তা হচ্ছে? পনেরো মিনি-টের মধ্যে দু তিনবার চেষ্টা করেও যোগা-যোগ করা গেল না।

আপিস থেকে নিজের ঘরে ফেরবার পথে সিমেন্ট বাঁধানো উঠোনে একখানা ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। মদনা বললো, "আরও একখানা গাড়ি এসেছিল। রাজাবাবু সেই গাড়িতে কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছেন।"

এই গাড়িটা চ'লে গেলেই আমাকে একটু খবর দেবার অনুরোধ করে এলাম মদনাকে। এসব ব্যাপারে রামসিংহাসন থেকে মদনাকেই আমার বেশী বিশ্বাস হয়।

টেলিগ্রামখানা বালিশের তলায় রেখে দিবানিদ্রার উদ্দেশে চোখের পাতাটা সবে বুজেছি, এমন সময় মদনার পুনরাবির্ভাব। ফিয়াট গাড়ির মালিক নিজেই ড্রাইভ করে থ্যাকারে ম্যানসন থেকে অদৃশ্য হ'য়েছেন। মদনা তার কাছ থেকে বকশিস হিসেবে একটা টাকাও আদায় ক'রে নিয়েছে। বলেছে, "হুজুর, আমি দাঁড়িয়ে না থাকলে আপনার গাড়ির হাব ক্যাপগুলো এতোক্ষ'ণে মল্লিকবাজারের দোকানে টাঙানো থাকতো। চাকাতে হাওয়াও থাকতো না।"

এই অসময়ে ঘরে ঢোকা পড়তে পারে তার জন্য সুলেখা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছে, হয়তো সুইপার এসেছে ঘর পরিস্কারের জন্যে।

দরজা খুলেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখে সুলেখা বেশ লজ্জা পেয়ে

সুলেখার শরীরের মতোই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। কয়েকটা গেলাশ এঁটো অবস্থায় ছড়ানো রয়েছে। ফ্লুরি থেকে ... আনানো খাবারের দুটো শূন্য প্যাকেট আধ খোলা অবস্থায় সোফার ওপরেই পড়ে আছে।

দৌড়ে গিয়ে সুলেখা একটা ... জোব্বার মতো গাউন পরে নিজের দেহটা ঢেকে ফেললো। সুলেখা এই মুহূর্তে আমাকে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করেনি।

এই অবস্থায় ওকে দেখে আমার নিজেরও লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আমি ক্ষমা চাইলাম সুলেখার কাছে। "সুলেখা... এই সময় আপনাকে কিছুতেই আমি ডিসটার্ব করতাম না। টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু আপনি কি কারও সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলছিলেন?"

"টেলিফোন! ওমা!" লজ্জায় ...

কাটলো সুলেখা। দেখলাম বিছানার অদূরে রিসিভারটা ফোন থেকে নামানো রয়েছে।

ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে সুলেখা বললো, "একদম ভুলে গিয়েছি। মিস্টার অরোরার জন্যে ফোনটা নামিয়ে রাখতে হলো। এক একজন গেস্ট আছেন টেলিফোন যেন তাঁদের সতীন। তাঁরা যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ টেলিফোন বাজলেই রাগ। টেলিফোনে ও'দের নাকি প্রাইভেসি নষ্ট হয়। তাই বাধ্য হয়ে ফোন নামিয়ে রাখতে হলো। তারপর একদম ভুলে গিয়েছি।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখলে সুলেখার লাইন পাবো কী করে?

"সুলেখা তুমি খাওনি এখনো?" সুলেখার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে এই একটা প্রশ্নই করতে ইচ্ছে হলো আমার।

বিধ্বস্ত বিছানার চাদরটা ঠিক করতে করতে সুলেখা বললো, "ও'রা সঙ্গে করে কিছু স্যান্ডউইচ এনেছিলেন, তার থেকে দু-একটা দাঁতে দিয়েছি। এখন আর খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। খাওয়া তো দূরের কথা, একবার গিয়ে শাওয়ারের তলায় দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। আপনি না এলে এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তাম। উঠতাম চারটের সময়—ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া আছে।"

সুলেখাকে এই অবস্থায় না-দেখলেই আমার মঙ্গল হতো। একটা অব্যক্ত রাগে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। জেঠমালানির ওই চ্যাংড়া ভাগ্নে অথবা তার ইয়ার মিস্টার অরোরাকে পেলে হয়তো নাকে একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিতাম।

সুলেখা বোধহয় আন্দাজ করছে, আমি মোটেই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। আমাকে শান্ত করবার জন্যেই সে বললো, "আজ আমি অনেক টাকা হাতে পেয়েছি, শংকরবাবু। আমার এখন অনেক টাকা দরকার হবে। আপনার কাছে আমি কিছুই চেপে রাখি না।"

এসব খবর আমার কাছ থেকে চেপে রাখলেই তুমি আমার ওপর সুবিচার করতে সুলেখা। ওর মুখের ওপর উত্তর দিতে গিয়েও কথা বলতে পারলাম না। সুলেখাকে বড় অসহায় ও ক্লান্ত মনে হচ্ছে আমার।

টেলিগ্রামের কথাটা তুলতেই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলো সুলেখা।

"অনেকক্ষণ ধরে সীমা চ্যাটার্জিকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, সুলেখা। কিন্তু কোথায় পাবো তাকে?"

সুলেখা ক্ষমা চাইলো আমার কাছে। বললো, "আপনাকে বলাই হয়নি। অথচ আপনার কেয়ারেই সীমা চ্যাটার্জিকে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

সুলেখার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না। কিন্তু টেলিগ্রামটা ওর হাতে দিয়ে আমি কোনোরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে আপিস ঘরে ফিরে এলাম। ঘর থেকে বেরুবার আগে সুলেখাকে মৃদু ভর্ৎসনাও করেছি। "আর একটু হলে টেলিগ্রামটা আপনার হাতেই পৌঁছত না।"

আপিস ঘরে ফিরে এসে কাজকর্ম শুরু করেছি। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠলো। সুলেখা জানতে চাইছে আপিস ঘরে আমি একা কিনা।

"আমার সামনে দু'তিনজন লোক বসে আছে", জানিয়ে দিলাম সুলেখাকে।

সুলেখা জানতে চাইলো আমার শোবার ঘরে সে সোজা চলে আসবে কিনা। ভদ্রতার খাতিরে সুলেখার ঘরেই আমার দেখা করা উচিত হয়তো। কিন্তু সুলেখার বিশৃঙ্খল ঘরের দৃশ্যটা আমাকে কেমন বিমুখ করে তুললো। ঐ ঘরে পা দেওয়া মাত্রই আমার শরীরে জ্বালা শুরু হয়, অথচ জ্বালা নিবৃত্তির জন্য যেসব কাজ করতে ইচ্ছে হয় তা নিজের চাকরি রক্ষা ও গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে মোটেই সহায়ক হবে না।

টেলিগ্রামটা হাতে করেই সুলেখা আমার ঘরে চলে এসেছে। ওর বিশৃঙ্খল চুলগুলো ইতিমধ্যে আবার আয়ত্ত এসেছে। এরই মধ্যে একপ্রস্থ কাপড় পাল্টে ফেলেছে সে। সুলেখা এত সহজে কী করে তার স্নিগ্ধতা ফিরে পেল তা ভগবানই জানেন। আবার বেশ স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে।

আমার ঘরের তক্তপোষের ওপরেই বসে পড়লো সুলেখা। ওর মুখে এবার উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

টেলিগ্রামের কাগজে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুলেখা বললো, "বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছি। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না, শংকরবাবু।"

'সুলেখা, জেনেশুনে যে জীবনের মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছো তাতে তোমার বিপদ ক্রমশ বাড়বেই।' কথাগুলো জিভের ডগায় এসেও আটকে গেল। অনাত্মীয় এক মহিলার এমন চরম লাঞ্ছনা নিজের চোখে দেখে সুলেখার ওপর মমতা ছাড়া আমার আর কিছুই হওয়া উচিত নয়।'

সুলেখা এবার বললো, "আমার বাবার কথা বলেছিলাম আপনাকে? কিষাণপুর সাব পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার বীরেন চাটুজ্যে।"

"সেভিংস ব্যাঙ্কের জমা টাকার গোলমাল নিয়ে কী একটা মামলার কথা বলছিলেন বটে", আমি স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম।

"অনেক চেষ্টা করেও বাবাকে সেদিন রক্ষে করতে পারিনি। ...

দিয়েও বাবার জেল সেদিন আটকাতে পারিনি, শংকরবাবু।"

এই জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা সুলেখা কোনোদিন আমাকে বলেছে কিনা স্মরণ করতে পারলাম না।

সীমা চ্যাটার্জির নাম পাঠানো টেলিগ্রামটা সুলেখার জন্যে নতুন খবর বয়ে এনেছে। তার বাবাকে আজই জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

মাঝে মাঝে গোপনে বেরিয়ে গিয়ে সুলেখা জেলে বাবার খবরাখবর নিয়ে এসেছে। জেলের কোনো সহৃদয় কর্মীর কাছে সুলেখা পয়সা দিয়ে এসেছিল, মুক্তির তারিখটা যেন তাকে টেলিগ্রাফে জানিয়ে দেওয়া হয়। এই একটি ব্যাপারে সুলেখা চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ঠিকানা ব্যবহার করতে সাহস পায় নি। আমার ঠিকানা রেখে এসেছে—তেমনি কোনো খবর থাকলে আমি যে সুলেখার সঙ্গে যেভাবেই হোক যোগাযোগ করবো সে সম্বন্ধে সুলেখা নিশ্চিত।

সুলেখা ভেবেছিল বাবার মুক্তি হতে আরও কয়েকদিন বাকি আছে। সেই মতো সে তৈরিও হচ্ছিল। কিন্তু টেলিগ্রামে লেখা আজই বাবাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

টেলিগ্রামটা পথে দেরি করেছে। সামান্য এইটুকু দূরত্ব পার হতে চিঠির থেকেও বেশী সময় নিয়েছে।

কিন্তু আসন্ন মুক্তির সংবাদ সুলেখার প্রচণ্ড উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে।

সুলেখা অকপটে বললো, "আমি ভেবেছিলাম আরও তিন চারদিন পরে বাবা রিলিজ হবে। আমি তৈরিও হচ্ছিলাম। আজই তো ভোজমালানির দোকান থেকে আমার শাড়ির সঙ্গে বাবার পাঞ্জাবির কাপড় কিনে এনেছি। ধানবাদে থাকতে থাকতে দু'খানা ধুতিও কিনে রেখেছি।"

আমি বললাম, "জেলের রিলিজ ব্যাপারে ঠিক সব সময় হিসেব করা যায় না। দু'তিনদিন আগু-পিছু হয়ে যায়।"

সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "এ-ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা আছে?"

"তা একটু-আধটু আছে বৈকি। কিছুদিন ব্যারিস্টার সাহেবের বাবুগিরি করেছি।"

সুলেখার সামনে এখন সমূহ বিপদ। একটু পরেই বহু সাধ্যসাধনার ফলশ্রুতি অর্জুন চৌধুরীর নির্ধারিত আগমন। আবার ঐ সময়েই দীর্ঘ দু'বছর পরে বাবা জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।

"কী বিপদেই যে পড়লাম", সুলেখার ইচ্ছা সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বাবার কাছে ছুটে যায়। তার বাবার জন্যে জেলখানার দরজায় অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। অথচ জগদীশবাবুর বিজনেস প্ল্যান অনুযায়ী অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আজ ভীষণ জরুরি।

সুলেখা ভাবছিল কাউকে কিছু না বলে সে সোজা জেলখানায় চলে যাবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে অর্জুন চৌধুরী গোপন অভিসারে এসে ফ্ল্যাটের দরজা তালাবন্ধ দেখলে কী রকম চটবেন তা সুলেখা সহজেই আন্দাজ করতে পারছে। এ খবর জেঠমালানির কানে পৌঁছবেই। এবং তার ফলাফল যে ভয়াবহ হবে তা সুলেখার অজানা নয়।

সুলেখার চোখ দুটো কান্নায় ভরে আসছে। কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে সুলেখা বললো, "জগদীশবাবুকেও দোষ দিতে পারি না। এতো খরচ করে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছেন, আমাদের মতো মেয়ে রেখেছেন, প্রয়োজনের সময় সার্ভিস না পেলে তিনি ছাড়বেন কেন?"

"অথচ আমার কথা কে বুঝবে বলুন তো? বাবাকে জেল থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি একথা সবাইকে বলা যায় না। একটু আগে জানলেও মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা অন্য সময়ে সরিয়ে নিতাম।"

"এক্ষেত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বদলে নেবার চেষ্টা করাটাই যুক্তিযুক্ত। শেষ মুহূর্তে যে কোনো মানুষেরই জরুরি কাজ পড়তে পারে।" আমি নিজের মতামত জানালাম।

সুলেখা ম্লান মুখে বললো, "কত সাধ্য-সাধনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুঝতেই পারছেন তো। তাছাড়া প্রোগ্রাম চেঞ্জ করার কথা তুললেই অন্য কিছু সন্দেহ করে বসতে পারেন।"

সুলেখা ছুটলো আবার নিজের ফ্ল্যাটে। বললো, "আপনি কিন্তু চলে যাবেন না, শংকরবাবু। আমি এখনই আসছি।"

একটু পরেই সুলেখা ফিরলো। ব্যাড লাক। অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। চৌধুরী আজ আপিসে আসেননি। বাড়িতেও ফোন করেছিল সুলেখা। সেখানেও নেই। তবে একটু পরে ফিরতে পারেন, বেয়ারা বলেছে। সুলেখা নিজের নম্বরটা দিয়ে রেখেছে, অর্জুন চৌধুরী ফেরামাত্রই যাতে ফোন করেন।

"অর্জুন চৌধুরী কি ফোন ব্যাক করবেন?" সুলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

"উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত। হয়তো উনি বাড়িতেই ফিরবেন না। সোজা এখানে চলে আসবেন।" আমি সুলেখাকে অহেতুক আশার আলো দেখাতে চাই না।

সুলেখা বললো, "অর্জুন চৌধুরী এখানে এলেন অথচ কেউ নেই—তাহলে আমার এই চাকরি শেষ। আর জেঠমালানির চাকরি না থাকলে বাবাকে খাওয়াবো কী? বাবা তো আর মেয়েকে নিয়ে কিষাণপুরে পোস্টাপিসের স্টাফ কোয়ার্টারে ফিরে যাবেন না।"

সুলেখা আবার উঠে পড়লো। বললো, "দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে।"

"কী চেষ্টা?" সুলেখার জন্যে আমিও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠছি।

"ফিরে এসে সব জানাবো", এই বলে সুলেখা দ্রুতবেগে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশ]

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

[রে]খাচিত্র প্রদর্শনী

দেবাশীষ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪৪) [এ]কজন ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তার [হ]লও তিনি শিল্পী। যেমন [ড্র]ইং টীচার হয়েও কেউবা শিল্পী [...] কেরানী হলেও কেউ শিল্পী। শুধু [...]ব এ'কে কলকাতায় উদরপূর্তি অসম্ভব!

দেবাশীষের দাদামশাই বনবিহারী [মু]খোপাধ্যায়, আর মায়ের আপন কাকা [বি]নোদবিহারী, সুতরাং শিল্পী হওয়ার [ব্যা]পারটা তাঁর জিনসের মধ্যে আছে। আমি [জা]নি তিনি বাঁকুড়ার মন্দির ভাস্কর্যের [ন]ন্দনিক দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর [অ]প্রকাশিত অথচ সুলিখিত প্রবন্ধ আমি [প]ড়ে মুগ্ধ। নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অন্ত-[র্দৃ]ষ্টি প্রমাণ করে তিনি বিনোদবিহারীর [উপ]যোগ্য দৌহিত্র।

কলকাতার কোনো একটি মেডিকাল [ক]লেজে এমারজেন্সি বিভাগে যোগদানের [আ]গে তিনি ছয় বছর বাঁকুড়ার ওন্দা হেলথ [সে]ন্টারে ছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ, [আ]দিবাসী, অন্তজ শ্রেণী, তাদের দৈনন্দিন [জী]বন, আটপৌরে সুখ দুঃখ, খোলা [আ]কাশ, গাছপালা—একটা মাটি মাটি সুগন্ধ [তা]ন তাঁর ছবিতে আছে। তাঁর রেখাচিত্রের

দম্পতি — দেবাশীষ ভট্টাচার্য

প্রদর্শনীতে (ডেকর সার্ভিস গ্যালারী, ৩২ চৌরঙ্গী রোড। ২০—২৯ জানুয়ারী) যদিও তিনি জলরঙ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে ক্যান মিশিয়ে এনেছেন অস্বচ্ছতা। কোথাও বা রঙের সঙ্গে কালি-কলম ব্যবহার করেছেন—মিশ্র মাধ্যম। না কোনো গল্প নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ তাঁর কৌতূহলের বিষয়। জীবনদৃষ্টি স্বচ্ছ। ভাবালুতাহীন। আবেগ বাদ দিয়ে কৌতূ-হলি দর্শকের দৃষ্টিতে দেখেছেন—সহানু-ভূতির সঙ্গে কিন্তু দূরত্বের আড়াল রেখে। ডাক্তার যেমন রোগী দেখেন। অথচ পাপ-পুণ্য প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধ প্রয়োগ করেননি। মানবিক বোধে সিক্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছবিতে এনেছে ভিন্নতর স্বাদ।

য়ুরোপের ক্ষেত্রে আদিম সরলী-করণের দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু তাঁর মানুষগুলো খুবই রক্তমাংসের। তাদের আসক্তি আর বিষাদ, বিপন্নতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনকে আঁকড়ে ধরা খুবই বিশ্বাস-যোগ্য। রোদ, জল, বৃষ্টির মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম। সহজ। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ছটফটানি আছে। অথচ দেবাশীষের দৃষ্টি নির্মোহ তীব্র। কিন্তু নির্মম বা তির্যক নয়। ডাক্তার হিসাবে তিনি শরীর ও শরীরী মানুষকে জানেন, সুতরাং বিকৃতি-করণ ও য়ুরোপের ক্ষেত্রে নানা স্বাধীনতা নিয়েও কিন্তু অ-ইউরোপীয় অঙ্কনকৌশলে তিনি তাদের হাজির করেছেন। দ্বিমাত্রিক নয় তারা। কিন্তু মূর্তিকলার ঘনত্ব ও ডৌল তাঁর অঙ্কনে এসেছে স্বাভাবিকভাবে এবং অনায়াসে। স্বশিক্ষিত তিনি, তাই শিল্প-কলা বিদ্যায়তনের মারপ্যাঁচ নেই। তাঁর অঙ্কনকৌশলের বিশেষত্ব অর্জিত নিজেরই পরিশ্রমের স্বেদরক্তে। রচনা করার ব্যাপারটা তাঁর আয়ত্তে। এখন চাই রঙ।

হাতে বসে থাকা লোকটার তীব্র কাতর মুখটা টানে বেশ। বর্শার আগায় সাপ জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে সাঁওতাল তার চলার ভঙ্গীটা দৃপ্ত। একটা ক্রুদ্ধ ষাঁড় ঢুঁ মারতে যাচ্ছে আর দ্রুত তুলি চালিয়ে দেবাশীষ তা ধরেছেন। 'দম্পতি' ছবিতে গর্ভিনী নারী আর গ্রাম্য একটা লোক—জোরালো রেখা টান টান করে এঁকেছেন। নানারকম কুচি কুচি রেখা দিয়ে ভরলেও মন্ডনধর্মী কোনো ব্যাপার নেই। খুচখুচ মেয়েলী কাজ নয় —জোরের সঙ্গে তুলি চালানো। এর মধ্যে একটা পাশ ফিরে শুয়ে থাকা নারী, পিঠের খুঁটিনাটি, ভারী পেছন, মাংসল সুন্দর আর ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা পেশীবহুল দুটি পুরুষ—কাজটার ভেতর জোর আছে। এর মধ্যে দুটি লোকের গাছতলায় দাঁড়িয়ে সাপ মারার ছবিটা সাবলীল রেখা দিয়ে এঁকেছেন। বস্তুত এবার রঙ নিয়ে কাজ করার সময় এসেছে।

মীরা মুখোপাধ্যায়ের প্রদর্শনী

১২ পদ্মপুকুর রোডে স্বগৃহে মীরা মুখোপাধ্যায়ের একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখলাম (১৫ই জানুয়ারী)। এবার থেকে স্থির করেছেন উনি মাসের দ্বিতীয় শনিবার তাঁর দোতলার ফ্ল্যাট সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্যে খোলা থাকবে। এমনি একটি শনিবারে আপনি চলে আসবেন কষ্ট করে পদ্মপুকুরে মীরা দেবীর

দাঁড়াতে। মনুষ্যপুত্র হবেন একথা জোর দিয়ে বলছি।

শিল্পের জন্যে এমন অনুরাগ আর সর্বস্ব পণ করতে ইদানীং এই শহরে কাউকে দেখিনি। ক্ষুদ্র স্বার্থ, বড় পদ, কুৎসা রটনা, দলাদলি এ সবের উপরে তিনি। কলকাতার প্রকৃত শিল্পপ্রেমিক ঠিক খবর রাখেন, সুতরাং শুধু ভাস্কর্য বিক্রী করে তাঁর চলে যায়। কিন্তু সারাদিন মীরা দেবী হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেন কুলি মজুরের মতো। বড় হাতুড়ী ছেনী নিয়ে কাজ। স্বহস্তে ধাতু গলিয়ে ঢালেন। বড় শিল্পীর তন্ময়তা আর ক্ষমতা তাঁর আছে।

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে তিনি সে-দেশ একা ঘুরে এলেন মাস তিনেক। নিজে তিনি সেখানে পড়াশোনো করেছেন। তাঁর ক্রেতাদের মধ্যে জার্মানদের সংখ্যা সর্বাধিক—এক সময় যেমন যামিনী রায়ের ক্রেতা ছিল মার্কিনীরা। সেখানে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রদর্শনী করেছেন এবং সংগ্রহশালায় ঘুরেছেন। ছাত্রীজীবনের অনেকখানি কেটেছে সে-দেশে। কুড়ি বছর পর পুরানো জায়গা এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দারুণ কাটিয়েছেন।

বাস্তারী মীরা মুখোপাধ্যায়

ফিরে এসেই কাজ ধরেছেন। এই প্রদর্শনীর অনেক কাজই ফিরে এসে করেছেন। মীরা মুখোপাধ্যায়ের মানুষজন যখন একা তখনও সমাজের বাইরে কোনো ভিন্ন গ্রহের জীব নয়। তারা সাধারণত শহর বা গ্রাম যেখানকারই মানুষ হন তাদের একটা শিকড় আছে। ভাসমান হলেও এই গ্রহেই তাদের ঠিকানা। অথচ যন্ত্রণা, আর্তি গভীরতর ক্রন্দন, একাকীত্ব—আছে সবই। ফরাসী দেশ থেকে আমদানী শৌখিন বিচ্ছিন্নতা এসব মীরা দেবী রেখে দিয়েছেন শহুরে বঙালী মধ্যবিত্ত তরুণ লেখক কবিদের জন্যে। কারণ, তাঁর জীবনদৃষ্টি এসেছে সরাসরি জীবন থেকেই।

এবার দলবদ্ধ মানুষ করেছেন। গ্রাম ছেড়ে ভূমিহীন চাষী আসছে। মিছিলটার চারপাশে মুখ—অসংখ্য। কিন্তু প্রত্যেকের ভঙ্গী, চরিত্র, চেহারা আলাদা। এদের পেটের মধ্যে ক্ষুধার দিগন্ত। নারী পুরুষ নির্বিশেষে ফুটপাতে শুয়ে থাকার কাজটি অনবদ্য। একজনের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা কুকুর। মাঝি আর জেলেদের নিয়ে কাজ আছে কিছু। একটু বাঁকা পাতের ওপর বাঁকাভাবে দাঁড়িয়ে গোল জাল ছুঁড়ে ফেলার কৌশলের গতি ও টানটান পেশীর অবস্থাটা লৌকিক ভঙ্গীতে করেছেন। চ্যাপটা নৌকা, দুজন মাঝি লগি ঠেলছে আর ত্রিকোণ জাল বাঁধা বাঁশের কাঠামো জলে ফেলার জন্যে প্রস্তুত হয় জেলেটি নৌকার মাঝখানে। আকাশ, জল আর ক্ষুদ্র মানুষের জীবন-লীলার মহত্ব ও নগণ্যতা দেখিয়েছেন। তিনটে জেলে জাল টেনে তুলতে গিয়ে যেন জীবনের জালে জড়িয়ে গেছে। তিনজনের বিকৃতকরণ ও জালের জড়ানো রূপারোপ ব্যাপারটাকে তীব্র করেছে। একজন শবর মুক্ত আকাশের নীচে শিকার করে আর পাখিরাও মুক্ত। কিন্তু আকাশটা ধরেছেন ধনুকের ফ্রেমে। কী বলিষ্ঠ, পরিষ্কার, সহজিয়া এবং কাব্যিক তাঁর লৌকিক সরলীকরণ! কী সচল আদিম বন্য তাঁর রেখার ছন্দ, বস্তুপুঞ্জের সংস্থান ইচ্ছা মতো কেমন টেনে দুমড়ে ভারকে টানটান করেন তিনি। রূপারোপে প্রাকৃত শিল্পী-দের স্বতঃস্ফূর্ততাকে অঙ্গীকার করেন স্বচ্ছন্দে।

সঙ্গীতজ্ঞ নিয়ে কিছু শক্তিশালী কাজ করেছেন। দুজন গায়ক, ভারী তাদের দেহ, কিন্তু সঙ্গীতের দমকে মুখব্যাদান করে অনৈসর্গিক একটা আবহ তৈরী করেছে। দুজন বাউল ছন্দিত ভঙ্গীতে বেঁকে উঠেছে। ঘাড়বাঁকানো সেতারীর তন্ময় ভঙ্গীটা ধরার জন্যে ঈষৎ দীর্ঘায়িত করেছেন তিনি। বিকৃতিকরণ সহজ করার জন্যে লখনো চিকণের কাজ করা পাঞ্জাবিটা খুঁটিয়ে করেছেন। এর মধ্যে একটি কাজ আছে—সঙ্গীতশিল্পীকে গোল করে ঘিরে শ্রোতারা শুনছে। এই গোল চত্বরের ওপর থেকে দুটো খুঁটিতে তরমুজের ফালির মতো চাঁদোয়ার আভাস—আকাশ। সুরে তন্ময় শ্রোতা। তেমনি গ্রহ, সূর্য, তারকামণ্ডল, পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিষ্ক নিখিল বিশ্বের চলার সুরে ছন্দে ঘুরছে নিজস্ব কক্ষপথে। প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বিরাট মন্দির দর্শনের অনুভূতি হয়।

সন্দীপ সরকার

বিমান ভ্রমণের ভূমিকা

প্রতিভা বসু

একদা এক দ্বিপ্রহরে, একটি ছোটো ছেলে আমাকে বললো, 'কাকিমা, তুমি খেয়েছো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ!'

'এখন তুমি শোবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি?'

'আয়, তুইও শুবি আমার সঙ্গে।'

'গল্প বলবে?'

'আমার ঘুম পাবে।'

'আমার পায় না।'

'তোর চোখে কাকের বাসা, তাই তোর ঘুম পায় না।'

'শোনো কাকিমা—'

'কী?'

'তুমি এরোপ্লেনে চড়েছো?'

'না তো।'

'কেন চড়োনি?'

'আমার যে টাকা নেই।'

'কাকা তো চড়েছে।'

'কাকার টাকা আছে।'

'কাকা তোমাকে নেয় না।'

'কই নিল?'

'তুমি কাকাকে বলো, তবেই নিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা বলবো। এবার আয়, দুজনেই একটু ঘুমিয়ে নিই।'

আট বছরের বালক কুশ খুশি হয়ে আমার পাশে শুলো। কবি অজিত দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ওরা থাকে তেতলায় আমরা থাকি দোতলায়। কিন্তু আমার সব সময়ের সংগী। কাকিমার কাছে আসতে পারলে সে খেলাও ভুলে যায়। তার মা বলে 'আপনার পোষ্য পুত্র।' নিতান্ত মিথ্যে বলে না। দুরন্ত কুশ শুয়ে শুয়ে ক্রমাগত হাত পা নাড়াচ্ছিলো, তন্দ্রাচ্ছন্ন আমি বিরক্ত হয়ে বলছিলাম, 'ও রকম হাত পা ছুঁড়লে শোবার দরকার নেই, উঠে যা।'

এরই মধ্যে একটি ফোন এলো। ঘুমটুম সব ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার।

উঠলাম। ফোন ধরলাম। যাঁকে চাইলেন তাঁকে দিলাম। সে ব্যক্তি আমার লিখন পঠনরত স্বামী বুদ্ধদেব বসু। এপিঠ থেকে যা বললেন, তা এই রকম 'না না অসম্ভব।' [illegible]

'আরে প্লেনে যাতায়াত করলেও তো থাকতে হবে পাঁচ দিন।' 'না' 'না' 'না' (এরপর সহাস্যে) করতে পারেন কিন্তু আমার মত-বদল হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে।' 'ঠিক আছে।'

ফোন ছেড়ে আবার যথাস্থানে বসতে যাচ্ছিলেন। আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'ওরো সব আজেবাজে হয়ে—

'কী।'

'কাশ্মীর যেতে বলছে।'

'কাশ্মীর! সে তো খুব ভালো কথা। কাশ্মীরে কী?'

'যা হয়। সরকার বাহাদুরের বাসনা আমি গিয়ে বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতিভূ হই। পাঁচ দিন ধরে সভা চলবে, আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

কুশ ততোক্ষণে কোথায় চলে গেছে। আমি উঠে বসে আগ্রহ সহকারে বললাম, 'ওরা তো প্লেন ভাড়া দিতে চাইছে?'

'কী আশ্চর্য! প্লেন ভাড়া দিলেই যাওয়া যায় নাকি? আর অতদূরে, প্লেন ছাড়া যাবোই বা কেন?'

'শোনো।'

'কী?'

'তুমি রাজী হও।'

'ধ্যুৎ।'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি যাবো। আমি কোনোদিন প্লেনে চড়িনি।'

অট্টহাসিতে ঘর ভরে গেল।

'কী ছেলেমানুষ। প্লেনে চড়ার এতো শখ?'

'হ্যাঁ।'

'তা ওরা তো আর তোমাকে চাইছে না, তোমার ভাড়া দেবে কেন?'

'না দিল, তোমারটা তো দেবে? তোমাকে থাকার খরচও দেবে নিশ্চয়ই—'

'তা তো দেবেই। দৈনন্দিন হাত খরচও দেবে।'

'তবে আর কী। তোমার খরচ তো লাগছে না, আমার একার খরচ, সে আমি নিজেই দেব। আমরা তো এমনিতেই একবার কাশ্মীর যাবার কথা ভাবছিলাম, খরচের কথা ভেবেই যেতে পারছি না। এখন যদি একজনের খরচ অন্যরা বহন করে, তবে আধেক হয়ে গেল।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'আর আমি তো প্লেনে চড়িনি, সেটাও হয়ে যাবে। নিজেরা গেলে তো ট্রেনেই যেতাম। তুমি কি একেবারে নাকচ করে দিয়েছো?'

'করলেও শুনছে কই? দু' ঘণ্টা বাদে

আবার ফোন করবে, যদি আমার মত বদল হয়।'

'মত বদল করো।'

'অসম্ভব কথা। বলছে পশুই রওনা হতে হবে।'

'বেশ তো।'

'বেশ তো? বললেই হলো? একদিনে প্রস্তুত হওয়া যায়?'

'আমাকে সঙ্গে নিলে আর ভাবনা কী? আমিই তো করবো সব।'

'পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা?'

'থাকবে। কেউ তো ছোটো নয়? মাত্রই তো পাঁচ দিনের ব্যাপার। না হয় এই পাঁচ দিন মিমি জ্যোতি এসে (আমাদের কন্যা এবং জামাতা) থাকবে ওদের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, তা হলে চল।'

দু' ঘণ্টা বাদে ফোন এলো। আমার স্বামী রাজী হলেন। বিকেলে চায়ের আসরে ছেলেমেয়েদের জানানো হলো সে কথা। সবাই খুশি হয়ে কাশ্মীর থেকে আনবার জন্য সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব ফরমাস

করেও ভাবতে লাগলো আর কী বলবে।

কুশকে বললাম, 'তোর কথাতেই আমার এরোপ্লেনে চড়া হচ্ছে। তুই-ই আমার আসল, বল, তোর জন্য কী আনবো।'

কুশ সলজ্জ হয়ে বললে, 'কিচ্ছু না।'

'ওমা এতো ভালো ছেলে! আর তোর দাদা দিদিদের দাবি কী লম্বা ফর্দ'। আমি তোর জন্যেই সবচেয়ে ভালো জিনিস আনবো।'

গদ গদ হয়ে একদিনের মধ্যেই গুছিয়ে নিলাম সব। অসুবিধের তো কিছু নেই, মাত্র তো পাঁচ দিনের ব্যাপার। আসল প্রস্তুতিটা মানসিক। বুদ্ধদেব কখনোই অত চটপট মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে পারেন না। কিন্তু আমি সঙ্গে যাচ্ছি, মস্ত ভরসা, এখন খুব খুশী। এটা নিয়েছো তো? সেটা নিয়েছো তো? অমুক বইটা কোথায়? পাড নাও, কলম নাও—আমার ঘুমোবার পোশাকটা কোথায় দিলে?' এই সব কথাই চলছে সারাদিন।

'কিন্তু সেজেগুজে রইলাম বসে, বর এলো না কপাল দোষে।'

শেষ মুহূর্তে খবর এলো একসঙ্গে দুখানা প্লেনের টিকিট ঐ তারিখে পাওয়া যাচ্ছে না, আগেই সব ভরে আছে। ও'রা একখানই কাটতে চাইছেন বুদ্ধদেবের জন্য। বুদ্ধদেব তাতে রাজী হলেন না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে, তুমি গেলেই পারতে।'

'পাগল!' নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে নিমগ্ন হলেন। আমার কিন্তু বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। এতো আশা করে-ছিলাম!

রাত্তিরে খাবার টেবিলে যখন ছেলে-মেয়ে জামাতা ভাইঝি সব একত্র হলাম, বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমরা একটু গোলমাল থামাও, আমার একটি প্রস্তাব আছে।'

জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত টেবিল চাপড়ালো, 'সায়লেন্ট সায়লেন্ট—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'তোমরা সবাই দেখছো এরোপ্লেনে ওঠা হলো না বলে রানুর কী অবস্থা?'

'আমার আবার কী অবস্থা?' আমি চক্ষুনি প্রতিবাদ করলাম।'

বড়ো মেয়ে মিমি বললো, 'সত্যি, ঠাট্টা নয়, মার মন কিন্তু বেশ খরাপ হয়েছে।'

আমি বললাম, 'য্যাঃ—'

ছোটো মেয়ে রুমি বললো, 'যা আবার কী? তুমি তো শুধু কাঁদতে বাকী রেখেছ।'

আমি আবার বললাম, 'য্যাঃ—'

বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, পাপপা রুমি যদি রাজী থাকে তা হলে রানুকে এবার আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাই।'

পঞ্চস্বরে কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'কোথায়?'

সেটা উনিশ শো একষট্টি সাল। বুদ্ধ-দেব নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে পড়াতে যাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে প্রায় সারা পৃথিবীব্যাপী বক্তৃতার আমন্ত্রণ।

বললেন, 'ভেবে দ্যাখ, কোথায় হলে প্লেনে ওড়ার সাধ মেটে।'

দু' ভাইবোন একযোগে লাফিয়ে উঠে বললো, 'রাজী, রাজী।'

'তুমি কী বলো মহুয়া?'

মহুয়া আমার ভাইঝির নাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক বিভাগের ছাত্রী, আমার কাছে থেকে পড়ে। সে-ও বলে উঠলো, 'নিশ্চয়ই।' কন্যা জামাতাও হাত তুললো 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।'

কয়েক বছর আগে বুদ্ধদেব যখন প্রথম ওদেশে যান, তখন অতি বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি ছিলেন আমার বাঁধা, এবারকার বাঁধা আমার পুত্রের আসন্ন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। তাছাড়া অবিবাহিত মেয়ে অবিবাহিত ভাইঝিও কম বাঁধা নয়। এই তিনটিকে একা একটি ফ্ল্যাটে শুধু ভৃত্য ভরসা করে অভিভাবকহীন অবস্থায় রেখে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি, উপরন্তু টাকার প্রশ্নটাও তো কম বড়ো নয়। কিম্বা সেটাই প্রথম। তাই হঠাৎ এই প্রস্তাবে হকচকিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মিন মিন করে বললাম, 'ওমা, তা কী করে হয়? তিন মাস বাদেই ওর পরীক্ষা। আমি না থাকলে—'

পনেরো বছরের ছেলে পঁচিশ বছরের মতো বিজ্ঞ মুখ করে বললো, 'তুমি থাকা না থাকার সঙ্গে আমার পরীক্ষার কী সম্পর্ক? তুমি কি আমাকে পড়াচ্ছো?'

'তা না হলেই বা কী, একটা দেখা-শুনো আছে না?'

'ন' মাস তো দেখাশুনো করেছ, তিন মাসের অদর্শনেই যদি সব গোল্লায় যায় তবে তা যাওয়াই ভালো।'

পাপপার কথায় সবাই বলে উঠলো, 'ব্রাভো ব্রাভো—'

আমি এবং বুদ্ধদেব দুজনেই ওদের এই উৎসাহিত সম্মতিতে কিঞ্চিৎ অবাক হলাম। কাশ্মীর যাবার ব্যাপারটা এভাবে ভেস্তে না গেলে আমার যাওয়া বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠত না। আমরা ভেবেই নিয়ে-ছিলাম, সেটা একান্ত অসম্ভব। বুদ্ধদেবের যাওয়ার কথা তো অনেক আগেই ঠিক হয়ে আছে। আমেরিকার এক যুবক কবি, যার নাম গলওয়ে কিনেল, যার চেহারা যে কোনো হৃদয়ে তরঙ্গ তোলে, যে ইচ্ছে করে খেয়াল-হীনভাবে একগুচ্ছ চুল ফেলে রাখে কপালের উপর, খেতে খেতে যে উদার

চোখে তাকিয়ে থাকে পছন্দ-সই মহিলাদের দিকে, সেই বধূটি তো ছ' মাস আগে এসেই ঠিকঠাক করে গেছে সব। আমাকে বলেছিলো, 'তুমিও কিন্তু যেয়ো।' আমি বলেছিলাম, 'সন্তানাদি নিয়ে দেখছো তো আমার একার সংসার?'

সে বলেছিলো, 'তাতে কী?'

তাতে যে কী সে কথা একজন বিদেশীকে তখন আর বোঝাতে বসিনি। শুধু একটু হেসেছিলাম।

কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা যে আমার যাওয়াটা এভাবে নেবে কে জানতো। এবং যার জন্যে আমার বেশী ভাবনা সে-ই দেখলাম সবচেয়ে বেশী উৎসাহী। দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো বড় ম্যাপ নিয়ে এসে বললো, 'এসো মা তোমাকে দেখাই তুমি কোন কোন দেশের উপর দিয়ে কীভাবে যাবে।

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললো, 'আমার পরীক্ষার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না, ফার্স্ট ডিভিশনে না গেলেও একটা সেকেন্ড ডিভিশন ঠিকই পাবো। ফেল আমি করবো না। সুযোগ পেলে আমি কি তোমার জন্যে কখনো বসে থাকবো? তুমিও এই সুযোগ ছাড়বে কেন?'

এর পরে খাবার টেবিল একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। মনে হলো আমি গেলে এদেরই যাওয়া হয়ে যায় এমনি উৎসাহের বন্যা।

জ্যোতি কাগজ কলম নিয়ে এলো, 'দেখুন, কলকাতা থেকে এই আপনারা উড়লেন, সঙ্গে থাকবে দুখানা রাউন্ড দ্য ওয়ার্লড টিকিট—প্রথম স্টেশন—'

আমি বললাম 'বার্মা। আমার ভারি বার্মা যাবার শখ।'

'বার্মা! বেশ। বার্মার পরে—' সে খস্‌খস্‌ করে একটি জাপানী মেয়ের ছবি আঁকতে আঁকতে বললো, 'ওসাকাতে বিমান বন্দর, সেখানে বক্তৃতা সেরে—'

আমি বললাম, 'না, তার আগে হংকং নামতে হবে।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, মা সেখানে নেমে জিনিস কিনবে, কী মজা কী মজা—'

বুদ্ধদেব সগৌরবে আমার দিকে তাকালেন, 'তা হলে যাচ্ছো? যাচ্ছো?'

কী থেকে কী! কোথায় প্লেনে চড়ে কাশ্মীর যেতে না পারার দুঃখে কাঁদছিলাম তার বদলে এই?

অবশ্য টেবিলে বসে সভা করে রওনা হওয়া যতো সহজ কর্ম বলে মনে হচ্ছিলো বাস্তবে তা হলো না। অন্য একটি বাধার কথা এতোক্ষণ ভাবিনি, সে হলো আমার কুকুর ভুতু। ভুতু মাতৃহীন অবস্থায় একুশ দিন বয়েস থেকে আমার কাছে প্রতিপালিত। তাকে তুলো দিয়ে দুধ খাইয়েছি, টিপে টিপে ভাত খাইয়েছি, কাঁদে বলে বিছানার পাশে বিছানা দিয়ে শুইয়ে রেখেছি। এই করতে করতে তার স্বভাব খুব খারাপ হয়ে গেছে। এখন বড়ো হয়ে গিয়েও সে সব অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। বেড়াতে গেলেও আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি যখন আমাদের তেতলায় কুশের মার কাছে গল্প করতে যেতে চাই তখনও সে যাবার জন্য কাপড় কামড়ে জবরদস্তি করে, জোর করে রেখে গেলে পাড়া ফাটিয়ে উ—উ—উ শব্দে এমন কান্না জুড়ে দেয় যে, বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হয়।

বর্তমানে তার অসুখ চলেছে। কানে যন্ত্রণা। বিখ্যাত পশু চিকিৎসক ডক্টর আমেদের রোগী সে। পনেরো দিন অন্তর কিড স্ট্রীটে 'অল লাভার্স অব অ্যানিমেলে' নিয়ে যাই চেক করাতে। সেখানে সব দামী দামী কুকুর আসে, আমার মাতৃহারা কানখাড়া পথ থেকে কুড়িয়ে আনা দিশী কুকুরটিকে তারা করুণার চোখে দেখে। বেয়ারারা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হেসে বলে, 'ঐ—আমাদের ক্যালকাটা টেরিয়ারটি এলেন। আমি অটল গাম্ভীর্যে তার চেন ধরে ঘরে নিয়ে আসি দেখাতে। আনতে কি পারি! অসভ্যের মতো টেনে হেঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দিতে চায়। অসভ্যের মতো নয়, বেশ একটু অসভ্যই। কোনো কথা শোনে না। আয় আয় বললে কোমর দুলিয়ে চলে যায়, যা যা বললে তৎক্ষণাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে যেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি সুপুরুষ। মুখে খুব লাবণ্য, আমার মনে হয় না ভুতুর তুল্য সুন্দর কুকুর আর একটিও ভূভারতে আছে।

এখন আমি না থাকলে কে ওর কান ধোয়াবে, লোম পরিষ্কার করবে, ঠিক মতো লাঞ্চ ডিনার ব্রেকফাস্ট তৈরি করে দেবে।

খাওয়া নিয়ে যা ঝকমারি। আমি না দিলে রেগে যায়, ঐখানে গিয়ে বসে থাকে চুপচাপ, তেড়িয়ে তেড়িয়ে আমাকে দ্যাখে। আমি তখন সোনা লক্ষ্মী বলে খাওয়াই।

ডক্টর আমেদকে বললাম, 'বেশী দিন নয়, ছ' মাসের জন্য যাবো, ও ঠিক থাকবে তো? আপনি মাসে একবার এসে দেখে যাবেন কিন্তু, আর হ্যারি যেন রোজ সকালে এসে কানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে যায়।'

ডক্টর আমেদের চেহারা দর্শনযোগ্য। টকটকে রঙ, প্রায় ছ' ফুট লম্বা, টানা টানা চোখে প্রেম প্রেম ভাব। সেই ভাব বজায় রেখে হেসে বললেন, 'কেউ কি কিছু কথা দিতে পারে? তবে আপনার কথা আমি রাখবো। মুশকিল কি জানেন? আপনি ওকে বড্ড বেশী ইয়ে করে ফেলেছেন, অসুখ করলে বাচ্চারা মাকে ছেড়ে থাকতে চায় না, ও-ও হয়েছে তেমনি। এ অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাবে কিছুটা, অনেক সময় দেখেছি আদুরে কুকুরেরা চট করে হার্টফেল করে।'

হ্যারির আসল নাম হরি, কায়দা করে নিজেকে হ্যারি করেছে, যাতে লোকেরা সাহেব ভাবে। ওঁর আদরের বেয়ারা। চেহারা কিন্তু মনিবের সম্পূর্ণ উল্টো। রঙ আবলুস কাঠ, তার উপরে মুখে বসন্তের দাগ, এইটুকু বেঁটে, খাটো, মাথায় শক্ত ব্রাশের মতো খাড়া খাড়া চুল। অবশ্য তারই মধ্যে চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। সব সময়ে মুখে তার হাসি। হেসে মনিবকে একান্ত-ভাবে অগ্রাহ্য করে বললো, 'না না কিছু হবে না। আপনি যান না, আমি রোজ আসবো। ছ' মাস তো চোক্ষের পলক, দেখতে দেখতে কেটে যাবে আমি বলছি। ছ' বছরেও এর কিছু হবে না।'

আমেদ সস্নেহে তাকিয়ে পাইপ টানতে টানতে বললেন, 'ব্যাটা সব জন্তা।'

এর পরে আসল সমস্যার অন্ধকারে প্রবিষ্ট হলাম। টাকা। আমাদের টাকা কোথায়? দুজনে মিলে লিখি পড়ি খাই, সব কোথায় ভোজবাজি হয়ে যায়। বুদ্ধ-দেবকে তো যাঁরা নিচ্ছেন তাঁরা নিচ্ছেন, আমারটা কে দেবে? তার মধ্যে সত্যি সত্যিই 'রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড' টিকিট কেনার প্ল্যান হয়েছে। দাম কি সোজা? পূর্বতট হয়ে যাবো, পশ্চিমতট হয়ে ফিরবো।

জ্যোতি বললো, 'প্রকাশক বধ করুন।'

ভেবেচিন্তে সেটাই স্থির হলো। কিন্তু কাকে? কিছুদিন যাবত একজন প্রকাশক আমাকে খুব বিরক্ত করছিলেন একটি উপন্যাসের জন্য। কিন্তু তিনি আমার স্বামীকে যাবজ্জীবন ঠকিয়েছেন, সেই কারণে আমি তাঁকে উপেক্ষার দ্বারা নিরস্ত করেছি। সেই তাঁকেই তখন মনে মনে ভজনা করলাম, যদি আসে।

আশ্চর্য, তিনি এলেন। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে, বললেন, 'বৌমা, শুনতে পেলাম বিলেত যাচ্ছেন, (এ'দের কাছে সারা দুনিয়াটাই বিলেত) ভাবলাম কবে আছি কবে নেই, একবার দেখে যাই আপনাদের।'

আমি বিয়ে হয়ে থেকে এই ভদ্রলোককে দেখছি, বৌমা ডাক শুনছি, কাছে দেখলে সমীহ না করে পারি না। তাড়াতাড়ি আদর যত্ন করে বসালাম, চা জলখাবার দিলাম, বধ করার কথা ভুলে গেলাম।

যাবার আগে ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'আমি আজ কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম, এটা রাখুন—'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'তারপর?'

'আপনার যখন খুশি নভেল লিখে শোধ করবেন।'

হাত বাড়িয়ে নিলাম টাকাটা। ভদ্রলোক বললেন, 'একটা আনুমানিক দাম ধরে পুরোটাই দিলাম।' দু হাজার বইয়ের পুরো দামটা নিতান্ত মন্দ হলো না। প্রকাশকটি ঝোপ বুঝেই কোপটা দিতে এসেছিলেন, ঠিকই বুঝেছিলেন, এবার ওঁর ফাঁদে না পড়ে আমার উপায় থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কৃতজ্ঞ হলাম। কেননা, অনুমান করে দাম ধরে যে টাকাটা আমাকে ভদ্রলোক দিয়েছিলেন আসলে সেটা একটা বইয়ের নয়, দুটো বইয়ের। কেননা, অত দামের একটা বই লিখতে গেলে আমাকে কমপক্ষে পাঁচশো পৃষ্ঠার বই লিখতে হয়। ততো বড়ো বই আমার হাতে এখনো বেরোয়নি।

ভাগ্য অনুকূল হলে এভাবেই হয়ে যায় সব। যাবো স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব গলওয়ে কিনেলকেও চিঠি লিখে দিয়েছিলেন যে, 'সস্ত্রীক যেতে চাই, কিন্তু পাথেয় কিছু বেশী না দিলে সেটা তো সম্ভাবনার পরপারে।'

তক্ষুনি জবাব দিলেন গলওয়ে, 'তোমার স্ত্রীও তো সাহিত্যিক, তার জন্য আমি যেভাবে পারি কর্তৃপক্ষকে বলে টিকিটের টাকাটার বন্দোবস্ত করে দেবো। কিছু ভেবো না।' সুতরাং—

সুতরাং, দেখতে দেখতে হয়ে গেল সব বন্দোবস্ত। শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে এলো রওনা হবার দিন। সেই দুপুরে যে বালক আমাকে এরোপ্লেনে চড়াবার জন্য তার কাকাকে বলতে বলেছিলো, যাবার দিনে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। সে কেঁদে ফেললো। যে ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের পৃথিবী ভ্রমণের উত্তেজনায় কিছু আগেও টলবগ করছিলো, দেখলাম তাদের অবস্থাও কুশের চেয়ে খুব উৎকৃষ্ট নয়। 'দড় বছরের নাতনীটি জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা দেখা থেকেই কোলে উঠে বসেছিলো কোথাও বেড়াতে যাবে বলে, তাকে তার আয়ার সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কুকুরটিও ভেকু ভেকু হয়ে পায়ে পায়ে চলছিলো, তাকেও চেন বেঁধে সরিয়ে নিয়ে গেল ছোটো থেকে পালিত নেপালী যুবক গঞ্জে, তারপর আমি পা বাড়ালাম বাড়ি থেকে। সেই মুহূর্তে বাড়ির চার দেয়াল ছেড়ে বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়ার একফোঁটা সাধও আমার অবশিষ্ট রইলো না।

দমদম এয়ার পোর্ট থেকে প্লেন ছেড়ে-ছিলো বেলা এগারটায়, বিদায় জানাতে জনসংখ্যা প্রায় ভরে ফেলেছিলো লবি। এক সময়ে ছাড়াছাড়ি হতে হলো। পিছনে মন রেখে শারীরিকভাবে কখন যেন বিমানযানের গহ্বরে এসে বসলাম। ঝাপসা চোখে জানলায় তাকিয়ে দেখলাম, ওরা সবাই-ই ঝাপসা হয়ে নিষিদ্ধ বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে, রুমাল নাড়ছে, আমার ছেলে-মেয়েরা চোখ মুছছে। মিষ্টি একটি মেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো, এয়ার হস্টেস, মৃদু কণ্ঠে বললো, 'ফাসন্‌ ইয়োর বেল্ট' আমি মুখ ফেরালাম, বেল্ট বাঁধলাম সঙ্গে সঙ্গে ভীম বেগে দৌড়ালো গাড়ি, তারপর হুস্‌ করে আকাশে উড্ডীন।

গ্লাইকোডিন-এর ওপর আমার পুরো ভরসা আছে

ওঁকে কাশি থেকে চটপট রেহাই দেবে

GLYCODIN TERP VASAKA COUGH SYRUP

গ্লাইকোডিন ভারতের যেকোনো কাশির ওষুধের তুলনায় অনেক বেশী লোকের কাশি দূর করেছে।

তাই আজ গ্লাইকোডিন-এর স্থান সবার আগে।

কাশি আক্রান্ত সমস্ত জায়গাতেই চটপট কাজ ক'রে গ্লাইকোডিন দ্রুত, নিশ্চিত আরাম দেয়

- গলা খুশ খুশ বন্ধ করে
- বুকের জমা শ্লেষ্মা গলিয়ে বার করে দিয়ে সর্দিকাশি থেকে রেহাই দেয়
- বুকের আড়ষ্টতা দূর করে, ফলে শ্বাস নেওয়া সহজ হয়··· আপনি আরামে ঘুমোতে পারেন

কাশি যেমনই হোক—তা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে আপনি সুস্বাদু গ্লাইকোডিন-এর ওপর ভরসা রাখতে পারেন।

গ্লাইকোডিন—ভারতে কাশি তাড়ানোর চ্যাম্পিয়ান··· নির্ভরযোগ্য ওষুধের নির্মাতা অ্যালেম্বিকের তৈরী।

everest/520/ACW-bg

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস : সমকালের কথা

আত্মরক্ষার অধিকার। সমীর রক্ষিত। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৯ টাকা।

এক অপঘাত-মৃত্যুর বর্ণনা দিয়ে 'আত্মরক্ষার অধিকারে' শুরু হলেও ওই দৃশ্যটির সঙ্গে মূল কাহিনীর কোনও অনিবার্য যোগ নেই। এমন কি, কোনও মৃত্যুচেতনায় পৌঁছে দেওয়াও লেখকের অভিপ্রেত নয়। বরং উল্টো। ওই ঘটনার অনুচিন্তায় সমীর রক্ষিত আসলে বেঁচে থাকার সঠিক ভূমিখণ্ডটুকু আবিষ্কারে তৎপর হয়েছেন। এদিক থেকে উপন্যাসটি শুরু থেকেই আকর্ষণীয়।

নায়িকা দীপা এক ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তার অভিজ্ঞতার দর্পণেই উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা বিধৃত। দীপা তপনকে ভালবাসে। তপন এক নিছক বস্তুবাদী, মূল্যবোধহীন, উচ্চাভিলাষী যুবক। যার একমাত্র অভীষ্ট যে-কোনভাবে হোক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। পারিবারিক জীবনের শ্বাসরুদ্ধকর জীর্ণতা থেকে মুক্ত হবার জন্যই দীপা তপনকে ঘিরে এক সম্ভাব্য সুখী সংসার রচনার স্বপ্ন দেখে। দীপার এই একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করছে রঞ্জনদা। কোনও বিচ্ছিন্ন, একক ব্যক্তিনির্ভর সাফল্যে সে বিশ্বাসী নয়। রঞ্জনদা মনে করে সামাজিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার রাস্তা একটাই আর তা হ'ল——সঙ্ঘবদ্ধভাবে অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সামিল হওয়া। এই দুই পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত দীপার মোহমুক্তি ঘটে। সে বুঝতে পারে আত্মকেন্দ্রিক তপনের ভালবাসা বস্তুত দেহগত অধিকারবোধের অতিরিক্ত কিছু নয়। এবং স্বভাবতই শেষ পর্যন্ত সে রঞ্জনদা অভিমুখী হয়ে ওঠে।

'আত্মরক্ষার অধিকার' কমিটেড রচনা। এই উপন্যাসে লেখক স্বকালমনস্ক। এবং শুধু সমকালের বিচিত্রজটিল রাজনীতি ও সমাজবিক্ষোভজ অভিঘাতগুলিকেই তিনি তুলে ধরেননি, সেই সঙ্গে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছোটখাটো প্রসঙ্গের সূত্রে তিনি এমন কিছু চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন যেগুলি তাঁর শিল্পসামর্থ্যের পরিচায়ক। এক দিকে তিনি যেমন তাজল এবং বিনয়ের চিত্রগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন, অন্য দিকে তেমনি প্রত্যাশা ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকেও চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করেছেন। দীপার ভাই, অজয়ের উন্মার্গগামিতা কিংবা আত্মপর সুখের সন্ধানে দাদার যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত তিনি যেমন বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি সমান শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন মা রেখার অগ্নিগর্ভ প্রত্যয়ের প্রকাশে।

সব মিলিয়ে 'আত্মরক্ষার অধিকার' নিঃসন্দেহে সমীর রক্ষিতের এক উল্লেখনীয় সৃষ্টি। তবু উপন্যাসের একটি প্রধান ত্রুটির কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দীপার মানসিক পরিবর্তনের রূপায়ণটি করতে গিয়ে লেখক কিছুটা তাড়াহুড়ো করে নিষ্পন্ন করেছেন। তপন চরিত্রটি কমিটমেন্টের চাপে পড়ে ঈষৎ পরিমাণে বাস্তবতা-বিচ্যুত হয়ে টাইপ চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কেননা, ব্যক্তিপ্রেমের সঙ্গে সমাজচেতনার কোনও অনিবার্য বিরোধ আছে কিনা এটা অবশ্যই বিতর্কের বিষয়। এ ক্ষেত্রে আর একটু সতর্ক এবং সংযমী হলে ঔপন্যাসিক হিসেবে সমীর রক্ষিত 'আত্মরক্ষার অধিকার'—এই সম্ভবত কিস্তিমাত করতে পারতেন।

প্রলয় সেন

কবিতা

ধ্যানে, ব্যবধানে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। দাম ৪·০০।

আকাশপথে স্থির ফটোগ্রাফ। প্রদীপ-

(সি ৫১৪২৭)

চন্দ্র বসু। আত্মপ্রকাশ, ১২৮এ বকুল-বাগান রোড, কলকাতা-২৫। দাম ৩·০০।

একত্রিশ বছর, তিনটে বই, কমবেশী সাত-আট শো পাতা পদ্য। কিন্তু সেই কবিতাটির দেখা নেই। (একটি বাস্তবিক গদ্য কবিতা)—এই দুঃসাহসিক উক্তি যে কবি করতে পারেন, তাঁর সততা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকে না মনোযোগী পাঠকের, যিনি 'যে-কোনো নিশ্বাসে' থেকে শুরু করে বর্তমান কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত কবির বিবর্তন ও উত্তরণের জটিল ইতিহাসটি সবস্নে মনে রেখেছেন, এবং ভালো কিছু কাব্যগ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিভুক্ত করেই তাঁর কাজ ফুরিয়ে যায়নি, নিজে তিনি আগ্রহী হয়ে শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবি-কৃতির মূল তাৎপর্যটুকুও অনুধাবন করতে পেরেছেন। কবিতা কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানপত্র। কিছু স্মরনীয় অসাধারণ পঙ্‌ক্তি, উজ্জ্বল চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা, আধুনিক আঙ্গিক ও শৈলী প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে কবি নির্মাণ করেন তাঁর শিল্প যা বিশেষ সময় ও সভ্যতার দর্পণ হিসেবেও অনাগত ভাবীকালের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে স্বীকৃত হয়। কবি শ্রীসেনগুপ্ত এই সময়ের রূপকার। পার্ক স্ট্রীটে এসে দাঁড়িয়েছে এক কিশোর ভিক্ষুক/... শুনছে পানশালার দরজা ঠেলে/সন্তপ্ত বেরিয়ে আসা বাবুর পিছন-পিছন ছোটা/ কপিলার কণ্ঠের শৃঙ্গার, অর্থাৎ গান/ এবং টুংটাং পিয়ানো যা কিনা তার/ গেঁয়ো নদীটির মতো। (এসে দাঁড়িয়েছে) নগর ভেঙেছে, গ্রামও প্রায় নষ্ট হয়ে এল/ ...এখন শ্মশান কোনও দূর/পৃথক অগ্নির স্থান নয় (শনি), নক্ষত্র সূর্যের নিচে ছোট, ছোট কেবলই ছোট হয়ে আসছে একজন মানুষ ও পৃথিবীর দুঃসময় (মানচিত্র)—এই সব পঙ্‌ক্তিই বুঝিয়ে দেয় কবি কি বলতে চাইছেন, কোথায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য। বাংলায় এখন কবিতার নামে ছদ্ম আত্মজীবনী রচনার জোর হুজুগ আমরা দেখতে পাই। অর্থহীনভাবে কারো বা উপজীব্য অ্যাবসার্ড বিষয়বস্তু। কেউ বা শেষ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন লিরিকের তরল চটুল ভাবমণ্ডল। পাশাপাশি এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম শ্রীসেন-গুপ্তের কবিতা। সমকালীন জীবন ও জীবনযন্ত্রণাকে তিনি দিয়েছেন উপযুক্ত বাণীরূপ। সমাজসচেতনতার সঙ্গে তিনি মিলিয়েছেন কবিব্যক্তিত্বকে। আলোচ্য কবির সার্থক কবিতা নির্মাণের কুশলী দক্ষতার কথা যদি আমরা কখনো ভুলেও যাই, অন্তত এই একটি কারণের জন্যেই

'ধ্যানে ব্যবধানে'র কবিতাগুলি আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

আজ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত যখন প্রদীপচন্দ্র বসুর কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল, আমরা তখনই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলাম। 'আলপথে স্থির ফটোগ্রাফ' শ্রীবসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যার পাতায় পাতায় মুদ্রিত আছে তাঁর সেই পূর্ব-প্রতিশ্রুতির পূর্ণ স্বাক্ষর। সকলেই সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখে, টাইগার-হিলে যায় লক্ষ টুরিস্ট/আমি একজন কবি, ভোর হলে, টুথব্রাশ মুখে যাই খেসারির ক্ষেতে;/দেখি কৃষকের উজ্জ্বল চোখ পাহারায় আছে/সময় হয়ে গেলে তুলে নেবে ঘরে পাকা ফসল (ছেঁড়া কাগজ)—এই কয়েকটি উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি থেকেই বোঝা যায় কবির বিশিষ্টতা। তাঁর দৃষ্টি একটি সরল রেখায় প্রবাহিত হয়েছে। মানব-জীবনের নানা জটিল সমস্যা ও দুঃখ-সুখের ঘাতপ্রতিঘাতের ফসল নয় তাঁর কবিতা। তিনি শান্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের কবি। পুরুলিয়ার কৃষক, ফসলের ক্ষেত, আলপথ, ঝোঁপ, খামারের ধান, সার, বীজ, সেচযন্ত্র প্রভৃতি তাঁর কবিতায় প্রিয় ও প্রায়-অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এগুলিকে কখনো রূপক, কখনো বা উপমা, তুলনা, প্রতি-তুলনা রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে নিখুঁত নিষ্ঠায়। কবি আশাবাদী বলেই বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন—তোমার কিছুই নেই/তবু/তুমি নিঃস্ব নও এটা ভোর-বেলা (সূর্য ও সংসারের মধ্যে)। আশাবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে জীবনের প্রতি তাঁর স্থির বিশ্বাস ও অনুরাগ। কবির স্পর্শকাতর ও অনুভূতিপ্রবণ মনের পরিচয় লুকিয়ে আছে বইটির ছত্রে ছত্রে। তাঁর কবিতায় কোনো চমক নেই। নেই জোর করে আধুনিক হবার অপচেষ্টা। এখানেই তিনি সার্থক যে, গভীর উপলব্ধির কথা সহজভাবে বলতে পেরেছেন।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এক পরাজিত শিল্পীর করুণ জীবন-আলেখ্য তরুণ কথাকার তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধরে (রাধা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৯, ছ টাকা) উপন্যাস। পুরোপুরি উপন্যাসের স্বাদ এতে ঠিক ফোটেনি, কাহিনী ছড়ানো নয় নানান উপ-কাহিনীর শাখা-প্রশাখায়,

মানসিক দ্বন্দ্ব যতটা এ-কাহিনীর কথকের কণ্ঠে বর্ণিত, নায়কের জীবনের ঘটমান বর্তমানে ততখানি প্রতিফলিত হয়নি। বরং কিছুটা গল্প বলার ভঙ্গিতে কাহিনী এগিয়ে গিয়েছে, সময়ের ব্যবধান কল্পনা করে নিতে হয় ক্ষেত্রবিশেষে। তবু আকারে সংহত এই উপাখ্যান আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও গতিময়। কৌতূহল ও ঔৎসুক্য শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে।

অসংযম কিভাবে শিল্পীকে তার সাধনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত ও দিগ্‌ভ্রান্ত করে তোলে মোটামুটিভাবে সেই ছবিটিই ফুটিয়ে তোলা যে লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। গুণেনের আত্ম-সমালোচনায় ও আত্ম-হননের স্বীকারোক্তিমূলক বিবরণীতে কথাটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও দু-একটি প্রশ্ন জাগে। গুণেন চরিত্রটিকে প্রথম থেকেই যেভাবে হাজির করা হয়েছে তাতে শিল্পী হিসেবে তার আত্মবিকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যথার্থ ভূমিটি কি, অনুধাবন করা কঠিন। মূর্তিশিল্পী হিসেবে সার্থক, গাইয়ে রূপেও কৃতী, নাটকে সফল, ছবি আঁকায় উৎসাহী, নাচিয়ে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত—এত বহুমুখী প্রতিভা এক শরীরে যেন মানায় না। এরকম যে দেখা যায় না তা বলব না, কিন্তু একই সঙ্গে এও দেখা যায় যে, সর্ব ক্ষেত্রেই মননশীল প্রতিভা দেখিয়ে এই সর্বগুণধরেরা লক্ষ্যহীন ও ব্যর্থ পরিগণিত হয়। গুণিলও ব্যর্থ, কিন্তু তার মূলে সর্বমুখী প্রতিভা নয়, 'লাম্পট্য ও দুশ্চরিত্রতা' প্রধান কারণ বলে বলা হয়েছে। লম্পট কিংবা চরিত্রহীন না হলেও কি গুণেনের পক্ষে অভিপ্রেত অমরতা লাভ করা সম্ভবপর ছিল? সেরকম কিন্তু মনে হয়নি।

আর একটি প্রশ্ন। দুটি দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার যে কারণ দেখিয়েছেন লেখক, 'বাস্তবের ওপর জোর দেওয়া' (গুণেনের ভাষায়—'বাস্তিক') গুণেনের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কি করে স্বাভাবিক হল জানি না। অন্তত সব পাঠকের পক্ষে যে স্বাভাবিক হবে না, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দীর্ঘকাল ধরে 'মহিলামহল'-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রীমতী বেলা দে-র পক্ষেই মানানসই কাজ অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্য একখানি প্রয়োজনীয় অভিধান রচনা। সংসার পরিচালনার জন্য আবশ্যক ও জরুরী কিছু পরামর্শ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গৃহিণীর অভিধান (পত্রজ পাবলিকেশনস, কলকাতা-২৯, পনের টাকা)। হাতের কাছে এমন একটি বই থাকলে আনাড়ী গৃহবধূও অল্প সময়ে সুগৃহিণী হয়ে উঠতে পারবেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই বই।

গৃহিণীর অভিধান-এর নতুন কলেবর বস্তুত শ্রীমতী দে-র পূর্ববর্তী দু-একটি গ্রন্থেরই সম্প্রসারিত রূপ। অনেক দিন আগে 'রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন' কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীমতী বেলা দে-র 'গৃহিণীর অভিধান'। সেই বইটি ও পরবর্তী প্রকাশিত 'রান্নাবান্না' বই থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ নিয়ে আদ্যন্ত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে এই নতুন সংস্করণ। অবশ্য পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির কোনো উল্লেখ লেখিকার ভূমিকায় নেই। প্রকাশকও এ বিষয়ে নীরব।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

জাতীয় ফুটবলে বাংলা আবার জয়ী

ভারতের ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। এর আগে ২ বার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৩ বার ফাইনাল খেলে বাংলা সন্তোষ ট্রফি পায় ১৫ বার। এবার নিয়ে ২৫ বার ফাইনালে উঠে ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন হল। একদিক দিয়ে এবারের জয় এই কারণে বেশী কৃতিত্বপূর্ণ যে, প্রথম সারির বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় দলে ছিল না। যেমন সুভাষ ভৌমিক, হাবিব, উলাগানাথন, সুরেশ চৌধুরী, সুধীর কর্মকার, তরুণ বসু এবং গৌতম সরকার। এই সাতজন খেলোয়াড়ের মধ্যে কারো কারো খেলায় বয়সের ছাপ থাকলেও অভিজ্ঞতায় এবং ক্রীড়াদক্ষতায় এখনো দলভুক্তির যোগ্য। কেউ কেউ তো অপরিহার্য। যে কারণেই হোক এদের বাদ দিয়েই এবার দল গড়া হয়েছিল। বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল তারুণ্যের উপর। সম্ভবত একথা মনে রেখে খেলোয়াড়রাও প্রতি ম্যাচ খেলেছে উজ্জীবিত হয়ে।

ভারতীয় ফুটবলে আবার বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের মূলে একদিকে যেমন খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা এবং পারস্পরিক সমঝোতা, অন্যদিকে তেমন কোচ অরুণ ঘোষের আন্তরিকতা ও শিক্ষা। এবার জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল পাটনায়। সেখানে দেখেছি বাংলা দল যেন একটি সুখী পরিবার। অরুণ খেলোয়াড়দের যেন একপ্রাণে বেঁধে রেখেছেন। কারো কোন অভিযোগ নেই। কোন বায়নাক্কা নেই। অনুশীলনে ফাঁকি নেই। সন্তোষ ট্রফি বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সবাই যেন আত্মবিশ্বাসী এবং সংকল্পবদ্ধ।

আমার নিজের ধারণা, খেলোয়াড়দের গড়ন, স্বাস্থ্য এবং সংগ্রামী মনোভাবে মহারাষ্ট্র ছিল সবচেয়ে ব্যালান্সড এবং শক্তিশালী দল। ফাইনালে বাংলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে শক্তির যথেষ্ট পরিচয়ও তারা দিয়েছে। কিন্তু ওই মহারাষ্ট্রকেই দুবার হার স্বীকার করতে হয়েছে বাংলার কাছে। একবার কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে, আর একবার ফাইনালে। ফাইনালে সতিাই ভাগ্যদেবী মহারাষ্ট্রের প্রতি বিমুখ ছিলেন। অন্তত পরাজিত হবার মত অস্বাচ্ছন্দ্য তারা করেনি। বাংলার অপর জয় মা কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে তারকাখচিত পাঞ্জাব দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করা—যে পাঞ্জাবের কাছে ১৯৭৪-এর ফাইনালে বাংলাকে শোচনীয় হার স্বীকার করতে হয়েছিল ০—৬ গোলে। সম্ভবত কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের প্রথম ম্যাচে বাংলার কাছে ওই পরাজয়ের ধাক্কা পাঞ্জাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে পরের দুটি ম্যাচেও গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের কাছে হেরে যায়। অথচ পাঞ্জাব সত্যিই তারকাখচিত দল। ভারতের তিনটি শক্তিশালী ফুটবল দল—জে সি টি মিলস, লীডারস ক্লাব এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের খেলোয়াড়দের নিয়ে দলটি গঠিত। দলের ৭ জন খেলোয়াড়—জাগির সিং, গুরুদেব সিং, সুখবিন্দার সিং, আজাইব সিং, হারজিন্দার সিং, মানজিৎ সিং ও ইন্দার সিং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়। সবাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারত দলে খেলেছে। তাছাড়া পরমজিৎ, কুলতার এবং অমরজিতেরও খ্যাতি কম নয়। আমরা জানি ওরা শুকনো মাটিতেই ভাল খেলে। পাটনা মইনুল হক স্টেডিয়ামের মাঠও ছিল শুকনো খটখটে। তবু কেন যে পাঞ্জাব তিনটি খেলায় হারল তার ব্যাখ্যা করা শক্ত। ভাগ্যদেবী ওদের প্রতি অবশ্যই বিমুখ ছিলেন। না হলে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্ট্রাইকার ইন্দার সিং শেষ মিনিটে গোয়ার বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিক মিস করে? বাংলা, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইন্দারের কতগুলি শটও ব্যর্থ হয় অল্পের জন্য? তবু পাঞ্জাবের তিনটি খেলায় পরাজয় বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আগেই বলেছি কর্ণাটক ছিল অপর শক্তিশালী দল। কোচ এম এইচ এস বাসা ফুটবলার গড়ার এক দক্ষ কারিগর। দলটিকে গড়েছেনও ভাল। ডিফেন্স বেশ শক্তিশালী। দুই লিংকম্যান কুমার ও দেবরাজ ভারত দলের জার্সি গায়ে পরার যোগ্যতাসম্পন্ন খেলোয়াড়। বিশেষ করে কদমছাটে চুল ছাটা পেলের মত দেখতে কুমার যে কোন দলের সম্পদ। অসাধারণ দম এবং ক্রীড়ানৈপুণ্য। কিন্তু কর্ণাটকের ফরোয়ার্ডরা বোধ হয় গোল-কানা। শক্ত ডিফেন্স ভেদ করার কৌশল কোচ বাসা ওদের রপ্ত করাতে পারেনি।

শারীরিক পটুতায় এবং খেলার প্রথা প্রকরণে মহারাষ্ট্র সব দলের উপর টেক্কা দিয়েছে। বিশেষ করে দুটি কেড়েছে লিংকম্যান রঞ্জিত, থাপা এবং রাইট আউট বুলার্ড পেরেরা। রঞ্জিত থাপার দম এত বেশী যে টানা দুটি ম্যাচ খেলায় শক্তি ধরে। চমক জাগানো চকিত শটে বলার্ড সিদ্ধপদ। নিজে বল তৈরী করে নেয় অসম্ভব ক্ষিপ্রতায়। ফাইনালে বাংলার বিরুদ্ধে ওর তিনটি শট ছিল দেখার মত। একটি তো পোস্টে লেগেছিল। দুটি ব্যর্থ হয়েছিল একটুর জন্য। যে কোন শটে গোল হতে পারত এবং গোল হলে খেলার ফল কি হত বলা শক্ত। নামী স্ট্রাইকার সাবির আলীর খেলা দেখার মত, বিপক্ষ রক্ষণের ভয়ের কারণ। ৬টি গোল করে প্রমাণও করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবার সবচেয়ে বেশী ১২টি গোল করেছে বাংলার স্ট্রাইকার শ্যাম থাপা। তারপরই ৭টি গোল করেছে বিহারের স্ট্রাইকার প্রধান।

বাংলার খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্যাম থাপার নাম দর্শকদের মুখে মুখে ফিরেছে। শ্যামই ৩৩তম জাতীয় ফুটবলে সবচেয়ে উচ্চারিত নাম। অপূর্ব ভঙ্গিতে কয়েকটি গোলও করেছে। তবু শ্যাম সে খেলা খেলতে পারেনি কলকাতার লীগ ম্যাচে যেমন খেলে থাকে। প্রসূন ব্যানার্জি সম্পর্কেও আমি একই কথা বলব। প্রতি ম্যাচে ধারাবাহিক ভাল খেলেছে স্টপার প্রদীপ চৌধুরী। সুব্রত ভট্টাচার্য, চিন্ময় চ্যাটার্জি, শ্যামল ঘোষ, রতন দত্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছে। কোচ অরুণ ঘোষকে ধন্যবাদ—বাংলার ২০ জন খেলোয়াড়কেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়েছেন।

প্রাথমিক গ্রুপ লীগে বাংলা পরাজিত করে উত্তর প্রদেশকে ৪—০ গোলে এবং মণিপুরকে ৫—০ গোলে। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে গোয়াকে ২—০, মহারাষ্ট্রকে ২—১ এবং পাঞ্জাবকে ৩—১ গোলে। ডাবল লেগ সেমিফাইনালে অন্ধ্রকে ৩—১ ও ৫—১ গোলে এবং ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে ১—০ গোলে। ফাইনালে জয়সূচক গোলটি করে লতিফুদ্দিন।

বাংলা দলে ছিল—গোল—বিশ্বজিৎ দাস, শিবাজী ব্যানার্জি ও সন্তোষ বসু; ব্যাক ও স্টপার—দিলীপ সরকার, সুব্রত ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষ, শ্যামল ব্যানার্জি, প্রদীপ চৌধুরী, চিন্ময় চ্যাটার্জি ও দিলীপ পালিত; লিংকম্যান—প্রশান্ত ব্যানার্জি, প্রসূন ব্যানার্জি ও রতন দত্ত; ফরোয়ার্ড—সুরজিত সেনগুপ্ত (অধিনায়ক), আকবর, শ্যাম থাপা, লতিফুদ্দিন, রঞ্জিত মুখার্জি, বিদেশ বসু ও মানস ভট্টাচার্য।

একলব্য

ফুটবলার সাবির আলীর শিল্পশৈলী

ক' বছর ধরে ফুটবল মহলে খবর ছিল মহারাষ্ট্রের নামী স্ট্রাইকার সাবির আলী কলকাতায় আসছে। খেলবে মোহন-বাগানে, না হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। আসেনি এবং এ মরসুমেও আসছে না। কারণ আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। জাতীয় ফুটবলে সাবির এবার খেলেছেও মহারাষ্ট্র দলে। সুতরাং কল-কাতার কোন ক্লাব যদি সাবিরকে পেতে চায় আরও এক মরসুম অপেক্ষা করতে হবে।

ছেলেটির খেলা দেখার খুবই ঔৎসুক্য ছিল। পাটনায় জাতীয় ফুটবল আসরে যখন সুযোগ ঘটে গেল তখন ভালভাবেই তার খেলাটা লক্ষ করতে থাকলাম। দেখলাম সাবির আলী সত্যিই সুযোগ-সন্ধানী স্ট্রাইকার। পায়ের কাজ, দেহের খেলা, হেড করার ক্ষমতা, পজিশন জ্ঞান এবং আক্রমণের গতির সঙ্গে অগ্রগমন—সব কিছু সমান ভাবে বাঁধা। ডাবল লেগ সেমি-ফাইনালে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় দুটি গোল এবং দ্বিতীয় খেলায় একটি গোল করার ক্ষেত্রে তার এই গুণগুলি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। কিন্তু ফাটবলে তার শিল্পশৈলীর শ্রেষ্ঠ কীর্তিটি ফুটে ওঠে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে বাংলার বিরুদ্ধে গোল করার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যে। বলা যেতে পারে ৩৩তম জাতীয় ফুটবলের ৪৫টি খেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি।

বাংলা তখন ১—১ গোলে এগিয়ে। খেলার বাকি মাত্র ৫ মিনিট। মহারাষ্ট্র গোল শোধের জন্য মরিয়া। আক্রমণের কায়দাটি বেশ ভেবে দিয়েছে বাংলার দুই স্টপার সুব্রত ও শ্যামল। মাঠে বাংলার মারমুখী চেহারা। কিন্তু সাবির সবসময় আক্রমণ। বাঁ দিক থেকে একটা ফ্রি-কিক উড়ে এল। সাবির তখন চল-মান। সাবির আলী এই মুহূর্তে গোলে আসছেন বাঁক নিয়ে একটি নিখুঁত মাথার উপর দিয়ে নিয়ে এসো পায়ের সামনে। এবং মাটিতে বল পড়ার আগেই সাবির ভলি মারল গোল লক্ষ করে। বিপক্ষের গতি নিয়ে বলটা গোলরক্ষকের উপর দিয়ে বল চলে গেল। একটু নিচে দিয়ে গেলে গোল হত এবং একটি বিরল গোল ফুট-বল ক্রীড়ামোদীদের বহু দিনের স্মৃতি হয়ে থাকত। আমি কিন্তু ওই ব্যর্থ প্রচেষ্টার স্মৃতি কোনদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না।

ফুটবল খেলা সম্পর্কে যাঁদের একটু জ্ঞান আছে তাঁরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন চলতি বলে ব্যাক হিল করে ওই-ভাবে ভলি মারতে কত সাধনা এবং কত পারদর্শিতার প্রয়োজন। দাঁড়িয়ে থেকে হিল করে ভলি মারাও অসাধারণ শিল্প-কর্ম। চলমান অবস্থায় শূন্যের বুকে চল-মান বল হিল করে সামনে এনে ভলি মারা বোধ হয় ফুটবলের সেই শিল্পসুষমা যে সুষমা ফুটে ওঠে নাদিয়া কোমানিচি বা ভেরা ক্যাসলাভস্কার জিমন্যাস্টিকসের মধ্যে। আগে একবার ছাড়া আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে আমি আর এমন শিল্প-

কর্ম দেখিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একবার কলকাতার মাঠে দেখেছিলাম ডেনিস কম্পটনের মধ্যে। দ্বিতীয়বার দেখলাম পাটনার মইনুল হক স্টেডিয়ামে।

সাবির আলীর ঘর এবং ঘরানা অনন্ধ। ফুটবলে প্রথম শিক্ষা পায় স্কুলের গেম টীচার এস এ গনির কাছে। পরে অনেকের কাছেই তালিম পেয়েছে। ভারতের পর-লোকগত ফুটবল গুরু রহিম সাহেবের পুত্র হাকিম, আবদুর সালাম, বাসা এবং বাংলার অরুণ ঘোষও কোন না কোন সময় ওকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এখনো প্রয়ো-জনীয় উপদেশ এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে মহম্মদ হোসেনের কাছ থেকে।

১৯৬৯ সালে হায়দরাবাদ আন্দোলাজ দলে এবং ১৯৭১-এ অন্ধ্রপ্রদেশ স্পেশাল পুলিস দলে খেলার সুবাদে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হিসাবে সাবিরের নাম শোনা যায়। ৭১এ আসামে অনুষ্ঠিত জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে অন্ধ্র দলের লেফট আউটে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কোচের পরামর্শে পরের বছর চলে আসে স্ট্রাইকারে। ১৯৭২এ ব্যাংকক এশিয়ান ইউথ ফুটবলে ছিল ভারত দলের সর্ব কনিষ্ঠ খেলোয়াড়। পরের দুই বছরও এশিয়ান ইউথ ফুটবলে খেলে তেহরান এবং ব্যাংককে। ৭৪এ ছিল ভারত দলের অধিনায়ক। যাই হোক, সাবিরের নেতৃত্বেই ৭৪এ এশীয় যুব ফুটবলে ভারত ইরানের সঙ্গে যুগ্মজয়ীর সম্মান পায়।

সাবিরের নিজের কথায় ওটাই ওর ফুটবল জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। খেলেছিলও চমৎকার। সারা প্রতিযোগিতায় ভারতের ৯টি গোলের মধ্যে একাই করেছিল [illegible]টি গোল। প্রাথমিক পর্বে সাবিরের গোলে লাওস ও বর্মার বিরুদ্ধে ভারতের জয় হয়। কোয়ার্টার ফাইনালে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধেও সাবিরের গোল, যদিও খেলাটি ১—১ গোলে ড্র হয়েছিল এবং ভারত শেষ পর্যন্ত জিতেছিল টাই ব্রেকারে। সেমি-ফাইনালে ভারত থাইল্যান্ডকে হারায় ২—১ গোলে এবং সাবির করে একটি গোল। ফাইনালে লতিফুদ্দিনের করা গোলটি ইরান শোধ করে দিলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটেই সাবির গোল করে ভারতকে আবার এগিয়ে দেয়। শেষ মুহূর্তে ইরান গোল শোধ করায় এবং ভারত এককভাবে চ্যাম্পিয়ন না হওয়ায় সাবিরের একটা চাপা অসন্তোষও রয়েছে।

যুব ফুটবলে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের পর ১৯৭৫এ ভারতের সিনিয়র দলেও সাবির যোগ্যতার পরিচয় দেয়। ইন্দো-নেশিয়ায় অনুষ্ঠিত মারা হালিম মোডান ফুটবলে ১১টির মধ্যে ৫টি গোল করে। অপর ৬টি গোল করেছিল স্ট্রাইকার ইন্দার সিং। হাবিব এবং ইন্দার দলে থাকায় কর্ণাটকের কোচ বাসা সাবিরকে লেফট আউটে সরিয়ে দিয়েছিলেন তাইওয়ানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটিতে। সেখানে সুবিধা করতে পারছে না দেখে দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য-স্থানে নিয়ে এলেন। দুটি গোল করল সাবির। বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলাতেই সাবির গোল করে থাকে। গত বছর মারডেকা ফুটবলেও হ্যাটট্রিক করেছে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে। ১৯৭২-এ টাটার চাকরি পেয়ে বোম্বাইবাসী হয়। ৭৩ থেকে মহারাষ্ট্রের নিয়মিত খেলোয়াড়।

মুকুল

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী/সঞ্জীবকুমার ও সাবানা আজমী/পরিচালক : সত্যজিৎ রায়

রঙ্গজগৎ

শিশু উৎসব/রবীন্দ্র সদন

এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানী—সুয়োরানী আর দুয়োরানী। সুয়োরানী ছিল খুব ভাল, আর দুয়োরানী ছিল খুব খারাপ। যে গল্পের শুরু এই, সেই গল্পে অক্লেশে আসে রাক্ষস, খোক্কস, অজগর সাপের মাথার মণি আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী গাছে বসে গল্প করে আর নীচে বসে সেই গল্প শোনে রাজপুত্তুর। আর শোনে কে? আর শোনে চালাক শেয়াল, বোকা বাঘ। শোনার পরেই শুরু হয়ে যায় গা-ছমছম-করা বিচিত্র সব কান্ডকারখানা। রূপকথার জগৎ আশ্চর্য এক জগৎ, এই জগতে সব অঘটন চমৎকারভাবে ঘটে যায়। সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে রূপকথার এই জগৎটি উঠে এসেছিল। শুধু রূপকথাই নয়, মনে ছিল আরও সব অপরূপ কথা। নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি আর জাদু প্রদর্শনীতে জমজমাট হয়ে উঠেছিল ছ'দিনের এক শিশু-উৎসব। উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্র সদন।

মঞ্চে সবচাইতে কম বয়েসী অভিনেতার বয়েস ছিল বোধ হয় তিন, আর প্রেক্ষাগৃহে সবচাইতে বেশি বয়েসী দর্শকের বয়েস ছিল সম্ভবত আশি। এই তিন থেকে আশি বয়ঃসীমার প্রতিটি দর্শকই সমানভাবে উপভোগ করেছে অনুষ্ঠানগুলি, না হলে অনুষ্ঠানের শেষে সবার মুখ অত ঝলমল করত না। অপরূপ জগতের এত কাছাকাছি বসে থাকলে বোধ হয় প্রভাবিত না হয়ে পার পাওয়া যায় না। মঞ্চে যখন এক বোকা ব্যবসায়ী গাছের ডালে জামাকাপড় ফলাবার জন্যে মন্ত্র পড়ছিল ওং, হ্রীং, ক্লিং... তখন সেই মন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এক শিশু দর্শক বলে উঠেছিল ওং, হ্রীং, ক্লিং। কিংবা যখন রাজামশাই সকলকে খুব ধমকাচ্ছিলেন, তখন একটি বাচ্চা দর্শক রেগে গিয়ে রাজামশাইকে খুব বকে দিয়েছিল। এ-ধরনের প্রতিক্রিয়ায় মজা পেয়েছিল সবাই, তবে এগুলি দর্শকদের বাড়তি পাওনা, আসল পাওনা ছিল অনেক বড়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল "অরুণপ্রাতের তরুণদল।" বাণীদীপা আয়োজিত এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরিচালনা করেন মিনতি দে। তারপরেই এল কাকাজু। কাকাজু ভীষণ কুঁড়ে, কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধি তার। একদিন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে পড়ল পথে। তারপর একে-তাকে এমনকি রাজাকে পর্যন্ত ঠকিয়ে বিস্তর পয়সাকড়ি নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। কাহিনীর শেষ নীতিকথায়। কাকাজুর নামেই নাটকের নাম। আনন্দ থিয়েটার প্রযোজিত "কাকাজু" আগাগোড়া চমৎকার। নির্দেশনায় ছিলেন তপন গঙ্গোপাধ্যায়।

গজমোতির মালা/সুব্রত, শুভ্রা, রঞ্জু, শংকরপ্রসাদ ও জয়ন্ত

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় আবৃত্তির আসর দিয়ে। বাণীদীপা পরিচালিত এই আসরে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, সুকুমার রায় এবং আধুনিক কবিদের কবিতা আবৃত্তি করে ছোটরা। আবৃত্তির পরে নাটক। লোকরঞ্জনার "স্বর্ণ-কাঞ্চন" নাটকটি সেই সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্প। দুয়োরানী ছিল মানুষের বেশে রাক্ষসী। সুয়োরানীর দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ের নাম পান্না, দুই ছেলের নাম স্বর্ণ আর কাঞ্চন। স্বর্ণ-কাঞ্চন দিগ্বিজয়ে বেরুবার পর থেকে ঘটতে লাগল অসম্ভব-অসম্ভব সব কান্ড। নাটকটি ভালই, তবে যবনিকার আড়ালে থেকে যাঁরা সংলাপ ধরিয়ে দেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল প্রায়ই। নির্দেশনায় ছিলেন রামকৃষ্ণ চন্দ।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিল তিনটি নাটিকা। "ব্যাঙের তীর্থযাত্রায়" তীর্থযাত্রী তিন ব্যাঙের দুর্গম যাত্রাপথে ছিল বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার। অভিনয় মোটামুটি সবাই ভাল করেছে, তবে চোখে পড়ার মতো অভিনয় করেছে সবুজ ব্যাঙরূপী শিশু শিল্পী মনোজ বৈদ্য। বাণীদীপা প্রযোজিত এই নাটিকাটি পরিচালনা করেন সঞ্জয় গুহঠাকুরতা। পরবর্তী নাটিকা দুটি, "লালচে বুড়ো" এবং "জিজোর" প্রযোজনা করেন জামশেদপুরের রবীন্দ্র সংসদ। "লালচে বুড়ো"র দেশে গিয়ে ধনরত্নের লোভে সবাই পাথর হয়ে যায়। কিন্তু সেই বুড়োর দেশে এমন একটি ছেলে গেল যার লোভ বলে কিছু নেই। নির্লোভ এই ছেলেটির জন্যেই প্রাণ ফিরে পেল পাথর-হয়ে-যাওয়া মানুষগুলো। "জিজো"র ছোট্ট ছেলেটি টুপি বিক্রি না করে শিশুদের দেবতা জিজোদের মাথায় পরিয়ে দিল টুপিগুলি। প্রচন্ড শীতে কষ্ট পাচ্ছিলেন দেবতারা। দেবতারা প্রতিদানে প্রচুর পিঠে রেখে গেলেন ঐ শিশুটির ঘরের সামনে। ছোট্ট এই কাহিনী দুটির প্রয়োগ অসামান্য। নাচে, গানে, অভিনয়ে পারদর্শী সুদূর জামশেদপুরের এই দলটিকে কলকাতা মনে রাখবে অনেকদিন।

চতুর্থদিনের অনুষ্ঠান শুরু করে মহারাজের পোশাক পরা সাড়ে পাঁচ বছরের জাদুকর পিটার প্যান। শোনা যায় এই জাদুকরের জাদু-জীবন শুরু হয়েছে মাত্র চার বছর বয়েসে। ঐ বয়েসেই পিটার প্যান সারা ভারত জাদুকর সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। যে বয়েসে হাঁ করে জাদু দেখে সবাই সেই বয়েসেই জাদু দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল পিটার প্যান। জাদুকরদের রঙ্গ-রসিকতা করতে হয়, পিটার প্যানও করেছিল। আধো-আধো গলা হলে কি হবে, তার রসিকতায় হাসেনি এমন একজনও বোধ হয় ছিল না। পরবর্তী অনুষ্ঠান সোনার তরীর নাটক "ধ্রুব।" ছোট রানীর কুপরামর্শে রাজা বড় রানী আর তার শিশুপুত্র ধ্রুবকে পাঠিয়ে দিল নির্বাসনে। তারপরে দীর্ঘ এক করুণ কাহিনী। পরিচ্ছন্ন এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বিমল সরকার।

পঞ্চমদিনের অনুষ্ঠানে প্রথমে আবার ছিল পিটার প্যানের জাদু-প্রদর্শনী। তারপরে বৈজয়ন্তী মণিমেলার নাটক "গজমোতির মালা"। কুমড়ার ভেতর থেকে গজমোতির মালা উদ্ধার গাঁয়ের ছেলে নবর দলের আশ্চর্য সব কান্ডকারখানা, পাজি মন্ত্রীর নিধন ইত্যাদি সব রোমাঞ্চকর ঘটনায় ঠাসা নাটকটি চমৎকার। এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সূর্য সেন। নবর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছে সাত্যকি চক্রবর্তী, অন্যান্যদের অভিনয়ও বেশ ভাল।

শেষদিনের অনুষ্ঠানে ছিল গীত ও ছন্দের "ছড়ার দেশের ছবি।" বিখ্যাত সব বাংলা ছড়া অভিনব প্রয়োগে সত্যিই ছবির মতো হয়ে উঠেছিল মঞ্চে। একই সঙ্গে শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক এই অনুষ্ঠানটি ছিল উৎসবের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রবীন্দ্র সদনের প্রশাসন

মবঙ্গ রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন (বাঁদিক থেকে)
ন চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, আরতি ভট্টাচার্য, মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায়। ফটো : দেশ

কারিক শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় য়েছেন যে, এই শিশু-উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য হল "শিশু-প্রতিভার বিকাশ।" শিশুদের প্রতিভা বিকাশে তাঁর রবীন্দ্র সদনের কার্যনির্ধারক সমিতির া সত্যিই প্রশংসনীয়।

বড়রা সাধারণত একটু বেশি উদার ছোটদের অনুষ্ঠান দেখতে যান। নয় করতে করতে যদি শিশু-শিল্পী ভুলে যায়, কিংবা যদি লম্বা-কোঁচা- ানো কোনো সওদাগরের ধুতি আলগা পড়ে, তাঁরা ক্ষমার চোখে দেখেন। , এই শিশু-উৎসবটি দেখে মনে হল, র ঐ উদারতা দেখাবার দিন আর নেই। া এখন নিজেদের জোরেই অবাক করে মতো নিখুঁত হয়ে উঠেছে।

শেখর বসু

চিত্র

চলচ্চিত্র পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার মনোনীত চকমণ্ডলীর বিচারে এ-রাজ্যে চলচ্চিত্র এবং চিত্রনির্মাণের সঙ্গে ষ্ট বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ বলে তদের পুরস্কার দেওয়া হয় ২৬ ারী রবীন্দ্র সদনে। মনোজ্ঞ ানটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এবং হিত্য করেন রাজ্যের তথ্য প্রতি- শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়।

তা শংকরের ভারতনাট্যম ও উদয়- কালচারাল সেন্টারের 'যুগছন্দ' নৃত্যের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আরম্ভ র পর নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ কানন দেবী ও সাহিত্যিক মনোজ পষ্টভাবে জানান যে নির্বাচনের সরকার পক্ষ থেকে সামান্যতম খাটানোর চেষ্টা হয়নি—নির্বাচন সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের। একথাও সঙ্গে তাঁরা জানান যে বিচারের জন্য তাঁরা যে ছবি দেখেছেন তা যথেষ্ট উচ্চমানের নয়। এঁদেরই বক্তব্যের জের টেনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে জানান ১৯৭২-এ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকার চলচ্চিত্রের উন্নয়নে বছরে পঁচিশ লক্ষ টাকা সাহায্য করে যাচ্ছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এককালে ভারতে উচ্চমানের ছবি তোলায় যে বাঙলাদেশ পথিকৃৎ ছিল সেখানে ছবির মান আশানুরূপ না হওয়া আপেক্ষের বিষয়। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন নাট্যাভিনয়কে পৌর-কর থেকে রেহাই দেওয়া হবে। সরকারের উদ্যমকে সার্থক করে তোলায় চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্যও তিনি আবেদন জানান। সভাপতির ভাষণে শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না বলে আশ্বাস দেন। তিনি জানান কোন প্রেক্ষাগৃহ প্রদর্শন সময়ের ষাট শতাংশ পশ্চিম বাংলায় তোলা যে কোন ভাষার ছবি দেখালে সে প্রেক্ষাগৃহকে সরকার থেকে ভরতুকি দেওয়া হবে।

'৭৬-এর শ্রেষ্ঠ তিনটি ছবি 'জন অরণ্য', 'মৃগয়া' ও 'অসময়'-এর পুরস্কার গ্রহণ করেন প্রযোজকত্রয় যথাক্রমে সুবীর গুহ, কে রাজেশ্বর রাও ও স্বরূপ দত্ত। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের জন্য নির্বাচিত সত্যজিৎ রায় উপস্থিত না থাকায় তাঁর পক্ষ থেকে প্রযোজক পুরস্কার গ্রহণ করেন। পুরস্কৃতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে তপন সিংহ (হারমোনিয়ম), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী (মৃগয়া), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী অপর্ণা সেন (অসময়), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (জন অরণ্য), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য (অসময়), শিশুশিল্পী অরিন্দম (হংসরাজ), গায়ক মান্না দে (যুগমানব কবীর), গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায় (হংসরাজ), গীতিকার শ্যামল গুপ্ত (হারমোনিয়ম), শিল্পনির্দেশক সুনীতি মিত্র (হারমোনিয়ম), আলোকচিত্র শিল্পী কৃষ্ণ চক্রবর্তী (অসময়), সম্পাদনার জন্য দুলাল দত্ত (জন অরণ্য), মেক-আপ দেবী হালদার (মৃগয়া), শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র অ্যাগ্নেস মুখোপাধ্যায় (গুরু আমুরি সিং), তথ্য-চিত্র পরিচালক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্ট্রীট ট্যালেনটস)। শিল্প-সৌষ্ঠবময় চিত্র নির্মাণে পথিকৃৎ বি. এন সরকার গ্রহণ করেন প্রমথেশ বড়ুয়া পুরস্কার।

শ্রেষ্ঠ শব্দ যোজনার জন্য কোন পুরস্কার প্রদত্ত হল না কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

বাংলা ছবির শোচনীয় অবস্থা ও মানের জন্যে যে-ব্যক্তিটি কোনো-কোনো সময়ে পরিচালকের চেয়েও বেশি দায়ী তাঁর বিষয়ে কিন্তু আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে কম। ইনি হচ্ছেন বাংলা ছবির প্রযোজক—সেই বিত্তবান কিংবা অর্থলগ্নি ধুরন্ধর যিনি চলচ্চিত্রের প্রায় কিছুই বোঝেন না, অথবা বোঝেন কিঞ্চিৎ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ তাঁর ভাবনায় চলচ্চিত্রের সঙ্গে বালতির ব্যবসা কিংবা ঘোড়ার পিঠে টাকা ধরার কোনো মূল পার্থক্য নেই। শুধু কোনো-কোনো সময়ে বালতি এবং অবিরল বালতি তাঁকে ক্লান্ত করে। কখনো-কখনো ঘোড়ার পিঠে কালো টাকাকে লাকস-ধৌত সফেদ করে নেবার পদ্ধতি তাঁর কাছে কিছুটা অনিশ্চিত মনে হতে পারে। কিংবা প্রায় কোয়ালিটির 'কুলচা'র মতো কালচারও তাঁর কাছে মনে হয় অর্থের বিনিময়ে অতি সহজেই প্রাপনীয়। সুতরাং চলচ্চিত্র!

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিটির নিজস্ব ভাবনার তহবিলে প্রায় কিছুই থাকে না। সে-দিক থেকে প্রায় শূন্য মূলধন হয়েই তিনি আরম্ভ করেন। এই দারিদ্র্যের জন্যে অবশ্য তাঁকে দায়ী বা দোষী করা যায় না। ঐ যে বললাম, বালতি-টালতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সারাজীবন এতো ব্যস্ত থাকেন

যে তাঁর পক্ষে নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার বিলাসিতা কদাচিৎ সম্ভব হয়। এবং যখন তিনি এসথেটিক ভাবনার সময় পান, তখন তিনি রাত ৯টার শোয়ে হিন্দী ছবি দেখেন। কিংবা রঙ্গমঞ্চে ক্যাবারে। একটা কথা এখানে বলে রাখি। ইদানীং বালতি, লোহা, বাঁশ কিংবা কেটারিং-এর ব্যবসা না করেও প্রযোজক হওয়া যাচ্ছে। কোনো নায়ক বা নায়িকার চামচে হতে পারলে 'স্পনারিজম'-এর দীর্ঘ ও ধৈর্যপরায়ণ পথে শেষ পর্যন্ত সেই নায়ক কিংবা নায়িকার টাকাতেই প্রযোজকের পদে আসীন হওয়া যায়। কিন্তু সেই পথে যেতে গেলে গায়ের চামড়া কোনো বিশেষ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর চেয়েও পুরু হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোনো-কোনো 'যোদ্ধার' গায়ে এমন চামড়া আমি দেখেছি।

একদা এক বাংলা ছবির প্রযোজককে আমি কোনো পত্রিকার জন্যে ইনটারভিউ করেছিলাম। সেই ইনটারভিউটি আজও আমি কোনো পত্রিকায় ছাপাতে পারিনি। সুতরাং লজ্জায় ভদ্রলোকের সঙ্গে কখনো চোখাচুখি হয়ে গেলে আমি তাঁকে এড়িয়ে যাই। এখানে সেই সাক্ষাৎকারের কিছুটা আমি তুলে দিচ্ছি। এ-থেকে পাঠক বাংলা-ছবির প্রযোজকের চেহারাটা আন্দাজ করতে পারবেন।

আমি : আপনি তো ইতিমধ্যে তিনটি ছবির প্রযোজক। তার মধ্যে দুটো ছবি বেশ ভাল চলেছে। ভবিষ্যতে কি ধরনের ছবির প্রযোজনার কথা ভাবছেন?
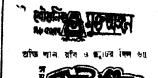
প্রযোজক : এবার একেবারে একটা আধুনিক গল্প নিয়ে করব।

আমি : অর্থাৎ আধুনিক সমাজের বিশেষ কোনো সমস্যা নিয়ে ছবি?

প্রযোজক : নিশ্চই। নায়িকা খুব আধুনিক মেয়ে। মর্ডান ড্রেসটেস পরে। ইংরিজি বলে, সিগরেট খায়, আর ফাংশ গান গায়। পাঁচ-ছ খানা গান থাকছে। সব মড্ গান। শুধু গান দিয়েই পাগলা করে দেব। তাছাড়া সেকসি ড্রেস দিচ্ছি। সেটা অবশ্য প্রথম দিকে। শেষে নায়িকার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। তখন সে কিন্তু শাড়ি পরছে। সিগরেট খাচ্ছে না। এবং ভক্তিমূলক গান গাচ্ছে। নায়ক হচ্ছে ইতিহাসের অধ্যাপক। সে নায়িকাকে নিয়ে অজন্তা-ইলোরা প্রভৃতি যাচ্ছে। কেভ-এর মধ্যে দু-একটা গানের দৃশ্য থাকবে। যাই হোক, এইসব দেখতে দেখতে নায়িকার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে।

আমি : কিন্তু এখানে আধুনিক সমস্যাটা কোথায়? আপনার কি মনে হয় নায়িকা অজন্তা-ইলোরার কাছ থেকে যেটা পাচ্ছে তা আমাদের পক্ষে আজও খুব রেলিভেন্ট? সেদিক থেকে আপনি কি কিছু বলার চেষ্টা করছেন?

প্রযোজক : ঐ তো বললাম। একটু বোঝার চেষ্টা করুন। অধ্যাপকের কাছে প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐ সব ব্যাপারটাপার শুনেই তো সে হঠাৎ একটা গান গেয়ে উঠছে। এবং এই প্রথম সে মড্ গান গাইছে না। এবং গানটা যখন সে গাইছে তখনই তার ড্রেসটা আমরা পালটে দিচ্ছি। হঠাৎ দেখছি তার পরনে শাড়ি!

আমি : আপনি বিদেশী ছবি দেখেন?

প্রযোজক : সময় পেলেই দেখি। এই তো সেদিনই যেন কি একটা ছবি দেখলাম। ফিলিম ফেসটিভ্যাল-এর ছবিগুলো দেখি। একেবারে হটু জিনিস মশাই। ওঁদের দেশের কত সুবিধে! সেন্সর দিয়েই তো বাজি মাৎ করে দিচ্ছে। একটা ইটালিয়ান ছবি দেখলাম। কি যেন নাম পরিচালকের। কি সব দৃশ্য মশাই! আর মাগীগুলোকে দেখতেও তেমনি......

আমি : আপনার কি মনে হয় সেনসর একটু আলগা হলে একসপেরিমেন্টাল ছবি এ-দেশে আরও সহজে করা যেতে পারে?

প্রযোজক : সেনসর-ই তো সব কিছু বানচাল করে দিচ্ছে। একসপেরিমেনটা করব কি করে? আমার যে-ছবিটার কথা বলছিলাম। অজন্তার গুহার মধ্যে একটা সিন ভেবেছিলাম কিন্তু সেনসর ছাড়বে না। না হলে শুধু ঐ দৃশ্যটার জন্যেই টাকা উঠে আসতো।

আমি : গদার এক্সপেরিমেনটাল ছবি করেন এবং ওঁর [illegible] বিশেষ সেকস নেই।

প্রযোজক : গদারফদার ওঁদের কথা ছাড়ুন। হলিউড-এর কত টাকা! ওরা পারে!!

এর পর আমি বহুক্ষণ কথা খুঁজে পাইনি।

এই হচ্ছে বাংলা ছবির প্রযোজকের মোটামুটি চেহারাটা। টালিগঞ্জের উপস্থিত যা অবস্থা তাতে মনে হয় ক্রমাগত এঁদেরই কাছে বাংলা ছবিকে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে ভিক্ষে চাইতে হবে। এবং ইংরেজিতে একটা কথা আছে, বেগারস ক্যানট বি চুজারস। অতএব বালতি, বাঁশ, লোহার ব্যবসার ফাঁকে-ফাঁকে ঐ ধুরন্ধর ব্যবসাদারটি যেমন-যেমন বলবেন আমাদের পরিচালকেরা ঠিক তেমন-তেমন ছবি বানাবেন। সেই সব অর্বাচীন প্রতিভাবান পরিচালকেরা যাঁরা এই ফরমুলায় কাজ করতে অপারগ তাঁরা আপাতত এবং আরও অনেকদিন চুপচাপ বসে থাকুন। জানি, এই সৃষ্টিহীন প্রতীক্ষা বড় যন্ত্রণাদায়ক। সেই যন্ত্রণার একমাত্র উপশম অন্তহীন কড়িকাঠ গোনা। কিন্তু আজকালকার বহু আধুনিক মাথা গোঁজবার মত ছাদে কড়িকাঠ পর্যন্ত নেই!

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে—৪

চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের কাছে এবারের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক উৎসবটি সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রেস-শো হতো সকাল ৭-৩০টায় এবং ৯-৩০টায়। শীতকালের মাঝামাঝি, তবে এবার তেমন হাড়-কাঁপানো শীত পড়েনি বলে রক্ষে।

এবারে ছবির মান তেমন উঁচু ছিল না। শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচনে বিচারকমণ্ডলীকে বেশ ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল মনে হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্তত দুখানি ভাল ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল—'ডেথ অব ইপু' (রুমানিয়া) এবং 'দাস বিগান দ্য জার্নি ইনটু হিবরনউইন্ড' (ইতালি)। হিচককের 'ফ্যামিলি প্লট' সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা

ছিল। কিন্তু ছবিখানি দেখার পর হতাশ হতে হয়। গ্রীসের 'প্রোমিথিয়াস' দিল্লির দৈনিক পত্রে উচ্চ প্রশংসিত হলেও বর্তমান লেখকের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে।

প্রধানমন্ত্রী উৎসবে সমাগত ডেলিগেটদের আপ্যায়নে একটি কফি-পার্টির আয়োজন করেন হায়দরাবাদ ভবনে। কিন্তু সে-পার্টিতে সাংবাদিকদের অধিকাংশই নিমন্ত্রিত না হওয়ায় সেখানে কি ঘটেছিল বলতে পারি না।

সবচেয়ে হতাশ হয়েছি আকিরা কুরসাওয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে। কুরসাওয়া ভাল ইংরাজী বলতে পারেন না বলে দীর্ঘদিন জাপানে অতিবাহিত করেছেন এমন একজন সাংবাদিক দ্বিভাষীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনিও আকিরার বক্তব্য ঠিকমতো অনুবাদ করতে অক্ষম হন। কুরসাওয়ার জাপানী সংগীটিও তথৈবচ। ওরই মধ্যে থেকে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা হচ্ছে কুরসাওয়া দিল্লিতে এসেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে। রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে একখানি ছবির বিষয়বস্তু তিনি ভেবেছেন বিশ বছর আগে কিন্তু টাকার অভাবে সে নিয়ে এগোতে পারেননি। অবশ্য রুশীয়রা সে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিভ্রাট হচ্ছে ভাষা নিয়ে। মার্কিন ছবি 'তোরা তোরা তোরা' পরিচালনায় তিনি বিরত হন মতের গরমিলের জন্য। ভাষার সমস্যা না ঘটলে ওই মহান স্রষ্টার কাছ থেকে আরো কিছু শোনা যেত।

কিউবার পরিচালক হুমবার্তো সোলাসের সাংবাদিক সম্মেলনেও সেই একই ভাষার সমস্যা দেখা দেয়। দোভাষীর বিব্রত হওয়ার কারণ ঘটে যখন সোলাস রাজনীতিক বিষয় অবলম্বনে ছবি তৈরির কথা উল্লেখ করেন। কিউবার চিত্রনির্মাতারা বিদেশে কেন বেশী ছবি তৈরি করেন—এ-প্রশ্নের উত্তরে সোলাস জানান যে, তাঁরা চলচ্চিত্রে আন্তর্জাতিক ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে চান। পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। তিনি জানান বিপ্লবের পূর্বে কিউবায় বছরে তৈরি হতো দুখানি মাত্র কাহিনী-চিত্র। কিন্তু আজ কিউবা-সহ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তৈরি ছবির সংখ্যা প্রভূত। সোলাস লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের জনক বলে অভিহিত করেন গ্লবার রোশাকে।

দিনের শেষে মাইকেলাঞ্জেলো আনতোনিওনির সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষার সমস্যা দেখা দেয়নি। কারণ, আনতোনিওনি বেশ ভালই ইংরাজী বলতে পারেন। কাজেই দোভাষীকে একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছিল। আনতোনিওনি জানান আলোচনা

রেজার সাহেব/মহুয়া রায়চৌধুরী ও বিশ্বজিৎ/পরিচালনা: রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী

আরম্ভ হবার আগে ফটোগ্রাফরা তাদের সেরে নিক। কিন্তু ভারতীয় ডকুমেণ্টারি প্রযোজক সুখদেব ছবি তোলার জন্য ফ্লাড-লাইট ফেলতেই আনতোনিওনি অস্বস্তি প্রকাশ করেন। কাজেই সুখদেবকে বাতি নিবিয়ে দিতে হয়। এত ছবি তৈরির পর আলো সম্পর্কে তাঁর অস্বস্তি কেন প্রশ্ন করতে আনতোনিওনি জানান যে, তিনি তো আলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন না—তিনি থাকেন ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে। আনতোনিওনি প্রসংগত জানান যে, অভিনয়-শিল্পীদের নিজস্ব প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে তিনি তাদের ওপর নিজের প্রভাব খাটিয়ে থাকেন—এটা সত্য নয়। সেন্সর তাঁর ছবিতে হস্তক্ষেপ করে সেটা তিনি পছন্দ করেন না তবে সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করেন যে বিশ্বের সব দেশের সেন্সরকে তো আর তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না! আনতোনিওনি জাপানী পরিচালক কুরসাওয়ার প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, কুরসাওয়া চিত্রনির্মাণে নতুন পথ দেখিয়েছেন। ইতালির টেলিভিশনে অত্যন্ত জনপ্রিয় কবীর বেদী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে আনতোনিওনি পরিহাসচ্ছলে বলেন, বেদীর মাথার চুল এত লম্বা যে ওর মুখ আমি কখনও দেখতে পাইনি।

কী চলচ্চিত্র উৎসবের সেক্রেটারি দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসব আরো 'কনডেনসড' করার প্রস্তাব করেন। দিল্লির উৎসব যে আগের চেয়ে উন্নততর হয়েছে সেকথা স্বীকার করে বলেন, একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রতিযোগিতার সব ছবিগুলি দেখানো হলে প্রতিনিধিরা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছোটাছুটি করার হয়রানি থেকে রেহাই পান।

নরেন্দ্রজন

সংগীত

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

রবীন্দ্রসদনে সুরদাস সংগীত সম্মেলন আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিলেন প্রখ্যাত সরোদিয়া ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ। ১২ই জানুয়ারির বৈঠকটিই ছিল তাঁর এই মরসুমের প্রথম অনুষ্ঠান।

আলী আকবর খাঁ সাহেব ভালভাবেই শুরু করেন তাঁর পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ নির্মিত হেম-বেহাগ রাগে একটি ছোট্ট (১৪ মিনিট) আলাপ দিয়ে, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। কাজেই আমরা যদি 'সব ভাল যার শেষ ভাল' প্রবাদ মেনে নিই তাহলে বলতে হয় তাঁর বাজনায় 'শেষ ভালোর' অভাব থেকে গিয়েছে। আলাপে খাঁ সাহেবের সেই কিংবদন্তিকারী সুরের জাদু তো ছিলই তাছাড়া রাগটিতে যা যা করা সম্ভব সব কিছু করা হয়ে গিয়েছিল এই সামান্য ১৪ মিনিটের মধ্যে। বিলম্বিত জোড়ের প্রথম কয়েক মিনিট ভালই কেটেছিল। কিন্তু তারপর শুরু হল অজস্র বেসুরো ও কনসুরো স্বরের ভয়াবহ আবির্ভাব। লয় যত বেড়ে চলল প্রাগল্ভ

স্বরের সংখ্যাও তত বেড়ে চলল। কাজেই ৩০ মিনিটব্যাপী জোড়ঝালার বেশীর ভাগ বিফলে গেল। স্বনির্মিত গৌরী-মঞ্জরী রাগে বিলম্বিত তিনতাল গৎটিও ভালভাবে শুরু হয়েছিল সেই সুরের মায়াজাল বোনা বিস্তার দিয়ে। কিন্তু লয়কারি ও তান-তোড়া আবার মাটি হয়ে গেল একই ভাবে। অপ্রচলিত ও চার স্বরে নির্মিত মালশ্রী রাগের গৎকারিও ততটা আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে তালটি ৮২ মাত্রায় ঝম্পক হওয়ায় খানিকটা মজা পাওয়া গিয়েছিল। শেষের পিলু গৎটিতে সুরের আবেগ থাকলেও শিল্পী লম্বা মীড় বা ঘষিৎ বাজাতে গেলেই বেসুরো হয়ে পড়ছিলেন। সঙ্গতকার তবলা বাদক স্বপন চৌধুরী যথেষ্ট ভাল বাজিয়ে ছিলেন এবং নড়নড়ে অনুষ্ঠানটিকে দাঁড় করিয়ে রাখায় তাঁর অবদান ছিল প্রচুর।

অন্য যন্ত্রীদের মধ্যে দিল্লীর দেবব্রত চৌধুরীই কলকাতার সেতারী (ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁর শিষ্য) সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছেন। তিনি বাজিয়ে ছিলেন বাগেশ্রী রাগে আলাপ, জোড় ও তিনতালে নিবদ্ধ বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ। আলাপ সুরেলা ও সুসংবদ্ধ হয়েছিল এবং ম প ধ (ম) জ্ঞ ও পকাড় পঞ্চমের উপর একটু বেশীক্ষণ দাঁড়ানোর ব্যাপারটা না থাকলে রাগ বিশ্লেষণও ত্রুটিহীন বলা যেত। জোড়টি তুলনায় একটু খাপছাড়া লেগেছে। বিনোদ পাঠক শিল্পীকে তবলায় বলিষ্ঠ মদত দেন এবং অনুষ্ঠানের সাফল্যের একটি বড় কারণ ছিল তাঁর নিপুণ কায়দা, রেলা, ছন্দ ও অতিদ্রুত ঠেকা। অনুষ্ঠানটি সম্মেলনের শেষ বৈঠক ছিল।

বলরাম পাঠক কলকাতার নাম করা সেতারী; বসেছিলেন প্রথম দিনের আসরের শেষার্ধে। বাজিয়ে ছিলেন 'মুখারী' রাগে আলাপ, জোড় ও দুটি গৎ। রাগটির সঙ্গে অবলুপ্ত হিন্দুস্থানী পূরবী ঠাটের মুখারীর কোন মিল পাওয়া গেল না। পাঠকজীর 'মুখারী' রাগেশ্রীর স্বরসমষ্টিতে তীব্র মধ্যম সংযোজন দ্বারা নির্মিত। কাজেই কর্ণাটক মুখারীর সঙ্গেও এর কোন মিল নেই—সে মুখারী আমাদের জৌনপুরীর স্বরে নির্মিত। আলাপে বেশ কিছু সুন্দর মীড় থাকলেও বেপরোয়া গঠন ভঙ্গীর জন্য সেটি সুখশ্রাব্য হতে পারেনি। গৎকারী তুলনায় কিছুটা ভাল হয়েছে।

পাঠকজীর পুত্র অলোক পাঠকের আলাপ ও জোড় অনিবার্য কারণে শোনা হয়ে ওঠেনি তবে পুরিয়া কল্যাণ রাগে গৎ দুটি ভাল লেগেছে। তানকারি ও লয়-কারিতে এই নবীন সেতারীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করলাম। কিরিট খাঁ (সরদীয়া বাহাদুর খাঁ সাহেবের পুত্র) বাজিয়ে ছিলেন কাফি রাগে আলাপ, জোড় ও দুটি তিনতাল গৎ। শুনে মনে হল তাঁর এখনো জলসায় বাজানোর মত দক্ষতা আসেনি।

কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাইয়ের পরভিন সুলতানা (কলকাতার চিন্ময় লাহিড়ীর শিষ্যা), দিল্লীর রাজন ও সাজন মিশ্র ও ভিলাইয়ের মিনাক্ষী দাস।

পরভিন সুলতানার ইমন কল্যাণ ও রাগেশ্রীর খেয়ালগুলিতে বিস্তারের কাজে এক নূতন পরিপক্কতা, আবেগ ও চিন্তা-শীলতার পরিচয় পেলাম। কিন্তু দ্রুত তানকারিতে তিনি প্রায়ই কনসুরা হয়ে পড়ছিলেন এবং দ্রুত সরগমের স্বরগুলি প্রায়ই জড়িয়ে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর তার ও অতিতারের কাজে দক্ষতা থাকলেও শিল্পবোধ ও মাধুর্যের অভাব আছে। কাজেই এগুলি পীড়াদায়ক বলেই মনে হয়।

রাজন ও সাজনের বিস্তারের কাজ বড় খাপছাড়া কাজেই রাগেশ্রীতে বিলম্বিত খেয়াল ভাল হয়নি। একই রাগে দ্রুত খেয়ালটি তুলনায় ভাল লেগেছে—এতে বেশ কিছু ভাল তানকারি ছিল। মিনাক্ষী দাস তাঁর শংকরা বিলম্বিত খেয়ালের বিস্তার পর্বে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন তবে মধ্যলয় অংশটি একটু কাঁচা লেগেছে। দ্রুত খেয়ালে তানকারি পরিষ্কার হলেও একটু বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়েছে। অবশ্য তাঁর পরের নিবেদন, নায়কী কানাড়ায় দ্রুত খেয়ালের তানকারি সেদিক থেকে অনেক ভাল হয়েছিল। অবশ্য তিনি স র জ্ঞ পর্দাটি প্রয়োগ না করলেই ভাল করতেন, কারণ এতে সুহা রাগের প্রভাব এসে যায়।

অনুষ্ঠানের একমাত্র নৃত্যশিল্পী ভাস্বতী সান্যালের কথক বড় আড়ষ্ট ও প্রাণহীন লেগেছে। নানকু মহারাজের নিপুণ তবলা সঙ্গতের গুণে অনুষ্ঠানটি কোনরকমে উতরে যায়।

নীলাক্ষ গুপ্ত

নাটক

দরজা ঠেলেছিল, খুলল না

অমন যে বিচিত্র-বিলাসী রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কলম থেকে প্রায় অ-রবীন্দ্র নাটক 'গৃহপ্রবেশ' প্রসূত হয়েছিল ভাবলে অবাক লাগে। অথচ চরিত্রগুলি প্রথম ২।৩ পৃষ্ঠাতেই পরিচিত হয়ে যায় এবং দীপ্তি-মান সংলাপ; তারই তলায় তলায় কী রকম মরবিবাড়িটির দমবন্ধ অন্ধকার পুঞ্জীভূত। নাট্যকারের সংলাপেই ঘুরিয়ে বলি, সমস্ত রচনাটিকে 'যেন হাসপাতালের ভূতে পেয়েছে।' সেজন্য এই নাটকের অনুষ্ঠান কম হয়, অনুষ্ঠেয় নাট্যের সফলতাও করতলগত সহজে হয় না। রবিরঞ্জনী সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। এই কারণেই আগ্রহ এবং ভীতি ছিল।

রবিরঞ্জনীর এই অনুষ্ঠানে প্রথমে একক গান করলেন শ্রীজন মুখোপাধ্যায় আর মায়া সেন। [illegible]জন মুখোপাধ্যায়ের গান শোনা হল না; মায়া সেনের গানের নির্বাচন ঠিক প্রশংসনীয় নয়। সব রকমের গান সব শিল্পীর কণ্ঠে বিকাশ পায় না। ধামার বা সুরফাক্তার ধ্রুপদাঙ্গ ইত্যাকার গানে মায়া সেন যথার্থ জমি খুঁজে পান; মীড়প্রধান গানে তাঁর কণ্ঠে মেলডির কিঞ্চিৎ অভাব ধরা পড়ে। এসবের জন্য সেদিন তাঁর 'দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে' সর্বোত্তম পরিবেষণ মনে হয়েছে।

বিরতির পর 'গৃহপ্রবেশ' হল। প্রযোজনা, এক কথায়, অ্যামেচারিশ। অধিকাংশ ভূমিকাভিনেতার তূণীরে স্বরক্ষেপ শরটি অন্তর্হিত, হাত দুটো নিয়ে দীর্ঘক্ষণের সমস্যা আর বৃহদাকার মঞ্চের অঙ্গনকেও তাঁরা কব্জায় আনতে পারেননি। অথচ সংলাপ উচ্চারণে, চকিত ভাবান্তরে তাঁরা কখনো আলো জ্বেলেছেন। চরিত্রের মুখেই গানগুলি বিশ্বস্ত রূপ পেয়েছে। নির্দেশক (নন্দকুমার কুরী) স্বয়ং যতীনের ভূমিকায় নেমেছেন। তাঁর অভিনয়টি জানা কিন্তু কখনো রুগ্নতাকে আনতে পারলেন না; পরিচ্ছদ আর উচ্চারণ সেখানে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। মাসীর (চিত্রা চট্টোপাধ্যায়) ব্যক্তিত্ব রয়েছে তাই মানিয়েছিল। মণি (নন্দিনী রায়) মোটামুটি স্বচ্ছন্দ কিন্তু সুন্দরী মানতে বাধে। হিমির (প্রমিতা শীল) সামান্য নারভাসনেস রয়েছে, গানে তিনি বরং সুগ্রাহ্য। প্রতিবেশিনীকে (দীপা চট্টোপাধ্যায়) বলতে পারি সর্বোত্তমা। আলোকসম্পাত অর্থহীন।

শান্তিনিকেতনের একটি দল কিছুদিন আগে 'গৃহপ্রবেশ' করেছিলেন; কলকাতার আকাদেমি মঞ্চেও তাঁরা আহূত হয়েছিলেন। তুলনাটা স্বভাবতই এসে পড়ছে : তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রধান সমস্যাগুলিকে অনা-য়াসে পেরিয়ে গিয়েছিলেন; বিশেষত, দীর্ঘগঠন বাক্য-উপস্থাপনে তাঁরা যথার্থ বিরতি রেখেছিলেন আর মঞ্চকে অধিকার করে এক অসুখী আবহ আনতে পেরে-ছিলেন। রবিরঞ্জনীর চেষ্টা ছিল, কিন্তু বড় উজ্জ্বল, বড় উচ্চারিত তাঁদের প্রযো-জনা। এই নাটকের স্বভাব সেখানেই আহত হল।

অপ্রাজিত বসু

রেকর্ড

মেলাবেন, তিনি মেলাবেন

'শঙ্কর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' এই মাসের লংপ্লেয়িং রেকর্ডের একদিকে গান, অন্যদিকে অর্কেস্ট্রা। একটি গানের 'অ্যারেঞ্জমেণ্ট' ছাড়া সব কিছুই রচনা করেছেন রবিশঙ্কর। লক্ষীশঙ্করের গাওয়া প্রথম গান 'আই অ্যাম মিশিং ইউ/ও কৃষ্ণ হোয়ার আর ইউ?' হারমনইজেশন ও পরিশীলিত গায়নভঙ্গীতে দেশে বিদেশে সমাদৃত হবে (কথা—রবিশঙ্কর)। অন্য দুটি লক্ষীশঙ্করের গাওয়া হিন্দী গানের অ্যারেঞ্জমেনট লক্ষণীয়। কিন্তু দশবতার স্তোত্র কখনই কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না। এই স্তোত্র বহুবার সুর করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সংকলনে রবিশঙ্করের সুরমাধুর্য কিচ্ছুই খুঁজে পাওয়া যায় না জিতেন্দ্র অভিষেকীর দুর্বল কণ্ঠের জন্য। ভাষা না বুঝলেও, বিদেশে কণ্ঠের মাধুর্য প্রথমেই নাড়া দিতে পারত—সেখানে শিল্পী নির্বাচনে আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল। অর্কেস্ট্রা কম্পোজিশনের মধ্যে আমাদের পরিচিত 'চন্দ্রকোষ' পাশ্চাত্য রীতিতে অদ্ভূতভাবে ঈপ্সিত রূপকে ফুটিয়েছে। সা জ্ঞা মা দা না র্সা পর্দার বিচিত্র সংস্থাপনে আমাদের অনুমানে বুঝতে হয় চন্দ্রকোষ। এখানে রাগরসে মুখানাদ অবনঠাকুরের ছবি লেখার মত, রবিশঙ্করের অভিপ্রেত 'ছবি বাজানো' অনুরূপভাবে 'ডেসপেয়ার অ্যান্ড সরো' অর্কেস্ট্রায় মারবা রূপের প্রয়োগ। এখানেও 'মারবা' রাগের কড়ি-মধাম ও কোমল রেখাবকে কাজে লাগানো হয়েছে। 'ডিসপিউট অ্যান্ড ভায়োলেন্স' অংশে শুধু কতকগুলি বোলের প্রতিধ্বনির শৈল্পিক প্রয়োগ। 'ফ্রাসট্রেশন' অংশের নানা-যন্ত্রের বিচিত্র 'ডিসকর্ড' এলোমেলো সুরে মন্দ্রসপ্তকে সি-এর ব্যবহার অদ্ভূতভাবে মনোভাবকে তুলে ধরেছে। সব শেষে বাঁশি ও সম্মেলক কণ্ঠে শান্ত ভোরের আগমনী 'ভাটিয়ার' রাগ। দুটি মধ্যমের ব্যবহার ও বাঁশিতে কোমল রে পর্দার সংস্থাপনা সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতির। তারপরেই 'হোপ অ্যান্ড অ্যাওয়েকনিং' অংশে ভাটিয়ার রাগেই যে সম্মেলক যন্ত্রে যে আশার সুর রচিত হয় তাতে আমাদের মনের আশা জাগে 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন।' দুটি রেকর্ডেই চৌরাশিয়ার বাঁশি অদ্ভূত কাজে লেগেছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় বাঁশি ও মাদল লোকায়ত মেজাজ এনে দিয়েছে; আবার সময় বিশেষে রসের মাধুর্য এমন কি ওয়েস্টার্ন কর্ডএও বাঁশি ঝলসিত থাপখোলা তরবারির মত।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

বিবিধ

শান্তিদেব আকাদমির ফেলো মনোনীত ও তিমিরবরণ পুরস্কৃত

সমাচার প্রদত্ত সংবাদে জানা গেল, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ সঙ্গীত নাটক আকাদমির ফেলো মনোনীত হয়েছেন। শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলেই পরিচিত, কিন্তু যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে জানেন তাঁরা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে তিনি সঙ্গীতজগতে একজন অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ। সঙ্গীতকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করে তার শিক্ষা, তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি সমগ্র জীবন ধরে চিন্তা করে এসেছেন। এতদ্ব্যতীত লোকসঙ্গীতে তাঁর সুগভীর অনুশীলনও সুবিদিত। ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চল ঘুরে তিনি নৃত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আজ এই প্রবীণ বয়সে সঙ্গীত নাটক আকাদমি তাঁকে সম্মানিত করে শুধু যে তাঁকে গৌরব প্রদান করেছেন তাই নয়, নিজেরাও বহুলাংশে উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সঙ্গে গুণী প্রবীণ যন্ত্রী ও সঙ্গীতবিদ শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য ও আকাদমির পুরস্কার লাভ করবেন জানা গেল। তিমিরবরণের প্রতিভা বহু দিকে পরিব্যাপ্ত। বর্তমান বাংলায় অর্কেস্ট্রার একটি নতুন রূপ তিনি প্রদান করেছেন। এ ছাড়া প্রয়োগকুশলতা ও প্রযোজনায় তাঁর মত উপযুক্ত ব্যক্তি খুব কমই আছেন। সঙ্গীত নাটক আকাদমির এই নির্বাচন সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় হয়েছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

জাদুকরের স্বপ্ন

শূন্য চায়ের কেটলি, ফাঁকা চিনি ও দুধের পাত্র—উপুড় করে দেখালেন জাদুকর। রুমাল চাপা দিয়ে রাখলেন কেটলিতে। দর্শকদের প্রশ্ন করলেন, আসাম না দার্জিলিং? অর্থাৎ কোন্ জায়গার চা পছন্দ? উত্তর এল, দার্জিলিং। শুধু উত্তরের অপেক্ষা। কেটলির ঢাকা খুলতেই গরম ভাপ বেরিয়ে এল। চোখের সামনে ভরে উঠল চিনি ও দুধের পাত্র। চারটি কাপে দার্জিলিঙ চা ছেঁকে প্রেক্ষাগৃহের চারদিকের চারজন দর্শকের হাতে তুলে দেওয়া হল। সত্যিকারের চা। স্বাদও যে চমৎকার বোঝা গেল দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্ত মুখ দেখে।

বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে 'জাদুকরদের স্বপ্ন' বলা যায়, তেমনই একটি খেলা দেখালেন তরুণ জাদুকর এম এন মুখার্জি সেদিন (১৬ জানুয়ারি) দমদমের টাউন হলে। ছিয়াত্তর সালে গণপতি-স্মৃতি-পুরস্কার পেয়েছেন এই উদীয়মান ইলিউশনিস্ট। খেলাটি নতুন নয়। কিন্তু এখনকার মঞ্চমায়াসৃষ্টিকারীরা যে-কালে সবাই একই ধাঁচের খেলা দেখাতে উৎসাহী, সে-কালে পুরনো একটি খেলাকে নতুন করে প্রদর্শনীতে স্থান দেবার এই ইচ্ছেকেই স্বাগত জানাতে হয়। নতুন খেলাও এম এন একটি রেখেছেন। 'চাইনিজ টরচার ইলিউশন'।

এম এন-এর খেলায় বহু আকর্ষণ। তাঁর 'মায়াজাল' সব মিলিয়ে চোখ টেনে রাখে।

- প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাসন্তিকা রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৩১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মারফত	২৩২·০০ টাকা	১১৬·০০ টাকা	৬০·০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

অরণ্যদেব ✲ লী ফক

গোটা জঙ্গল খোঁজা হয়েছে... কিন্তু সম্রাট জুনকরের খোঁজ মেলেনি...
রাজধানীতে খবর এসেছে কিনা, কে জানে।

বেঁচে থাকলে একটা খবর নিশ্চয় পাঠাতেন।
সম্রাট সম্ভবত বেঁচে নেই...
চেষ্টা ছেড়ো না!

সপ্তদশ শতাব্দীর এক ভয়াবহ কাহিনী।
সেইখানেই কি আমাকে মরতে হবে?
নোঙর তোল, পাল ওঠা!

ধরতে গেলে আমাদের মেরে ফেলবে!
তাড়াতাড়ি চল, নয়তো আমিই তোকে মারব!

জুনকর.. আমি জেমি...
?

জুনকর... আমি জেমি...
!!!
6/27

জুনকর.. তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি...
জেমি, ফিরে যাও...অরণ্যদেবকে খবর দাও... অরণ্যদেবকে...

ঐ ডিঙিটা কাদের?
গোলা চালিয়ে ডুবিয়ে দাও!
এক্ষুণি চালাচ্ছি মালিক!
১১

everest/503/JKH-bn

আপনি একটা হেয়ার ডাই থেকে কি কি পেতে চান?

টিক্ মার্ক করুন

☐ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ☐ সহজে ছড়িয়ে পড়া ☐ বেশী স্থায়িত্ব
☐ শ্যাম্পুর মত ব্যবহার ☐ হেয়ার কণ্ডিশনারযুক্ত ☐ তাড়াতাড়ি লাগানো
☐ সুন্দর গন্ধ ☐ সহজেই অতিরিক্ত ডাই ধুয়ে ফেলা।

নতুন নেচুরীন

প্রকৃত শ্যাম্পু হেয়ার ডাই

যাতে আপনি পাচ্ছেন ওপরের সবকটা গুণ—এমনকি আরও বেশী কিছু।

অনুপম সুরভি
এক অতি মনোরম সৌরভ—যাতে কোন খারাপ, কৃত্রিম দুর্গন্ধ নেই।

চুল থেকে ঝরে পড়ে না, নির্ঝঞ্ঝাট। লাগানো খুব সহজ।

বিশেষ ধরনের হেয়ার কণ্ডিশনার
একমাত্র নেচুরীন-এর মধ্যে আছে অ্যামাইড—এমন এক কণ্ডিশনার যা হেলীন কার্টিস বিশেষ ফরমুলায় তৈরী করেছেন। আপনার চুল সত্যিসত্যিই মোলায়েম রাখে আর সহজেই বাগ মানানো যায়।

প্রতি প্যাকে অনেক বেশী পরিমাণ ডাই
আপনার পয়সায় ২৫% বেশী মূল্য দেয়।

একবার ব্যবহার করলে—আর কোনও শ্যাম্পু হেয়ার ডাই ব্যবহার করতে চাইবেন না।

পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে স্বাভাবিক কালো ও ডার্ক ব্রাউন রঙে পাওয়া যায়।
গ্যারান্টী দিচ্ছেন হেলীন কার্টিস—চুলের যত্নের ব্যাপারে যাঁরা জগতে সবার অগ্রণী।
জে. কে. হেলীন কার্টিস লিমিটেড, বম্বে ৪০০ ০৩৮

নেচুরীন—জাপান ও অ্যামেরিকায় যে হেয়ার ডাই সাফল্যের চমক এনেছে।

এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: **জি. এথারটন অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড,** কোলকাতা, পাটনা, গৌহাটি, কটক ও ভিলাই।

দেশ

২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ ৮০ পয়সা
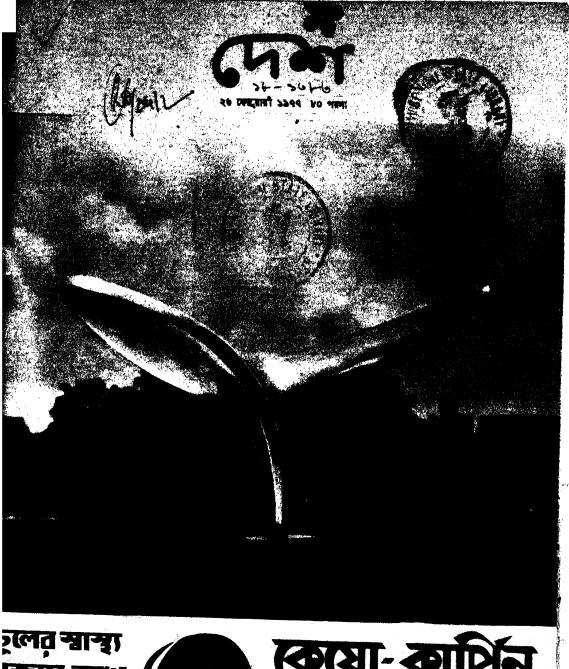
এখন!

ফ্যারেক্স®

ভারতের সবচেয়ে বেশী-বিক্রীর শিশুদের মায়ের দুধ ছাড়াবার আহার

এক নতুন, আধুনিক রিফিল প্যাকে !

ফ্যারেক্স এখন আপনি পাবেন একেবারে নতুন এক রিফিল প্যাকে—প্যাক করার আন্তর্জাতিক সর্ব্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা অনুসারে

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেসকাফে®
স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
NESCAFE
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইন্স্ট্যান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মানিক তালুকদার

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "উড়ে চল" (ব্রোঞ্জ—১২"×১০")—একটি পাখির ওড়ার গতিময় রূপ ধরেছেন শিল্পী। একটি ডানা পালের মতো ফুলে উঠেছে, অন্যটি একটু তেরছাভাবে স্থির। কী মসৃণ ও ছন্দময় রূপবন্ধ। খুঁটিনাটি নয় মৌল জ্যামিতিক আকারের ওপরেই তাঁর ঝোঁক। রেখার বন্ধনের মধ্যে বস্তুপুঞ্জ ধৃত এবং ধাতব দ্যুতির ব্যঞ্জনায় মনোজ্ঞ।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় ভ্রমক্রমে প্রচ্ছদশিল্পী হিসাবে হীরাচাঁদ দুগারের নাম ও তার ছবির পরিচিতি মুদ্রিত হয়েছিল। গত সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী।

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮
শনিবার ১৪ ফাল্গুন ১৩৮০

ফকরুদ্দিন আলি আমেদ

রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদের আকস্মিক জীবনাবসান সারা জাতির প্রাণে যে বেদনা উদ্বেলিত করেছে, সে বেদনা কোনো ব্যক্তির জীবনে তার নিকট প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোকবেদনার অনুরূপ একটি করুণতার প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়। লক্ষ্য করতে হয়েছে, ভারতীয় জনজীবনের এই বেদনার প্রকাশ নিতান্ত প্রথাগত কোন ক্রিয়াচারের মতো রূপ গ্রহণ না করে সহজ আন্তরিক আচরণের অশ্রুসজল আবেগের মতো ভারতের সকল প্রান্তের সকল জনপদের নাগরিক শ্রদ্ধার বিপুল অভিব্যক্তির দৃশ্য সম্ভব করেছে। এটা নিতান্ত রাষ্ট্রপতির পদগৌরবের প্রতি লৌকিক শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রপতির পদাধিকারী মানুষটিরও প্রতি শ্রদ্ধাশীল জাতির সকৃতজ্ঞ সম্মানের নিবেদন। ভারতের মতো দেশের রাষ্ট্রপতিত্বের পদাধিকারের একটি সহজ গৌরব অবশ্যই আছে। এবং সে বিষয়ে জাতীয় আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে উপলব্ধি এবং অনুভবের কোন অপূর্ণতা থাকবে না, এটাই সুসংহত জাতীয়তার একটি লক্ষণ। সেদিক দিয়ে ফকরুদ্দিন আলি আমেদের সম্পর্কে ভারতীয় জনতার কোন অংশের মনে ও আচরণে শ্রদ্ধার বোধ কখনও উদাস হয়েছে, এমনতর ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাঁরা সংবিধানের কঠোর সমালোচনা করেন, তাঁরাও রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা সম্বন্ধে লঘু ধারণার মন্তব্য সাধারণত মুখরিত করেন না। দেশ-বিদেশের সর্বজনীন শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার বিশেষ গৌরবের একটি বড় পরিচয়। যা-ই হোক, ফকরুদ্দিন আলি আমেদের প্রতি জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিতান্ত তাঁর রাষ্ট্রীয় পদাধিকারের উচ্চতার সত্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও বিবেচিত হয়নি। তিনি তাঁর দেশানুরাগ ও চারিত্রিক মহত্ত্বের গুণে জাতির সার্বিক শ্রদ্ধার আস্পদ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের আংশিক পরিচয় এই যে, তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এটা তাঁর জীবনের বহু কর্তব্যের মধ্যে মাত্র একটি কর্তব্যের পরিচয়। কিন্তু তাঁর জীবনের যথার্থ এবং শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে তিনি জাতির জীবনের সকল অভীপ্সা এবং সংগ্রাম ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে শুধু এক আদর্শোচিত জাতিসেবকের কর্মিষ্ঠতা নয়, দূরদৃষ্টিপ্রবণ এক জাতি-সংগঠকের প্রাতিভাও অর্জন করেছিলেন। কুসুমাকীর্ণ পথে নয়; বহু ত্যাগ ও পরীক্ষার ঘটনা উত্তীর্ণ হয়ে, মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে কারাবরণ করে, জাতীয় সংস্কৃতির মূল সত্যটিকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করে তিনি তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের যে মহনীয় সৌকর্য সম্পন্ন করেছিলেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্বল হয়েও বস্তুত জাতিরই জীবনের একটি সম্বল হয়ে সার্থকতা অন্বেষণ করেছে।

সংবাদপত্রের পাঠক এবং বেতার-প্রচারের শ্রোতা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হতে পারেন না যে, রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ ভারতের সমন্বিত সংস্কৃতির পরিচয় সম্বন্ধে কী বিপুল শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং এক নিষ্ঠাশীল মুসলিম, কিন্তু তাঁকেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, হিন্দু বৌদ্ধ ও শিখের ধর্মীয় তত্ত্বের আনুষ্ঠানিক কোন আসরে; কিংবা সন্ত-মহাজনের কোন স্মৃতি-সভার ভাষণে অজস্র তথ্যজ্ঞান এবং শ্রদ্ধার সমুল্লেখ কত সহজে সম্পন্ন করতেন। সুতরাং, তাঁকে একজন আদর্শোচিত ভারতীয় বলে অভিহিত করলে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি হবে না। বরং বলা যায়, দেশবাসীর পক্ষে তাঁর জীবনের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় বস্তুত এই শিক্ষণীয় সত্যটিকেই নতুন করে জনপ্রিয়তা প্রদান করেছে। সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গী আচরণ ও মনোভাব বলতে কী বোঝায়; আদর্শোচিত ভারতীয় চরিত্র বললে কেমনতর প্রকৃতির চরিত্র বোঝায়; সে প্রশ্নের ঐতিহাসিক সদুত্তর ফকরুদ্দিন আলি আমেদের জীবনে প্রতি-মূর্ত হয়েছে।

রাজনীতিক ও সাংবিধানিক তত্ত্বের তার্কিক বিচারের আসরে একটি প্রশ্নের আওয়াজ খুব বেশী করে বাজতে দেখা যায়—ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পদটি কি নিতান্ত একটি প্রতীক নয়? রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিসীমা সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদের মুখরতাও শোনা যায়। বিগত কোন কোন রাষ্ট্রপতির উক্তিতে এবিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নও আভাসিত হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ফকরুদ্দিন আলি আমেদের সম্পর্কে বলা যায়, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিসীমা নিয়ে সাংবিধানিক স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতার কোন প্রশ্ন তাঁর কাছে বস্তুত কোন প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবারই সুযোগ পায়নি। কারণ তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে দেশসেবক, এবং দেশ-বাসীও তাঁকে একজন মহান্ দেশসেবক বলে অনুভব করেছে।

দৃশ্যপট

মনে হয়, বিরোধী পক্ষের চমকের খেলা শেষ হয়েছে, বিজয়লক্ষ্মীর ব্যাপারটা যতটা চমক সৃষ্টি করবে বলে বিরোধী নেতারা আশা করেছিলেন তা করেনি। এর সবচেয়ে বড় কারণ, বিজয়লক্ষ্মী দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি থেকে দূরে আছেন। বিজয়লক্ষ্মী ভারতের রাজনীতিতে এখন খুব বড় নাম নয়। এর দ্বিতীয় প্রধান কারণ, রাজনীতি সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পিসির সম্পর্কটা অনেকদিন ধরেই ভাল নয়। কংগ্রেস যখন ভাগ হয় তখন বিজয়লক্ষ্মী প্রকাশ্যে অনেককে বলেছিলেন, ইন্দুর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান উচিত। সেই বিজয়লক্ষ্মী এখন সুযোগ বুঝে শ্রীমতী গান্ধী-বিরোধী জোটে গিয়ে যোগ দেবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এখনও কোনও পাল্টা চমক দেখান নি। সবাই জানেন চমক দেখানোয় তাঁর জুড়ি নেই। এই লেখা পর্যন্ত তিনি চুপচাপ। নির্বাচনের অর্থাৎ ভোট গ্রহণের এখনও অবশ্য এক মাস আছে। দলের মনোনয়নের পালাটা শেষ করে তিনি কোনও বড় চমক দেখান কিনা তাই দেখার জন্য এখন অনেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সবাই বলছেন, সেই চমক দেখার আগে বলা যাবে না ভোটের ফলাফল কী হয়।

✻

এমনিতে যা অবস্থা তাতে কংগ্রেসের অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধীর জয় যে খুব সহজ হবে না সেটা সবাই বুঝছেন।

বিরোধীরা বহু দল একজোট। নির্বাচনের মুখে একদল কংগ্রেসীও দল ছেড়ে বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে জগজীবন রাম এবং বহুগুণার গুরুত্ব বিরাট। হরিজনদের উপর, বিশেষ করে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের হরিজনদের উপর জগজীবনবাবুর প্রভাব সুবিদিত। বহুগুণা সাংগঠনিক নেতা। উত্তরপ্রদেশে মুসলমানরাও [illegible] বিশেষ করে জগজীবন রাম এবং বহুগুণার দলত্যাগের প্রভাব তাই নির্বাচনের উপর পড়বেই।

কংগ্রেস ১৯৭১ সনের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে যে ফলাফল করেছিল এবার তা কেউ আশা করেন না। অতিরিক্ত উগ্র কংগ্রেসীও না। সবাই বলছেন, এবার কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে খুব ভাল ফল করবে না।

প্রশ্ন হল, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেসের ফলাফল কতটা খারাপ হবে? এই দুই রাজ্যে এবার মোট আসন সংখ্যা ১৩৯। এর ভেতরে যদি অন্তত ৬০টি আসন কংগ্রেস জিততে না পারে তাহলে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে লোকসভায় গরিষ্ঠতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ, অন্যান্য রাজ্যেও ৭১ সনে কংগ্রেসের যে ফলাফল হয়েছিল এবার ততটা ভাল আশা করা যায় না।

কংগ্রেস নেতারা আশা করছেন, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরলে তাঁদের অবস্থা গতবারের তুলনায় কিছুটা ভাল হবে। কিন্তু তেমনি আবার মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে কিছুটা কমবে।

সুতরাং, লোকসভায় গরিষ্ঠতা পেতে হলে কংগ্রেসকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অন্তত ৬০টি আসনে জিততেই হবে।

✻

একটা জিনিস অবশ্য আমরা কেউই এখনও জানি না। আমরা যাঁরা শহুরে মানুষ তাঁরা জানি না যে গ্রামের মানুষ জরুরী অবস্থাকে কীভাবে নিয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, বিনা বিচারে আটক রাখা, ইত্যাদি বিষয়ে যতটা ক্ষুব্ধ, গ্রামের গরীব মানুষও কি ওসব নিয়ে ততটা বিচলিত? আবার দিল্লি শহরের গরীব মানুষ "রাজধানী সুন্দর করার অভিযানে" চরম ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের গরীব মানুষকে এই অভিযান স্পর্শই করে নি। সুতরাং, এই অভিযান দিল্লির গরীব মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের গ্রামের গরীব মানুষ এ ব্যাপারটা জানেই না!

পরিবার পরিকল্পনা অভিযানও দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে যে আকার ধারণ করেছিল বিহার বা ওড়িশা বা পশ্চিমবঙ্গে সেই আকার কখনওই ধারণ করে নি। তাই, এর প্রতিক্রিয়া দিল্লি শহর বা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে যতটা হবে বিহার বা ওড়িশা বা পশ্চিমবঙ্গ বা দক্ষিণ ভারতে ততটা হবে না।

দ্বিতীয় একটা বড় প্রশ্ন তা হল উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মফঃস্বল অঞ্চলে জনসংঘের সংগঠন এখনও কতটা মজবুত আছে। দলগত বিচারে এই দুই রাজ্যে কংগ্রেসের পরই শক্তিশালী হল জনসংঘ। এই দুই রাজ্যেই এই দলের বহু কর্মী জেলে আটক হয়েছিলেন। এরা কতজন জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন এবং এসেও বা কতজন সক্রিয়ভাবে আবার রাজনীতিতে যোগ দিলেন তাও দেখার। জরুরী অবস্থায় জনসংঘের বহু সমর্থক দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে দলের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। নির্বাচনের সময় এরা কি আবার ফিরে আসতে ভরসা পাচ্ছেন?

এবারের নির্বাচনের ফলাফল এইসবের উপর অনেকটা নির্ভর করবে। এবারের নির্বাচনের সঙ্গে আগের সব নির্বাচনের বিস্তর ফারাক। কারণ, এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সব রাজনৈতিক পণ্ডিতই স্বীকার করছেন, এবারের নির্বাচনটা কংগ্রেসের পক্ষে, শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে মোটেই সহজ হবে না।

১৫-২-৭৭।

নবারুণ গুপ্ত

স্বরূপ কামত

প্রায় চল্লিশ বছর পরে নতুন করে গণতন্ত্রে দীক্ষা নিতে চলেছে স্পেন। মাদ্রিদ ছিল ফ্যাসিবাদের শেষ ঘাঁটি। ফ্রাঙ্কো মারা যেতে না যেতেই সে ঘাঁটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তার জায়গায় নতুন গণতন্ত্রের ইমারত তোলার ব্যবস্থা সব পাকা। নতুন সংবিধান তৈরি হয়ে গেছে। গণভোটের গঙ্গাজলে তাকে শুদ্ধ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সুয়ারেজ আর তাঁর দোস্তরা। শীত গেলে বসন্ত এলেই নির্বাচন হবে স্পেনে। তার তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। স্পেনের লোকেদের কাছে ব্যাপারটা নতুন। নির্বাচনের কথা তারা বইয়েই পড়েছে—তাও লুকিয়ে চুরিয়ে—কখনও তা ফ্রাঙ্কোর আমলে দেখেনি। অবাধ নির্বাচন যাতে সাবালক মাত্রেই ভোট দিতে পারে ফ্যাসিবাদী সরকার তা তো আর কখনও স্পেনে হতে দেননি। কাজেই সে যে কী বস্তু তা কমবয়সী স্প্যানিয়ার্ডরা জানবে কী করে? তিনের দশকের গৃহযুদ্ধের পর এই তো তাদের দেশে প্রথম নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

সে নির্বাচনের পালা ভালোয় ভালোয় চুকে যায় তা কিন্তু স্পেনে এক দল লোক চাইছে না। এক দল না বলে দু দল বলাই বোধ হয় ঠিক। নির্বাচন চায় না একদিকে অতি দক্ষিণ আর একদিকে অতি বাম। তারা উঠে-পড়ে লেগেছে নির্বাচন বানচাল করতে। তার জন্যে তারা বেছে নিয়েছে খুনেখারাপির পথ, চাইছে দেশটা এলোমেলো করে দিতে যাতে তারা লুটেপুটে খেতে পারে। দু দল অবিশ্যি সলাপরামর্শ করে কাজ করছে না, কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ করলেও পথ তাদের একই, উদ্দেশ্যও। মরিয়া হয়ে তারা লেগে পড়েছে স্পেনে এমন চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে যাতে নির্বাচন ভেস্তে যায়, গণতন্ত্রের চারাগাছটি মুড়িয়ে খায় রক্তচোষা বাদুড়ের দল। দক্ষিণীরা হানা দিচ্ছে বামপন্থীদের আড্ডায়, বামপন্থীরা দক্ষিণীদের। দু দলই বাগ পেলে খুন করছে নিরীহ মানুষদের, খতম করছে পুলিসকে। সরকারী আমলাদেরও তাদের হাতে রেহাই নেই। ফৌজিকে তাতাবার চেষ্টাও তারা সমানে করে যাচ্ছে যাতে তারা ক্ষেপে উঠে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় অস্থায়ী সরকারের কাছ থেকে।

কত লোক যে হালে স্পেনে সন্ত্রাস-বাদীদের শিকার হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। কালো পোশাক পরে বন্দুকধারী খুনের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে স্পেনের রাজধানীর পথে পথে, সুবিধে পেলেই হামলা করছে বামপন্থী ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীদের ওপর। খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষরাও বাদ যাচ্ছে না। ফ্যাসিবাদের নিবন্ত ধুনি তারা আবার চাঙ্গা করার জন্য চেষ্টার কসুর করছে না। ফ্যাসিস্ট কায়দায় মিছিল বেরুচ্ছে শহর থেকে দূরে গাঁয়ে, নাৎসি নেতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা হচ্ছে গির্জেয় গির্জেয়, চুটিয়ে গাল দেওয়া হচ্ছে সোস্যালিস্ট কম্যুনিস্টদের খালি নয়, গণতন্ত্রীদেরও। সুয়ারেজের ওপর তাদের বেজায় রাগ তিনি ফ্যাসিবাদকে বিদেয় দিয়ে গণতন্ত্রকে ডেকে আনছেন বলে। এখনও পর্যন্ত অবিশ্যি স্পেনে কম্যুনিস্ট দল বেআইনী বলেই গণ্য—সুয়ারেজ আর যাই হোন কম্যুনিস্টদরদী নন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের ভয় নির্বাচনের পর বাঁধ ভেঙে যাবে আর ফাটল দিয়ে কম্যুনিজমের বেনোজল ঢুকবে স্পেনে। তা তারা বরদাস্ত করতে নারাজ।

কম্যুনিস্টদের ওপর অতি বামদেরও কোনও টান নেই। তাদের কাছে এরা হচ্ছে মেকী বামপন্থী শোধনবাদী মস্কোভজার দল। স্পেনের কম্যুনিস্ট দল হালের স্বাধীন কম্যুনিস্টদের জোটে ভিড়েছে। তারা মস্কো ভজা নয় যদিও তারা রুশীদের অখাতির করে না। পশ্চিম ইউরোপের বেশীর ভাগ কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে পা মিলিয়ে তারা চলতে চায় স্বাধীনভাবে। মস্কোকে তারা মক্কা-কাশী-রোম-জেরুজালেম বলে গণ্য করে না। তারা এখন পা ফেলছে খুব সন্তর্পণে। তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে খেটেখাওয়া মানুষদের এককাট্টা করা। তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে না নিলেও তারা চায় আইনমাফিক নির্বাচন হোক। তাদের আশা তা হলেই তাদের পায়ের শেকল খুলে যাবে। তাদের হিসেবে খুব একটা ভুল আছে বলে মনে হচ্ছে না। সুয়ারেজ সরকারের সুরও একটু নরম হয়েছে। তাঁরা গায়ে পড়ে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছেন না, নির্বিচারে তাদের ধরে গারদেও পুরছেন না। মোটের ওপর তাঁদের কাছে খানিকটা প্রশ্রয়ই পাচ্ছে স্পেনের বেআইনী কম্যুনিস্ট দল। নির্বাচনের আগে সে দল জাতে উঠলেও উঠতে পারে।

অতি বামরা কিন্তু সরকারের ওপর খড়্গহস্ত। তারা বলছে নতুন সংবিধান একটা বিরাট ধাপ্পা, নির্বাচনটা একদম ভুয়ো। তারা লোক খুন করছে বেপরোয়া, গায়েব করছে যাকে খুশী। তারা নিজেদের জানের পরোয়া করে না, অন্যের জানের দাম তাদের কাছে কানাকড়িও নয়। তারাও উস্কানি দিচ্ছে ফৌজদের যাতে তারা স্পেনে জঙ্গী শাসন চালু করে। তা হলে তাদের মাথায় করে নিশ্চয়ই ফৌজীরা রাখবে না, তা তারা বিলক্ষণ জানে। তবু তারা ভাবছে ফৌজী বাঁধন যত শক্ত হবে ততই তাদের বাঁধন টুটবে। পুরোনো সমাজ ভেঙেচুরে নতুন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। অতি বাম যে খোয়াব দেখছে তাতে ভুল নেই। তারা যা করছে তাতে সমাজে বিপ্লব তো আসবেই না, নতুন সমাজ গড়া আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। কম্যুনিস্টরা তাদের দু চোখের বালাই, কম্যুনিস্টদের জব্দ করার জন্যে তারা নরকে যেতেও রাজী, ফ্যাসিবাদীদের দলে ভিড়ে যাওয়া তো সামান্য কথা।

রক্তগঙ্গা কোনো কোনো পাড়ায় কী এলাকায় বয়ে গেলেও সুয়ারেজ যাবড়াননি, তিনি নির্বাচন ঠিক সময়ে করার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। মারামারি কাটাকাটি মানুষ গুম-করা তাঁকে অবিশ্যি ভাবিয়ে তুলেছে। তাই তিনি এক মাসের জন্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে পুলিসের হাতে জরুরি ক্ষমতা দিয়েছেন। সন্দেহ হলে পুলিস এখন যে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করতে পারে, খানাতল্লাসি করতে পারে যে কোনও জায়গায় বা বাড়িতে। মুশকিল হচ্ছে সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে। ফ্রাঙ্কোর আমলের পুলিসের কর্তাদের অনেকেরই গণতন্ত্রে অচলা ভক্তি নেই, লাল জুজুকে তারা একটু আমল দিতেও নারাজ। ফৌজী মোড়লরাও সবাই নয়া জমানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে মনেপ্রাণে চাইছে না। প্রধানমন্ত্রী সুয়ারেজের দুশমন ঘরেও, বাইরেও। তবে তাঁর বাহাদুরি আছে। এত চাপেও তিনি ভেঙে পড়েননি। ধরপাকড় তিনি জোর চালাচ্ছেন স্বৈরতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে নয়, গণতন্ত্রের ভিত স্পেনে মজবুত করতে। ফ্রাঙ্কোর চেলা যে গণতন্ত্রের জন্যে এতটা করবেন তা ভাবাই যায়নি।

দেবরাজ

এই বেশ আছি

সুধেন্দু মল্লিক

এ জীবন কারো না কারো না।
ভালোবাসবার জন্যে প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা
ছিন্ন মেঘ উড়ে যায়—
কি সুন্দর ব্যাপক শূন্যতা।
ভালোবাসবার জন্যে অন্ধকারে স্তব্ধ হলো কথা।

শুধু তোর স্পর্শ তোর জাগরণ উদাত্ত ভঙ্গিমা
অনুভব জ্ঞানে সেই আনন্দ মহিমা।
এই বেশ আছি আমি। নেই কোন ক্ষোভ।
নির্গন্ধ কুসুম দেখে শিশু তার যতখানি লোভ
নিয়ে ছোটাছুটি করে কাঁদে হাসে
তার চেয়ে বেশী কিছু নয়
ভোরের পুজোর ঘরে স্পন্দমান আগুনের বিস্ময়।
এই বেশ আছি আমি এই ভালো আছি
যে গোপাল পদ্মের পাতায় শান্ত সোনালী মৌমাছি।

সংশয়

শতদ্রু সাহা

আমি যতো কাছে যাই আসলে কি সেটা খুব দূরে চলে যাওয়া?
তবে কি মৌসুমী হাওয়া
নিস্তব্ধ পাহাড় থেকে, হরিৎ বনের থেকে চলে যাবে দূরে
পাড়াগাঁর ঝিমন্ত পুকুরে?

আমি যতো পুণ্য করি আসলে কি ততোটাই বেড়ে ওঠে পাপ?
তবে কি গোপন কোনো সাপ
কেয়ার বনের থেকে মাঝরাতে উঠে আসে দোতলার ঘরে?
যখন সকল পুণ্য পদ্ম হয়ে ফুটে থাকে বুকের ভিতরে!

অধ্যাপক

গণেশ বসু

নীরবে মননে নেমেছে মেঘের মেঘেদের জটিলতা,
স্বরলিপি কাঁপে ছায়ার ভিতরে রুদ্ধিত ছায়ায় গান।
ওদের আকাশে ভালোবাসা শুধু ভালোবাসা অভিমান
চেতনায় কাঁদি, ঘরে ফিরে কাঁদি কান্নায় নীরবতা।
কি আছে কী আছে অধ্যাপকের? মাসান্তে কালো রাত
ভাবনার মেঘ, মেঘের ভাবনা, দেয়ালের সাদা হাত।

শীত আসে এবং চলে যায়

তারাপদ রায়

তোমার সঙ্গে দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই, বহুকাল।
আরো বহুকাল তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে না
এবং এইসব প্রসঙ্গও পুরনো হয়ে গেছে বহুকাল।

দুই প্রান্তে দুইরকম সময়,
শুধু মাঝে মাঝে সেইরকম বৃষ্টি রাস্তায় ভেজা বকুল
শীতের নরম রোদে ও সামান্য কুয়াশায়,
সদ্য চোখ-ফোটা কুকুরছানাদের আদিঅন্তহীন খেলাধুলো
এখন মাসখানেক চমৎকার চলবে
ভেন্টিলেটরের বাসায় ডিম পাড়বে চড়ুই,
মানুষের বাচ্চা ছোট স্কুল থেকে বড় স্কুলে, একদিন কলেজে যাবে

শীতের নরম রোদে ও সামান্য কুয়াশায়
মাছ ও তেল কিছু মহার্ঘ তরকারির দাম একটু সবুজ,
টাটকা [illegible] রঙীন কাঁচের জানলা দিয়ে
চমৎকার দেখাচ্ছে আমাদের পুরনো শহর।
সব ঠিকঠাক, শুধু ফাঁকে ফাঁকে
আমাদের ছায়া ও ব্যবধান, ক্রমাগত দিন ও বৎসর
আমাদের যৌবন ও আয়ু, শীত আসে এবং চলে যায়।
হঠাৎ দেখা হওয়ার মত আশ্চর্য ঘটনা,
এখন আর তার কোনো সম্ভাবনা নেই।
শীতের নরম রোদে ও কুয়াশায়, স্পষ্ট টের পাই
তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না॥

মেশিন

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা। পৃথিবীতে
মেশিন ভাই-বোন, মেশিন স্বামী-স্ত্রী ও মেশিন মা-বাপ
ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ। ওই,
একটা জাহাজ ভেসে উঠলো আবার সমুদ্রে, ওতে আসছে
নতুন আর এক ঝাঁক মেশিন; তুমি চেয়েছিলে কোলের ওপর
ছোট্ট এক হাতের হাত নাড়া, যা আমি এতদিন কিছুতেই
দিতে পারিনি তোমাকে, আজ ওই নতুন মেশিন থেকে এসে, সে
তোমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কি তোমার কান্নাও
আমি দেখতে পাই না আর, শুধু শব্দ হয় ঠকঠক, চোখ থেকে
হাতের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ে। শুধু শব্দ হয় ঠকাস ঠকাস, আর
একা এক রোবোট হেঁটে যায় আমাদের চারদিকে। ওই,—
সে টিপে দিচ্ছে
সুইচ, এক্ষুনি আমরা আবার হাত-পা নাড়বো, ঘুষি পাকাবো,
কাজ [illegible] কাজ তারপর যখন ফুটবে মেশিনের ফুল তুমি তুলে
তৈরী হয়ে নিও, আমরা ঘুরে আসবো মেশিন-বউদির বাড়ি।

নিজেকে দেখা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেবার শীতে কলকাতায় সংঘর্ষ। আগুন, চিৎকার, কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজ, ত্রাস। গাঁয়ে পালিয়ে গেলাম। পরদিন বিকেলে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার টের পেলাম। ওখানে মাঠগুলো খুব বড়। নির্জন আর কিছুটা ঢেউ-খেলানো। অনেক দূরে দিগন্ত একটা ধূসর রেখার মতো লাগে। টিটিভের ডিমের মতো নীল ধূসর আকাশ। ফসল উঠে গেছে ক্ষেতের। মরা শামুক আর কাঁকড়ার সাদা বা সোনালী খোলের পাশে ঘাসফুল ফুটেছে। কেটে নেওয়া ধানের নলে আগের রাতের শিশির দিনভর রোদ্দুরেও শুকোয়নি। তাই হাঁটলেই দুই পা দুঃখিত চোখের মতো হাঁটু-অবধি অশ্রুপাতে ভিজেছে মনে হয়। কচিৎ ফরফর করে উড়ে যায় বনচড়ুইয়ের ঝাঁক। ঢ্যামনা সাপ আর ইঁদুরগুচ্ছের মালা পরে একা ঘরে ফেরে উৎফুল্ল কোন সাঁওতাল কিশোর। এবং এসবের মধ্যেই সাংঘাতিকভাবে টের পেয়ে গেলাম আমি কি স্বাধীন! এখানে কি বিশাল স্বাধীনতা! কারণ, এখানে দাঙ্গা নেই। পুলিস ও সেনাবাহিনী নেই। সরকার ও রাষ্ট্র নেই। খাজনা আদায়কারী নেই। এখন এখানে আমি যা খুশি করতে পারি। কেউ বাধা দেবার নেই। কি আশ্চর্য! শালীনতা-অশ্লীলতা-পাপপুণ্য-মন্দির-মসজিদ-বিরহিত এই গোপন নির্জন ভূখণ্ডেই তো আছে আত্মার যথার্থ স্বাধীনতা! প্রাকৃতিক এবং স্বর্গীয় স্বাধীনতা তো এই-ই!

সেই প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে সুযোগ পেলেই নিজেকে স্বাধীন দেখার জন্যে আমি ওখানে যাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা প্রতীকী ভাবা যেতে পারে। ওই গোপন নির্জন প্রাকৃতিক ভূখণ্ড স্বাধীনতাবিলাসী যে-কোন মানুষের মনেও গড়ে নেওয়া সম্ভব। এবং এক দিক থেকে কি আকবর বাদশা, কি হরিপদ কেরানী সবারই ওই ধরনের একটা বিচরণভূমি আছে, যেখানে সে মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম মানুষ। স্বেচ্ছাচারী সম্রাট হতে তার বাধা নেই সেখানে। অন্তত এখন অবধি নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র যেভাবে অযুত শিকড় চালিয়ে ব্যক্তির আত্মা অবধি বিদ্ধ করার জন্যে এগোচ্ছে, ভবিষ্যতে আর ওটুকু স্বাধীনতাও থাকবে না—তা বোঝা যায়। আমার তো মনে হয়, একদা আমাদের কল্পনাবৃত্তিও নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। কি কল্পনা করব—পক্ষীরাজ না পরী, নাকি জ্যোতির্ময় মুকুট পরা রাষ্ট্রপ্রধান মহাশয়কে—তাও ঠিক করে দেবে সে। অতএব ব্যক্তির মুক্তি নামে সব রকম পুরনো ও নতুন রেনেশাঁর স্লোগান অরণ্যে রোদনমাত্র।

মুশকিলের কথা, লেখকরা বড্ড অনুভূতিপ্রবণ। শিল্পী মাত্রেই তাই। নিটশের অনেক বাক্য বোকামি মনে হোক, অন্তত এই বাক্যটি দুর্ধর্ষ : 'শিল্পীরা বাস্তবতা সইতে পারে না।' মানুষ হিসেবে অর্থাৎ সমাজের একজন হিসেবে অনেকানেক স্বাধীনতা-হীনতার মধ্যে আমাদের অস্তিত্বরক্ষা করতে হয়। এটা একটা মারাত্মক বাস্তবতা। অতএব শিল্পীর পক্ষে তা স্বভাবত অসহনীয়। একটা আলাদা জগত তাকে তৈরি করে নিতেই হয়—যেখানে সে স্বাধীন এবং ঈশ্বরের তুল্যমূল্য। (ঈশ্বর ছাড়া প্রকৃত স্বাধীন আর কে হতে পারে?) যে বাস্তব স্বাধীনতাহীন জগতে তার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা, তার প্রতীক কি না সমাজ এবং সমাজের আধারের নাম রাষ্ট্র। তাই প্রকৃত শিল্পীর কাছে রাষ্ট্র চক্ষুশূল হতে বাধ্য। সে প্রকারান্তরে নৈরাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। এটাই তার নিয়তি।

*

এ প্রসঙ্গে টলস্টয়কে মনে পড়ে যায়। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর উচ্চণ্ড ঘৃণা 'ফোর্স' অর্থাৎ শক্তি ব্যাপারটাকেই ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল—যা সব সময়ই কিনা হিংস্র। 'পাপকে শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করো না'। স্তেফান জাইগের মতে, টলস্টয়ের সমগ্র নীতিতত্ত্ব এই বাক্যটিতে নিহিত। এবং বোঝা যায়, এই তত্ত্ব টলস্টয়কে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতার কারণ-ভাষ্য এই বক্তব্য : 'সম্পত্তিই সব পাপ ও দুর্ভোগের মূলে। যাদের খুব বেশি সম্পত্তি আছে এবং যাদের তা কিছুই নেই, তাদের পরস্পরের মধ্যে তাই সংঘর্ষের বিপদ রয়েছে।' সম্পত্তি রাখতে হলে বা বাড়াতে হলে শক্তি দরকার। তাই সম্পত্তি রক্ষার সহায়ক হিসেবে রাষ্ট্র সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ ইত্যাদি সুসংগঠিত উপায়ে নিজের শক্তি মজুত রেখে তাকে টিকিয়ে রাখে। রাষ্ট্রের গোটা ব্যাপারটাই শুধুমাত্র সম্পত্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। তাই যে রাষ্ট্রের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দেয়, তার সব পুজোআচ্চা আসলে শক্তির কাছেই পৌঁছয়। আধুনিক রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের আপাত-প্রতীয়মান স্বাধীনতার খাতিরে রাষ্ট্রশক্তি জিইয়ে রাখার কাজে উৎসর্গিতপ্রাণ।

ট্রটস্কি লেনিন প্রমুখ মার্কসবাদীদের টলস্টয়প্রীতির কারণ বোঝা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাপ—এই মার্কসীয় নীতিতত্ত্বের অবিকল প্রতিধ্বনি টলস্টয়ে। কিন্তু টলস্টয় মূলত ছিলেন প্রাকৃতিক স্বাধীনতার গোঁড়া ভক্ত। তাঁর নৈরাজ্যবাদী কথাবার্তা ভুললে চলবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে তিনি বলতেন 'অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর।' জীবনকে বলতেন 'পাপ'। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে বলতেন 'বিলাসিতার চূড়ান্ত'! সঙ্গীতকে বলতেন 'শয়তানের ভেঁপুবাঁশি'। বিঠোফেন সেক্সপীয়র নিটশে পুশকিন সম্পর্কে তাঁর মতামত মোটেও শালীন নয়। শিল্প তাঁর কাছে 'আলসেদের বিলাসব্যসন'।

আনা কারেনিনা ও ওয়ার অ্যান্ড পিসের বিরাট লেখক সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা নিশ্চয় কঠিন। তাঁর দ্বৈত-বোধ (ডুয়ালিজম) বড্ড গোলমেলে। তাঁর যৌবনের লাম্পট্য আর প্রৌঢ়ত্বের বিবাহিত আইনসম্মত যৌনজীবন—যার ফল সর্বসাকুল্যে তেরটি সন্তান, অনেক বিশৃঙ্খলার প্রতীক। তাঁর স্ত্রী বলতেন, 'ওকে বোঝায় সাধ্য কার? নিজে যা বোঝে, তাই যথেষ্ট। ভুল হলেও স্বীকার করতে রাজী নয়।' এতে তাঁর একগুঁয়েমিও বোঝা যায়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও একটা জায়গায় টলস্টয় খুব স্পষ্ট। তাঁর রাষ্ট্রবিরোধিতায়—নৈরাজ্যবাদী ধারণায়। এখানে তিনি ঘোর প্রকৃতিবাদী। 'পাপকে বাধা দিও না।' কারণ, বস্তুত প্রকৃতিতে পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। খ্রীস্টতত্ত্বে টলস্টয় যতই নিজের বিশ্বাস প্রচার করুন, তিনি মূলত প্রকৃতিবাদী—তাই বিশুদ্ধ স্বাধীনতার জন্যে অত আঁকুপাঁকু করেছেন।

*

টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম জড়ানোর কারণ অহিংসা। টলস্টয় যাকে শক্তি বলতেন, তা আসলে হিংসা। গান্ধীজী কি কোনরকম প্রাকৃতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন? অর্থাৎ এই ধরনের নৈরাজ্যবাদে? গান্ধীজী কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর রামরাজ্য বস্তুত প্রকৃতিরাজ্যেরই সমতুল। তবে প্রকৃতিতে নির্বিবেক রক্তপাত অর্থাৎ হিংসা আছে, রামরাজ্যে নেই—এই যা তফাত। গান্ধীজীর ইউটোপিয়াও যথার্থ স্বাধীন

ব্যক্তির বাসভূমি। সেদিক থেকে গান্ধীজীরও প্রকৃত শিল্পীর প্রজ্ঞা ছিল।

এবং এটাই বিস্ময়কর যে, সব বিরাট মানুষই আদতে একজন করে শিল্পী। তাঁদের কাজের ধারা পৃথক, অর্থাৎ তুলি-কলম ইত্যাদির রূপে অন্যরকম। ভাবুক রাষ্ট্রনেতা জওহরলালের একই ধরনের ভাবনা ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষে ওই এক মুশকিল। তাঁদের ঘর বাঁধা আছে বৈরীর মাটিতে। হতভাগ্য ফ্রাংকেনস্টাইনের দল!

শিল্পী বা লেখকদের সেদিক থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি। কিন্তু কে কতটা সচেতন, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আজ চারপাশে লেখক-শিল্পীর ভিড়ে যত ভজনপূজনকারী সেবক দেখি, দেখি না তত কালাপাহাড়। অথচ প্রকৃত শিল্পী তো কালাপাহাড়ই। এই কালাপাহাড়ী গর্জন গভীর অবচেতনা থেকে কি আমরা শুনিনি রবীন্দ্রনাথেও?

হ্যাঁ—রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতা নিয়ে বলা বাড়াবাড়ি। তাঁর ছবি আর নাটকে তো সেই দিব্য স্বাধীনতার আকুল ক্রন্দন কম নেই! 'ডাকঘর' থেকে ধরলে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' অবধি নানা সুরে নানা পর্দায় একই আর্ত আহ্বান, বলাকার পাখার শব্দে 'হেথা নয় অন্য কোনখানে', যেখানে অপার স্বাধীনতা—যা প্রাকৃতিক, যা 'মুক্তি' শব্দে প্রতীকায়িত। বৈষ্ণবতত্ত্বেও সংসারক্লিষ্টা রাধা মানবাত্মার করুণ আর্তিতে বলে ওঠে, ওই কোথায় বাঁশি বাজে! প্রকৃতিতে বাঁশি বেজে চলেছে নিরন্তর। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। ওই বাঁশিতেই স্বাধীনতা বাজে।

এবং সেখানে ক্লীব আয়ানেরা নেই। কুঁদুলী ননদিনীরা নেই। রাজাপ্রজা নেই। খাজনা আদায়কারী নেই। পুলিস ও সেনা-বাহিনী নেই। আদালত নেই। রাষ্ট্র নেই। বাংলার আউলবাউল চোখে ঠার দিয়ে কবে ডেকেছিল, আমরা তো ভুলেই গেছি। দেখেও চিনতে পারিনে এই ন্যালাক্ষ্যাপা অশিক্ষিত গেঁয়ো ডুবকি-একতারাওয়ালা গাঁজাখোর লোকগুলো সেই আদিম প্রাকৃতিক স্বাধীনতার পথেই বেরিয়ে পড়েছে কতকাল আগে।

॥ ৩৮ ॥
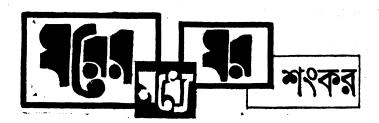
অফিস ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠানে ছাপা প্রোগ্রামে মিস্টার অর্জুন চৌধুরীর ছবিটা দেখেই মনে হলো লোকটি যেন আমার চেনা। এই প্রথম নিশ্চয়ই আমি অর্জুন চৌধুরীর ছবি দেখছি না।

বড়াই করবার মতো প্রখর স্মৃতিশক্তি আমার নেই। অনেক ঘটনা, অনেক মুখ আমার স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকে, আবার অনেকের কথা একেবারেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়, প্রয়োজনের সময় তাঁদের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে পারি না।

অর্জুন চৌধুরীর ছবিটার দিকে আমি আবার তাকালাম। মুখটা কিছুতেই অপরিচিত মনে হচ্ছে না। কিন্তু অর্জুন চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমি কোথায় দেখতে পারি? স্মৃতির গভীরে মনঃসংযোগের আলোক নিক্ষেপ করেও আমার সন্দেহ নিরসন হলো না। কিন্তু কীভাবে কোথায় আমাদের পরিচয়ের সূত্র থাকতে পারে তা সেই নাটকীয় অপরাহ্ণে স্মরণ করতে সক্ষম হলাম না।

সুলেখা ইতিমধ্যে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এই ঘরের বিভিন্ন কোণে অনেকগুলি মানুষ-সমান আয়না সযত্নে সাজানো রয়েছে। ডানলপিলো-মোড়া বেডের কাছে দাঁড়িয়ে সেই সব মুকুরে একই সঙ্গে সুলেখার নানা প্রতিফলন দেখতে লাগলাম। সোফা সেটের গণ্ডী পেরিয়ে সুলেখার শয্যাকক্ষের এই বৈচিত্র্যটি এর আগে কখনও এমনভাবে আমার নজরে পড়েনি।

আয়নার মধ্য দিয়ে মনে হলো, অনেক-গুলো সুলেখার দিকে একই সঙ্গে আমি তাকিয়ে আছি। প্রতিটি সুলেখা যেন আলাদা। এদের নানা অঙ্গে নানা রূপ।

রক্তমাংসের সুলেখা এবার কথা বলে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবছেন?"

"কিছুই না", আমি হেসে উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার প্রচেষ্টা তেমন সফল হলো না। এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন সব কিছু হেসে উড়িয়ে দিলেও হাল্কা হওয়া যায় না।

অন্য সময় হলে সুলেখা হয়তো আমার এই মানসিক অস্থিরতার উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু এখন সে প্রাণপণে সময়ের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করছে—কোনো দিকে বিশেষ নজর দেবার মতো সময় তার নেই।

সুলেখা বললো, 'এই প্যাকেটে বাবার জন্যে একটা গেঞ্জি, একটা পাঞ্জাবি, আর একটা ধুতি আছে।"

জেল থেকে বেরোবার সময়ে কয়েদীর পোশাক কেড়ে নিয়ে সদাশয় সরকার কোনো বেসরকারী জামাকাপড় দেন কিনা আমার জানা নেই। সুলেখা বললো, "আপনার হয়তো অসুবিধে হবে, শংকর-বাবু। কিন্তু এই প্যাকেটটা সঙ্গে রাখুন। পরে আসবার মতো পরিষ্কার জামাকাপড় বাবার সঙ্গে থাকবে বলে মনে হয় না আমার।"

নিউ মার্কেটের বিখ্যাত দোকানের নাম-ছাপানো ঠোঙায় মোড়া ধুতি-পাঞ্জাবির দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সুলেখা এবার কিছু কথা বলতে চায়।

কথাটা যে অস্বস্তিকর তা ওর মুখ দেখেই আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু সুলেখা বোধ হয় মনে মনে রিহার্সাল দিচ্ছে। মূল বক্তব্য সম্বন্ধে এখনও কিছুটা সন্দেহ থাকায় সে অন্য কাজের কথা তুললো।

ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সুলেখা বললো, "আপনি ট্যাক্সি করেই চলে যান। বাসের ভরসায় থাকলে দেরি হয়ে যেতে পারে।"

নিজের হাতব্যাগ থেকে কয়েকখানা নোট বার করতে করতে সুলেখা বললো,

"ফেরবার সময়ও ট্যাক্সিতে চলে আসবেন। ট্রাম-বাসের ভিড়ে বাবা অভ্যস্ত নন—ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসে।"

গাড়িভাড়ার টাকাটা নিজের হাতে নিতে সংকোচ হচ্ছিল। অবস্থা যতই খারাপ হোক, কতকগুলো ব্যাপারে পারিবারিক ঐতিহ্যের ছায়া এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। সামান্য কাজে বন্ধুর কাছে বন্ধু রাহাখরচ নেয় না। কিন্তু সুলেখা জোর করে আমার বুকে পকেটে টাকা গুঁজতে গুঁজতে বললো, "আমার এই ব্যাগে অনেক টাকা আছে, শংকরবাবু। ট্যাক্সি ভাড়া ছাড়াও আপনার টাকা দরকার হবে। বাবার জুতোর অবস্থা কেমন জানি না। কাছাকাছি কোনো দোকান থেকে এক জোড়া জুতো অথবা চটিও কিনতে হতে পারে।"

সুলেখা হঠাৎ একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। হাসবার চেষ্টা করছে সে। কান্না ঢাকবার এক অদ্ভুত হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে বললো, "এখন আমার ব্যাগে যত টাকা আছে, সেদিন তার অর্ধেক থাকলেও বাবাকে জেলে যেতে হতো না। মাত্র পাঁচশ টাকার হিসেব মেলাতে পারলেন না, বাবা। তাই টেমপোরারি ডিফলকেশনের মামলা শুরু হয়ে গেল।"

সুলেখার মুখের দিকে আমি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। সুলেখা ওই-ভাবে হাসতে হাসতেই বললো, "বাবার ইচ্ছে ছিল আমার খুব ভাল বিয়ে দেবেন। বিয়ের চেষ্টা না করলে বাবাকে কিষাণপুর পোস্টাপিসের টাকা ভাঙাতে হতো না।"

সুলেখা ওই হাসি অব্যাহত রেখেই বললো, "যার যা কপালে আছে তাই তো হবে? আমার কপালে এই থ্যাকারে ম্যানসনের চৌত্রিশ নম্বর ঘর লেখা আছে, বাবা তা খণ্ডাবার চেষ্টা করলে কী হবে? চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই জেলে গেলেন।"

এবার হাসি বন্ধ হয়ে আসছে সুলেখার। সে বললো, "বাবাকে আমার সম্বন্ধে কী বলবেন আপনি? মনে রাখবেন, আমার নাম সীমা—সুলেখা নয়।"

সীমা এবার হাঁপাচ্ছে। "দোহাই, শংকরবাবু, বাবা যেন সুলেখার কাজকর্মের কিছুই খবর না পান। জেলে যাওয়ার থেকেও বেশী কষ্ট পাবেন যদি জানতে পারেন সীমা এখন কোথায় নেমে এসেছে।"

প্রথমে আমার একটু গুলিয়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে অনর্গল মিথ্যা ভাষণে অনভ্যস্ত আমি—সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে সুলেখার বিপদ ডেকে আনবো না তো?

সুলেখা আমার অবস্থা বুঝছে। গোলমেলে পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে সে বললো, "শুধু মনে রাখবেন সীমা এবং

সুলেখা দু'জন আলাদা মানুষ। তাহলেই আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। সুলেখাকে বাবা চেনেন না—তার সঙ্গে বাবার কোনো সম্পর্ক নেই। আর সীমা খুব কষ্টে কলকাতা শহরে বেঁচে আছে, সে অপেক্ষা করছে কবে বাবা জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।"

বৃহস্পতিবারের সেই অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। কলকাতার এক অখ্যাত ফ্ল্যাট বাড়ির কনিষ্ঠতম কর্মচারির জীবনেও যে এমন নাটকীয় মুহূর্ত আসতে পারে তা কে কোথায় কবে কল্পনা করেছেন? সীমা ও সুলেখার আলোছায়ায় এমনভাবে যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবো তাও কোনোদিন ভাবিনি

সীমা ও সুলেখা, তোমাদের দু'জনের কাছেই আমি গভীর কৃতজ্ঞ, তোমরা আমার চোখ খুলে দিয়েছো। সংসারের এক বিচিত্র সত্যকে তোমরা আমার সামনে মেলে ধরেছো। তোমাদের না-দেখলে সংসারতীর্থে আমার সুদীর্ঘ পরিক্রমা অপূর্ণ থেকে যেতো।

অবিশ্বাস্য সময়ের মধ্যে প্রাক্তন পোস্ট-মাস্টার বীরেন চ্যাটার্জিকে জেলের দরজা থেকে উদ্ধার করে থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এসেছি।

বীরেন চ্যাটার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারটাই এক নাটক। এমন নাটকে এর আগে আমি কখনও অংশ গ্রহণ করিনি।

জেল থেকে বেরিয়েই কারাভারে শীর্ণ ও ঈষৎ কুব্জ বীরেন চ্যাটার্জি তাঁর হাই-পাওয়ারের চশমার মধ্য দিয়ে নিজের মেয়ে সীমার খোঁজ করছিলেন। কষ্টকর ছি কোথাও কোনো মেয়েকে না-দেখে বীরেন চ্যাটার্জি যখন অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন, তখন আমিই এগিয়ে এসে নমস্কার করলাম।

"সীমা? সীমা কোথায়?" বীরেন চ্যাটার্জি বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করলেন। এই মুহূর্তে তিনি আর কারও সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নন।

বললাম, "সীমা আসতে পারেনি। হঠাৎ তার কাজ পড়ে গিয়েছে।"

"কীসের কাজ?" বীরেন চাটুজ্যে বেশ অধৈর্য হয়ে উঠলেন। যত কাজই থাক, বাবার মুক্তি দিনে সীমা কাজে জড়িয়ে থাকবে তা বীরেনবাবু এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন না।

বললাম, "আপনার খবরটা আসতে দেরি হয়েছে। টেলিগ্রামটা ঠিক সময় পৌঁছয়নি।"

নিজের পুরনো আপিসের কথা বোধ হয় বীরেন চাটুজ্যের মনে পড়লো। "আর্জেন্ট টেলিগ্রামও এখানকার পিওনরা ঠিক সময় ডেলিভারি দেয় না? আমাদের পোস্টাপিসে তো কখনও এমন হতো না।"

"সীমা কি এখনও খবর পায়নি?" বীরেন চ্যাটার্জি এবার আরও অস্থির হয়ে উঠলেন।

ওঁকে আশ্বাস দিলাম, "চিন্তার কিছু নেই, সীমা খবর পেয়েছে। খবর না পেলে এইসব জামাকাপড় আমাকে কে দিল?"

আমাকে খুব সহজভাবে নিতে পারছেন না বীরেন চ্যাটার্জি। তাঁর আদরের মেয়ে সীমার সঙ্গে আমার মতো একজন অচেনা লোকের কী যোগাযোগ থাকতে পারে তাও তিনি ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

কী উত্তর দিই এখন? একবার ভাবলাম বলি, "আমি সীমার বন্ধু।" কিন্তু বন্ধু কথাটা এই বৃদ্ধের মনে আরও কীসব সন্দেহের সৃষ্টি করবে তা ঈশ্বর জানেন।

হঠাৎ মুখ দিয়ে উত্তর বেরিয়ে এল। বললাম, "আমার বোনের বন্ধু সীমা।"

এরপরেই যে আমার বোনের নাম জানতে চাওয়া হবে তার জন্যে প্রস্তুত

ছিলাম না। প্রশ্নের চাপে হঠাৎ বলে ফেললাম, "সুলেখা। ওর সঙ্গে খুব ভাব সীমার।"

খুব সুখী হলেন বীরেন চ্যাটার্জি। "সীমা ও সুলেখা—ভারি চমৎকার মিল হয়েছে তো। সীমা তাহলে খুব একলা নেই। আমার শুধু দুশ্চিন্তা হতো সীমা নিশ্চয় খুব নিঃসঙ্গ। এতো বড় এই শহরে বাবার অপরাধে সে একলা জ্বলে পুড়ে মরছে—তাকে দেখবার কেউ নেই।"

"সুলেখা ওকে যতখানি সম্ভব দেখেছে", আমি কোনোরকমে উত্তর দিলাম।

এরপর কথাবার্তা চালাতে গেলে হয়তো ঠিকমতো বানাতে পারবো না—হঠাৎ কী বেফাঁস বলে ফেলবো, এই ভয়। তাই এবার জামাকাপড়ের কথা তুললাম। "আপনি কি জামাকাপড় পাল্টাতে চান?"

নিজের জামা কাপড়ের দিকে তাকালেন বীরেন চাটুজ্যে। কয়েকদিন না-কামানো মুখের দাড়িতেও হাত বুলোলেন তিনি। তারপর বললেন, "সীমা কী পাঠিয়েছে? দেখি।"

জেলের গেটের কাছেই প্যাকেটটা খুলে ফেললেন বীরেন চ্যাটার্জি। এবং ওইখানেই বেশ পরিবর্তন করলেন।

ছাড়া জামাকাপড়গুলো প্যাকেটে পুরে নেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু বীরেন চ্যাটার্জি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "ওগুলো এখানেই পড়ে থাক। জেলের জামাকাপড় নিয়ে সীমার বাড়িতে ঢুকতে চাই না আমি। ওসব আমি সীমাকে আর মনে করিয়ে দিতে চাই না, শংকরবাবু।"

ট্যাক্সির খোঁজে হাঁটতে হাঁটতে দূরে একটা চুল কাটার সেলুন নজরে পড়লো। বললাম, "আমার কাছে টাকা আছে যদি দাড়ি কামিয়ে নিতে চান।"

"আপনার পয়সায় দাড়ি কামাবো? না ওটা ঠিক হবে না।"

"আমার পয়সা মোটেই নয়—আপনার মেয়েরই রোজগার-করা পয়সা, আপনি যেমন খুশি খরচ করতে পারেন।" আমি আশ্বস্ত করি সীমার বাবাকে।

"তা হলে চলুন। এই দাড়ি গোঁফ দেখে সীমা বেচারা ভয় পাবে, কষ্ট পাবে। সীমা জানে, এই দাড়ি কামানোর ব্যাপারে আমি খুব পার্টিকুলার ছিলাম। সকাল সাড়ে ছটার সময় দাড়ি না-কামালে আমার অস্বস্তি হতো—মনে হতো দাঁত মাজা হয়নি। দাঁত না মেজে খাওয়া আর দাড়ি না-কামিয়ে আপিসে যাওয়া আমার কাছে একই কথা ছিল।"

খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়াল থেকে সেলুনের আয়নায় অন্য এক বীরেন চ্যাটার্জি এবার প্রতিফলিত হলেন।

আমার হাত থেকে পয়সা নিয়ে সেলুনের মালিককে প্রাপ্য মিটিয়ে দিলেন বীরেন চ্যাটার্জি।

রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে হাঁটতে বীরেনবাবু বললেন, "সীমা আপনাকে কত পয়সা দিয়েছে?"

"কোনো চিন্তা নেই আপনার। যা প্রয়োজন সব মিটে যাবে" আমি আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করি তাঁকে।

সীমার বাবা হাসলেন। "প্রয়োজন আমার অনেক। মেয়ের বিয়েটা না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরেও শান্তি পাবো না। কথাগুলো নিষ্ঠুর রসিকতার মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু আমি এর কী উত্তর দেবো? আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আর কত অভিনয় করতে পারে?

বললাম, "একটু চা খেয়ে নিন।"

"সীমার ওখানে গিয়েই খাওয়া যাবে।"

বীরেনবাবুর কথা শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সীমার সঙ্গে কখন দেখা হবে তা আমি জানি না। সীমা নিজেও জানে না। তার মুক্তিটা নির্ভর করবে অর্জুন চৌধুরীর মর্জির ওপর।

জোর করেই সীমার বাবাকে একটা খাবারের দোকানে ঢুকিয়ে ফেললাম। "আসুন আসুন। সীমার ওখানে আরও একবার খেতে তো বারণ নেই। সীমা কখন আসবে তাও তো ঠিক নেই।"

শেষ কথাটা বোকার মতো বলে ফেলেছি। মুক্তির পর প্রথম চায়ের চুমুকটাও সীমার বাবা সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারলেন না। বললেন "সীমা কখন আসবে ঠিক নেই কেন?"

বিপদ এড়াবার জন্য মুখে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছি। "সীমাকে রোজগার করতে হয়, মিস্টার চ্যাটার্জি। গেরস্ত

পেশীপুঞ্জকে শক্তিমান্ করে তুলুন
প্রতিদিন মাত্র কয়েক মিনিটে!
সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত:
বুলওয়ার্কার-এর আইসোমেট্রিক-আইসোটনিক প্রণালী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লব এনেছে এবং যে মত/অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন, পেশাদারি অ্যাথলেট, কোচ, ট্রেনার ও স্পোর্টস ডাক্তার সকলেই দারুনভাবে সমর্থন করেন। রীডার'স ডাইজেস্ট'র ডার স্টার্ন লিখেছেন, "সব পত্রিকা, ও অসংখ্য মেডিক্যাল ও সায়েন্টিফিক জার্নাল সবাই দেখ, শরীরের মাসল গড়ে তুলতে এই আবিষ্কার সবচেয়ে দ্রুত পদ্ধতি—যা অন্য যে কোনও চিরাচরিত প্রণালীর চারগুণো তাড়াতাড়ি কাজ করে।"
গড়ে তুলুন চওড়া কাঁধ
গড়ে তুলুন প্রশস্ত বুক
এই সহজ উপায় অন্য যেকোন পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করুন:
যা আপনি সবসময়ে চেয়েছেন, সেই সুন্দর, পেশল দেহ গড়ে তোলার জন্যে আপনি একটা দারুন উপায় পেয়ে যাচ্ছেন···কোনও ভারোত্তলন নেই. কোন বারবেল তোলা নেই··· দীর্ঘ ও বিরক্তিকর অনুশীলন নেই; দিনে শুধু ৫ মিনিটের অনুশীলনে। এর গোপন কথা হ'ল বুলওয়ার্কার, একটি সম্পূর্ণ নতুন, মৌলিক আবিষ্কার যা'র উন্নতি করা হয়েছে অলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগীদের প্রশিক্ষনের জন্যে ও যা' আপনি আগে কখনও দেখেন নি। আর এই উপায় অন্য যে কোনও ব্যায়াম চর্চার উপায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে প্রমাণিত আইসোমেট্রিক প্রণালী:
বুলওয়ার্কার-এর মধ্যে আইসোমেট্রিক ও আইসোটনিক দুটি প্রণালীর'ই সমন্বয় আছে যাতে একটা হালকা, সহজে বহনীয়, কম খরচের প্রশিক্ষণ যন্ত্রে আপনার মাসল প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে, আর সময়ও আপনার দাড়ি কামাবার সময়ের চেয়ে কম লাগে।
বিনামূল্যে পরীক্ষা··· আমাদের খরচে:
আপনি কি এখনি আরম্ভ করতে চান, আপনার শরীরের সবকটা বা বিশেষ কোন মাসল গ্রুপ গড়ে তুলতে যা'তে আপনি চিরকাল যা কল্পনা করে এসেছেন সেইরকম প্রচণ্ড শক্তিশালী ও টগবগে জীবনী-শক্তি পেতে? এই কুপনটা আজই বিনামূল্যে ১৪-দিন হোম ট্রায়ালের জন্যে আমাদের কাছে পাঠান। আপনি যদি ১৪ দিনে সুনিশ্চিত ফল না পান তাহলে সবকিছু আমাদের ফেরত পাঠালে পুরো টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিয়ে দেবো। মনে রাখবেন বিনামূল্যে মেরামতও বদলের জন্যে আমরা ৫ বছরের গ্যারান্টী দিই।
এখন দাম, মাত্র ১৯৮ টাকা
© Mail Order Sales Pvt. Ltd., 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 400 004
MAIL ORDER SALES PVT. LTD. (Order Dept.) 15 Mathew Road, Bombay 400 004.
BWN-2-B
বিশেষ ডিস্কাউন্টে এখনই বুলওয়ার্কার পাঠান। যদি আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হই, তাহলে ১৪ দিন ট্রায়াল শেষ হবার আগেই আমি হয়তো সবকিছু ফেরত পাঠাবো যাতে বিনা প্রশ্নে আমি পুরো টাকা ফেরত পেতে পারি।
আপনি কিভাবে টাকা দেবেন ঠিক করে নিন ও সঠিক ঘরে ☑ টিক মার্ক করুন:
☐ ৬৪ টাকা (তাছাড়া ১৫ টাকা ডাকমাশুল ও পাঠানোর খরচ) এবং ৪০ টাকা করে আরও ৪টে মাসিক ইনস্টলমেন্ট।
☐ একটি জিনিস ক্যারিইং কেসের মধ্যে করে পাঠানোর জন্যে প্রথমে দিতে হবে ৭৯-টাকা (তাছাড়া ১৫ টাকা ডাকমাশুল ও পাঠানোর খরচ) এবং ৪০ টাকা করে আরও ৪টে মাসিক ইনস্টলমেন্ট।
একসঙ্গে সবটাকা পাঠালে ২৬ টাকা বাঁচাতে পারেন
DS-1
☐ ১৯৮ টাকা (তাছাড়া ১৫ টাকা ডাকমাশুল ও পাঠানোর খরচ)
☐ ২১৩ টাকা (তাছাড়া ১৫ টাকা ডাকমাশুল ও পাঠানোর খরচ) বুলওয়ার্কার ক্যারিইং কেসের মধ্যে করে পাঠানোর জন্যে
☐ টাকা পাঠাচ্ছেন চেক/ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার/মনি অর্ডার-এর সাহায্যে। নম্বর······তারিখ······ ☐ ভি.পি.পি.-তে পাঠান, আমি শপথ করছি যে টাকা লেখা থাকবে সেই টাকা পোস্টম্যানকে ডেলিভারি'র সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবো।
সই ······ নাম ······
ঠিকানা ······ ইংরাজীতে সব রকমের যোগাযোগ করুন
MAILORD

ঘরের লোকদের কলকাতা শহরে বাড়তি টাকা রোজগার করাটা খুব শক্ত। তার জন্যে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।"

সীমার বাবার মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। আপন মনেই বিড়বিড় করলেন, "আমার বাবা বলতেন মহাপাপ না করলে মেয়ের রোজগারে খেতে হয় না। মহাপাপ, কিন্তু আমি এ জন্মে কী এমন পাপ করেছি? মেয়ের বিয়ের জন্যে আটঘাট বাঁধতে গেলাম—কিন্তু মাত্র পাঁচশ টাকার জন্যে সব গোলমাল হয়ে গেল।"

ট্যাক্সিতে চড়ে বসেছি আমরা। বীরেন চাটুজ্যে এক মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে কী সব ভাবছেন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে কেমন আছে শংকরবাবু?"

জড় জড়িয়ে যাচ্ছিল। তবু উত্তর দিলাম "ভালই তো আছে। অনেক মেয়ে তো এর থেকেও কষ্টে থাকে।"

"আমার সম্বন্ধে সীমা কিছু বলে আপনাকে?" সীমার বাবা আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না।

"আপনাকে খুব ভালবাসে, সীমা। বাবা সম্বন্ধে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা।" আমি এখন বোধ হয় খুব মিথ্যে কথা বলছি না।

"ভালবাসতে পারে। বাপ তো। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা কেমন করে করবে!" এবার জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো সীমার বাবার চোখ দিয়ে।

"ভক্তি শ্রদ্ধার নিয়মকানুন তো কোর্টকাছারিতে ঠিক হয় না বীরেনবাবু" আমি ওঁকে অন্তর থেকেই সত্য কথা বলবার চেষ্টা করলাম।

"সীমা আপনার কথা বিশ্বাস করে?" আকুলভাবে জানতে চাইলেন বীরেন চাটুজ্যে। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে অসহায়ভাবে নিবেদন করলেন, "বিশ্বাস করুন আমি চোর নই। পাঁচশ টাকা আমি চুরি করিনি। মাত্র ক'দিনের জন্যে সরিয়ে রেখেছিলাম—দু'দিন পরে বন্ধুর কাছ থেকে ধার পাওয়া মাত্রই শোধ করে দিতাম। কিন্তু পাঁচটা চুরির অভিযোগে আমি দু'বছর জেল খেটে এলাম।"

"পাঁচটা চুরি?" আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

"কোনো টাকাই একদিনের বেশী রাখতে পারছি না। এর টাকা দিয়ে ওর খাতা শোধ করছি। পরের দিন আর একজনের টাকা দিয়ে আগের টাকা শোধ করছি। টেমপোরারি ডিফলকেশন পাঁচটা সেভিংস ব্যাংক পাশ বইতে। চুরি করবার ইচ্ছে থাকলে তো একটা খাতা থেকে টাকা সরিয়ে চুপচাপ বসে থাকতাম।"

এসব কথায় আমি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারছি না। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমাদের ট্যাক্সি দ্রুতবেগে থ্যাকারে ম্যানসনের কাছে এগিয়ে আসছে। সেখানে পৌঁছে সীমার বাবাকে নিয়ে কী করবো তা এখনও ঠিক করিনি।

অর্জুন চৌধুরী আমার বিপদ আরও বাড়ালেন। নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছু পরেই তিনি বোধ হয় থ্যাকারে ম্যানসনে সুলেখা সান্নিধ্যে আসছেন। আমাদের ট্যাক্সির সামনেই একটা সরকারী গাড়িকে থ্যাকারে ম্যানসনে প্রবেশ করতে দেখলাম। পিছনের সীটে অল্প বয়সী রাজপুরুষ সুগম্ভীর স্টাইলে শান্তভাবে বসে আছেন। যেন সোফার চালিত হয়ে কোনো জরুরী কনফারেন্সে চলেছেন তরুণ পদস্থ অফিসার।

গেটের গোড়াতেই সরকারী গাড়িকে বিদায় করলেন যিনি তিনিই যে অর্জুন চৌধুরী সে-সম্বন্ধে আমার প্রায় কোনো সন্দেহ নেই। সুলেখার হাতে যে ছবিটা দেখেছি তার সঙ্গে কোনো অমিল নেই রক্ত মাংসের এই নায়কের। বিশিষ্ট এই অতিথিকে কেন সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হচ্ছে না, তা এই মুহূর্তে নিজেও বুঝতে

পারছি না। কিন্তু এ বিষয়ে গভীর ভাবনার সময় এখন নেই। আমার পাশেই আরও অনেক বড় সমস্যা সশরীরে উপস্থিত রয়েছে। তাঁকে নিয়ে এই মুহূর্তে কী করবো তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বীরেন চ্যাটার্জি অস্থিরভাবে চারদিকে তাকাচ্ছেন। তিনি যে এই মুহূর্তে নিজের মেয়েকে খুঁজছেন তা বুঝতে পারছি আমি।

সীমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এ কোথায় নিয়ে এলে বাবা?" ও'র কণ্ঠস্বরে অসহায় ভাব ফুটে উঠছে।

"কোনো চিন্তা নেই আপনার। আমার সঙ্গে আসুন।" এই বলে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের লিফটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। লিফটের কোলাপসিবল গেট বন্ধ করে বোতাম টিপে দিলাম। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে, হাই তুলে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধ লিফটটা এবার মন্থর গতিতে ঊর্ধ্বযাত্রা শুরু করলো। বীরেন চ্যাটার্জি নিজের মনেই বললেন "ঠিক যেন জেলখানার খাঁচা।"

আমি কোনো কথা বলছি না। সীমার বাবার সঙ্গে এবার কী সব বানানো কথা বলবো মনে মনে তারই মহড়া দিচ্ছি।

"সীমা এখানে থাকে?" বীরেনবাবু নিয়ে চলে এসেছি। বললাম, "এই ঘরটাই এখন আপনার। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।"

"সীমা এখানে থাকে?" ধীরেনবাবু শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

"ঠিক এখানে নয়", আমি আমতা আমতা করি।

"তা হলে!" একটু বিরক্তই হলেন সীমার বাবা। "সীমা যেখানে আছে সেখানেই আমাকে সোজা নিয়ে গেলেন না কেন?"

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "কলকাতায় এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মেয়েদের ছাড়া কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না। আপনি চিন্তা করবেন না, সীমা একটু পরেই এখানে আসবে।"

সীমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "লেডিজ হোস্টেল বুঝি? সেখানে অচেনা পুরুষ-মানুষ ঢুকতে দেয় না বটে। কিন্তু আমি তো সীমার বাবা। বাবা-মায়েদের তো কোনো লেডিজ হোস্টেলে আটকানো উচিত নয়।"

"সব জায়গায় তো সমান নিয়ম নয়", আমি আবার মিথ্যেকথা বলতে অস্বস্তি-বোধ করি। এবার আশ্বাস দিলাম "সীমা এল বলে। আপনি ততক্ষণ স্নান সেরে নিন। আপনার মুখ চোখ এখনও বেশ শুকনো রয়েছে। আপনাকে এই অবস্থায় দেখলে সীমা খুব কষ্ট পাবে।"

আমার কথায় কাজ হলো। বীরেনবাবু

বললেন, "মা আমার অনেক কষ্ট পেয়েছে। ওকে আমি আর কষ্ট দিতে চাই না। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি যতটা পারি চকচকে হয়ে নিই। জেলেতে খুব কষ্ট শংকরবাবু। কিন্তু আমার মাকে ওসব কখনও জানতে দিইনি।"

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সহদেবের নজরে পড়ে গেলাম। সহদেব বললো, "আপনি এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন, স্যার? সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজছি আমি।"

"কেন কী হলো! আমাকে খুঁজে তোমার কী লাভ হবে, সহদেব?" আমি হেসে জানতে চাই।

"ইচ্ছে করে কী খুঁজছি আমি!" সহদেব ঝটপট উত্তর দেয়। "চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণির দেখাশোনার হুকুম।"

"কী হুকুম, সহদেব?" আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাই।

সহদেব ফিস ফিস করে বললো, "আপনার সঙ্গে কথা আছে, হুজুর। কথা বলবো বলেই তো সেই কখন থেকে আপনাকে ধরবার জন্যে বসে আছি।"

ক্রমশ

পাখি, বিবর্তন এবং কয়েকটি সমস্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূ-তত্ত্ববিদরা খড়ি-পাথরের স্তর ঘেঁটে যখন সেই অদ্ভুত জীবাশ্মগুলির সন্ধান দিলেন, প্রাণি-বিজ্ঞানীরা তো অবাক! অতীতের কোন প্রাণীর সাক্ষ্য বহন করছে এ জীবাশ্ম? কারা এরা? পাখি, না সরীসৃপ?

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, পাখিই তো! যথেষ্ট পরিশ্রম করার পর আসল চেহারাটি দাঁড় করালেন নৃবিজ্ঞানীরা। চোয়াল ধনেশ পাখির মত। সরীসৃপের মত শিরদাঁড়া। বাজ পাখির মত পা। পায়ের নখ ইস্পাতের মত শক্ত। দুটি বিরাট ডানা। ডানার মাঝ বরাবর জোড়া দুটি উপাঙ্গ। দেখলে মনে হয় খুদে খুদে যেন দুটি হাত। জীবন্ত অবস্থায় ওই হাতের সাহায্যে গাছের ডাল বা কান্ড বেয়ে গিরগিটির মত অনায়াসে হয়ত তারা চলাফেরা করত। ওঁরা কল্পনা করলেন, যখন মাটির ওপরে বসে থাকত তখন দূরে থেকে দেখলে মনে হত যেন আস্ত এক একটি জানোয়ার। আর আকাশে উঠলেই বনে যেত এক একটি রাক্ষুসে পাখি। একই জায়গায় প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল এই পাখির। তাই দেখে নৃবিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে, উন্নত প্রাণীর মত ওরা সম্ভবত সামাজিক জীবন যাপন করত।

বিজ্ঞানীরা এদের নাম রাখলেন, টেরোসর বা টেরোডাকটাইলস গোষ্ঠীর প্রাণী। আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে এরা বিচরণ করত পৃথিবীর সর্বত্র। প্রায় সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভূস্তরে যখন খড়িমাটি সৃষ্টির কাজ শেষ হতে শুরু করে ওই সময় প্রকৃতির বিচিত্র এই প্রাণীও বিলুপ্তির গর্ভে ঢলে পড়ে।

না। চেহারায় মিল ছিল ঠিক। তাই বলে আয়তনে সবাই যে কেউকেটা মত ছিল, তাও নয়। ওদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম শ্রেণীর আয়তন ছিল কতকটা বাবুই পাখির মত। এদের বলা হয় টেনেড্রাকন। আর যারা সব চেয়ে আকৃতিতে বড়, তাদের পাখা দুটি এক সঙ্গে খুলে দিলে লম্বায় দাঁড়াত সাতাশ ফুটেরও বেশি। অর্থাৎ এখনকার অ্যালবাট্রস পাখির দুটি পাখার মিলিত দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ। এদেরই বলা হয় টেরোসর।
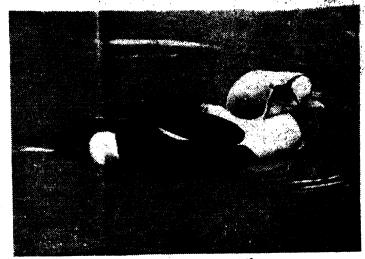
প্রাগৈতিহাসিক এই পাখি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা, আসলে এরা হল সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী। তবে সরীসৃপের মত শীতল-রক্তের নয়। এদের দেহে আধুনিক পাখির মতই উষ্ণ-শোণিত প্রবাহিত হত। বাঁচার তাগিদে খাবার যোগাড় করতে এদের উড়তে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাইলের পর মাইল। মাছই ছিল এদের প্রধান খাবার।

কিং আইডার সাঁতার কাটছে। এদের মাথার সামনের দিকে থাকে এক ধরনের গ্রন্থি। নাম সল্ট-একসক্রিটিং গ্ল্যান্ড। সমুদ্রের জীবনে খাপ খাওয়া[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গ্রন্থির [illegible]

অবশেষে মহাকাল তাদের গ্রাস করল। একে একে তারা অপসৃত হল এই পৃথিবী থেকে।

কিন্তু কেন?

এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কেউ দায়ী করেছেন পরিবেশকে। পৃথিবীর বয়স-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন এল। আবহাওয়ায় বৈচিত্র্য। অনেকের ধারণা, নতুন এই পরিবেশে নতুন জাতের গাছপালা সৃষ্টি হতে শুরু করল। ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে মাটির রাসায়নিক উপাদান পাল্টাল। বিকশিত হতে শুরু করল নতুন নতুন জাতের সংকর জাতের উদ্ভিদ। মাটির মধ্যে জমে ওঠা কোন কোন ধাতু বা অধাতুর যৌগ গাছের দেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়, এবং শেষ পর্যন্ত ক্রোমোজোম স্তরে পরিবর্তন এনে তাদের জৈবিক বিবর্তনে সাহায্য করে। বিবর্তিত ওই সব গাছপালার ফুলের পরাগ ছড়িয়ে পড়ে জলে এবং বাতাসে। ওই সময় কোন কোন গাছের পরাগ হয়ত টেরোসরদের শরীরে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছিল। তারা মড়কের কবলে পড়ে এবং দ্রুত সবংশে অবলুপ্ত হয়।

অন্যান্য [illegible] কারোর মত, পৃথিবীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির অবক্ষয়ে কোন কোন জায়গায় বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক যৌগ এবং ধাতু জমতে থাকে। খাবারের সঙ্গে এরা ওই সব পাখির দেহের মধ্যে ঢোকে। যা শেষ পর্যন্ত তাদের বিপাকীয় পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনের ফলে তাদের ডিমের গঠন পালটাতে থাকে। ডিমের খোলা কখনও কখনও এত শক্ত হয় যে, তা ভেঙে নতুন বাচ্চার পক্ষে আর বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। আর এমনি করেই ক্রম তাদের বংশবৃদ্ধি কমে যেতে থাকে। অতঃপর অবলুপ্তি। এমন কথাও বলেন কেউ কেউ, বিবর্তনের ফলে নতুন নতুন প্রজাতির পাখির আবির্ভাব ঘটল। এরা দলে ছিল ভারী, চরিত্রে অতিকায় ওই সব পাখির চেয়ে অনেক বেশি তৎপর। ওদের মত নতুন আগন্তুকরাও হয়ত জীবন ধারণের জন্যে মাছের ওপর নির্ভর করত। সহস্র সহস্র ঐ সব পাখি মাছের অন্বেষণে ঝাঁপিয়ে পড়ত সমুদ্রের বুকে। তাদের ভিড় ঠেলে অতিকায় ওই পাখির পক্ষে মাছ সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। এর ফলে ওদের খাবারের টান পড়ে। বংশপরম্পরায় আংশিক উপবাসের দরুন দুর্বল হতে থাকে এবং নির্মূল হয়ে যায়।

*

শুধু একটি প্রজাতিই নয়। ভূ-তাত্ত্বিক

যুগের পাখিদের মধ্যে বহু প্রজাতিই এখন অবলুপ্ত। বিবর্তন। হ্যাঁ, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে অনেক নতুন পাখির আবির্ভাব ঘটল এই পৃথিবীতে। আবার প্রাচীনতম পাখির বংশকুলের কেউ কেউ বিবর্তনের ঝড় ঝাপটা সহ্য করে টিকেও রইল। পরিবর্তিত চেহারায় এবং চরিত্রে।

নৃবিজ্ঞানীরা এখন একমত, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি উভয়েরই উৎপত্তি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকে। এবং মানসিক দিক বাদ দিয়ে শারীরবৃত্তীয় গঠন কাজ-কর্মের দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় কোন কোন ক্ষেত্রে পাখি যেন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চেয়ে জটিল এবং দুর্বোধ্য।

এরা বাতাসের চেয়ে ভারী, কিন্তু বিশেষ ধরনের শারীরিক গঠনের দরুন তৎপরতায় এরা বাতাসে ভর করে উড়তে পারে। কখনও ওড়ে ডানার ঝাপটা মেরে, কখনও হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় গ্লাইডিং। কোন কোন পাখি শত শত মাইল উড়ে পথ চলে। তিব্বত থেকে ভারতে। সাইবেরিয়া থেকে আলাস্কায়। দক্ষিণ অথবা উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে উষ্ণতর মণ্ডলে। খাবার অন্বেষণে, ডিম পাড়তে এবং অনুকূল
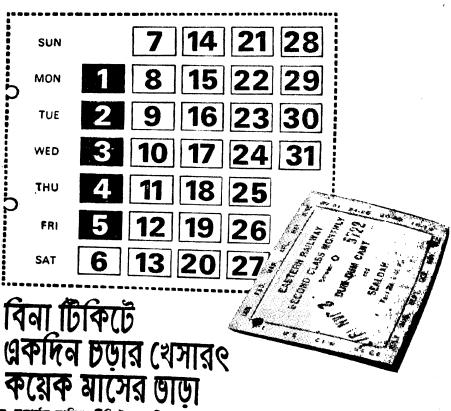
আবহাওয়ার তাগিদে। কিন্তু কি ভাবে এত দূরের পথ চিনে তারা যাওয়া আসা করে, বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও তা রহস্যই থেকে গেছে। কারোর মত, সূর্য চাঁদ এবং কোন কোন পাখি নক্ষত্রের অবস্থান চিনে পথ চলে। কোন কোন পাখি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুসরণ করে দূরদেশে পাড়ি দেয়। বিভিন্ন পরিবেশে চলাফেরা করতে গিয়ে কারোর কারোর চালচলন পাল্টায়। শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মেও কিছু কিছু বৈচিত্র্য আসে

যেমন ধরা যাক আইডার নামে এক ধরনের হাঁস। এদের বিচরণ মুখ্যত উত্তরসাগরীয় অঞ্চলে। পশমের মত নরম এদের পালক। আলাস্কা, গ্রীনল্যান্ড সাইবেরিয়া থেকে শীতের সময় এরা শত শত মাইল দূরাঞ্চলে চলে যায়। লবণাক্ত সমুদ্রের জলে ভাসে। মাছ শিকার করে। এদের মধ্যে কিং-আইডার নামে এক ধরনের প্রজাতির কপালের দিকে এক ধরনের গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি লবণ নিঃসৃত করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সমুদ্রের পরিবেশে খাপখাওয়াতে গিয়েই তাদের শরীরে এই বিশেষ ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে।

পেঙ্গুইন পাখির দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারটাও আরও একটি রহস্য। মেরু অঞ্চলের এই পাখি জলের মধ্যে যত সহজে চলাফেরা করতে পারে, বাতাসে পারে না। এদের চোখও অদ্ভুত! বাতাস জলের চেয়ে হাল্কা মাধ্যম। অতএব আলো বাতাস থেকে জলে প্রবেশ করলে প্রতিসরণের নিয়ম অনুযায়ী বেশি বেঁকবে। আলোর গতিপথের পরিবর্তনের দরুন সাধারণ ক্ষেত্রে দেখার কাজটা ব্যাহত হয়। কিন্তু দেখা গেছে, পেঙ্গুইন এ ক্ষেত্রে বড় একটা অসুবিধে বোধ করে না। কোন পাখি রাত কানা। আবার প্যাঁচা, বাদুড় প্রভৃতি পাখি রাতেই দেখতে পায় ভাল। কোন কোন পাখি একই জায়গায় দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। কেউ কেউ ঋতুতে ঋতুতে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাফেরা করে। এই যাযাবরী জীবনের জন্য মুখ্যত তিনটি কারণ দায়ী। কোন জায়গায় খাবারে টান পড়লেই ওদের যেতে হয় অন্যত্র। ডিম পাড়ার অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার জন্যেও ওদের সাময়িক স্থান ত্যাগ করতে হয়। কখনও আশপাশে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে ওরা স্থান ত্যাগ করে।

*

শেষের ব্যাপারটা নিয়েই মানুষের মাথা ব্যথা সবচেয়ে বেশি। গত কয়েক দশকে পৃথিবীর অনেক দেশে বেপরোয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন নতুন জন বসতি এবং কলকারখানা গড়তে গিয়ে বহু পাখি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তাদের খাবারেও টান পড়েছে অনেকটা। তারা এখন ভিড় করছে বিমান বন্দরের কাছাকাছি। বিমান বন্দর এলাকায় রেস্তোরাঁ প্রভৃতি থেকে ফেলে দেয়া অভুক্ত খাবারের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ভিড় করে। যা কখনও কখনও বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। কিছু কিছু দুর্ঘটনাও ঘটে এদের দরুন। এ ছাড়া বহু পাখি বছরে প্রচুর শস্যও খেয়ে ফেলে মানুষের শস্যভাণ্ডারে টান সৃষ্টি করে। ভারতে এই সব পাখির মধ্যে পড়ে চড়ুই, বাবুই পায়রা টিয়া প্রভৃতি। আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে এক ধরনের কুয়েলা পাখি বছর চার আগে তো রীতিমত ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। এদের বলা হয় রেড বিলড্ কুয়েলা। ঠোঁটের রং লাল বলে। সাহারার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় মরু এলাকায় এদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। কখনও কখনও লক্ষ লক্ষ পাখি এক একটি ঝাঁক সৃষ্টি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছপালা অথবা ফসলের ক্ষেতে। খাবারের খোঁজে ওরা দৈনিক ২০ থেকে ৩০ মাইল দূরে পর্যন্ত চলাফেরা করে। তবে কোন কোন কুয়েলাকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মালাই-এর মধ্যে ১০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতেও দেখা গেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ফসল খেকো পাখি ভারতেও একটা বড় রকমের সমস্যা।

বাঁ দিক থেকে : অধ্যাপক অশোক ঘোষ এবং আন্তর্জাতিক পাখি-বিষয়ক আলোচনা চক্রের সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি এস ফার্নার ছবি : দীপ্তি ঘোষ

*

ভারতে কত রকমের পাখি দেখতে পাওয়া যায়?

ডঃ অশোক কুমার ঘোষকে এই প্রশ্নটি করেছিলাম কয়েকদিন আগে। ডঃ ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের স্যার নীলরতন সরকার অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট পক্ষীবিজ্ঞানী। বিভিন্ন পাখির শারীরবৃত্ত এবং বিশেষ করে হরমোন

সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করে আসছেন গত কয়েক বছর। তাঁরই উদ্যোগে পাখির হরমোন সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বসেছিল এই কলকাতায়। ভারতে এ ধরনের আলোচনাচক্র এই প্রথম।

আমার প্রশ্নের উত্তরে ডঃ ঘোষ বললেন, পৃথিবীতে মোট ৮৬০০ প্রজাতির পাখি এ পর্যন্ত সনাক্ত করা গেছে। বংশধারা বা গণের দিক দিয়ে ২৭। তুলনায় ভারতে আছে ১২০০ প্রজাতির পাখি। ২০টি গণের মধ্যে এরা পড়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে মোট যত রকমের পাখি রয়েছে তাদের অনেকগুলি এদেশে পাওয়া যায়।

ডঃ ঘোষ বললেন, এই সব পাখিদের মধ্যে কেউ কেউ বিবর্তনের দিক দিয়ে দেখলে আধুনিক পর্যায়ে পড়ে। এরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে অনেক শেষের দিকে। এদের মধ্যে পড়ে বাবুই, চড়ুই বুল-বুল শালিক প্রভৃতি। কিছু কিছু পাখি আছে বিবর্তনের দিক থেকে যারা এখনও সরীসৃপের কাছাকাছি থেকে গেছে। যেমন, পানকৌড়ি ময়ূরও এদের মধ্যে পড়ে। মুরগীও। বাজপাখিদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী পুরনো, কোন কোন শ্রেণী নতুন।

প্রশ্নঃ বিবর্তনের শেষের ধাপে যাদের আবির্ভাব যেমন বাবুই চড়ুই দেখা যাচ্ছে আকারে এরা অনেক ছোট। তাহলে শেষের দিকে যে সব পাখির আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের সবাই কি আকারে ছোট?

ডঃ ঘোষঃ না। তা কেন? কাকের কথাই ধরুন না। এদের আকার বড়। কিন্তু পাখির দিক দিয়ে এরা আধুনিকতম।

শুধু আকার এবং শারীরবৃত্তীয় গঠনই নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে বিবর্তন ঘটতে ঘটতে পাখিদের স্বভাব চরিত্র এবং আঙ্গিক গঠনেও যেমন পরিবর্তন এসেছে অনেক, সেই সঙ্গে তাদের হরমোন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানেও কিছু কিছু গরমিল রয়েছে।

যেমন ধরুন, বললেন ডঃ ঘোষ, যে কোন প্রাণীর বিপাকীয় কাজকর্মে অ্যাড্রিনেলিন এবং নরঅ্যাড্রিনেলিন এই দুটি হরমোনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে, যে সব পাখি পুরনো তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় একশ' ভাগ নর অ্যাড্রিনেলিন নিঃসৃত হতে দেখা যায়। অ্যাড্রিনেলিনের পরিমাণ খুবই কম। আবার যারা নতুন পাখি, যেমন চড়ুই বাবুই এদের মধ্যে প্রায় শতকরা একশ' ভাগই নিঃসৃত হয় অ্যাড্রিনেলিন। নর অ্যাড্রিনেলিন খুব কম। আবার যে সব পাখি খুব প্রাচীনও নয় আবার নতুনও নয় যেমন পায়রা, তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশভাগ অ্যাড্রিনেলিন এবং শতকরা পঞ্চাশভাগ নর-অ্যাড্রিনেলিন নিঃসৃত হয়। মুরগী পান-কৌড়ি এরা পুরনো পাখি। এদের মধ্যে অ্যাড্রিনেলিন নিঃসৃত হতে দেখা যায় না বললেই চলে। আবার ব্যতিক্রম আছে। যেমন, মাছরাঙা। এরা মাঝামাঝি পর্যায়ের পাখি। কিন্তু এদের দেহে পায়রার মত ওই দুই হরমোনের মাত্রা ৫০ : ৫০ এই অনুপাতটি মেনে চলে না।

*

ডঃ অশোক ঘোষের গবেষণাগারে পাখি-দের হরমোন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ওপর এখন কাজ চলছে। ডঃ ঘোষ বললেন, সারা ভারতের পাখিদের বিবর্তনের ধাপ অনুসারে আমরা এখন পরীক্ষা করতে চাই। অ্যাড্রিনে-লিন এবং নরঅ্যাড্রিনেলিন এই দুই হর-মোনের মাত্রায় অনুপাত কাদের মধ্যে বেশি, কাদের কম, দেখা দরকার। এই অনুসন্ধানের ওপর নির্ভর করে যাবতীয় পাখির মধ্যে কে বেশি পুরনো, কে নতুন তার একটা পর্যায়-ক্রমিক চিত্র হয়ত তুলে ধরা সম্ভব হবে।

অবশ্য, এটা অ্যাকাডেমিক দিক বললেন ডঃ ঘোষ। এ ধরনের অনুসন্ধানের একটি প্রায়োগিক দিকও রয়েছে। যেমন ধরুন, হাঁস মুরগীর মত কোন কোন পাখি মানুষের খাদ্য। হরমোন বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এদের উৎপাদন বাড়ান সহজতর হবে। আবার যে সব পাখি ফসল নষ্ট করে ওই একইভাবে তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করে তাদের প্রকোপের হাত থেকে আমরা রে[illegible] পেতে পারি।

আসলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও এখন বিভিন্ন পাখি নিয়ে নানা রকম অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্যঃ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যে সব পাখির প্রয়োজন বেশি তাদের সংরক্ষণ এবং অধিক উৎপাদনের চেষ্টা। যে সব পাখি অনিষ্টকর তাদের নিয়ন্ত্রণ। যারা কীটপতঙ্গ খেয়ে ক্ষতির হাত থেকে ফসল বাঁচায় তাদের সংরক্ষণ। এ ছাড়া আরও অনেক পাখি, যারা প্রকৃতির বৈচিত্র্য—বর্ণে চরিত্রে এবং স্বভাবে মানুষের ভাল লাগার যারা পরিপূরক—একটি ভারসাম্য পরিবেশের মধ্যে তাদেরও যাতে বাঁচিয়ে রাখা যায় তারও চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

সমরজিৎ কর

চিৎ হয়ে জলে ভাসতে ভাসতে নানুর মনে পড়ল, গেল বছর চাম উকুন হয়েছিলো বুড়োর গায়ে। বগলে, বুকের লোমে, পায়ে কনুইয়ের কাছে বাদামী খুদে খুদে তিলের মতো হেঁটে বেড়াতো। দুপুরে খাপরার ঘরের সামনে উপুড় হয়ে খাটিয়ায় টানটান শুয়ে বুড়ো বলেছিলো,

"পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দে তো'!"

সেই হাত বোলাতে গিয়েই প্রথম চাম উকুন হাঁটতে দেখলো নানু। চিমটি কেটে একটকে তুলতে যেতেই বুড়ো খিঁচিয়ে উঠেছিলো "হেই শালা! চিমটি কাটিস কেন রে?"

পোকাটা হাতের চেটোয় ফেলে বুড়োকে দেখিয়েছিলো নানু "এই দ্যাখ—তোর গায়ে পোকা পড়েছে"

বুড়ো দেখেশুনে বলেছিলো চামউকুন।

এক সঙ্গে শোয় বলে নানুর গা' থেকেও বেরুলো দু'-একটা। নানুর বারো বছরের কালো শরীরে তেমন লোম-টোম নেই বলে বাঁচোয়া। তবু ফুরসৎ পেলেই পালা করে দুজনে দুজনের গা বেছে ছিলো প্রায় মাসখানেক ধরে। এখনো মাঝেমধ্যে পিঠ চুলকে বুড়ো বলে ওঠে, "দ্যাখ তো' দ্যাখ তো'—।"

বুড়োর দিকে চেয়ে হাসি পেল নানুর। পাঁচ-ছ' মানুষ উঁচুতে, কেমন সাদা-দাড়িঅলা হনুমানের মতো বসে আছে দ্যাখো! কপালে হাত রেখে রোদ ঠেকাচ্ছে। এতো নিচে থেকে দাদুর চোখ দেখা যায় না। নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে ইস্টিশানের দিকে লক্ষ্য রাখছে, রেলগাড়ি আসে কি না!

সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যেকার হাসির ভাবটুকু সরে গিয়ে গলা এবং বুকের কাছে সর্দিকাশির মতো হালকা একটু কষ্ট এসে জড়িয়ে গেল। নানুর তো' আর কেউ নেই কিনা! ছেলে ছোকরা ঝোপড়া বস্তির প্রতিবেশীরা আছে ঠিকই আশেপাশে। কিন্তু নানুর চোখ খোলার পর থেকেই জগৎ জুড়ে শুধু ওই এক বুড়ো মানুষ। খিদে পেলে বুড়ো ঘুম পেলে বুড়ো ঘুমের মধ্যে ভয় পেলেও সেই একটাই চেনা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ 'ভয় কিসের রে নানু! এই তো' আমি পাশে—।" বলেই, সেই সাদা লোমভর্তি চামউকুনের বুকে জাপটে ধরবার মানুষটা,—একটাই। তিন দিন গা[illegible] তাপ। কাজে আসলে কামাই নেই। এইসব ভেবেটেবে কষ্ট হলো নানুর। কথা বলতে ইচ্ছে করলো। শুধু পায়ের ধাক্কায় ভেসে থেকে পিছিয়ে এলো একটু। চেঁচিয়ে বললো, "গাড়ি আসে নাকি দাদু—"

ইস্টিশানে ঢুকে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা! ছাড়ে না কেন শালা? ইদিক থেকে দু-দুটো গিয়ে দাঁড়ালো বান্দ্রায়। দাঁড়িয়ে জিরিয়ে চলেও গেল। ও শালার কিছু বিগড়ালো কিনা কে জানে? বিরক্ত মুখে ভাবছে বুড়ো মানুষটা। জিভের চারপাশে সাড় নেই। স্বাদ নেই তিনদিন। মাড়ির গায়ে নেড়ে নেড়ে হাঁ করলো, ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। জিভ নাড়তেই একটু জল এলো। মুখের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গিলে ফেললো কোঁৎ করে। জ্বরটা বোধ হয় কমলো একটু। দুদিন বাদে খিদে খিদেও পাচ্ছে এখন। পরের গাড়িটা দেখে ঘরে ফিরবে। ওইটে আন্ধেরী লোকাল। পরেরটা ছাড়ে ভিরার থেকে। তিনটে ইস্টিশান পেরিয়ে গেলে, আন্ধেরী। এ গাড়ি থেকে তেমন অ হা মরি মাল কোনো দনই পড়ে না। বড় জোর সাত-দশটা মোড়ক। তাও বেশির ভাগই শুধু ফল পাতা। মাল থাকে না বিশেষ। ভিরার অনেক দূর। কত দূরে জানে না [illegible]। [illegible] ওদিকে কোনোদিন। শুনেছে, দশ-পনেরোটা ইস্টিশান পেরিয়ে

তবে ভিরার। ঘণ্টায় এক-আধখানা ভিরার লোকাল যায় এই পুলের ওপর দিয়ে। ঠাসা মানুষ দু'দিকের দরজায় ঝোলে। ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রায় সব জানালা গলেই হাত বেরিয়ে আসে। পটাপট পড়তে থাকে শালপাতার মোড়ক কাগজের পুঁটলি। বেশি ভারী হ'লে সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাঁড়ির জলে নয়তো হাওয়ায় অল্প হেলেদুলে নিচের দিকে নেমে যায়। বছর কয়েক আগেও সব মোড়কই প্রায় বুড়োর নাগালের মধ্যে থাকতো। জলে তো তেমন হই-হুল্লোড় স্রোত নেই—দড়ি-বাঁধা চুবড়িটি ফেলে ধীরে সুস্থে তুলে আনতে পারতো। তখনকার পাকা হাত একটু কাঁপ[illegible] না। এক নজরে ঠিক করে ফেলতে [illegible] পারতো কোন্ মোড়কটি সবার আগে তুলে নেওয়া দরকার নয়তো ভেসে যাবে অথবা যাবে তলিয়ে।

এখ[illegible] আর পারে না। পারে না—তাও তো দু' বচ্ছর হয়ে গেল। নানুটাকে জলে নামাতে হলো। আরব সমুদ্দুরের জল এই মাহিম খাঁড়িতে ঢুকে রেলপুলের তলাটুকু ভাসিয়ে দেয়। জোয়ারের ধাক্কায় চলে যায় অনেকখানি ভেতরে। ঘোলা জল। আশপাশের মল ময়লা টেনে জড়িয়ে আরো ঘুলিয়ে কেমন একটা পচা গন্ধসমেত পুলের তলায় দুলতে থাকে। তারই ওপরে পড়ে উত্তর বোম্বাইয়ের অজস্র ঘর-গেরস্থালির পুজো-আচ্চার নানান জাতের ফুলপাতা। কেউ কেউ যত্ন করে শক্ত মোড়কে বেঁধে মাহিম খাঁড়ির ঘোলা জলকে পেন্নাম ঠুকে ফেলে দেয়—অনেকেই কোনোরকমে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি। কী না ঘরের লক্ষ্মীর পুজো হয়েছে—পুজোর ফুল সাগরে গেলেই পুণ্যি হয়। আপিস যেতে যেতে 'বান্দ্রা কখন এলো' খেয়াল রাখলেই সেই পুণ্যিটুকু কামিয়ে ফেলা যায়। 'বান্দ্রা কখন এলো'—তার জন্যেও বিশেষ বেগ পেতে হয় না। ঝিমো'তে ঝিমোতে অথবা তাশ পেটাতে পেটাতে রেলপুলের ওপরে উঠে আসে গাড়ি। ভিন্ন ধরনের ঘটাং-ঘট-ঘট শব্দ। ব্যস! ঘণ্টা দেওয়া ঘড়ির মতো সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি মোড়কটি হাতে উঠে আসে। ছুঁড়ে খাঁড়ির জলে ফেলে দাও—কাজ শেষ! এসব আমার [illegible] আছে। কারণ তারপরেই তো [illegible] চুবড়িটি জলে ফেলে আমার [illegible]

ছেড়েছে। এতক্ষণে আন্ধেরী [illegible] স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে আসছে। [illegible] লাইন ধরে যাবে। পুলের ওপরে সাতটা লাইন। ছয়-সাতে হারবার লোকাল আসে যায়। বাকি পাঁচটা চার্চগেটের আপ-ডাউন গাড়ি পার করে দেয়। এক লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি যাবে তার পাশের লাইনে সরে

আসে বুড়ো। কাঠের পাটাতনে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। তৈরী। জাল ফেলবার আগে জেলেরা যেমন তেমনি।

দুই নম্বরে সরে এলো বুড়ো। সামান্য ঝুঁকে ঘড়ঘড়ে গলা তুলে চেঁচালো "তিন নম্বরে আসে রে নাননু—উ-উ—"

দেওয়ালী হয়ে গেল। এবারে এখনো শীতের নামগন্ধ নেই শহরে। তবু নাগাড়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা জলে থাকলে থেকে থেকে শরীরটে কেমন কনকন করে। হাতের ছোটো ছোটো আঙুলগুলো চুপসে ভাঁজ পড়ে ফ্যাকাশে দেখায়। বুড়ো কিংবা মরামানুষের আঙুল যেন। দুটো গাড়ির ফাঁক পেলেই কাদামাটির পাড়ে উঠে এসে বসে থাকে নানু। হাতে হাত রগড়ে দু'হাতে মুখ ঘষে গা শুকিয়ে নেয়। গাড়ি এলেই ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। সকাল থেকে যত ফুলের মোড়ক জুটেছে সব ঢিপি করে রাখা হয়েছে প্যাচপেচে মাটি আর আগাছার জঙ্গলের মধ্যে। মাল কত এখনো দুজনের কেউ জানে না। এগারোটা বিয়াল্লিশের ভিরার লোকাল গেলে দুজনে মিলে মোড়ক খুলে গুনতে বসবে।

তিন নম্বরে গাড়ি আসছে শুনে চিৎ সাঁতারে একটু পিছিয়ে এলো নানু। দাদুর গায়ে পুলের ওপরে রেল লাইনে রোদ চনমনে। এখানে জলে পুলের ছায়া দাদুর হাতের ছায়া। হাত বেয়ে চুবড়ি নেমে এসে জল ছুঁয়ে থাকলো। দাদুকে পুরোপুরি দেখা যায় না। দূরে উঁচুতে ফুরফুরে পাতলা সাদা দাড়ি তুলোর মতো উড়ছে। তার পেছনেই ছাই-ছাই আকাশের খানিকটা দেখতে পেল নানু। বান্দ্রা ইস্টিশান থেকে পুল অবধি পৌঁছোতে রেলগাড়িতে উ-ই-ই ওপরের উঁচু রাস্তার তলা দিয়ে আসতে হয়। চওড়া মস্ত হাইওয়েতে লরী মোটর বাস সব চলে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলো নানু। সে যেন একতলায় ভাসছে। দোতলায় দাদু দাঁড়িয়ে। রেল-গাড়িও দোতলা দিয়ে চলে যাবে। এখনো দেখা যাচ্ছে না। বাঁ পাশে তিনতলায় চলন্ত লাল বাসের খানিকটা দেখতে পেল এখন। শাঁ করে চলে গেল। এক দুই এবং তিন তলায় তিন রকম কান্ড হচ্ছে। বেশ মজা লাগলো নানুর। আরো একটু ভেবে দেখলো ওর পিঠের নীচে বেশ কয়েক হাত নিচে পাতাল। পাতালে গেঁড়ি শামুক গুগলি পড়ে আছে।

ঘটাং-ঘট-ঘট করে আন্ধেরী লোকাল পুলের ওপরে এসে গেল। শাঁখ বাজালো একবার। প্রথম কামরায় কাঁচকলা। সেটা নানুর ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই পরেরটা থেকে দু'তিনটে মোড়ক জলের দিকে নেমে আসছে। দাদুর চুবড়ির কাছে পড়লো একটা। ওটা দাদু তুলে নিতে পারবে। বাঁ পাশে দু'হাত দূরে আরেকটা জল ছুঁতে না ছুঁতেই নানু প্রায় লুফে নিলো। ঠিক তক্ষুনি ঘাড় এবং পিঠের মাঝামাঝি ঢিলের মতো শক্ত কি একটা পড়লো। 'উফ' বলে ঘোরবার সময় পেল না নানু। মোড়কটা তলিয়ে যাচ্ছে খলবল করে কয়েক হাত ডুব দিয়ে ধরে ফেললো ওটাকে। ঢিলের মতো ভারী যখন ভালো মাল আছে। রুপোর টাকা-ফাকা হলেও হতে পারে। ভাবতে ভাবতে ভুস করে ভেসে উঠলো ওপরে। গাড়ির শেষ কামরাটা পেরিয়ে যাচ্ছে তখন। দড়ি টেনে টেনে চুবড়িটা তুলে নিচ্ছে দাদু।

প্যাচ পেচে কাদামাটির পাড়ে উঠে এলো নানু। দুহাতে দুটি মোড়ক। একটা পলকা। ফালতু। অন্যটার ওজনে ভিজে জল আসে। হাতের চেটো নাচিয়ে ভার বুঝে দেখলো। শালপাতার মোড়কটি। বেশ ভালো করে আস্টেপৃষ্ঠে সুতো দিয়ে বাঁধা। নির্ঘাৎ রুপোর টাকা। একটা কি, তার বেশিও হ'তে পারে। দাদু কোনোদিন রুপোর টাকা পায়নি। পাবে কোথেকে সব মোড়কই তো প্রায় ফালতু। স্রেফ বাসী ফুলপাতা। খুলে খুলে দেখে ফের জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যেগুলো কাজের সেগুলোর ভেতরেও পাঁচ বড়জোর দশ নয়া পড়ে থাকে। তার বেশী মানে সিকি-আধুলি-টাধুলি পেলে কপালে ঠেকিয়ে পেন্নাম করতে ইচ্ছে করে। আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠলো নানু "দাদু-উ-উ—টাকা আ আ—"

সবশুদ্ধ তিনটে মোড়ক উঠে এলো চুবড়িতে। খবরের কাগজের পুরিয়াটা ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে বাকী দুটো শালপাতার। একটারও তেমন আহা মরি ওজন নেই। পলকা। তবু খুলে না দেখে ফেলে দেওয়া ঠিক নয়। দড়ি গুটিয়ে চুবড়িতে ফেললো বুড়ো। এক হাতে মোড়ক তিনটে, অন্য হাতে চুবড়ি নিয়ে নামতে লাগলো। খুব সামলেসুমলে রেললাইনের পাশের ঢাল বেয়ে। এরপর ভিরার লোকাল। আসতে এখনো মিনিট কুড়ি। দু'পাঁচ মিনিট দেরীও হয়। সেই ফাঁকে কাজ এগিয়ে রাখতে হবে। নিত্যিকার নিয়মে এই সময়টুকু মোড়ক বাছাই করে দুজনে মিলে।

ছোঁড়াটা 'টাকা-টাকা' করে চেঁচাচ্ছে। বলদ কোথাকার! টাকা পেয়েছে! হুঁহ্! বলি টাকা কি গুগলি-শামুক? খাঁড়ির জলে ডুব দিলেই হাতভরতি উঠে এলো? আসলে ফুলশুদ্ধ মোড়ক ভাসতে ডুবে যায় সেইজন্যে অনেকেই নুড়ি বা ইঁটের টুকরো ভরে দেয় ভেতরে। এরকম কত পেয়েছি জীবনে। ওজনে মনে হয় মাল টসটস করছে। খুলে ফেললে ভোঁ-ঢুঁ। আবার

দলা পাকিয়ে সেই জলেই ছুড়ে ফেলে দাও। ওই রকমই একটা পুরিয়া পেয়েছে বোধ হয় ছোঁড়াটা। নতুন জলে নেমেছে তো! ওর আর দোষ কি? জানে না। ঢাল বেয়ে সাবধানে নামতে নামতে বুড়ো বললে, "দাঁড়া, আসছি! চেল্লাস নে। দেখি তুই কোথায় টাকা পেলি!"

নান্টুর আর তর সইছে না। লাইন থেকে এইটুকুন নেমে আসতেই বুড়ো বোধ হয় দিন কাবার করে দেবে। আবার হাতের চেটোয় ভারী ব্যাপারটা নাচিয়ে দেখলো। খট করে অন্য একটা সন্দেহ ঢুকলো মাথায়। একটার বেশী টাকা থাকলে তো শব্দ হতো! অল্প হলেও টং অথবা ঠুন করে জানান দিতো! না, না আসলে ফুলে-পাতায় জড়িয়ে রয়েছে তো, তাই আওয়াজ নেই। এইসব ভাবতে ভাবতে আর সবুর সইলো না। 'দুত্তোর' বলে সুতো ছিঁড়ে শালপাতার বড়সড় মোড়কটি খুলতে লাগলো নান্টু।

গাঁদা, জুঁই আর বেলফুল। কিছু তুলসীপাতা। সবই শুকনো এবং ভেজা। এইমাত্র জলে ডুবে ভিজেছে। দলা পাকানো ফালতু পাতাফুল সরাতেই যে জিনিসটা

ধরলো। সেদিকে তাকিয়ে একেবারে হাবা
য়ে গেল নানু। টাকা তো' দূরের কথা
কটা ঘষা নয়া পয়সাও নেই। সিঁদুর
াখানো ছোট একটি মূর্তি। ঠাকুর-টাকুরই
বে। কালচে পাথর কিংবা লোহার। কড়ে
আঙুলের সাইজ। এতো রাগ হ'লো নানুর'
চুল-টুল সুদ্ধ দলা পাকিয়ে ওটাকে ফের
জলে ছুঁড়ে ফেলতে যাবে, বুড়ো এসে
গেল। দেখেছে।

"কি রে? ওটা কী রে নানু?"

নিজে নিজেই চটে গেছে নানু। তার ওপরে দাদুর কাছে বে-ইজ্জত। এক্ষুনি ওটা নিয়ে ঠাট্টা শুরু করবে। ফোকলা দাঁতে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসবে আর বলবে, "উরিব্বাস রে! আমার নাতি কি সেয়ানা দ্যাখো, খাঁড়ির বেনো জল থেকে একেবারে ইয়া পেল্লায় একখানা ট্যাংরা তুলে ফেলেছে —হে—হে—।"

নানু আগেভাগেই রুখে দিলো, "টাকা না হাতি। এই দ্যাখ না—"

বলে এগিয়ে ধরলো মোড়কটা। ঘাড় এবং পিঠের কাছে হাত বুলিয়ে নিলো একবার। যেন ঢিলের মতো এই অলপ্পেয়ে মোড়কটা যেখানে পড়েছিলো সেইখানটা এখন একটু ব্যথা-ব্যথা করছে।

মূর্তিটা হাতে নিয়ে বুড়ো কিন্তু অন্যরকম কাণ্ড করলো। মুখে বললে, "ও রে! এ তো' পুজোর ঠাকুর-দেবতা—"

বলে বাঁ হাতের চুবড়ি নামিয়ে রেখে দুই হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব যত্ন করে দেখলো ওটাকে। তারপর শিরফোলা রোগা বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটার গায়ে-মাখানো সিঁদুর ঘষে ঘষে তুলতে লাগলো। নানু অবাক। ওই অকেজো ফালতু ব্যাপারটা হাতে নিয়ে বুড়ো জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো না দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকলো। মুখে শুধু বললে, "কি করো দাদু?"

যৌবনে এবং মধ্য বয়েসে বহু বচ্ছর কাগজ কুড়িয়েছে বুড়ো। নানান টুকিটাকি ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছে। চুরি করেছে এখানে সেখানে সুযোগমতন। চোর বাজারে যাতায়াত ছিল। জেল খেটেছে দুবার। এখন বয়েস। চোখের জোর ফিকে। তবু চিনতে ভুল হয় না। রুপো! এ জিনিস সাক্ষাৎ রুপো না হয়ে যায় না। সিঁদুরের ঘষায় চমকে চকমকিয়ে উঠলো। বুড়ো বললে, ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো যেন।

নানুও দেখেছে। বললে, "কী, দাদু?"

আদর করে নাতির থুতনি নাড়া দিয়ে একগাল হাসলো বুড়োমানুষ। দেখবার মতো হাসি। নানু টের পেল, ওটা আর যাই হোক, ঠাট্টার হাসি নয়। খাঁড়ির জলের মতো ঘোলা চোখ দুটো আরো ছোটো হয়ে গেছে। চোখের দুপাশে, কপালে কাটা দাগ

বা মড়া ঝোপের মতো জড়িয়ে মড়িয়ে গেছে চুলগুলো। মাথার পাতলা চুল আর ফুরফুরে দাড়ি সমুদ্রের বাতাসে উড়ছে। আঠা দিয়ে লাগানো তুলোর মতো। আর একটু জোর বাতাস দিলেই বুঝি গাল থেকে আলগা হয়ে উড়তে উড়তে দূরে চলে যাবে। এই সব নানান গণ্ডগোলের মধ্যে বুড়োর হাঁ-মুখের ভেতরে বেশ অন্ধকার। দাঁত নেই তো একটাও! সেই অন্ধকারের মধ্যে লালচে জিভের ডগাটুকু তিরতির কাঁপছে। যেন একটি হাসির দৃশ্য। ফিক করে হেসে ফেললো নন্দু।

বুড়ো বললে, মূর্তিটা দেখিয়ে, "হাসিস না, শালা। মা লক্ষ্মী! দেখছিস না, হাতে ডিবে, দু' হাতে ফুলটুল, আর এই নিচের হাতে আশীর্বাদ করছে! খাঁটি রূপো। কম্‌-সে-কম চাল্লিশটে টাকা নগদ—"

বুড়ো দাদুর চেহারা, হাসিটাসি ভুলে নান্দু এখন মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকলো হাঁ করে। পলক পড়ে না চোখে। একটু বাদেই ঢোক গিলে ভাবলো অত দামী জিনিসটা আজ ওর হাতেই উঠেছে। দাদু সারা জন্মে একদিনে চল্লিশ টাকা খাঁড়ি থেকে তোলেনি। দুচার ফোঁটা লোভ জমলো ভাবনায়। চ—ল্লি—শ টা—কা! ভাবা যায় না! রা কাড়ে না মুখে। নান্দু তার চকচকে চোখে সেই চাল্লিশটে রূপোর টাকার দিকে চেয়েই থাকলো চেয়েই থাকলো।

বুড়োর মাথার মধ্যে, মিন্দুর ভেতরে ততক্ষণে বিজবিজ করে গজিয়ে উঠছে। গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ফেলে-আসা নানান পাপ কুৎসিত কেন্নো আরশোলা কেঁচোর মতো কিলবিলিয়ে গায়ে গায়ে ঘুরছে। সারা গায়ে চুলকুনি! চাম উকুনে ছেয়ে গেছে নাকি গা' গতর? চিৎ হয়ে, চোখ উল্টে পড়ে আছি নাকি কোথাও? শ্বাস পড়ছে না! হাঁ-করা মুখের মধ্যে মাছি ঢুকেছে। চুরি-চামারি, ছ্যাঁচড়ামি কি কম করেছি! জেল হয়েছে মোটে দুবার। বাকি সব? কেউ না কেউ তো ঠিকই হিসেব-পত্তর রেখেছে। অ্যাতো বড় সমুন্দুর সামনে। সমুন্দুরকে পুজোর ফুল-পয়সা ফেলা তো ভগবানকেই দেওয়া! প্রণামী, নৈবিদ্য। হাজার হাজার পয়সা, ভগবানকে দেওয়া প্রণামী চুরি করলুম ঢের। তেমন যদি কেউ থাকে? আছে নিশ্চয়ই। আর, আছে মানেই, তিনি কি ছেড়ে কথা কইবে? তেনার নজর নাকি সবখানে!

বাহাত্তুরে বুড়োর মনে কেন্নো, কেঁচো, চাম উকুন এবং উড়ন্ত মাছির পথ ধরে ভয় ঢুকে পড়লো। অন্য ধরনের ভয়। যে মানুষটা এতকাল 'ভগবান ধুয়ে কি জল খাবো—খেতে দেবে কোন্‌ শালা' বলতো, সেই লোকটা এখন পড়ে-পাওয়া একটা মূর্তি হাতে ভূত দেখার মতো দাঁড়িয়ে ভগবানের ভয় টের পাচ্ছে। হাতের কাঁপুনি গেছে বেড়ে। শীত-শীত ভাব। আবার জ্বর এলো বোধ হয়। আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে নিজের ভেজা চুবড়িটির পাশে বসে পড়লো বুড়ো। ভয়ের চোটে ছেলেমানুষের মতো কেঁদেই ফেললো।

"কি হলো গো? কি হলো, দাদু—" বলে নানুও বসে পড়লো মুখোমুখি। নিজের হাত দুটি দিয়ে বুড়োর মালাইচাকি চেপে থাকলো আলতো ভাবে। খুঁটি ধ , যেন, ছুঁয়ে থাকা ভালো।

আসলে, নানু কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রথমে সামান্য অবাক হয়ে, পরে, একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। এখন, দু' হাতের চেটোর মধ্যে জোড়া মালাইচাকির কাঁপুনি ধরে থাকতে থাকতে সারা গায়ে ছোটো ছোটো ঢেউ খেলছে। আর এক ধরনের ভয়। তিন দিন বুড়োর জ্বর। পেটে নেই কিছু। মুখে নাকি সোয়াদ নেই। তার ওপরে, খাটুনি যেটুকু—সে তো গতর নাড়িয়েই। দাদু খুব বুড়ো হয়ে গেছে। পট করে এই কাদামাটির জমিতে যদি শুয়ে পড়ে চোখ উল্টে? নানুর তো আর কেউ নেই কিনা! চোখ খোলার পর থেকেই জগৎজুড়ে এই বুড়োমানুষটা। খিদে পেলে বুড়ো, ঘুম পেলে বুড়ো, ঘুমের মধ্যে ভয়

লেও—"ও দাদু! কাঁদছিস্ কেন? ভয় সের! —আমি তো রয়েছি—"

বলতে, বলতে নান্দুর বয়েস দ্বিগুণ হয়ে গেল। পাশে ফুলের মোড়কগুলোর দিকে য়ে আর এক লাফে একটা দুস্তাখনা টিয়ে ফেললো। বয়েস হয়েছে। চোখ জলে কী আর করা যাবে? ফুলের ভাবনা নেই।

হাত বাড়িয়ে রুপোর মূর্তিটা ছুঁয়ে বলে, "কাঁদিস নে! চ', বাড়ি যাই। ওটা দ আমাকে—বেচে আসি। দিন কয়েক শুয়ে শুয়ে আরাম করবি'খন।'

কান্না থামিয়ে, মুখ তুলে এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলো বুড়ো। এতক্ষণে এক চিলতে সাহসও ফিরে এসেছে বুকে। সেই সাহসী গলায় চাপা ধমক দিলো ছোঁড়াকে, "অ্যাই হাত দিবি না!"

নানু আবার অবাক।

বুড়ো বললে, এবার একটু শান্ত এবং নিশ্চিন্ত গলায়, "এ ঠাকুর বেচে দেওয়া হবে না। ঘরে দরমার বেড়ার গায়ে কাঠের পট্টি লাগিয়ে—তার ওপরে বসিয়ে দেবো। ফুল দেবো রোজ সকালে। বুঝলি?"

চল্লিশটে রুপোর টাকা দরমার বেড়ায় আটকে রাখা হবে শুনে, নানু প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলো না। হেসে ফেললো, "ক্ষ্যাপাস্নি দাদু!"

বুড়ো জবাব দিলো না। শরীরে বল ফিরে পেয়েছে। উঠে দাঁড়ালো গম্ভীর মুখে। আদেশের গলায় বললো, "গাড়ির টাইম হয়ে গেছে। যা'। জলে নাম আমি ওপরে যাচ্ছি।" বলে চোখ বুজে কপালে ঠেকালো মূর্তিটা।

নানু কোনো হনুমানের কাণ্ডকারখানা দেখছে যেন। ভাবছে গেল। আর বেশীদিন নেই বুড়োর। পেন্নাম-ফেন্নাম করে চল্লিশটে নগদ টাকা বেড়ায় আটকে রাখবে! আসলে বুড়ো ভয় পেয়েছে ভাবতে ভাবতে জলে লাফিয়ে পড়লো নানু। খুক-খুক হাসি পেটের ভেতরে পাক খাচ্ছে। হা-হা করে বেরিয়ে এলো। হাসতে হাসতে নানু খাঁড়ির ঘোলা, নোংরা জলও খেয়ে ফেললো খানিকটা। হাসি আর থামে না। ওর হাসির শব্দগুলি তিন চার গুণ হয়ে রেলপুলের নিচে ঘুরতে লাগলো। দাদুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

কপালে ঠেকিয়ে কোমরের গামছার সঙ্গে ভালো করে মা লক্ষ্মীকে বেঁধে ফেললো বুড়ো। ভাবলো কার ঘর পুড়িয়ে আমার ঘরে এলেন? কোন্ পাষণ্ড এমন বলভরসা পুজো করে জলে ফেলে দেয়? নিশ্চয়ই সে সংসারে বড় অশান্তি। কিংবা কেউ কেউ খুব আপনজন মারা-টারা গেছে। নইলে এমন মা' লক্ষ্মী কেউ ছুঁড়ে ফেলে দেয়! আমার ঘরে থেকো মা'। শেষ বয়েসে আমার এটুকু দেখো। আমি তোমায় কিছুতেই বেচবো না।

হাসির মধ্যে নানু দেখলো, দোতলায় উঠে যাচ্ছে দাদু। চার হাতে পায়ে হামা দিয়ে ঝোপঝাড় আঁকড়ে চুবড়ি সামলে উঠেও গেল।

নানুর কাছে গোটা ব্যাপারটাই কেমন ঠাট্টার মতো লাগছে। পুরোপুরি বিশ্বাসই করতে পারছে না আর একবার বুড়োকে জিগ্যেস করলে হয়। ভেবে একটু এগিয়ে পুলের নিচে চলে এলো। বুড়ো দুহাতে রোদ ঠেকিয়ে ইস্টিশানের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ চমকে কোমরে হাত বুলিয়ে রুপোর মালটা দেখে নিচ্ছে।

হাসি চেপেচুপে চেঁচিয়ে উঠলো নানু "দাদু-উ-উ! সত্যি সত্যিই বেচবি না নাকি?"

বুড়ো চোখ না নামিয়ে আপন মাথা নেড়ে জানালো, না। আনিয়ে কের কোমরে হাত বুইয়ে দেখলো।

বাদু কেমন পর পর হয়ে গেল হঠাৎ। মনে মনে রেগে উঠলো নানু। ভেবে রাখলো এবার চাম উকুন হলে আর বেছে দেবো না। শোবোও না তোর সঙ্গে, যা'।

নানু একলা হয়ে গেল।

আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন

অজন্তা পাবলিশার্স
৪/২ রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা ৯

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
পি ১৭ মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা ১৩

অক্সফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারী কোং
১৭ পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা ৭৩

অ্যালায়েড বুক এজেন্সি
১৮-এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

অ্যালায়েড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭২

আই এ বি বুকস্
৯/১ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

আনন্দ পাবলিশার্স
৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

আর্য সমাজ
১৯ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

ইউ. বি. এস. পাবলিশার্স ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
৮/১-বি চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা-১৬

ইণ্ডিয়া বুক হাউস
২০-এ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

এস. চাঁদ অ্যান্ড কোং লি.
২৮৫-জে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ লিঃ
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭২

কোয়ালিটি বুক কোং
৩১ লেনিন সরণি, কলিকাতা ১৩

চ্যাটার্জি পাবলিশিং কনসার্ন
৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

জিজ্ঞাসা
১-এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১১৯ লেনিন সরণি, কলিকাতা ১৩

জোনাকি
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

টাটা ম্যাকগ্রহীল পাবলিশিং কোং লিঃ
১২/৪ আসফ আলি রোড, নিউ দিল্লী ১

দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

দি ম্যাকমিলান কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
কলিকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ

নব ভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

পি এম বাক্‌চি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬

পুঁথিপত্র
৯ অ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা ৯

প্রেন্টিস হল অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ
এম-৯৭ কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী ১

প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭/এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

বিকাশ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৮/১-বি চৌরঙ্গী লেন, কলিকাতা ১৬

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

বেস্ট বুকস
১-এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

ব্ল্যাকি অ্যান্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ
২৮৫-জে বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ব্ল্যাকি (ইণ্ডিয়া) এমপ্লয়ীজ কোঅপারেটিভ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১০/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

ভারতী বুক স্টল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

মিনার্ভা অ্যাসোশিয়েটস্ (পাবলিকেশনস্) প্রাইভেট লিমিটেড
৭-বি লেক প্লেস, কলিকাতা ২৯

রূপা অ্যান্ড কোং
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

শংকরস্ বুক এজেন্সি
১/১ মেরিডিথ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭২

শরৎ বুক হাউস
১৮-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৯

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
২২ রাজা উডমণ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা ১

কলিকাতা পুস্তক মেলা উপলক্ষে অভিনন্দন—
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এ-৫ গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী ১১০০১৬

কবির চোখে কবি: বুদ্ধদেব বসু-রবীন্দ্রনাথ

সুতপা ভট্টাচার্য

তিন

তাই 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি'ই তাঁর আলোচনার বিষয় হয় 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬) গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে বাংলায় লেখা এইটিই তাঁর প্রথম ও শেষ গ্রন্থ, এ বিষয়ে তাঁর যাবতীয় ভাবনাকে সংহত করতে চেয়েছেন এখানে বুদ্ধদেব। তাঁর কাব্য-তত্ত্বের যে পরিচয় ইতিমধ্যে পেয়েছি আমরা, এখানেও তার ব্যত্যয় দেখি না, যেভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট কবিতা নির্দেশ করে দেন 'কবিতার সাত সিঁড়ি' অধ্যায়টিতে। কাহিনীমূলক কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'অভিসার', বর্ণনামূলক কবিতা 'নববর্ষা', অতিকথিত ভাবোচ্ছ্বাসের কবিতা 'বসুন্ধরা' এবং সংকেত রূপক কবিতা 'সোনার তরী'—এই পাঁচ-ধরনের কবিতার মধ্যে, তাঁর মতে বিধৃত 'সর্বজনীন রবীন্দ্রনাথ' (৫৯); অন্য দুটি কবিতা—'স্বপ্ন' ও 'অনাবশ্যক'—বিশুদ্ধ কবিতা, যে ধরনের কবিতা তাঁর মতে ১৮৯০—১৯১০-এর মধ্যেই শুধু সুলভ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের "গণাবগ্রহ থেকে কবিসত্তাকে" (৬০) বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস করেছেন বুদ্ধদেব। গ্রন্থের বাকি তিনটি অধ্যায়ে এই বিশেষ পর্যায়ের বিশুদ্ধ কবিতাগুলির "বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্র"টি (৬১) ধরিয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এর সমালোচনা-পন্থা কিন্তু তাঁর পূর্বতন পন্থার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কলাকৌশল নয়, কবিতা বিষয়ই এখানে আলোচ্য।* উপস্থাপনায় অভিনবত্ব আছে ঠিকই—"যেন একটি নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে, প্রেম, বিরহ ও পুনর্মিলনের নাটক, যাতে তিনি প্রথমে নায়ক পরে নায়িকা, আর যাতে প্রেমিক-প্রেমিকার অবিরল রূপান্তর ঘটছে। এই নাটকের নান্দীপাঠ 'সন্ধ্যা-সংগীত', যবনিকা উত্তোলন হলো 'মানসী'তে আর 'গীতাঞ্জলি'তে ঘটলো স্বপ্নের অবসান" (৬২), কিন্তু যখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"আর এই বানিতা ও কবিতা, এই মানসসুন্দরী ও বিদেশিনী—সব এক পুরুষ-দেবতার মধ্যে লীন হয়ে যাবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর নাম 'জীবন দেবতা'" (৬৩)—তখন বোঝা যায়, বক্তব্যের দিক থেকে অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর প্রভেদ সামান্যই। এবং তিনি স্বীকারও করেন সে কথা—"এই পরিবর্তন—যা আসলে বিবর্তন—তা কিছুকাল আগে অন্য এক সমালোচক লক্ষ্য করেছিলেন, আমি এই পথ ধরে আরো কিছুদূর এগোতে চাই।" (৬৪) দেখা যায়, 'জীবন দেবতা' ও 'অন্তর্যামী' কবিতা দুটি যে "রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্‌ভক্তির নিদর্শন" (৬৫) প্রচলিত এই মতকে একদা যে-বুদ্ধদেব 'ধ্যাবড়া মত' (৬৬) বলে মনে করেছিলেন, 'কবি-রবীন্দ্রনাথ'-এ তিনি নিজেই সেই মত দিয়ে দিলেন—"আমরা কি বলতে পারি না যে, 'জীবনদেবতা'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা, যাতে নাম উচ্চারণ না করেও একটি ছদ্মবেশ অবশিষ্ট রেখেও—নিজেকে তিনি ভগবানের ভক্ত হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন" (৬৭)। প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ পরিকল্পনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী সমালোচনা পাঠ প্রয়োজন মনে করেছিলেন বুদ্ধদেব তার দ্বারাই কি তিনি প্রভাবিত, না কি তাঁর বিশেষ কোনো মানস-প্রবণতায় রবীন্দ্রনাথ এভাবেই প্রতিভাত হলেন তখন? এ প্রশ্নের উত্তরের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হবো আমরা।

কবিতা বোঝবার নয়, তাই বোঝাবারও নয়—'কবিতার' যুগে এই ছিল তাঁর মত। কিন্তু 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এ বোঝাবারই

---

* "কলাকৌশলকেই কলাকৈবল্য ব'লে গ্রহণ ক'রে ইংলণ্ডের 'নব্বুই'-যুগের সমালোচনা" যে ভুলই করেছিল, বুদ্ধদেব তা উল্লেখ করেন ১৯৪৭-এ লেখা একটি প্রবন্ধে—'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' নামে তা 'সাহিত্য-চর্চা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত—যদিও তার অনেক পর পর্যন্ত কলাকৌশল প্রাধান্য পায় তাঁর নিজের লেখায়।

প্রয়াসী তিনি—'অনাবশ্যক'-এর বালিকা অথবা 'চিনি গো চিনি' গানের 'বিদেশিনী' যে প্রকৃতি, এবং 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'র রহস্যময়ী যে কবিতা—এসব যেন এখানে দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত, শুধুই ইঙ্গিতমাত্র নয়। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য পূর্বতন সমালোচকদের প্রচলিত পথটি ধরেন নি অবশ্য তিনি, কবিতার এক-একটি শব্দ ধরে তার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ ও অনুষঙ্গ বিচার করে অর্থের অন্বেষণ—তার মধ্য দিয়ে কবিতাকে বোঝবার প্রয়াস—যেমন, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির অর্থ-উন্মোচনের জন্য 'পশ্চিম' অথবা 'বিদেশিনী' শব্দের অভীষ্ট অর্থ অন্বেষণ করছেন তিনি—তার জন্য সাহায্য নিচ্ছেন কাছাকাছি সময়ের অন্যান্য কবিতায় শব্দ দুটির ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ থেকে। শব্দের সূত্র ধরেই বোঝাচ্ছেন একটি কবিতার সঙ্গে অন্য কবিতার সম্বন্ধ। সমালোচনার এই পদ্ধতিতে 'প্র্যাকটিকাল ক্রিটিসিজমে'র ধারাই পরিলক্ষিত হয়।

মূল বক্তব্যের পাশাপাশি, প্রায়শই বিশ্ব-সাহিত্য থেকে প্রসঙ্গের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় এ গ্রন্থের আলোচনায়। যেভাবে তিনি কাফ্‌কার 'দি ট্রায়াল' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন 'অনাবশ্যক' কবিতাটির সূত্রে, অথবা এনেছেন কীট্‌স-এর 'লা-বেল দাম সাঁস মের্সি' কবিতাটির প্রসঙ্গ 'সিন্ধু-পারে'র সূত্রে—তা কবিতার উন্মোচনে বিশেষ সাহায্য করে না, সমালোচকের সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে মাত্র। পদ্ধতি হিসাবে তুলনামূলক আলোচনার দৃষ্টান্তও অবশ্য বিরল নয়, যেমন কোলরিজ-এর 'কুবলাই খান' ও 'স্বপ্ন' কবিতাটির তুলনা, অথবা উপমা-বিন্যাসের দিক থেকে শেলির 'স্কাইলার্ক'-এর সঙ্গে 'নববর্ষা' কবিতাটির তুলনা। এদিক থেকে মূল্যবান ও বিস্তারিত একটি আলোচনা স্থান পেয়েছে পাদটীকায়—শেলির 'এপিসাইকিডিয়ন'-এর সঙ্গে 'মানস-সুন্দরী'র সাদৃশ্য-নির্ণয়। পাদটীকার অন্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা হলো ফ্রানৎস কাফ্‌কা ও রবীন্দ্রনাথ—দুই 'অপেক্ষারত' লেখকের তুলনা।

কিন্তু শেষ অধ্যায়টিতে, 'গীতাঞ্জলি'র আলোচনায় সমালোচনার এ সব পদ্ধতি যেন অন্তর্হিত, বিশুদ্ধ কবিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'গীতাঞ্জলি'র উল্লেখ করেছেন তিনি বার বার, কিন্তু আলোচনা এই প্রথম। বোঝাবার প্রয়াস নেই, আছে শুধু ইঙ্গিত : রূপকল্পের পরিচয় বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রূপকল্পের উপর স্বতন্ত্র গুরুত্ব আরোপিত হয় নি, আধার এবং আধেয় একটি সম্পূর্ণতায় বিধৃত—এই আলোচনায় ; শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করছেন এখানেও, কিন্ত বিশ্লেষণ নয়, সংশ্লেষণের অভিপ্রায়ে। তাই, "সে যে আসে, আসে, আসে"—এই পংক্তিতে তিনি দেখেন—"আসে

সে শব্দই জয়ধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়ছে" : কিংবা "আছে আমার হৃদয় আছে ভরে"—এই পংক্তি সম্বন্ধে বলতে পেরেন—"এখানে কবি যে 'আছে' বলছেন, সেই তির্যক ভঙ্গিতেই অপেক্ষার অবস্থা সূচিত হলো।" (৬৮)

"সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা" রবীন্দ্রনাথের এই যে প্রত্যয় তিনি উদ্ধৃত করেছেন 'কালের পুতুল' প্রবন্ধে—যা তাঁর সমালোচনার আদর্শ—সেই আদর্শ রূপ পেয়েছে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এ, বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি' আলোচনায়—ভালোবাসার আবেগ সেখানে এমনভাবে সঞ্চারিত, এবং পাঠককেও এমনভাবে সংক্রামিত করে তা—বাংলা সাহিত্যে যার তুলনা বিরল। তবু প্রশ্ন জাগে, 'গীতাঞ্জলি'তেই শেষ কেন আলোচনা? "'গীতাঞ্জলি' যে কাব্য হিসাবেই মহৎ এ কথা যাঁরা মানতেন তাঁরা উল্লসিত বিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগলেন কবি-প্রতিভার নব-নব আভার বিচ্ছুরণ" (৬৯)—তাঁর 'সব পেয়েছির দেশে' গ্রন্থে বুদ্ধদেব ১৯৪১ সালে এই মন্তব্য করেছিলেন, তারপরে তিনিই আবার রবীন্দ্র-কাব্যের পরবর্তী সমস্ত পর্যায় নাকচ করলেন কেন? 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এর আলোচনার গোড়ার দিকে কী কী পাওয়া যায় না রবীন্দ্রনাথে তার যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন বুদ্ধদেব, সেও সমান বিস্ময়কর : "নিষ্করুণ বা কঠিন হওয়া তাঁর স্বভাবে নেই।...কোনো রুগ্ন গোলাপ, মৃত মানুষের চক্ষু দ্বারা গঠিত কোনো মুক্তো, কোনো মকরদীর্ণ সমুদ্র বা কবরের মতো বাসরশয্যা—এই সমস্তই তাঁর জগতের বহির্ভূত ;...তাঁর কবিতায় চলতিকালের জীবন অথবা কথ্য ভাষার আস্বাদ নেই। তাঁর কাব্যের সমগ্র পটভূমি মধ্যযুগ ও পুরাকাল থেকে সংগৃহীত...তিনি আক্রান্ত হননি আধুনিক নাগরিক জীবনের কোনো চরিত্রলক্ষণে" (৭০)। এই তালিকা দেখে সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথকে যেন অনাধুনিকই বলতে চান বুদ্ধদেব। তাই, জেনে নেওয়া প্রয়োজন আধুনিকতার সূত্রে কখন কীভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করেন তিনে।

চার

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে রচিত যাবতীয় প্রবন্ধাবলিতে কোথাও বুদ্ধদেব আধুনিকতার মূল্যবোধ উপস্থাপিত করেন নি, প্রগতির পাতার বাল্য উত্তেজনা ব্যতীত। যে 'আধুনিক সাহিত্যের' স্পষ্ট লক্ষণ রবীন্দ্র-বিমুখতা যার সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়িয়েছিলেন 'প্রগতি'র কালে—তার জের কেটেছিলো যে অচিরেই 'কবিতা'র রচনাগুলি তার প্রমাণ। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনটি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় (১৯৪০) তখন সম্পাদক হিসাবে বুদ্ধদেবের নাম ছিলো না, কিন্তু সংকলন কাজে তাঁরই ছিলো প্রধান ভূমিকা, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানাচ্ছেন তিনি—"প্রসঙ্গ বা আঙ্গিকের দিক থেকে যে-সব কবিতা আধুনিক, শুধু তাই থেকেই এ সংকলন করা হয়েছে" (৭১) এবং এও জানিয়েছেন যে এ বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই "প্রথম প্রধান" (৭২)। রবীন্দ্রনাথকে যে আধুনিক বলেই মনে করেন তাঁরা এর থেকে তা স্পষ্ট হয়। বইটির পরবর্তী সংস্করণে (১৯৫৪) বুদ্ধদেব বসু নিজে যেখানে সম্পাদক, ভূমিকায় লিখছেন তিনি "—'মানসী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত এক জন্ম শেষ করে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনার ধারা আমাদের সাম্প্রতিক কাব্যে নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে" (৭৩)। এই ভূমিকাতে অবশ্য আধুনিকতার মূল্যবোধ কী—সে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই। কিন্ত তাঁর অন্য কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে, যেগুলির নামের মধ্যে 'আধুনিক' শব্দটি প্রত্যক্ষ চিনে নেওয়া যায় তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিকতার স্বরূপ, এবং দেখা যায় প্রতি প্রবন্ধতেই আধুনিক-

তার নজির হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

'আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি', 'সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ' এবং 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা'—এমনি তিনটি প্রবন্ধ। প্রকৃতি বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে "রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতাকে পৃথক করে নেয়া" (৭৪) সহজ মনে করেন, বুদ্ধদেব, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পাখিরে দিয়েছো গান...' কবিতাটি উল্লেখ করা হয়েছে আধুনিক কবিতার নজির হিসেবেই। প্রকৃতির সঙ্গে চৈতন্যের, অথবা "প্রাণ ও মনের এই দ্বন্দ্ব" (৭৫)—টমাস মানএ যার বিশ্লেষণ পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব 'অনাবশ্যক' কবিতাটি তাই দিয়েই ব্যাখ্যা করেন তিনি—"যেহেতু মানুষ একমাত্র চেতন জীব, তাই এই বিশ্বে সে প্রক্ষিপ্ত, বিশ্ব-বিধানে তার মানবিক জ্ঞান বা মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই, অথচ জগৎটাকে তার চেতনার দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টাও সে ছাড়তে পারে না। এই যে দ্বন্দ্ব, যা মানব-জীবনে মৌলিক ও অনতিক্রম্য 'অনাবশ্যক'এর নিগূঢ় সংলাপে তারই বেদনা উদ্‌ঘাটিত হলো" (৭৬)—এই ব্যাখ্যা হয়তো সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অন্তত বুদ্ধদেব-এর কাছে 'অনাবশ্যক' রোমাণ্টিক কবিতা নয়, আধুনিক কবিতা। চৈতন্যের সঙ্গে প্রকৃতির এই বিরোধ উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে "সবচেয়ে তীব্রভাবে উপলব্ধি ও উচ্চারণ করেন বোদলেয়ার এবং তিনিই আধুনিক কবিতার জনক" (৭৭)—'আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি' প্রবন্ধে এই মন্তব্য করেন বুদ্ধদেব এবং 'শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে একাধিকবার বোদলেয়ারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও আলোচনা করেন। বস্তুত এ প্রবন্ধে অনেকখানি জায়গা জোড়ে রবীন্দ্র-কাব্য, পরে যার কিছু কিছু অঙ্গীভূত হয়েছে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এ। 'সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ' প্রবন্ধটিতেও আধুনিক যুগের কবিতার নজির হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপস্থাপন করেন দেখতে পাই।

এসব সত্ত্বেও আধুনিকতার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট অভিমত দিতে দ্বিধা ছিল হয়তো বুদ্ধদেবের। এর একটি স্পষ্ট নিদর্শন উল্লেখ করা যায়। 'অমিয় চক্রবর্তী : পালাবদল' প্রবন্ধটি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে, অমিয় চক্রবর্তীকে 'রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী' বলে নিয়ে কোথায় তিনি আধুনিক, এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে কোথায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য—সে প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব লেখেন—"প্রথমে বলবো যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্যায়ে আধুনিক কবি, দ্বিতীয়ত, এ-দুজনের জগৎ মূলত এক হলেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই—কোনো আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়" (৭৮)—এখানে স্ব-বিরোধিতা খুব স্পষ্ট। প্রবন্ধটি যখন 'কালের পুতুল' গ্রন্থে ধৃত হয় ১৯৫৮-র সংস্করণে, তখন 'প্রথমে বলবো যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্যায়ে আধুনিক কবি' অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। তবু, ছাপার অক্ষরে কখনো যে এমন স্ব-বিরোধিতা ঘটতে

পারলো—তার থেকে এ বিষয়ে তাঁর মানস-দ্বন্দ্বই প্রতীত হয়।

আবার এও আমরা দেখেছি, বুদ্ধদেবের কাছে আধুনিকতা ও রোমান্টিকতা সব সময়ে দুটি বিরোধী মূল্যবোধও নয়, 'সমগ্র আধুনিক কবিতাই রোমান্টিক' (৭৯) বোদলেয়ার প্রসঙ্গে এমন উক্তিও করেন তিনি, এ বিষয়ে আলোচনাও করেন, এবং বোদলেয়র ও রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের যে খোঁজ করেন সেও কেবলমাত্র এক রোমান্টিক আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে। কবিতায় যাত্রা অথবা ভ্রমণ, গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব, অথবা মৃত্যুবোধ—ইত্যাদি রোমান্টিক, তথা আধ্যাত্মিক ভাবধারা এই দুই কবির কাব্যে কীভাবে রূপায়িত—তাই তাঁর আলোচনার বিষয়, সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতার নাম করেন তিনি, কিংবা উদ্ধৃতি দেন, তা সবই 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যায়ের এবং বিশেষভাবে 'গীতাঞ্জলি'রই। আধুনিক কালের আরেক কবি রিলকে, জর্মান থেকে বাংলায় যাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব; তাঁর কবিতা-প্রসঙ্গেও 'গীতাঞ্জলি'র উল্লেখ—"যেমন রবীন্দ্রনাথে আমরা প্রধানত পাই—মিলনের মুহূর্ত নয়, ভগবানের আসন্নতার অনুভূতি, তেমনি রিলকের ভগবানও, অনেক কবিতায় তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি সত্ত্বেও, প্রকৃতপক্ষে ভাবীকালে প্রচ্ছন্ন, সম্ভাব্য ও জায়মান, এমনকি কখনো-কখনো মানুষের হাতে নির্মীয়মাণ।...গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের মতোই 'প্রহর-পুঁথি'র রিলকে রূপমুগ্ধ ও পার্থিবের প্রেমিক, তাঁর ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই সহস্ররূপে আবির্ভূত।" (৮০)

মানসিক যে প্রবণতায় বুদ্ধদেব অনুবাদের জন্য বেছে নেন বোদলেয়ার, রিলকে অথবা হোলডেরলিন-এর মতো কবিদের যাঁদের কবিতা আধ্যাত্মিক চেতনায় ভাস্বর, সে প্রবণতাতেই হয়তো গীতাঞ্জলি পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যই কেবলমাত্র গ্রাহ্য তাঁর কাছে। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখে আধুনিক নন মোটেই, কবিতা পত্রিকাতেই তাঁর এই মত বিশদভাবে প্রকাশ পেয়েছে—"...এই আনন্দ কিসের? সে কি শুধুই ব্রহ্ম স্বাদ, শুধু মায়ার কারাগারে ধ্রুব সত্যের উন্মোচন? না, আনন্দ এই জীবনেও, এই মর্তজীবনে, মৃত্যুকবলিত এই শরীরে, ইন্দ্রধনুতুল্য এই পৃথিবীতে। এই কথা বস্তুতই জগৎবাসীকে শোনাবার যোগ্য, কেন না এই বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তির প্রস্তাব, প্রচলিত ধর্মমতের যা বিরোধী, মানুষের পীড়িত আত্মার মূল্যবান শুশ্রূষা এখানে নিহিত। এই পার্থিব জীবন, যে-সব জটিল বিধানের মধ্যে জীবের জন্ম, যার মধ্যে বাঁচতে এবং মরতে সে বাধ্য, সেটা যে ভগবানের উপলব্ধির অন্তরায় নয়, সেটাও উপায়, এই প্রয়োজনীয় চেতনা রবীন্দ্রনাথে যেমন ভাস্বর, তেমন আর কোন আধুনিক

কবিতে?" (৮১) উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলো, কিন্তু আধুনিক কবিতাতেও বুদ্ধদেব যে আধ্যাত্ম[illegible]সন্ধান করেন, [illegible] বুঝে [illegible]রট.কুই প্রয়োজন[illegible]

'গতিস্থলি' পর্বে 'রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের অনুৎসাহের এভাবে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখা উচিত 'কবিতা'র প্রথম আলোচনাগুলিতে শেষ পর্বের কবিতার চিন্তা-প্রাধান্য বিষয়ে সমালোচনা থাকলেও তাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট। বিশেষত শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থ স[illegible] উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ব্যক্ত [illegible] 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ'-এই প্রথম শোনা গেল তাঁর পরবর্তী মত, এবং বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার অল্প কিছুকাল পরে। 'কবিতা'র পাতায় বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদগুলি ১৯৫৫ থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। বলা যায় এ সময় থেকে [illegible] রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মনোভঙ্গী পরিবর্তিত হয়। সামগ্রিকভাবে এ মনোভঙ্গীর বিবিধ পরিবর্তনগুলির কারণ বুঝতে গেলে শুধু সমালোচনই যথেষ্ট নয়, দেখে নিতে হবে বুদ্ধদেবের কবিতার জগৎ, কবিতার ভিতর দিয়ে কীভাবে কবি দেখছেন [illegible], কারণ কোনো কবি যখন কবিতার সমালোচনা করেন, তখন ভিতরে ভিতরে তাঁর নিজের সৃষ্টিভাবনার সঙ্গে তার যোগ থাকেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গ্রন্থপঞ্জী

এই গ্রন্থ-পঞ্জীতে যে যে স্থানে লেখকের নামের উল্লেখ নেই, সেখানে বুদ্ধদেব বসুই লেখক। যেহেতু প্রধানত তাঁর রচনাই এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত, তাই পুনরুক্তি এড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থা।

৫৯। "কবি রবীন্দ্রনাথ", ১৯৬৬, পৃ ২১
৬০। তদেব, পৃ ৩৬
৬১। তদেব, পৃ ১১
৬২। তদেব, পৃ ৩১
৬৩, ৬৪। তদেব, পৃ ৫৭
৬৫, ৬৬। রবীন্দ্র রচনাবলী (৪র্থ খণ্ডের আলোচনা), "কবিতা", পৃ ১৮
৬৭। "কবি রবীন্দ্রনাথ", পৃ ৬৪
৬৮। তদেব, পৃ ৮৮
৬৯। "সব পেয়েছির দেশে", ১৯৪১, পৃ ৯৯
৭০। "কবি রবীন্দ্রনাথ", পৃ ৩২
৭১, ৭২। বুদ্ধদেব বসুর চিঠি: রবীন্দ্রনাথকে, "দেশ", সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১ পৃ ২৯
৭৩। ভূমিকা, "আধুনিক বাংলা কবিতা", ১৯৭৩, পৃ ৯
৭৪, ৭৫। "আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি", "সঙ্গ নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ", পৃ ৩৩
৭৬। "কবি রবীন্দ্রনাথ", পৃ ২৮
৭৭। তদেব, পৃ ৩৩
৭৮। তদেব, পৃ ১৫৪
৭৯। শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা, "প্রবন্ধ সংকলন", ১৯৬৬, পৃ ২১৫
৮০। ভূমিকা, "রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা", ১৯৭০, পৃ ২৩
৮১। ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ (মার্জরী সাইকস-এর অনূদিত "collected Poems and Plays by Rabindra Nath Tagore" গ্রন্থটির আলোচনা), কবিতা ১৩৫৭ আষাঢ়, পৃ ১৬৬—১৬৭

সাহিত্য প্রসঙ্গ

পুস্তক সংবাদ

আমাদের বাংলা ভাষায় প্রতি বছর বই কিছু কম ছাপা হয় না। উপন্যাস, গল্প-গ্রন্থ, কবিতা—এই ধরনের বই বাদেও ছাপা হয় প্রবন্ধ, ভ্রমণ, ধর্মগ্রন্থ, শিশুসাহিত্য গবেষণা, বিজ্ঞান। বিবিধ বিষয়ক বইও আছে। আমাদের ভাষা আঞ্চলিক, পাঠক-সংখ্যাও পরিমিত। ইদানীং ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চয় ঘটেছে, পাঠকসংখ্যাও বেড়েছে; তবু বই প্রকাশের ব্যাপারে আমরা তেমন কিছু পিছিয়ে নেই। শুনেছি, আমাদের স্থান তৃতীয় কিংবা চতুর্থ, প্রকাশনা-ব্যবসায়।

যে-ভাষায় সারা বছর এত বই প্রকাশ পায়, সেই ভাষায় কিন্তু এমন কোনো পত্রিকা ছাপা হয় না যার মধ্যে আমরা নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের মোটামুটি একটা আন্দাজ পেতে পারি। অর্থাৎ বিদেশে যে-ধরনের দ্বি-মাসিক বা ত্রৈমাসিক পাবলিকেসান রিভিয়ু ছাপার প্রচলন আছে, এখানে সেরকম কিছু নেই। বিদেশে অনেক জায়গায় হয় প্রকাশক সমিতির পক্ষ থেকে নয়ত স্বাধীনভাবেই পাঠক ও গবেষকদের সাহায্যের জন্যে রিভিয়ু ছাপার ব্যবস্থা হয়। একটি রিভিয়ু হাতে থাকলে সর্বপ্রকার প্রকাশিত গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়। এমন কি কোনো কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের—সে উপন্যাস, কবিতাই হোক কিংবা বিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের। গ্রন্থটির বিস্তারিত পরিচয়ও মিলে যায়। কোনো পত্রিকা আরও কিছুটা সুবিধে করে দেন। যেমন সমালোচনা ছাপেন লেখকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের বিবরণ দেন, ছবি ছাপেন নতুন লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেন, বিজ্ঞানীদের গবেষণার কথা বলেন—এই রকম আরও কত কি। শিল্পী গায়ক এঁদের খবরও পাওয়া যায়।

জনৈক প্রকাশককে আমি একবার এই ধরনের একটি পত্রিকার কথা বলেছিলাম। তিনি জবাবে বললেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ কে তাড়াবে, মশাই। এমনিতেই বিজ্ঞাপন দিতে দিতে মরছি, বই ছাপার যা খরচ আজকাল সেই খরচ জুগিয়েই অবস্থা কাহিল, তার ওপর ওসব বাড়তি খরচা কে করে।

আজকাল বই ছাপার খরচ সত্যিই বেশী। বিজ্ঞাপনের খরচও আছে। কিন্তু এ-কথা আমরা ভেবে দেখব যে, যদি তিন মাস অন্তরও একটি করে রিভিয়ু-গোছের পত্রিকা বেরোয় তাতে কি প্রকাশকরা সত্যিই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। প্রথম প্রথম হতে পারেন; পরে বোধ করি হবেন না।

এই ধরনের পত্রিকা আমাদের বাংলা ভাষায় কখনো ছাপা হয়েছে কিনা জানি না। তবে একসময় সিগনেট প্রেস যে 'টুকরো কথা' বার করতেন তার জনপ্রিয়তা আমাদের অজানা নয়। 'টুকরো কথার' পাঠ্য-মূল্যও কম ছিল না। সিগনেট প্রেসের পর আমার তো আর মনে পড়ে না ওই ধরনের কিছু দেখেছি।

'টুকরো কথা' অবশ্য আমি যা বলার চেষ্টা করছি সেই ধরনের কিছু ছিল না। তবু ওর একটি মূল্য ছিল।

যদি কেউ ত্রৈমাসিক পুস্তক সংবাদ গোছের কিছু ছাপেন তাতে কী কী লাভ হতে পারে আমরা তা ভেবে দেখতে পারি। প্রথমত, পুস্তক প্রকাশের একটি যথার্থ হিসেব পাব। জানতে পারব, কোন ধরনের বই সংখ্যায় কতগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশকরা কী ধরনের বই ছাপার দিকে নজর বেশী দিচ্ছেন এবং সাধারণভাবে লেখকরাও কোন দিকে ঝুঁকেছেন। তা ছাড়া বিজ্ঞান, গবেষণা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে

কোন কোন বই নতুন প্রকাশিত হল তাও জানা সহজ হবে।

এই ধরনের পত্রিকার বিশেষ চাহিদা থাকবে লাইব্রেরীতে। বই কেনার সময় খুব কাজ দেবে। কিছু পাঠকও এতে লাভবান হবেন। অন্তত যাঁরা বিশেষ ধরনের গ্রন্থের খোঁজ করেন তাঁরা।

প্রকাশক সমিতি কেন এমন একটি পত্রিকা ছাপেন না বলা মুশকিল। যদি এমন হয়—কয়েকজন প্রকাশক মিলে অর্থ ব্যয় করে পত্রিকাটি ছাপেন তবে খুব কি একটা লোকসানের ভয় আছে!

আমার এই প্রস্তাবটির বিরুধে নিশ্চয় কিছু কথা উঠবে। যেমন কেউ কেউ বলবেন, প্রতিটি প্রকাশকই নিজের প্রকাশিত গ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগবেন। আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু চলতি কাগজপত্রের বিজ্ঞাপনেও তো তেমন চেষ্টা প্রকাশকরা করে থাকেন। কাজেই ওটা বিজ্ঞাপন হিসাবেই গ্রাহ্য হবে। সমালোচনা না থাকাই ভাল। এই পত্রিকার পক্ষে আমাদের এখানে ওটি সুবিধের হবে না।

অভিনন্দ

এই কলকাতায়

একটি ঘনবুনট সাংস্কৃতিক নক্‌শা

বহু বিচিত্র এই কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। শুধু কি নাচগান, সাহিত্য অথবা নাটকের সোনালী অনুষ্ঠানের আসর বসে এখানে প্রতিমাসে, আর কিছু নয়? ঘুরে বেড়ান মহানগরের পথে পথে, চোখ কান খুলে রাখুন, চোখে পড়বে, অবশ্যই চোখে পড়বে আপনার নানা রংয়ের সব অনুষ্ঠান আর উৎসব। কোনটি বা ভাবগম্ভীর, কোনটি আবার শুধুই হাসিখুশীর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের কথাই ধরুন। এই তো সেদিন ওখানে উপাচার্য উদ্বোধন করলেন ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন স্মৃতি-গ্রন্থাগারের। ডেভিড ম্যাকক্কাচ্চন ইংলণ্ড থেকে এদেশে পড়তে এসে গভীরভাবে প্রেমে পড়ে যান পোড়ামাটির মন্দির শিল্পের। স্বল্প যা উপার্জন করতেন তাই সম্বল করে ঘুরে বেড়াতেন ভারতের গ্রামে গ্রামে। উনি আবিষ্কার করেছেন কত না অবহেলিত পুরাকীর্তি আর লুপ্তপ্রায়, ভগ্ন পোড়ামাটির অসাধারণ সব মন্দির। ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে অল্প অল্প করে তিনি গড়ে তুলেছেন দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থের অমূল্য এক সংগ্রহ। হঠাৎ মারা গেলেন তিনি। মারা যাবার আগে যে বিভাগে তিনি পড়াতেন সেখানে দিয়ে গেলেন তাঁর বইগুলি। ভারতের ইতিহাস ও শিল্পকলা বিষয়ে অনুরাগী গবেষকদের কাজে লাগবে এই সব বই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যথোপযুক্ত পরিবেশে স্মরণ করা হলো ডেভিডকে। বাইরের রাজপথে তখন যানবাহনের ভিড়, আপন কাজে ব্যস্ত মানুষেরা চলেছে দল বেঁধে। শান্ত গম্ভীর পরিবেশে ওদিকে তখন ডেভিডের বিষয়ে কথা বলছেন কতিপয় ভালোবাসার মানুষ। গ্রামের নির্জন পথঘাটের পাশে উপেক্ষিত চারুশিল্পের অবস্থিতির মতোই মহানগর কলকাতার ব্যস্ত উদাসীন জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে তুলনা করে দেখুন এই অনুষ্ঠানের রূপকল্পকে। আত্মীয় বিয়োগব্যথার যন্ত্রণা অনুভব করবেন বুকে। ১২ই জানুয়ারীর সেই তারিখটিতেই আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজে আঁদ্রে মালরো বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন ফাদার ফাঁলো। ফরাসী দেশের এক সময়ের সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো ছিলেন বহু মাথার মানুষ। শিল্প সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় ছিলো তাঁর অবাধ যাতায়াত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় জগৎসংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে পুঁথিচর্চায় কালাতিপাত করেন নি তিনি। নিগৃহীত মানুষদের সাহায্য করার ঐকান্তিক অভিপ্রায় নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এদেশে। এই তো কিছুদিন আগে তিনি মারা গেলেন। কলকাতা যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করল তাঁকে।

বরণীয় যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের ভোলে না কলকাতা। তাঁরা দেশী বা বিদেশী যাই হোন না কেন, কলকাতার উদার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায় তাঁদের আসন। আবার শুধু অতীতচর্চাই নয়, কলকাতার বুকেই বসে শিশুদের হাজার অনুষ্ঠানের আসর। বিজয়গড়ের জাগ্রত খেল্যাঘর শিশুমেলা মুখোশে অভিনয় করল নৃত্যনাট্য 'জয়যাত্রা'। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নতুন শক্তি পেলো শিশুদের হাতে। আবার আরেক দল শিশুই জওহর শিশুভবনে বসালো বিজ্ঞানের আসর। শিশু বিজ্ঞানীরা তৈরী করেছে নানা মডেল, আবিষ্কারের নেশায় পেয়েছে তাদের। কেউবা তৈরি করেছে নতুন মডেলের উড়োজাহাজ। এই জাহাজে চেপে অনেক দূরে উড়ে যাবার স্বপ্ন তারা এখন থেকেই মনের ভিতরে লালন করছে।

মুখোশ আর মডেল থেকে সরে আসুন মানুষের মুখে। দেখুন চৌরঙ্গীর চলমান

চলমান শিল্পের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উৎসব। জামায় ছবি আঁকছেন শিল্পী। মুখোশ এঁটে ছবি আঁকা লক্ষ্য করছেন কাঁরা।
ফটো—মনোজিৎ মিত্র

শিল্পের আসরে অত্যাশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানায় পথ-চলা মানুষের মুখ কী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিল্পী অসিত পাল প্রতিষ্ঠিত পথিপার্শ্বের গ্যালারিতে প্রতি শনি ও রবিবার বসে গল্প-কবিতা-ছবি ও নাটকের আসর। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সেদিন এই গ্যালারির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। শিল্পীরা মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ালেন সাধারণ জনতার মাঝে। মানুষের ভিড়ে মানুষ তো ওঁদের চিনতে পারে না, তাই বুঝি মুখোশের চালাও ব্যবস্থা! মুখোশ ওঁরা খুলেছিলেন এবং পরছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক গ্যালারি ও পত্রপত্রিকার বেড়াজাল ছিঁড়ে শিল্প ও সাহিত্যকে তাঁরা সরাসরি এনে বসাতে চান সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। খোলা আকাশের নিচে পাতাল রেল কর্তৃপক্ষের গুদামের রেলিংয়ে যে ছবিগুলো ঝুলছে তাতে শিল্পীর স্বাক্ষর দেখে চমকে উঠবেন না। সত্যিই ওগুলো সুনীলমাধব, রথীন মৈত্র ও পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা। কিন্তু হয়ত চমকে উঠবেন আধুনিক কবিতার আবৃত্তি শুনে। বাইফোকাল চশমার নিচে আধবোজা রাতকানা চোখ নিয়ে এক কবি উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত কবিতা পড়ছেন। কবিতার নাম 'মহিলা অ্যারিস্টটল'। কবি পড়ছেন—ইয়াচিং ইয়াচিং—তোমার নাভিজল ইস্পাতের গাড়িদের রেখা।/র‍্যাকেটটি যেন নীল লির্জার্ডের মতো হাওয়ায় জলতরঙ্গ তুলেছে!—মুথামুণ্ডু কী যে এর মানে ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছেন না আপনি। কে এই ইয়াচিং? তার সঙ্গে মহিলা অ্যারিস্টটলের সম্পর্কই বা কী! সভয়ে কবির দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি তুমি লিখেছো? কি নাম ভাই তোমার?—ছটফটে কিশোর কবি কবিতা পড়ার সুরে উত্তর দিল—রঞ্জন পুরকায়স্থ। কবির এক কবিবন্ধু তখন তার মুখের সামনে মেলে ধরেছে সাদা এক মোমবাতির আলো। সেই আলোয় পকেট হাতড়ে কবি আরো পাণ্ডুলিপি বের করছেন দেখে আপনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন অন্য দিকে। সংস্কৃতিপ্রেমী আপনি। সংস্কৃতি আপনার রক্তে। তার উঁচু চাপ এখনো আপনাকে বিব্রত করে নি। পায়ে পায়ে এগিয়ে দেখলেন বঙ্গসংস্কৃতির বিশাল মণ্ডপ আর উৎসব প্রাঙ্গণে। মাত্র তিরিশ পয়সার টিকিট কেটে অনায়াসে আপনি ঢুকে গেলেন স্বর্গের বাগানে।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের স্বাবিংশতিতম অধিবেশন শেষ হলো মাত্র এই কয়েকদিন আগে। নির্ধারিত সময়সূচী ছাড়িয়ে আরও কয়েকদিন মেলা ও মূল মণ্ডপের অনুষ্ঠানাদিকে প্রলম্বিত করা হয়েছিলো, বোধ করি জনগণের অনুরোধেই। এ একটা সম্মেলন যা আজ বাঙালীর জাতীয় সম্মেলনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবারের অধিবেশনে বাংলার বহুমুখী সংস্কৃতির রূপরেখাটি সর্বাঙ্গীণভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরাই সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। তাঁরা যে সফল হয়েছেন তার প্রমাণ সম্মেলনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। শুধু কি বাঙালীরাই আজ আকৃষ্ট হন এই সম্মেলনের প্রতি? ভিন্ন ভাষাভাষী বহু ভারতীয়কে আমি প্রতিদিনই মেলায় ইতিউতি ঘুরতে দেখেছি। ছিলেন শ্বেতচর্ম সাহেবরা। স্থানীয় না বিদেশ থেকে আগত বুঝতে পারিনি। এটুকু বুঝেছি যে তাঁদের কৌতূহল ও মেলার মাঠে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ আমাদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিলো না।

বইমেলায় সব চেয়ে বেশী বিক্রী হয়েছে উপন্যাস। তার পর বিশেষ কয়েকজন কবির কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধপুস্তক। দুয়েকজন ঔপ-

ন্যাসিক কবির জনপ্রিয়তা দেখলাম খ্যে সিনেমাস্টারের মতো! কোনো কোনো পাব-লিশার এ'দেরই ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের স্টলে। সফল বাণিজ্যের আশায়। ক্রেতার মনস্তত্ত্ব তাঁরা ভালোই বোঝেন। লেখকের স্বাক্ষরিত বই কেনার শোরগোল উঠেছিল সেদিন। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার-গণ ও কণ্ঠস্বর কবিগোষ্ঠী দুটি স্টল নিয়ে-ছিলেন বইমেলায়। প্রথমোক্তদের স্টলে প্রখ্যাত এক লেখককে অটোগ্রাফ দিতে দেখা গেল একদিন। পাশেই ছিলেন নবীন এক গল্পকার। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বাক্ষরশিকারীকে তিনি বললেন—আজ আমার সই নিচ্ছেন না, কিন্তু খুব শিগ্-গিরই একদিন আসতে হবে আমার কাছে। কবিসেনারা পোস্টার দিয়েছিলেন কণ্ঠস্বর পত্রিকার স্টলে—গতানুগতিক কবিতা-মুখের ভূগোল পাল্টে দিন! কা'দের উদ্দেশে এই আহ্বান বোঝা গেল না! এই স্টলে বসেছিলো মৌখিক ছড়ার আসর! মান সাঙ্কের মতো ব্যাপার অনেকটা। কবিরা পোস্টার দিয়েছিলেন—রেডিমেড ছড়া—২৫ পঃ, কড়াপাকের ছড়া—৪০ পঃ, মিঠে পাকের ছড়া ৩০ পঃ, ছড়া ও ছবি ৫০ পঃ। 'উন্ডিয়া প্রকল্পনা'র কবিতা সম্বলিত এক টাকা দামের পকেট ডায়েরি এই স্টল থেকে গরম তেলেভাজার মতোই বিক্রী হয়েছিলো। কবিতার বইয়ের পাশাপাশি স্টলে ছিলো ফুলের বাগান, চাষবাস বিষয়ক বই। সত্যি!

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মেলায় পুরুলিয়ার কলানিকেতনের পুতুল প্রদর্শনী। পুতুলের পাশে আসল মানুষ
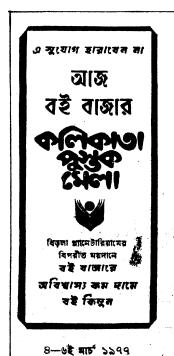
কবি ছাড়া কবিতার তুমুল ডামাডোলের বা তুলকালাম কান্ড কারখানা ছাড়া যেন আজ বঙ্গসংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না!

ডামাডোল হয়েছিল মূল মণ্ডপে, যে-দিন কমলকুমার মজুমদারের প্রযোজনায় 'দানসা ফকির' নামে অসাধারণ আষাঢ়ে পালাটি মঞ্চস্থ হয়। 'মঞ্চস্থ হয়' বলা ঠিক হবে না। কিছু দর্শক নাটকের সূক্ষ্ম হাস্য-রস ও অভিনেতাদের ম্যারিওনেট সুলভ অঙ্গভঙ্গির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধা-বনে ব্যর্থ হয়ে তারস্বরে চীৎকার করতে থাকেন—যার ফলে নাটকের অভিনয় ভণ্ডুল হয়ে যায়। বাংলা নাটকের গভীর দুর্দশার মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি কমলকুমারের এই নাট্যপ্রযোজনা। অপ্রচলিত ভিন্নধর্মী ফিল্ম বা নাটকের রসগ্রাহী দর্শকের অভাব নেই কলকাতায়, তবু কেন যে সেদিন সেই দুর্ঘটনা ঘটল তার কোনো কারণ খুঁজে পাই না। মূল মণ্ডপে অন্যান্য অনুষ্ঠান-গুলি কিন্তু সুষ্ঠুভাবেই শেষ হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীত, লোক সংগীত, পুরাতনী বাংলা গান ও বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকের গানের অনুষ্ঠানগুলি হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। শেষোক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মেলা কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে-ছেন।

মূল মণ্ডপ থেকে আবার ফিরে আসি মেলা প্রাঙ্গণে। বইমেলার পাশেই ছিলো খাবার ও চায়ের দোকানের সারি। খেলা-ভেজাতে উক্ত পানীয়ের সন্ধানে তাই কবি-লেখকদের বড় একটা পরিশ্রম করতে হয়নি। 'পাতালরেল' কর্তৃপক্ষের প্যাভেলিয়ন প্রথম দিকে কয়েকদিন অসম্পূর্ণ ছিলো। বহুবার গেছি গলদঘর্ম কর্মীদের দেখেছি খোঁড়া-খুঁড়ি করে প্যাভিলিয়ন তৈরী করতে। ময়দানে ভবিষ্যতের স্বপ্ন সফল করার সাধ-নায় আজ তাঁরা 'পাতালের' মাটি তুলে পাহাড় বানিয়েছেন। যারা পাহাড় দেখেনি তারা ওখানে পাহাড় দেখতে যায়! মেলা-প্রাঙ্গণে ও'দের খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখে অনেকেরই হাসির উদ্রেক হয়েছিলো। হাসিয়েছিল পুরুলিয়ার কলানিকেতনও। স্টলের বাইরে শো-কেসের ধরনে নির্মিত এক খুপরীতে তাঁরা আমদানি করেছিলেন এক বামন জোকারকে। জোকারের নিখুঁত মাটির মূর্তিও ছিল পাশে। মূর্তির ভঙ্গি অনুকরণ করে জ্যান্ত জোকার মাঝে মধ্যেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছিল দর্শকদের আনন্দ দিতে। গ্রামীণ মেলায় যে ধরনের নির্মল কৌতুকের পরিবেশ সৃষ্টি হয় অনেকটা তাই হয়েছিল বঙ্গসংস্কৃতির মেলায়। মেলায় এমন কিছু ইন্দ্রজাল ও

রাকবুকের খেলা বসেছিলো যে বেশ ভিড় হতো লোকের। ওইসব স্টলে ক্যানভাসে এমন সব উদ্ভট ছবি ছিলো যার কল্পনা ব্রাক বা পিকাসোর বিমূর্ত ও জ্যামিতিক কল্পনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো মনে হয়।

মেলার নতুন আকর্ষণ ছিলো অরিগামি ও ধাঁধা প্রদর্শনী। জাপানী শিল্প এই অরিগামি। কাগজ না কেটে, এমনকি আঠা দিয়ে না জুড়ে ছোট ছোট শিব বা জ্যামিতিক কারুকর্ম তৈরী করাই অরিগামিশিল্প। জীব-জন্তুর সুন্দর কাগজে মিনিয়েচার মূর্তি ছিলো ওখানে। ধাঁধা প্রদর্শনীতে ছিলো 'বয়স বলা কার্ড'। চার্ট দেখে কার কত বয়স সামান্য মানসাঙ্কের সাহায্যে বলা যেত। কে যেন বলেছিলেন আমাদের দুটো বয়স। একটা আসল, দ্বিতীয় জন্ম সার্টিফিকেটের প্রয়োজনে, চাকরি রিটায়ারমেন্ট ইত্যাদি জাগতিক ব্যাপারে যা খুব কাজে লাগে। 'বয়স বলা কার্ড' কোন্ বয়স নির্দেশ করছিলো? মেঘের আড়ালে বেড়ে যাওয়া ছায়াচ্ছন্ন আসল বয়সটা কি?

শরৎজন্মশতবর্ষ উৎসব

জীর্ণ, কৃশকায় কিছু [illegible] কলমের মাঝখানে বেশী করে চোখ [illegible] নিচ্ছিল পেট-মোটা [illegible] একটা কলম যা [illegible] কেনোমতেই [illegible] নয়। [illegible] সরকার আয়োজিত শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসবে প্রদর্শনীর [illegible] সামগ্রীর মধ্যে কয়েকটি কালো কলমের মাঝখানে [illegible] পড়ছিল এই স্থূলকায় কলমটি। প্রাচীনত্ব অপরাপর কলমের চেয়ে [illegible] প্রদর্শনীতে [illegible] প্রায় বছর পাঁচিশ স্থায়ী [illegible] সাহিত্যজীবন, প্রক- [illegible] গ্রন্থসংখ্যা [illegible] এই কলম [illegible] দিয়েছে? [illegible] হিসেবে [illegible] সম্পূর্ণ- [illegible] বিভিন্ন মানপত্র, শরৎবাবুর স্বহস্তে লেখা ডায়েরি, মোজা, আসন, গড়গড়া, পাইপ, চশমা প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎবাবুকে সর্বোচ্চ ডি লিট্ উপাধি দিয়েছিলো। ডি লিট্ উপাধি গ্রহণের জন্যে তিনি বিশেষভাবে পোশাক, প্যান্ট ইত্যাদি তৈরী করিয়েছিলেন। সেই পোশাক, প্যান্ট গ্যালিস ইত্যাদিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিলো। ছিলো রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত কাগজপত্র রাখার জন্যে শৌখীন চামড়ার আধার, যার ভিতরে সেদিন আমরা

শরৎ জন্মশতবর্ষ উৎসবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিচ্ছেন অন্ধ্রের সাহিত্যিক ডঃ আদাপপা রামকৃষ্ণ রাও (তেলগু)

বিচিত্র মঞ্চ ও শান্তিনিকেতন, নাট্যমঞ্চ, ছায়ামঞ্চ, ছোটদের মহলে ছিল শরৎচন্দ্র নিয়ে নানা ও ছায়াছবির আয়োজন। এদিকে ওদিকে ছড়ানো বেশ কিছু ভাস্কর্য এবং ছবিতে শিল্পীরা ঘটনাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। ছোটদের মহলে বাচ্চারাই নাটক করেছে, গেয়েছে শরৎচন্দ্রের প্রিয় গান। এমনকি শিশুরা ছোটো গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করে তারা যথেষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয়। স্কুলের ছাত্রদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলো শরৎ সাহিত্যে কিশোর চরিত্র। স্কুলের বালক যে খুঁটিয়ে, কেমন মনোযোগ সহকারে শরৎসাহিত্য নিয়ে পড়তে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেছে একাধিক ছাত্রের রচনায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিলো বাগ্মিতা প্রতিযোগিতা। দু'জন ছাত্র বা ছাত্রী নিয়ে টিম তৈরী করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাংলার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিযোগিতা ও মেলা-প্রাঙ্গণের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীঅংশু সুর বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় রাখেন। লটারীর মতোই হয়েছিলো বাগ্মিতা প্রতিযোগিতা। ছাত্র বা

ছাত্রীদের সামনে রাখা হয়েছিল ভাঁজ করা কয়েকটি কাগজের টুকরো। এক-একটি বিষয়ের নাম লেখা ছিলো ওই কাগজগুলোয়। যে যা হাতে তুলে নেয় সে বিষয়েই তাকে বলতে হয়। এই নিয়ম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের ভাগ্যে পড়েছিলো শরৎ সাহিত্যে সমুদ্রের বর্ণনা বিষয়টি। এই বক্তাই প্রথম হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তাকে বলতে হয় যথাক্রমে শরৎ-সাহিত্যে পাঠশালার চিত্র ও শরৎ সাহিত্যে বাৎসল্য রস বিষয়ে। আরেকটি চমৎকার বিষয় রেখেছিলেন কর্তৃপক্ষ—শরৎ সাহিত্যে মেসবাড়ি। সংশ্লিষ্ট বক্তা কিন্তু বিষয়টি নিয়ে একেবারেই সুবিধে করতে পারেননি।

এই শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিলো কিন্তু আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজনটি। ১৬—২১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলেছিলো অনুষ্ঠান। সোভিয়েট ও বাংলাদেশের খ্যাতনামা বক্তা ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত [illegible] ও সাহিত্যসেবী শ্রীমানিক সরকার এই আলোচনাচক্রের ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করেন। সরকার বাহাদুর তাঁকেই অনুষ্ঠানের যাবতীয় কর্মভার অর্পণ করেছিলেন। বিশ্ব ও ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমিকায় শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়নই ছিল এই আলোচনাচক্রের লক্ষ্য। একটা তাজা টাটকা আবহাওয়া তৈরী হয়েছিলো আলোচনামঞ্চে। ছিলো বিতর্ক, সমালোচনা ও ভাবের আদানপ্রদানের অবকাশ। অন্তত একজন আলোচকের কথা আমি জানি যিনি গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না, শরৎচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দিয়ে পুজো করেন নি। তিনি, শরৎসাহিত্যের রক্ত মাংস, মেদ মজ্জার বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও ন্যায়নিষ্ঠ। আলোচনায় তিনি উত্তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উৎসব প্রাঙ্গণে বুক সেলার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বইয়ের হাট বসিয়েছিলেন। হুজুগপ্রিয় বাঙালী সেখানেও ভিড় জমাতে ভোলে নি' বলা বাহুল্য শরৎপুজোর আসরে শরৎচন্দ্রের বইয়ের কাটতিই ছিলো বেশী।

পুতুলের সংসার

সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাপ্ত পুতুলের নিরিখে নির্ধারণ করার একটা রেওয়াজ আছে। পশ্চিম বাঙলায় চমৎকার সব পুতুল তৈরী হয় কৃষ্ণনগর, জয়নগর-মজিলপুর, কাঁটালিয়া, রাজনগর প্রভৃতি স্থানে। পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির পুতুলও খুব বিখ্যাত। নাড়াজোলের পুতুলের রূপ-বৈভব আর সহজ টানা ফর্মের ছন্দ আমরা আজও ভুলিনি। হাতের চাপ দিয়ে কাঁচা মাটির দলায় চমৎকার সব পুতুল গড়ে তা নরম অল্প আগুনে পুড়িয়ে আমাদের ছেলেদের খেলনা হিসেবে দেওয়া হত। তখনও এত প্লাস্টিকের পুতুলের ছড়াছড়ি দেখা যায়নি। আস্তে আস্তে ওইসব পুতুল জাদুঘরের ঠাণ্ডা কাচের আলমারিতে শেষ আশ্রয় নিয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদের বড় একটা চোখে দেখা যায় না। এখন অসীমা মুখোপাধ্যায়, ইলা রাউথ প্রমুখ মহিলারা কিছু কিছু পুতুল তৈরী করছেন যা গ্রামীণ পুতুলের মতো না হলেও নিজস্ব সৌন্দর্যে বেশ আকর্ষণীয়। সম্প্রতি বোস ইনস্টিটিউ-

কথাকলি নৃত্য কেয়া রায়চৌধুরী

বেশ জটিল মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে গবেষণারত শ্রীমতী কেয়া রায়চৌধুরীর পুতুল প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। পুতুলের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছিলেন কথাকলি, কথক, মণিপুরী, ভরতনাট্যম প্রভৃতি নাচের নানা রসভঙ্গি ও মুদ্রা। তাছাড়াও ছিলো গ্রামীণ পরিবেশে আদিবাসী সর্দার, ঢাকী, ধনুরী প্রভৃতি মানুষের আদলে তৈরী অজস্র পুতুল। শ্রীমতী রায়চৌধুরী পুতুলের সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের শারীরিক সাদৃশ্য সুন্দরভাবে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব অন্যখানে। তিনি ফেলে দেওয়া কাপড়ের টুকরো, ধুঁধুলের ছোবড়া, আখরোটের খোসা প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিস সাজিয়ে তৈরী করেছিলেন তাঁর পুতুলের সংসার। শিল্পীর চোখ বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। অবশ্য আসল ভেলকি তিনি দেখিয়েছিলেন নানা মাপের গাঁজার কলকে নিয়ে। এগুলোকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন মানুষের শরীর হিসেবে। তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছিলেন অজানা কুমোররা। বাকি ছিলো কেবল শরীর অনুযায়ী মাথাটুকু বসানো। কেয়া রায়চৌধুরীর এই কাজটুকু সারতে নিশ্চয় বেশী সময় লাগেনি।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১৮ ॥

নোটিশটা দেখে মরিশাস সম্বন্ধে আমাকে নতুন করে আবার ভাবতে হলো। তাহলে এখানেও এই সব বেআইনী কাণ্ড ঘটে! আমাদের দেশের ট্রেনের থার্ড ক্লাশ কামরায় যেমন সতর্ক-বাণী লেখা থাকে যে "চোর গুণ্ডা বদমাইস পকেট-মার নিকটেই আছে" এও প্রায় অনেকটা সেই রকম। পাহাড়ের ওপর ধোঁওয়া দেখলে যেমন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ওখানে আগুন আছে, এই তুচ্ছ নোটিশটা থেকেও তেমনি প্রমাণ হয় যে কেউ কেউ হোটেলের কামরায় তাহলে বাইরের স্ত্রীলোককে নিয়ে ঢোকে।

বিকেল বেলা নীচের লাউঞ্জে নেমে একজোড়া নতুন মুখ দেখে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ভারী হাসি খুশী মুখ।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনাদের নতুন দেখছি—

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন—হ্যাঁ, আমরা আজই এসেছি। আসছি সাউথ আফ্রিকা থেকে। আমরা সেখানেই থাকি—

দক্ষিণ আফ্রিকা! দক্ষিণ আফ্রিকার নাম শুনেই মনটা কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আমাদের আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার নাম অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ উঠলেই সহজ ভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার নাম মনে পড়ে যায়। বিগত মহাযুদ্ধের অন্তের পরই রাজনৈতিক স্তরে ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার তেমন সৌভাগ্য হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা তাই আজও সংবাদপত্রের শিরোনাম। বিশেষ করে যখন আমরা মরিশাসে উপস্থিত রয়েছি সেই সময়ে প্রতিদিনই সংবাদপত্র জগতের প্রধান খবর ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

জিজ্ঞেস করলাম—এই সময়ে আপনি কী করে এখানে এলেন? আপনার দেশে তো এখন খুব দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে। রোজ হাজার হাজার লোক পুলিসের গুলিতে মারা যাচ্ছে, জেলখানা নাকি ভর্তি হয়ে গেছে কয়েদীতে—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কই, তাই নাকি? আমি তো কিছু জানি না—

—আপনি কবে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়েছেন?

ভদ্রলোক বললেন—এই তো আজকেই সকালে, আমি তো কোনও গণ্ডগোল দেখিনি সেখানে।

—এখানে কী করতে এসেছেন?

ভদ্রলোক বললেন—একটা বিয়ের উৎসবে নেমন্তন্ন রক্ষে করতে। সেইটে সেরে ফেরবার পথে একদিন শেসেলস-এ যাবো—তারপর দেশে ফিরে যাবো—

দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা একজন ভারতীয়কে আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এ ঘটনা যেন আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম—দক্ষিণ আফ্রিকাতে আপনি কী করেন? চাকরি?

—না, ব্যবসা। আমি একজন বিজনেস-ম্যান। আমার মিঠাই-এর দোকান আছে ডারবানে। ইন্ডিয়ান সুইটমিটস।

—কী কী মিঠাই বিক্রি করেন?

—এই লাড্ডু, গুলজামুন, পেড়া, দহি এই সব। এখন আমার ছেলেরা বড় হয়েছে। দুটি ছেলে, তাদের ঘাড়ে দোকানের ভার ছেড়ে দিয়ে এখন আমি আরাম করে রিটায়ার্ড লাইফ ভোগ করছি—

—আপনাকে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়?

—হ্যাঁ, তবে বেশি নয়। আমার বড় ছেলের দুটো বাচ্চা তাই তাকে বেশি ট্যাক্স দিতে হয় আর ছোট ছেলের তিনটে বাচ্চা তাই তাকে দিতে হয় কম ট্যাক্স—

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—দেশটা আপনার কেমন লাগে? ভালো না খারাপ?

—খারাপ কেন লাগবে? আমরা তো খুব আরামে আছি, আমাদের তো কোনও কষ্ট নেই—

তাঁর কথায় আমি কম আশ্চর্য হইনি। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের যে ভেদ-নীতি সারা পৃথিবী জুড়ে এক আলোড়ন তুলেছে, এ ভদ্রলোক কি তার কোনও খবরই রাখেন না? নাকি এক ধরনের মানুষ থাকে সংসারে যাঁরা দুটি ভালো-মন্দ খেতে পেলেই নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, এ ভদ্রলোক কি সেই দলভুক্ত? পরাধীনতার আমলে আমাদের ইণ্ডিয়াতেও তো আমরা এমন মানুষদের দেখেছি যাঁরা ইংরেজ-প্রভুদের পদসেবা করে 'রায়-বাহাদুর' 'রায়

কথা বলি তা হলো বাজারের ভাষা তাতে আমাদের প্রয়োজন মেটে। কিন্তু কাব্য তো প্রয়োজনের সামগ্রী নয়, কাব্য হচ্ছে ভক্তির জিনিস। বাজারের ভাষায় ভক্তি প্রকাশ করা অন্যায়। আপনি বাজারের ভাষায় 'রাম-চরিত-মানস' লিখে মহাপাপ করেছেন।

মন্তব্যটা শুনে গোস্বামীজী আরো বিমর্ষ হয়ে গেলেন। রাস্তার গাছের ফুল দিয়ে যদি দেবতার পুজো করতে কোনও অন্যায় না হয় তাহলে লৌকিক ভাষায় দেবতার বন্দনা করার মধ্যে কী অন্যায়টা তাঁর হলো?

এমনি করে যাঁকেই পড়ান তিনিই নিরুৎসাহ করেন গোস্বামীজীকে। সকলেই বলেন—এ চলবে না—

শেষ জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন প্রথম জীবনে তাঁরা প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন —ইতিহাস তাই-ই বলে। বাধা বিপত্তির সাফল্যের চাবিকাঠি। যত বাধা তত সাফল্য। তাই গোস্বামীজী ঠিক করলেন, ভারত-বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীকে একবার পাণ্ডুলিপিটা দেখাবেন। আজকের পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে মধুসূদন সরস্বতীর পরিচয় নেই। আমাদের পক্ষে এটি একটি গর্বের বিষয় যে একজন বাঙালী সন্তান সে যুগে সংস্কৃতের অন্যতম পণ্ডিত বলে সর্বভারতের কাছে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ফরিদপুরে মধুমতী নামে যে নদী আছে তা ওই মধুসূদন সরস্বতীর নামানুসারেই। শোনা যায় বাদশা আকবরের দরবারে তিনি নাকি পণ্ডিত দার্শনিক হিসেবে বিশেষ সম্মানিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি তখন কাশী বাস করছেন।

গোস্বামী তুলসীদাস তাঁকে গিয়ে ধরলেন।

বললেন—আমি একটা কাব্য লিখেছি, আপনি কি দয়া করে সেটা একটু দেখে দেবেন?

মধুসূদন সরস্বতী বললেন—কাব্যটির নাম কী?

গোস্বামীজী বললেন—'রাম-চরিত-মানস'। সবাই বলছে এ-কাব্য নাকি চলবে না—

—কেন চলবে না?

—কারণ সংস্কৃত ভাষায় না লিখে আমি বাজার-চলতি অবধী ভাষায় দেব-দেবীদের কথা লিখেছি, এটা নাকি আমি অপরাধ করেছি—

মধুসূদন সরস্বতী বললেন—ঠিক আছে, আপনি পাণ্ডুলিপিটা আমার কাছে রেখে যান, আমি সেটি পড়ে আপনাকে আমার মতামত জানাবো—আপনি কয়েক দিন পরে আমার কাছে আসবেন—

গোস্বামীজী পাণ্ডুলিপিটি রেখে চলে যাবার পর মধুসূদন সরস্বতী পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে পড়তে বসলেন। যতই পড়েন ততই মুগ্ধ হয়ে যান। পড়তে পড়তে তাঁর মনে হলো এ তো সাধারণ কাব্য নয়, মহাকাব্য। শাস্ত্র সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য আর অসীম অনুরাগ, ভক্তি এবং রসবোধ না থাকলে এমন কাব্য রচনা সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটি শেষ করে তিনি তার মাথার ওপর দু'ছত্র সংস্কৃত মন্তব্য লিখলেন:

আনন্দ-কাননে কশ্চিৎ জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিত মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা ॥

অর্থাৎ কাশীর মত আনন্দকাননে তুলসী নামে একটি চলমান বৃক্ষ আছে, আর তুলসীতরুর কবিতাকুসুমগুচ্ছে রাম-রূপে ভ্রমর শোভা পাচ্ছে।

কয়েক দিন পরে গোস্বামী তুলসীদাস সসংকোচে মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রমে এসে হাজির হলেন। ভয়ে তাঁর বুক তখন দুরু দুরু করে কাঁপছে। তিনি ঠিক করেই এসেছিলেন যে যদি মধুসূদন সরস্বতী মশাই পাণ্ডুলিপির নিন্দে করেন তাহলে তিনি গঙ্গার জলে সে পাণ্ডুলিপি ভাসিয়ে দেবেন। জীবনে আর কখনও কোনও কাব্য লিখবেন না।

কিন্তু না, তা হলো না। গোস্বামী তুলসীদাস আশ্রমে যেতেই মধুসূদন সরস্বতী পাণ্ডুলিপিটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—এই নিন আপনার পাণ্ডুলিপি—

গোস্বামীজী পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কেমন লাগলো পড়তে?

মধুসূদন সরস্বতী বললেন—আমার

মন্তব্য আমি পাণ্ডুলিপির মধ্যেই লিখে দিয়েছি, আপনি পড়ে দেখুন—

এরকম মন্তব্যটির উপরে নজর পড়লো প্রেসকর্মীটির। তিনি দেখলেন, পড়লেন এবং পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগলো।

এ কাহিনী বা কিংবদন্তী অনুসারে [illegible] শেষ ভাগের [illegible] প্রকাশ ভাবের। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় সেদিন যদি মধুসূদন সরস্বতী প্রেসকর্মীটির [illegible] পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতেন তাহলে [illegible] এক অমূল্য সাহিত্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হতো। কারণ তুলসীদাসজী এরকম বলেছিলেন যে মধুসূদন সরস্বতী বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি পাণ্ডুলিপি কাশীর গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে দেবেন।

মরিশাসের কবি সম্মেলনে বসে কবিতা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল গোস্বামী তুলসীদাসও একজন কবি আবার আমরাও কবি। শুধু একটা জায়গায় আমাদের এই মিলটুকু আছে যে আমরা সবাই কবিতা লিখি। কিন্তু এ-যুগে সে-

কালের পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতীর মত বিচারক কই যাঁর চূড়ান্ত রায়ের ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করে আমরা বলতে পারি আমাদের কাব্য-রচনা সার্থক! আর তা নেই বলেই তো এখন আমাদের ঘন ঘন কবি সম্মেলন ডেকে জনতার রায় ভিক্ষে করতে হয়।

দূরে কাছেই জালিম দাঁড়িয়ে ছিল। নিজের আসন ছেড়ে তার কাছে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কই, শিউপূজন কই? তাকে তো কোথাও দেখছি না?

জালিম বললে—রায়নার অসুখ, তাই হয়ত সে আসতে পারেনি—

ওদিকে মঞ্চের ওপর ভারতীয় প্রতি-নিধিদের নেতা মন্ত্রী করণ সিং ওঁর নিজের লেখা ডোগরা ভাষায় লেখা একটি কবিতা পড়তে উঠলেন। করণ সিংজীর চেহারা যেমন মিষ্টি তাঁর গলার স্বরও তেমনি মিষ্টি। ভাষার বাধার জন্যে কবিতার মর্ম উপলব্ধি করতে একটু কষ্ট হলেও তাঁর গলার স্বরের মিষ্টতায় তা পুষিয়ে গেল। কবিতা পাঠ করার পর তিনি সবিনয়ে জানিয়ে দিলেন যে তৃতীয় বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন যখন হবে তখন তিনি সেখানে হিন্দি ভাষার কবিতা পড়বার চেষ্টা করবেন।

একজন একটা মজার কবিতা পড়লেন। কয়েকটা লাইন মুখস্থ হয়ে গেছে আমার।

কবি কল্পনার চোখে একজন বিরহিনী স্ত্রীর দুঃখের কথা বলছেন। তার স্বামী টাকা উপার্জন করতে স্ত্রীকে ইণ্ডিয়ায় রেখে মরিশাসে গিয়েছে, আর স্ত্রী ইণ্ডিয়ার এক গ্রামে স্বামীর জন্যে পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করছে।

স্ত্রী বলছে :

সোনা খোঁজন পিউ গয়ে
সূনা কর্ গয়ে দেশ।
সোনা মিলা ন পিউ ফিরে
রূপা হো গয়ে কেশ॥

অর্থাৎ—আমার স্বামী সোনা খুঁজতে বিদেশে গেছে। তার অভাবে দেশ শূন্য হয়ে গেছে। সোনাও মিললো না, স্বামীও ফিরলো না, এদিকে আমার মাথার কেশ রূপোর মত সাদা হয়ে গেল। আমি বুড়ী হয়ে গেলাম।

কবি সম্মেলন শেষ হবার আগেই হল থেকে আমরা দু' জনে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

*

রাস্তায় বেরিয়ে জালিম বললে—শিউপূজন সাধারণত এই সব কবি সম্মেলনে বড় একটা যায় না, তবু আপনারা এসেছেন তাই বলেছিল সে আসবে, কিন্তু রায়নার অসুখের জন্যেই হয়ত শেষ পর্যন্ত আসতে পারেনি—

বললাম—কোথায় ছিল এ ক'দিন তা বলেছে সে?

জালিম বললে—কিছু বলে নি। বড্ড অভিমানী ছেলে স্যার শিউপূজন। নিজে কষ্ট পাবে কিন্তু নিজের কষ্টের কথা সে মুখ ফুটে কখনও কাউকে বলবে না—। বড় জোর খুব দুঃখ-টুঃখ হলে একটা কবিতা লিখে ফেলবে। ও যত কষ্ট পেয়েছে তত কবিতা লিখেছে। সেই জন্যেই আমরা এখানে সবাই ওকে পাগল বলি—

বললাম—পাগল না হলে কি ভালো কবি হওয়া যায় জালিম?

জালিম বললে—সেবার শিবরাত্রির দিনে যখন সবাই গংগা-তালাওতে পূজো দিতে গেল, আমি শিউপূজনকেও যেতে বললাম, কিন্তু ও কিছুতেই গেল না। ওর বউ গিয়েছিল। সারা রাত ধরে রায়না শিব-পূজো করলে। সকালে ফিরে এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী রে সারা রাত তুই ঘুমোলি নাকি?

শিউপূজন বললে—না, সারা রাত জেগে একটা কবিতা লিখেছি—

আমি বললাম—কী কবিতা? মনে আছে তোমার?

জালিম বললে—হ্যাঁ, সবটা মনে আছে স্যার, শুনুন—

বলে জালিম শিউপূজনের কবিতাটা মুখস্থ বলতে লাগলো :

প্রভু, তুমি তো জানো
আমরা তোমাকে কত ভালবাসি
তোমাকে রেখেছি গীর্জায়
রেখেছি মন্দিরে
রেখেছি যাদুঘরে
তোমার নামে আমরা ধর্মশালা বানিয়েছি
তোমার ছবি ছেপেছি
ক্যালেণ্ডারের পাতায়

ডেকে দিলে না। তা আপনি আর ক'দিন আছেন এখানে?

বললাম—আমি কালকেই চলে যাবো—

শিউপূজন বললে—সে কী? রায়নার সংগে আর আপনার দেখা হবে না?

বললাম—এখনও পাকাপাকি কিছু ঠিক হয়নি। হয়তো পরশুও যেতে পারি—। তা আমি কালই যাই আর পরশুই যাই, যাবার আগে একবার ওর সংগে দেখা করে যাবোই—এখন আসি—

শিউপূজন বললে—কিন্তু আপনাকে তো আজ কিছুই খাতির করতে পারলাম না, আপনি এত কষ্ট করে এলেন আমার বাড়িতে...

বললাম—তাতে কী হয়েছে, আমি তো হোটেল থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। তোমার কবিতা শোনবার লোভেই আমি কবি সম্মেলনে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে তোমাকে দেখতে না পেয়েই তোমার বাড়িতে চলে এসেছি—

শিউপূজন বললে—আমার কবিতা শুনবেন? আমি আজ নতুন একটা কবিতা লিখেছি—

-সে কী, রায়নার এত অসুখের মধ্যেও কবিতা লেখবার সময় পেলে?

শিউপূজন বললে—রান্না করতে করতে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম সমস্ত জীবনে আমি কী পেয়েছি, কেনই বা বেঁচে আছি, এই সব কথা মনে এলো—

বললাম—তা হলে শোনাও তোমার কবিতা। তোমার কবিতা শুনতে আমার ক্লান্তি নেই—

আমার কথায় খুব খুশী হলো শিউপূজন। বাইরের বারান্দায় একটা টেবিল ল্যাম্প জেলে দিলে। তারপর যাতে বাইরের কোনও শব্দ রায়নার ঘরে না যায় তার জন্যে ঘরের জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলে।

বারান্দার সোফার ওপর আমরা তিন জনে বসলাম। সামনের দিকে জমাটবাঁধা মাঝ রাতের ঠাণ্ডা অন্ধকার।

শিউপূজন বলতে লাগলো—আমার সারা জীবনটাই আমার মনে পড়ছিল আজ। সেই ঝড়ের রাতে কেমন করে আমরা এই বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার বাবা নিজের বাবার ওপর রাগ করে কেমন করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। কত কষ্ট করে আমাকে বাবা মানুষ করেছিল, এই সব কথাই সারা দিন আমার মনে আসছিল। তারপর একটু ফুরসত পেতেই আমি এই কবিতাটা লিখে ফেললাম। শুনুন—

শিউপূজন তার কবিতা পড়তে লাগলো—

কত দূর চলে এলাম
চলতে চলতে
প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—

এই আগুনের ঢেলাটা কবে সৃষ্টি হলো
বলতে পারো?
কবে ঘুরতে শুরু করলো
তোমায় ঘিরে?
কিন্তু আমি জানি কবে
আমার চলা শুরু হলো
জ্বলতে জ্বলতে
চলতে চলতে
প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—

(ক্রমশ)

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেশ'-এর পাঠকমাত্রেরই কাছে সুপরিচিত। তাঁর প্রচ্ছদের নয়ন-জুড়ানো রূপ পাঠকদের অবশ্যই ভাল লেগেছিল। সম্প্রতি দেখলাম ছবি নিয়ে—বিশেষ করে ছাপা ছবি নিয়ে—নানা পরীক্ষা গভীর অভিনিবেশ করে চলেছেন (আকাদমী অব ফাইন আর্টস—২৮ ফেব্রুয়ারী ৬ই মার্চ)।

রামানন্দের শিল্প ভাবনার মধ্যে মাটি আর মানুষের বিষয় তাঁর টান সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। গ্রামের মানুষজন, লোকশিল্পের রূপারোপের ধরন, প্রতীক, লোকসংস্কৃতির সারল্য অথচ ছবি দেখতে দেখতে বোঝা যায় কোনো গ্রামীণ শিল্পীর কাজ নয়। আর একটি ব্যাপার দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ—সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতির অপ্রাচুর্য তাঁকে দমাতে পারে না। পাথর ছাপ ছবির পাথর মাটিতে রেখে তার ওপর কাগজ লাগিয়ে রোলার চালিয়ে ছাপ তুলেছেন। যন্ত্রপাতি নেই বলে হাহাকার করেননি। তেমনি ধাতুপাত্র মূল্যবান [illegible] জন্যে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে দোরে খিল [illegible] লাগাননি। কাচের ওপর এচিং করে ছাপ তুলেছেন। অবশ্য এইভাবে একটিবারই ছাপ তোলা যায়। এরই পারিভাষিক নাম 'মনো প্রিন্ট'।

প্রদর্শনীতে রামানন্দ নানারকম কাজ রেখেছিলেন—'ওয়াশ', অস্বচ্ছ জলরঙ, ছাপা ছবি। ওঁর অংকনের জোর আছে, বিশেষত সরল রেখার ছন্দের জাদু—রূপকে আপাত আলগা কিন্তু কাঠামো দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখার কায়দা—চোখকে সরতে দেয় না। —হয়তো তাঁর আগের দিকের কাজে মন্ডন বা design-এর প্রাধান্য, হয়তো সচিত্রীকরণের ঝোঁকও প্রবল এবং ছবি কখনো কখনো এসবের জন্যে অনাবশ্যকভাবে কাব্যিক বা মিষ্টি হয়ে যায়, তথাপি তাঁর ছবিতে

হুঁকো হাতে মানুষ — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : দেশ

নিজস্ব চিত্রগত উপাদান এবং আকাঙ্ক্ষী [illegible] খুব কম নয়। [illegible] পরিবেশে [illegible] গ্রাম [illegible] সহজে তোলা যায় না। কিংবা [illegible] সদৃশ মায়ের বুকে ছোট্ট বাচ্চাটি, অনবদ্য। [illegible] গানের সঙ্গে জোড়া [illegible] সামনে তিনজন শিশুর আনন্দ প্রকাশ মন্দ লাগে না।

রামানন্দ এখন লোকচিত্রের রূপারোপের কাব্যিক পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন আদিম চিত্রকরদের সরলীকরণ এবং রূপরীতির রাজ্যে। এ যেন ঠিক প্রস্থান নয়। যেটা আমার কাছে ভাল লেগেছে সেটা হলো ভাবালুতায় ভেসে যেতে আর রাজী নন। চোখ ভোলাবার ছল নেই। এ যেন ভেতর থেকে উঠে আসা রূপ। রূপতৃষ্ণা আছে কিন্তু নেই কোনো পগলভ উচ্ছ্বাস। যেমন দুটো গাধার ছবিটাতে জোরালো রেখা দিয়ে পলায়নপর রূপকে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। তেমনি কাচের ছাপা ছবিতে একটা আদিম ষাঁড় [illegible] একটা মানুষ, পাথরছাপে মাতৃরূপ [illegible] একটা ভেড়া—এসবে গল্প নেই। শুধু [illegible] রূপের বিন্যাস [illegible] প্রাধান্য এসব ক্ষেত্রে [illegible] মানুষই হোক আর পশুই হোক সর্বক্ষেত্রে আদিরূপ (বা archetypal form) ধরবার দিকে তাঁর ঝোঁক। একটা আদিমতা আছে। [illegible] এখন আরো গভীর [illegible] কথা বলা [illegible] করেছে।

রামানন্দের শিল্পজীবন নতুন বাঁকে এসে উপস্থিত। আর তাঁর কাছ অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

রবিবারের শিল্পী

সানডে পেন্টার অর্থাৎ শৌখিন শিল্পী। আমার সঙ্গে ছিলেন চিত্রকর বিষ্ণু দাস। তিনি বললেন, 'কলকাতায় সবাই সানডে পেন্টার। প্রত্যেকেই অন্য কিছু করেন জীবিকার জন্যে।' বললাম, একটা তফাৎ আছে। কলকাতার শিল্পীরা রুজি রোজগারের জন্যে অন্য কাজ করেন। আর এক্ষেত্রে অপেশাদার লোক শখে ছবি

তৌলক আলোচনায় ধীর বিচারবোধ ও সাহিত্যসমীক্ষা আজও আমাদের মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানে ভারতবাসী অপেক্ষা কেউ বড় নয় কিন্তু আমাদের বহির্বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হতে হবে। বঙ্গদর্শন কাগজে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় ও ... বহির্বিষয়ক ... নয়। সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনালব্ধ জীবনের দর্শন বঙ্গদর্শনে। কিন্তু কেবল জ্ঞানচর্চাই নয় বঙ্গদর্শনে সাহিত্যচর্চারও উৎসাহ প্রবল ছিল। সম্পাদক বিশেষ কারণেই যে সকল রচনার স্থান দেন নি। কিন্তু তিনি রাজসিংহ ও ইন্দিরার প্রাথমিক রূপ প্রকাশ করে ধন্যবাদভাজন হবেন। তার একটি প্রশংসনীয় অধ্যায় হল বঙ্গদর্শনের প্রথম নয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সূচী।

বিজিতকুমার দত্ত

সঙ্গীত

বাঙালীর রাগসঙ্গীত চর্চা। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। ফার্মা কে. এল. এম. (প্রাঃ) লিমিটেড। ২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ৩০ টাকা।

বিশিষ্ট অধ্যায়ে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতকের গোড়ার যুগ পর্যন্ত সঙ্গীতের আলোচনা এবং মূল্যায়ন করেছেন। নিধুবাবু সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা অন্যান্য লেখকেরা করলেও এই গ্রন্থে বহু তথ্য সমেত বেশ ব্যাপকভাবেই এটি করা হয়েছে। কালী মীর্জা অর্থাৎ কালিদাস চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমরা অনেকেই খুব কম জানি। লেখক পরিশ্রমপূর্বক এর সম্বন্ধে গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে ঐতিহাসিক চাহিদা মিটিয়েছেন। এর পরেই তিনি আলোচনা করেছেন রঘুনাথ রায় এবং বাংলার চারতুকের খেয়াল সম্বন্ধে। এটিও একটি প্রায় অনালোচিত বস্তু। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখক এর আগেই একটি গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রধানত রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেটিও তিনি এই গ্রন্থে মিটিয়েছেন। ব্রহ্ম সংগীত সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল আছে। এই গ্রন্থে তা অনেকাংশে নিবৃত্ত হবে। বাংলায় ... চর্চা এবং পাখোয়াজ বাদন একটি প্র... ভূমিকা স্থাপন করেছে। এই প্রসঙ্গে লেখক বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছেন, বিশেষ করে বিষ্ণু চক্রবর্তীর জীবন ও সাঙ্গীতিক প্রতিভার মূল্যায়ন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এর পরে আর একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা পাওয়া গেল রমাপতি বন্দোপাধ্যায়ের জীবন প্রসঙ্গে। এতদ্ব্যতীত প্রসঙ্গত আরও অনেকের জীবনালেখ্য প্রদান করে গ্রন্থকার একটি পূর্ণাঙ্গ সাঙ্গীতিক ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থশেষে তিনি স্বরলিপির বিবর্তন সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ যুক্ত করে সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টার এই প্রয়োজনীয় দিকটির উপরেও আলোকসম্পাত করেছেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতজগতে গবেষণামূলক কাজের জন্য সুবিদিত। তাঁর সম্বন্ধে কোনও পরিচিত আবশ্যক নেই। তাঁর প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তাঁর প্রদত্ত বিষয়বস্তু, সন তারিখ ইত্যাদির প্রামাণিকতা। তিনি যে কত পরিশ্রম করে কতদিক ভেবেচিন্তে এই গ্রন্থে বিবরণগুলি প্রদান করেছেন সেটি মুখবন্ধ পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থের

প্রবন্ধে ডকটর নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের একটি সুচিন্তিত ক্ষুদ্র ভূমিকা সংযুক্ত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে নিঃসংশয়েই কামনা করি এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠকের সমাদর লাভ করুক।

রাজেশ্বর মিত্র

উপন্যাস

মায়াকাননের ফুল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনী কলকাতা-৯। ছ' টাকা।

লেখক পাঠকের জন্যেই লেখেন। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনবোধ ও রচনাভঙ্গির উপর নির্ভরশীল তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও জনপ্রিয়তার রহস্যময় বিষয়টি। লেখক ও পাঠকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ না হলে, দেখা যায়, অনেক সময় মহৎ সাহিত্যেরও মূল্যায়নে কোথায় যেন অল্প বিস্তর অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। দু' পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে আলোচ্য উপন্যাসে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ক্রিয়াপদ বর্জন করে এমনভাবে বাক্য রচনা করেছেন যে পাঠকের কল্পনার সাহায্যে শূন্য স্থান পূরণ করে নিতে হয়। এভাবে তিনি লেখক ও পাঠকের মাঝখানে একটি সেতু রচনা করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য 'এটা একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র, বিরাট কোনো দাবি নেই। তাছাড়া সব জায়গাতে যে ক্রিয়াপদ বাদ দিতেই হবে, এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণও আমার। যখন যেমন মনে। অনেকটা কৌতুকের ছলেও।' উদ্ধৃতির বাক্য গঠনরীতি থেকেই বোঝা যায় বইটি কিভাবে এগোবে, লেখক কিভাবে ব্যবহার করবেন ভাষাকে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বইটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মতোই রোমান্টিক। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—'আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি বোঝাটির নাম গোপনীয়তা। একা একা তা বেশীক্ষণ বহন করা যে কত কষ্টের।—(পৃষ্ঠা ৩৫)।' তিনি তাঁর রচনায় এই গোপনীয়তা ও বুক-চাপা রহস্যকে প্রায় সর্বদাই এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। গভীর উপলব্ধির কথা ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, কামনা-বাসনা সুখ দুঃখের গল্প কী অনায়াসে, কলমের অল্প আঁচড়েই না তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। ডিটেকটিভ স্কুল মাস্টার আর লেখক—এই তিনজনই যে মানুষের চরিত্র ভালো বোঝেন 'মায়াকাননের ফুল' থেকে আমরা তা জানতে পারি। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সেই বিরল লেখকদের একজন যিনি বাইরের মানুষটাকে ভিতরের মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। কাজেই পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সমস্যা অন্য লেখকের কাছে যতটা প্রবল, সুনীলের ক্ষেত্রে ততটা নয়। তবু তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করেন, কখনোই গতানুগতিকতার মসৃণ বিছানায় গা ঢেলে দেন না। লেখক সুনীলকে যাঁরা চেনেন, তাঁরাই জানেন তাঁর অফুরন্ত প্রাণ শক্তি ও প্রাণ প্রাচুর্যের কথা। মুক্ত প্রাণের সুন্দর লাবণ্যভরা রূপকথা এই 'মায়াকাননের ফুল।' অনুরোধাকে আমরা ভুলতে পারি না, ভুলি না এক মুহূর্তের জন্য দেখা ট্রেনের সাঁওতাল বধূটিকে। বইটি শেষ করার পর একটু যেন বিষণ্ণ যেন অল্প একটু মন খারাপের রেশ জেগে উঠে আমাদের আতুর করে তোলে। কিন্তু চিরন্তন প্রেম, ভালোবাসা, মিলন ইত্যাদির
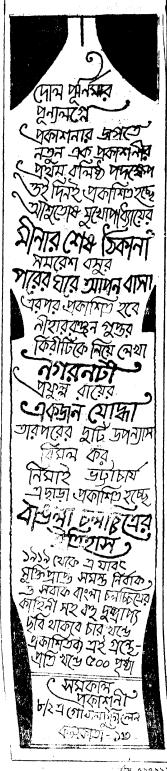
মতো এই বিষদটুকুও তো সত্যি। 'কাঁটাটা তো সত্যি। ফুলের কাঁটা। কাঁটা আছে, ফুলও ছিল।'—আমরা জানি। জানি বলেই মায়াকাননের ফুলের প্রতি আমাদের মায়া কখনোই [illegible] না।

দেবা[illegible] [illegible]পাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খৈরী নদীর তীর থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বাঘিনী এখন স্বনামধন্যা। সিমলিপাল প্রোজেক্ট টাইগার'-এর অধিকর্তা সরোজরাজ চৌধুরীর হাতে খৈরী যখন জমা পড়ে, তখন ও দু-তিন মাসের বাচ্চা। জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল খৈরীকে, মানুষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরোজবাবুর কাছে [illegible] [illegible] দেয়। সরোজবাবুর ভাইঝি নীহার খৈরীকে নিজের মেয়ের মতো [illegible] [illegible] তুলেছেন, খৈরীও মানুষ-মাকে ধীরে-ধীরে ভালবাসতে শিখছে—এ-খবর বটে যেতে সময় লাগেনি। ছ-নম্বর [illegible] [illegible] ওপর যশীপুরের বন-বাংলোয় সেই থেকে নানান কৌতূহলী মানুষের আনাগোনা। কাগজের পাতায়-পাতায় খৈরীর ছবি আর খবর।

খুব ছোটদের জন্যে খৈরীকে কাছ থেকে দেখে আসার এক মায়াময় ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেছেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। খৈরী, আমার খৈরী (আশা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা) এক অন্য স্বাদের গ্রন্থোপহার। শক্তির লেখায় অজস্র সুন্দর ছবি, এই ভ্রমণ-পথের অনুপুঙ্খ বর্ণনা, জ্যান্ত বাঘিনীকে দেখে আসার সজীব কাহিনী। পূর্ণেন্দু পত্রী সেই ছবিগুলিকে, জ্যান্ত বর্ণনাকে, লেখা থেকে রেখায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। সত্যি খৈরীকে চোখের সামনে দেখতে আর কোনো কল্পনার সাহায্য নিতে হয় না।

বইটি যে বিশেষ করে ছোটদের ভালো লাগবে তার আরেকটি কারণ, শুধুই একজন কবি-সাংবাদিকের দৃষ্টি দিয়ে খৈরীকে দেখেন নি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সপরিবার ভ্রমণের এই সত্যি-কাহিনীতে ছোট্ট মেয়ে তিতির চোখ আর অভিজ্ঞতাকেও তিনি অবিকল তুলে ধরেছেন। এবং তুলে ধরেছেন অতি নিপুণ ও স্বচ্ছ ভাষায়।

*

ছোটগল্প হবে ছোট এবং গল্প—প্রমথ চৌধুরীর এই কথা মনে রেখে আরেকটু এগিয়ে গিয়েছেন বারুইপুরের গাঙেয় প্রকাশক : ছোটগল্পের বইকেও বেশ ছোটখাট চেহারায় হাজির করেছেন তাঁরা। শিখর রায় রচিত এই সব ভেড়াগুলো আর রক্তচোষারা (প্রকাশক: পিনাকীপ্রসাদ রায়, বারুইপুর, দু টাকা) নামের গল্পগ্রন্থটি পোস্টকার্ডের থেকে সামান্য বড়ো-মাপের বই ইঞ্চির হিসেবে ছয়-চার।

'খটাশ', 'এ-রকম [illegible] এবং [illegible]' ও 'মেঘলাতে বিচিত্র খেলা' গল্প তিনটিতে [illegible] এই গল্পলেখক নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতিবাহী। প্রথম দুটি সমতান প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ধারায়, তৃতীয়টি রূপকধর্মী। তাঁর মনোভঙ্গি যে আধুনিক এই গল্প তিনটিতে তারও প্রমাণ রয়েছে। নাম-গল্পটিকেও রূপকের আবরণে মুড়ে দিতে চেয়েছেন শিখর রায়। কিন্তু নামকরণ থেকেই অনুমেয়, কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ সেই আবরণ। প্রথম গল্পের (বিমলবাবুর বাঁচা-মরা এবং আমি) বক্তব্য সুন্দর, কিন্তু সব মিলিয়ে গল্পের টান নেই। আর দুটি রচনা স্কেচ ধরনের।

শিখরের ভাষা ও বর্ণনা তরতরে। দু-একটি মারাত্মক বানানভুল চোখে পড়ল। 'উচিৎ' এবং 'স্বান্তনা'। 'সান্ত্বনার এমন বানান লেখা কি 'উচিত'?

—প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

খেলার মাঠে

রাতের ফুটবল এবং রুশী দল

একটি বিদেশী দলকে আনিয়ে কলকাতায় রাতের ফুটবলের উদ্বোধন করা হল। উদ্যোক্তা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। চেম্বার্স তাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে ২৫ লাখ টাকা খরচ করে কলকাতায় নৈশ ফুটবলের পথ খুলে দিল—অবশ্য রাজ্য সরকার, আই এফ এ এবং মোহনবাগান ক্লাবের সহযোগিতায়।

নৈশ ফুটবলের জন্য মোহনবাগান মাঠই প্রথম বেছে নেওয়া হয়েছে। চারটি বাতিস্তম্ভের প্রতিটিতে আছে ৯০টি করে মোট ৩৬০ হ্যালোজেন বালব। প্রতি বালবের আলো বিকীরণ ক্ষমতা এক হাজার ওয়াট। চারটি স্তম্ভ থেকে সারা মাঠে বিচ্ছুরিত হয় ৩৬০ কিলোওয়াট শুভ্র আলো। এ ছাড়া গ্যালারি, প্রবেশ পথ, র‍্যামপার্ট এবং মাঠের অন্যান্য স্থানের জন্য পৃথক আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে একটি জেনারেটর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হঠাৎ বিকল হলে মাঠ যাতে অন্ধকারে ডুবে না যায়। নৈশ ফুটবলের উপযোগী করে মাঠটিকে সাজানোর সঙ্গে প্রেস, রেডিও এবং টেলিভিসন বক্সটিও সুন্দর করে তৈরী করা হয়েছে। ওই বক্সের মধ্যেই সারা মাঠের কণ্ট্রোল ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এর পর ইস্টবেঙ্গল এরিয়ান মাঠ এবং মহমেডান স্পোর্টিং-হাওড়া ইউনিয়ন মাঠও নৈশ ফুটবলের উপযোগী করা হবে। আশা করা যায় মোহনবাগান মাঠে আলোর ব্যবস্থায় যে ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছে অপর দুটি মাঠের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। মোহনবাগান মাঠের পূব দিকে, যে দিকটায় বাতিস্তম্ভ মাঠের খুব কাছাকাছি বসানো হয়েছে, সেদিকে আলোর প্রাচুর্য পশ্চিম দিকের মত নয়। দূরে থেকে খেলা ভাল দেখা যায় না, খেলোয়াড়দের চিনতে কষ্ট হয়। তবু ভারতের অন্য যেসব শহরে নৈশ ফুটবলের ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে মোহনবাগান মাঠের ব্যবস্থা অনেক ভাল এবং দূরপ্রাচ্যের অনেক শহরের চেয়েও ব্যবস্থাদি উন্নত। যারা ওই সব মাঠে রাত্রিতে ফুটবল খেলেছেন এটা তাঁদেরই অভিমত।

বলা বাহুল্য, রাত্রিকালীন কলকাতার [illegible] ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন [illegible] এর ফলে মাঠ সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে প্রতিদিন দুটি, প্রয়োজনে তিনটি খেলারও ব্যবস্থা করা যাবে এক মাঠে। স্কুল কলেজের ছাত্র এবং অফিস কর্মীরা রাত্রিতে খেলা দেখার সুযোগ পাবে দিনের কাজ গুছিয়ে নিয়ে। যানবাহনের অসুবিধারও কিছুটা লাঘব হবে। সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে খেলোয়াড়রা। কলকাতায় খেলা হয় গ্রীষ্মতাপের মধ্যে। প্রচণ্ড গরমে লীগের খেলায় ৭০ মিনিট এবং নক আউটে ৯০ মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে রাত্রির শান্ত আবহাওয়া অপরাহ্নের তপ্ত আবহাওয়ার চেয়ে অনেক অনুকূল। খেলার মান বাড়ানোর দিক দিয়েও রাতের ফুটবল বেশী উপযোগী। ভারতীয় বণিক সভাকে ধন্যবাদ শহরের সহস্র সহস্র ফুটবল অনুরাগী এবং ফুটবল খেলোয়াড়দের সামনে সুযোগ সুবিধার একটি নতুন পথ তাঁরা খুলে দিলেন।

একটা উৎসবের আমেজ আনতেই নৈশ ফুটবলের উদ্বোধনের জন্য কয়েকটি বিদেশী দলকে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দলও আসতে চেয়েছিল। প্রথম যারা আসতে আগ্রহ দেখিয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেই সোভিয়েট রাশিয়ার দল 'পাকতাকোর' তিনটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে তিনটিতেই জিতে দেশে ফিরে গেছে। দিয়ে গেছে উৎসবের আমেজের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ফুটবলে কিছু নতুন চিন্তার খোরাক।

বলা নিষ্প্রয়োজন, পাকতাকোর সোভিয়েট ইউনিয়নের নামকরা ফুটবল দল নয়। কিয়েভ ডায়নামো, মস্কো ডায়নামো, মস্কো লোকোমোটিভ, স্পার্টাক, লেনিনগ্রাদ ডায়নামো, বিলিসি বা সেন্ট্রাল আর্মি স্পোর্টস ক্লাবের মত দলটির প্রতিষ্ঠা নেই। কেন্দ্রীয় উজবেকিস্থানের একটি কালেকটিভ ফার্মের ফুটবল দল পাকতাকোর। পাকতাকোর কথাটির অর্থ তুলা উৎপাদনকারী। ফার্মে উৎপন্ন হয় মুখ্যত তুলা ও ধান। পাকতাকোর খেলে অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম ডিভিসন লীগে। গত বছর পেয়েছিল তৃতীয় স্থান। কিন্তু মনে রাখতে হবে সোভিয়েট দেশে প্রথম ডিভিসনের উপরেও আছে সুপার ডিভিসন, যাতে খেলে নামী দলগুলি। তবু যে দেশে ফুটবলের মান অত্যন্ত উন্নত এবং খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রচুর সে দেশের প্রথম ডিভিসনের দলের খেলায় ক্রীড়াশৈলীর ছাপ মিলেই থাকে। মিলেছেও নিশ্চয়ই। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং আই এফ এ একাদশের সঙ্গে তিনটি খেলায় পাকতাকোর দেখিয়েও গেছে তাদের পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াবিন্যাস, প্রচণ্ড গতির সঙ্গে ফুটবল শিল্পের সংমিশ্রণ। খেলা দেখে মনে হয়েছে যেন সদা তেল খাওয়ানো একটি মেসিন—যার প্রতিটি [illegible] সূক্ষ্মতার কাজে সারা মাঠে সক্রিয়। খেলোয়াড়দের দৈহিক পটুতা প্রশ্নাতীত। প্রায় সবার পায়ে আছে ইনসাইড ও আউটসাইড ডজের ছোট-বড় কাজ। দেহের দোলায় প্রতিপক্ষকে মাটাল করতে ওস্তাদ। ঘাসের উপর বল রেখে আক্রমণ রচনার গতিময়তা দর্শক চোখের তৃপ্তির খোরাক। অসাধারণ বল কণ্ট্রোল ক্ষমতা। শ্যুটিং দক্ষতাও প্রশংসনীয়। এক কথায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ফুটবল খেলার জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন পাকতাকোর দলের প্রায় সবারই সেসব গুণ অধিগত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পাকতাকোরের তূণে যখন এত বাণ তখন ইস্টবেঙ্গল বা আই এফ একে তারা পরাজিত করলেও ধরাশায়ী করতে পারল না কেন? উত্তরে বলব তারা খেলেছে প্রদর্শনী ফুটবলের মানসিকতা নিয়ে কিছুটা হাল্কা মেজাজে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে বেশী গোল করতে না পারার অন্য কারণ ইস্টবেঙ্গল খেলেছে ক্লাব ইতিহাসের এক স্মরণীয় ম্যাচ কিছু অলৌকিকতা ঘাড়ে নির্ভর না করলে যে ম্যাচ খেলা যায় না।

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং যুগ্ম শীল্ড জয়ী মোহনবাগানকে একরকম নাস্তানাবুদ করে পাকতাকোর প্রথম খেলাটিতে ৩—০ গোলে জয়ী হয়। দুটি গোল করে এরিমভ, একটি ফেদারভ। দ্বিতীয় খেলায় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয়ী হয় বাকানভের করা একমাত্র গোলে। আই এফ এর বিরুদ্ধেও জয় ১—০ গোলে। গোলদাতা এরিমভ। ওদের মোট পাঁচটি গোলের মধ্যে তিনটিই এরিমভের।

একলব্য

পরলোকগত রাষ্ট্রপতির ক্রীড়াপ্রীতি

খেলাধুলো করার সহজাত তাগিদ সব মানুষের মধ্যেই থাকে। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের পর, এমন কি রাষ্ট্রের হাল ধরার পরও কেউ কেউ খেলার মধ্যে নির্মল আনন্দ পেতে চান। অন্য দেশের রাষ্ট্রনায়কদের কথা বলছি না, আমাদের রাষ্ট্রনায়ক জহরলাল নেহরুও কাজের ফাঁকে ব্যাডমিন্টন খেলেছেন, ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠেছেন, আবার কখনো কখনো ক্রিকেট ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী বৃদ্ধ বয়সেও সাঁতার কেটেছেন, নিয়মিত যোগব্যায়াম করেছেন। কিন্তু খেলাকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসাবে বোধ হয় আর কেউ এতটা গ্রহণ করেননি, যেমন করেছিলেন পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আমেদ।

৭২ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসানকে অকাল মৃত্যু বলা ঠিক হবে না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত অবশ্যই। বলা বাহুল্য খেলার অপরিসীম আগ্রহ এই আকস্মিক মৃত্যুর আংশিক কারণও।

রাষ্ট্রপতি আমেদ দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে, মালয়েশিয়া থেকে অসুস্থ অবস্থায় আগের দিন ফিরে এসে। মালয়েশিয়াতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন গলফ খেলতে খেলতে। ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে গলফ খেলতে যান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক হোসেনের সঙ্গে। সেখানকার আবহাওয়া খেলার পক্ষে অনুকূল ছিল না। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে কিছুক্ষণ খেলা চলার পর রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ কর্নেল তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, অনেকক্ষণ তো খেললেন—এবার খেলাটা বন্ধ করুন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তখন খেলার আনন্দে বিভোর। নেশায় মেতে উঠেছেন। চিকিৎসকের সতর্কবাণীতে কান দেননি। ঘণ্টা দেড়েক খেলার পর ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্তি দিলেন এবং সেইদিনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

পরলোকগত রাষ্ট্রপতি আমেদ কৈশোর ও যৌবনে চুটিয়ে খেলেছেন টেনিস ও ফুটবল। বড় খেলোয়াড় নিশ্চয়ই ছিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলাতেও অংশ নেবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু কলেজ জীবনে মোটামুটি ভালই খেলতেন। বিশেষ করে টেনিস। ব্যবহারজীবী হিসাবে জীবন শুরু করার পর এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল থাকাকালেও নিয়মিত টেনিস খেলতেন। রাজ্যে এবং কেন্দ্রে মন্ত্রীত্বকালে টেনিস খেলেছেন মাঝে মাঝে। দ্রুতগতির খেলার সঙ্গে বয়সের ভার যখন সায় দিতে সমর্থ হয়নি, তখন ঝুঁকে পড়েন গলফ খেলার দিকে। আগে থেকেই রাষ্ট্রপতি ভবনে টেনিস কোর্ট ছিল। ফকরুদ্দিন আলী আমেদ রাষ্ট্রপতি হবার পর ওঁর উদ্যোগেই সেখানে প্রথম গলফ কোর্স খোলা হয়। নিজে নিয়মিত খেলতেন বন্ধু বান্ধব এবং আগত বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও অতিথিদের সঙ্গে।

খেলাধুলোয় দারুণ অনুরাগী ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের সম্মান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিল যথেষ্ট আগ্রহ। উনি যখন যেখানে কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন সেখানকার ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ওঁর আন্তরিক সহযোগিতা এবং সমর্থন। বহু ক্রীড়াসংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন দীর্ঘ সাড়ে এগার বছর। ত্রিবান্দ্রমের কর্নেল রাজার পর ফকরুদ্দিন আলী আমেদ জাতীয় টেনিস সংস্থার সভাপতি হন ১৯৬৪ সালে। ১৯৭৪ এ রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত সেই পদেই আসীন ছিলেন। বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রপতির পদের জন্যই তাঁকে টেনিস সভাপতির পদ ছাড়তে হয়। যদি সংবিধানে না আটকাতো কিংবা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে বেমানান না হত তা হলে হয়তো টেনিসের সঙ্গে তাঁর সাংগঠনিক সম্পর্কও ছিন্ন হত না। আত্মিক এবং এক নম্বর পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ক অবশ্য ছিল আমৃত্যুকাল।

জাতীয় টেনিস সংস্থার সম্পাদক দিলীপ বসু বলছিলেন, খেলা সম্পর্কে অমন একজন উৎসাহী এবং আগ্রহী উপদেষ্টাকে পাওয়া যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভাগ্যের কথা। শুধু আগ্রহ এবং উপদেশই নয়, টেনিস সম্পর্কে পরলোকগত রাষ্ট্রপতির প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ফাইনার পয়েন্টস খুব ভাল বুঝতেন।

দিলীপবাবু আরও বললেন,—'ওঁর সভাপতিত্বকালে আট বছর আমি কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলাম। তখন এবং তিনি রাষ্ট্রপতি হবার পর যখনই দিল্লিতে গিয়ে টেনিস সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি শত কাজের মধ্যেও তিনি টেনিসকে দিয়েছেন অগ্রাধিকার। বলতে গেলে আমাদের জন্য তাঁর দ্বার ছিল সদা উন্মুক্ত। যখনই যেতাম দেশের মান বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরীর উপর জোর দিতেন। ছোটদের জন্য কোচিং স্কিম করার পরামর্শ দিতেন। বলতেন টাকার কোন চিন্তা নেই। সরকারের নীতিই তো খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়া। শিক্ষা দফতর নিশ্চয়ই বড় অঙ্কের অনুদান দেবে। তোমরা ছেলেমেয়েকে তৈরী করার কাজে মন দাও। বেশী সংখ্যায় ছেলেমেয়েকে টেনিসের মধ্যে টেনে আনতে পারলে বেশী প্রতিশ্রুতিবানের সাক্ষাৎ পাবেই। তার মধ্য থেকে দু চারজন কৃষ্ণণ-জয়দীপ প্রেমজিৎকে পেয়েও যাবে।'

দিলীপ বসু দুঃখ করে বললেন, ফকরুদ্দিন আলী আমেদের মৃত্যুতে দেশের অনেক ক্ষতি হল। টেনিস হারাল তার শ্রেষ্ঠ সুহৃদকে।

খেলোয়াড় এবং খেলার জন্য একটি দরদী কোমল মন ছিল ফকরুদ্দিন আলী আমেদের। কলকাতার জন্য ছিল কিছুটা দুর্বলতা। কলকাতা যখনই ডেকেছে তখনই তাঁকে পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি হবার আগে সাউথ ক্লাবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের খেলার তিনিই উদ্বোধন করেন। ১৯৭৫ এ নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন করেন বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের। গত বছর ইংল্যান্ডের ক্রুক টাউন ফুটবল দলের উদ্বোধনী খেলার দিনও ইডেনে হাজির ছিলেন। তাঁরই নৈশ ফুটবল উদ্বোধন করার কথা ছিল। কিন্তু বিদেশ সফরের জন্যই আসতে পারেননি।

মন্ট্রিল অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের বিপর্যয়ের পর তাঁর বিবৃতির কথা হয়তো অনেকেরই স্মরণ আছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দল গড়ার নিন্দা করে বলেছিলেন, অন্যান্য দেশের চৌদ্দ পনের বছরের ছেলেমেয়েরা দু হাত ভরে অলিম্পিক থেকে সোনা কুড়োচ্ছে আর আমরা দল গড়ছি যৌবন উত্তীর্ণ খেলোয়াড় নিয়ে। এই বিপর্যয় তারই ফল। পূর্ব জারমানী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের ধাঁচে ক্রীড়াকাঠামো ঢেলে সাজানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। সে উপদেশ মত কিন্তু কাজ হয়নি।
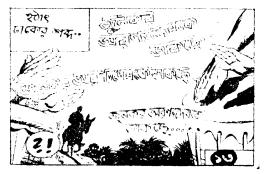
মুকুল

বিজয় অরোরা, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, ভাস্কর চৌধুরী/**পুরস্কার**/পরিচালনা : তপন সিংহ

ফটো : দেশ

রঙ্গজগৎ

ছবির মাধ্যমে একটা গল্প বলতে হবে—এই তো? অন্তত অধিকাংশ বাঙালী চিত্রপরিচালকের কাছে চিত্রপরিচালনাটা এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এখন প্রশ্ন, কি ধরনের গল্প এবং কেমনভাবে বলতে হবে? অর্থাৎ, সমস্যাটা মূলত গল্প বাছার এবং স্টাইল-এর। কিন্তু এ ব্যাপারটা শুধু নামেই সমস্যা, কেননা ছবি করতে করতে অধিকাংশ পরিচালকই এই সমস্যারও অতি সহজ সমাধান তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এবং এতে তাঁরা রীতিমত খুশি ও আপাতত বেশ কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

দুটো কথা কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা ভালো। প্রথমত, এই

প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র

গল্প বাছার ও স্টাইল-এর সমস্যাটা দুই বিপরীত বর্ণের দুজন দিকপাল বাঙালী পরিচালক, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী এবং আরো দু-একজন প্রতিভাবান এবং অধুনা কর্মশূন্য পরিচালকের কাছে চূড়ান্ত দাবীদার হয়ে বারবার এসেছে। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ পরিচালকের কাছে এই সমস্যার রূপটা আশ্চর্যজনকভাবে সিনেমা-ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ অনেকটা এই রকম—এঁদের অনেকেই মনে করেন, যে-কোনো **ভালো গল্প থেকেই ভালো ছবি হতে পারে।** অর্থাৎ সাহিত্যের আবেদন ও সিনেমার আবেদনে মূলত কোনো তফাত নেই, এবং একটা ভালো গল্পকে ছবির ভাষায় 'অনুবাদ' করে দিলেই ভালো সিনেমা হয়ে গেল। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, কোনো গল্প থেকে যখন কোনো ছবি বানানো হয়, মূল সমস্যাটা ট্রানশ্লেশন-এর নয়, ট্রানসক্রিয়েশন-এর। অর্থাৎ একটা মিডিয়াম থেকে অন্য একটি মিডিয়াম-এ আমরা সরে আসছি এবং সে জন্যে আমাদের ভাবনার মধ্যে অনেক কিছু ওলোটপালোটের প্রয়োজন। একটা গল্পকে যে মুহূর্তে আমরা ছবিতে রূপান্তরিত করছি, সে মুহূর্তে আমাদের ভাবনাগুলো যেন সাহিত্যের টারমস্ ছেড়ে ছবি বা সিনেমার টারমস-এ চলে আসে। সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার যোগসূত্র নিশ্চয় একটা আছে। কেননা, দুয়েরই সমস্যাটা কিন্তু এক—কমিউনিকেশন-এর। কিন্তু এ সমস্যা তো সমস্ত শিল্পেরই প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার যে মূল প্রভেদ সেটাও এই সাধারণ সমস্যাটি ঘিরেই। সাহিত্যে কমিউনিকেশন-এর মাধ্যম মূলত কথা বা ভারবাল ল্যাংগুয়েজ। আর সিনেমায় কমিউনিকেশন-এর মাধ্যম মূলত ছবি বা ভিসুয়াল ল্যাংগুয়েজ। শুধু কখনো কখনো একজন অবন ঠাকুর ছবি লেখেন। কিংবা কোনো আচমকা গোদার পর্দার বুকে লেখার পর লেখা ফুটিয়ে ভিসুয়ালস থেকে কিছুটা সরে এসে কমিউনিকেশন-এর সমস্যা পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। **এই সব বেপরোয়া** সৃষ্টিশীল মুহূর্তে আমাদের চলতি

ভাবনার সামনে ট্রাফিক-এর লাল আলো জ্বলে ওঠে। আমরা প্রতিভাকে পথ ছেড়ে দিয়ে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকি।

কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে যেটা ঘটে তাও আমাদের কম ঘাবড়ে দেয় না। আমাদের অধিকাংশ পরিচালকদের গল্প বাছার ব্যাপারটা সত্যিই খুব গন্ডগোলের। গন্ডগোলটা শুরু হয় একেবারে প্রথম থেকে। সিনেমার জন্যে এক ধরনের গল্প বাছা হয় যেগুলো সাহিত্য হিসেবে উত্তীর্ণ কিংবা বেস্ট-সেলারস হিসেবে বাজার সরগরম করেছে। অন্য এক ধরনের গল্প বাছা হয় যেখানে মূল চরিত্রে উত্তমকুমারকে কোনো রকমে টাইপ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এটাই টালিগঞ্জের সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য ফরমুলো। কিন্তু এর বিপদ অনেক।

প্রথমত, সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত গল্প বা উপন্যাস থেকে আমাদের দেশে ছবি হয়েছে অনেক, কিন্তু ভালো ছবি হয়েছে কটা? একা শরৎচন্দ্রই তো টালিগঞ্জের পুষ্টি জুগিয়েছেন বছরের পর বছর। এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তো কম বাংলা ছবির উৎস নন। কিন্তু 'শেষের কবিতা' ছবিটার কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন ভালো সাহিত্য থেকে কত খারাপ ছবি হতে পারে। কিংবা 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' ছবিটার কথা ভাবুন, বুঝতে পারবেন আসল গন্ডগোলটা কোথায়। আসলে সব সময়ে ভালো গল্প থেকে ছবি করা যায় না। তার কারণ, কোনো-কোনো গল্প বা উপন্যাস কিংবা সাহিত্যের কিছু-কিছু ধরণ একান্তভাবে সিনেমা-বিমুখ।

দিন সৃষ্ট হয়েছিল সেই পরিচিত পৃথিবী 'কালে কালে জীর্ণ হল, বাগানগুলো শুকিয়ে এল/ভগবান জমিদারী দেখতে পারেন না।'

কি হল? হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস? হ্যাঁ আপনার আক্ষেপ যথার্থ। নাটকটি গোছাতে গিয়ে কিছু গোলমাল থেকে গেছে। অনেক ছেলেমানুষী প্রশ্রয় পেয়ে গেছে। অনেক অভাবিত সুন্দর কম্পোজিশন, বহু বেদনাময় মুহূর্তের পাশাপাশি চিত্রগুপ্তের কান্না অথবা বার বার কাপড় তোলার রসিকতা—ব্যালান্সের অভাব কিংবা লোকরঞ্জনী মোহিনী মায়া? বহু অংশ সম্পাদনা করা হয়নি আকর্ষণীয় সংলাপের মোহে। প্রথম স্বর্গের দৃশ্যে গুইবাবা ঢোকার আগে পর্যন্ত বিরক্তিকর। ছেলেমানুষী আরও আছে নরক পরিকল্পনায়—কালীপুজোর প্যাণ্ডেলের মত ডাকিনী মূর্তির লাল আলো জ্বলার সংগে হাহা করে পৈশাচিক অট্টহাস্যে। সঙ্গীত পরিচালক দেবাশিস দাশগুপ্ত মাত্র চার-পাঁচটি গান নিয়েই হিমসিম খেয়ে গেছেন। প্রতিটি গান হয় বেসুরো নয় বেতালা। এই সব ত্রুটি শোধরানো দুঃসাধ্য নয়, সেটা আপনিও জানেন। থিয়েটার ওয়র্কশপ তাঁদের নামের আক্ষরিক অর্থ মেনে চলেন। তাঁরা সেই সব দেবতাদের মত নন, যাঁরা 'আবেশে মূর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করেছেন।'

কি হল? আপনাকে যেন কিছুটা বিমুগ্ধ মনে হচ্ছে? আসলে আমরা যত অসাধারণ হতে চেষ্টা করি না কেন, কতকগুলি জায়গায় আমরা মানবিক অনুভূতিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুর পঞ্চমে বাঁধা হয়ে যাই। এই নাটকে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে তাপস সেনের আলো, মনু দত্তের বিরাট সেট, শেষ যুদ্ধের সময় অথবা ঘোড়ুই এর নরকগমনের সময়ের আবহ, হিমাদ্রী ভট্টাচার্য ও দিলীপ দত্তের শব্দগ্রহণ ও শব্দ প্রক্ষেপণে গতিশীল করেছে, যার চমৎকারিত্বে সাধারণ দর্শকের সঙ্গে আপনিও বিস্ময়াহত। অপূর্ব দক্ষতা রূপশিল্পী শক্তি সেনের। প্রচণ্ড হাসির মধ্যে তাঁরই নৈপুণ্যে ক্যালেণ্ডারের দেবতারা মূর্তিমান। নরকের ঘোড়ুই যখন দশ হাতে তাণ্ডব নাচে, মাণিকচাঁদ ফুল্লরা যখন শত্রুর মুখোমুখি অসম যুদ্ধের প্রতীক্ষায়। আরো অনেক মুহূর্ত বাংলা নাটকে স্মরণীয় ছবি হয়ে থাকবে। মুখে মুখে ফিরবে হয়ত একটি গান 'কথা বলো না/কেউ শব্দ করো না।'

কি হল? আপনি যেন একটু নড়ে চড়ে বসলেন? কিছু কিছু অভিনয় আছে, যা দর্শককে নির্লিপ্ত থাকতে দেয় না। সামগ্রিক প্রযোজনার মেরুদণ্ড অভিনয়।

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মল্লিক/ময়না/পরিচালনা : অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটার ওয়র্কশপের মেরুদণ্ডটি জবরদস্ত। মাণিকচাঁদ ও ফুল্লরায় সুদীপ্ত বসু ও সুচেতা দাস মাটির সেই মানুষের উজ্জ্বল প্রতিনিধি, বারমাস্যা যাঁদের কণ্ঠহার, শিকল যাদের পায়ের নূপুর। শেষ সংগ্রামের পর স্বর্গের সঙ্গে তাঁরা দর্শক হৃদয়ও জয় করে নেন। নরকের চরিত্রগুলি আমাদের চাবুক মারে। কারণ নরকের দর্পণে আমাদেরই ছায়া। গুইবাবার ভূমিকায় মাণিক রায়চৌধুরী আবার প্রমাণ করলেন, সাম্প্রতিক থিয়েটারে তিনি একজন জরুরী শিল্পী। আশিস মুখোপাধ্যায়ের 'লেঠাটি' সেই মন্ত্রনাকে রূপায়িত করেছেন 'যার উপরে ভগবানেরও হাত নেই।' ঘোড়ুই-এর চরিত্রে সৌমিত্র চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত দর্শকের ঘৃণাকে কমতে দেননি, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। অন্য দুটি চরিত্রে শর্বানন্দ রায় ও অমিয় মুখোপাধ্যায় যথার্থ জবরী সঙ্গত না করলে নাটকীয় ঝালার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। ব্রহ্মার ভূমিকায় অশোক মুখোপাধ্যায় আদ্যোপান্ত দর্শককে নাড়া দিয়েছেন, এমন কি আপনার উদাসিকতার শিকড়ও। অন্য দুজন দেবতার ভূমিকায় যোগ্য সহযোগী নির্মল রায় ও বিমলেন্দু ঘোষ। ওদের অনেক ত্রুটিও চাপা পড়ে গেছে; যাবেই, স্বয়ং ব্রহ্মা যখন তাঁদের সহায়! এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নারদের। রাম মুখোপাধ্যায় আন্তরিক নিষ্ঠায় সেই কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তাঁর বাচিক বিন্যাসের তুলনায় নারদ অনেক ফিকে, এই নাটকেরই অন্য অংশের তুলনায় প্রথম টাইটেল মিউজিকের মতন। স্বল্প অবকাশে শিবনাথ চৌধুরী ও চিত্ত দে দর্শকমনে দাগ কাটেন। স্বর্গের দেবতা নিয়ে হাস্যরস, দেবভাষার সঙ্গে দশ...এর মিশ্রণ, বর্তমান বাংলা নাটকের একটি সর্বজনীন প্রবণতা। এই বহু ব্যবহৃত [illegible] বাসিতও প্রযোজনা নৈপুণ্যে [illegible] নাটকে সেই অনায় সত্য প্রমাণিত 'ভুলভুলিয়ার ছানাপোনা, দেবতা আছে নাইলনা/অকাজের গোসাই কারো কাজের বেলায় না।'

কি হল? আপনি যেন কিছুটা উদ্দীপ্ত? হ্যাঁ, সঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছে থিয়েটার ওয়র্কশপ অ্যাকাদেমী মঞ্চে। সকলের সঙ্গে আপনাকে আমাকে সচেতন করেছে যুগে যুগে যা থিয়েটার কর্মীর সামাজিক দায়িত্ব। বহুদিনের অনুপস্থিতি নিয়ে অনেক মন্তব্য, কটাক্ষও কিছু কম হয়নি। থিয়েটার ওয়র্কশপ বিরাট এবং ব্যাপকভাবে 'টুইণ্ট'-এর পাদপ্রদীপের ফিরে এসেছেন। একে পুনরাগমন না বলে পুনরাবির্ভাব বলা সঙ্গত। তাঁরা প্রমাণ

মনোহারী মসৃণিত্ব
ম্যাক্সি, মিডি, মিনি! ঠাকরসীর ফ্যাশানের অপূর্ব
সম্ভার থেকে বেছে নিয়ে নতুন রেওয়াজের
পোশাকে নিজেকে প্রকাশ করুন। সবসময়
সবজায়গায় ঠাকরসীর ড্রেস মেটিরিয়াল
আপনাকে অসাধারণ ক'রে তোলে।
ঠাকরসী ফ্যাব্রিক্স
নতুন যুগের দিশারী-
ঠাকরসী ব্লেণ্ড
TF
হিন্দুস্তান স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলস্ লিঃ
Dattaram-TG-42
everfresh®
67% 'Terene' 33% Cotto..
DOUBLE EDGE
'Terene' Suitings
care®
67% 'Terene' 33% Cotton
lene®
80% Polyester, 20% Cotton
Cronlene®
Pol, ster/Cotton
Cronester®
Polyester/Cotton

সাধনা
দশন
সাধনা
টুথ পেস্ট
সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
Sadhana
TOOTH PASTE
SADHANA DASAN
TOOTH POWDER

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হলো

গ্রাহকগণ সংগ্রহ করুন। দাম কুড়ি টাকা

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পৌরাণিক উপন্যাস

পাঞ্চজন্য ১৬৲

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষের অপেক্ষা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনকে শাসন ক্ষমতার প্রধান লক্ষ্য করে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। সেইজন্যই কি তাঁর শঙ্খের নাম দিয়েছিলেন পাঞ্চজন্য? সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

প্রমথনাথ বিশীর
নবতম উপন্যাস

বঙ্গভঙ্গ ১৪৲

১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল এক রাজনৈতিক আন্দোলন—যার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ পেলো রাজনীতির দীক্ষা পেলো বন্দেমাতরম মন্ত্রটি। এই পটভূমিতে লিখিত বঙ্গভঙ্গ—ইহা রাজনীতি বা ইতিহাস নয়—সেদিনকার সুখে দুঃখে আশা ভরসায় গ্রথিত উপন্যাস।

বিশেষ ঘোষণা

আগামী ৯ই মার্চ আমাদের প্রতিষ্ঠানের শুভ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল পুস্তক ব্যবসায়ী, পাঠাগার ও প্রতি পাঠক ও ক্রেতাকে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। এই উপলক্ষ্যে আগামী ৯ই মার্চ বুধবার হইতে ১৫ই মার্চ মঙ্গলবার পর্যন্ত আমাদের সকল প্রকার পুস্তকে প্রতিটি সহৃদয় ক্রেতাকে ১৫% কমিশন দেওয়া হইবে। সহৃদয় পুস্তক-ব্যবসায়ীরাও ঐ সময়ে বিশেষ সুবিধা সকল পুস্তকে পাইবেন।

সদ্য প্রকাশিত একখানি উপন্যাস
আশাপূর্ণা দেবীর

পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি ৮৲

জরাসন্ধের

তৃতীয় নয়ন ৬৲

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা ১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস

আবার কর্ণফুলি আবার সমুদ্র ৮৲

বাংলা উপন্যাসে যাঁরা বিশেষ নতুন রীতি এনেছেন তাঁদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম ও অগ্রগণ্য। এই বইতে তিনি [illegible] করেছেন। সেই সঙ্গে মানুষের [illegible] করেছেন। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ যা [illegible] উপন্যাস সাহিত্যে দুর্লভ।

প্রকাশিত হলো! প্রকাশিত হলো!

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজকৃত

সতাং প্রসঙ্গ (নবস্তবক) ১০৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৮৩/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ / ৩৪-৮৭৯১
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩ / ৩৪-৩৪৯২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "কাশীর ঘাট" (তৈলচিত্র—৪৮" × ৩৬")—খাড়া উঠে যাওয়া ইমারতের ভেতরকার সমান্তরাল অনুভূমিক রেখার বাহুল্যে ছবিটি জমজমাট। পরিচিত দৃশ্য ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন রমেন্দ্রনাথ। ইমারত ও এই ঘাট যেন বহু যুগের ইতিহাস বুকে চেপে আছে। আর নীল আকাশ ও হালকা মেঘ যেন এসব তুচ্ছ সুখদুঃখের ওপরে। রমেন্দ্রনাথের এই কাজের মধ্যে তাঁর ছাপা ছবি বা গ্রাফিক প্রভাব লক্ষণীয়।

(সি ৫৩৪৮২)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিরাট ক্যানভাসে আঁকা
নতুন উপন্যাস

ছবির মানুষ

দাম ৭·০০

একটি জাহাজ আন্দামানের দিকে চলেছে, সেই জাহাজে আছেন একদা স্বাধীনতা-সংগ্রামী কয়েকজন মানুষ। তাঁরা তাঁদের পুরোনো সেলুলার জেল দেখতে যাচ্ছেন। এই যাওয়া মানে অনেক স্মৃতি, অনেক অভিজ্ঞতাকে সাক্ষী রেখে যাওয়া। [illegible] মানুষগুলির এই [illegible] নিজেদের যৌবনের দিকে ফেরা। আর সেই কাহিনী নিয়েই উপন্যাস 'ছবির মানুষ'।

প্রকাশিত হল

এই উপন্যাসে সুনীলের সহজাত দক্ষতার ছাপ যাতে মেলে, সেই প্রেম নেই। তার বদলে তিনি বিষয়ীভূত করে নিয়েছেন জীবনের অন্য অনেক কিছু—অনেক তুচ্ছতা, অনেক মহত্ত্বের উপকরণ। আর, এই সবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের কতকগুলি মানুষ আমাদের চোখের সামনে অত্যন্ত জীবন্ত-ভাবে হাজির হয়েছেন। অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে দ্রুত পদসঞ্চারের ফল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল পটভূমিকা, যেখানে এক ব্যাপকতর পরিসরে অসামান্য এই মানুষ-গুলি সমগ্রতায় প্রতিভাত। 'ছবির মানুষ'-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিরাট ক্যানভাসে নিখুঁত ছবি এঁকেছেন অতীতের, বর্তমানের; আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেকালের, চিরকালের।

সব মিলিয়ে 'ছবির মানুষ' এক নতুন স্বাদের রচনা, যা উপন্যাস হয়েও ইতিহাস, ইতিহাস হয়েও উপন্যাসতর॥

সমরেশ বসুর উপন্যাস
প্রাচীর ৭·০০

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস
বন উপবন ৬·০০

বিমল করের উপন্যাস
দংশন ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস
দ্বিতীয় প্রেম ৩·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস
আমিই সে ৭·০০

বিমল মিত্রের উপন্যাস
রং বদলায় ৫·০০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ

উলঙ্গ রাজা ৪.০০

নবম মুদ্রণ প্রকাশিত হল

কেতকী কুশারী ডাইসন-এর

কবিতা সংকলন

বল্কল

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রকাশিত হল

ছোট একটি বছর বারোর ছেলে। জঙ্গলের মধ্যে [illegible] অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। সারা দেহে তার আঘাতের চিহ্ন। একসময়ে ছেলেটির জ্ঞান ফিরল। কিন্তু তখন আর সে কিছুই মনে করতে পারছিল না। কি তার নাম, কে তার বাবা, কোথায় তাদের বাড়ি, এখানে এমনভাবে পড়েই বা আছে কেন, কি করে এল এখানে, কি হয়েছিল কিছু না। লোকে জিজ্ঞেস করলে নিজের নাম বলতে পারবে না। অগত্যা সে নিজেই নিজের একটা নাম বানিয়ে নিল—ফটিকচাঁদ পাল।

ফটিকচাঁদ সেই স্মৃতিভ্রষ্ট বালকটির স্মৃতি হারানো এবং স্মৃতি ফিরে পাওয়ার এক দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প। যদিও এটি গোয়েন্দা ফেলুদার বোধবুদ্ধি-ধাঁধানো কোনও রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের গল্প কিংবা প্রোফেসর শঙ্কুর চমকে দেওয়া কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী নয়, তবু যে-কোনও সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা গল্পই যে সত্যজিৎ রায়ের হাতে কতখানি অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, 'ফটিকচাঁদ' তার এক উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা অনেকগুলি ইলাসট্রেশন এবং প্রচ্ছদ এ বইয়ের অতিরিক্ত আকর্ষণ ॥ দাম ৮·০০ ॥

সত্যজিৎ রায়ের

ছোটদের আর একটি আশ্চর্য বই

ফটিকচাঁদ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৬৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯
শনিবার ২১ ফাল্গুন ১৩৮৩

'পরশাসিত বুদ্ধিবাদ'

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে প্রসঙ্গত এমন একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যেটা কোন রাজনীতিক তর্কের অধীন বিষয় নয়। বরং বলা চলে, প্রধানমন্ত্রী বস্তুত জাতীয় মহত্ত্বের অনুগত একটি চারিত্রিক সম্বলের উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিক কালে দেশবাসীর পক্ষে মনের দিক দিয়ে একটি বড় লাভ এই হয়েছে যে, নিজের দেশীয়তা অর্থাৎ তার ভারতীয় পরিচয় তার মনে একটি প্রসন্ন গর্ববোধ সঞ্চারিত করেছে। সরল করে বলা যায়, ব্যক্তি তার ভারতীয়তার সত্য উপলব্ধি করতে গিয়ে একটি সঙ্গত গর্বের বোধে প্রসন্ন হবার হেতু পেয়েছে। 'আমি ভারতীয়'—আত্মপরিচয়ের এই সত্যটিই যেন আত্মসম্মানের নতুন উপলব্ধি সম্ভব করেছে। ঘোষিত জরুরী অবস্থার প্রভাবে ভারতীয় ব্যক্তির মনে এই ধরনের কোন মানসিক প্রকৃতির জাগৃতি নতুন করে সম্ভব হয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নে অনেক তর্কাতর্কি ও বাদ-প্রতিবাদ হতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক অথবা সমাজিক সত্যের যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষিত করে এমন সিদ্ধান্তের কাছে পৌঁছাতে পারা যায় না যে, নিজেকে ভারতীয় বলে বোধ করতে গিয়ে নতুন এক গর্ববোধের সম্বল লাভ করতে হলে জরুরী অবস্থার ঘোষণা দরকার হয়। এটা প্রধানমন্ত্রীরও প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। সাধারণ মানুষের মনে তার দেশিক ও জাতিক পরিচয়ের গর্ব বিনষ্ট অথবা বিকৃত হয়ে যায়নি। বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে দেশের বুদ্ধিবাদী সমাজের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ভিন্নতর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পরশাসনের প্রভাব ও অধীনতা থেকে ভারতীয় রাজনীতিক জীবনের মুক্তি সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতীয় বুদ্ধিবাদীর চিন্তা অভিরুচি ও মানসিক প্রকৃতি পরশাসনের অধীনতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চিন্তার ক্ষেত্রে বিদেশীয় রুচি প্রত্যয় ও সংস্কারের প্রতি ভারতীয় বুদ্ধিবাদীর দাস্যতা জাতির সাংস্কৃতিক সম্মান ও সুস্থতার একটি প্রতিবন্ধক হয়েছে। তিনি যে 'ইনটেলেকচুয়াল কলোনিয়ালিজম'-এর উল্লেখ করেছেন, তার প্রত্যক্ষ কুফল হলো নিজের দেশ ও দেশিক পরিচয় সম্বন্ধে ব্যক্তির গর্ববোধের নিতান্ত শূন্যতা।

নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচিত করতে গিয়ে, অথবা বোধ করতে গিয়ে যদি কোন ভারতীয়ের প্রাণের নিঃশ্বাস উদাস হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে যে তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সমুচিত স্বাস্থ্যে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। কবি লর্ড বায়রনের একটি উক্তি: দোষী হোক বা নির্দোষ হোক, আমার দেশ হলো আমার দেশ। ভারতীয় মনস্বিতার বাণীতে অবশ্য ঠিক এরকম অথবা এতটা কট্টর দেশপ্রীতির কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। দেশীয় ও জাতীয় জীবনের অজস্র ত্রুটি গ্লানি ও বিকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন যাঁরা, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—তাঁরা কিন্তু তাঁদের প্রিয় ভারতগর্বের মূলে সংস্কারটিকে একটুও ক্ষুণ্ণ ও ব্যথিত করেননি। ভারত বলতে এবং ভারতীয় বলে নিজেকে অনুভব করতে গিয়ে যে গর্ব তাঁরা বোধ করেছেন ও প্রসন্ন হয়েছেন, তার মধ্যে রুচ প্রকারের আত্মশ্লাঘার প্রশ্রয় ছিল না। নিজ দেশের ও নিজ জাতির শত ভুলত্রুটির সমালোচক হয়েও তাঁরা আত্মসম্মানবোধের সেই মহত্ত্বময় সংস্কার পরিপোষণ করেছেন, যেটা প্রত্যেক জাতির সার্বিক চেতনা ও চরিত্রের একটি ঐতিহাসিক উৎকর্ষের প্রধান প্রেরণা।

বিদেশীয় ভাষা সাহিত্য ও জ্ঞানতত্ত্বের নানা সম্বলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্রে ভারতীয় জীবনের অনেক নতুন উপকার হয়েছে, এই সত্যে কোন সংশয় নেই। কিন্তু একটি বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে, এই সূত্রে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ভারতীয়ের চিত্তে স্বাদেশিক ঐতিহ্যের সম্পর্কে নিদারুণ রকমের একটি তুচ্ছতার বোধ এবং অজ্ঞানতা সঞ্চারিত হয়েছে। বিদেশীয় মনস্বিতার একটি উদ্ধত আগ্রহে ভারতীয়তার ঐতিহ্যকে গুণে-মানে একটি নিকৃষ্ট পরিণামের ধারা বলে দুই শতাব্দী ধরে অত্যন্ত প্রবল মুখরতার সঙ্গে প্রচারিত করা হয়েছে। জনজীবনেরই একটি বিশেষ অংশের মানসিক প্রকৃতি সহজেই এই বিদেশীয় অভিমতের দাসত্ব গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনীতিক সত্যের রূপে আর ভারত-জীবনের প্রভুত্বে সমাসীন নয় বটে, কিন্তু মানসিক সত্যের রূপে এখনও ভারতজীবনের আত্মসম্মানের সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। যদি বিদেশীয় প্রশস্তির জন্য তৃষ্ণাতুর একটা আগ্রহ ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিপালিত হতে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, যথার্থ সাংস্কৃতিক মহত্ত্বের সৃষ্টি এমনতর মানসিকতার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। এমন ভারতীয় আছেন যিনি অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগীদের দীনহীন কৃতিত্বের দৃশ্য দেখে নিজের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাঁর ধারণা, এহেন ভারত নিতান্ত অপদার্থ একটা দেশ। জাতির মহত্ত্বের অথবা কৃতিত্বের কোন সত্যকে এভাবে খণ্ডিতভাবে বিচার করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে যে বিপদের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সেটা হলো 'পরানুকরণ'। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় জীবনে এখনও পরানুকরণের মোহময় প্রভাব জাগ্রত আছে। 'ভারত আমাদিগকে (পশ্চিমকে) কী শিক্ষা দিতে পারে'—ম্যাক্সমুলারের এই বিখ্যাত প্রশ্নটি এক হিসাবে আধুনিক সেইসব ভারতীয়ের পক্ষে একটি বিশেষ সত্যের শিক্ষা, যার প্রধান নির্ণয় এই যে, ভারত ও ভারতীয়ের প্রতিভা, দুইই আধুনিক বিশ্বের জীবনে অনেক আদর্শোচিত উৎকর্ষের ও অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করতে পারে। অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলা হয় যে, ভারতীয়ের পক্ষে তার ভারতগর্বের নতুন জাগৃতি বস্তুত তার মানসমুক্তির একটি ঐতিহাসিক প্রকাশ।

কলকাতা থেকে লণ্ডন সরাসরি সেভেন-ফোর-সেভেন ফ্লাইট শীঘ্রই আসছে।

শীঘ্রই প্রতি সপ্তাহে তিনটি* একস্টপ ফ্লাইট।

মাথার উপরে লকার থাকায় পা ছড়াবার প্রচুর জায়গা থাকবে।

ফার্স্ট-ক্লাশ যাত্রীদের জন্য নিজস্ব লাউঞ্জ বারের বৈভব।

পৃথিবীর প্রশস্ততম এয়ার লাইনের যত্ন ও সাচ্ছন্দ্য উপভোগ করুন।

সঙ্গীত এবং ফিল্ম* আপনার নিজের হেডসেট থেকে পাবেন।

বিশদ বিবরণ দেবেন আপনার ট্রাভেল এজেন্ট।

৭ই এপ্রিল থেকে একমাত্র বৃটীশ এয়ারওয়েজই সেভেন-ফোর-সেভেন লণ্ডনে যাবার দ্রুততম সুপার ফ্লাইট আনছেন।

অব্যাহত থাকবে আমাদের সাদর সম্বর্দ্ধনা—আপনার উপস্থিতিতে আমরা হব ধন্য।

British airways

We'll take more care of you.

* তৃতীয় ফ্লাইট শুরু হবে ৮ই জুলাই থেকে।

* ফিল্ম ও সঙ্গীতের জন্য ইকনমী ক্লাশ যাত্রীদের একটা নামমাত্র মূল্য দিতে হবে

FCB.OBM-3559 BEN

দৃষ্টিকোণ

শিল্পীর সংসর্গ দুই

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় আমার এক বান্ধবী আছেন যাঁর ভুরু আঁকার পেনসিল দিয়ে কোনো বাঙালী শিল্পী আজ থেকে বছর দশেক আগে একটি ছবি এঁকেছিলেন। জোরালো, দীর্ঘ, প্রায় ছেদহীন রেখার ছবি—এক জোড়া দৃপ্ত অশ্ব, যাদের দেহের সামনের অংশ বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ, এবং সীমান্তভাগ কিছু ঝোড়ো রেখার দাপটে ছত্রভঙ্গ, একাকার। ছবিটা দেখামাত্র, মনে আছে, একটা টনটনানি ধাক্কা লেগেছিল বুকে, কেননা মনে হয়েছিল, যদিও মুহূর্তের জন্যে, যে ছবিটি হয়তো হুসেনেরই কোনো স্বল্প-পরিচিত প্রক্ষিপ্ত ক্যানভাস যা বিশ্বজোড়া আর্ট-র‍্যাকেট-এর ঠাসবুনন জাল দিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে গলে গিয়ে ঝুলে রয়েছে আমার বান্ধবীর বাড়িতে (যিনি নিজে আঁকেন এবং ছবি ভালোবাসেন!), গেরস্থ প্রাত্যহিকতার সরগরম মজলিসে, কোনো বিদেশী, বরফ-স্তব্ধ আর্ট গ্যালারি কিংবা কোনো দেশীয় লাখপতির সোচ্চার, দাম্ভিক ড্রয়িংরুমে নয়।

না, আমার চেনাশোনা কোনো বাঙালী বাড়িতে আমি মকবুল ফিদা হুসেনের আঁকা কোনো ছবি কখনো দেখিনি। এবং সেটাই তো স্বাভাবিক, যেহেতু উচ্চকণ্ঠ, বিজ্ঞাপন-নিযাতিত, ডলার-প্লাবিত পশ্চিমী আর্ট-মার্কেটে হুসেনই আধুনিক ভারতীয় শিল্পের একক, নিরঙ্কুশ ঘোষণা এবং যেহেতু পিকাসো, মাতিস, মুর-এর ধুরন্ধর বাণিজ্যিক সাফল্যের পাশাপাশি একমাত্র হুসেনকেই রঙের তাস হিসেবে আমরা খেলতে পারি। হুসেনের অবিরল সৃষ্টিশীলতাকে মূলধন করে যাঁরা ফাঁপিয়ে তুলেছেন বিচিত্র বেলুন, পৃথিবী জুড়ে লটকে দিয়েছেন বিজ্ঞাপন, অদৃশ্য জাল ছড়িয়ে দিয়েছেন বছরের পর বছর আর তারপর টেনে তুলেছেন অকল্পিত স্বর্ণমুদ্রা তাঁদের মধ্যে বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিশ্চয় নেই। এই কলকাতারই ডোভার পার্কে এক অবাঙালী ধনীর ইন্দ্রপুরীতে আমি একখণ্ড হুসেন একদা দেখেছিলাম এবং পরে জেনেছিলাম সে-বাড়ির মেমসাহেব ছবি এবং বই কিনে থাকেন। এবং তাঁর বিশাল, চমক লাগানো বুক-কেস-এর সমস্ত বই একেবারে এক মাপের, এমনি তীব্র এই মেমসাহেবের শিল্প-চেতনা! এবং যেহেতু এক মাপের বই পাওয়া ক্রমেই তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি টেলিফোন-ডিরেকটরি সারিবদ্ধভাবে বাঁধিয়ে রেখে তাঁর সমস্যার সমাধান করেছেন!

ক' বছর আগের কথা। সবে লিখতে শুরু করেছি। এবং সব সময়ে লেখার জন্যে মনে মনে একটা ছটফটানি অনুভব করি। একটি ইংরেজি পত্রিকা থেকে আমায় টেলিফোনে বলা হল, হুসেন কলকাতায় আসছেন, আমি যেন তাঁকে সেই পত্রিকার জন্যে একটা ইনটারভিউ করি। হুসেন আসছেন ঠিক, কিন্তু তিনি ঠিক কবে আসছেন, কোথায় উঠবেন, আর কতদিন থাকবেন, এসব অতি-প্রয়োজনীয় তথ্যের কিছুই আমাকে জানানো হল না, কেননা সেটা পরে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম, সম্ভব ছিল না। পত্রিকার সম্পাদক ইংরেজিতে যা বললেন তার হুবহু তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় : হুসেন অতীব কঠিন বাদাম, ভাঙা শক্ত। আমি প্রথমেই এমন দু-চারজনের কাছে ছোটাছুটি করলাম যাঁরা কোনো-না-কোনো সময়ে হুসেনের সংস্পর্শে এসেছেন। আমার ইচ্ছে ছিল এঁদের কাছ থেকে হুসেনের বিষয়ে আগে থেকে যতোটা পারি জেনে নেয়া। এবং সেদিক থেকে আমি আশাতীতভাবে সফলও হলাম। অর্থাৎ, একজন হুসেনের পরিবর্তে আমি পেয়ে গেলাম বিভিন্ন হুসেনের এক বিচিত্র সমাবেশ, একে অন্যের প্রায় সম্পূর্ণ বিরোধী, বিপ্রতীপ। কেউ বললেন, হুসেনের কোনো-কোনো ছবির দাম লাখ টাকা পর্যন্ত পৌঁছলেও, হুসেনের কাছে সে-টাকার একটি খুদে ভগ্নাংশ আসে হয়তো, এবং তিনি আজও দরিদ্র, এতদূর যে তাঁকে খালি পায়ে পথ হাঁটতে হয়, এক জোড়া জুতোও তাঁর পকেট অনুমোদন করে না। আবার কেউ বললেন হুসেন সেই সব বিরল কোটিপতি শিল্পীদের একজন যাঁরা অতি যত্নবান ছাঁচে গড়ে নিয়েছেন তাঁদের ব্যবহারিক ঔদাসীন্য, উড়ুক্কু চুল, আর এলোমেলো দৃষ্টি আর ভাবনা-কুঞ্চিত অন্যমনস্ক কপাল। যেমন ধরুন পিকাসো—যিনি, শোনা গেছে, তাঁর সিগারেট-এর খরচ হিসেবে পকেটে রেখে দিতেন ভীতিকর ষাট হাজার টাকা এবং ছুটির সমুদ্রতীর থেকে বেছে নিতেন যে-কোনো সঙ্গলিপ্সু বহুচারিণীকে তাঁর অনুপ্রেরণা ও সম্ভোগের ক্ষণিক জ্বালানি হিসেবে, তিনিও কি ছিলেন না যত্নবানভাবে উদাসীন, নির্লিপ্ত, সাংসারিককাণ্ডজ্ঞানশূন্য? আবার কারো কাছে শুনলাম, হুসেন একজন বেপরোয়া বোহিমিয়ান, একেবারে উপচে-পড়া, বাঁধভাঙা এক মানুষ, সামাজিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং ভালোমানুষী সাংসারিকতার চূড়ান্ত বিরোধী। এবং আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বললেন, হুসেনের সঙ্গে দেখা না করার চেষ্টাই আমার পক্ষে উচিত কাজ হবে, কেননা হুসেন এই বন্ধুটির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের মাঝখানে 'একটু আসছি' বলে সেই যে পাশের ঘরে ঢুকলেন, আর বেরলেন না। পনেরো দিন পরে তাঁর পাত্তা পাওয়া গেল জাপানে। এই সব অসংলগ্ন তথ্য পকেটে পুরে আমার পরের কাজ হল কলকাতায় হুসেনকে পাকড়াও করা। এবং সে-জন্যে আমি ক্রমাগত শেয়ালদার 'পবিত্র হিন্দু হোটেল' থেকে আরম্ভ করে 'হোটেল হিন্দুস্থান' পর্যন্ত টেলিফোনে খোঁজ নিতে লাগলাম, এম এফ হুসেন বলে কেউ সম্প্রতি এদের কোথাও অতিথি হয়েছেন কি না। এবং ঠিক দু-দিন পরের সকালবেলা শিল্পীর সঙ্গে টেলিফোনে সংলগ্ন হলাম কলকাতার এক পঞ্চ-তারকা খচিত বিলাসবহুল হোটেলে। পরের দিন সকাল আটটায় সাক্ষাৎকারের সময় দিলেন। মনে মনে ভাবলাম, হুসেন সত্যিই উঁচু ঘোড়ার আরোহী নন, যেন বড্ড বেশি সহজেই ধরা দিলেন আমাকে। পরের দিন ঠিক আটটায় হুসেনের হোটেলে গিয়ে শুনলাম, তিনি সকালের প্লেনে দিল্লি চলে গেছেন, সেই রকমই তো ঠিক ছিল তাঁর।

এই ঘটনার মাস খানেক বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো আর্ট-মিউজিয়াম-এর এলিভেটরে যে-ব্যক্তিটির সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলাম তিনিই ছিলেন মকবুল ফিদা হুসেন! আমি জানি, ঘটনাটি স্বয়ং রিপলের পক্ষেও হিংসে করার মত। তবুও হুসেনকে চিনতে মুহূর্তের বিলম্ব হয়নি। লম্বা, ঋজু গঠনের মজবুত শরীর, চুল আর দাড়ি রেশমী রুপোলী, চোখের দৃষ্টি পিছলে যাওয়া পারদের মতো তরল, বোতাম-স্বাধীন বুক, আর খালি পা। সেই যে দেখা হল, পাস দুটি ঘণ্টা এক সঙ্গে। কিন্তু নিজের ছবির প্রসঙ্গে প্রায় পাঁকাল মাছের মতো ধরা দিয়েও দিলেন না। "আপনি একজন ভারতীয় শিল্পী, কিন্তু এ-গরীব দেশে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা দিয়ে একটি ছবি কেনার মতো লোক অন্তত সত্যিকার সমঝদারদের মধ্যে ক'জন আছেন বলে আপনার ধারণা?" এ প্রশ্নের উত্তরে হাসি, শ্রাগ এবং অস্পষ্ট কিছু উচ্চারণ ছাড়া কিছুই পেলাম না। কিন্তু যা পেলাম সেটাও আশা করে

॥ ৩৯ ॥

সহদেবের কথার ধরণ দেখে মনে হয়েছিল কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ব্যাপারটা অত নাটকীয় নয়।

সহদেব বললো, "কী ব্যাপার বুঝলাম না, সায়েব। দিদিমণি নিজে ডেকে বলে গেলেন, আপনার খোঁজ করতে এবং আপনার ঘরে দুজনের জলখাবার পাঠিয়ে দিতে।"

সহদেব অনর্গল কথা বলে যায়। সে বললো, "আমি ভেবেছিলুম দিদিমণি নিজেও আপনার ঘরে এসে জলখাবার খাবেন। কিন্তু পরে শুনলাম, আপনার কোন্ আত্মীয় আসবেন—তাকে আনতেই আপনি বেরিয়েছেন।"

আমি উত্তর দিলাম, "তুমি দুজনের মতোই খাবারের ব্যবস্থা করো। কিন্তু কী খাওয়াচ্ছ তুমি, সহদেব?"

একগাল হেসে সহদেব জানিয়ে দিল, "আপনার কোনো চয়েস নেই, সাহেব। দিদিমণি নিজেই অর্ডার দিয়েছেন। এক প্লেট আলু-চচ্চড়ি তো দিদিমণি নিজেই ঘরে রান্না করে আমার হাতে দিয়ে দিলেন।"

ভাবলাম একবার সহদেবকে দিয়ে সুলেখার কাছে খবর পাঠাই, আমরা নিরাপদে এখানে পৌঁচেছি। বাবার খবরের জন্যে বেচারা এতক্ষণ নিশ্চয় খুবই চিন্তিত হয়ে রয়েছে। সহদেবকে অনুরোধ করলে সে নিশ্চয় রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারী পিক-আপ ভ্যান থেকে অর্জুন চৌধুরীর নামবার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এই মুহূর্তে সীমা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছে। তাকে জ্বালাতন করাটা এখন কোনো ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হবে না।

সহদেব জিজ্ঞেস করলো, "আপনার সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি আপনার কে হন?" বিলিতি ভব্যতা অনুযায়ী যাই হোক, এই ধরনের কৌতূহল দিশী মতে মোটেই অশোভন নয়।

কী উত্তর দেবো ভাবছি, এমন সময় সহদেব একগাল হেসে নিজেই ঘোষণা করলো, "দিদিমণি বল-ছিলেন আপনার মেসোমশায়!"

মেসোমশায়! সম্পর্কটা মন্দ নয়। বীরেন চ্যাটারজি অবশ্যই আমার মেসো-মশাই হতে পারেন। সুতরাং আমি আর প্রতিবাদ করলাম না।

সহদেব এবার জিজ্ঞেস করলো, "দিদি-মণির সঙ্গে ওঁরও চেনা আছে নাকি?"

এবার উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু এমনভাবে হাসলাম যার অর্থ হাঁ অথবা না দুই হতে পারে। সহদেব বুঝলো, আমি এখন একটু দূরত্ব রেখে চলতে অগ্রহী। সে আমাকে আর প্রশ্নবাণে বিরক্ত করলো না।

বীরেন চাটুজ্জে এখানে আসা পর্যন্ত ছটফট করছেন। তিনি জানতে চাইলেন, "সীমা কখন আসবে?"

সীমা যতটুকু প্রয়োজন তার এক মুহূর্ত বেশী দেরি করবে না, এ কথা জানালাম বীরেন চ্যাটার্জিকে। কিন্তু তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "সীমার হোস্টেল এখান থেকে কত দূরে? ওখানে ঢুকতে না দিলেও, আমরা তো গেটের কাছ থেকে দারোয়ানের থ্রু দিয়ে সীমাকে ডেকে পাঠাতে পারি।"

ছোট ছেলেকে যেভাবে ভোলায় সেই-ভাবে আমি একের পর এক মিথ্যা কথার জাল বুনে যেতে বাধ্য হলাম। বললাম, "একটুও চিন্তা করবেন না, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আপনার।"

সহদেব ইতিমধ্যে আমাদের দুজনের জন্যে খাবার এনে হাজির করেছে। আমার ঘরে একখানা বাড়তি প্লেট অথবা জলের গেলাস নেই। শুধু খাবার এনে হাজির করলে আমাকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যেতে হত। কিন্তু সহদেব আমাকে সে অবস্থায় ফেলেনি। নিজে থেকেই সে কাঁচের প্লেট ও ডিশে লুচি, বেগুন ভাজা, তরকারি, মিষ্টি ইত্যাদি সাজিয়ে এনেছে। সঙ্গে সুন্দর হালকা গোলাপী রঙের কাপ-ডিশ। ধূমায়িত চা টিপটের মধ্যে অপেক্ষা করছে।

সহদেবকে ধন্যবাদ জানাবো ভাবছিলাম। কিন্তু সহদেব এই অবস্থায় আমাকে বিপদে ফেলে দিল। একগাল হেসে বীরেনবাবুর সামনেই সে বলে ফেললো, সুলেখা দিদিমণি নিজে এই সব কাঁচের বাসন সহদেবের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ও সুলেখা সম্বন্ধে যত কথা বীরেনবাবুকে বলেছি তা তাকে বলতেই হবে। ওর কথাবার্তা একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ অনিবার্য।

আপিস ঘরে বসেও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার অজান্তে সুলেখার অতিথি যদি বিদায় নেন এবং বাবাকে দেখার উত্তেজনায় সুলেখা যদি সোজা আমার ঘরে চলে যায় তা হলে বিপদের অন্ত থাকবে না।

চৌত্রিশ নম্বরে যখন সশরীরে হাজিরা দেবার উপায় নেই, তখন সুলেখাকে একটা টেলিফোন করলে কী হয়? হাজার হোক মিস্টার চৌধুরী তো অনেকক্ষণ এসেছেন। আর কতক্ষণ তিনি এইভাবে সুলেখাকে ধরে রেখে তার বাবাকে অসহ্য যন্ত্রণা দেবেন? বোধ হয় সুলেখাকে একটা টেলিফোন করাই যুক্তিযুক্ত। কোনো রকমে ডিসটার্বড না হলে মিস্টার চৌধুরী যে কখন বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত নেবেন তা কেউ জানে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করছে।

টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করতে গিয়েও মনটা অকস্মাৎ সংশয়ে ভরে উঠলো। মনে হল, পত্রিকালয়ের নিষ্ঠাবান কর্মচারী হিসেবে কেমন সহজে আমি কাজ করে চলেছি। জেসমালোনি, চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট, মিস্টার অর্জুন চৌধুরী, সুলেখা সেন সব মিলিয়ে যে বিসদৃশ পরিস্থিতি এই সুসভ্য নগরীতে গড়ে উঠেছে, তার কোনো প্রতিকার নেই প্রতিবাদও নেই। ঐশ্বর্যময়ী এই নগরীতে প্রতিদিন অন্যায়ের স্রোত কেমন অনায়াসে দিবা-রাত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

দিনে দিনে এই অন্যায় বিপুলাকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি নেই।

অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থ্যাকারে ম্যানসনের সিমেণ্ট বাঁধানো দীর্ঘ ড্রাইভ-ওয়েতে কিছুক্ষণ পায়চারি করে নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। থ্যাকারে ম্যানসনের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে শত শত ওয়াটের আলো জ্বলতে শুরু করেছে। দূর থেকে এই আলো-আঁধারি এমন এক রহস্য সৃষ্টি করছে যার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই।

"সেলাম সাব", কে যেন এই অন্ধকারে আমাকে সেলাম ঠুকলো।

মুখ তুলে দেখলাম মদনা, তার ঝকঝকে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"কী এত ভাবছেন, হুজুর?" মদনা এবার আমায় জিজ্ঞেস করলো। "দুবার আপনাকে সেলাম করলাম আপনি দেখতেই পেলেন না!"

মদনাকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি ঠিক অপছন্দ করতে পারি না। ওর মধ্যে কোথায় একটা উষ্ণ আন্তরিকতা আছে যা কিছুতেই অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে দিতে পারি না।

মদনা বললো, "আমি জানি স্যার আপনি পোয়েট্রি লেখেন। পোয়েট্রি লিখতে হলে মাথা গরম হয়ে যায়, আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু অত ভাববেন না, স্যার।"

"কেন? বলো তো?" মদনার উদ্বেগের কারণটা আমি বুঝতে পারি না।

"অত মাথা ঘামালে শরীর খারাপ হয়, হুজুর।" মদনা উত্তর দিল। তারপর বললো, পোয়েট্রি লেখায় সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তবে যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে তা জানালেই সে ঝটাঝট তার সমাধান করে দেবে। "এ বাড়ির কেউ যদি আপনার পিছনে লাগে আমাকে একটিবার হুকুম করে ডেকে পাঠাবেন— তারপর সে ব্যাটার তেরোটা বাজিয়ে তবে ছাড়বো!"

হাতের গোড়ায় আর কাউকে না পেয়ে মদনাকেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। মদনা তার আগেই আবার শুনিয়ে দিল, "আমি যতক্ষণ এ বাড়িতে আছি ততক্ষণ আপনি একটুও ভাববেন না, স্যার।"

"এখানে সব কিছু ঠিক মতো চলে না কেন বলো তো?" প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরোবার পরেই মনে হলো মদনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করাটা আমার উচিত হয় নি।

মদনা নিজেও কিছু বুঝতে পারছে না। "কী বলছেন হুজুর? ঠিক মতো তেল না দিলে কোনো কিছুই ঠিক মতো চলে না— কলকব্জার ব্যাপার তো!"

মদনাকে আর বোকার মতো প্রশ্ন করে বিব্রত করবো না। "মদনা, তুমি চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট চেনো?"

"সবই চিনি স্যার। তবে ওখানে ইন্দোবেঙ্গল ব্যাপারটা মাকালীর দিব্যি বলছি, ওখানে আমি কখনও নাক গলাইনি।"

একটু থেমে মদনা জানতে চাইলো, "কিছু দরকার আছে স্যার?"

কথাটা কীভাবে পাড়বো ভাবছি। মদনা নিজেই এবার আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "ওখানে হুজ্জুত স্যার। বড় কোনো পার্টি এসেছে—আমি নিজের চোখে দেখেছি, কিছুক্ষণ আগে।"

বললাম, "মদনা, তোমাকে এখন ডিসটার্ব করতে হবে না। কিন্তু একটু নজর রাখবে? চৌত্রিশ নম্বরের সিঁড়িটার ধার থেকে কেউ বেরোলেই আমি খবরটা চাই।"

মদনা সঙ্গে সঙ্গে জানালো, "চৌত্রিশের মতো খবর পেয়ে যাবেন স্যার। আমি এখনই সিঁড়িতে গিয়ে বসছি। নিঃশব্দে [illegible] আপনার কাছে টেলিফোন চলে আসবে।"

মদনা এবার দ্রুতবেগে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল এবং আমি আবার অফিস ঘরে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করলাম। কাজকর্ম সব মাথায় উঠেছে। সীমার বাবাকে [illegible] নিরাপদে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত ম্যানসনের কোনো শব্দকেই হিসেব আর মাথায় ঢুকবে না।

সীমা তার বাবাকে নিয়ে আজ রাতে কী ব্যবস্থা করবে তাও জানি না। আমি নিজেই খাওয়ার জোগাড় করে রাখবো কিনা ভাবছি। পরের মুহূর্তে সহদেবের কথা মনে পড়লো। সে যখন জলখাবারের অমন ব্যবস্থা করলো, তখন রাত্রেও নিশ্চয় কোনো স্পেশাল আয়োজন হচ্ছে।

ঘড়ির দিকে আবার নজর পড়ে গেল। এতক্ষণেও মিস্টার অর্জুন চৌধুরী বিদায় নেবার সময় হলো না? হঠাৎ সন্দেহ হলো, মদনা এখনও সিঁড়িতে বসে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দিকে ঠিক মতো নজর রেখেছে তো?

মদনার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। সুতরাং অগতির গতি টেলিফোনটাই এবার ব্যবহার করবো কিনা ভাবছি।

টেলিফোনের রিসিভারটা সবে হাতে তুলে নিচ্ছি এমন সময় পুরনো কণ্ঠস্বর। ফোন করা হলো না। ঘাড় ফিরিয়ে যাকে দেখলাম আজ রাতে এই সময় আমি মোটেই আমার অফিস ঘরে প্রত্যাশা করি নি।

"নমস্কার। কেমন আছেন?" মিস্টার আর সি ঘোষ তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময় করলেন।

"আরে! আপনি! এমন সময়?" ঘোষ মশায়কে দেখে সত্যিই আমি একটু অবাক হয়ে গেছি।

আর সি ঘোষ আজ তাঁর মসলিনের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরেন নি। চকচকে স্যুটসজ্জায় তাঁকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে।

"আপনার তো আজ কলকাতার বাইরে থাকবার কথা।" আমি জিজ্ঞেস করি আর সি ঘোষকে। হাজার হোক হাওড়া কোর্টের খাস কলকাতার লোক তিনি—ওঁর সঙ্গে অন্য পাঁচজন ভাড়াটের মতো কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না।

আর সি ঘোষ বললেন, "টেলিফোনটা সেরে নিন, তারপর কথাবার্তা হবে।"

কিন্তু পৃথিবীর অন্য কারও উপস্থিতিতে সুলেখাকে টেলিফোন করা যায় না। মনে মনে বললাম, 'তোমার নামে ভাড়া দেওয়া ফ্ল্যাটেই যত রকম গোলমাল হচ্ছে। তোমার মালিকদের সর্বনাশা লোভের জালেই কিছুটা জড়িয়ে পড়েছি আমি এবং কষ্ট পাচ্ছি।'

আর সি ঘোষকে চটপট বিদায় করে দেওয়া দরকার—না হলে টেলিফোনে সুলেখার সঙ্গে যোগাযোগে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

"কলকাতার বাইরে যান নি আপনি?" জিজ্ঞেস করি আর সি ঘোষকে।

...: 'তিনি গিয়েছিলেন এবং আজ ...ক্ষণ আগে ফিরেও এসেছেন।

ধবধবে জামাকাপড় পরলেও আর সি ...কের মুখে চিন্তার ছায়া পড়েছে। আমি ...লাম, "কী? মেয়ের কাছে গিয়েও ...পিসের কাজকর্মের কথা ভাবছিলেন ...?"

"দিশী আপিসের চাকরি, মশাই। দুশ্চিন্তা ত্যাগ করবো বললেই কি ত্যাগ করা যায়?"

এই পর্যন্ত সহজভাবেই বললেন আর সি ঘোষ। তারপর ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন, "আপনার ভাড়াটা নিয়ে নিন, মশায়। মাসের শেষ তারিখ, আজই দেনাটা শোধ করে দিই।"

এই ভাড়াটা ঠিক দিনে দেবার জন্যে ভদ্রলোক ছুটির মধ্যে অত দূর থেকে চলে এসেছেন ভাবতে আমার খুব কষ্ট হলো। বললাম, "আপনাকে তো বলেইছিলাম, কোনো চিন্তা নেই—ছুটি থেকে ফিরে এসে আমাকে ভাড়া দেবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমাকে আপনার মালিকরা বিশ্বাস করতে পারলেন না

করলে একটুতেই নেশা ধরে। মাত্রা বাড়ালে তো কথাই নেই। আর এই অবস্থায় মানসিকতা কখনও কখনও ভারসাম্য হারায়, স্নায়ুমণ্ডল অস্থির হয় এবং হৃদস্পন্দন অনিয়ত হতে শুরু করে। মদ্যপানের ফলে যেসব উপসর্গ প্রায় সবার মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে, এই তিনটি উপসর্গই তাদের মধ্যে প্রধান। ইদানীং কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, অনেক সময় দেখা যায়, কেউ যৎসামান্য মদ্য পানেই কুপোকাত হন। আবার অনেকে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি পান করেও বাইরের চালচলনে প্রায় সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করেন। এই ব্যতিক্রমের প্রধান কারণ, শারীরবৃত্তীয় ঘটনাবলী। বিশেষ এক ধরনের হরমোনের কথা বলেছেন তাঁরা। যাঁদের শরীরে এই হরমোন বেশি করে নিঃসৃত হয়, তাঁরা মাত্রার বেশি মদ্য পান করেও চালচলনে স্বাভাবিক থাকেন। যাঁদের কম হয় তাঁরা সামলাতে পারেন না তাঁরাই।

গোলমালটা এখানেই। ঘরে বসে অবসর মুহূর্তে নিজেকে ক্লান্তি বা অবসাদ থেকে কিছুটা মুক্তি দেবার জন্যে অথবা চাঙ্গা করার জন্যে মদ্য পান করুন, তাতে কোন আপত্তি ছিল না। মদ্যপানের পর যখন কেউ দায়িত্বসম্পন্ন কাজে নামেন, মুশকিল হয় তখনই। এর জন্যেই নিয়ম করা হয়েছে, রেল ইঞ্জিনের চালক, বিমানচালক এবং মোটরচালক কাজ করার সময় মদ খেতে পারবেন না। ইত্যাদি।

তা না হয় হল। কিন্তু কেউ যে মদ খেয়ে এসব কাজ করছেন, ধরবেন কি করে? কারণ, **এক,** অনেকে মদ্যপান করার পরও বাইরের আচরণে প্রায় স্বাভাবিকই থেকে যান, বেসামাল হন না। **দুই,** নিষেধ সত্ত্বেও বাস, ট্রাক প্রভৃতির চালকরা অনেক সময় কাজের সময় কিঞ্চিৎ মদ্যপান করেন নিজেদের চাঙ্গা করে তুলতে। বিশেষ করে শীতের সময়। তাতে ক্লান্তি আসে না। মনে ফুর্তি থাকে। **তিন,** অনেক সময় মদ্যপানের পর কিঞ্চিৎ সুগন্ধীযুক্ত পান বা মসলা খেলে অপরের পক্ষে চট করে ধরা শক্ত হয় সত্যিই কেউ মদ্য পান করেছেন কিনা। এসব কেস সনাক্ত করতে গিয়ে পুলিসরাও কখনও কখনও হিমসিম খান।

ব্যাপারটা আইনগত। মদ্যপানে বাধা নেই। কিন্তু নেশা হওয়া চলবে না।

কেউ নেশা করেছেন অর্থাৎ নেশাগ্রস্ত হয়েছেন কিনা, ধরবেন কি করে?

রক্ত পরীক্ষা করে এটা বলা যায়। আইনের দিক দিয়ে ধরে নেয়া হয়েছে, যদি দেখা যায় কারোর শরীরে ১০০ মিলিলিটার রক্তে ৮০ মিলিগ্রাম অ্যালকোহল **আছে,** আইন অনুযায়ী তিনি দণ্ডনীয়

চণ্ডীগড়ে তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে জনৈক গবেষক রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখছেন

উল্লেখ্য, মদ্য পান করার কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা বাড়ে। একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালে 'নেশাগ্রস্ত' বলতে যা বোঝায় তা হয় না। ওই মাত্রার বেশি হলে অস্থিরতা ধরা পড়ে। চালচলন বেসামাল হয়।

মোটরচালক প্রভৃতি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছেন কিনা, সেটা জানার জন্যে পুলিসের পক্ষ থেকে রক্ত পরীক্ষা করার চল দীর্ঘকালের। যদিও এতে কিছুটা অসুবিধেও ভোগ করতে হয়। প্রথমত ডাক্তার দরকার। দ্বিতীয়ত সময়সাপেক্ষও বটে।

ইদানীং একটি সহজ পদ্ধতি অবশ্য বের হয়েছে। সম্প্রতি এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনে চণ্ডীগড়ের সেণ্ট্রাল সায়েণ্টিফিক অর্গানাইজেশন একটি বিশ্লেষক যন্ত্র তৈরি করেছেন। যন্ত্রটি আসলে একটি প্লাসটিক ব্যাগ। তার সঙ্গে লাগান থাকে ছোট্ট একটি নল। নলের মধ্যে থাকে হলুদ রঙের একটি রাসায়নিক যৌগ (নাম প্রকাশ করা হয় নি)। এই নলটি ওই ব্যাগটি ফোলানর নলের মধ্যে বসান থাকে। কেউ মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত আছেন সন্দেহ হলে তাঁকে ফুঁ দিয়ে ব্যাগটি ফোলাতে বলা হয়। ১০ থেকে ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে কাজটি করা যায়। রক্তে অ্যালকোহল থাকলে ভেতরের নলের হলুদ পদার্থের রঙ পালটে গিয়ে হবে সবুজ। যদি রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা শতকরা ০.০৮ ভাগের বেশি হয় অর্থাৎ আইন অনুসারে নিষিদ্ধের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে তখন ওই সবুজ রঙ প্রসারিত হয়ে নলের ওপরকার লাল রঙ করা একটি নির্দিষ্ট চিহ্ন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। সবুজ রঙের প্রসার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রার সমানুপাতিক। অতএব রক্তে কতটা অ্যালকোহল রয়েছে, মাপা গেল। বিদেশ থেকে অ্যালকোহল বিশ্লেষক নলটি আমদানি করতে এক একটি নলের জন্যে খরচ পড়ে ১৫ টাকা। এবং যেহেতু একবারের বেশি এ নল ব্যবহার করা যায় না, অতএব এক-একবার পরীক্ষার জন্যে খরচ পড়ে পনের টাকা। চণ্ডীগড়ের গবেষণাগার কর্তৃক তৈরি ওই নলের দাম পড়বে মাত্র ২ টাকা। দেশে এ ধরনের উপকরণের চাহিদা এখন অনেক। ফলে উদ্ভাবনা প্রচুর বিদেশী মুদ্রারও সাশ্রয় করবে।

সমরজিৎ কর

Greater Power
Extra Lather
Fresher Perfume
New Formula White Det
det
সবচেয়ে শক্তিশালী কাপড় ধোয়ার পাউডার
নতুন ফরমুলা ডেট
বেশী শক্তিশালী
অতিরিক্ত ফেনা
সতেজ সুগন্ধ
ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা।
Shilpi dm 11b/76 ben

সদরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মিটার ফ্ল্যাগ তোলার ক্ষীণ একটু শব্দও শোনা গেল। বঙ্কিমের কান সজাগ ছিল বলেই, রেডিও চলা সত্ত্বেও শুনতে পেল। খাটের বাজুতে ঠেসান দিয়ে, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে, বঙ্কিম সকালের কাগজ পড়ছিল, রেডিও-ও শুনছিল, পাশের বাড়ির শাশুড়ী বউয়ের প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন ঝগড়ার দিকেও কান রেখেছিল। এখন গাড়ি থামার শব্দ এবং মিটার ফ্ল্যাগ তোলার ক্রিং শব্দটাও শুনল। বঙ্কিম একসঙ্গে অনেক দিকে মনোযোগ দিতে পারে বলেই, তার জীবনে বোধ হয় কিছু হল না। বহুমুখী মন নিয়ে বঙ্কিমের কেরিয়ারের বারোটা বেজে গেল। বঙ্কিমের মেকার্সদের অন্তত সেই রকমই ধারণা।

ক্রিং শব্দটা হতেই বঙ্কিম চট করে উঠে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। হাত দিয়ে মাথার চুল খানিক এলোমেলো করে নিল। খাটের মাথা থেকে একটা চাদর নিয়ে গায়ে জড়ালো। এখন এই রকম একটা অসুস্থতার মেক-আপ নিয়ে তাকে প্রতিমার সামনে দাঁড়াতে হবে। তাতেও শেষ রক্ষে হবে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমের বউ প্রতিমা ফিরে আসছে নার্সিং হোম থেকে, তাদের জয়েন্ট ভেনচার, প্রথম সন্তান কোলে নিয়ে। ফিরিয়ে আনছে বঙ্কিমের পিসতুতো বোন। বিয়ের বছর না ঘুরতেই, বঙ্কিম প্রাউড ফাদার।

বঙ্কিম কিন্তু জানে, সে মোটেই প্রাউড নয়, বরং কাওয়ার্ড। সে নিজেকে কোনো দিনই ফাদার বঙ্কিম বলে ভাবতে পারেনি। তার ফাদারেরই আছে। তিনি কি বড় জোর চার বছর বয়সে মা মারা যাবার পর তার জীবন একেবারে কানায় কানায় পিতৃময়। তার মন, প্রাণ, ভাবনার আকাশ আচ্ছন্ন করে পিতা পরমেশ্বর। শৈশবে পিতৃভক্তির আতিশয্যে বঙ্কিম সুর করে সকাল সন্ধ্যা পিতৃ শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করত—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। বঙ্কিমের এক জ্যাঠাইমা যাঁর ঠোঁটকাটা, কটুভাষী, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে পরিচয় আছে, তিনি একদিন বঙ্কিমের ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ কি রে? এত মাথা নাড় করে ঘাটে বসে, পিণ্ডি দেওয়ার সময় পড়তে হয়।' বঙ্কিম সত্য মিথ্যা জানার জন্যে পিতা পরমেশ্বরকে প্রশ্ন করেছিল। ভয়ও ছিল, শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ে জীবিত পিতার পরলোকের পথ প্রশস্ত করে ফেলছে না তো! তিনি বলেছিলেন, 'ও সব সংশয়বাদীদের কথা। ভক্তিমার্গে এসব বাধা ইগনোর করবে। পিতা আর পরমপিতায় শুধু দুটি শব্দের তফাৎ—প র আর ম। পিতাকে যে সন্তান পরম পিতা করে নিতে পারে তার আর মার নেই। পিতার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। সে সেই গানটা গা। তোর দাদুর সেই গানটা।' বঙ্কিম সংশয়মুক্ত মনে, সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়ম বাজিয়ে, চাঁছা ছোলা গলায় গেয়েছিল, সুখে ডালে বসি ডাকিছো পাখি রে, ডাকিছো কি সেই পরমপিতারে।

চোখ বুজিয়ে বঙ্কিম বহুবার মাকে দেখবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। দেব দেবীর মূর্তিও আসতে চায় না। চোখ বুজলেই নাক, ডগাটা অল্প একটু বেঁকে কমার মত পাতলা ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়ে, গজাল গোঁফ জোড়াকে যেন জিজ্ঞেস করছে—কি হে ভায়া, ঠিকঠাক আছ তো! মাথার সামনে খেলার মাঠের মত একটি মসৃণ টাক। তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, লিভারের গোলমালে প্রায়ই হলুদ বর্ণ। সোনালী ফ্রেমের শৌখীন চশমা। একেবারে স্ট্রেট ইরেকট্ মেরুদণ্ড। সামনে নুয়ে পড়া কোঁচ। ফাইন ধুতি। কালো ঝকঝকে জুতোর ওপর রাস্তার মিহি ধুলো। সাদা টেনিস সার্ট। ক্রিম কলারের কোট। গটগট করে মিলিটারিদের মত হাঁটা। জুতোর গোড়ালির শব্দ কি? খট্ খট্; নিখুঁত করে কামানো দাড়ি। সদা গম্ভীর মুখ। সে মুখে মেয়েলি মুচকি হাসি বঙ্কিম কখন দেখেনি। বছরে একবার বিজয়ার দিন একটু সিদ্ধি খেয়ে পরমেশ্বর যখন হাসতেন, বঙ্কিম সে হাসির নাম রেখেছিল— একতলা-দোতলা। হাসির বোল লাফিয়ে লাফিয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠে যেত, আবার নেমে আসত ধাপে ধাপে। স্বরযন্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিহার। পাড়ায় আর একজন মাত্র মানুষের এই রকম হাসি ছিল। তাঁর নাম ছিল সত্যেনদা। বাড়ির পাশেই পান বিড়ির দোকানের মালিক। তাঁর হাসির অবশ্য একটা ডিফেক্ট ছিল। পরমেশ্বরের হাইটে উঠত ঠিকই তবে এই খোল ফাটা তুবড়ির মত। শেষ ধাপে উঠেই হাসি হয়ে যেত ব্রঙ্কাইটিসের কাশি। সত্যেনদা কাশতে কাশতে শেষকালে বুকটা চেপে ধরে, 'ওরে বাবা রে, ওর বাবারে' বলে আর্তনাদ

বার হাসতেন। তখন বাঙলা দেশে হাসির কাল চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টাকা হাওয়ায় উড়ছে। পরমেশ্বর হাসতেন বছরে একবার। সেই কারণে একটায় ছিল নাদ, অনটায় আর্তনাদ।

বঙ্কিমের মনে যে ফাদার ফিগার বা ফিগার ফাদার ছিল, তা পরমেশ্বরের আদলে ঢালা। ঠুংরি নয়, একেবারে ধ্রুপদ। বঙ্কিম নিজে একেবারে উল্টো। পরমেশ্বর তাকে ইটারনাল সান করে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ভেতর থেকে পিতৃনির্যাসের শেষ বিন্দুটুকু বের করে নিয়ে বঙ্কিমকে এমন কায়দায় মানুষ করেছিলেন, মেয়েছেলে দেখলেই যেন গো-বৎসের মত হাম্মা, মা, মা করে ওঠে। বঙ্কিম নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল—ফাদার হবার কোনো কোয়ালিটিই তার মধ্যে নেই। সারা পৃথিবীতে বাবাদের যদি কোনো স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেসান তৈরি করে কোয়ালিটি মার্ক দেবার প্রথা থাকত, তাহলে সেই স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হত পরমেশ্বরকে দেখে। পরমেশ্বর চিরকালের ফাদার, বঙ্কিম চিরকালের সন্তান। বঙ্কিমের ভাব সন্তান-ভাব। তার ভেতরটা কেবলই বাবা বাবা করছে। কিন্তু বিধির বিধানে, সেই বঙ্কিম আজ ফাদার। পরমেশ্বরের সমর্থন ছাড়াই এই অশনিসম্পাত। সে নিজে এতকাল বাবা, বাবা করেছে, এইবার তাকে বাবা বাবা করবার এতটুকু একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

প্রতিমা বুকের কাছে এতটুকু একটা তোয়ালের পার্সেল ধরে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে। বঙ্কিম লাজুক লাজুক মুখে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখলে মনে হবে, বঙ্কিমই যেন মাদার। আর প্রতিমা যেভাবে উঠে আসছে মনে হচ্ছে সেই যেন ফাদার। যেন পরমেশ্বর বাজার করে ফিরছেন, বগলে একটা এক পাউন্ড রুটি। বঙ্কিম চোরের মত এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে দেখল। যেন কত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে! দুজন থেকে তিনজন হয়েছে। প্রতিমার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটা যখন কিছুতেই আর চেপে রাখা গেল না, সারা শরীরে এবং ব্যবহারে মায়ের দয়ার মতই শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশিত হল, তখন পরমেশ্বর ছেলেকে বলেছিলেন—মালটিপ্লিকেশান ইজ এ রুল বাট ডোণ্ট মেক ইট এ ন্যাচারাল প্র্যাকটিস। সেই সারমন শোনার পর থেকেই বঙ্কিমের লজ্জা ও অপরাধ বোধটা আরো বেড়ে গেছে।

আর তিনটে ধাপ ভাঙলেই প্রতিমা দোতলায় উঠে আসবে। বঙ্কিম সারা মুখে একটা নির্বোধের হাসি ছড়িয়ে, লম্বা তর্জনীটা একটা হুকের মত সামনে বাড়িয়ে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল—'এইটা, এইটা'। ■

থেমে কটমট করে তাকাল। বঙ্কিম ভয়ে ভয়ে বলল—'একটু হাত দেব্যো'? স্পর্শ করার জন্যে আঙুলের হুকটা একবার বাড়িয়েও ছিল। তোয়ালের মোড়কটা বুকের কাছে আড়াল করে, প্রতিমা বললে—'না'। প্রতিমার স্বাভাবিক গলাই লাউডস্পিকারের মত। 'না'টা একটু জোরেই বলেছিল। সারা বাড়িটা যেন শিউরে উঠল। বঙ্কিম তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রতিমা গটগট করে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলে। প্রতিমার কাঁধের পাশে হলদে কাপড়ের একটা সাইড ব্যাগ ঝুলছে। সাইড ব্যাগে কি আছে, কে জানে! আসল বস্তুটা ব্যাগে নেই তো।

বঙ্কিম জানে প্রতিমার পক্ষে সবই সম্ভব। একবার একটা দুধে চোর ছেলেকে বাজারের ব্যাগে ভরে মাইলখানেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। যদিও ছোঁড়াটা প্রতিমা ফেরার আগেই ফিরে এসে আবার ঘরে যথাস্থানে গাঁট হয়ে বসেছিল। এই সিঁড়িতেই একবার প্রথম রাতে একটা ছিঁচকে চোরের হাত থেকে নতুন তোয়ালে, গেঞ্জি, আরো কি কি সব কেড়ে নিয়ে, চোয়ালে একটা আপারকাট মেরেছিল। চোরটা শেষ ধাপে ছিটকে পড়ে বলেছিল—মা এমন ঘুঁষি থানার বড় দারোগার হাত থেকেও খেলতে হবে না। ঘুঁষির প্রশংসায় খুশি হয়ে প্রতিমা চোরকে নতুন গেঞ্জিটা উপহার দিয়েছিল। পরমেশ্বর অবশ্য বলে-ছিলেন, বাইরের লোকের সামনে ঘোমটা দিয়ে বেরোলে শালীনতা বজায় থাকে। প্রতিমা বলেছিল, এর পর চোরে আপনার তোয়ালে কি জুতো চুরি করতে এলে ঘোমটা দিয়েই ঘুঁষি চালাব। এই প্রতিমাই পরমেশ্বরের হার্ট এ্যাটাকের সময় পাড়ার এক জুনিয়ার ডাক্তারকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে পাঁই কি মরি করে নিয়ে এসেছিল। বঙ্কিম তখন অফিসে। পরমেশ্বর সুস্থ হতে হতে বলেছিলেন, বউমার জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। সুস্থ হয়ে বলেছিলেন—হি-ওম্যান। গোঁফ থাকলে ওই বঙ্কিমের স্বামী হত। প্রতিমা সব পারে, কেবল মেয়ে-ছেলে হতে পারে না।

বঙ্কিম পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। প্রতিমা ইতিমধ্যে খাটে পা মুড়ে বসেছে। কোলের ওপর তোয়ালেতে এতটুকু একটা লাল মত মানুষ। মানুষের বাচ্চা যে এত কুৎসিত দেখতে হয় বঙ্কিমের ধারণাই ছিল না। মাথায় কয়েক গাছি লোম। ওকে চুল বলা যায় না। মুখটা অনেকটা আলু-পোড়ার মত। গায়ের চামড়া যেন [illegible] [illegible] সঙ্গে নাড়ীর যোগ। জীবনের ভাইটাল সাপ্লাই লাইন। কোথায় দুধের টিনের গায়ে আঁকা সেই একমাথা কোঁকড়া চুল, নীল আকাশের মত [illegible]। একটা আঙুলের স্পর্শ করার ইচ্ছেটা তার আর নেই। প্রতিমা [illegible] সুন্দর [illegible] নার্সিং হোমের মধ্যে থেকে, রং যেন ফেটে পড়ছে। মাথার চামড়া একেবারে টান টান তেলা। চোখ দুটো মনে হচ্ছে অয়েলিং ক্লিনিং করে নতুন ফিট করা হয়েছে। মণি দুটো ঝকঝকে কালো। সেই প্রতিমার জঠর [illegible] জিনিস বেরোলো। নিজের সৃজনী শক্তির ওপর বঙ্কিমের ঘেন্না ধরে গেল।

বঙ্কিম রাস্তার ধারের জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াল। মানুষের বাচ্চা সে একটা বড় অবস্থায় দেখেছে। ফ্রেশ ফ্রম [illegible], সে দেখেনি। পাশের বাড়ির গরুর বাচ্চা সে ডেলিভারী হতে দেখেছে। মার পেট থেকে পড়েই খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়োলো। চারটে পা তখনো ছোটায় অভ্যস্থ নয়। ধড়াস ধড়াস করে বার কতক [illegible]। [illegible] মাটিতে পা [illegible] সাদা রং। বড় বড় নতুন চোখ। বঙ্কিম ভাবে বিভোর হয়ে মনে মনে বলেছিল—ও ক্রিয়েটার! কি সুন্দর, কি সুন্দর! মানুষের বাচ্চা গরুর [illegible] সে এক্সপেক্টও করে না, ডিজায়রেবলও নয়। তাহলেও এই কি একটা স্যাম্পল! সে ছাগলের বাচ্চা, খরগোসের বাচ্চা কুকুরের একসঙ্গে আটটা বাচ্চা, বেড়ালের বাচ্চা, মুরগীর একগাদা বলের মত বাচ্চা দেখেছে। একমাত্র পাখির বাচ্চা ছাড়া এত কুৎসিত প্রোডাকসান সে আর দেখেনি।

বঙ্কিম জানলার পাশ থেকে সরে এসে, খাটের আর একদিকে বসে একটু উসখুস করে জিজ্ঞেস করল, 'এই রকমই হয় বুঝি'? প্রতিমা এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। রাগে [illegible] বারুদ, এক কথায় ভিসুভিয়াসের মত ফেটে পড়ল—'হ্যাঁ এইরকমই হয়। স্বার্থপর, চোর, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, চিটিংবাজদের ছেলে এইরকমই হয়। কথা বলতে লজ্জা করছে না। এ ছেলে তোমার নয়।' ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বঙ্কিম ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এ সব ডায়ালগ পিতা পরমেশ্বরের কানে গেলে রক্ষে নেই। একেই তিনি সেদিন বলছিলেন—আমার ছেলেটা সেন্টালি ইনোসেন্ট ছিল। পাল্লায় পড়ে পেকে গেল। কথা হচ্ছিল বোনের সঙ্গে। বঙ্কিম ওভার হিয়ার করেছিল। 'জেনে রাখবি, ভাল যখন খারাপ হয় তখন খারাপকেও সে ছাড়িয়ে যায়।' পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রথম থেকেই প্রতিমার

সামলে দিলে—মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ। বাপ তবু সহ্য করা যায়, ভুঁড়ি শব্দটা দেখতেও যেমন শুনতেও তেমন আগলি। প্রতিমা বললে, রাখো তোমার আগলি, আগলির নিকুচি করেছে। আমার ইচ্ছে করছে, দাঁত কিড়মিড় করে প্রতিমা বললে, তোমার কাপড় খুলে...। আর নয়। বঙ্কিম কানে আঙুল দিল। প্রতিমা মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বঙ্কিম বললে, 'তোমার পেটে ওয়ার্মস হয়েছে, যেরকম দাঁত কিড়মিড় করছ, নাক খুঁটতে ইচ্ছে করে? এক ডোজ 'সিনা' দিতে পারলে ভাল হত।'

ওয়ার্মস যেটা হয়েছিল সেটা এখন কোলে। 'সিনা' খেয়ে তোমার ওয়ার্মস মারো। রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে।

বঙ্কিম আর বসতে পারল না। দাঁড়িয়ে পড়ল। অসম্ভব। সে যদি হিপনোটিজম জানত! এ-মেয়েকে বশে আনার ক্ষমতা রাখে একমাত্র সার্কাসের রিং মাস্টার। পরমেশ্বর ঠিকই বলেছিলেন — যেসব মহিলার গড়ন ডেয়ো পিঁপড়ের মত হয়, দেখতে ভাল হলে কি হবে, স্বভাবে তারা প্রতিমার মত হয়। গুরুজন বাক্য শোনেনি, তখন তো প্রেম-যমুনায় ঢেউ গুনেছে, এখন তো মাও সামলাতেই হবে। অবশ্যই এ রকমের কিছু লাপসেস আছে। তা বলে বাড়িতে ঢুকেই এইভাবে তাদের পিণ্ডি চটকানোর কোনো মানে হয়! এটা কি ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে শোভন! বঙ্কিমের কি দোষ! সে তো হেল্পলেস হাবি। সংসারের কন্ট্রোল গিয়ার তো পরমেশ্বরের হাতে। বঙ্কিম যা রোজগার করে, ডিউটিফুল ছেলের মত মাসে মাসে তুলে দেয় পরমেশ্বরের হাতে। সংসার নামক স্টেজকোচের সঙ্গে সেই কেবল টিকিটধারী যাত্রী, প্রতিমা তার লাগেজ। গাড়ির গায়ে যাত্রীদের জন্যে পরমেশ্বরের ওয়ার্নিং, মাল নিজ দায়িত্বে রাখুন। মাল এবং মালের মালের জন্য ড্রাইভার কাম কনডাকটার পরমেশ্বরের কোনো রেসপন-সিবিলিটি নেই। বঙ্কিম নিজের দায়িত্বে ফাদার।

পরমেশ্বর হিসেবী মানুষ। তাঁর নানা হিসেব। অসংখ্য খামে অসংখ্য ফান্ড। খামগুলোর রং গোলাপী। কারণ বঙ্কিমের ফুলশয্যার তত্ত্বে শ্বশুরমশাই মেয়েকে চিঠি লেখার জন্যে যে রাইটিং সেট দিয়ে-ছিলেন তার মধ্যে এই খামগুলো ছিল। বিয়ের পর আর প্রেম থাকে না। গোলাপী খাম ইউসলেস। পরমেশ্বরের কাজে লেগে গেছে। কোনো খাম। 'এডুকেশান ফান্ড' কোনো খাম 'ফেস্টিভ্যাল ফান্ড', একটা 'অকেসনাল বুক পারচেজ ফান্ড', এইভাবে 'রিটায়ারমেন্ট ফান্ড', 'লুচি ফান্ড', 'অ্যামিউজ-মেন্ট ফান্ড।' সবচেয়ে বড় ফান্ড, যেটা খামে ধরে না, সেটা হল—'হাউস বিলডিং ফান্ড।' মাসে মাসে থোক টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে —সবার আগে বাসস্থান। পরমেশ্বর বলেন, সব কিছু কার্টেল করে আগে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। বেশ কষ্টেই সংসার চলে। প্রতিমা জানে, কতদিন রাতে কুমড়োর ঘ্যাঁট আর রুটি খেয়ে, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে, মুখে বড় এলাচের দানা ফেলে মাঝ রাত অবধি গজগজ করেছে, দধীচির হাড় দিয়ে বাড়ি তৈরি হবে অবশেষে, সেই বাড়ি হবে আমাদের সমাধি, তোমার আমার প্রেমের তাজমহল। সেই খাম ফান্ড বা ফান্ডখামে প্রেগনানসির কোনো প্রভিসান ছিল না। পরমেশ্বরের হিসেবে—বঙ্কিমের এক্স-পেকটেড ফার্স্ট ইস্যু—পাঁচ বছর পরে। বঙ্কিম যদি স্লিপ করে, বঙ্কিমের বাবা কি করবেন? পুরোটাই এখন বঙ্কিমের দায়িত্ব।

ফার্স্ট ইস্যু, রিসক অনেক, এ বাড়িতে দেখাশোনা করার দ্বিতীয় কোনো মহিলা নেই, এইসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলে প্রতিমাকে বাপের বাড়ি পাচার করা হয়েছিল। তাতে অপরাধটা কি হয়েছে! বেশির ভাগ মেয়েই তো প্রথম মা হবার সময় বাপের বাড়িতেই যায়। বঙ্কিম বললে—ঠিক আছে, আমি পার্টটাইম করে, যা খরচ হয়েছে হিসেব করে তোমার বাপকে ইনস্টলমেন্টে শোধ করে দেবো, দরকার হলে ইণ্টারেস্টও দেবো। বঙ্কিম ইচ্ছে করেই বাপ বলল। বাপে বাপে কাটাকাটি।

'তোমার টাকায় তারা...'

তারা যা করে দেন, অন্তত, প্রতিমা যা বললে বঙ্কিম উচ্চারণ করতে পারবে না।

'টাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মন। সেই ছ মাসে আমি গেছি, তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ একবার দেখতে গেল না। আড়াই টাকা দামের গোটাকতক চার্টনি

ভাবছিল কয়েক ঘণ্টা পরেই এই খাটে একটা মেয়ের সঙ্গে সে শোবে শুধু শোবে না, নিজেদের আইবুড়ো অবস্থার উপর রঙীন মশারি ঝুলিয়ে দেবে অন্ধকার মাঝরাতে ঘরের হাওয়ায় পরীর মত ডানা মেলে ফুলের গন্ধ উড়বে। এখন পরমেশ্বর অন্য ঘরে। নিদ্রাহীনতার রুগী। নির্জন বিছানায় স্মৃতি সঙ্গী করে ভোরের অপেক্ষায় জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকবেন।

বঙ্কিম স্টেনলেস স্টিলের বাটিটাকে অন্তত দশবার ধুলো। পৃথিবীতে সদ্য আগত অতিথি উষ্ণ জল খাবে। জল খাবে, কি অন্য কিছু খাওয়াবে প্রতিমাই জানে। অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে কোনোরকম জীবাণু যদি একবার ঢোকে, কতরকম কি হতে পারে—পোলিও, ডিপথেরিয়া, জিআর্ডিয়া, ব্যাসিলাই ডিসেণ্ট্রি। পরমেশ্বরের হোমিওপ্যাথি বই পড়ে ভয়ংকর ব্যাধির জগতের অনেক তথ্য বঙ্কিমের নখদর্পণে। প্রতিমার আবার চোরা অম্বল নেই তো! চেক করতে হবে। ভাবনার শেষ নেই। শিশু মৃত্যুর হার এদেশে এখনও খুব বেশি। তাছাড়া এ ফ্যামিলির কার্স্ট ইস্যু বাঁচে না। রেকর্ড আছে। পরমেশ্বরের প্রথম কন্যা সন্তান দু মাস না তিন মাসের হয়ে পটল তুলেছিল। বেঁচে থাকলে বঙ্কিমের একটা দিদি থাকতো। বঙ্কিমের জ্যাঠামশায়েরও সেই একই ব্যাপার।

দুর্ভাবনা আর গরম জল নিয়ে বঙ্কিম ঘরে ঢুকতেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বঙ্কিমের দিকে পেছন ফিরে বসল। ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। বঙ্কিমের একটু হিংসে মত হল। মনে মনে বললে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। বিছানার উপর একটা ময়লা এক টাকার নোট অবহেলায় পড়ে আছে। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল—'এটা কি?' 'তোমার ছেলের মুখ দেখে গেল।' 'এর মধ্যে আবার কে মুখ দেখে গেল?' প্রতিমা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—'বামুন দি।' এই বামুনদি, এক সময়, বঙ্কিমদের যখন বোল বেলা ছিল, তখন রান্নার কাজ করত। বুকে পিঠে করে বঙ্কিমকে মানুষ করেছে। এখন অন্য বাড়িতে কাজ করলেও, পুরোনো মনিব বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি। বঙ্কিম টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখল।

গরম জলের বাটিটা নিয়ে প্রতিমা বললে, 'ঝিনুক?' সর্বনাশ, ঝিনুক কোথায় পাবে বঙ্কিম! মুখটা কাঁচুমাচু করে ভৃত্যের মত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমা বললে, 'নিকালো।' এমনভাবে বললে, যেন চোরকে চোরাই মাল বের করতে বলছে জাঁদরেল দারোগা। 'ঝিনুক তো নেই।' কেন নেই? তোমাদের এত হিসেব, এই হিসেবটা নেই কেন?' বঙ্কিম বললে 'ঢাকনা দিয়ে আপাতত ম্যানেজ করা যায় না!' প্রতিমা ঝোলাটা দেখিয়ে বললে, 'বের কর। জানতুম আমি তোমাদের মুরোদ কত!' ঝুলি থেকে ঝিনুক বেরোলো। 'কিনলে?' প্রতিমা বললে, 'কিনবো কেন? বাপের বাড়ি থেকে বাগিয়েছি। এই ঝিনুকে আমি দুধ খেতুম।' বঙ্কিম অবাক হয়ে ঝিনুকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। মার ঝিনুকে ছেলে দুধ খাবে। কি আশ্চর্য! দেখা শেষ করে বঙ্কিম বললে, 'দাঁড়াও ধুয়ে আনি।' প্রতিমা বললে, 'ভ্যাগ, ধোবার কি আছে? পরিষ্কারই তো আছে।' অ্যাপারেণ্টলি পরিষ্কার, মাইক্রোসকোপের তলায় ফেললে অসংখ্য জীবাণু জড়িয়ে আছে। বয়েল করে স্টেরিলাইজ করে আনি। তুমিও হাতটা ডিসইনফেকট্যাণ্ট দিয়ে ভাল করে ধোও।' প্রতিমা অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, 'অত সব পারবো না।'

ঝিনুক ফোটাতে ফোটাতে বঙ্কিম খুব ঘাবড়ে গেল। বউ দেখছি ব্যাকটেরিওলজির এ-বি-সি জানে না। ফুলস রাশ ইন হোয়্যার এঞ্জেলস ফিয়ার। ওঃ, বাড়িতে গিন্নীবান্নি কেউ নেই! কোর্ট থেকে কোনো হুলিয়া বের করা যায় কি? ডিসওবিডিয়েণ্ট মাদার ছেলেটাকে দেখছি মেরেই ফেলবে। মা বেঁচে থাকলে যা হয় একটা কিছু করা

হুকুম তামিল করবে—পানি লাও, চা বানাও, চিৎ হও, উপুড় হও, ত্রিভঙ্গমুরারি হও। বদলে, বছরে চারখানা শাড়ি, আঁচলে এক গোছা চাবি, চার বেলা আহার, সপ্তাহে একটা সিনেমা, দশ কি বারো বছরে তিন থেকে চারবার প্রজনন। ব্যতিক্রম হলেই তুমি শালা জাহাবাজ মহিলা। প্রতিমা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে গেছে। তাকে 'ইয়েস ওম্যান' বলা চলে না। অতএব তিনি এখন তোফা ঘুমোবেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র ব্যস্ত হবে সরষের বালিশ তৈরিতে। বঙ্কিমের পিসীমা কথায় কথায় বলেছিলেন, সরষের বালিশে শোয়ালে মাথাটি নিটোল গোল হবে, একেবারে পাকা বেলের মত। বঙ্কিমের সেই কেতাব আবার বলছে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে একুশ দিন পর্যন্ত শিশুকে চিৎভাবে শয়ন না করাইয়া ডান বা বাম পার্শ্বে শয়ন করানো ভাল। সারা মাসের রান্নার সরষে বালিশের খোলে ভরে যে জিনিস তৈরী হল তাকে বালিশ না বলে সরষের কাঁথা বলাই ভাল।

ঘুমন্ত শিশুর মাথার তলায় সেই বল বেয়ারিং বালিশ ঢোকাতে গিয়ে দুটো মারাত্মক ত্রুটি আবিষ্কার করল। প্রথমত চিৎ, দ্বিতীয়ত হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বঙ্কিমের বই বলছে, সব সময় নজর রাখ। হাঁ হয়েছে কি বুজিয়ে দাও। ম্যাক কঙ্ক সাহেব পই পই করে বলেছেন, ওই হাঁ পথে যত রোগজীবাণু শিশুর শরীরে ঢুকবে, প্রথম অসুখই টি বি। ইস, দিনের বেলায় না-হয় ঘুরতে ফিরতে একবার করে এসে বুজিয়ে দেওয়া গেল, রাতের বেলায় টর্চ লাইট জেবলে কে পাহারা দেবে। মা আর ছেলে দুজনেই হাঁ। বঙ্কিম প্রথমে ছেলেরটা বোজালো। বউয়েরটা বোজাতে একটু বেগ পেল। টেম্পার করা ঠোঁট। যেই বোজায়, সঙ্গে সঙ্গে প্যাট করে খুলে যায়। বোজা, খোলা, খোলা, বোজা করতে করতে প্রতিমার ঘুম ভেঙে গেল। বঙ্কিম অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল—'হাঁ করে ঘুমোনো চলবে না। জীবাণু ঢুকে যাবে।' প্রতিমা বিশাল একটা হাই তুলে বললে—'আদেখলের আংটি হল, দেখতে দেখতে প্রাণটা গেল। নাও, একটা ফর্দ কর—দুধ এক টিন বড়, গ্রাইপওয়াটার একটা, রবার ক্লথ দু মিটার, গোল মশারি, তোয়ালে এক ডজন।'

বঙ্কিমের মুখ শুকিয়ে গেল—টাকা? ব্যাঙ্কার তো পরমেশ্বর। বঙ্কিম জিজ্ঞেস করল, 'এখনই দুধ কেন? এখন তো তোমার দুধই যথেষ্ট।' প্রতিমা বললে, 'যথেষ্ট নয় বলেই তো বলা হচ্ছে।' কিন্তু এখনই টিনের দুধ! বই বলছে, মায়ের দুধের এক-মাত্রবিকল্প গাধার দুধ। পাশেই ধোপা আছে, গাধাও আছে, গাধী তো নেই।

থাকে? গাধারা কোথায় জন্মায়! বুঝেছি সব শালা খচ্চর, আসলে কেউ পিওর গাধা নয়। দুধ নিয়ে মহা চিন্তা হলো তো। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলে—'খাটালে গিয়ে রাম-খলোয়ানকে জিজ্ঞেস করে আসব, ওরা কি করে গরুর দুধ বাড়ায়?' প্রতিমা বললে, 'আমি জানি, ফুকো দেয়, আর রোজ পাঁচ সের ভেলি বিচিলির সঙ্গে খাওয়ায়। দুধ না কিনে যাও ফুকোর ডাক্তার ডেকে আন।'

বিকেলের চা পর্বের উপর সন্ধ্যা নামল। বহুকালের প্রথা, ঠাকুরঘরে প্রদীপ দেখিয়ে শাঁখ বাজানো। প্রতিমা কোনো কালেই করেনি। এখন তো সাত খুন মাপ। আঁতুড়ে পক্ষাঘাত। পরমেশ্বরই করেন। মেয়েদের হাতে শেষ সন্ধ্যার প্রদীপ পড়েছিল তিরিশ বছর আগে। বঙ্কিম শাঁখের আওয়াজ শুনলো। পরমেশ্বর বাজাচ্ছেন। পরমেশ্বরের এই শাঁখ সন্ধ্যায় মাঙ্গলিক নয়, প্রতিমার অক্ষমতার পেছনে শিঙে ফোঁকা। প্রথম ফুঁ—অপদার্থ। দ্বিতীয় ফুঁ—ম্লেচ্ছ স্বভাব। তৃতীয় ফুঁ—দেখবো, দেখবো, কতদিন এই ভেড়া-স্বামীর পদসেবা পাস হতভাগা। সন্ধ্যে উৎরে অন্ধকার বেশ ঘন হল। পরমেশ্বর খবরের কাগজে মুড়ি ঢেলে তেল মেখে খাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাদামভাজা, একটা করে গোলমরিচের দানা। কুড়িটা বাদাম, পাঁচটা মরিচ হল ডোজ। বঙ্কিম পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো। পরমেশ্বর আড়চোখে দেখে শুকনো গলায় বললেন—'আয়।'

গলার স্বরে আর বেশী দূর কথা এগোবে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই। তবু বঙ্কিমকে বলতে হবে—দুধের কথা, রবার ক্লথের কথা, তোয়ালের কথা। বঙ্কিম আমতা আমতা করে বলল—'ওটাকে একবার দেখলেন না?' 'ওটা' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন নিউটার জেন্ডার। একটা কীটপতঙ্গ বিশেষ। পিতৃত্বের অহঙ্কারকে বাথটাবের ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে মার। পরমেশ্বর ইস্‌স্‌ করে একটা শব্দ করলেন—মরিচের ঝাল হতে পারে, ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত হাওয়ার আউটলেটও হতে পারে। নির্বিকার মুখে বললেন—'দেখার সময় এলেই দেখবো। আমার সব কিছু একটা নিয়ম আছে।' নিয়মের লাটাইকলে পরমেশ্বর বাঁধা। বঙ্কিম প্রস্তুত হল পরের প্রসঙ্গের জন্যে। মোস্ট ডেলিকেট ইস্যু টাকা। একটা ঢোঁক গিলে বললে—'কিছু টাকার প্রয়োজন ছিল, কয়েকটা জিনিস, এই যেমন...।' পরমেশ্বর একটা মরিচ মুখে ফেলতে যাচ্ছিলেন, ফেলা হল না, দু আঙুলে ধরে রেখে বললেন, 'আই অ্যাম সরি বঙ্কিম, আমার হাত এখন একে-বারে খালি। ধারধোর করে যোগাড়ের চেষ্টা

ম্যানেজ কর। পরমেশ্বর আর একটু যোগ করলেন—'আমি তো প্রিপেয়ারড হবার কোনো চান্সই পেলুম না। সব কিছুর একটা প্রিপারেশান চাই। তুমি প্রিপেয়ারড না হয়ে পরীক্ষা দিলে ফেল করলে, প্রিপেয়ারড না হয়ে ফাদার হলে, পভার্টি ডেকে আনলে।' বঙ্কিমকে বেশ মোলায়েম করে কড়কে দিলেন। বাছাধন এইবার বোঝো, বাপ হয়ে বাপ বাপ কর।

সব শুনে প্রতিমা বললে, 'এইবার লোকের বাড়ি ঝিগিরি করতে বেরোই ওইটাই আর বাকি থাকে কেন। বড়ি-খোঁপা করে, মুখে দোক্তাপান ঠুসে বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াই।' বঙ্কিম বললে, 'কাল থেকেই চেষ্টা করি, মারোয়াড়ীর গদিতে পার্ট টাইম। না জোটে, ফুটপাথে গামছা বিক্রি। মধ্যবিত্তের আবার মান-সম্মান। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে তো। আপাতত ঘড়িটা বেচে যা লাগে কিনে আনি।' প্রতিমা বললে—মাইরি আর কি! ঘড়িটা আমার বাবার দেওয়া। বেচতে হয় তোমার বাপের ট্যাঁকঘড়িটা বেচ গে যাও।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাউকেই কিছু করতে হল না। সাত দিনের দিন পরমেশ্বর বঙ্কিমের মার একটা মপচেন বঙ্কিমের ছেলের গলায় পরিয়ে দিলেন। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরেছেন। কপালে চন্দনের টিপ।

বুঝি চোখে কোমল দৃষ্টি। দু হাতের উপর শিশুকে দুলিয়ে বঙ্কিমের ঠাকুর্দার ছবির সামনে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললেন—এসেছেন, তিনি এসেছেন।

সেই শিশু পরমেশ্বরের হাতে বড় হতে হতে এখন বারো বছরের দুর্দান্ত কিশোর। পরমেশ্বর বাহাত্তর বছরের সাত্ত্বিক বৃদ্ধ। বঙ্কিমের চুল পেকেছে। ছুটির দিন প্রতিভার পাকা চুল তুলে দেয়। তা না হলে কুটকুট করে। অভিমান করে মরে। বিল্ডিং ফাণ্ডের টাকায় নতুন বাড়ি হয়েছে। দোতলার ঘরে দাদু আর নাতি হুটোপুটি করে কাবাডি খেলে। বৃদ্ধ নাতিকে বলেন, 'তোমার বাবার অনেক গুণ ছিল। মহাপুরুষ হতে হতে একটুর জন্যে পুরুষ হয়ে গেছে।' নাতি বলে, 'রেগে গেলে বাবাকে মহাপুরুষের মত দেখায়।' পরমেশ্বর হাসতে হাসতে বলেন, 'ইয়েস, ঠিক বলেছো। রাগ হল পুরুষের অলংকার। তোমার যা ইন্টেলিজেন্স আর অবজার্ভেশান, বখে যদি না যাও তুমি মহাপুরুষ হবে। দেখি রবিরেখাটা একবার।' রোজ একবার করে নাতির রবিরেখা দেখেন। নাতি তখন দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের গলায় বলে, 'দাদি আর একটা, আর একটা দাদি।'

পরমেশ্বর তাঁর সামান্য পেনসানের টাকায় এই হনুমানের জন্যে ফল-পাকড় কলা স্টোর করে রাখেন। যেমন রাখতেন মা-মরা বঙ্কিমের জন্যে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। নাতি এখন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের শয্যাসঙ্গী। নিদ্রাহীন বৃদ্ধ মাঝরাতে ঘরময় পায়চারি করেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় অন্ধকার দুলে ওঠে। স্ত্রীর ছবির সামনে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর পাঁচটা বছর আমাকে সময় দাও। আমার শেষ ব্যবস্থাটা করে যাই। তুমি তো জান আমি সহজে কখনও হারি না। জাস্ট ফাইভ ইয়ারস, মাই জব উইল বি ডন। আমার বড় ভরসা এই ছেলেটা। তোমারও তো নাতি গো। বেঁচে থাকলে, কি বল?'

কবির চোখে কবি: বুদ্ধদেব বসু - রবীন্দ্রনাথ

সুতপা ভট্টাচার্য

পাঁচ

বুদ্ধদেবের কাছে রবীন্দ্রনাথ নিছক একজন শ্রদ্ধেয় কবিমাত্রই নন—"বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।" (৮২) দু-ভাবে সম্ভব ছিল সেই সমস্যার মোকাবিলা, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গিয়ে, অথবা তাঁকে আত্মসাৎ করে। বুদ্ধদেবের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব, সুধীন্দ্রনাথ দত্তই তাঁদের মধ্যে "আত্মিকতার সাদৃশ্য" (৮৩) লক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর কবিতাতেই বোঝাপড়ার পালাটি দীর্ঘায়িত।

"আমার 'নিজের' বলতে পারি এমন কোনো লেখা আমি লিখতে পারিনি, যতদিন না রবীন্দ্রমোহ থেকে অন্তত খানিকটা মুক্ত হতে পেরেছিলাম। আর সে মোহ ছিল অনেকদিনের"—বুদ্ধদেব জানিয়েছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা' প্রবন্ধটিতে। কৈশোরক কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী'তে সেই রবীন্দ্র-মোহ রূপ নিয়েছে, সেখানে এমন শব্দবন্ধ দুর্লভ, যা রবীন্দ্রনাথের নয় (৮৪)। 'মর্মবাণী' প্রকাশিত হয় 'প্রগতি'র সূচনার কিছু পরে, ১৯২৫-এ। বোঝা যায়, সেই 'রবীন্দ্রমোহ' ধিক্কার দিয়ে ভাঙতে চেয়েই 'প্রগতি'র রবীন্দ্র-বিদ্রোহ। এই সময়ের কবিতাগুলি 'বন্দীর বন্দনায়' ধৃত হলো ১৯৩০-এ। এর কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথের জগৎকে প্রত্যাখ্যান করার সচেতন অভিপ্রায় লক্ষ করা যায় "রাহুর না আর রহস্যের অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রজাল" (৮৫) "এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা" (৮৬), "প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি রচেছো আমায়—নির্মম নির্মাতা মম।" (৮৭)—কিন্তু এসব কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পংক্তিমাত্র, আমরা জানি 'বন্দীর বন্দনা'র যে দুটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দিলীপকুমার রায়, তাদের এই বলে প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—"ভয় ছিল পাছে সস্তা চড়া নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস দেখা যায়। সে দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েছি" (৮৮)। বস্তুত, 'বন্দীর বন্দনা'র 'ক্ষণিকা' মনে পড়ায় 'বলাকা'র ভাবনা, 'উর্বশী'র প্রত্যাখ্যান মনে পড়ায়ই 'শেষের কবিতা', 'অশান্ত বাসনা'র ভাবনা প্রায় আক্ষরিকভাবে মিলে যায় 'নিষ্ফল প্রেমে'র সঙ্গে (৮৯)। 'বন্দীর বন্দনা'র ভাবনা-বিষয় প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছিলেন—"একদিকে মহৎ ও রোমান্টিক স্বপ্নের সম্ভার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত" (৯০)—সে আত্মবিরোধ আর একটু অন্যভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথেও দেখেছি; "বাসনার আড়াল হবে রইলে গো কেন" (৯১)—'কবিকাহিনী'র এই দ্বন্দ্ব 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মানসী'র "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব" (৯২) পর্যন্ত এই বিরোধকে চিনে নেওয়া যায়, শুধু "স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত"টি ঠিক রাবীন্দ্রিক নয় মোটেই, এ হলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাঁকানো ভঙ্গির ধরন। ভাষার দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, রাবীন্দ্রিক শব্দবন্ধের অনুরণন এ কাব্যে যথেষ্টই "জীবনের গাঙুরে বসন্তের চঞ্চলতা হয়েছে মন্থর" (৯৩) অথবা "এ উজ্জ্বল আলোখানি প্রাণের প্রদীপে মোর জ্বালিবে না আর" (৯৪) দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

বিরোধের ধরনে মিল থাকলেও বিরোধের মীমাংসায় বুদ্ধদেব এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী। রূপ থেকে অরূপের সন্ধানে নয়, রূপেরই মধ্যে চাক্ষু-তৃপ্তি খুঁজলো বুদ্ধদেবের সৌন্দর্য-অনুভূতি। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কঙ্কাবতী'তে*, শব্দ-বন্ধের দিক থেকেও রবীন্দ্রজগতের বাইরে আসতে পারলেন তিনি। যদিও তাঁর পূর্বসূরী অনেক কবির ছায়া ধরা পড়েছে এর অনেক কবিতায়, তবু, বুদ্ধদেবের নিজস্ব জগৎ আকার লাভ করছে এখানেই। 'বন্দীর বন্দনা'র "রক্তে বহ্নি দাহ হয়, ঝরে পড়ে বকুলের কলি সুগন্ধে বিভ্রান্ত করি তনুমন" এই পংক্তি দুটির পাশে অনুরূপ ভাবনার 'কঙ্কাবতী'র দুটি পংক্তি—"দিন বুঝি নিবে আসে; বিকেলের রোদ, ঢলে

---

* 'কঙ্কাবতী' বইটি প্রতি সংস্করণে বদল পেয়েছে। 'পৃথিবীর পথে' নামে 'কঙ্কাবতী'র অগ্রজ কাব্যগ্রন্থের যে ক'টি কবিতা নতুন সংস্করণ 'কঙ্কাবতী'তে (১৯৫৭) গৃহীত, ভাষা-ভঙ্গীতে তারা অনেকাংশে পৃথক।

কাটিয়ে একদিন তিনি স্ব-সম্মুখ শক্তিতে উদ্যত হয়েছিলেন সাহিত্যজগতে নব নবতর রাজ্যখন্ড জয় করতে, সেই রবীন্দ্রনাথেরই কব্যের আওতায়। এই নিরাপদ আশ্রয়ে তিনি অজ স্থাণু হয়ে বসেছেন।" এ লেখার প্রতিবাদ করেন অরুণ সরকার পৌষ সংখ্যায়, উত্তরে মাঘ সংখ্যায় দীর্ঘ কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়—এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সকলের স্বতন্ত্র হলেও প্রত্যেকে একটি বিষয়ে একমত যে—বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-প্রভাবে আচ্ছন্ন। রবীন্দ্র-বিরোধী বলে যিনি একাধিকবার খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি যে আবার রবীন্দ্র-অনুকারী বলেও লাঞ্ছনা-ভাজন—এই তথ্যটিই আমাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক।

কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব আসলে অনুকরণকে অপরাধ বলেই গণ্য করতেন না; তাই প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে যখন তিনি অভিনব, তখনও প্রকরণের দিকে রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রয়োজন মতো গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। 'কবিতার' রবীন্দ্র-সমালোচনায় কলা কৌশলের আলোচনা যে অতটা জায়গা জোড়ে—এও তার একটা কারণ। রাবীন্দ্রিক স্তবক-বন্ধের ব্যবহার সমসাময়িকদের তুলনায় বুদ্ধদেব-এই সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, আধুনিক কবির অভিষ্ট—বাকস্পন্দের সঞ্চার করা কবিতায়—তার আদর্শ তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকেই সংগ্রহ করেছেন (১০৫)। 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র পরবর্তী গ্রন্থ 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' পর্যন্ত এর [illegible] ছড়িয়ে আছে। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে রাবীন্দ্রিক শব্দ-বন্ধের অনাবরণ দেখা যায় না। রবীন্দ্র প্রভাব আত্মস্থ করে তিনি পরিণতির পথে পা দিয়েছেন, কিন্তু রাবীন্দ্রিক স্তবক-বন্ধ এবং বাকস্পন্দের দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ এবং তার সমসাময়িক অন্যান্য কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা যায় :

(ক)

"ধরার প্রথম ভাষাবিহীন ক্রন্দন-কাকলি যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠল জেগে ছন্দ সুরে সুরে........"

—রবীন্দ্রনাথ, অনুক্ষমন পরিশেষ

"বিশ্বলোকে সবার সঙ্গে তার-যে বিনিময়
বয়ে চলে গাছে-পাতায়, তারায়-তারায়,
প্রাণে-প্রাণে,
অপরিমাণ রহস্য তার কেউ কি জানে..."

—বুদ্ধদেব বসু

'নববর্ষের জল্পনা' 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'।

(খ)

"আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসি থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ', 'বাঁশি' "পরিশেষ"।

"এগারোটা রাত
বসে আছি বারান্দায় চোখে ঘুম নেই।"

—বুদ্ধদেব বসু, 'বিদেশিনী'।

"ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার আছে দরদী—
আছে ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী।"

—রবীন্দ্রনাথ, 'সাধারণ মেয়ে' "পুনশ্চ"

"তোমার কবিতায় আমাকেই তুমি আঁকছো;
যে-আমি আমার কল্পনা,
সে যেন যৌবনে এলো আমার দেহ ছেড়ে,
দেহ নিলো তোমার ছন্দে
রূপ নিলো তোমার ভাষায়।"

—বুদ্ধদেব বসু 'কবির স্ত্রী'।

(ঘ)

"ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত
তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে
আলোকের ইঙ্গিত।
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান
বলে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি বলে,
[illegible] শাশ্বত।
বলে, সাধুতা তলে-তলে আত্মপ্রবঞ্চক।"

—রবীন্দ্রনাথ, 'শিশুতীর্থ', পুনশ্চ।

"নিবিড় হলো রাত্রি, পাংশু চাঁদ ছেড়ে গেলো,
নেকড়ের মতো অন্ধকার।
দলে দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়
আততায়ীর ছুরির মতো শীত।
এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ উৎসর্গ হবে প্রাণ,
আগুন জ্বালবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ,
আর যাকে জেনেছো তোমার অতীত।
পবিত্র হও প্রতীক্ষা করো।"

—বুদ্ধদেব বসু, 'শীত রাত্রির প্রার্থনা'
'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর'।

আলোচনা

নজরুল কণ্ঠ

'দেশ' পত্রিকার ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখের সংখ্যায় আমার 'নজরুল-কণ্ঠ' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশ হবার পর এই বিষয়ে দুটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম পত্রটি লিখেছেন শ্রীঅশোক সেনগুপ্ত (দেশ—৬ নভেম্বর, '৭৬)। তিনি একটি নতুন তথ্য জানিয়েছেন—এর জন্য তাঁকে আমি আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছেন, শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (দেশ—২০ নভেমবর, '৭৬)। তিনি কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এবং তথ্যের দিক থেকে নির্ভুলও নয়। আমার প্রবন্ধের শিরোনামই তার বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেয়; তবু শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ পাঠকদের কাছে যদি তা পরিষ্কার না হয়ে থাকে তবে স্পষ্ট করেই লিখি যে, নজরুলের নিজ কণ্ঠস্বর যেসব গ্রামোফোন রেকর্ডে বা চলচ্চিত্রে একদা বিধৃত হয়েছিল তার বিবরণ তুলে ধরা এবং এই দুষ্প্রাপ্য কবিকণ্ঠের নিদর্শনগুলিকে পুনরুদ্ধার করে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করার একটি আবেদন জানান এই প্রবন্ধের মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। বলাই বাহুল্য, ব্যক্তিবিশেষ স্বীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতবিদ্য হলেও তিনি এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেই কারণেই বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের নাম বা তাঁর অন্যান্য শিল্পীদের জীবনে ভূমিকার কথা এই প্রবন্ধের অন্তর্গত হয়নি। নজরুলের গানে বিমল দাশগুপ্তের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রীসেনগুপ্ত যা লিখেছেন তা অতিশয়োক্তি মাত্র। বিমল দাশগুপ্ত মহাশয় লোকান্তরিত হন ২ এপ্রিল ১৯৩৬ সালে রাত্রি ১টায় উড়িষ্যায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শনকালে। ১২ এপ্রিল ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হলে (শ্রীসেনগুপ্ত উক্ত ১৯৩৭ সালে বা রামমোহন হলে নয়) তাঁর স্মরণে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় নজরুলের মুখে আরোপিত শ্রীসেনগুপ্তের উক্তিটির কোনও সমর্থনই পাওয়া যাচ্ছে না ওই সভার বিশবস্ত প্রতিবেদনে বা উপস্থিত ব্যক্তির স্মৃতির সাক্ষ্য থেকে। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার যিনি ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁর এই সম্বন্ধে বক্তব্য—'বিমল দাশগুপ্তের শোকসভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। নজরুল ওরকম কথা বলেনি। কেনই বা বলবে? ... সঙ্গীতে নজরুলের জয়যাত্রায় কোনো ব্যক্তিবিশেষের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি। নজরুল নিজের প্রতিভায়, নিজেরই শক্তিতে জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়েছে। আর নজরুল যখন সঙ্গীত-জগতে ও কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তারপর গ্রামোফোন কোম্পানিতে তার প্রবেশ। নজরুলের গানের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখেই গ্রামোফোন কোম্পানির টনক নড়ে।' ঐতিহাসিক দিক থেকেও শ্রীসেনগুপ্তের উক্তি যথার্থ নয়। ১৯২৭ সালে স্বর্গত বিমল দাশগুপ্তের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ শিল্পী-জীবনে প্রবেশের প্রারম্ভিক যোগাযোগ মাত্র। প্রথমে বিমল দাশগুপ্ত গ্রামোফোন কোম্পানিতে শিল্পী হিসাবে যোগদান করেন এবং তাঁর প্রথম রেকর্ড (পি ১১৫৬২—'বল না, বল না, ও কথা বল না', এবং 'আমি আপনা জানিয়া স'পেছি পরান') প্রকাশ হয় ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে। বিমল দাশগুপ্ত ট্রেনার পদে উন্নীত হন ১৯৩০ সালের শেষে বা ১৯৩১ সালে এবং তাঁর সুরারোপিত গানগুলি রেকর্ডে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে ১৯৩১ সাল থেকেই। ১৯২৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত এফ জি ১২নং শিশুমঙ্গল সিরিজের রেকর্ডে সুধীরা দাশগুপ্তের কণ্ঠে 'শেফালি ও শেফালি' (শ্রীপরিতোষ বসু) ও 'বকুল ফুল,

ওলো বকুল ফুল' (শ্রীহীরেন বসু) গান দুটির প্রযোজনা এবং সুর রচনার সমস্ত কৃতিত্বটুকুই শ্রীহীরেন বসুর প্রাপ্য। নজরুল বা বিমল দাশগুপ্তের সঙ্গে এ রেকর্ডের গানের যোগ কোথায়? সুধীরা দাশগুপ্তের কণ্ঠে ১৯৩২ সালের সেপটেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি ২২১৭নং টুইন রেকর্ডে নজরুলের 'এলো ফুলের মরশুম' এবং 'আন শাকী সিরাজী' (গজল) এবং ১৯৩৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত একটি ৩৩০০নং টুইন রেকর্ডে 'নন্দকুমার বিনে সই' এবং 'সই কই গোপীবল্লভ' (কীর্তন) প্রকাশের পূর্বেই হরেন দত্ত, আঙুরবালা, কে মল্লিক, উমাপদ ভট্টাচার্য এবং ইন্দুবালা প্রভৃতি তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের কণ্ঠে বেশ কিছু নজরুল-গীতি সম্পূর্ণ নজরুলের কথায় এবং সুরে রেকর্ডে প্রকাশিত এই তথ্য শ্রীসেনগুপ্ত অবহিত হলে নিশ্চয় এই বিষয়ে অকারণে উল্লেখ করতেন না।

আমার প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও শ্রীসেনগুপ্তের পত্রের উত্তরে জানাই যে, রেকর্ডের গানে বা কমিকে দাশগুপ্ত পরিবারের কৃতী সন্তানগণের অসামান্য অবদান সম্পর্কে একজন সঙ্গীত-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হিসাবে আমি কিঞ্চিৎ অবহিত। কিন্তু সে আলোচনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, বলাই বাহুল্য। আমি তাঁর নজরুল-গীতির সুরকার বা ট্রেনার এই আংশিক পরিচয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তাঁর সমগ্র সুরসৃষ্টির রূপরেখাটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি—সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, সঙ্গীত-জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং প্রসঙ্গক্রমেই নজরুল, বিমল দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যদের কথাও লিখেছি।

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

[এ বিষয়ে আর কোনো . প্রকাশ সম্ভব নয়।]

সরোদ ও সেতারে যুগলবন্দী

গত ২৯ জানুয়ারী তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'রঙ্গজগৎ'-এ নীলকণ্ঠ গুপ্ত মহাশয় আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সার্কেলের পক্ষ থেকে আয়োজিত ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ—বিলায়েৎ খাঁর সরোদ ও সেতারে যুগলবন্দী অনুষ্ঠানের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন সেজন্য সঙ্গীতপ্রেমিক পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষ থেকে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আলোচনা প্রসঙ্গে, যুগলবন্দী অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞ উদ্যোক্তাদের কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন পেশ করতে চাই। দেখুন, বাদন পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যে সেতার ও সরোদ যখন ভিন্ন, প্রথাগত সাঙ্গীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি 'রাগ'কে

প্রকাশের ধারাও যখন কিছুটা ভিন্ন, যোগদানকারী প্রথিতযশা শিল্পীরাও যখন ভিন্ন ঘরানাভুক্ত এবং অসমঞ্জস যুগলবন্দীর বিন্যাসে সময় সময় 'বেসুরোর খপ্পরে' পড়তে বাধ্য—তখন একই ঘরানাভুক্ত শিল্পী অথবা একই শ্রেণীভুক্ত যন্ত্রে 'যুগলবন্দী' অনুষ্ঠান হওয়াই তো শাস্ত্রীয় বিধিমতে যুক্তিযুক্ত। যদিও লেখকের অভিমতে—"জায়গায় জায়গায় মনে হচ্ছিল একই শিল্পী দুই যন্ত্রে বাজাচ্ছেন"—তথাপি বিলায়েৎ-আলি আকবরের মত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের "বেসুরো" হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক নয় কি? সুখের কথা, বেতার কেন্দ্রের কর্মকর্তারা যুগলবন্দীর প্রতি এখনও বিগলিত হৃদয় নন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীদের কাছে সবিনয়ে জানতে ইচ্ছে করে—ঘরানার ঐতিহ্যকে ব্যক্তিগত নিপুণতায় প্রকাশের মাধ্যমে রস সৃষ্টির পরিবর্তে, কেন আজ আপনারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পারস্পরিক লড়াই দেখিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে লালায়িত হলেন? বলুন তো—যুগলবন্দী বাজিয়ে আপনারা কি প্রকৃত আনন্দ পেয়ে থাকেন? অপর পক্ষে, যে উদ্যোক্তাদের প্রশ্রয়ে ও প্ররোচনায় সনাতন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্তেরা একটু বেশী 'আধুনিক' হওয়ার সুযোগ পান—জানি না তাঁরাও কি "প্রবল সাথসঙ্গতের" সঙ্গে গৎকারি শুনে 'হায় হায়' করেন?

পরিশেষে, শ্রীগুপ্তের সমালোচনা পড়ে মনে হল তিনি গানের ব্যাকরণ সম্পর্কে একটু বেশী তন্ময় ছিলেন। ফলে, তবলা-বাদকদের সাফল্য ও ব্যর্থতা তাঁর কাছে গৌণ প্রতিপন্ন হয়েছে। যতদূর জানি, তবলারও ব্যাকরণ আছে—ঘরানাগত কৌশলটা এবং ইতিহাস আছে। দুঃখের কথা, সাথসঙ্গতে অংশ গ্রহণকারীদের যোগ্য মর্যাদা দিতে সমালোচকেরা এবং শ্রোতারা যেন আজও কিছুটা কুণ্ঠিত। অথচ, কিন্তু সঙ্গীত শিল্পীরা অবশ্যই কবুলে করবেন—সঙ্গীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূলে তবলাবাদকের ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

তারাশিস মুখোপাধ্যায়
তমলুক

উপন্যাসে স্মরণীয় চরিত্র

দেশ পত্রিকায় অভিনন্দ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে উপন্যাসে কেন স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে না তার কতক-গুলি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি যে সব কারণ দেখিয়েছেন সেগুলি নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় তাঁর বক্তব্য যতটা বিশ্লেষণধর্মী হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তাঁর বক্তব্যে যথেষ্ট ফাঁক থেকে গেছে।

স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে না এর প্রথম কারণ হলো এই যে, বর্তমানে বাংলা ভাষায় উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক লেখা হচ্ছে না। বর্তমান ...

গল্পকে উপন্যাস হিসাবে চালাচ্ছেন। বলতে লজ্জা নেই তাঁরা বর্তমানে অনেকটা ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হয়ে গেছেন। বেশি বই লেখার তাগিদে তাঁরা এক একটি রচনা অল্পেই সারছেন। ফলে রচনাগুলি বড় গল্পের পরিসরেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, তার ঊর্ধ্বে উঠে সেগুলি যথার্থ উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারছে না। সুতরাং উপন্যাসে যদি গল্পেরই কাঠামো বজায় থাকে তবে সেখানে স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হবার সুযোগ কোথায়।

এর পর অভিনন্দ বলেছেন, বর্তমানে সামাজিক অবনতির দরুণ বেশীর ভাগ মানুষই ডাল ভাতের জীবে পরিণত হয়েছে তাই সেখানে স্মরণীয় চরিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অভিনন্দের এই মূল্যায়ন আমার কাছে কিন্তু ভ্রান্ত মনে হয়েছে। সামাজিক অবনতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে সমাজ থেকে আদর্শনিষ্ঠ হৃদয়বান বড় মানের মানুষ একেবারে উবে গেছে তা আমরা বলি কি করে।

স্মরণীয় চরিত্র আগেও যেমন সমাজে ছিল এখনও তেমনি আছে। আসলে গলদ ঘটছে এই জন্য যে, আধুনিক উপন্যাসকারেরা সেই চরিত্রগুলি খুঁজে নেওয়ার মত পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকারে কার্পণ্য করছেন। আগেকার উপন্যাসে ঘটনার পর ঘটনা সাজানোর মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে তার পরিপূর্ণ শিল্পগত রূপ পরিগ্রহ করতে দেখতাম। কিন্তু আজকালকার উপন্যাসগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবজগতের ঘটনা-বর্জিত। এর স্থান গ্রহণ করেছে একান্তভাবে মনোজগতের ঘটনা। আধুনিক উপন্যাসে আমরা প্রায়ই দেখি চরিত্রেরা বাস্তবজগতের ঘটনাস্রোত দ্বারা যতটা না পরিচালিত তার চেয়ে বেশী পরিচালিত মনোজগতের বিচিত্র আলোছায়ার অনুভূতির দ্বারা। চরিত্রের সংলাপগুলি বাস্তবজগত সঞ্জাত ততটা নয় যতটা অবচেতন মনের রাজ্য সঞ্জাত। আধুনিক উপন্যাসের এই যে ঘটনাবিহীনতা এর কারণই হচ্ছে যে, সাহিত্যিকেরা জীবনের মূল স্রোত থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছেন। সুতরাং এ অবস্থায় স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হবে কি করে। কারণ স্মরণীয় চরিত্র আমরা খুঁজে পাবো বাস্তব জীবনে, অবচেতন মনের রাজ্য থেকে তাকে তো সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বর্তমানে স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে না এ কারণে নয় যে মানুষ খর্ব খেলো হয়ে গেছে। আসলে সাহিত্যিকেরাই স্মরণীয় চরিত্র খুঁজে পাওয়ার জন্য যে ত্যাগ, পরিশ্রম ও ধৈর্য স্বীকারের প্রয়োজন তাতে কার্পণ্য করছেন।

প্রভাতকুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ঃ সুধীরচন্দ্র করের চোখে প্রথম দর্শনে

আপনাদের পত্রিকায় সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের পরলোকগমনের খবর জেনে দুঃখ-বোধের সঙ্গে সঙ্গে মন চলে গেল প্রায় সতেরো বছর আগে যখন তিনি আমাকে একটি অপূর্ব চিঠি লিখে তাঁর সহৃদয়তার পরিচয় দেন।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনে কি ভাব তাঁর মনে জেগেছিল, এই কথাটি জানবার জন্যে তাঁকে যে চিঠি লিখি, তাঁর পত্রটি এরই উত্তরস্বরূপে তিনি লেখেন।

জনৈক পাঠক
শান্তিনিকেতন
২৪-৭-৬০

সবিনয় নিবেদন,

লেখার মতো সম্বল বা সাধ্য নেই; কিন্তু আপনার আগ্রহকে শ্রদ্ধা না জানিয়েও পারা যাচ্ছে না।

প্রায় ৩৫/৩৬ বছর আগেকার কথা। তখন আমি কুমিল্লাতে অভয় আশ্রমের কর্মী। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসব। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। আশ্রমে পৌঁছলেন রাত্রিতে। ভোরে উপাসনা হল। তিনি আচার্যের আসন গ্রহণ করেছিলেন। পাশে বসেছিলেন তাঁর 'সুরের ভাণ্ডারী' স্বর্গত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমবেত কণ্ঠে আশ্রমের পক্ষ থেকে উদ্গীত হল, সেতার, কর্মী একজন গাইলেন রবীন্দ্রসংগীত—"এই লভিনু সংগ তব, সুন্দর, হে সুন্দর।" আচার্য তখন প্রার্থনা করলেন, এবং প্রার্থনাতে আশ্রমের বিষয়ে কিছু বললেন। তাঁকে ভালো করে দেখলাম, তাঁর বাণী শুনলাম সেই প্রথম। পরিশেষে, সকলের অনুরোধে কবির ইঙ্গিতে দিনেন্দ্রনাথ গাইলেন—"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন" গানখানি।

সেই প্রথম দেখার স্মৃতির মধ্যে মনে পড়ছে বিশেষ করে গানের একটি পদ—"সুন্দর হে সুন্দর"। প্রার্থনাসংগীতের ঐ পদটিতে সেদিন সামনে-বসা জ্যোতির্ময় মানুষটিকেও যদি মাঝে মাঝে মনে পড়িয়ে দিয়ে থাকে, জানিনে তা দোষের হয়েছিল কি না। তিন দিন আশ্রমে কাটিয়ে চলে এলেন তিনি সদলবলে। পরের বছর এখানে তাঁর আশ্রয়ে আসতে হল আমাকে।

কবির প্রসঙ্গে দু'চার কথা লেখা আছে আমার 'কবি কথা' বইখানিতে। সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। নমস্কার। ইতি—

নিবেদক
শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

অসংলগ্ন সাহিত্য

অসংলগ্ন সাহিত্য (দেশ, ৫ ফেব্রুয়ারি) লেখাটির জন্যে অভিনন্দকে অভিনন্দন। অভিনন্দ যে আলোচনা করেছেন, তা

আরামবাগ আদা। বরানগর।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে কুম্ভিলক-বৃত্তিজাত অপচ্ছায়াগুলি যেভাবে দাপাচ্ছে, তাতে যথেষ্ট কারণ রয়েছে দুশ্চিন্তার। মানবজীবনের কোন কোন উপাদানকে মাত্রা-হীনভাবে ব্যবহার করে, সাহিত্যের উপজীব্য করে সাহিত্য এমন একটা বিন্দুর পানে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে আনন্দ নেই, আদর্শ নেই, নেই সৃষ্টি। শুধু আছে অন্ধকার। নবজাগরণের নামে, নতুন কিছু দেবার কসনায় অসংলগ্নতাই যদি পনেরো আনা স্থান দখল করে বসে, সেটা সুস্থতার পরিচয় নয় বলেই মনে হয়। লোভ, ঈর্ষা, আনন্দ, বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা, সুখ দুঃখ—সব কিছু নিয়েই তো মানুষের পূর্ণ জীবন। তার ইতিহাস। সেই ইতিহাস রচনায় যদি সুন্দরের স্পর্শ না থাকে, তবে তো জীবন মধুময় হতে পারে না। বিদেশী সমাজে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে ঠিকই, কিন্তু নেই সুস্থ জীবনবোধ। ফলে ও-দেশের বর্তমান সাহিত্যে অসংলগ্নতার ছড়াছড়ি, জীবনে হাহাকার। এ কথা মনে রাখলে সুখী হই, একমাত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেই সভ্যতার উন্নতি নয়, সভ্যতার উন্নতি নির্ভর করে আত্মিক উন্নতিতে। আমাদের সমাজ তো সেদিক থেকে বিদেশের মত কাঙাল নয়, আমাদের সমাজে তো মানবিক বোধের অভাব নেই। তবে কেন সাহিত্যে অসংলগ্নতা?

অভিনন্দ বলেছেন, অধিকাংশ তরুণ লেখকরা অসংলগ্নতার দিকে ঝুঁকেছেন, এটা বয়সের দোষ হতে পারে। এই মন্তব্যের শেষ শব্দ দুটি লক্ষ করতে বলি। অভিনন্দ "হতে পারে" লিখেছেন, 'দোষ' লিখে দাঁড়ি টানেননি। অর্থাৎ তিনিও যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তা নয়। আসলে বয়সের দোষ বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কারণ, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েকজন তরুণ লেখক এবং কবি আছেন, যাঁরা সত্যই সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন। যাঁদের লেখায় অসংলগ্নতা অনুপস্থিত।

সত্য রায়
বরানগর

বিশ্ববিজ্ঞান

বাইশে জানুয়ারীর দেশ পত্রিকায় বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে শ্রীসমরজিৎ করের "গাছও রোগ প্রতিরোধ করে" শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। মূলত ছত্রাক জাতীয় রোগ-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে রোগ প্রতি-রোধের জন্য অনেক গাছ নিজস্ব ক্ষমতায় যে এক শ্রেণীর বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ তৈরী করে থাকে তার নাম ফাইটোঅ্যালেক্সিন নয় ফাইটো অ্যালেক্সিন। ১৯৩৯-৪০

সহকর্মীরা আলুর নাবিধসা রোগ সংক্রান্ত তাঁদের গবেষণার উপর ভিত্তি করে গাছের দেহে এই ধরনের রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন যৌগের উৎপাদনের সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে নীরোগ গাছের দেহে ফাইটোআলেকসিন থাকে না, জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে এর উৎপাদন শুরু হয় এবং আক্রান্ত অঞ্চলের কোষসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে জমলে সেখানে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত গাছ নিয়ে এরকম গবেষণা হয়েছে এবং মটর, সয়াবীন, ফ্রেঞ্চবীন, গাজর, আলু, অর্কিড ও অন্যান্য অনেক গাছের ক্ষেত্রে ফাইটোআলেকসিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কিছু গাছের ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে ফাইটোআলেকসিনের ভূমিকা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। বর্তমান চিন্তাধারা হল এরকম। রোগ আক্রান্ত হলে কোন গাছের সব প্রজাতি একই ফাইটোআলেকসিন উৎপাদন করে থাকে, যদিও উৎপাদনের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশী এরকম প্রজাতির দেহেই ফাইটোআলেকসিনের উৎপাদন সাধারণত দ্রুত এবং বেশী হয়। একই প্রজাতির গাছে বিভিন্ন রোগজীবাণুর আক্রমণ হলে ফাইটোআলেকসিন উৎপাদনের পরিমাণও কম বেশী হতে পারে। অপেক্ষাকৃত মারাত্মক ধরনের রোগজীবাণুর কোন একটি গাছের কোষকে ফাইটোআলেকসিন উৎপাদনে উদ্দীপিত করবার ক্ষমতা সাধারণত কম মারাত্মক রোগজীবাণুর তুলনায় অনেক কম। সব রোগজীবাণুর ফাইটোআলেকসিনের প্রতি সহনশীলতাও এক নয়। গাছের বেশী ক্ষতি করে যেসব রোগজীবাণু তাদের সহনশীলতা কম ক্ষতিকর জীবাণুর তুলনায় অনেক বেশী। রোগের আক্রমণ হলে আক্রান্ত অঞ্চলে কি পরিমাণ ফাইটোআলেকসিন উৎপন্ন হচ্ছে ও জমছে আর রোগজীবাণু কতটা ফাইটোআলেকসিন সহ্য করতে পারে তার উপর নির্ভর করবে আক্রান্ত গাছের দেহে আদৌ রোগের লক্ষণ দেখা দেবে কিনা বা দেখা দিলে রোগের আক্রমণে ক্ষতি কম হবে না বেশী হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রজাতির গাছে রোগজীবাণুর যে-কোন প্রজাতির আক্রমণ হলে দ্রুত হারে ফাইটোআলেকসিন উৎপাদন হতে থাকে, ফলে খুব তাড়াতাড়ি রোগজীবাণুর বৃদ্ধি ও কার্যক্ষমতা ব্যাহত হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই বা অত্যন্ত কম এরকম প্রজাতির গাছে রোগের আক্রমণ হলে ফাইটোআলেকসিন উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত মন্থর হওয়ায় রোগজীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকর পরিমাণে জমতে সময় যত বেশী লাগে গাছে তত বেশী রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ফাইটোআলেকসিন রোগজীবাণুকে সম্ভবত মেরে ফেলে না, নিষ্ক্রিয় করে দেয়। পরে রোগজীবাণু মরে যায়।

বিভিন্ন ধরনের গাছের উপর চালানো পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ধরনের জীবাণু, জীবাণুনিঃসৃত রস বা নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে গাছে ফাইটোআলেকসিন উৎপাদন করানো

যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে জীবাণুর দেহের মধ্যে এমন কোন রাসায়নিক পদার্থ আছে যা গাছের কোষে প্রবেশ করে তাকে ফাইটোঅ্যালেকসিন সংশ্লেষণে উদ্দীপিত করে। অনেক ধরনের রাসায়নিক পদার্থই কিন্তু এই উদ্দীপনা যোগাতে পারে। সয়াবীন এবং ফ্রেঞ্চবীনের ক্ষেত্রে দুটি রোগ-জীবাণু নিঃসৃত প্রোটিন জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব জানা গেছে যারা ফাইটোআলেক-সিন সংশ্লেষণের ব্যাপারে গাছকে সাহায্য করে। বিটা-গ্লুকান নামক শর্করাজাতীয় পদার্থ এই তালিকায় নতুন সংযোজন। মটর, বীন, তুলা, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি গাছের উপর পরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন ধরনের বেশ কিছু সংখ্যক রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি ঐসব গাছকে ফাইটো-অ্যালেকসিন উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগাতে পারে। গাছ তার নিজের দেহে কিভাবে ফাইটোঅ্যালেকসিন সংশ্লেষণ করে এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও পরিষ্কার নয়।

অশোককুমার সিংহ
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী।

সব্যসাচী ঃ চলচ্চিত্র

'সব্যসাচী' চলচ্চিত্রের বলিষ্ঠ সমালো-চনার জন্য রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুধু রঞ্জনবাবু কেন, আমরাও সব্যসাচীকে কোন সময়েই সব্যসাচী বলে মনে করতে পারিনি। বিশেষ করে নিমাই-বাবুর সামনে যে সব্যসাচীকে হাজির করা হয়েছে, সে সব্যসাচীকে পীযূষবাবুর উত্তমকুমার ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। এমন কি তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের সব্যসাচীকে কষ্ট করেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আসলে পীযূষবাবুর সাম্প্রতিক ছবি-গুলির (রাজবংশ, বহ্নিশিখা) মধ্যে সৃজন-শীলতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের দেউলিয়াপনা লক্ষ করা গেছে। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে উক্ত ছবিগুলির নায়ক চরিত্রে অভিনেতার মধ্যেও একই জিনিস প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে জনপ্রিয়তাই যে উৎকর্ষের মানদণ্ড নয়—একথা একই সঙ্গে পরিচালক এবং অভিনেতার মনে রাখা উচিত। রঞ্জন-বাবুর সমালোচনায় এ কথা স্পষ্ট করে উচ্চারিত না হলেও তিনি সেদিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন বলে, তিনি অবশ্যই দর্শকদের ধন্যবাদার্হ।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, বাংলা সাহিত্যে 'পথের দাবী' উপন্যাসটির যে একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে সে কথা পরিচালক কিংবা অভিনেতা কেউই গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করতে শোচনীয়ভাবে অক্ষম হয়েছেন। যদি উপন্যাসটির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে পরিচালক অন্তত একটু ওয়াকিবহাল হতেন, তাহলে শরৎশতবর্ষে 'পথের দাবী'কে নিয়ে এমন স্বেচ্ছাচার খেলায় তিনি মাততেন না। 'পথের দাবী' অবলম্বনে 'সব্যসাচী'র এমন ব্যর্থ চলচ্চিত্রায়ণে আমরা মর্মাহত, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ।

প্রতাপরঞ্জন হাজরা
শ্রীরামপুর, হুগলী

চলতে চলতে

বিমল মিত্র

॥ ১৯ ॥

পরের দিন ডাক্তার মিত্রের টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো। আমি ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসেছি। ঘড়িতে চেয়ে দেখি তখন ইণ্ডিয়ার টাইম সকাল আটটা। অর্থাৎ মরিশাস-এর ঘড়ি হিসেবে সকাল সাড়ে ছটা।

টেলিফোনে ছিলেন ডাঃ মিত্র। বললেন—কোথাও বেরোবেন না, আমি আপনাকে তুলে নিয়ে আসবো—

আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলাম। মরিশাসে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। এ ক'দিন সরকারী অনুষ্ঠান যতটা সম্ভব এড়িয়ে এড়িয়ে মরিশাসের অন্য দিকটা দেখে বেড়িয়েছি। এই সেই মরিশাস, ক'দিন আগেও যার নাম পর্যন্ত কেউ জানতো না। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে মরিশাস কীভাবে আধুনিক ভূগোলের মানচিত্রে তার একটা পাকা আসন গড়ে তুলেছে তাও জেনে রোমাঞ্চিত হয়েছি। মানচিত্রের এই পরিবর্তনের পেছনে মরিশাসের মানুষের যে কী অনলস অধ্যবসায় ব্যয় হয়েছে, সকলের সঙ্গে মিশে তারও পরিচয় পেয়েছি। আজকের যুগের মরিশাসের ছেলেমেয়েরা কিন্তু তাদের পূর্ব-পুরুষদের সেই ত্যাগ আর অধ্যবসায়ের কথা ভোলেনি। ভোলেনি বলেই তারা মাঝে মাঝে সে যুগের কোনও স্বদেশীয় মহাপুরুষের স্মৃতি-বার্ষিকী পালন করে তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যেমন গান্ধীজী। গান্ধীজীর উপদেশ আর অনুপ্রেরণাতেই যে তাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে একথা তারা স্মরণ করে বলেই আজ সেখানে গান্ধী স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করে তাঁকে তারা সম্মান দেখাচ্ছে।

অথচ এই কিছুদিন আগেই এই কলকাতাতেই মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মর্মরমূর্তি ভেঙে ফেলার হিড়িক শুরু হয়ে গিয়েছিল—এ ঘটনা মরিশাসে গিয়ে আমার বারবার মনে পড়েছিল।

সেদিন শিউপূজনের বাড়ি থেকে

কিন্তু শিউপূজনের কবিতাটা আমার মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, সারা রাস্তা তা আমার মনের ভেতরে গুঞ্জন করতে শুরু করেছিল। এমন করে তো আমি কখনও আমাকে নিয়ে ভাবিনি—যেমন করে মরিশাসের একজন কবি নিজেকে নিয়ে ভেবেছে। শিউপূজনকে সংসারের পথে চলতে চলতে অনেক জ্বালায় জ্বলতে হয়েছে, তবু তারই মধ্যে প্রভুকে ডেকে সে বলছে—'প্রভু, আখের রসে আরও মিষ্টি দিও—'

আমাদের উপনিষদকারও বলেছেন ঃ

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ। ইত্যাদি...

অর্থাৎ—বায়ু মধু বহন করছে, নদী-সিন্ধু সকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক, রাত্রি মধু হোক, ঊষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক, সূর্য মধুমান হোক।

শিউপূজনের এ কামনা সমস্ত শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই কামনা। পৃথিবীর তাবৎ ঋষি মহাপুরুষ, বিভিন্ন ধর্ম-গুরুদেরও এই একই প্রার্থনা যে, পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষ, জীবজন্তু সব কিছু মধুময় হোক, সকলের মঙ্গল হোক, সবাই আনন্দ-রূপকে দেখুক, সকলে অমৃত আস্বাদ করুক।

আসবার সময় তাই শিউপূজনকে বলে এলাম—তোমাকে দেখে আমার আসল মরিশাসকে দেখা হয়ে গেল শিউপূজন, আমার আর কিছু দেখার দরকার নেই—

শিউপূজন বললে—ও কথা কেন বলছেন, আমি তো সামান্য একজন কবি মাত্র—

আমি বললাম—তুমি যে আখের রসে আরো মিষ্টি দেবার জন্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছ। এ শুধু একলা তোমার কথা নয়, এ সমস্ত মরিশাসের কথা। তাই মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন এই মরিশাসেই সফল হয়েছে—

শিউপূজন বললে—আপনি যে কী বলেন—

শিউপূজন যেন একটু লজ্জায় পড়ে গেল আমার অকপট প্রশংসা শুনে। বললাম—না, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। তোমরা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক প্রগতি আর পূবের আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুটোর সমন্বয় করতে পেরেছ বলেই এমন করে তোমরা বলতে পেরেছ যে, শুধু তোমাদের নয়, সকলের ভালো হোক—

তখন তার বেশি কথা বলবার আর সময় ছিল না। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হোটেলে আসতে আসতে ভাবছিলাম এখানে প্রায় চল্লিশটা চিনির কল, রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন থেকে আরম্ভ করে বৈজ্ঞানিক

প্রগাতর দান যা কিছু সবই আছে আবার তারই পাশাপাশি আছে আখের ক্ষেত, মৃদু বাতাস, সমুদ্রের নীল, আর বিশাল আকাশের বিস্তার। আবার দেওয়ালীর দিনে যেমন আছে সম্প্রীতির আলিঙ্গন, তেমনি আছে মহরমের দিনে অফুরন্ত সৌহার্দ্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে কী জিনিস তা মরিশাস জানে না। মহাত্মা গান্ধীকে সেদিন যারা অভ্যর্থনা করতে সামনের সারিতে এগিয়ে এসেছিল তারা যে সবাই মুসলমান এ তথ্য কি আমি আগে জানতুম? ইংরেজ ভারতবর্ষের যে-চক্রান্ত করে সফল হয়েছিল, এই মরিশাসে কেন তারা সে-চক্রান্ত করতে পারলে না?

তার কারণ এই আকুল প্রার্থনা—"প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—"

আমরা তো কেউ চাইছি আমরা বড় হয়ে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবো। কেউ চাইছি ভবিষ্যতে বড় ইঞ্জিনীয়ার হবো, কেউ বা ভাবছি বড় ডাক্তার হবো, কেউ চাইছি বড় লেখক হবো। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকে অনেক কিছুই তো আমরা হতে চাইছি। কিন্তু তা কি সবাই হতে পারছি? অথচ কেউ কেউ তো আমাদের মধ্যে ঈপ্সিত গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারছি। কিন্তু কেন আমাদের সকলের সব চাওয়া সফল হয় না?

হয় না তার কারণ আমাদের চাওয়ার মধ্যে আমাদের সমস্ত মনের আকুল অনুরাগ নেই। কলম্বাস তাঁর মনের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে চেয়েছিলেন যে, তিনি এমন এক জায়গায় পৌঁছবেন যেখানে একটা ডাঙা আছে। তাই তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারিনি কারণ আমাদের চাওয়ার মধ্যেও ভেজাল আছে। আমরা সমস্ত মনের অনুরাগ দিয়ে বলতে পারি নি যে, 'প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—'

একমাত্র মরিশাস যে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে তার কারণ তার চাওয়ার মধ্যে কোনও ভেজাল ছিল না।

ডাঃ মিত্র পরের দিন ঠিক নির্ধারিত সময়েই এলেন, ডাঃ প্রভাতকুমার মিত্র। বিলিতি ডিগ্রীধারী। লন্ডন থেকে সোজা চাকরি নিয়ে মরিশাসের হাসপাতালে এসে যোগদান করেছেন। সব সময়েই হাসি-খুশী মুখ। ডাক্তার কেমন তা জানবার সুযোগ হয় নি আমার, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি যে সরল বন্ধুবৎসল অকপট তা একদিনের মধ্যেই জানা হয়ে গেল। নইলে আমি কোথাকার কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল মানুষ, আমার তুষ্টিবিধান করতে তিনি এত ব্যাকুল হলেন কেন?

গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন—কেমন দেখলেন মরিশাস?

বললাম—মনে হচ্ছে, না দেখলে একটা অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতুম—

আবার জিজ্ঞেস করলেন—ইণ্ডিয়াতে ফিরে গিয়ে মরিশাস সম্বন্ধে কিছু লিখবেন নাকি?

বললাম—তেমন কোনও পরিকল্পনা নেই আমার। আমি একটা নোট-বুক পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি—

শুনে ডাক্তার মিত্র বললেন—লিখুন না। আমি পৃথিবীর এত জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এমন সুন্দর দেশ আর দেখিনি। এখানকার জল-হাওয়া এত ভালো যে, আর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অথচ চিরকাল তো এখানে থাকা চলবে না, একদিন-না-একদিন তো দেশে ফিরতেই হবে—

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কলকাতার মানুষ এখানে এলেন কী করে?

ডাঃ মিত্র বললেন—লনডনে থাকতে কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখে এখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে চাকরি পেয়ে গেলাম—

বললাম—মরিশাসে অত সবার আগে ভাবতেও পারিনি যে এখানে এত বাঙালী দেখতে পাবো। শুনেছিলাম এখানে শুধু বিহারের লোক আছে।

ডাঃ মিত্র বললেন—বাঙালী অনেক আছে এখানে। এখানকার আর্মিতে, এখানকার এয়ারপোর্টে কনট্রোল-টাওয়ার অফিসে তাঁরা আছেন। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট তাঁদের পাঠিয়েছে মরিশাসের লোকদের ট্রেনিং দেবার জন্যে।

তারপর একটু থেমে বললেন—আজকে আবার একটা মুশকিল হয়েছে—

—মুশকিল? আবার কী মুশকিল?

—আমার স্ত্রী আবার একটু ব্যস্ত আছেন তাঁর স্কুল নিয়ে। তাঁদের স্কুলে আজকে 'ফ্যান্সি-ফেয়ার' আছে। চলুন সেখানেই যাই। সেখান থেকে আমার স্ত্রীকে তুলে নিতে হবে।

বলে তিনি একটা স্কুলবাড়ির সামনে গিয়ে গাড়িটা থামালেন।

স্কুলবাড়িটি একটি মনোরম জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে লেখাপড়া করলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এর পরিবেশটা তাই। ভেতরে ঢুকে দেখি একটা বিরাট উঠোন, তার চারদিকে বারান্দা। আর তার পেছনে সার-সার ঘর। স্কুল ছুটি, তাই ঘরগুলো তালা বন্ধ, কিন্তু বারান্দার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত বাজার বসেছে। বোধ হয় ছাত্রী বা শিক্ষয়িত্রীদের তৈরি নানা রকমের পণ্য-সামগ্রীতে ভরা। শিক্ষয়িত্রীরা বসে গেছেন তা বিক্রী করতে। উলের সোয়েটার, সুতীর ফ্রক, ফলের জ্যাম বা জেলি এইসব নানা-রকম জিনিস। ক্রেতাদেরও বেশ ভিড়। ডাক্তার মিত্রকে দেখে একজন আফ্রিকান মহিলা এগিয়ে এলেন। বললেন—কিছু কিনুন ডাক্তারবাবু—

আমি তাঁর ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। ডাক্তার মিত্রকে জিজ্ঞেস করলাম—কী বললেন উনি? আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না—

ডাক্তার মিত্র ততক্ষণে একটা দশ টাকার কি পনেরো টাকার নোট বার করে দিলেন, আর মুখে যেন কী বললেন। বলে আমাকে বললেন—এ হচ্ছে ক্রিয়োল ভাষা। ফ্রেঞ্চ থেকে ভেঙে এই ভাষার চলন হয়েছে। এখানে সবাই রাস্তায়-ঘাটে-বাজারে এই ভাষাতেই কথা বলে। আমাকে একটা কিছু কিনতে বললে, আমিও কিনলাম—

কী একটা জিনিস প্যাকিং করে তাকে দেওয়া হলো। মিসেস মিত্র তখন ক্যাশ টাকার হিসেব আর রসিদ লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। খানিক পরে তিনি উঠে আমাদের কাছে এলেন। বললেন—এই দেখুন, ঠিক আজকেই আমার এই কাজ পড়েছে—সকাল থেকে কিছু রান্নাবান্না করতে পারিনি, এখানেই জড়িয়ে পড়েছি—আজকে আপনাকে হোটেলে খেতে হবে—

আমি বললাম—খাওয়া তো ওখানে আমাদের রয়েছেই, শুধু আপনাদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করবো সেইজন্যেই আসা—।

মিসেস মিত্র গাড়িতে উঠেও দুঃখ করতে লাগলেন। বাঙালী মাছ-ভাত খেলেই খুশী হয় এইটেই তাঁর ধারণা এবং অনিবার্য কারণেই তা সম্ভব হয়নি বলে তাঁর আপ-সোসের শেষ ছিল না। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—আমি সেরকম বাঙালী নই, আমায় আপনি যা খাওয়াবেন তাই-ই আমার কাছে অমৃত। আপনাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবো এইটের ওপরেই আমার যত লোভ। আপনারা যে শুধু কলকাতার লোক তা তো নয়, আপনারা মরিশাসের বাঙালী যে। তার তো একটা আলাদা স্বাদ আছে—

একটা জায়গায় এসে মিসেস মিত্র বললেন—চাইনীজ লাঞ্চ খাবেন?

বললাম—আমার কাছে সবই সমান। তবু চলুন, একটু মুখ বদলানো যাক—

চীনা খাবারের দোকান ভারতবর্ষের সব শহরেই আছে। কিন্তু বাঙালী ঝোল-ভাত খাবার ভালো দোকান বোধহয় বাঙলাদেশেও নেই। বহু বিদেশী কলকাতায় এসে বাঙালী খানা খেতে চান। অর্থাৎ মাছের ঝোল ডাল ডালনা চচ্চড়ি প্রভৃতি। কিন্তু কলকাতা শহরে অনেক খুঁজেও তেমন হোটেল তাঁরা খুঁজে পান না। ব্যতিক্রম শুধু চীনাদের বেলায়। চীনাদের খাবারের দোকানে শুধু যে চীনারাই খান তা নয়। আমি নিজে বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে গিয়ে চীনাদের দোকানে গিয়ে খেয়েছি এবং দেখেছি যে খরিদ্দারের অধিকাংশই অচীনা। এ ব্যাপারে মাদ্রাজী খাবার দোকানেরও উল্লেখ করা চলে। ভারতবর্ষের সর্বত্র মাদ্রাজীখানার দোকান খুবই জনপ্রিয়। পরিচ্ছন্নতা, সুস্বাদ এবং উপাদেয়তার দিক থেকে চীনা খাদ্যের পরেই বোধ হয় মাদ্রাজীখানার স্থান।

আমি মন্তব্য করলাম—এখানেও দেখছি চীনাদের রেস্টুরেন্ট আছে—

ডাঃ মিত্র বললেন—এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার চাইনীজ আছে যে, তারা সবাই ব্যবসাদার, নানারকম কারবার তাদের—

ডাঃ মিত্র মরিশাসের লোকসংখ্যা সম্বন্ধেও অনেক আলোকপাত করলেন। মরিশাসের ১৯৬৪ সালের লোকগণনার হিসেব অনুযায়ী ৩৭৩, ১৫৫ জন হিন্দু, ১১৯,৫৯৪ জন মুসলমান, ২৪,৩৯৪ জন চাইনীজ আর অন্যান্য সম্প্রদায় মোট ২১৬,৯৬২ জন—এই নিয়ে মরিশাসের মোট লোকসংখ্যা।

সেই ১৮৩৩ সালে দাস-ব্যবসা বিলোপ হলো আইন পাশ করে। তারপর ১৮৩৪ সাল থেকেই পাঁচ বছরের চুক্তি করা ক্ষেত-মজুর আসতে লাগলো মরিশাসে। তখন থেকেই ভারতীয়দের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন এই অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে। কিন্তু মরিশাসের চীনাদের অবস্থা অন্য-রকম। তারা কোনও রাজনীতি নিয়ে কোথাও মাথা ঘামায়নি। কারবার করে টাকা উপায় করে সংসার চালাতে পারলেই তারা খুশী, তার বেশি আর কিছু চায়নি তারা। কলকাতায় চীনাদের প্রধান কারবার যেমন জুতো, মরিশাসে তেমনি তাদের মুদিখানার দোকান আর হোটেল।

চীনের মূল ভূখণ্ডের ইতিহাস বড় মর্মান্তিক। আদিকালে যেমন চীনাদের রাজারা দেশের জনগণকে শোষণ করেছে পরবর্তীকালে তেমনি তাদের শোষণ করেছে পৃথিবীর সবাই। শোষণ করার পদ্ধতিটা কিন্তু সেই একই। আমাদের ভারতবর্ষের মত চীন দেশেও তারা প্রথমে পাঠিয়েছিল মিশনারিদের। মিশন বি... গিয়ে জমি তৈরি করার পর শুরু ... তাদের কারবার। আর তখনই বাধলো সংঘর্ষ। আমাদের দেশে রামমোহন রায় ছিলেন বলে তবু ইংরেজদের চক্রান্তে কিছু বাধা পড়েছিল। কিন্তু চায়নায় তেমন কোন রামমোহন রায় জন্মাননি। চীনারা আদিকাল থেকেই আফিমের নেশায় আসক্ত ছিল। পর্তুগীজরা যখন প্রথম সেখানে গিয়ে পৌঁছায় তখনই তারা দেখে-ছিল জনসাধারণের মধ্যে আফিমের প্রচলন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আর ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৭৭৩ সাল থেকেই ইংরেজরা ভারতবর্ষ থেকে আফিম নিয়ে গিয়ে চায়নাতে বিক্রী করতে লাগলো। আফিম বড় লাভজনক ব্যবসা। এত লাভ-জনক ব্যবসা যে পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে আফিমের কারবার চারগুণ বেড়ে গেল। আর শুধু কি ইংরেজ—কে চীনকে শোষণ করেনি? গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স স্পেন জাপান—যে কেউ যখন সুবিধে পেয়েছে

অত্যাচার চালিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যাচার সহ্য করে করে চীনারা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন তারা কেউ কেউ আশপাশের জনপদে গিয়ে বসতি করেছে। কেউ এসেছে ইণ্ডিয়ায়, কেউ গেছে ইন্দোনেশিয়ায়, কেউ আফ্রিকায়, কেউ মালয়েশিয়াতে, কেউ সিঙ্গাপুরে, কেউ বা এসেছে এই মরিশাসে।

ইণ্ডিয়ায় যদি সিপাহি বিদ্রোহ না হতো তাহলে কি উত্তর ভারত থেকে ইণ্ডিয়ানরাই মরিশাসে যেত? আর মরিশাসে যারাই বা গিয়েছিল পেটের দায়ে বা চাকরির লোভে সবাই তো ক্রিশ্চিয়ানই হয়ে যেত। কিন্তু তা যে হয়নি তার কারণ তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। আর তাছাড়া আর একটা প্রত্যক্ষ কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্যসমাজ' আন্দোলন।

ততক্ষণে আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে মুখ বদলানো গেল। মিসেস মিত্র আবার দুঃখ করতে লাগলেন—আপনাকে মাছের ঝোল-ভাত খাওয়াতে পারলুম না—

আমি বললাম—না খাওয়াতে পেরেছেন ভালোই হয়েছে। বাড়িতে মাছ ভাত খাওয়ালে তো আর জানতে পারতুম না যে এখানে স্কুলে 'ফ্রান্সি-ফোনো' হয়, আর এখানে এত সুন্দর চীনে রেস্টুরেণ্ট আছে—

খাওয়া দাওয়ার পর ডাক্তার মিত্র আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়ি গেলেন। এখানকার অন্যান্য বাড়ির মত ডাক্তার মিত্রের কোয়ার্টারও খুব সুন্দর। চারদিকে বাগান। বাড়িতে গিয়ে মিসেস মিত্র জোর করে কফি করে খাওয়ালেন। তারপর আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন মোকায়।

※

সম্মেলনে পৌঁছে দেখি তখন বিকেলের অধিবেশন শুরু হয়েছে। সেই বক্তৃতা। বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া আগেই বলেছি। তাই ভেতরে ঢুকে মঞ্চের ওপর আর উঠলাম না। শ্রোতাদের আসনে বসে খানিকক্ষণ নিয়মরক্ষা করলাম।

ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য বহির্ভারতীয় যেসব দেশের বন্ধুত্ব আছে তার বেশির ভাগের মূলে কথা হলো রাজনীতি। রাজনৈতিক কারণেই বন্ধুত্ব পাতাতে হয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম মরিশাস। ভারতবর্ষের বাইরে মরিশাসই একমাত্র দেশ যার সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক যোগ ছাড়াও সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক যোগ রয়েছে। মরিশাসে যেদিন মকর সংক্রান্তির উৎসব হয়, আমাদেরও সেদিন মকর সংক্রান্তি। মরিশাসে যেদিন পঙ্গল বা মহরম অনুষ্ঠিত হয় আমাদের

—আপনারা সবাই চলে যাচ্ছেন?

বললাম—না, সবাই আছে, সারাদিন থাকবেন, আমি কেবল আগেই চলে যাচ্ছি।

—কেন? মরিশাসের সব কিছু দেখা হয়ে গেল?

বললাম—সবই দেখেছি—

দিলীপবাবু বললেন—আমার সঙ্গে দেখা না করলে আপনার মরিশাস দেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি এখুনি যাচ্ছি, আপনাকে তুলে নিয়ে আসবো, আপনি অপেক্ষা করুন, কোথাও যাবেন না—

মনে আছে দিলীপবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা দিলীপবাবু, আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী বলছিলেন যে এখানকার এক একর জমির দাম নাকি বাইশ লাখ টাকা? আমার তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—

দিলীপবাবু বললেন—খুব কম করেও তিরিশ লাখ টাকার কম তো নয়। চিনির দাম যত বাড়ছে এখানকার জমির দামও তত বাড়ছে—

আমি বললাম—চিনি কি পৃথিবীতে এতই দামী জিনিস? এত চিনি কারা খায়?

দিলীপবাবু বললেন—কে চিনি খায় না? পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাই তত কেজি চিনি খায়। সব খাবারে চিনি থাকলেই চিনি লাগে। যেমন ধরুন আইসক্রীম, টফি, কেক, পেস্ট্রি, কিসে চিনি লাগে না?

তা বটে! আমি নিজে ও সব খাই না বলে আমার ধারণা হয়েছিল চিনি অত্যাবশ্যক ভোজ্য তালিকার মধ্যে পড়ে না। গাড়ি চলেছে খুব দ্রুতবেগে। আমি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। সামনেই একটা পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে পাথরের ওপরে দেখলাম চাষ-বাস হচ্ছে। আশে-পাশে যত কিছু জঙ্গল বা পাহাড় দেখছি সমস্ত কিছুই দিলীপবাবুর এক্তিয়ারে। সব কিছু দেখা-শোনার ভার দিলীপবাবুর ওপর। তিনি মরিশাসের ফরেস্ট অফিসার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি মরিশাসে এলেন কী করে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—আমি তো আসিনি, আমাকে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট পাঠিয়েছে এখানে। আমি মরিশাসে চাকরী করি বটে কিন্তু আমার মাইনে দেয় ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট। গোড়ায় যখন এখানে এলুম তখন আমাকে দু'বছরের জন্য এখানে থাকতে হবে এই বলা হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রায় আট বছর হয়ে গেল এখানে আছি, এখানকার গভর্নমেণ্ট আমাকে ছাড়তে চাইছেন না। কেবল দু'বছর দু'বছর করে কন্ট্রাক্ট রিনিউ করা হচ্ছে। এখন এখানকার মন্ত্রী বলছেন—আপনি এখানে পার্মানেণ্টলি থেকে যান—আপনাকে আমরা মাইনে বাড়িয়ে দেব—

জিজ্ঞেস করলাম—তা আপনি কি এখানেই থাকবেন নাকি?

দিলীপবাবু বললেন—আমার থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন, ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট আমার লেখা-পড়ার জন্যে হাজার-হাজার টাকা খরচ করেছে, আর আমি কিনা ইণ্ডিয়ার কোনও উপকার করতে পারছি না, এইটা ভাবতে আমার বড় কষ্ট হয়।

আমি বললাম—কিন্তু সবাই তো এখন তাই-ই করছে, ইণ্ডিয়ার কত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র, টেকনিশিয়ান ইণ্ডিয়ার টাকায় লেখা-পড়া শিখে বেশি টাকা রোজগারের লোভে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, জার্মানী চলে যাচ্ছে, এ তো হামেশা দেখছি—

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—কিন্তু ওটা আমার ভালো লাগে না। আমি যদি এখনই চাই তো ইণ্ডিয়ার বাইরে যে কোনও জায়গায় গিয়ে মাসে দশ হাজার টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমার নিজের মা যদি গরীব হয় তো সেই মাকে আমি গরীব বলে ত্যাগ করবো? আমি ইণ্ডিয়ার সেবা করতে চাই, কিন্তু তা করতে পারছি না বলে মনে খারাপ লাগছে—। ইণ্ডিয়ার ফরেস্ট ভালো করে দেখাশোনা হচ্ছে না, আর আমি কিনা মরিশাসের ফরেস্ট দেখাশোনা করছি—

বললাম—এখানে পাহাড়ের ওপরেও কি আখের চাষ হচ্ছে নাকি? জাপানি কায়দায় চাষ?

গাঙ্গুলী বললেন—না, ওগুলো আমিই করছি। সার রামগুলাম পাহাড়ের গায়ে বড়-বড় গাছ বসাতে চান। এখানকার প্রায় সব পাহাড়ই ন্যাড়া। পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ থাকলে দেখতে ভালো লাগবে। ওই দেখতে টুরিস্টরা মরিশাসে আসবে, সেই জন্যেই আমার লোকরা ওখানে চারা গাছ বসাচ্ছে—

গাঙ্গুলীবাবুর কথাগুলো শুনে বড় ভালো লাগলো। এমন ইণ্ডিয়ানও কে আছে ইণ্ডিয়ায়! এমন করে একজন ইণ্ডিয়ানও যে ভাবে এটা দেখে আমি আশাবাদী হয়ে উঠলাম। আমি অনেককে কত লোককে বলেছি কেন তাঁরা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। জবাবে তাঁরা বলেছেন—'এই হতচ্ছাড়া দেশে কি কোনও ভদ্রলোক থাকতে পারে? এই মশা-মাছি আর উকুনের দেশে দায়ে না পড়লে কেউ থাকে?' অথচ এই যুগেরই একজন মানুষের মুখ থেকে আজ উল্টো কথা শুনলাম।

বললাম—মিস্টার গাঙ্গুলী, আপনাকে দেখে আর আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমার মরিশাসে আসা সার্থক হলো—

গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেল। দিলীপবাবু বললেন—আসুন, আমার বাড়ি এসে গেছে—

বাড়ির চারদিকে বাগান। বাগানে সার সার পেঁপে গাছ আর সেই গাছে থরে থরে সব পাকা পেঁপে ঝুলছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

বাস্তব কল্পনা : নানা অনুষঙ্গ

একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ। স্লেট রঙের আকাশ আর এক বৃদ্ধের মুখ। বাঁশী বাজিয়ে সে যেন ঘুমন্ত পুরীর ঘুম ভাঙাতে চাইছে। কিংবা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ—আর নীচে একটা দীন নগণ্য ট্রাই-সাইকেল। ওপর থেকে দেখা বলে ট্রাই-সাইকেল পাশের দিকে একটু বেড়ে গেছে। কিংবা ধাপ ধাপ সিঁড়ির ওপর থেকে নীচের চত্বরে পায়রার জটলা দেখার মজা! অদ্ভুত মায়াময় একটা জগৎ। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো দেখতে মানুষজন। এসেছে মাঝে মাঝে একটা পাখি। কখনো দেখে মনে হয় খুবই চেনা, আর কখনো গভীর কোনো তাৎপর্যময় একটা প্রতীক। এই স্বপ্নময় পরিবেশ। কিন্তু এই জগতের মধ্যে হঠাৎ-ই অনুপ্রবেশ ঘটে ভিখারীদের তোবড়ানো থালা। স্নিগ্ধ স্বপ্নিল মায়াজাল কিন্তু তবু যেন ছিন্ন হয় না।

শ্যামল দত্তরায় (জন্ম ১৯৩৪) কলকতার কলারসিকদের কাছে অপরিচিত নন। ইদানীং জলরঙ প্রায় লুপ্ত একটা মাধ্যম। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর আঙ্গিককে সাধুবাদ দিতে হয়। তুলির সূক্ষ্ম টান বা কখনো জোরালো আঘাত করে একটা অনৈসর্গিক পটভূমি তৈরী করেছেন তিনি। প্রত্যেকটা রঙের স্পর্শ স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ। বেশ একটা জেল্লা আছে। জায়গায় জায়গায় রেখার উর্ণনাভ তন্তুজালের খেলা; জলরঙের সমস্ত জাদু তাঁর নখদর্পণে। অঙ্কন ও রচনা আকর্ষণীয় সবসময় না হলেও কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর প্রদর্শনী দেখতে দেখতে এসব মনে হচ্ছিল (ম্যাকস মুলার ভবন—৩-১৪ ফেব্রুয়ারী)।

আসলে গণেশ পাইনের মতো নিজস্ব একটা কল্পনার জগত গড়তে চেয়েছেন শ্যামল। এইখানে তাঁর সাফল্য কম নয়। অথচ কল্পবাদ বা ফ্যানটাসির আসরে পুরোপুরি নামতে রাজী নন তিনি। গণেশ পাইন তাঁর অনুজ সমসাময়িক। গণেশ স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের পুরাণকল্পের প্রতিভাস চিত্রভাষায় রূপায়িত করেন। শ্যামল সেক্ষেত্রে অবচেতনের অবগুণ্ঠন খুলতে দ্বিধা করেন। অন্যদিকে তাঁর সমবয়সী সব শিল্পীরা ইতিহাসের সমসাময়িক ওলোট-পালটের হলাহল পান করে নীলকণ্ঠের মত ত্রিনয়নের অধিকারী। তাই শ্যামলের ছবির মধ্যে আসে ভিক্ষাপাত্র—হয়তো প্রতীকরূপে। তোবড়ানো ভঙ্গী। অনেক-সময় একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই। কাব্যিক পরিবেশে যথেষ্ট রূঢ় নয়, সুতরাং ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কল্পনার জগৎ আর বাস্তবের অনুষঙ্গ যেন মেলেনি।

অথচ সমাজসচেতন হবার চেষ্টা না করে যখন তিনি ছবি এঁকেছেন তখন সার্থক হয়েছে ছবি। পটকে উল্লম্ব করে নিয়ে জ্যামিতিক নকশার মতো বাড়িঘর, জেব্রা-ক্রসিং আর কতিপয় নেড়ী কুকুর বীরদর্পে ঘুরে বেড়ানো নির্জন রাস্তায় ধরেছেন নিপুণভাবে। ছবিতে চিত্রগত উপাদানের প্রচুর্য ও তির্যক ভঙ্গী মনকে টানে। এমনি আরেকটি ছবি পর্বতশীর্ষে পতাকা হাতে সেই পর্বতারোহী। নীচের ট্রাইসাইকেলটা তুলনাহীন। রূপারোপের সময় সামান্য বিকৃতি খুবই মজাদার।

সে তুলনায় তাঁর ইন্টাগ্লিও ছাপা ছবি আমাকে তেমন আকর্ষণ করেনি। প্রধানত আঁকিবুকির চিত্রবিচিত্র উল্কি দিয়ে পটের শূন্যতা ভরা হয়েছে। নন্দন বা নান্দনিক অনুভূতির আবেশ তৈরি হয়নি সবসময়। মানুষজন, বাড়িঘর, মরা পাখি এসেছে সব চিত্রকল্প। তাঁর হাতের কারিগরী দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েও পরিতৃপ্তির শেষ ধাপ পর্যন্ত ওঠা যায় না অনেক সময়। তুলনায় তাঁর জলরঙের কাজ অনেক ভাল।

জ্যোৎস্নতা রায় চক্রবর্তী

দীপ্তা রায় চক্রবর্তীর একটা প্রদর্শনী দেখলাম (ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার, ১-৭ই ফেব্রুয়ারি)। তাঁর শিল্পকলা শিক্ষা জাপানে। তিনি দাবী করেন যে প্রাচীন তন্ত্রতন্ত্র ও কুহকিনী বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছেন। তাঁর জলরঙের ছবিতে তাঁর অদ্ভুত জীবনদর্শনের প্রভাব পড়েছে। জীবনের চারধারে নানা শান্ত সাঙ্কর, অশান্ত ধারণ করতে পারলে না-কী শান্ত ও অশান্ত নানা কাজ সহজে করা যায়। অন্ধকার, কুণ্ডলী পাকানো নীল সমুদ্র, উন্মাদ উচ্ছ্বসিত টিয়া-সবুজ সমুদ্র, ভূতপ্রেত, ডাইনী, তুকতাক অনুষ্ঠানের নানা ব্যাপার তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন। ছবি হিসাবে কতোটা উত্তীর্ণ সেটা অন্য প্রসঙ্গ, তবে

করে।

বাণীপ্রসন্ন

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে বাণীপ্রসন্নর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। বাণীপ্রসন্নর রেখাচিত্র খুব জোরালো। বিশেষত সাবলীল

হয়ে উপায় থাকে না। মানুষ বা জন্তু যখন বা চীনে-কালি দিয়ে এঁকেছেন, তখন রূপারোপ বা স্টাইলাইজেসনের ওপর জোর দিয়েছেন বা সামনের দিকে ছোট করে পেছনের দিকে টেনে বাড়িয়েছেন। কিন্তু এমন তাঁর কবজীর জোর যে দুবার ভাবেননি। যা করতে চেয়েছেন একটানে করেছেন। বিকৃতিকরণ নিয়ে মজাদার খেলা জমেছে বেশ। গাছ বেয়ে দুটো পায়ের উঠে যাওয়া বোঝানোর জন্য জোড়া জোড়া পা একটার ওপরে আরেকটা এঁকেছেন। শেষের দিকে গাছের গুঁড়ি নেই, শুধু জোড়া জোড়া পা। একটার ওপর আরেকটা। রেখাচিত্র খুব ভাল বাণীপ্রসন্ন দু টাকায় রেখাচিত্র বিক্রি করছিলেন, তাতেও লোকে এসে আট আনায় দরদাম করছিল (ধন্য! কলকাতা!)

সে তুলনায় তাঁর ছবি আমাকে আকর্ষণ করেনি। যেখানে অঙ্কনানিভ'র কাজ করেছেন সেখানে জমেছে কাজটা। যেমন 'অর্কিড হাতে মেয়ে'—মোটা কালো রেখার বাঁধনে সবুজ চুলের মেয়েটিকে মনে ধরে। কিন্তু যেখানেই অলংকরণের দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন সেখানে রঙের জেল্লা ও ছবির রচনার খুঁতকে গোঁজামিল দিয়ে চাপাতে পারেননি। তাঁর রেখাচিত্রের দক্ষতা এখনও তাঁর ছবিতে সংক্রামিত হয়নি।

যুগলবন্দী

চিত্রকর রণজিৎ ভট্টাচার্য এবং ভাস্কর যশপ্রার্থী অনিল চ্যাটার্জি আকাদমী অব ফাইন আর্টসে একই সঙ্গে, একই চিত্রশালায় এবং একইদিনে প্রদর্শনী করলেন (১-৬ই ফেব্রুয়ারি)। তবে তেমন একটা জমেনি। রণজিৎবাবু প্রতিবারে উৎসাহ নিয়ে এবং খুব যত্ন করে কাজ করেন কিন্তু কাজের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে যা কলেজের প্রদর্শনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই বস্তির দৃশ্যের প্রথাগত বাস্তব ছবি পরিচ্ছন্ন করে করা, সেই ফুলদানির মধ্যে ফুল, সেই নিসর্গদৃশ্য। কাজ এবং মানসিকতা বয়োঃসন্ধিকালের। পাশ করে বেরিয়েছেন '৬১ সালে সুতরাং এর মধ্যে তাঁর কাজে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা কি অন্যায়?

কিছু কিছু কাজে ক্ষীণভাবে গোপাল ঘোষের কথা মনে পড়ে যায়। যেমন হলুদ ফসলের মধ্যে একটি আদিবাসী মেয়ে। প্যাস্টেলের কাজ। বা জলরঙ আর প্যাস্টেলে করা কাশফুল আর প্রবহমান নদী। আসলে ছবি আঁকা রণজিৎবাবুর একটা অভ্যাস কিন্তু সেই স্বতঃস্ফূর্ততা বা আসক্তি নেই যা আমাদের নাড়া দিতে পারে।

বিশেষত মডেলিং ত্রুটিপূর্ণ। তাই তাঁর মূর্তি সামনের দিক দিয়ে যতোটা দেখতে ভাল, চারপাশ থেকে নয়। যথা—এক বৃদ্ধার প্রতিকৃতির কথা ধরুন। সামনে থেকে মুখটা মন্দ নয়, কিন্তু পাশ থেকে খুবই দুর্বল আর কাপড়ের ভেতর রক্ত-মাংস নেই, শুধু হাওয়া। অন্য ভাস্কর্য-গুলোর—একজন পিঠের ওপর আরেক-জনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বা উবু হয়ে বসে আছে কিন্তু আবেগের তুলনায় দক্ষতা কম। এসবই পোড়ামাটির মূর্তি। দুটি মুখ খুব সংবেদনশীল। একটা নাকসর্বস্ব চাপটা মুখ আর একটা ডিমের ছাঁদের মুখ, একটি কিশোরের প্রতিকৃতি, খুবই সংবেদনশীল। আসলে ভাস্কর্যে নিহিত যে অংকন তা তাঁকে ভাল করে আয়ত্ত করতে হবে।

সন্দীপ সরকার

বিমল আপনার
স্বাভাবিক দেহশ্রীকে
ক'রে তোলে
আরও মনোহর
আর আপনার
ব্যক্তিত্বকে
ক'রে তোলে
আরও
সুন্দর
VIMAL
A RELIANCE PRODUCT
স্যুটিং • শার্টিং

দর্শনের সমস্যা ও আলোচনা

বিশ্ব-জিজ্ঞাসা। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭। দম কুড়ি টাকা।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশ্ব-জিজ্ঞাসা' বাংলা ভাষায় লিখিত 'বুদ্ধি-প্রধান' বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই ধরনের গ্রন্থ শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ও বাঙালী মনীষার গৌরব নয়, যথার্থ যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে অনূদিত হলে যে-কোন ভাষার গৌরবজনক সংযোজন বলে বিবেচিত হতে পারে। এটা একেবারেই অত্যুক্তি নয়।

গ্রন্থটির প্রথম গৌরব হল, এর পরিকল্পনা। যাকে একটু ঘুরিয়ে বলা চলে ফর্মের অভিনবত্ব। দর্শনের মত কূট ও জটিল বিষয়কে, বিশেষত পৃথিবীর তাবৎ দর্শনকে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও উপলব্ধির জারক রসে পরিপাক করে তার থেকে সার সংগ্রহ করা এক দুঃসাহসিক সাধনা। একটা গোটা জীবনের সাধনা। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় তো বটেই, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শন সমুদ্রকে মথিত করে, নিপুণ হাতে অমৃত-সার সংগ্রহের এই ধরনের প্রচেষ্টা আছে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন মনীষীর হয়তো অভাব নেই। আবার প্রাচ্য দর্শনে অধিকার সম্পন্ন জ্ঞানীও হয়তো অনেক আছেন। কিন্তু উভয় দর্শনকে এক পংক্তিতে বসিয়ে তাদের শক্তি বিচারের দুঃসাহস খুব কম লোকেরই আছে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটিতে সে পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হওয়ার পরবর্তী কারণগুলি এক এক করে আলোচিত হল।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল বিশিষ্ট দর্শন—কি ব্যক্তিগত মনীষা থেকে উদ্ভূত, কি সমষ্টিগত মেধা থেকে বিকশিত—এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, মাত্র ৬০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে এতবড় ব্যাপক একটি বিষয়কে সাজিয়ে তোলা অকল্পনীয় ব্যাপার, অবিশ্বাস্য ঘটনা।

তৃতীয়ত, এই গ্রন্থে দর্শনের সকল মৌলিক সমস্যাগুলিরই আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক সমস্যাগুলি তো আছেই, দর্শনের ব্যবহারিক সমস্যাগুলিও আলোচিত হয়েছে। ফলে ধর্মতত্ত্ব নীতিতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এবং এই আলোচনাগুলি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে করা হয়েছে।

চতুর্থত, এবং অতি অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি তা হল, সম্ভবত এই প্রথম একটি দর্শন আলোচনার গ্রন্থে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা হয়নি। সমস্যা তুলে, তার উপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনের আলোই ফেলা হয়েছে। ফলে, সমস্যার জটও যেমন অনেক পরিমাণে খুলে গিয়েছে, তেমনি উভয় দর্শনের আলোকোজ্জ্বলতার আপেক্ষিক যাচাই ও ভালভাবেই হয়েছে। লেখক যথার্থ বলেছেন, 'সমস্যা যখন এক তখন প্রাচ্য মনীষীর স্থাপিত তত্ত্ব আর পাশ্চাত্য মনীষীর স্থাপিত তত্ত্বের আলোচনা পৃথক ভাবে করার অর্থ হয় না।'

পঞ্চমত, গ্রন্থটি দর্শনের ইতিহাস নয়। সাল তারিখ পরম্পরা দার্শনিকের কিছু জীবন কথা ও তাঁর দর্শনের সামান্য চুম্বক পরিচয় দেওয়া তেমন একটা কঠিন কাজ নয়। দশখানা বই ঘাঁটিয়ে দর্শনের নিষ্ঠাবান ছাত্র বা অধ্যাপকের পক্ষে একটি দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ লিখে ফেলা কিছু পরিশ্রম ও সময়ের ব্যাপার মাত্র। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সে পথে যাননি। অর্থাৎ সাধারণ দর্শনবিদ যেপথে যান। তিনি এক নূতন পথে চলেছেন। তিনি দর্শনের মৌলিক সমস্যাগুলি তুলেছেন এবং সেই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বের সকল বিশিষ্ট দার্শনিক যে আলোকপাত করেছেন তা একত্র স্থাপন করেছেন, তাদের পারস্পরিক তুলনা করেছেন এবং প্রত্যেকটির মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এইখানেই শেষ করেন নি, আরো এগিয়ে গিয়ে বিশেষ সমস্যার সমাধান যেখানে মিলেছে, সেখানে তা স্পষ্টভাবে যুক্তিসহ উল্লেখ করেছেন। যেখানে সমাধান খুঁজে পাননি, সেখানে গ্রন্থকার নিজেই একটি সমাধান উপস্থাপিত করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ দার্শনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দার্শনিকের গৌরব প্রকৃতই হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

ষষ্ঠত, দেশকাল নির্বিশেষে দর্শনের এক সামগ্রিক ও তুলনামূলক পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন দার্শনিক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। এক কথায় 'বিশ্ব-জিজ্ঞাসা'কে বিশ্বরহস্য ভেদ করবার চেষ্টায় গোটা মানব জাতির সামগ্রিক উদ্যমের একটি পরিচয়গ্রন্থ বলা চলে।

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০১
২। প্রকাশকাল সাপ্তাহিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর, বাম্পাদিত্য রায় ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০১
৪। সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০১
৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :
(ক) মালিক আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০১
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অশীপকুমার সরকার, অর্ণনকুমার সরকার। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০০১

আমি বাম্পাদিত্য রায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

বাম্পাদিত্য রায়

১, মার্চ ১৯৭৭ প্রকাশক

ও দার্শনিক সমস্যারই আলোচনা করা হয়েছে। দার্শনিকের জীবন, জীবনের ওঠানামা—নানা রকম মুখরোচক চুটকি বা গল্প দিয়ে গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তোলার কোন প্রয়াস নেই। দার্শনিকতত্ত্বের সূক্ষ্ম ও গভীর বিচার, বিশ্লেষণ ও আলোচনাই

রসময়তার দ্বারা প্রাঞ্জলতম ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এমন কঠিন বিষয়ের এত সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেওয়া যায়, এই গ্রন্থটি না-পড়লে জানা হত না।

রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শনে হিরন্ময়

করেছেন প্রায় মুখের ভাষা। উপমা ব্যবহার করেছেন এমন যার নিজস্ব সৌন্দর্য তো আছেই, অথচ শক্তিতে যা যুক্তির মত তীব্র। সমস্তটা মিলে আচ্ছন্ন করে দেওয়ার মত একটি গ্রন্থ এই 'বিশ্ব জিজ্ঞাসা'।

মূল্য ও শ্রদ্ধা পায় না। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা। অতএব দেশী সাহেবরাও এর প্রশংসা করবেন এমন সম্ভাবনা কম।

—অমল মুখোপাধ্যায়

দিয়েছেন তিনি—'জানি না কি আছে ভাগ্যে, শুধু জানি কয়েকটি কবিতা/লিখে যেতে হবে, এই উদাসীন ধূসর জীবনে।'

জীবন যে কোথায় ধূসর এবং উদাসীন তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলেননি এই কবি। 'হৃদয়ের সুচেতন ক্ষণে/কবিতার জন্ম হয় কালজয়ী সুতীব্র বেদনে'—এই অহংকারী ঘোষণারও সার্থক পরিচয় ফুটে ওঠেনি তাঁর রচনাবলীতে। তাঁর কবিতার বিষয় আসে কী নিবিড়/স্বপ্নের সুষমা নিয়ে'—পড়লেই মনে পড়ে যায় শিশু ভোলানাথের সেই অকৃত্রিম বিস্ময়— 'কিন্তু শনির রাতের শেষে যেমনি উঠে জেগে/রবিবারের মুখে দেখি হাসিই আছে লেগে'। 'প্রাণরক্তে লিখিত কবিতা' কি এরই নাম? অথচ ছন্দ-মিল আবেগ কোনোটিরই অভাব ছিল না এই সমর্পিত-প্রাণ মগ্ন লেখকের।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলা সাহিত্য একদিকে যেমন কয়েকটি শাখায় অতীব সমৃদ্ধ, অন্যদিকে দু-একটি ক্ষেত্রে নিতান্তই অবহেলিত। এই উপেক্ষিত শাখার মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায় বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের। বাংলায় বিজ্ঞান নির্ভর কল্পকাহিনীর তৃষ্ণা প্রায়শই মেটাতে হয় অনুবাদের মাধ্যমে। এবং বলা সঙ্গত, সব অনুবাদই তেমন নির্ভরযোগ্য নয়।

দীপংকর লাহিড়ী নতুন লেখক। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেই তিনি এমন একটি ক্ষেত্র নির্বাচন করে নিয়েছেন, যে-ক্ষেত্রে যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব দীর্ঘ-অনুভূত। তাঁর **বিপ্রতীপ বিশ্ব** (অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, সাড়ে পাঁচ টাকা। সম্পূর্ণই বিজ্ঞাননির্ভর কল্পকাহিনী, এবং মৌলিক এই সৃষ্টি। শুধু প্রয়াসের জন্যই তিনি অভিনন্দিত হতে পারেন।

অভিনন্দিত হবার মতো উপাদানও এই উপন্যাসের বিষয়ে কম নেই। বেশ চমকপ্রদ একটি তত্ত্ব তিনি বেছে নিয়েছেন। ভূগর্ভস্থ এমন একটি গুহা-সুড়ঙ্গের—এক কথায় যাকে 'গ্রটো' বলে ইংরেজীতে—অস্তিত্ব তিনি কল্পনা করেছেন যার মধ্যে দিয়ে গেলে আদ্যোপান্ত সব কিছু বদলে যায়, ডান এবং বাম স্থান বদল করে। নারাণপুরের এই বিচিত্র গুহায় ঢুকে এক বৈজ্ঞানিকের কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল, এবং কেমন করে বৈজ্ঞানিক উপায়েই এই পরিবর্তনকে আবার পূর্ব অবস্থায় রূপান্তরীকরণ সম্ভবপর হল তাই নিয়ে রচিত এই প্রথম উপন্যাসে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন এই নবীন কথাকার। তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং সমাধান অভ্রান্ত কিনা এ-নিয়ে গূঢ় তর্ক চলতে পারে, কিন্তু কল্পকাহিনীটি যে চিত্তহারী এ নিয়ে তেমন তর্কের অবকাশ নেই।

*

রঞ্জিত ফাল্গুনে (পুস্তক বিপণী, কলকাতা-৯, চার টাকা) পরিমল চক্রবর্তীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম দুটি প্রকাশিত

সাদামাটা সিরিজ শেষ

ভেবেছিলাম বাঙ্গালোরে চতুর্থ টেস্ট জয়ের পর ভারত বোম্বাইয়ে পঞ্চম টেস্টও ইংলণ্ডকে হারাতে পারবে। বিশেষ করে টসে জিতে যখন সর্বপ্রথম ৩০০ রানের উপরে ইনিংস গড়ল তখন ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে ইংলণ্ডের এই মাঝারি শক্তির দল চতুর্থ ইনিংসে ভারতের বিশ্বখ্যাত স্পিন বোলারদের বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করতে পারবে না। পারতও না নিশ্চয়ই, যদি আর কিছু সময় হাতে থাকত কিংবা ভারত আরও আগে দ্বিতীয় ইনিংসের দান ছাড়ত। দান অবশ্য ছাড়েনি। পঞ্চম দিনের সকালে ইনিংসই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা চতুর্থ দিন কি ভারতের ব্যাটসম্যানরা দ্রুত রান সংগ্রহ করতে পারত না? যে দল প্রথম তিনটি টেস্টে পরপর হেরে সিরিজ এবারের ইংলণ্ডের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের তো কোন ঝুঁকি ছিল না। সতর্কতারও প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল সাহসী হয়ে ব্যাট করার। দ্রুত রান তুলে ইংলণ্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করার। বেদি অবশ্য এক বিবৃতিতে বলেছেন চতুর্থ দিন আর ৪০ রানের মত সংগ্রহ করতে পারলে তিনি দান ছেড়ে দিতে পারতেন।

সাদা কথা, জয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি না করে পরাজয়ের ঝুঁকি নেওয়া ঠিক না। ইংলণ্ড যদি ভারতের রান পেরিয়ে জিতে যেত তখন বেদিকেই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত। তবু, আমার বিশ্বাস, যদি জয়ের চেষ্টায় ভারত দ্রুত রান সংগ্রহ করত, সাহসই জয়ের ঝুঁকি নিয়ে হেরে যেত তবে সমালোচনার বদলে সংগ্রামী মনোভাবের জন্য তারিফই পেত। প্রথম ইনিংসে ২১ রান এগিয়ে থেকেও চতুর্থ দিনে ২৬২ মিনিটে মাত্র ১৪০ রান সংগ্রহ কি জয়ের চেষ্টা? না, চতুর্থ টেস্ট জয় সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সাহসে, উৎসাহে ও সংকল্পে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেনি। তাই জয়ের মুখে পৌঁছেও পঞ্চম টেস্ট জিততে পারল না। ইংলণ্ড শেষ টেস্ট ড্র করে ৩-১ জয়ের গৌরব নিয়ে ভারত ত্যাগ করল। কিন্তু এই সিরিজে ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ের দীনতাও কম প্রকাশ পায়নি।

আগের টেস্টগুলির কথা বাদ দিয়ে পঞ্চম টেস্টের কথাই বলছি। জয়ের জন্য তাদের ২১৪ রান করার দরকার ছিল। সময় ছিল ২৪০ মিনিট। এই অবস্থায় যে কোন দল জয়ের চেষ্টা করত, ইংলণ্ড করেনি। আবার উইকেটও আগলাতে পারেনি। পিচ কিন্তু মারাত্মক ছিল না। এতেই তাদের ব্যাটিং দুর্বলতার পরিচয় মেলে। ভারতের ভাগ্য যদি একটু ভাল থাকত কিংবা মোক্ষম মুহূর্তে উইকেট-কিপার কিরমানি যদি টলচার্ডকে স্টাম্প করতে পারত তবে ইংলণ্ডের পরাজয়ও ঘটতে পারত।

এই সিরিজে কোন দলের ব্যাটিংয়েই জলুস ছিল না। প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার প্রতিশ্রুতি ইংল্যাণ্ড রাখতে পারেনি। কিছু বেশী রান করেছে এবং অপেক্ষাকৃত সহজে বারবার জিতেছে পেশাদারী মানসিকতা এবং ভারতীয়দের ফিল্ডিং ব্যর্থতায়। ভারত কম রান পেয়েছে ইংলণ্ডের চমকপ্রদ ফিল্ডিংয়ের ফলে। ফিল্ডিংয়ে এই দলটি সত্যিই আগের বহু দলের চেয়ে দক্ষ। পাঁচটি টেস্টে সেঞ্চুরির সংখ্যা মাত্র তিনটি—প্রথম টেস্টে অ্যামিসের ১৭৯, দ্বিতীয় টেস্টে গ্রেগের ১০৩ এবং পঞ্চম টেস্টে গাভাসকরের ১০৮। বোলিংয়ে অবশ্য অনেকেরই কৃতিত্ব আছে।

পঞ্চম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত প্রথম ইনিংস ৩৩৮ (গাভাসকর ১০৮, ব্রিজেশ প্যাটেল ৮৩, সুরিন্দর অমরনাথ ৪০, কারসন ঘাউড়ি ২৫; আণ্ডারউড ৪—৮৯, গ্রেগ ৩—৬৪, লিভার ৩-৪২)।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস ৩১৭ (ব্রিয়ারলি ৯১, গ্রেগ ৭৬, অ্যামিস ৫০ : প্রসন্ন ৪-৭৩, বেদি ৪—১০৯, চন্দ্রশেখর ২—৮৫)।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস ১৯২ (সুরিন্দর অমরনাথ ৬৩, গাভাসকর ৪২, যশপাল ২? : আণ্ডারউড ৫-৮৪, লিভার ২-৪৬, গ্রেগ ১-৩৯)।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস ৭ উইকেট ১৫২ (ফ্লেচার নট আউট ৫৮, টলচার্ড ২৬ : ঘাউড়ি ৫-৩৩, প্রসন্ন ১-৩৬, বেদি ১-৫২)

গড় সম্পর্কে

ভারত-ইংলণ্ড সদ্য সমাপ্ত সিরিজে গড়ের দিক দিয়ে দুই দেশের খেলোয়াড়রাই যেন গরিব হয়ে গেছে। বোলাররা অবশ্য ব্যতিক্রম। আমি ব্যাটসম্যানদের কথাই বলছি। দুই দেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ৫০ এর উপর গড় মাত্র একজনের—ইংলণ্ডের ওপেনার ডেনিস অ্যামিসের। তার গড় ৫২·১২। ৫ টেস্টের ৯ ইনিংসে মোট রান ৪১৭। তার মধ্যে দিল্লির প্রথম টেস্টের এক ইনিংসেই ১৭৯। ব্যাটিং গড়ে দ্বিতীয় স্থান ভারতের সুরিন্দর অমরনাথের। সুরিন্দারের ৪ ইনিংসের রান ১৮০। গড় ৪৫·০০। ৪০-এর উপর গড় মাত্র আর একজনের, ইংলণ্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগের। ৮ ইনিংসে রান ৩৪২। গড় ৪২·৭৫। তারপরই উইকেট কিপার অ্যালান নট-এর গড় ৩৮·২৫।

সুরিন্দর অমরনাথের পর ভারতের ব্যাটিং অ্যাভারেজে দ্বিতীয় স্থান গাভাসকরের (১০ ইনিংসে ৩৯৪ রান—গড় ৩৯·৪০; এবং ব্রিজেশ প্যাটেলের (১০ ইনিংসে ২৮৬—গড় ২৮·৬০)।

বোলিংয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারতের মাঠে বিশ্বখ্যাত ভারতীয় স্পিনার-দের চেয়েও সফল হয়েছেন ইংল্যাণ্ডের বাঁ হাতি স্পিনার ডেরেক আণ্ডারউড। ১৭·৫৫ গড়ে টেস্টে পেয়েছেন ২৯টি উইকেট। কোনবার ভারত-ইংল্যাণ্ড সিরিজে ইংলণ্ডের কোন বোলার এত বেশি উইকেট পাননি। ফাস্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান এই বিষয়ে রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। আণ্ডারউড সে রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছেন। ইংলণ্ডের পেস বোলারদের গড়ও ভারতের স্পিনারদের চেয়ে বেশ ভাল। নীচের তালিকা থেকেই সেটা বোঝা যাবে।

জন লিভার ২৬ উইকেট, গড় ১৪·৬১।
বব উইলিস ২০ উইকেট, গড় ১৬·৭৫।
ক্রিস ওল্ড ১০ উইকেট, গড় ২০·১০। প্রসন্ন ১৮ উইকেট, গড় ২১·৬১। বেদী ২৫ উইকেট গড় ২২·৯৬। চন্দ্রশেখর ১৯ উইকেট, গড় ২৮·২৬।

টেস্ট এবং সফরে সব খেলা মিলিয়ে সবচেয়ে সফল বোলার ইংলণ্ডের বাঁ-হাতি

নম্বর তারে

বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরসূরী সুরিন্দার অমরনাথের ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশও ঘটেছিল প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসাবে। বৈশিষ্ট্যও ছিল। কেননা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান দলের সম্পদস্বরূপ। ১৯৬৫-৬৬ মরসুমে লণ্ডন স্কুল ছাত্রদের বিরুদ্ধে ভারতের যে তিনজন নাটা ব্যাটসম্যান ভবিষ্যতের টেস্ট খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল তাদের মধ্যে সুরিন্দার ছিল সবচেয়ে সম্ভাবনাময়। অপর দুজন—একনাথ সোলকার এবং অশোক গণ্ডোত্রা। অশোক কখনো সাফল্য কখনো ব্যর্থতার মধ্যে প্রায় হারিয়ে গেল। সোলকারের বর্ণময় ক্রিকেট জীবন প্রায় শেষ হবার মুখে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেল সুরেন্দ্র অমরনাথ।

যদিও বে-সরকারী টেস্ট, তবু ১৯৭৫এ সফরকারী শ্রীলংকার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করে এক দুর্লভ নজির সৃষ্টি। সুরিন্দারের পিতা লালা অমরনাথও জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন ডগলাস জার্ডিনের ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৩-৩৪ সিরিজে বোম্বাইতে। সুরিন্দার করে আমেদাবাদে। লালাও করেছিলেন ১১৮ রান, সুরিন্দারও ঠিক ঐ ১১৮ রানে আউট হয়। বেসরকারী টেস্ট বলেই ঘটনাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং রেকর্ড বইয়েও নাম ওঠেনি। কিন্তু ওই মরসুমেই অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬এ নিউজিল্যাণ্ড সফরে গিয়ে সুরিন্দার জীবনের প্রথম সরকারী টেস্টেও সেঞ্চুরি করে প্রমাণ করে দিল, সে যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র। অকল্যাণ্ডে প্রথম টেস্টে করল ১২৪ রান। তাছাড়া গাভাসকারের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেট জুড়িতে ২০৪ রান সংগ্রহ করে ভারত-নিউজিল্যাণ্ড টেস্টে নতুন রেকর্ডেরও অংশীদার হল। রেকর্ড বইয়ে লেখা হয়ে গেল জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিকারীদের মধ্যে সুরিন্দার অমরনাথ ভারতের সপ্তম ক্রিকেটার।

অবশ্য ভারতের রঞ্জিৎ সিংজী এবং পাতৌদির পরলোকগত নবাব ইফতিখার আলীও প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তবে ভারতের পক্ষে নয়, ইংলণ্ডের পক্ষে। ভারতের পক্ষে প্রথম লালা অমরনাথ। দীর্ঘ ৪২ বছর পরে পুত্র সেই কৃতিত্ব অর্জন করে বিশ্ব ক্রিকেটে এক বিরল নজির সৃষ্টি করে। তারপরেই কোথা... দ্বিতীয় টেস্টে ১১ ও ২১ এবং ওয়েলিংটনের তৃতীয় টেস্টে ২ ও ২৭। নিউজিল্যাণ্ড সফরের পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আরও ব্যর্থতা। প্রথম দুটি টেস্টের তিন ইনিংসে কুল্লে ২৯ রান। ফলে বাকি দুটি টেস্টে দল থেকেই বাদ। সামগ্রিকভাবে লালার মধ্যমপুত্র মহীন্দার অমরনাথ দুই সিরিজেই বেশী সফল।

নিউজিল্যাণ্ডে সুরিন্দার তিন টেস্টের ৬ ইনিংসে করেছিল ১৯৪ রান (গড় ৩২·৩৩)। মহীন্দার তিন টেস্টের ৫ ইনিংসে করেছিল ১৭৮ রান (গড় ৩৫·৬০)। এ ছাড়া মহীন্দার উইকেট পেয়েছিল ৫টি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সুরিন্দারের গড় যেখানে মাত্র ৯·৬৬, মহীন্দারের সেখানে ৩৯·৭১। চার টেস্টে গাভাসকারের ৩৯০ রান সংগ্রহের পরই মহীন্দারের ২৭৮। ৩টি উইকেটও ছিল।

তাই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মহীন্দারকেই অপরিহার্য মনে করা হয়েছিল। নির্বাচকরা ইচ্ছে করেই ভুলে গিয়েছিলেন সুরিন্দার অমরনাথের নাম। কিন্তু ভারতের বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুই প্রাক্তন অধিনায়ক প্রচ্ছন্নভাবে সুরিন্দারের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে গেছেন। একজন সুরিন্দারেরই পিতা লালা অমরনাথ। আর একজন পাতৌদির মনসুর আলী খাঁ। এক বিখ্যাত ক্রীড়া পত্রিকায় লালা লিখেছিলেন, "আমাকে যেন কেউ ভুল না বোঝেন—দলে একজন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান থাকা অবশ্যই দরকার।" কলকাতা টেস্টের পর মনসুর আলী লিখলেন—ভারতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একজন তিন নম্বর সাহসী ও সংগ্রামী ব্যাটসম্যানের, যে বিপক্ষ বোলারদের মাথায় চাপতে দেবে না।

সুরিন্দার অমরনাথ

তিনটি টেস্টে হারার পর খুঁজে পাওয়া গেল সেই তিন নম্বর ব্যাটসম্যানকে। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে সুরিন্দার বাঙ্গালোর টেস্টে করল ৬৩ ও ১৪ রান, বোম্বাই টেস্টে ৪০ ও ৬৩ রান। ব্যাটিং গড়ে (৪৫·০০) শীর্ষস্থান।

খুব বড় স্কোর নিশ্চয়ই নয়, তবে এবারের ভারত-ইংলণ্ড সিরিজের পক্ষে যথেষ্ট ভাল স্কোর। তার চেয়েও বড় কথা তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে সুরিন্দারের সফল ভূমিকা—ইনিংসের বনিয়াদ গড়া এবং সাহসভরে স্ট্রোক করে খেলে বিপক্ষ বোলারদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যে ভূমিকার মূল কথা। বাঙ্গালোর টেস্টে ইনিংসের ভিত গড়া এবং শেষ পর্যন্ত জয়ের মূলে সুরিন্দারের অবদান অনেকখানি। বোম্বাইতেও কোন অংশে কম নয়। দু জায়গাতেই প্রমাণ হয়েছে ভারতের ব্যাটিং-যন্ত্রের তিন নম্বর তার বেশ শক্ত ও

আর সেঞ্চুরির মুখ দেখে না। দেখেওনি কেউ এক বিশ্বনাথ ছাড়া। লালা অমরনাথ দীপক সোধন, এ জি কৃপাল সিং, আব্বাস আলী বেগ, হনুমন্ত সিং—কেউ দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি করতে পারেনি। বিশ্বনাথেরও 'শাপমুক্তি' হয়েছে অনেক দেরীতে। সুরিন্দার তো টেস্ট ক্রিকেট থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম তিনটি টেস্টে বিপর্যয় না ঘটলে হয়তো আর খেলার ডাক পেত না। এখন প্রশ্ন, সুরিন্দারও কি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? ক্রিকেটে তার দক্ষতা ও মানসিকতার বিচারে বলা যায় যদি অনুসরণ করে সেটা হবে তার ও ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

কী নেই সুরিন্দারের? সাহস, সংগ্রামের মানসিকতা, হাতের স্ট্রোক—সবই আছে। স্কোয়ার কাট এবং কভার ড্রাইভে সিদ্ধহস্ত, পুল ও সুইপ দেখার মত। প্রতি স্ট্রোকের পেছনে থাকে যথেষ্ট শক্তি। যারা মনে করে বল মারার জন্যই হাতের ব্যাট এবং যাদের আছে হাতে স্ট্রোক, তাদের ঝুঁকি নিয়ে খেলতেই হয়। তার ফলে পতনও ঘটে মাঝে মাঝে। কিন্তু খেলা দেখে খেলোয়াড়ের জাত চিনতে নির্বাচকদের ভুল হওয়া উচিত নয়।

আমি লালা অমরনাথের সঙ্গে সুরিন্দার ও মহীন্দার সম্পর্কে একবার কথা বলেছিলাম। লালা বলছিলেন, নানা জনের উপদেশ সুরিন্দারের সহজাত স্ট্রোক প্রবণতাকে দমিয়ে দিচ্ছে। সবাই উপদেশ দেয়—আরও সতর্ক হয়ে খেল, একটু ধীরে। সতর্কতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু যখনই চল। লালা বললেন, ক্রিকেটে অবশ্যই কোন খেলোয়াড় উপদেশের কথা মনে রেখে স্বাভাবিক খেলা ছেড়ে অতি সতর্ক হয়ে স্ট্রোক করতে যায় তখন তার ভুল হওয়া অবধারিত। সুরিন্দারেরও তাই হচ্ছে। লালার মতে মহীন্দারের চেয়ে সুরিন্দারের ট্যালেন্ট বেশি। এবং যেহেতু সে বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান সেহেতু তার বাড়তি সুবিধাও আছে।

১৯৭১-৭২এ মধ্য প্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফিতে ডাবল সেঞ্চুরি এবং ৭২-৭৩এ দিল্লির বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করলেও পাঞ্জাব থেকে ১৯৭৪এ দিল্লিতে আসার পর সুরিন্দারের ক্রিকেট বেশী পরিমার্জিত হয়েছে। ১৯৭৫এ রঞ্জি, দলীপ, ইরাণী ট্রফির খেলায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ভাল রান করায় টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিল। টানা ৮টি টেস্টে উপেক্ষিত হয়ে আবার ফিরে এসে যোগ্যতা প্রমাণ করল।

মুকুল

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন/**প্রণয়পাশা**/পরিচালনা ঃ মঙ্গল চক্রবর্তী

রঙ্গজগৎ

অসাধারণ/চণ্ডীকা ফিলম

পরিচালক নিজেই যখন নিজের ছবিকে 'অসাধারণ' বলে ঘোষণা করেন (এ-ছবির বিজ্ঞাপন ঃ একটি অসাধারণ ছবিতে এক অসাধারণ উত্তমকুমার!) এবং তারপর স্বাভাবিক বিনয়-বশত ছবির প্রথমে কিংবা শেষে ঠিক কি-কি কারণে তিনি ছবিটিকে অসাধারণ ভাবছেন সে-কথা বাতলে দিতে বিরত থাকেন, তখন সমালোচকের দায়িত্ব বায় বেড়ে। দর্শকের ওপর বিশ্বাস নেই। দেশী-বিদেশী ভালো ছবি দেখতে-দেখতে এবং ক্রমাগত চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে, দুর্দান্ত সব ছবির স্ক্রীপ্ট পড়ে এবং সিনেমার ওপর

চলচ্চিত্র

ইদানীং দারুণ-দারুণ বই পড়ে-পড়ে তাঁদের বারোটা বাজছে। সুতরাং ভিন্ন স্ট্যাণ্ডার্ডে অভ্যস্থ হয়ে গিয়ে তাঁদের অনেকেই 'অসাধারণ' ছবিটিকে শেষ পর্যন্ত নাও বুঝে উঠতে পারেন। এবং তার ফলে এমন অসাধারণ ছবিটি মাঠে মারা যাবে। অতএব সমালোচকের দায়িত্ব ছবিটির অসাধারণত্ব ঠিক কোথায় কোথায় সেটা খুব স্পষ্ট করে দর্শকদের জানিয়ে দেয়া।

প্রথমেই পরিচালক সলিল সেনকে অজস্র ধন্যবাদ এ-ছবিটিকে সিনেমা বলে বাজারে ছেড়ে দেবার মত অসাধারণ সাহস দেখবার জন্যে। এ-ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, ভাবনা, ভাবনাহীনতা, চরিত্রায়ণ, নাচোনকোঁদন, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, স্যাটায়ার, সমাজচেতনা সমস্ত কিছুই একান্তভাবে তাঁর। এবং এই সব মাল মশলা যখন তাঁর নিজস্ব সিনেমা ভাবনায় মজে গোঁজলে ওঠে, তখন সেই দুর্লভ পদার্থকে (ত্রবে টালিগঞ্জে এ-দ্রব ক্রমেই সুলভ হয়ে উঠছে) কোনো পর্যায়ের শিল্প বলে ভাবাটাই অসাধারণ সাহসের ব্যাপার। এ-ধরনের দুঃসাহস সহজে আসে না। এটা আসে যদি অ্যামনেশিয়া-আক্রান্ত অসহায়ের মতো একেবারে ভুলে যেতে পারেন যে এটা ১৯৭৭ সাল, যদি মন থেকে ঝেঁটিয়ে দিতে পারেন পৃথিবীর সব ভালো ছবি আর বার্গম্যান প্যাসোলিনির মতো সব বৈদ্যুতিক নাম, যদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন এই ভেবে যে চলচ্চিত্রের ধারা, ধরণ, ব্যাকরণ, তুমুল কিছু প্রতিভার অভিঘাতে ভেঙে চুরে পৃথিবী জুড়ে নিয়ত বদলাচ্ছে না, এবং যদি এমন কথা নির্দ্বিধায় ভেবে নিতে পারেন যে বাঙালী দর্শকের সিনেমা-চেতনা দিনে দিনে শীলিত হচ্ছে না। অন্যদিক থেকেও 'অসাধারণ' ছবিটি অসাধারণ সাহসের পরিচায়ক। ভাবতে পারেন যে কতটা সাহস থাকলে ধরে নেয়া যায় যে এতো সেলুলয়েড নষ্ট করার মতো, এত অর্থ অপচয়ের মতো বিলাসিতা আজও ক্লান্ত, দীর্ণ, মুমূর্ষু টালিগঞ্জকে মানায়?

পদার্থ। বিশ্বসাহিত্য বা সিনেমার আর কোথাও এ-জিনিসের তুলনা পাওয়া শক্ত। সলিল সেন সেদিক থেকে একেবারে ঝাড়া-হাত পা, ঋণ-মুক্ত, দেশী বিদেশী সাহিত্য বা চলচ্চিত্র থেকে মূল চরিত্রায়ণে এতটুকু টুকলি নেই কোথাও, একটুকরো স্লেজিয়া-রিজমও তাঁর অসাধারণ মৌলিকতাকে নষ্ট করেনি। মূল চরিত্রের নাম (রূপায়ণে অবশ্যই উত্তমকুমার) জগবন্ধু, দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু যাহোক কিছু একটা হতে পারে, কেননা সাক্ষাই সে জগতের এবং গরীবের মুখ চেয়ে শুধু চাল চিবিয়ে, মুড়ি খেয়ে, ঢেঁকুর তুলে তুলে ক্রমেই চিকন স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে, একা শেষ পর্যন্ত একটা বিয়ে করে নিজেই নিজের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করে। এবং লোকটির পদবী ব্যটব্যাল যেহেতু সে বড়লোক শয়তানদের (বড় খোকা, ভালোমানুষ, অর্ডারি শয়তান এঁরা সবাই। ব্যাটবল-এর মতো ব্যবহার করে।

জগবন্ধু আরো অনেক কারণে অসাধারণ। যেমন, একজন সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবান সমাজকর্মী হয়েও সে একটি 'কাসুন্দি' কমিটির জন্যে প্রাণ দিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে। এবং তার কমিটমেন্ট শীগগির একটি 'বোড়ি কমিটি' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়। তাছাড়া ছবির আগাগোড়া সে একটি বিধবা কমিটি নিয়েও চিন্তাভাবনা করে এবং নিজের স্ত্রীকে বিধবা ভাবতে তার ক্রমেই বেশ ভালো লাগতে থাকে। এর পর কুকুরের শ্রাদ্ধবাসর আয়োজন, রূপালো রিকশাওয়ালাকে রিকশায় বসিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে রিকশা টান, এবং কিছু ঘনিষ্ঠ প্রণয় দৃশ্যের পরই রুল হাতে বড়দিনের দিন কৃষ্ণ-কীর্তনের স্টাইলে দলবল নিয়ে নগর পরিভ্রমণে বেরোনোর মতো অসুস্থ হয়ে ওঠা—এ সব কিছুর মধ্যে আছে চরিত্রটির অনন্যতা। জগবন্ধুর ইনকোয়েশ্চেন্যাল ক্যালিবারও অসাধারণ। সে যে মহিলার রান্নাঘরে ঢুকতে পারে তাকে মাসীমা ডাকে, যার বসার ঘর পর্যন্ত যেতে পারে তাকে দিদি আর যার চৌকাঠ পর্যন্ত, তাকে মিসেস অমুক-তমুক বলে সম্বোধন করে! আবার ভেবে দেখুন, জগবন্ধু দিনের পর দিন জল চিবিয়ে চিবিয়ে এমনি দুর্ধর্ষ প্রবল হয়ে ওঠে যে জানলার চার চারটে কাঠের গরাদ সে এক টানে উপড়ে ফেলে ভাত ফোটানোর জ্বালানি তৈরি করে। এবং ফুলশয্যার রাত্তিরে পরবে বলে সে স্ত্রী এবং নিজের জন্যে একই রকম দু-খানা শাড়ি কেনে! একটা কথা, অসাধারণ কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও হালকা হাসির ছবি নয়। তবে যদি বলেন এসব অতীব গভীর ব্যাপার, সোশিও-ইকনমিক স্যাটায়ার, তাহলে আমি বলবো, এমন স্যাটায়ার-এর পাশে স্বয়ং অরওয়েল

উৎপল দত্ত, উত্তমকুমার/**অসাধারণ**

সায়েরও টুপি খুলে দাঁড়াবেন। আর যদি বলেন, একেই বলে নিছক হাস্যরস, আমি বলবো, এর পাশে এমনকি ওডহাউসও তুলনায় পেলব।

অবশ্যই এ-ছবিতে অভিনয় প্রসংগ একেবারেই অবান্তর। শুধু উত্তমকুমারকে সেই পুরোনো কথাটা না বলে পারছি না। এই সব বিপজ্জনক ছবি থেকে তাঁর মতো প্রতিভা নিজেকে যেন সরিয়ে নেন। যে বাড়ির ধ্বংস নামছে সেখানে স্যামসন-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকা আত্মহনন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু স্যামসন অন্ধ ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে সরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

ছবির টাইটেল মিউজিক-এ বাঁশির ব্যবহার এবং উত্তম-আরতির দেখা হওয়ার দৃশ্যে সানাই-এর চেয়ে অন্য রকম কিছু এ-ছবির চরিত্রের সঙ্গে যেত না। শুধু সেটুকুর অভাব ছিল সামনের সারির দর্শকরা উলু দিয়ে তা পূরণ করেছে।

ভালো কথা, ছবিটি আমি বিজলীতে দেখেছি। হল-এর আরামহীন ড্রেস-সার্কেল, পুরোনো ময়লা পর্দা, অকেজো শব্দ প্রক্ষেপণ, এবং পাখা হীন শীত তাপ-অনিয়ন্ত্রিত চাপচাপ গুমোট এ-ছবির যথা-যোগ্য। তবু আমাদের একান্ত বিনম্র প্রশ্ন : বাংলা সিনেমা দেখাটা কি আরো একটু আরামের বিড়ম্বনা হতে পারে না?

—**রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

নয়ন/এস এস এন্টারপ্রাইজ

অশ্রুবর্ষণ মনে প্রশান্তি এনে দেয়—এমন একটা তথ্য বছর কতক আগে এক বিদেশী সাপ্তাহিকের 'চিকিৎসা' বিষয়ক কলামে পড়েছিলুম। এর মূলে যদি বৈজ্ঞানিক সত্য থাকে তাহলে 'নয়ন'-এর দর্শকরা অশ্রুপাতের যে অপার সুযোগ লাভ করবেন সেজন্য কাহিনীকার-পরিচালক সুখেন দাসকে তাঁরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবেন।

শিল্পসৌকর্য প্রকাশের কোন চেষ্টা না করে পরিচালক সরল আবেগপ্রবণ মনকে নয়নজলে প্লাবিত করার মতো করে ঘটনা-বলীর উপস্থাপন করে গিয়েছেন যা অনেক-কাল আগের ছকবাঁধা কয়েকখানি ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। বড় ভাই অনিল চট্টোপাধ্যায় এত ভালমানুষ যে তার মাতৃহারা পুত্র কাকিমাদের হাতে কেবল অবহেলা নিগ্রহই লাভ করে চলেছে সেটা তার চোখেও পড়ে না। মেজ ভাই নির্মল-কুমার তাকে ধাপ্পা দিয়ে প্রচুর টাকা হস্ত-গত করে নিজের ব্যাংকের পুঁজি বাড়িয়ে হবার উপক্রম—পিতৃবন্ধু এবং ম্যানেজার (শিশির বটব্যাল) সে ব্যাপারটা জানালেও অনিল নির্বোধের মতো নিরুদ্বিগ্ন—যেন ভালোমানুষ হয়ে থাকতে গেলে বোকার মতো প্রবঞ্চিত হওয়া একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এ হেন সংসারে অশান্তি আরো ঘনিয়ে উঠলো অনিল বোবা মেয়ে নয়নকে এক মাতালের সঙ্গে বিয়ে হওয়া থেকে রক্ষা করতে নিজেই বিবাহ করে স্বগৃহে আনতে। অনিলের মাতৃহারা সন্তান পুত্র পার্থকে নয়ন (সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়) মমতার প্রতিমূর্তি হয়ে বশে আনে। পার্থ নয়নকেই তার মা বলে মেনে নেয়। নয়ন দেবর এবং জায়েদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং সে যে অসতী এবং চৌর্যাপরাধে অপরাধিনী, অনিলকে তা বিশ্বাস করানো হলো অতি সহজেই। ফলে নয়ন গৃহ-ত্যাগিনী হলো—অবশ্য পার্থকে সঙ্গে নিয়ে। নয়ন ঝি-গিরি থেকে নানা ধরনের কাজ করে পার্থকে মানুষ করে তোলে। শেষে এই পার্থই তার নির্দোষ পিতাকে আসামী রূপে দেখে এবং বিচারের ভারও পড়ে তার ওপর। পরিশেষে ছোট ভাই সুখেন অপরাধ স্বীকার করে।

সংসারে সজ্জন ব্যক্তিকেই দুর্ভোগে পড়তে হয় এবং লাঞ্ছিত হতে হয়, নারীই যত অনর্থের মূল এবং পাপকর্মের জন্য একদিন প্রতিফল ভুগতেই হয়—নানা অপ্রাকৃত কষ্টকল্পিত ঘটনাবলীর আশ্রয়ে কাহিনী মারফত এই প্রতিপাদ্যই উপস্থাপিত হয়েছে। তবে পরিচালনার একটা গুণ যে কোন ঘটনাকেই দীর্ঘায়িত না করায় বহুবিধ অবাস্তবতো দর্শক মনের অস্বস্তিকে বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছনো

সুখেন দাস, রত্না ঘোষাল/**নয়ন**

...ন্তু সেটা এদেশে এসে পৌঁছতে মাঝে মাস সময় কেন লাগল! শক্তি সামন্ত এই নের পূরস্কার তাঁর আর এক অভিজ্ঞতার ও জানান। ১৯৭৪-এ ইওরোপের এক চ্চ উৎসবে তাঁর দুখানি ছবি পাঠানো। ছবি দুটির প্রিন্ট তাঁর কাছে ফিরত াসে ১৯৭৬-এ এবং জরাজীর্ণ অবস্থায়! এটা কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বসু চ্যাটার্জিরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ য়েছে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেরিত তাঁর ছবি 'বালিকার' সম্পর্কে। উক্ত উৎসব সমাপ্ত য়েছে বেশ কিছু মাস হল কিন্তু আজও ছবি নয়াদিল্লির কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী য়ে রয়েছে। 'বালিকা বধূ' রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য পাঠাবেন কিনা জিজ্ঞেস করায় শক্তি সামন্ত হেসে মন্তব্য করেন, ...ই ছবি নির্দিষ্ট পাঠাতে হবে। বাস্তবিকই এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমাদের সমালোচনা পদ্ধতিতে ...ছবি প্রিন্ট হয় কিন্তু এ ধরনের ব্যাপারে প্রযোজকের আর্থিক ক্ষতি তো হয়ই, সেই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রারও অপচয়।

• • •

আগামী লোকসভার নির্বাচনের দরুন মার্চ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে স্থির করা ছবির মুক্তি স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা লোকে এই সময়টায় সিনেমা গৃহে যাওয়ার চেয়ে নির্বাচনী বক্তৃতা শোনাতেই বেশী ঝোঁক দেবে। এর ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে 'ধরমবীর' ছবিখানি। মার্চের প্রথম সপ্তাহে বড় বড় শহরে ছবিখানির মুক্তি স্থির হয়ে আছে। এখন মুক্তি স্থগিত রাখা সহজ ব্যাপার নয়। একেই তো সেনসরের ব্যাপারে পড়ায় মুক্তি বেশ কিছু সপ্তাহ পিছিয়ে পড়েছে। তার ওপর বোম্বাইয়ের প্রতিটি চিত্রগৃহ ভাড়া নেওয়া হয়েছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। 'ধরমবীর' মুক্তি না পেলে পরিবেশককে বাধ্য হয়েই তার পরিবর্তে অন্য ছবি চালাতে

...হতে হবে।

—অনুরঞ্জন

নাটক

কাকাজু/আনন্দ থিয়েটার

গল্পটা নেপালের। কাকাজু নামে একটা ভীষণ কুঁড়ে লোক ছিল। তা সেই কাকাজু ঘরেই শুয়ে থাকত। আর বউটা খেটে খেটে হত হয়রাণ। একদিন দুজনের ক্ষাণ ঝমাঝম। কাকাজু বেদম রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আর যাবার সময় ব'লে গেল, গতর না খাটিয়ে শুধু বুদ্ধি দিয়ে কিভাবে রোজগার করতে হয়, সে তা দেখিয়ে দেবে। চলতে চলতে পথে সে এক মুচি, এক ময়রা, এক ধোপা, তারপর একজন ব্যবসায়ী'কে ঠকিয়ে রওনা দিলে রাজবাড়ির দিকে। তারপর রাজবাড়িতেও সেয়ানা কুঁড়ে কি করে তার কাম ফতে করল—সে অনেক মজাদার গপ্পো। কিন্তু লোক ঠকিয়ে তো আর পার পাওয়া যায় না, তাই কাকাজু ধরাও পড়ল আর বুঝতে পারল খেটে না খাওয়াটা পাপ।

শিশুদের জন্য এই গল্প নিয়ে নাটক লিখেছেন তপন গঙ্গোপাধ্যায়। সকলকে শিখিয়েছেনও তিনি। মুক্ত অঙ্গনে সেদিন বাচ্চারা প্রচণ্ড খুশী। হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ছিল চন্দন ঘোষ মিত্র চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য, সাত্যকি রায়ের কাণ্ড-কারখানা দেখে। ছোট্ট ছেলে শিবাজী চ্যাটার্জী যখন তড়াক করে লাফ দিয়ে বাবার কোলে ওঠে, রাজবাড়ির ড্রামের তালে তালে প্রহরী অসীম সে যখন ঝিমোয়, আর রাজা মশাই সেজে স্বপন চক্রবর্তী শুধুই ঘুমোয় তখন বাচ্চাদের হুল্লোড়ে অনেক কিছুই শোনা যায় না।

বাবু আয়ার আর ঘনশ্যাম পাইন নানা রকম যন্ত্র নিয়ে সব সময় ঘটনাগুলোকে মজাদার করে তুলেছেন। থমক, মিরচাং, মোষের সিং, ক্যাপার বক্স, বেয়ালা সব কিছু বটে। জয়ন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় নেপালী মেজাজটা আনা গেছে। উপকথার পরিবেশ গড়ে তুলতে চিত্ত সরকারের আলোও কম সাহায্য করেনি। অর্জুন মুখোপাধ্যায় পোষাক সাজিয়েছেন সুন্দর। যেটুকু না হলেই নয়, সেটুকু দিয়েই তিনি স্টেজ ডেকরেট করেছেন। মাঝে একবার কাকাজু যখন ...দের ...য় ...শ্বর, তখন প্রজেক্টর দিয়ে ডাকাতের মুখটাও ভেসে ওঠে।

শিশুদের মন ভোলাবার জন্য সব কিছুই করা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা নিখুঁত সুসংগত নয়। শুধু গল্পটাই যথেষ্ট ছিল, গল্পের খেই ধরানোর জন্য মাঝে মাঝে গল্পদাদুই কাজ করতে পারত (সঞ্জয় হালদার)। মানিকজোড় দিয়ে শুধু সেটাই সরানো যায়, পার্ট করানো যায় না। প্রথম দিকে দুজনে নেচেছে কিন্তু জোড় মেলেনি। এমন কি দুজনের কথা বলাটাও একসঙ্গে হয় না। একদম শুরুতে মানিকজোড়ের কথা তারপর নাচ, এর পর গল্পদাদুর ভূমিকা তারপর আবার নাচ। একটা বাচ্চা প্রশ্ন করে 'কখন আরম্ভ হবে?' মানিকজোড় আর গল্পদাদুতেও কুলোয়নি, মাঝে একবার পেছন থেকে মাইকে গল্প বলা হয়েছে (যদিও ভাষ্যকারটি খুব ভাল)। বিরতির আগে দ্রুতগতিতে কাকাজুর ছোটার সঙ্গে বাজনা, বিভিন্ন লোকের চীৎকারের প্রতি-ধ্বনি খুব কাজে লেগেছে। অনেক কিছুই বেশি বেশি। এফেক্ট মিউজিকের মত ফ্রিজেরও শেষ নেই। আর একটি ছোট মেয়ের প্রশ্ন 'ওরা মাঝে মাঝে পুতুল হয়ে যাচ্ছে কেন?' এটা কমপ্লিমেন্ট কিনা পরিচালক ভেবে দেখবেন।

আনন্দ থিয়েটার্স এই 'কাকাজু' অনেক দিন থেকেই করে যাচ্ছেন। অনেক শিশুকেই ওরা মুগ্ধ করেছেন, এর থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে! প্রয়োজন ছিল কিছু সুরের, আর তার থেকেও দরকার ছিল আরও সহজ হওয়া—যদিও জানি সহজ হওয়াটাই সবচেয়ে শক্ত ব্যাপার।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৫১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায়) সডাক	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

অরণ্যদেব ★ লী ফক

জুনকর অরণ্য-দেবকে ডাকছে! জুনকর ডাকছে..!
দূর দূর, একেই বলে অরণ্যে রোদন!

কিন্তু... ঐ ঢাকের শব্দ কোত্থেকে আসছে?
তোমি জানেনা, শব্দটা সাংকেতিক।

জুনকর ডাকছে!
??
?
?
সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী।

গাধার পিঠে সাদা মানুষ.. ডাকছে।
এ-রকম খবর আরও তো কত পেয়েছি। কিন্তু সবই মিথ্যা।
জুনকর নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। এক্ষুণি যেতে হয়..

লোকটিকে শেষ দেখা গেছে খুলি-পাহাড়ের পুবদিকে
এক্ষুণি সেখানে যাচ্ছি.. জুনকরকে খুঁজে বের করতে হবে।
গিয়ে দেখুন।

সঙ্গে লোকজন দেব?
দরকার হবে না।

উঃ! ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে গেছে।
আরে পাহাড়ের চূড়াটা একেবারে মানুষের মাথার মতো!

..পাহাড়ের চূড়ার মতো.. তুমি কে?
তুমি আমায় ডেকেছ।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

রবির কোথাও কেটে ছড়ে গেলে

রবির মা রবিকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একমাত্র BAND-AID BRAND পট্টির ওপরেই ভরসা রাখেন

ক্ষত খুব সহজেই দূষিত হয়ে ওঠে। সেইজন্য বুদ্ধিমতী মায়েরা ক্ষতের সুরক্ষা ও তা সারিয়ে তোলার জন্যে কেবলমাত্র **ব্যাণ্ড-এইড** ব্র্যাণ্ড পট্টির ওপর ভরসা রাখেন।
ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি ক্ষতকে রোগজীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে এবং প্রমাণিত এন্টিসেপটিক, মার্কিউরোক্রোম কাটা চামড়ার ক্ষতে আরাম আনে ও উপশমে সাহায্য করে।
জমিয়ে তোল খেলার আসর, **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টি হবে দোসর।
সব সময় হাতের কাছে কিছু রেখে দিন।

ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড
পট্টি কেবলমাত্র
জনসন এণ্ড জনসন-ই তৈরী করেন।
*Johnson & Johnson**

NEW STANDARD STRIP
BAND-AID
PROTECTS AGAINST INFECTION
MEDICATED DRESSING WITH MERCUROCHROME

মার্কিউরোক্রোম ঔষধিযুক্ত

ক্ষত নানা রকমের হতে পারে
সেই অনুযায়ী নানা ধাঁচের ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টিও পাবেন।

দেশ

২ এপ্রিল ১৯৭৭ ৮০ পয়সা

ডিপিজ্
জগতের সেরাদের একজন!

আপনার তো অভ্যেস সবসময়ে বাজারের সেরা জিনিসটা কেনা। সুতরাং খাবার দাবার কেনার সময় আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার কিনতে। তাই নয় কি? আপনি কি করবেন?

ডিপিজ্ কিনে দেখুন না। জগতে সেরা কোয়ালিটির খাবার। জাপান, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মিডল ইষ্ট থেকে শুরু করে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি সব বড় বড় দেশেই ডিপিজ্ খাবারের দারুন আদর।

ডিপিজ্ টম্যাটো কেচাপ-এর কথাই ধরুন না। এইতো সেদিন সে মস্ত ১৯৭৬ সালের ওয়ার্ল্ড সিলেকশনে সোনার মেডেল জিতে এল।

ডিপিজ্ টম্যাটো কেচাপ যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এই পুরস্কার জিতেছে। কারন, দেশে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট টম্যাটো দিয়ে তৈরী এই কেচাপ কঠোর উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রন মানের সাহায্যে বোতলে ভর্তি করে বাজারে বিক্রী করা হয়। আর এই কেচাপ-এর স্বাদ-আহা, অপূর্ব! ভোজন বিলাসীদের কাছে এক পুলক জাগানো শিহরণ!

আর তাজা সুস্বাদু ফল দিয়ে তৈরী ডিপিজ্ ফ্রুট জ্যাম-এর কথাই ধরুন না। বাজারে এর কি দারুণ চাহিদা। আর পাওয়াও যায় আটরকমের। কোনটা ছেড়ে কোনটা কিনবেন, ঠিক করতে পারবেন না। সবকটাই এত মনলোভা!

তারপর তো আছে ১৩ রকমের ডিপিজ্ স্কোয়াশ ও সিরাপ। সবকটা দেখলেই জিভে জল আসে! এই আদর্শ পানীয় পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গার লোকেদের, বিশেষকরে বাচ্চাদের তেষ্টা মেটাচ্ছে। আর সেজন্যই সবার এত আদরের।

স্ট্রবেরী, র‍্যাস্পবেরী বা অন্য যেকোন সুগন্ধের ডিপিজ জেলী ক্রিস্টাল-এর কথাটাও ভাবুন না! সারাবছরই সকলে খেতে চায়। ডিপিজ্ ক্রিস্টাল দিয়ে বানানো ডেসার্ট আহা, স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়!

হ্যাঁ, ডিপিজ্ এর নামই হচ্ছে আজ বিশ্বাসের প্রতীক। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে। আর এই সব কারণেই আপনার চির আদরের খাবার — ডিপিজ্।

আজই চাখুন ডিপিজ্ জিনিসের স্বাদ
আহা! একবার খেলে আর ভোলা যায় না।

Dipy's
LIVE HAPPY FOODS

Interpub/HL/4/76 BEN

সূচীপত্র

তৃতীয় মেরু
নির্মল আচার্য

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি : পার্বত্যচিত্র (জলরঙ ৭½"×৫")—বিনোদবিহারী এক সময় নেপালে ছিলেন কিছুকালের জন্যে, এই ছবি সম্ভবত সেই সময় আঁকা। দক্ষিণ এশিয়ার মোঙ্গলীয় ধাঁচের চৌকো বাড়িঘরের মাথায় লাল ছাদের নানা বৈচিত্র্য ও সবুজ গাছপালাকে যেন কাব্যিক করে তুলেছে নীল রঙের মেঘের মায়া। ভূপ্রকৃতি, স্থাপত্য আলো বাতাসের হাল্কা শৈত্য তুলির ছন্দিত টানে স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। (শ্রীমতী উমা মজুমদারের সৌজন্যে)

৪৪ বর্ষ ।। সংখ্যা ২৩
শনিবার ১৯ চৈত্র ১৩৮৩

আদিম-ভারত চিত্রকলা

প্রশ্ন করা চলে, আদিম ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্যের সন্ধান ও গবেষণার কর্তব্য সম্বন্ধে ভারতীয় আগ্রহের এবং কৌতূহলের বিশেষ কোন সাড়ার প্রমাণ কি পাওয়া যায়? কিছু সাড়ার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায় কিন্তু সেটা বিশেষ সাড়া বলে নিশ্চয়ই আখ্যাত হতে পারে না। বরং বলা চলে, ভারতীয় শিক্ষিতের চিন্তাতে এবিষয়ে জিজ্ঞাসার বিশেষ অভাব আছে। মধ্যপ্রদেশে আরণ্য এলাকার ভিতরে একটি গিরিগুহার মধ্যে আদিম চিত্রকলার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রচারিত এই সংবাদটির পক্ষে শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে কোন সাড়া জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সংবাদটি যেন অরণ্যের নিভৃতে সামান্য মুখর একটা আনন্দের মতো ব্যর্থতার বাণী। তুলনায় প্রকাশ করা চলে, এধরনের আবিষ্কারের কোন ঘটনার সংবাদ যদি পশ্চিমের কোন দেশে সহসা প্রচারিত হতে দেখা যেত, তবে শত শত শিক্ষিতের কৌতূহলের সাড়াও সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে দেশের সাংস্কৃতিক প্রাণের উৎসাহ উদ্দীপ্ত করে তুলতো। আমাদের দেশের দৃশ্যটা ঠিক বিপরীত। দেখতে পাওয়া গেল, মধ্যপ্রদেশ সরকার এই নবাবিষ্কৃত গুহাচিত্রের বিবরণ বিশদ করে সংগ্রহ এবং প্রচারিত করবার চেষ্টাই করলেন না। দেশের কোন প্রান্ত থেকে কোন জিজ্ঞাসাপ্রবণ শিল্পী সেই গুহাচিত্র দেখবার জন্য ছুটে গেল না। এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চের বড়-বড় চিত্র-সমালোচক এবং গবেষকের কাউকেই উৎসাহিত হয়ে আবিষ্কৃত গুহাচিত্রের পরিচয় আরও ভাল করে সংগ্রহ করতে দেখা গেল না। সাংস্কৃতিক ভারতের পক্ষে অনেক কৃতিত্বের গৌরব ও ঐতিহ্য থাকতেও একটি বিশেষ দীনতার বিষণ্ণ অন্ধকার যেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণবত্তার রূপ মলিন করে রেখেছে। ভারতীয় ইতিহাসের ভারতীয় জীবনের এবং ভারতীয় মনীষার কোন বিস্ময়ের নিদর্শন যেন ভারতীয় উচ্চ শিক্ষিতের সন্ধিৎসা ও কৌতূহলের দ্বিতীয় আস্পদ। এবং প্রথম আস্পদ যেন পশ্চিমের প্রিয় সাংস্কৃতিক ভাব ভাবনা ঘটনা কল্পনা অভিরুচি এবং তথ্য। স্পেনের ও ফ্রান্সের গিরিগুহার ভিতরে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার পরিচয় নিয়ে লেখালেখি করেন, এবং সেজন্য দেশ ও দশের কাছে বিদ্যাবত্তার মহাজন বলে খাতির পেয়ে থাকেন, ভারতে এহেন বিজ্ঞ ও বিজ্ঞতার কোন অভাব নেই। কিন্তু ভারতের গিরিগুহাতে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলার পরিচয় সম্পর্কে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় প্রদান করতে পেরেছেন, এমন কৃতীর সংখ্যা কত? বলা চলে, এপর্যন্ত ভারতীয় গিরিগুহার আদিম চিত্রকলার সমুৎকর্ষ এবং রম্যতার মান নির্ণয় করবার গবেষণায় কোন ভারতীয় ব্যক্তিই আত্মনিয়োগ করেননি।

ভারতীয় আদিম চিত্রকলা বলতে নিশ্চয়ই ভারতীয় প্রকৃতির ও অভিরুচির সৃষ্টি বোঝাবে না। মধ্যপ্রদেশে জগদলপুরের কাছে পাহাড়ের গুহাতে হোক, কিংবা মির্জাপুরের গুহাগাত্রে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা হোক; তাদের উৎকর্ষের রূপ স্পেনের আল্টামিরা গুহার বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাবলীর সমতুল বলে ধারণা করবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু কোথায় ভারতীয় শিল্প এবং শিল্প সমালোচকের আগ্রহ ও উৎসাহের আত্মাটি? খুবই দুঃখকর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পশ্চিমের পণ্ডিত ঐতিহাসিক ভারতীয় গিরিগুহার আদিম চিত্রকলার নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্নকে সম্মানিত করতে ও গুরুত্ব প্রদান করতে সমূহ কুণ্ঠা প্রদর্শন করেছেন বলেই যেন ভারতীয় সংস্কৃতিকের উচ্চশিক্ষিত মনও উদাসীন হয়ে বসে আছে। কোন সন্দেহ নেই, ভারতীয় গিরিগুহার চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করতে দু'চারজন ভারতীয়কে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মন্তব্য হিসাবে বলা চলে এক্ষেত্রে যথার্থ কর্তব্যের চেতনা এবং আগ্রহ ভারতীয় সাংস্কৃতিকের মনে প্রাণে ও চরিত্রে জাগ্রত হয়নি।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের গবেষকের কাছ থেকে চিত্রকলার গুণ ও গরিমা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ চেতনার কাজ দাবী করবার বড় যুক্তি নেই। যদিও একথা সত্য যে এযাবৎ সামান্য কয়েকজন ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিকের আগ্রহে এ কৃতিত্বে আদিম-ভারত চিত্রকলার পরিচয় প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু স্বীকার করতে হয় যে, আদিম-ভারত চিত্রকলা সম্পর্কে শ্রদ্ধার সংস্কার পোষণ করা নিতান্ত পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকের অভ্যস্ত অনুরাগের অন্তর্ভুক্ত কোন কর্তব্য নয়। এই চিত্রকলা মানবীয় জীবনেরই একটি প্রাকৃতিক সত্যের বিস্ময় দিয়ে নির্মিত অনুরাগের মূর্ত প্রকাশ। এই চিত্রকলা সব দেশের সবাকার প্রিয় একটি সাংস্কৃতিক সম্বল। শিশুর কাছেও তার প্রিয় রূপকথার দ্বিতীয় প্রতিচ্ছবি।

ভারতীয় পুরাতত্ত্বের নিদর্শন সংরক্ষার আইন ভারতীয় গিরিগুহার আদিম চিত্রকলার নিরাপত্তা সম্ভব করবার কোন বিশেষ প্রয়াস কার্যান্বিত করেছেন কি না, এটাও একটা বড় প্রশ্ন। অত্যুক্তি নয়, নিতান্ত সন্দেহবিলাসী অনুমানের কথাও নয়, ভারতের অরণ্যাচ্ছন্ন গিরিগুহার নিভৃত বক্ষের মধ্যে আশ্রিত প্রাগৈতিহাসিক মানবীয় জীবনের এক রম্য চেতনা ও সাধনার রঙীন পরিচয় এই চিত্রকলার বহু নিদর্শন অনাদরে ও উপেক্ষায় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। শোনা যায়, হাজারিবাগের আরণ্য এলাকার মধ্যে অবস্থিত একটি গিরিগুহার গায়ে আদিম চিত্রকলার সব রেখা ও বর্ণাবলেপ পলাতক ডাকাতের ভাত-রান্না করবার জ্বলন্ত উনানের ধোঁয়াতে অভিভূত হয়ে অবশেষে একেবারে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভূমি জরীপের এক কর্মচারী অনেকদিন আগে এই গুহাচিত্রের অস্তিত্বের সংবাদ সরকারের গোচরে এনেছিলেন বটে, কিন্তু সেদিনের সরকার সেই গুহাচিত্রের সংরক্ষা সম্ভব করবার তেমন কর্তব্যই গ্রহণ করেননি।

স্বাধীন ভরতের সাংস্কৃতিক কৌতূহল কি সত্যই স্বাধীন হয়ে ও আত্মসম্মানবোধে অনুশাসিত হয়ে আদিম-ভারত চিত্রকলার সংরক্ষা ও সন্ধান প্রশস্ত করবার এবং সেই সঙ্গে সেই চিত্রকলার পরিচয়ের গৌরব গর্বোবিত করে বুঝবার কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে না?

আমি যা চাই

সুনীল বসু

আমাকে পুরস্কার দিও না, আমি যৎসামান্যই মানুষ
বরং আমাকে তিরস্কার দাও
পুরস্কারে বড় খাদ জমে, আমি নিখাদ হতে চাই
ভয় হয় যদি হুল্লোড়ে আমি নিজের সুর ভুলে যাই
আমাকে যশ নয়, ওতে আমি বশ মানব না, বরং অপযশ দাও
খ্যাতি নয়, অখ্যাতি, বরং উপেক্ষা
অপমানে আমার জোর বেড়ে ওঠে, ধার ফুটে ওঠে, বরং
ধিক্কার দাও আমি বেজে উঠব

বাড়ি নয় ঘর নয় জমি নয় টাকা নয় পয়সা নয়
কিছু নয়
সমস্ত পৃথিবীই আমার অথবা আমিই সমস্ত পৃথিবীর
আমি নিজের জন্যে আলাদা করে কিছুই চাই নে
দু'পাশে যারা যায় যারা আসে সবাই স্বজন সবাই আপন
আমি নিজের জন্যে আলাদা করে কিছুই চাই নে

আমাকে সুখ নয়, দোহাই, ও-তে আমি কেনা হয়ে যাব
আমি কেনা হতে চাই নে
আমাকে দুঃখ দাও, আরও দুঃখ, আমাকে মালা নয়, জ্বালা দাও—
আরও জ্বালা

আমার ভিতরে জোর বেজে উঠুক
আমি ঝংকার হ'য়ে ফুটে উঠি
গান হয়ে যদি ঝরে যাই নদী হয়ে যদি ভাসাতে পারি,
শুধু সেইটুক
সেইটুকু চাই।

নদীবাস

মদন দাশ

বুকের ওপর আছো নৌকার ছইয়ের মতন
নীচে নদী ছলাৎছল বয়ে যায় অনন্ত বিলাসে
রৌদ্র নয়, রৌদ্রের উত্তাপ ঘিরে থাকে
বৃষ্টি নয়, বৃষ্টির উচ্ছ্বাস ভেসে আসে।

ছুঁয়ে নেই, তবু ছুঁয়ে আছি
মাটির একটু দূরে, আকাশের একটু কাছাকাছি
দিনেরাতে আঁধারে জ্যোৎস্নায়
তোমার অস্তিত্ব শুধু অনুভবে মিলেমিশে যায়।

শিল্পী

সলিল চক্রবর্তী

আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছো, মনে হয়—
পৃথিবীতে আজও আছে শ্রাবণের ধারা।
আজও ছুঁয়ে থাকতে পারি বন্ধুর সান্নিধ্য,—
রাত ভ'র বাউলের সুখময় হরিৎ তুষার।

শিয়রচাঁদার দেশ থেকে আগলে এনে
অশ্রু আনো বার বার হৃদয়ে আমার।
মলিন-সম্বলে, শুয়ে থাকা জননীর—
বিচ্ছিন্ন স্বপ্নের কাছে, জড়ো করো—মনস্তাপ দিয়ে

হরিয়াল অন্ধকারে, এভাবে কে তুমি—
মাটি দিয়ে গড়ে যাও অপরূপ জোনাক-মঞ্জরী।

দৃষ্টিকোণ

মধ্যবিন্দু

নবনীতা দেব সেন

জগতে আমাদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন ধরনের "দ্বৈতভূমিকায় অবতীর্ণ" হতে হয়। আমরা অফিসে চাকর, বাড়িতে মনিব। কখনও পিতা, কখনও প্রেমিক। আপনি এতকাল ছিলেন সবিনয় জামাতাবাবাজী, সম্প্রতি হয়েছেন মহামান্য শ্বশুরমশায়। গেলবারে ভোট দেবার সময় যিনি ছিলেন নিতান্তই 'জনগণ' এবারে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে ভোট নেবার সময়ে তিনি হয়েছেন 'জননেতা'। তাঁর স্বার্থটা এখন স্বভাবতই পালটে গেছে। আমরা সকলেই কোথাও দাতা কোথাও গ্রহীতা। কখনো খাদ্য কখনো খাদক।

টিকটিকিটা দেখতে দেখতে আমার কথাগুলো মনে হলো। এতক্ষণ ধরে সে ছিলো এক ভয়াবহ স্বেচ্ছাচারীর ভূমিকায়, পতঙ্গ-হঠাৎ থপ করে মেঝেয় ঝাঁপ দিলো। আর দেবামাত্রই, বিসর্গ, কুলের শমন হয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলো দেয়ালে দেয়ালে। আমাদের শান্ত বেড়ালছানা, ঝাঁপিয়ে পড়ে এক থাবার ঘায়ে ঘুচিয়ে দিলো তার স্বেচ্ছাচারের স্বপ্ন। দেয়ালে আলো ঘিরে পোকাদের ওড়াউড়ি। মেঝেয় নিহত ডিক্টেটরের শব। বিসর্গ ততক্ষণে ওদিকে গিয়ে একটা দাঁড় নিয়ে খেলাধুলো শুরু করে দিয়েছে, যেন কিছুই হয়নি। এইমাত্র যেন একটা খুনীকে খুন করেনি সে। বিসর্গের এই হত্যাটি অবশ্য নিতান্তই কর্মের অধিকারে কর্ম ; ফলের আশাহীন স্বধর্ম-পালনমাত্র। টিকটিকি সে খায় না। দুধ মাছেই তার রুচি। —মেঝেয় তাকিয়ে দেখলুম এইমাত্র যে ছিল খুনে, দুশমন, এখন সেই হয়েছে আরেক খুনীর অকারণ নিষ্ঠুরতার শিকার।

আমাদের জীবনে হামেশাই এই জিনিস ঘটছে। পরীক্ষার খাতা দেখবার সময় আমার প্রায়ই মনে পড়ে পরীক্ষা দেবার সময়ে আমার মনের ভাব কতো অন্যরকম ছিলো। জানি না মান্য শিক্ষকদের তা আর মনে পড়ে কিনা। বউ যেদিন শাশুড়ি হয়, তার কি তখন মনে পড়ে শ্বশুরবাড়িতে নববধূর গভীর গোপন একাকিত্ব কেমন ছিলো? শক্ত হয়ে যখন গৃহভৃত্যের কামাইয়ের মাইনে কাটছি—সেই চুলচেরা নিয়মনিষ্ঠ মাননীয়ানা করবার বেলাতে আমাদের কি মনে পড়বে, গেল বছর অত ভুগে নির্দিষ্ট ছুটির চেয়ে বেশি ছুটি নিয়ে কী মুশকিলেই পড়েছিলুম অফিসে?

না। পড়বে না। কেননা এসব মনে থাকলে আর জগৎ চলতো না। তেলের ব্যাপারী যখন দামটা বাড়িয়ে বলেন তাঁর তখন মনে পড়ে না মাছের বাজারে গিয়ে তাঁর কেমন অবস্থা হয়। সবলপুঁটি যখন মৌরলা খায় সে কি ভাবে একটা কালবোস এই মুহূর্তে তার দিকে ধেয়ে আসছে? বিদেশী শক্তিকে বহু সংগ্রামের শেষে পরাজিত করে, স্বাধীন হয়েই অনেক সময়ে আমরা হাত কি বাড়াই না স্বাধীনতা কেড়ে নেবার দিকে?

সমস্যাটা দৃষ্টিকোণের। সমস্যা আত্মপরিচয়ের। বড়ো বড়ো ব্রহ্মাণ্ডজোড়া চিন্তার মধ্যে না ঢুকে কেবল নিজের কথাটাই যদি ভাবি, দেখতে পাই—বারবার, দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে কেমন বদলে যাচ্ছে দৃষ্টিকোণ, বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ। একই মানুষ আজ এখানে একজন, কাল ওখানে আর একজন। একটা শরীরেই যে অনেকগুলো শরীর আছে আমাদের। একজোড়া চোখে নানান দৃষ্টিকোণ।

আমি যখন কেবল সংসারে ঘরণী ছিলুম তখন আমার দৃষ্টিকোণটা ছিলো এইরকম—এ তো কিসের কাজ আমার কর্তার? এই যে দিনগুলো আজকাল এমন সুন্দর হয়েছে, একটু পিকনিক করে এলে হয় না? কত তো সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে। তা নয় কেবল কাজ, কাজ, কাজ। সারাদিন পড়িয়ে এসে, বাড়িতে ফিরেও শুধু বই আর খাতা, খাতা আর বই! কিছু বললেই বলবেন—"এ লেখাটা শেষ হোক, তারপরে একদিন নিশ্চয়ই যাবো, কেমন?"—এতে চোখে জল আসবে না কোন্ পাষাণের? —"ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী, সাহায্যপ্রার্থী—সবাই তোমার জরুরি। সবাই তোমার প্রথম। —প্রেফারেন্স লিস্টে বুঝি বউই লাস্ট?"—"দূর বোকা মেয়ে, তা কখনও হয়? তুমিই তো ফার্স্ট, তোমার কাছেই না ইচ্ছেমতো সময় চেয়ে নিতে পারি? বাইরের লোকদের কি ঝট করে 'না' বলা যায়?"—

দিন পালটেছে দিনের নিয়মে। কখন ভূমিকা-বদল হয়েছে। আমিই এখন সারাদিন পড়িয়ে এসে বাড়িতে ফিরেও সেই খাতা-বই বই-খাতা ঘাঁটাঘাঁটি করি। মেয়েরা এসে ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়ায়। —"হাওড়ায় হচ্ছিল বলে সে সার্কাসটা দেখালে না। কাজ কাজ করে একদিনও তো বঙ্গসংস্কৃতিতে গেলে না। এখন ঢাকুরিয়াতে সার্কাস হচ্ছে। নিয়ে যাবে না তো?"

—"এ লেখাটা শেষ হোক, সোনা, তারপর নিশ্চয়ই..."

—"ও লেখার পরে আরেকটা লেখা আসবে, তারপর পরীক্ষার খাতা—সবাই তোমরা ফার্স্ট, ছাত্রছাত্রী, পত্রপত্রিকা, সব্বাই, কেবল আমরাই লাস্ট। এই তো।"

অভিমানে তাদের গলা বুজে যায়। চোখের পাতায় থিরথিরিয়ে কাঁপন লাগে।

—"ছি সোনা, তোমরাই তো আমার ফার্স্ট, ফার্স্ট বলেই না তোমাদের কাছে আমার কাজের সময়টুকু চেয়ে নিতে পারি?...এ" বলতে বলতেই বহুযুগের ওপার থেকে আরেকটা অনুযোগ, আরেকটা সান্ত্বনার কথা বুকের গভীরে প্রতিধ্বনিত হয়।...পাতা উলটে যায় দৃষ্টিকোণের। তক্ষুণি লেখা ঠেলে ফেলে বলি—"চল্ তোদের আজকেই সার্কাস দেখিয়ে আনি।"

কিন্তু সব সময়ে এমনটি পারি না। ইচ্ছেমতন সামলে ওঠা সব সময়ে হয় না। দৃষ্টিকোণ বদলাতে চায় না সহজে। ইচ্ছেমতন ভূমিকাবদলও কি হয়? কখনও ভূমিকার বদল সময়াধীন—কখনও বা ব্যক্তি-নির্ভর। খুব কম সময়েই ইচ্ছাসাপেক্ষ।

কর্মজগতে যেমন নিজের কাছে আমার দুটি পরিচয়, পরিবারের মধ্যেও তেমনি। একই সঙ্গে দুটি ভূমিকা আমার। আমি মায়ের মেয়ে, আর মেয়ের মা। আমার মায়ের এ সমস্যা নেই। তিনি শুধুই মা। আমার মেয়েদেরও নেই। তারা শুধুই মেয়ে। কিন্তু আমি আছি একই সঙ্গে দুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণের হাল ধরে দুই জগতে দুটি পা রেখে—একই সঙ্গে সন্তান এবং জননী হয়ে। ক্রমশ, জানি, মায়ের ভূমিকাটাই বেড়ে উঠবে, মেয়ের ভূমিকাটা গুটিয়ে আসবে, জগতের তাই নিয়ম। একদিন কেবলমাত্র মেয়েই ছিলুম। আবার একদিন শুধু একজন মা হয়ে যাবো। প্রকৃতি তার হিসেব মিলিয়ে নেবে।

সেদিন এক বন্ধুর মা মারা গেলেন। বাবা আগেই স্বর্গত। তার এখন রইলো দুটি মেয়ে আর স্বামী। আমার মনটা হাহাকার করে উঠলো—'রঞ্জা এখন থেকে জন্মের মতন শুধুই

মা হয়ে গেল।" নিজে আর মেয়ে রইলো না বন্ধু। তার আজন্মের অভ্যস্ত জীবনের প্রাথমিক ভূমিকাটির এইখানেই সমাপ্তি। এবারে কেবল সেকেণ্ডারী পোস্টে পার্মানেন্ট হওয়া। এর নাম পদোন্নতি। ধাপের পরে ধাপ। মেয়ের পরে মা।

বৃদ্ধ বাপ যতকাল মাথার ওপরে থাকেন, চল্লিশোর্ধ্ব পাত্রটি তখনও সন্তানমাত্র। হয়তো তারও সন্তানেরা যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, তবুও তার বুকের মধ্যে একটা চেনা বনস্পতির ঘনিষ্ঠ ছায়ায় চল্লিশ বছর ধরে 'খোকা'টি বাড়তেই থাকে। তারপরে বাবা যেই একদিন সরে গেলেন কোলে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর 'খোকা'কেও। একটি নিষ্পাদপ খাঁখাঁ মাঠে ঝাঁঝাঁ রোদে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল 'বাচ্চার-বাবা'। 'খোকা'-ডাকের গুটিয়ের মধ্য থেকে উঠে আসে নতুন একজন 'বাচ্চার বাবা'।

এখন থেকে কেবল সেই বেড়ে উঠতে থাকবে। ডালপালা মেলে একাই একশো হয়ে মেসো-পিসে-খুড়ো-জ্যাঠা থেকে দাদু-ঠাকুর্দা পর্যন্ত ঝুরি নামিয়ে। সে জঙ্গলে খোকাটার খোঁজ মিলবে না, কেবল তার না-কোনো কান্নাটুকু শুনতে পাওয়া যাবে, কখনো কান পাতলে।

আমাদের বাড়িতে ইদানীং একটা পদোন্নতির ব্যাপার ঘটে গেছে। ফোন বাজলো।

—হ্যালো, মাসিমা?

—না, আমি নবনীতা।

—মাসিমা, অন্তরা আছে?

...কে মাসিমা?...আমি?

—"মাসিমা" আমি কেন হব? আমাদের বাড়ির মাসিমা তো আমার মা। আমার বন্ধুরা আসবে। তারা ডাকবে—"মাসিমা, নবনীতা আছে?"—এটাই স্বাভাবিক। এটাই তো হয়ে আসছে। মাসিমা মানেই মা। আমি তো নবনীতা।

আমার বন্ধুদের মতো আমার বাচ্চাদেরও বন্ধু আছে বইকি। তারা আমারই বন্ধুদের বাচ্চা। তিস্তা-টেটো ডাকবে—"নবনীতা মাসি পিকোলো আছে?" ভাতাই-পুপলু ডাকবে—"নবনীতা পিসি টুম্পা আছে?"

কিন্তু এই যে নামডাকহীন, বর্ণগন্ধশূন্য নিরাকার শব্দব্রহ্ম মাসিমা—আমার আবার এই পরিচয় কবে থেকে হল? এই পরিচয়ে আমাকে আমি চিনবো কি করে?

—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। কেন, ঘটনা তো সরল!

এতদিন তোমার সন্তানদের কেবল নামটুকুই ছিলো। সেই নামের তাদের আলাদা একটা অস্তিত্ব তৈরি হয়নি। এখন ইশকুলের বন্ধু হয়েছে তাদের। সেখানে প্রত্যেকেই যে যার নামের পরিচয় বহন করে। প্রত্যেকেই একজন ক্ষুদে আলাদা মানুষ। এতদিন ব্যাপারটা ছিলো এমনি—"কোন পিকোলো?"

—"নবনীতার মেয়ে।" এখন হয়েছে—'কোন মাসিমা?'

"অন্তরার মা।" পটভূমিকা এবং দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ ফ্রেম অফ রেফারেন্স এবং পারস্পেকটিভ দুটোই পাল্টে গিয়েছে। তুমি নিজেই এখন একজন 'বন্ধুর মা'।

পদোন্নতির পরে আমাদের বাড়িতে এখন দুই মাসিমা। নবনীতার মা। আর অন্তরা-নন্দনার মা। ফোনে কেউ—হ্যালো, মাসিমা?' বললে মা, আমি দুজনেই মুশকিলে পড়ি। হ্যাঁ, কি না? আমার যখন পি. এচ. ডি হোলো, আমার শ্বশুরমশাই খুব খুশি। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এই বলে—"তোমার মায়ের এখন ফোন ধরতে বেজায় মুশকিল হবে।"—(আমার শাশুড়ি মায়ের প্রসঙ্গটি একবার মা-তুলে শ্বশুরমশাই কোনো কিছুই বলে তেমন আনন্দ পেতেন না!)

—"কেন, বাবা?"

—"এতদিন ছিলাম বাপ-ছেলে দুই ডক্টর সেন। উনি বলতেন, ডক্টর সেন, না প্রফেসর সেন? এখন ওঁকে তিন দফায় বলতে হবে, ডক্টর সেন, না প্রফেসর সেন, না ডক্টর মিসেস সেন?" বলে হা হা হেসে ঘর ভরে দিয়েছিলেন।

এখন সংসারে সেসব সুখের জটিলতা জন্মের মত মিটে গিয়েছে। ফোন ধরতে কারুরই আর ভুল হবার উপায় নেই।

মুশকিলের অভাবও যে কখনো মুশকিলের হতে পারে তার প্রমাণ আমাদের ওবাড়ি। যেখানে ফাঁকাঘরে আর গোলমাল হয় না। দুই 'মাসিমা'র মতই কেউ যদি মা বলে চেঁচিয়ে ওঠে, এবাড়িতে সে দু রকম গলায় সাড়া পাবে। তেমনি 'দিদি' বলে ডাক দিলেও দুটো জবাব মেলে—আমিও সাড়া দিই আমার বড়ো মেয়েও দেয়। সেও তো একজন দিদি! সেই দিনটি কল্পনা করতে আমি শিউরে উঠি যখন ওবাড়ির মতো এবাড়িতেও এই ছোটো জটিলতাটুকু সরল হয়ে যাবে। যখন 'মা' বললে একজনই মা, আর 'দিদি' বললে একটিই দিদির সাড়া মিলবে। জীবনের দু-দিকের দুটো খোলা দরজা দিয়ে একবার মায়ের খুকু হয়ে আরেকবার খুকুর মা হয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের এই দ্বৈত খেলা, দায়িত্ব আর দায়িত্বহীনতায় ইচ্ছে মতো দোল খাওয়ার এই স্বাধীনতা আমার ঘুচে যাবে। তখন আমার আব্দার করবার পালা শেষ, তারপর কেবলই আব্দার রাখবার দিন।

এ সংসারে দ্বৈতদৃষ্টি কেবল একমাত্র আমারই আয়ত্ত, কেননা আমি এখনও সেই ক্ষুদ্র বিন্দুতে রয়েছি যার নাম যৌবন। যার এক তীরে কৈশোর, অন্য তীরে বার্ধক্য। ঈনিয়াসের কাঁধে তার বৃদ্ধ পিতার মধ্যে বিধৃত ছিল তার অতীত আর হাতের মুঠোয় ধরা পুত্রের হাতের মধ্যে স্পন্দিত ছিল ভবিষ্যৎ। তেমনি আমার মায়ের মধ্যে বেঁচে আছে আমার বাল্য-কৈশোর, আমার সন্তানদের মুঠোর মধ্যে গড়ে উঠছে আমার মধ্যবয়স। আমার জরা।

যৌবন এক চিকন সূক্ষ্ম মধ্যবিন্দু, ঊষার মতো স্বচ্ছ এক ব্রাহ্মমুহূর্ত। কৈশোরের ম্লান চন্দ্র এখনও জেগে রয়েছে মায়ের "খুকু রে" ডাকের মধ্যে, কিন্তু জানি, ক্রমশ উদিত হওয়া "মাসিমা"র অমোঘ রৌদ্র তাকে একদিন মুছে দেবে। তখন শুধু দ্বৈতহীন নেত্রে চেয়ে থাকা, নির্ভুল সন্ধ্যার দিকে।

॥ ৩ ॥

চীনের তিব্বত অধিরোহণের পর থেকেই (অধিরোহণ কথাটি আক্ষরিক অর্থেই সত্য। কারণ, তিব্বত বোধ হয় দশ থেকে পনেরো হাজার ফুট উঁচু, ওটা তো পৃথিবীর ছাদ।) মনটা বিমুখ ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত দালাই লামা যখন বললেন ধর্মত্যাগ করাবার জন্যই সহস্র সহস্র মানুষকে নিষ্ঠুর-ভাবে মেরে ফেলা হয়েছে তখন স্বাভাবিক-ভাবেই সারা ভারত গর্জন করে উঠেছিল। মানুষ মারা আমরা কোনোদিনই অনুমোদন করি না; দরজা খুলে দিই—দলে দলে শরণার্থী আসে বারবার। এদেশে মোগল-পাঠানেরা জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করে-ছিল শুনেছি। কিন্তু যদি সত্যই তা হত তা হলে উত্তর ভারতে হিন্দু মেজরিটি থাকত না। কাজেই, খুব স্বল্পসংখ্যক লোককে গরু খাইয়ে মুসলমান করলেও হাজার হাজার লোককে করা যায় না। তবু যদি-বা ধর্মান্তরিত করা যায়—মেরে ফেললে প্রাণত্যাগ হয়, ধর্মত্যাগ হয় না। দালাই লামার এই কবিত্বও কিন্তু আমার সন্দেহ দূর করেনি। কারণ একদা ভালো ভেবে-ছিলেন বলেই পরে তা খারাপ হবে না, এও কোনো কথা নয়।

চীনের সম্বন্ধে আসল বিরূপতা আমার মনে এল নকশাল আন্দোলনের সময়। যে ছন্নছাড়া ছিন্নমস্তা রাজনীতি তখন বাংলায় ও অন্ধ্রে পাইকারী হারে, অনাত্র খুচরোভাবে তাণ্ডব শুরু করল তাতে চীনের প্রভাব আছে এ-কথা স্পষ্ট হল, যখন দেওয়ালে লেখা পড়ল—'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। মত ধার করা যেতে পারে, অর্থাৎ এক দেশে উদ্ভূত মত অন্য দেশে সফল হতে পারে তার সহস্র প্রমাণ আছে; কিন্তু এক দেশের নেতা অন্য দেশের নেতা হতে পারেন না, বিশেষত যে দেশের মানুষের কাছে তিনি একটি নাম মাত্র। আমরা ভাবছিলাম আমাদের ভালো ভালো ছেলেগুলিকে খেপিয়ে দিয়ে চীন কি আমাদের উপর প্রতিহিংসা নিচ্ছে? তখন বুঝিনি এ-দেশের অনু-করণপ্রিয় অল্পবুদ্ধি 'adventurist' কতি-পয় নেতা 'কালচারাল রেভলিউশন'-এর নাটক করতে গিয়ে আমাদের আত্মত্যাগের, বীরত্বের উপকরণে পূর্ণ কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিষ্ফল চেষ্টার দিক শুধু নয়, অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। শুধু তাদের ধ্বংস নয়, ধ্বংস হয়ে-ছিল আমাদের সকলের সাহস—আমরা মেরুদণ্ডহীন জীবে পরিণত হয়েছিলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সনৎবাবুর দুর্দশা যাঁরা ঘটাচ্ছিলেন তাঁরা সম্ভবত সিংহুয়া ইউনিভার্সিটির অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু সনৎবাবুও জানতেন না, তাঁরাও জানত না তার প্রকৃত অর্থ কি। কারণ সেটা অনেকটা 'লামাসারি'তে মন্ত্র জপার মত হচ্ছিল। তেমনি মূঢ়, তেমনি ব্যর্থ। সে সময় অসীম চ্যাটার্জির সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করেছি, দীপাঞ্জনের সঙ্গেও কথা হয়েছে কিন্তু কেউই আমাকে বোঝাতে পারেননি তাঁরা কি চাইছেন। কারণ, নিশ্চয় তাঁদের কাছেও 'কালচারাল রেভলিউশন'-এর অর্থ স্পষ্ট ছিল না—যেহেতু, তাঁরা এক ধাপ এগিয়ে লাফ দিচ্ছিলেন। যে দেশে না সামা-জিক, না রাজনৈতিক রেভলিউশন হয়েছে সেখানে হঠাৎ 'কালচারাল রেভলিশন'-এর কল্পনা অলীক। অসীম (কাকা) যেদিন কলকাতা ছেড়ে গেলেন সেদিন রাত্রি এগার-টায় আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, "আপনি আমাকে স্নেহ করেছিলেন তাই যাবার আগে আপনাকে বলে গেলাম।" তাঁর গলা ভারি ছিল, আমারও মনটা ভারি ছিল। তাঁর সততায় আমার অবিশ্বাস ছিল না। আমি রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন স্মরণ করলাম, 'ধন্য কর দাসে সফল চেষ্টার আর নিষ্ফল প্রয়াসে।'

এর পরে আন্দোলন যখন উগ্র, ফলে চারিদিকে একটা আতঙ্ক তখন তৎকালীন হোম সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি আর গুপ্তর অনুমতি নিয়ে আমি, গৌরকিশোর ঘোষ, জ্ঞানাঞ্জন পাল, নির্মল চট্টোপাধ্যায় বন্দী ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, সে সময়ে বারবার বিপ্লব হালিম প্রভৃতিকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, ব্যাপারটা কি? বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে বন্ধ্যা তা আমরাও বুঝতে পারছি—এতে খালি বেকার তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ভাই, কিভাবে ব্যবস্থা করলে ভালো হয় তার কি কোনো ব্লু-প্রিন্ট তোমাদের কাছে আছে? সেই ব্লু-প্রিন্টটা দাও—যদি আমাদের মনোমত হয়, সর্বতো-ভাবে সহায়তা করবো। তোমাদের দলে ভিড়ব আমরা। আমরা মিত্র হতে চাই, আমাদের শত্রু করে লাভ কি? কিন্তু কোনো ব্লু-প্রিন্ট তাঁরা দিতে

[illegible]
চ্যাম্পিয়ন গোপাল সেনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর ঐ আন্দোলনের মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে সমস্ত আলোচনা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু চীন গিয়ে সূত্র-প্রিন্টটা পেয়ে গেলাম। সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

যতই মনে মনে চীন সম্বন্ধে সন্দেহ থাক, সে দেশে যাবার আগ্রহ আমার প্রবল ছিল। ভেবেছিলাম একবার সেই দেশ দেখতেই হবে যে দেশ আমাদের পাশে থেকেও এত অজানা। যে দেশের নেতা সর্বোচ্চ পদে বসে থেকে নিজেই নাকি নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছেন (কালচারাল রেভোলিউশনকে এইরকমই অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমাদের) তা শুধু অজানা নয় দুর্জ্ঞেয়ও। যাঁরা চীনপন্থী তাঁদের কাছ থেকে রুশবিরোধী কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তা দিয়ে ঠিক চীনকে বোঝা যায় না।

১৯৭৪ সালে আমি শ্রীমতী গান্ধীকে চীনে ডেলিগেশন পাঠাবার কথা লিখেছিলাম। তখন একটু সদ্ভাবের আলো দেখা গিয়েছিল। তারপর প্রথম সূচনা চীনের টেবিল টেনিস টীম যখন এলো। ঢাকুরিয়া লেকের প্রাঙ্গণে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ও তাঁদের লীডার একজন উপমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই সময় দিল্লী থেকে তাঁদের ফার্স্ট সেক্রেটারী লী-ও এসেছিলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক। টেবিল টেনিস দল একটি ভারী সুন্দর ঘোষণা নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিল—'friendship first competition second' কথাটি যেমন সুন্দর তেমনি বহুপ্রসারিত এর অর্থ। এইরকম ছোট্ট এক একটি বাক্যকে অর্থগর্ভ করে বলা এরা এদের নেতার কাছ থেকে শিখেছে—তা এখন বুঝতে পেরেছি। কথাটির ভারতের প্রসঙ্গে একটি অর্থ আছে। এটি বলছে, আমরা বন্ধুত্বের বাণী এনেছি—দুর্যোগের পর প্রথম মৈত্রীর বাণী। আবার ভারতের প্রসঙ্গ ছাড়াও খেলার প্রসঙ্গেও এর সার্থকতা কম নয়। আজকের দিনে যখন খেলার ক্ষেত্রটাও কলুষিত, জাল-জুয়াচুরি নেপটিজমের রাজত্ব—যখন 'sporting spirit' শব্দটাই অর্থহীন হয়ে গেছে তখন খেলার প্রসঙ্গে এ-কথা বলা যে হারজিতই বড় কথা নয়, বড় কথা খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্প্রীতি—এ একটি পরিচ্ছন্ন সভ্য মানুষের ঘোষণা, যা আমাদের পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায়।

চীনের সম্বন্ধে আমার মন দোটানায় থাকলেও বাংলাদেশে ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতি সমিতির অনেক সভায় আমি গিয়েছি। এই সমিতি ডাঃ কোটনিসের খবর আমাদের দেশে প্রচার করেছে, নইলে ভারতের ওই বীর সন্তানকে আমরা মনেই রাখতাম না। সারা ভারত ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি হিসাবে ডাঃ বিজয় বসু সপত্নীক মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হয়ে চীন গিয়েছেন কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিকূল থাকার সময়েও। এবারে চীনে হোপেই প্রদেশে সিজিয়াচুয়াং শহরে যেখানে ডাঃ কোটনিসের সমাধি সেখানে তার নিকটে একটি স্মৃতিমন্দির অর্থাৎ মিউজিয়াম স্থাপন হয়েছে। তারই উদ্ঘাটন উৎসবে নজন ভারতীয়কে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন চীন রাষ্ট্রদূত। ২৮শে নভেম্বর এই ডেলিগেশন রওনা হবার কথা। ৯ই ডিসেম্বর উদ্বোধন-দিবস। নভেম্বরের মাঝামাঝি জানলাম আমাকেও দলে নেওয়া হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস আমার নাম উত্থাপিত করেছেন ও সেটা গৃহীত হয়েছে। তারপর চলল ভারত সরকারের ছাড়পত্রের সাধনা। অবশেষে ছাড়পত্র নিয়ে যখন দিল্লী পৌঁছলাম তখন শুনি শেষ দিন পর্যন্ত কোনো করণিকের নিজস্ব মতের প্যাঁচে পড়ে আমাদের যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর কি। যা হোক, ২৮ তারিখে যাওয়া গেল না।

আমরা চার তারিখ শেষ রাত্রে দিল্লীর দিকে রওনা হলাম। দিল্লী হয়ে বম্বে যাওয়া, বম্বে থেকে সুইস এয়ারে সোজা পিকিং, আর থামা নেই। যাওয়া কি না-যাওয়ার সন্দেহে কটা দিন কি উদ্বেগে কেটেছে কি বলব! দলপতি বিজয়বাবু বলেছিলেন তাঁকেই চীনারা নিমন্ত্রণ করেছে সে-ক্ষেত্রে তাঁদের পাসপোর্ট যদি সরকার আটকে রাখেন তা হলে ডাঃ কোটনিসের ভ্রাতা-ভগ্নী ও আমার ছাড়পত্র পাওয়া না পাওয়া সমান—কেউই যাবে না। সে তো ঠিকই। চীনারা ওঁদের চান, ওঁরা তো তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমি যে যেতে চাই যদি এতটুকুও ভালো দেখতে পাই (কারণ, অনেকের মত আমারও সন্দেহ ছিল সেখানে খালি বন্দুক-বেয়নেটের রাজত্বই দেখব।) তা হলে দেশে এসে বলব। অবশ্য আমি জানতাম যে, সেটা বলা বা বলার চেষ্টা

করাটাও হবে একটা যুদ্ধ। এশিয়ার এই দুই বৃহৎ ভূখণ্ড, এই দুই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর কিছু না হোক শত্রুতা ও অবিশ্বাসের ভাবটাও যদি দূর হয় তা হলে যে বিপুল শক্তি ও বল লাভ হবে তাকে ভয় করবার অনেক দেশ ও গোষ্ঠীর কারণ আছে।

যাবার আগেই ভেবেছিলাম সুযোগ পেলে সে-দেশে রবীন্দ্রনাথের কথা বলব। ইতিহাসের শাক্যসিংহ বুদ্ধ ও মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের মত এ-যুগে দেশে দেশে সেতু বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এশিয়া বা য়ুরোপের যে-কোনো দেশেই যাই না কেন, সে-দেশ সম্বন্ধে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে, যা সর্বদাই প্রগতিশীল অর্থাৎ সামনের দিকে মুখ ফেরানো। নানা দেশ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়েছে। কিন্তু ঐ যা বললাম, যাওয়া হবে কি না হবে, ঠিক না হওয়ায় গরম কাপড়চোপড়ও কেনা হয়নি, বইপত্রও গোছানো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের Talks in China বইখানা নিলাম ও শেষ মুহূর্তে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত জাপানী কবি নগুচিকে লেখা কবির [illegible] (উত্তর-প্রত্যুত্তর সমেত) একটি ছোট গ্রন্থ আমাকে সেদিন দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর লেখা আমার নিজের কয়েকটি বইও নিলাম। বাক্সের ওজন কুড়ি কেজির বেশী হওয়া চলবে না। সামান্য গরম কাপড়েই ওজন ভারী হয়ে যায়। এয়ারপোর্টে বিজয়বাবু বললেন ওজন আরো খানিকটা কম নিতে হবে, কারণ বম্বে থেকে একখানা ভাল মার্বেল পাথর মুক্তেশ কোটনিসরা নিয়ে যাবেন। চাংসার কাছে সাওসান নামক স্থানে মাও-সে-তুং-এর যে স্মৃতিমন্দির তৈরী হচ্ছে সেখানে তাঁর মরদেহ রক্ষিত হবে। সেই অট্টালিকার এক পার্শ্বে ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ ঐ প্রস্তরটি সংলগ্ন করা হবে। আমার ইচ্ছা ছিল এক কবির স্মৃতির উদ্দেশে আর এক কবির একটি পঙ্‌ক্তি উৎকীর্ণ করে দিই। ইংরাজীতে দেওয়া যেত—নানা কারণে তা হল না। যা হল তা মামুলী বাক্য। যাই হোক, এয়ারপোর্টে তাড়াহুড়ো করে ওজন কমাতে গিয়ে বইগুলিই বের করে দিলাম। তার মধ্যে অনবধানে Talks in China-ও পড়ে রইল।

চীন সরকার কলকাতা থেকেই তাঁদের দাক্ষিণ্য শুরু করলেন। আমাদের [illegible] শহর থেকে পিকিং যাওয়া, এক মাস চীন দেশ ঘুরে দেখা—সমস্ত খরচ তাঁরা বহন করবেন।

হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলবে শুনে তিনি জানতে চাইলেন, রবীন্দ্রনাথ কে? আমি বললাম, "আপনি কি রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেন নি?"

তিনি বললেন 'না, perhaps I am not cultivated enough।' (আমি হয়তো যথেষ্ট শিক্ষিত নই)। আমি বললুম, "অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে একমত হতে হচ্ছে।"

প্রেস কনফারেন্সের পর আমরা যতিদল এক সঙ্গে বসে দু একটি কথা আলোচনা করলাম। তখনই মহাকবি শ্রী শ্রী জানালেন যে, তাঁর কোনো এক সিনেমা ডিরেক্টরের সঙ্গে কনট্রাক্ট রয়েছে যিনি তখন বিদেশে। কিন্তু দিন দশেকের মধ্যে ফিরে আসবার কথা। ফিরে যদি তিনি টেলিগ্রাফ করেন তা হলে মহাকবিকে দশ দিন পরই চলে আসতে হবে। আশ্চর্য কথা এই যে, তাতেই দলকে রজী হয়ে গেলেন। আমি ভাবলুম এত খরচ করে যাবা নিয়ে যাবে মধ্যপথে ফিরে আসলে তারা কি ভাববে। অনেক ডেলিগেশনেই দেখছি সব সময়ই এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে!

রাত্রে চীন দূতাবাসে একটি বিরাট পার্টি ছিল, শতাধিক মানুষ হবেন! এই নিমন্ত্রিতের নির্বাচন কিভাবে হয়েছিল জানি না, কারণ এর মধ্যে কমিউনিস্ট মতাবলম্বীর সংখ্যা বেশী নয় বলেই মনে হল। তবে বর্ণচোরা আম কত থাকে! আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে, তথা সব মতের নেতাদের সম্বন্ধেই শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এটা দুঃখের। অথচ কি আগ্রহ নিয়েই না কমিউনিস্ট দেশে চলেছি!

ঐ যা বলছিলাম—নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নাভার মহারানী ছিলেন। নাভা পঞ্জাবের একটি এস্টেট। স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য নাভার মহারাজকে ইংরেজরা জেলে রেখেছিল। তবে নিশ্চয় রাজকীয় জেল। কারণ, বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি জেলে গেলে মহারানীও গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর সন্তানাদির জন্ম হয়। তারপর মহারাজাকে ইংরেজরা কোথায় সরিয়ে ফেলে তার পাত্তা নেই। এঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, চীনের সঙ্গে তাঁর কি সংযোগ? তিনি এই দূতাবাসে নিমন্ত্রিত কেন? তাতে তিনি বললেন, ভারত-চীন সম্পর্ক দূষিত হওয়ার পরেও সর্বদাই তিনি এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছে সমস্ত দেশ যখন একটা বিষয় নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন তাদের বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। সে সময় কিছু মানুষ থাকা দরকার যারা একটু নির্লিপ্তভাবে উভয় পক্ষকে সম-দৃষ্টিতে দেখে সত্যাসত্য বিচার করতে পারে। তারাই শান্তির দূত। ঠিক এই কথা না হলেও মোটামুটি এই তার বক্তব্যের তাৎপর্য ছিল। আমি বিস্মিত ও খুশী হলাম।

চীন দূতাবাসে ঢুকেই মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে দেখা হল। অর্থাৎ দেওয়ালে টাঙানো, ফ্রেমে বাঁধানো মাও-সে-তুং-এর কবিতার সঙ্গে। ঘরে ঘরে তাঁর আলোকিত উপস্থিতি। কবিতা দুটি পড়িয়ে নিলাম—পোলিটিকাল কবিতা নয়, কোথায় কোন গিরিশৃঙ্গে বরফ পড়ার বা ঐ জাতীয় প্রকৃতি বিষয়ক—তবে তার মধ্যে অন্য কোনো নিহিতার্থ আছে কি না জানি না। থাকতে পারে।

ককটেল পার্টির পর আমরা কজন, মিঃ সার্তিফি এবং তাঁর স্ত্রী রয়ে গেলাম নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণে। একটি মেয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি এই শাড়ি পরেই চীন ভ্রমণ করবেন? আমার কোটটি দেখে বললেন, এইরকম কোট ছাড়া ভারি কোট সঙ্গে নেননি? আমাদের বেশ-ভূষা তাঁর আদপেই মনঃপূত হল না। তাঁরা

ছিটকিনি / দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্য একটা ছিটকিনি খুলতে পারেনি বলেই অমল মাঝরাতে বাড়ির বাইরে যেতে পারেনি! সেই অসাধারণ মানুষটির কথা সে জানতো যে একটা বিহ্বলভাবের অভাবে আজো আত্মহত্যা করতে পারল না! অমলের ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে। যে ঘরে তার জীবন ভোঁতা তীরের ফলার মতো আধখানা বিদ্ধ হয়ে গেছে, তার পরিচিত দেয়াল, খুব চেনা জানলা কিছুই সে খুঁজে পেতো না। দরজা আছে ভেবে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় কতবার অমলের মাথা ঠুকে গেছে অন্ধকারে। দেয়ালগুলো যেন এক একটা জমাট বোধ!

ডুবো পাহাড়ের মতো নিজেকে তারা লুকিয়ে রাখে সারারাত, দিনের আলো ফুটলে স্পষ্ট হয়, আর সে ভয় করে স্পষ্টতাকেই সবচেয়ে বেশী। জীবনে তার গোপনতা বলে কিছু নেই, অথচ কেন যে স্পষ্টতাকে ভয় পায় বোঝা যায় না। একবার অসুস্থ হবার পর ডাক্তারের পরামর্শ মতো অন্তর্ভেদী আলোর মেশিনের সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েছিল খুব। ভেবেছিলো কঠিন অসুখ। গোপনতা নেই, স্পষ্টতাও নেই! অদৃশ্য যা কিছু লুকিয়ে থাকে শরীর আমাদের তুলে ধরছে, ভয়—সে ভেবেছিলো। রঞ্জনরশ্মি সেবার চোখের সামনে মেলে ধরেছিল বুকের ভিতরে ছোট্ট একটি তিলের মতো সাদা দাগ। ওরকম দাগ নাকি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ ছবিতে। সাদা দাগ দেখে ভয় পাওয়ার পর থেকেই সে সাদা স্পষ্টতাকে ভয় পেতে শুরু করে। তারপর থেকেই তার ঘুম ভেঙে যায় মাঝরাতে। কিংবা রাতের সচেতনায়! শুরু, এক অন্তহীন পথ পরিক্রমা। জেগে এবং ঘুমিয়ে। দেয়ালগুলো অনেকখানি সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয়। হয়তো সে যত এগিয়ে যাবে, অনায়াসে হাঁটাচলা করতে শিখবে ঘুমের মধ্যে, দেয়ালগুলো আরো কিছুটা পিছিয়ে যাবে অন্ধকারে। কিন্তু থাকবে, ওরা থাকবে অন্ধকারে লুকোনো বাঘের মতো ওঁত পেতে। একটা ছিটকিনি খুলতে পারেনি বলেই এই দেয়ালগুলোকে পর পর ছোট বড় অনেকগুলো দেয়ালের বিষণ্ণ গম্ভীর মাল-ভূমিটিকে অমল কিছুতেই আজো জয় করতে পারল না।

বাতির সুইচে রাতের কুয়াশা লেগে থাকে। আলো জ্বালার প্রয়োজন করে না। অন্ধকারে অমল টের পায় এই তার ছেলে, এই স্ত্রী—গোড়ালি থেকে শাড়ির প্রান্ত কিছুটা সরে গেছে, পাশ ফিরে সে শুয়ে আছে, দেয়ালের প্রতি যেন সে আসক্ত মনে হয়, ছাদের দিকে মুখ করা নেই, ছাদ যখন নেমে আসে মাটিতে, মেঝের ওপর শরীর বিছিয়ে বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি—এর কোনো কিছুই রমা, তার স্ত্রী জানে না। অথচ অমল ভাবে মশারির জালের ওপারে থেকেও দেয়াল তার বাহু দিয়ে রমাকে জড়িয়ে আছে। সে ঘুমন্ত ভিতরের কামনা কখন আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়বে, কখন তার ঘুম ভাঙবে তার জন্যে সে অপেক্ষা করছে, কিংবা ভাবছে অমলতো আঙুলের ছোঁয়ায় তাকে জাগিয়ে তুলবে এখনি, সিদ্ধান্ত নিতে পারছো না, কষ্ট পাচ্ছে আর অনর্গল বয়ে যাচ্ছে আগুন-মাখা নিশ্বাস, তার শরীরের বালি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমল সহজ হতে পারে না তার স্ত্রীর সঙ্গে। কেমন যেন ভয় পায়। মনে হয় শাড়ি সায়া ব্লাউজের ভিতর থেকে যে নরম স্পর্শকাতর মানুষটি গভীর মমতায় তার দিকে তাকিয়ে আছে সে তার নয়। কলেজ পড়াকালীন এক তরুণ অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে পড়তে যেত রমা। দু'বছর পড়েছিলো। ভাব হয়েছিলো এক অল্পবয়সী ডাক্তারের সঙ্গে। খুব সহজেই ওর সঙ্গে সকলের পরিচয় হয়ে যায়, স্বভাবে কিংবা আচার আচরণে কোনো আড়ষ্টতা কখনোই প্রকাশ পায় না। বিয়ের পরেও অনেকের সঙ্গেই সে সহজভাবে মেলামেশা করেছে, অন্তরঙ্গ হয়েছে। স্ত্রী ঘরকুণো হয়ে থাকুক যেমন অমল চায়নি, তেমনিই আবার অনেক সময় ভুল বুঝেছে তাকে। নিজেকে কল্পনা করে সুখ পেয়েছে এক ব্যর্থ অসুখী মানুষ বলে (আসলে ওর ব্যর্থতাবোধ বাড়িয়ে তুলেছিলো রমাই)। এরই মধ্যে এল ওদের ছেলে। দেখল এপারে গ্রাম, ওপারে গ্রাম মাঝখানে শহর। ওরা এতদূরে পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পেরেছে। মন খারাপের মধ্যেও ভালোবাসতে পেরেছে তাকে, এই শহরতলিকে যেখানে বাস এসে দাঁড়াল, ওরা আর কোথাও গেল না, দুয়েকটি চায়ের দোকান, সুন্দর রাস্তা তালগাছ, লাল কাঁকড়ের পথ, খোয়াই, সূর্যের দিকে

ওরা তাকায় না, তাকিয়ে থাকে সন্ধ্যার তারার জোৎস্নাভরা আলোর দিকে। দু প্রান্ত থেকে দুটি হাত—একটি নিরাভরণ, অন্যটি বেঁটে স্থূলে, ছুঁয়ে দেখে ছেলের মাথার চুল: সংসারে আর কিছু নেই, শুধু এই সন্তান। তিন জোড়া চোখ দূরাগত নক্ষত্রের পদধ্বনি শুনতে পায়। ওরা জানে, উপলব্ধি করে এই শহর তার আকাশ এবার নিজেই খুঁজে পাবে। কিন্তু হয় না। শহরের জঞ্জালে শুকনো পাতার উপর দিয়ে, কখনো বা ঘাসে সড়সড় করে এগিয়ে যাবার সময় আগুনের মুখ বাড়ায় ডিমসুদ্ধ পাখির বাসার দিকে। বাউল গানে যে পাখিটি চার রঙের ডিম পাড়ে, সেই পদ্ম যার শিকড় নেই, নেই বোঁটা, ভ্রমরের প্রেম উপভোগ করার আগেই তাদের গ্রাস করে, একটি গহ্বরের, অর্থাৎ পেট সরীসৃপের। চিরগর্ভবতী প্রেমিকার কথা যে লেখা হয়েছিলো গুপ্ত সাধনার গানে, সে কোথায়? তাই স্ত্রীকে অমল ভাবে এক অচেনা আজানা বিদেশিনী। যেন তার জাহাজ ছাড়বে দূরে, সে অপেক্ষা করছে।

অন্ধকার ঘরের ভূগোল ততদিন অমলের বেশ মুখস্থ হয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে সে

দেখে একটা বড় হলঘর। কার্পেটের ওপর বিছানো ঝকঝকে ডাইনিং-টেবিল, চেয়ার। টেবিলে বোন্ চায়নার সুন্দর বাসন, পাশে ফ্রিজ, রান্নাঘরে কুকিং রেঞ্জ, কিন্তু কেউ কোথাও নেই! ওয়ার্ডরোবে বেয়ারা ও বাবুর্চির সাদা ধবধবে পোশাক, নীল অন্ধকারে স্টেনলেসের সুদৃশ্য কল থেকে শুধু জল বয়ে যাচ্ছে, চাবি বন্ধ করার লোক নেই, চারপাশে নেই মানুষ, আছে ছায়া, মানুষের ছায়া। এই নিশ্চুপ নিথর পরিবেশে একটা বেড়াল শুধু একা এ-ঘর থেকে ও-ঘর নিজের লাল ছায়া নিয়ে গ্রহের মতো ঘুরছে। এরপর একক সত্যাগ্রহের একটা সর্বাত্মক শক্তি অমল টের পায় যখন দেখে তার ভিতরে একটা প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে, ভিখারীরা বলছে মন্দিরের দরজা নোংরা কোরো না। শ্রমিকদের ধাওড়া ও ব্যারাকের চারপাশে সে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ, দূরে থেকে দেখল দশজন মানুষ রমাকে চাইছে, একজন তার বুকে হাত দিল, কিন্তু রমাকে পেল না, আরেকজন খুলে ফেলতে চাইল তার পোশাক, কিন্তু রমা তখন তার থেকে অনেক দূরে, বোকা লোকটা জানত না গোটা শরীরটাই তার কবরখানা, আশাকে সে স্বপ্ন বলে ভুল করল, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের মধ্যে কোনো প্রভেদ করতে পারল না, ঘুমের মধ্যে তার জন্ম, যে বাড়িতে এক হাজার বছর ধরে জ্বলছে আগুন সেখানে তার মৃত্যু—ঘাসের জঙ্গলে, তুষার ঝড়ে। পাথর খনিতে কাজ করার সময় সে বিদেশী বইয়ে পড়েছিল পাথর ভেঙে কি তুমি রুটি বানাতে পারো? অমল রুটির কথা ভাবল আর তখনই তার মনে পড়ল রমার কথা। সংসারের প্রতি তার দায়দায়িত্বের বিষয়। মানুষের কাছে সে কোনো কিছু চাইতে পারে না। যে সব মানুষ হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে থাকে অনেক দয়াদাক্ষিণ্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাদের সে চেনে না। অথচ চিনলেও ব্যক্তিগত কোনো দাবী তাদের কাছে সে পেশ করতে পারে না। ফলে সূর্যাস্তের আকাশের দিকে তাকিয়ে, কিংবা ঘরের গুহায় দাঁড়িয়ে অমল বুঝতে পারে ছিটকিনি সে কোনোদিনই খুলতে পারবে না। তবে আরো মনে পড়ল অন্ধকারে ভায়াবহ রেল-বাঁকের দৃশ্য, লাল সিগন্যাল, মৃত গুমটি-ম্যানের পরিত্যক্ত বউটির কথা। আজ রমা ও সে যে বিষুবরেখার দু' দিকে ছিটকে পড়েছে পরস্পরবিরুদ্ধ দুই মাধ্যাকর্ষণের টানে তারও কারণ বোধ হয় এই ছিটকিনি। তার রোগা জন্মভিতু ছেলেকে যে সে ভালোবাসে তার কারণও কি এই নয় যে, কখনোই সে তাকে বিষণ্ণ দেখতে চায় না? মানুষকে ভালোবাসার আগে অন্তত একবারও তাকে দুঃখী ভেবে নিতে হয়!

প্রতিটি ঘর তার নিজের জায়গায় থাকে। বাথরুমের জায়গায় বাথরুম, শোবার ঘর তার নির্দিষ্ট এলাকায়। শুধু মানুষের কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, দুঃখের নেই কোনো স্থির নির্দিষ্ট উৎস। কেউ কারো দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে চলে যায় না, ছিটকিনিই কখনো সখনো বিগড়ে যায়,—বিদ্রোহ করে। যেমন বাথরুমে গিয়ে সদ্যবিবাহিত সমীরবাবুর স্ত্রী বন্দী হয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন আগে এবং কয়েক ঘণ্টা পর তার অচেতন নগ্ন শরীর দরজা ভেঙে উদ্ধার করতে হয় পড়শীদের। অথচ এ রকম হবে কেউ আগে বুঝতে পারেনি। কেউ টের পায়নি যে আগের দিন সমীরবাবুর হাতঘড়িটা চুরি গেছে। জানলার পাশের টেবিলে হাত বাড়িয়ে চোর সেটা নিয়ে গেছে বোঝা গেল যখন সময় দেখার প্রয়োজন হয়েছিলো। অমল জানে সমীরবাবুর ড্রয়িং রুমের ছিটকিনি ভেঙে একদল চোর একবার বেশ কিছু জিনিস হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

আজ রমা ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে তার ছেলে। ওদের মায়ামমতা ও সংসারের প্রতি টান, প্রেম ভালোবাসা চুরি করে মহাসময়ের ঘরে জমা দিচ্ছে কেনো এক চতুর, বুদ্ধিমান চোর যার মুখোমুখি হবার ক্ষমতা অমলের নেই। অমল ভাবল ওদের দুঃখ-কষ্টের জন্যে সে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ওদের জন্যে সে কিছুই করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। অন্ধকারে আজ ওদের বিছানার চারপাশে সে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবল ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে। রমাকে ঘুম থেকে তুলে বলবে আমি জেগে আছি, তুমি জাগবে না? কিন্তু অমল পারল না। তার দু'হাতে কে যেন স্ক্রু এঁটে দিয়েছে মনে হল! অমল ভাবল বাইরে কাজে ও অকাজে কত সময় তার অকারণে

নষ্ট হয়ে যায় যখন ছেলে তার জন্যে একা লুডো বা ক্যারমবোর্ড সাজিয়ে বসে থাকে, সে আসতে পারে না। বাসস্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষায় তার নষ্ট হয় অনেক সময়। এমনকি যে চাকরিতে সে সর্বস্বপণ করেছে তাও খুব অর্থহীন মনে হয় তার কাছে। চাকরির টাকা থেকে তার সংসার চলে না। সন্ধ্যেবেলা অন্য একটা অফিসে নিয়ন আলোর নিচে ঝুঁকে পড়ে তাকে পার্টটাইম আরেকটা কাজ করতে হয়। রমাকে নিয়ে কতদিন সে সিনেমা যায়নি, কতদিন ছেলেকে নিয়ে যায়নি চিড়িয়াখানায়। অমলের নদী ফুল পাখির প্রতি আলাদা কোনো আকর্ষণ নেই। শুধু এক ভালো-লাগা আছে। কিন্তু একটি নারী ও একটি শিশু সমস্ত নারী ও শিশুর প্রতীক হয়ে তাকে আকর্ষণ করে। সে আর দ্বিতীয় কোনো নারী বা শিশুর কথা ভাবতে পারে না। আগাগোড়া বিশ্বস্ত থাকতে চায় অমল তাদের প্রতি। অদম্য এক অধিকারবোধ গড়ে তোলে নিজের মধ্যে। নিজের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অমল নিজেকে দেখে। তখনই তার ক্লান্তি যায় বেড়ে। বাস্তবে সে ব্যর্থ নয়, কিন্তু বেশী তার ব্যর্থতাবোধ, যার অনেকটাই নিছক কাল্পনিক। কল্পনা থেকেই সে কালো ছবি এক তৈরী করে নেয় মনেঃ নদীর প্রাচীন মাছ যে গিলে খেয়েছিলো শকুন্তলার হারানো আংটি, পেটের মধ্যে ধাতব এক বস্তুর অস্তিত্বের অস্বস্থতা নিয়ে ধরা পড়ল জালে। মোহনায় সে আর ফিরে যাবে না কোনোদিন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না স্রোতো কিংবা জাল তার স্বদেশে! শুধু তার অস্বস্থতাটুকু সত্য হয়ে থাকল অমলের কাছে।

অমলের কাছে ভীষণভাবে সত্য আর ভয়াবহ, মানুষের মতো শরীরী রক্তমাংসের এই শহর যা তাকে সময়হীনতার কোলে ছেঁড়া ঘুড়ির মতো ক্রমশ বাতাসের নিচের দিকে টেনে নিচ্ছে। সময় সে বুঝতে পারে না। কথা দিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে না কারো কাছে। সপ্তাহ বা মাস কেটে গেলে মনে হয় যেন একটা দিন বা কিছু শিথিল মুহূর্তের গুচ্ছ সে পিছনে ফেলে এল। নিজের সঙ্গে একান্তে দেখাসাক্ষাতের সময় সে এবার ঠিক করে নেয়। কিন্তু ঠোঁট নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে আজ নয়, অন্য কোনোদিন তাকে ছিটকিনিবিহীন চমৎকার এক বাড়ির সন্ধানে যেতে হবে যে বাড়ির দরজা ও জানলাগুলো সব খোলা, রোদ্রে রোদ্র সেখানে মিশে যায়, ছেলে তার জন্যে সেখানে লুডোর ঘুঁটি সাজিয়ে বসে থাকে কিংবা ক্যারাম বোর্ড, স্ত্রী সারাদিন অপেক্ষা করে স্বামীর জন্যে—শান্ত, সুন্দর সংযত। কিন্তু সেই বাড়িতে যেতে পারে না বলেই নিজের সঙ্গে একটা বিরোধের সম্পর্ক গড়ে ওঠে অমলের। বিরোধ পরিণত হয় যুদ্ধে। হয়ত না হলে বাঁচার কোনো অর্থ থাকতো না। যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজন শক্তিশালী এক প্রতিপক্ষের। সে যুদ্ধ করে বাঁচবে; এই শহরের জীবনযাত্রার মালিন্য আর দীনতা তার প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ সে নিজে।

কাচের অ্যাশট্রের গায়ে সিগারেট ঘষে অমল বহুবার দেখেছে তার গায়ে কোনো ফোসকা পড়ে না। অ্যাশট্রের মতো মনে হয় শহরটাকে। একটা বড় ছাইদানি হিসেবে নিষ্ঠুরভাবে ক্রমাগত ব্যবহার করা হয় তাকে। একদিন বাসে সে ও রমা এসপ্লানেডের দিকে আসছিলো। আলিপুরের পুরোনো জেলখানা আর গুদামের মত বড় কয়েকটা অফিস পেরিয়ে বিকেলের বাস গঙ্গা থেকে বেরিয়ে-আসা খাঁড়ির ব্রিজের দিকে এগোয়। পাশে বস্তি। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু কাদা শুকোয়নি। বস্তি, বাতিল কঙ্কালসার একটা মেয়ে গরীব ছাউনি গুলোর সামনে মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে। মনে হল যেন যক্ষ্মা হয়েছে কিছু শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পাশে। দুপাশে চাপা, ঘিঞ্জি জনবসতি। বাস হঠাৎ এক সবুজ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এল। যে বাড়িগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাস্তাটার গলা চেপে ধরেছিলো, হঠাৎ তারা যেন কোথাও উধাও হয়ে গিয়ে রাস্তাটাকে দুপাশে অনেকখানি চওড়া করে দিলো। যাকে অমল ভেবেছিল সফেন সবুজ সমুদ্র, দেখল তা নয়—বিশাল বিস্তৃত এক রেসকোর্স। এবছরের বর্ষায় ঘাসগুলো খুব সুন্দর বেড়েছে। আজ রেস নেই। জেতার শিকের বেড়াগুলোয় দুয়েক ফোঁটা জল। মুক্তোর মতো। দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। এসপ্লানেড পৌঁছনোর আগে হঠাৎ ওরা এক সুন্দর সাদা মন্দির দেখে নেমে পড়ল তার সামনে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। গেট পেরিয়ে যাবার পথে নরম, রোগা একটি ছেলে ভিক্ষে চাইল ওদের কাছে। সদ্য যেন গ্রাম থেকে এসেছে মনে

হল। কিংবা সে শহরেই আছে গ্রামের অধিবাসী হয়ে। এ আজ কয়েক বছর আগের কথা। তখনো বুবুল আসেনি। ছেলেটিকে ওরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরল অনেকক্ষণ। স্মৃতিসৌধের আয়নার মতো ঝকঝকে সাদা সিঁড়িগুলোয় কাদা লাগল ওর ছোট্ট পায়ের। পায়ের ছাপ পড়ল পাথরে। সাদা মার্বেলের পাশাপাশি কালো মার্বেল। ঘন বুনট দাবা বোর্ডের নকশা। এত পরিষ্কার, তকতকে একটা বাড়ি—কিন্তু কোথায় যেন কিসের অভাব বোঝা যায়। ছবিগুলো শুধু ছবিই। কাঠের আলমারিগুলো বড় বেশী কাঠের। কাচে ময়লা ঘোলাটে আলোর ছায়া পড়ে শুধু। বাইরের সুন্দর বিকেল, চমৎকার পোশাক পরা তরুণ-তরুণী, ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা, শৌখিন নুড়ি পাথরের পথ, মূর্তি, মালা ও জাদুঘরের গাদা বন্দুকের ঠাসাঠাসি ভিড়ে কাদা মাখানো নরম পায়ের ছাপ ওই অসম্পূর্ণতার পরিবেশে আশ্চর্য এক সিম্ফনির সৃষ্টি করল। অন্ধকারে লেকের প্রান্ত ছুঁয়ে ওরা সেদিন অনেকক্ষণ বসেছিল। শিশুটির চোখ নয়, নয় মায়াবী চেহারা, শুধু তার রোগা দুটি পায়ের কথা বারবার ওদের মনে পড়ল। ওই পা ধারণ করে শরীরকে। শরীরের ডানা ধরে ঝুলে থাকে দুটি হাত, যা পৃথিবীর সমস্ত ছিটকিনি খোলে এবং বন্ধ করে। ছেলেটির অপুষ্ট টালমাটাল দুটি পায়ের প্রসঙ্গে অমলের নেহাৎ আকস্মিকভাবেই, কার্যকারণের যোগাযোগ না থাকলেও, প্রথমে একটি ছোট্ট, ভীষণভাবে জ্যান্ত ছিটকিনির কথা মনে পড়ল। ছিটকিনি থেকে সে প্রবেশ করল বস্তুর জগৎ সংসারে যার কেন্দ্রে আছে সৎ ও সরল একটি শিশু ও তার সংকোচহীন স্বাভাবিক ব্যবহার। হাত বাড়িয়ে কিছু চাইতে তার দ্বিধা নেই, অমল যা পারে না, তা সে অনায়াসে পেরেছে—মানুষের মধ্যে ড্রয়ারগুলো সে খুলে খুলে দেখেছে, ড্রয়ারের ভিতর তন্নতন্ন করে দেখেছে রূপোর জরি দেওয়া জামাকাপড়, পুরোনো চিঠির তাড়া ও সিঁদুরে মাখানো গিনি। সমস্ত পৃথিবীর বুকে আলোড়ন তোলে তার পা, পা অর্থাৎ ছিটকিনি, যে জানে স্বর্গের দরজা খোলার মন্ত্র। স্বর্গে সাজানো বেশ কিছু ঝকঝকে টেলিফোন ও অজস্র রবার স্ট্যাম্প। নগ্ন শরীরের ডিম। ডিমের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে প্রেমিকাকে উপলক্ষ করে কে যেন বলল—তুমি কি সেই মেয়ে যে আমাকে আফিম দিয়েছিলে? নেশা না করে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো বেঁচে আছে অমল। কিন্তু কেন বেঁচে থাকা কিংবা জীবনের উদ্দেশ্য কী সে জানে না।

সেদিন লেকের জল ছুঁয়ে বসেছিল ওরা দুজন। বিপরীত স্বভাবের দুটি চরিত্র। বিষণ্ণ আত্মমুখী গম্ভীর অমল। অন্যজন উজ্জ্বল, ব্যস্ত মুখর। ওদের মাঝখানে অদৃশ্য একটা কাচের দেওয়াল। রমা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে দেওয়ালে প্রতিহত হল। কিন্তু বুঝতে পারল না। হয়তো সে কিছুক্ষণ বুকে মাথা রাখল অমলের, কিংবা কাঠের ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল, কিন্তু ঠোঁটের মাংস মাংসের স্বাদ পেলো না, বুকটা যেন ঠাণ্ডা হিম পাথরের চাতাল, কিংবা ফাঁকা তোবড়ানো টিন, আঙুলে টোকা দিলে টপ্ টপ করে শব্দ উঠবে। যে কথাগুলো বলল অমল তারও কোনো পারম্পর্য খুঁজে পেল না রমা—

বড়বাবুর স্ত্রীর ক্যান্সার। জরায়ুতে—বড় সাহেব বিলেত যাচ্ছেন—সেলস প্রোমশন—

নতুন একজন রিসেপনিস্ট নেওয়া হয়েছে অফিসে—

সমস্ত শরীরটা যেন ওর হাওয়া দিয়ে তৈরি—

ছোটবেলায় আমগাছ থেকে পড়ে আমার একবার হাত ভেঙে গিয়েছিল, জানো?—

অমল বোধ হয় কিছু জানাতে চায় রমাকে অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে। পারছে না, গুছিয়ে কোনো একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার মানসিকতাই বোধ হয় তার তৈরি হয় নি। কিংবা একটা চিন্তা থেকে আরেকটা চিন্তা সে খুব দ্রুত পেরিয়ে যায়। মাঝখানের সরু কোমরের মতো ঝর্না বা ছোট টিলা যখন সে লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায় অন্যেরা বুঝতে পারে না। কোনো কিছু সে ব্যাখ্যা করে বলে না। তার পছন্দ নয় কিস্তার, গভীরতার দুয়েকটি ইঙ্গিত সে শুধু ফুটিয়ে তুলতে চায় জীবন দিয়ে। ছোট বেলায় যখন সে গ্রামে থাকত, স্টেশন ছেড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়া মেলট্রেনের কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ তাকে ভীষণভাবে অস্থির করে তুলত। কিছু স্ফুলিঙ্গ আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। অন্ধকার তখন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অমল যখন কথা বলে, কিংবা কোনো কিছু চিন্তা করে, তার মনে পড়ে এই স্ফুলিঙ্গের ছবি। বন্ধুরা যখন লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরায়, অমল গ্রামের হারান মাঝির কথা ভাবে। কে চড় থেকে সে

বের করত চকমকি। বিড়ি ধরাতো। দুটি পাথর ঠুকে ঠুকে তার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে অমলের। যে আগুন শিখাসর্বস্ব, যেখানে থাকে না কোনো স্ফুলিঙ্গ বা প্রাণ তা অমলকে কোনোমতেই আনন্দিত করে না। স্ফুলিঙ্গের মতোই তার জীবন এবং কথাবার্তা যা অনেকের কাছেই অসংলগ্ন মনে হতে পারে।

অমল তুমি কি সুখী? —এক সময় সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে।

সুখী, হ্যাঁ সুখী ছাড়া আর কি?

তুমি কি দুঃখী?

দুঃখ আমার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

কেন সুখী, দুঃখেরই বা কারণ কি?

সুখ না দুঃখের আসল কারণ মানুষ কখনো তলিয়ে দেখে না। যারা দেখে, তারা ওই দুটোরই জাল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বহু বিচার বিশ্লেষণ করেও অমল নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। তার অবস্থা অনেকটা সেই মাছের মতো যে বঁড়শির টানে জলের গভীরে প্রাণপণ এদিক ওদিক ছুটে যায়, যত ছোটে ততই অনুভব করে সুতোর টান, মুক্ত করতে পারে না নিজেকে, শালুকে, শাপলা ও শামুক কাছিমের সুন্দর জগৎ থেকে এভাবে তার বেদনাদায়ক চিরবিদায়ের মুহূর্তে নিদারুণ ব্যাকুলতার মধ্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে। কিন্তু আবার এমনও মুহূর্ত আসে যে, অমল ওই লোভী, সমস্যাপীড়িত মাছের সঙ্গে কোনো-ভাবেই নিজের তুলনা করতে পারে না। রবিবারের দুপুরে একদিন শুয়েছিল বিছানায়। সারা সপ্তাহ জুড়েই তার কাজ। সেদিন সত্যই ছুটি। খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমের মিষ্টি একটা আমেজে সে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। গরমের দিন। খালি গা। ফ্যান ঘুরছে। আলতো নরম আঙুল দিয়ে কে তখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর পিঠে। পাশ ফিরে অমল দেখল বুবুল। ছ' বছরের ছেলে। এখন থেকেই ও সব কিছু জানে। বাবা মার ঝগড়া হলে কষ্ট পায়। দুজনকে থামাতে চেষ্টা করে। মাসের শেষে যখন দেখে অভাব, আবার থালায় নেই বরাদ্দ এক টুকরো মাছ, কিংবা দুধ একটু জলো, সে সব কিছু টের পায়। কোনো কিছুই এড়িয়ে যায় না তার চোখ। তখন সে বিস্কুট বা লজেন্সের জন্য বায়না ধরে না। যা পায় খায়, ঘুমিয়ে পড়ে, খুব ভোরবেলা উঠে নিজে থেকেই মুখ ধুতে যায়, চা, রুটির জন্য অপেক্ষা করে না, বই খুলে পড়ে। কিন্তু অমল ওর এই শান্ত সুন্দর স্বভাবের জন্যেও সুখী হতে পারে না। ভাবে ওর মুখের হাসি সে কেড়ে নিচ্ছে। ওকে আদর করবার সময় অপরাধী মনে করে নিজেকে। কিন্তু সেদিন ছেলে যে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর সে যখন পাশ ফিরে ওকে দেখল কী যেন হলো অ... । বুবুলকে সে কাছে টেনে নিলো—

তোমাকে হাত বুলিয়ে দিতে হবে না, তুমি আমার বুকে এসো।

রমা বিছানার পাশে বসে অমলের মাথার চুলে, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় বুবুল দেখছে। কিন্তু মায়ের অনুকরণ করে সে তার বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়নি, দিয়েছে নিজের মমতায়। বাবা যে সারা দিন বাড়ি থাকে না, ফেরে অনেক রাত করে, এমন কি বহু দিন যে তার বাবার সঙ্গে কথা পর্যন্ত হয় না—এ সব কিছুই কি ছেলেকে তার বাবার প্রতি মমতাশীল, স্নেহময় করে তুলছে? যে মমতা ওই বয়সের ছেলের কাছ থেকে বড় একটা আশা করা যায় না? অমল খুব সুখী হলো সেদিন। বিকেলে বেড়াতে গেল ওরা তিনজন। ছেলে বউ যাতে বাসের ভিড়ে কষ্ট না পায়, অমল একটু বেহিসেবী খরচ করল। আসা-যাওয়ার পথে মিনি বাস নিলো, রেস্টুরেন্টে খেলে আর ছেলেকে কিনে দিল

কিন্তু যখন রাত এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে নিঃসঙ্গতা ও নগ্নতার চরম মুহূর্ত, অমল পুরোপুরি বদলে যায়। যে স্ত্রী তার একান্ত আপন তাকে মনে হয় যেন সে তার নয়। অচেনা মানুষের সঙ্গে যেন পান্থশালায় একটি বিছানা শুধু একটি রাতের জন্য ভাগ করে নিচ্ছে। অমল ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় সারা ঘর। ঘর তো নয়, যেন নদী। ভবজলধি। স্রোতে ভেসে বাইরে ছিটকে পড়তে চায় সে। হাতছানি দেয় ঘাস ফুলে ভরা মাঠ, হেমন্তের কাশবন আর মেঘের রাজবাড়ি। অমল একা যাবে না, সবাইকে নিয়ে যাবে। পুরনো দিনের সুন্দর একটা বাসে চেপে ওরা যাচ্ছে। প্রতি চটিতে থামছে বাস। ঘরোয়া আমেজ। কণ্ডাকটার প্রতিদিনের চেনা যাত্রীদের নিয়ে রঙ্গ-রসিকতায় মেতে উঠছে। বাস গন্তব্যে পৌঁছানো নিয়ে কারো কোনো ব্যাকুলতা নেই। বাসের সীটে বসে আছে মাথায় কাঠের চিরুনি ও টকটকে লাল জবাফুল গোঁজা সাঁওতাল যুবতী, হাট ফেরত ও'রাও যুবক, বাসের মাথায় কয়েক ঝুড়ি তাজা মোরগ-মুরগি, বরজের পান। বাইরে শরতের মেঘ, রৌদ্র, হাওয়া। দূরে গৈরিক ময়ূরাক্ষীর জল। সবুজ ধান মাঠ। জলভর্তি ক্ষেত। মাঝেমধ্যে পাথুরে জমি। বাংলা বিহার সীমান্ত। সুন্দর গাছের ছায়া। গোল করে গাছের তল বাঁধানো। চায়ের দোকান। পাথর কোয়ারির মালিক মোটর বাইক থামিয়ে গল্প করছে পাহারঅলার সঙ্গে। দূরে মাসাঞ্জোরের পাহাড়ে মেঘ। বড় বাঁধের জল তিলপাড়া ব্যারাজে পৌঁছতে সময় নেয় আট ঘণ্টা। জলের মতো নিশ্চিন্ত আরামে বয়ে যায় যাত্রীরা, কোথাও পৌঁছনোর জন্যে তারা উতল হয় না, সন্ধ্যায় ফিরবে বলে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে এসে বসে থাকে বাসস্ট্যাণ্ডে। কিন্তু ওদের মতো অমলের যাওয়া হয় না, শুধু একটা ছিটকিনি খুলতে পারেনি বলেই। অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য যে সামান্য একটা ছিটকিনিই অমলের জীবনে প্রবলতম বাধার সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু এই ছিটকিনিই সে খুললো। হঠাৎই তাকে দিয়ে যেন কেউ খোলালো বাইরে থেকে। ঘুমের মধ্যে হাঁটছে অমল, বিছানার চারপাশে, ড্রেসিং টেবিলের পিছনে গোল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় কড়া নড়ে উঠল দরজায়। কে ডাকছে, দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছে বাইরে থেকে। সম্বিত ফিরে পেল অমল। ছিটকিনি খুলল। কোনো কষ্ট হল না, এতটুকুও ভয় পেল না সে। বাইরে দাঁড়িয়ে রহস্যময় এক ডাকপিওন। তার হাত থেকে বরফের ধোঁয়া মেশানো, ঠাণ্ডা সাদা সরবতের মতো টেলিগ্রামটা অমল চেয়ে নিল। টেলিগ্রামটা ফিরে গেল আবার পিওনের হাতে। ভুল ঠিকানায় ভুল মানুষের টেলিগ্রাম।

চিনি না।

আমিও নতুন—মনে মনে বলল অমল। এক পাড়ায় একাদিক্রমে বহু বছর থাকলেও সে নতুন। পড়শীদের কাউকেই চেনে না, দেখাসাক্ষাৎ হয় না কারো সঙ্গে। অমল দেখল টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে ডাকপিওন সাইকেলে উঠছে। টেলিগ্রামটা লাল। অমল নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল মরচে পড়েছে। মরচের রঙে লাল হয়ে গেছে টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটাকে ওর শরীরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে হয় এবার। ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে টেলিগ্রামটা চলে যাচ্ছে দূরে—ক্রমশ তার নাগালের বাইরে। ওকে ডাকবে, অমল ভাবল। কিন্তু ডাকল না। যে চলে যাচ্ছে সে আর ফিরে আসবে না। ছিটকিনি লাগালো অমল।

এবার বাড়ি ফেরার পথে, ঘরের ভেতর সে ভাবলো যে গল্পটা নিজের মধ্যে লেখা শুরু হয়েছিল এতদিন, এর পর তাকে এভাবেই আরম্ভ করবে। অর্থাৎ শেষ থেকে। হারিয়ে যাবার জন্যেই চিরদিন লেখা হয়ে থাকে মানুষের হৃদয় নামক রহস্যময়, রঙিন শতচ্ছিন্ন আকাশে।

ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি

কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে তৈরি এক একটি গ্যালাকসি বা ব্রহ্মাণ্ড। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড ওই সব নক্ষত্রদের বয়ে নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করছে। ওদের গতিবিধি, গঠনবৈচিত্র্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সমস্ত রকমের তথ্যের জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হয় নানা রকম বিকিরণের ওপর। এই বিকিরণের মধ্যে পড়ে সাধারণ আলো বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ যে আলোর সাহায্যে আমরা আমাদের চারপাশের বস্তুজগৎকে দেখতে পাই, সেই আলো। এ ছাড়া রয়েছে অবলোহিত রশ্মি, অতিবেগনী রশ্মি, একস-রশ্মি, বেতার তরঙ্গ এমন বহু রকম বিকিরণ। এই সব বিকিরণের মত্র, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং গতিমুখ দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারেন ওই বিকিরণের উৎসটি কত বড়, কোথায় অবস্থান করে এবং তার চরিত্রই বা কি রকম।

কথাটা শুনতে খুবই সহজ, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখতে গেলে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। হসপিটালে চিকিৎসার জন্যে আমরা একস-রশ্মি ব্যবহার করি। এই একস-রশ্মি তৈরির জন্যে দরকার হয় হাজার হাজার ভোল্টের মত উচ্চভোল্টেজ। দরকার প্রচণ্ড পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি। আর তাতেই হিমসিম খাওয়ার মত অবস্থা। অথচ সুদূর নক্ষত্রলোকের কথা ভাবুন। বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রচুর নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে (আমাদের সূর্যও তাদের মধ্যে পড়ে), যারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একস-রশ্মি বিকীর্ণ করে চলেছে আবহমানকাল ধরে। কথাকে আপত্তি নেই। কিন্তু গোল বাধে তখনই, বিজ্ঞানীরা যখন হিসেব করতে বসেন ওই সব নক্ষত্রের একস-রশ্মির উৎসটি কত বড় বা কত শক্তিশালী তা নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, ওই সব উৎসের ক্ষমতা কত প্রচণ্ড হলে মহাজগতের শতেক বাধা কাটিয়ে কোটি কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ওই উৎস থেকে সৃষ্ট একস-রশ্মির পক্ষে পৃথিবীর পরিমণ্ডল পর্যন্ত এগিয়ে আসা সম্ভব? শুধু একস-রশ্মিই নয়, এ প্রশ্ন দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে ছুটে আসা বেতার তরঙ্গ এবং অন্যান্য বিকিরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীরা নানা রকম যুক্তি দাঁড় করিয়ে এ সম্পর্কে প্রচুর ব্যাখ্যাও তুলে ধরেছেন। ব্যাখ্যাগুলি জোরালো করার জন্যে তথ্যও জুগিয়েছেন যথেষ্ট। সম্প্রতি তার একটা নমুনা পাওয়া গেল।
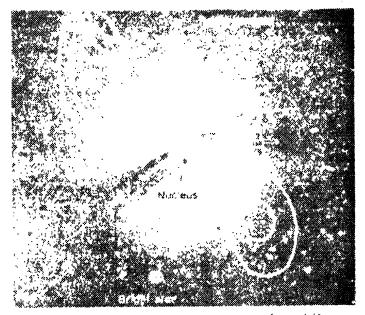
অ্যাঙ্গলো-অস্ট্রেলিয়ান দূরবেক্ষণে ধরা সেনটারস-এ গ্যালাকসির ছবিটি লক্ষ করুন। উপবৃত্তীয় এই গ্যালাকসিটির কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস। ব্যাস বরাবর ধূলিপথ। ধূলিপথের দুপাশে বেতারশক্তির দুটি উৎস সাদা বৃত্তের সাহায্যে দেখান হয়েছে। নিউক্লিয়াসের পেছনে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কোটি সূর্যের আভা

বেশ কিছুকাল ধরে সেন্টরাস-এ—এই গ্যালাকসিটির শক্তির উৎস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আসছেন জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীরা। গ্যালাকসিটির কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসছে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নানা রকম বিকিরণ। তাঁদের প্রশ্ন, এই অস্বাভাবিক বিকিরণের যিনি উৎস, তাঁর স্বরূপটি কি রকম?

একটি অতিকায় 'ব্ল্যাকহোল'! যার ভর প্রায় আমাদের এক কোটি সূর্যের ভরের সমান। সেন্টরাস-এ গ্যালাকসি থেকে অত্যন্ত তীব্র যে একস-রশ্মি নির্গত হচ্ছে তার উৎস এই 'ব্ল্যাক হোল'। নেচার পত্রিকায় (খণ্ড ২৬০, ৬৮৩ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এ মন্তব্য করেছেন কেমব্রিজ ইনসটিটিউট অব অ্যাসট্রনমির চারজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্নল্ড ফাবিয়ান, দারিও ম্যাককগান, মার্টিন রিজ এবং উইলিয়াম স্টেগার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীদের মতে, কোন কোন নক্ষত্র তাপপরমাণবিক সংযোজন পদ্ধতিতে তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলার পর সংকুচিত হতে শুরু করে এবং অবশেষে পরিণত হয় ছোট ছোট এক একটি জ্যোতিপিণ্ডে। এদের বলা হয়, 'ব্ল্যাকহোল'! আমাদের সূর্য যদি 'ব্ল্যাকহোল'-এ পরিণত হয় তার ব্যাস গিয়ে দাঁড়াবে মাত্র তিন মাইলের মত। ব্ল্যাক-হোলের মাধ্যাকর্ষণ বল প্রচণ্ড। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করে বস্তুকণা তো দূরের কথা, সাধারণ আলো থেকে শুরু করে বেতার তরঙ্গ, একস-রশ্মি প্রভৃতির মত যাবতীয় বিকিরণের পক্ষে ব্ল্যাকহোলের পরিমণ্ডল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে সেন্টারাস-এ নামক এই জ্যোতির্মণ্ডলটি আবিষ্কারের পরমুহূর্ত থেকেই যথেষ্ট বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এখান থেকে নিয়মিত বিকীর্ণ হচ্ছে দৃশ্যমান আলো, বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত এবং একস রশ্মি। তুলনায় যাদের তীব্রতা অনেক বেশি। দৃশ্যমান আলোর মাধ্যমে দেখলে গ্যালাকসিটিকে দেখায় কতকটা উপবৃত্তের মত। উপবৃত্তটির কেন্দ্রস্থল তীব্র জ্যোতিচ্ছটায় ভাস্বর। দেখলে মনে হয় কে যেন সেখানে লক্ষ লক্ষ সূর্যের মালা গেঁথে রেখেছে। অথবা লক্ষ

শরৎচন্দ্রের সম্পাদক হওয়া

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২-১-৭৭-এর দৈনিক বসুমতীতে শ্রীদ্বিজেন ঘোষের 'শরৎচন্দ্র কি সম্পাদক হতে চেয়েছিলেন' লেখাটি পড়ে বহুদিন পূর্বের (প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের বেশী হবে) একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এত দীর্ঘ দিন কেটে গেলেও, এই বৃদ্ধ বয়সেও সে সব কথা স্পষ্ট মনে পড়ে; মনে হয়, ঘটনাটি যেন চোখের সামনে ভাসছে।

১৯২২ কি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কথা. শরৎচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজো উপলক্ষে ভাগলপুরে মামার বাড়িতে এসেছেন। প্রায় প্রতিবারই পূজোর কয়েক দিন আগে এসে দিন আট-দশ থাকতেন।

বাড়ির একদিকে পূজোর ব্যাপার নিয়ে হই-হল্লা-সমারোহ. ওদিকে পূজো উপলক্ষে কি কি উৎসব হবে—গান-বাজনা, ছোটদের নাটক ইত্যাদি নিয়ে কর্মব্যস্ততা। অন্য দিকে শরৎচন্দ্রকে ঘিরে সাহিত্যিকমণ্ডলীর জম-জমাট আড্ডা।

শরৎচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ (ডাক্তার) শরৎচন্দ্রের তিন মামা এবং আরও এক মামা উপেন্দ্রনাথও এসে পড়তেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভাগ্নে এবং শরৎচন্দ্রের মাসতুতো ভাই ও ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যাঁর ডাক নাম ঝড়ু, মামাদের ঝড়ু, আমাদের ঝড়ুদা) দেবার উপস্থিত।

নানা আলাপ-আলোচনার মধ্যে কথায় কথায় তাঁদের ছেলে বয়সের হাতে-লেখা পত্রিকা ছায়া-র কথা ওঠে এবং তা নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়।

কথাবার্তার মাঝে শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করেন, আমাদের পারিবারিক কাগজ হিসেবে এসো আমরা একটা কাগজ বের করি। ছাপা লেখা তো প্রায় আমাদের সকলেরই বেরিয়েছে, বেরোচ্ছে, বেরোবেও। কিন্তু আমার ইচ্ছে আমরা একটা হাতে-লেখা কাগজ বের করি।

সকলেই সানন্দে সম্মতি দেন।

শরৎচন্দ্র বলেন, তাহলে এই জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনই এসো তার গোড়া-পত্তন করে ফেলা যাক।

সুরেন্দ্রনাথ হেসে বলেন, তোমার সবই তড়ি-ঘড়ি ব্যাপার! হঠাৎ খেয়াল হলো—অমনি সঙ্গে সঙ্গে এখনই করে ফ্যালো। সেটা কতদূর সম্ভব, আদৌ সম্ভব কিনা তা তো ভেবে দেখবে না—একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়বে।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, অসম্ভব আবার কি! অসম্ভবকে সম্ভব করে নেওয়া তো আমাদেরই হাতে। এখনও হাতে পাঁচ সাত দিন সময় রয়েছে।

গিরীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বলেন, বেশ তাই হোক, তুমি তোমার লেখা দাও. আমরাও লেখা দিচ্ছি, কিন্তু সম্পাদনা তোমাকে করতে হবে। লেখা কে কে দেবে?

শরৎচন্দ্র কেন, তুমি সুরেন উপীন সত্য ঝড়ু শচী এতগুলো লেখা হলেও এক কপি হবে না?

গিরীন্দ্রনাথ বলেন. আর তুমি বাদ?

শরৎচন্দ্র—আঃ আমি তো সম্পাদক!

সকলে হো হো করে হেসে ওঠেন।

শরৎচন্দ্র এতক্ষণ এসব আলোচনা বড় ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতেই করছিলেন। পরে তাঁর ইজি-চেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বলেন, সুরেন ঠিকই বলেছে, আমার যখনই যা খেয়াল হয় তখনই সেটা করে ফেলার জন্যে মনে একটা ছট-ফটানি জাগে। এই স্বভাবের জন্যে আমাকে জীবনে অনেক ধাক্কা খেতে হয়েছে, আমার অনেক কাজ পণ্ড হয়ে গেছে।

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, এ কথাটা ঠিক হলেও একটা জিনিসে কিন্তু তোমার অদ্ভুত ব্যতিক্রম আছে।

সে আবার কি? শরৎচন্দ্র সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তুমি খুব ভালো করেই তা জানো! লেখার বিষয়ে তোমার সংযম ও ধৈর্য কখনও হারায় না।

ও: এই? হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্র বলেন—ও কথা এখন থাক। এখন এই কাগজ বের করার কথা নিয়ে ভেবে দেখছি তোমরা ঠিকই বলেছ, এত তাড়াতাড়ি কাগজ বের করা সম্ভব নয়। এবার তোমরা যা বলো আমি তাতেই রাজী!

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, হঠাৎ খেয়াল বদলে গেল কিসের জন্যে—লেখার ভয়ে না সম্পাদক হবার ভয়ে?

আবার হাসির রোল ওঠে।

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, আমরা কথা ঠিকই রাখবো—এখন তোমার মতিস্থির থাকলেই হয়।

গিরীন্দ্রনাথ—তুমি আগে লেখা দেবে, তবে কাগজ কবে বের করা হবে তা স্থির করা হবে।

শরৎচন্দ্র বলেন, এক মাস সময় পেলে আমি একটা ছোট গল্প ও একটা ধারাবাহিক উপন্যাস দিতে পারি।

গিরীন্দ্রনাথ বলেন, এই পাঁচ-সাত দিনে আর কি কি লেখা দিতে পারতে?

সেটা সম্পাদকের বিবেচনাধীন থাকতো!

আবার হাসি।

এবার ঠিক হয়, কে সম্পাদক হবে! সকলে একবাক্যে শরৎচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করেন। শরৎচন্দ্র বলেন, এক কাজ করলেই তো এ সমস্যা সহজে মিটে যায়। বাই টার্ন একজন করে সম্পাদক হোক—তিন মাস করে এক-একজন, সুরেন গিরীন উপীন ও আমি।

উপেন্দ্রনাথ বলেন, তা না হয় হলো। কিন্তু প্রথম সম্পাদক তুমি হও শরৎ। কেননা প্রস্তাবটা তোমারই! লেখক হিসেবে তোমার পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি কাগজ সম্পাদনা করতে ইচ্ছুক এবং একজন প্রবীণ সম্পাদক—লোকে সেটাও জানুক।

শরৎচন্দ্র বলেন, কোন পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করার ইচ্ছে আমার বহুদিনের এবং বহুবারই তা হয়েছে, কিন্তু ঠিক যোগাযোগ ঘটে ওঠেনি, আর আমার জীবনের মারাত্মক দোষ হলো কুঁড়েমি—নইলে আমি আরও অনেক লিখতে পারতুম সম্পাদকী করা তো দূরের কথা। এবার আমাদের কাগজের সম্পাদনায় আমি তা তোমাদের দেখিয়ে দোব। কিন্তু প্রথমবার গিরীনই সম্পাদক হোক, ও পাকা ও পুরনো সম্পাদক—আমাদের প্রথম হাতে-লেখা কাগজের সম্পাদকও ঐ গিরীনই ছিল।

সম্পাদক বাই টার্ন মন্দ প্রস্তাব নয়, সকলেই সম্মত হলেন। কাগজের নাম 'ছায়া'ই বজায় থাকে—এবং প্রথম ছায়ার সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথই ছিলেন—তাই তাঁকেই এ ছায়ারও প্রথম সম্পাদক [illegible]চন করা হয়।

গিরীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তখন পাটনা জিলার বিহার-শরীফ মহকমায় যথাক্রমে মুনসীফ ও সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার।

এর পর কি কি বিষয় লেখা থাকবে তারও আলোচনা হয়। স্থির হয়, ছোট এবং বড় গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী সাময়িকী সম্পাদকীয় ইত্যাদি সবই থাকবে—যেমন প্রথম শ্রেণীর কাগজে থাকে, এবং এসব লেখা ছাপানো হবে না।

এ প্রশ্নে কেউ কেউ আপত্তি তুললেও কোন মীমাংসা হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে তাঁকে বাদ দিতে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র জোর করে বলেন—না-না, একজনের মধ্যে কাউকেই বাদ দেওয়া চলবে না। সময় করে নেবে, এবং তোমার ডাক্তারী অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্প লিখবে, খুব ভালো হবে—বেশ ইনটারেস্টিংও হবে, ঝড়ু, তুইও তো লাইনের, ঐসব বিষয়ে যা পারিস লিখবি।

[illegible] কি লিখবি?

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, শচী তো গিরীনের কাছেই থাকে, ওকে সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া ও তো নিজেই একটা কাগজের সম্পাদক, ওদেরও একটা হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা আছে 'মালতী'। ওদের কাগজের নিয়ম একজন করে সহ-সম্পাদক থাকে, প্রতি মাসে সহ-সম্পাদক বদলে যায়—ওরাও পাঁচ-সাত জনে মিলে কাগজটি চালায়; মন্দ চালায় না, প্রায় বছর ঘুরতে চল্লো। আমিও মাঝে মাঝে লিখি, উপীনের লেখাও বোধহয় জোগাড় করেচে। বেশ জোগাড়ে আছে ওরা—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখাও জোগাড় করেচে, 'মালতী'র লেখক সংখ্যা বেড়েই চলেচে। পড়ে দেখো, আনন্দ পাবে।

শরৎচন্দ্র বলেন, দিস্ তো তোদের মালতী দু-এক সংখ্যা পড়ে দেখবো। সুরেন যখন ভালো বলচে, তখন নিশ্চয় ভালোই হবে। ভবিষ্যৎ লেখক, সম্পাদক তো তোরাই হবি রে!

সব ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের লেখা ছাড়া আর সকলেরই লেখা যথা সময়ে বিহারশরীফে পৌঁছে গেল। শরৎচন্দ্রের কাছে তাগাদার পর তাগাদা গেল, কিন্তু কোন উত্তর এলো না। সময় পেরিয়ে যায়—ছায়ার সব লেখা প্রস্তুত, বাকী শুধু শরৎচন্দ্রের লেখা।

অবশেষে একদিন তাঁর চিঠি এলো—এবারে আমাকে বাদ দিয়েই কাগজটা বের করো, আসচেবারের সব দায়িত্ব আমার এমন কি সম্পাদকেরও,—এবারে নানা কারণে সময় করে উঠতে পারলুম না।

কিন্তু সে দায়িত্ব কোনদিনই তিনি পালন করতে পারলেন না। ক্ষণজন্মা 'ছায়া'র অস্তিত্ব প্রথমবারের মতো এবারেও লোপ পেল। বছর ঘুরে গেলেও নিজের কথা তিনি রাখতে পারলেন না।

পরের বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের তীব্র আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নির্বিকারচিত্তে গড়গড়ায় টান দিতে দিতে শরৎচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলেন, পরে সব বলবো।

সুরেন্দ্রনাথ হেসে বলেন, তোমার ওসব বাক্-চাতুরী আমাদের জানা আছে। এত আগ্রহ দেখিয়ে কাগজ বের করবার প্রস্তাবই করলে কেন! এদিকে সম্পাদকের দায়িত্ব নেবার কথাও বলেছিলে। অথচ একটা লেখা দিয়েও কাগজের সৌষ্ঠব বাড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত করলে না।

শরৎচন্দ্র সাগ্রহে বলেন, তোমরা সকলে লেখা দিয়েছিলে?

হাঁ সকলেই, এমন কি ঝড়ু বেচারাও তোমার কথায় চিকিৎসা-বিষয়ে বেশ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল।

কই দেখি!

গিরীন্দ্রনাথ হস্ত-লিখিত ছায়ার প্রথম ও শেষ সংখ্যাটি শরৎচন্দ্রের হাতে দেন।

শরৎচন্দ্র সেটি নিয়ে পড়তে শুরু করেন। আগাগোড়া সব লেখাগুলি আগ্রহ-সহকারে পড়ে বলেন, বা! চমৎকার কাগজ হয়েছে ; সব লেখাগুলিই ভালো হয়েছে, যেকোন প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। গিরীন তোমার সম্পাদকীয় লেখাটি অতি চমৎকার!

গিরীন্দ্রনাথ বলেন, তোমার চেয়েও?

শরৎচন্দ্র—সেটা আমার টার্ন এলে করে দেখিয়ে দেব। আচ্ছা আবার সকলে লেখা দাও, এবারের সম্পাদক আমিই হলুম।

গিরীন্দ্রনাথ বলেন, তাহলে এবারে ছায়ারও ইতি হলো।

শরৎচন্দ্র লজ্জিত হাসি হেসে বলেন, আরে না না, এবার তোমরা ঠিক দেখে নিও।

কিন্তু তাঁর সে কথা কোনদিনই আর কার্যে পরিণত হলো না।
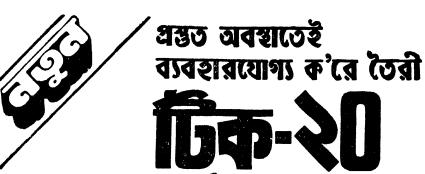
পরশাসিত বুদ্ধিবাদ

সোমদেব শর্মা

"আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন।' কথাগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজ থেকে প্রা দুই দশক আগে, তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে।

'পরশাসিত বুদ্ধিবাদ' এই শিরোনামায় দেশ পত্রিকার ২১শে ফাল্গুনে (১৩৮৩) তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের ঐ কথাগুলি মনে পড়ে গেল।

শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এদেশের বুদ্ধিজীবীদের খোঁটা দিয়ে বলেছেন যে তারা 'ইনটেলেকচুয়াল কলোনিয়ালিজম' থেকে মুক্ত হতে পারেনি। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমাদের পরশাসনের অবসান হয়েছে, অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও পরবশতা ঘুচতে চলেছে, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা আজও পশ্চিমের ভাবধারার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি, প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ এইটই।

ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেটা "কোনো রাজনীতিক তত্ত্বের অধীন বিষয় নয়।" প্রধানমন্ত্রীর সেদিনের বক্তৃতা যাঁরাই সংবাদপত্রে পাঠ করেছেন, তাঁরাই কিন্তু জানেন যে তাঁর এই অভিযোগের উপলক্ষ ও বিষয়বস্তু মুখ্যত এক রাজনীতিক তত্ত্ব। স্বাধীনতালাভের পর আমরা যে সংবিধান গ্রহণ করেছিলুম তাতে এক নিয়মতান্ত্রিক সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়েছিল। যে বছর ঐ সংবিধান প্রণীত হয় সেই বছরেই ইংরেজ মনস্বী লেখক আরনেস্ট বার্কার Principles of Social and Political Theory নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধটি উদ্ধৃত করে বলেন যে ঐ মুখবন্ধে ঘোষিত আদর্শ ও নীতিগুলিই তাঁর গ্রন্থের আলোচিত বিষয়। ঐ আদর্শগুলি নিঃসন্দেহে পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত; কিন্তু বার্কার সেদিন বলেছিলেন যে স্বাধীন ভারতের জনগণ তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক জীবন শুরু করলে ঐ আদর্শগুলিকে বরণ করে তাতে প্রমাণিত হলো যে ঐ ঐতিহ্য আর শুধু পশ্চিম ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ নেই, তা আজ বিশ্বজনীন। এবং একথা ভেবে বার্কার সেদিন গর্ববোধ করেছিলেন।

বার্কার গর্ব অনুভব করলেও ইদানীং এদেশের রাষ্ট্রনেতারা যেন ঐ রাষ্ট্রনীতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বেশ অস্বস্তি অনুভব করছেন; তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন ঐ ঐতিহ্যকে এদেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে। বেশ কিছুকাল ধরেই এদেশের শাসক দলের মনোভাব ও আচরণে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতি এক অবজ্ঞা ও অসহিষ্ণুতার ভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন নেমে এল সেই চরম আঘাত যার ফলে এদেশের মানুষ হারালো বাক স্বাধীনতা ও অন্যান্য মানবিক অধিকার। সংবিধানের সংশোধন করে তার মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরিবর্তে সংসদীয় সার্বভৌমত্বের নামে শাসক দল ও তার নেত্রীর একাধিপত্যই কায়েম করার চেষ্টা হল। যাঁরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর এই আঘাতকে নীরবে মেনে নিতে পারলেন না, তাঁদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হলো দেশদ্রোহী সমাজবিরোধী এইসব অপবাদ দিয়ে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বড়ুয়া বলছেন শ্রীমতী গান্ধীই ভারতবর্ষ। দেশের জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা মূর্তিমতী হয়েছে তাঁর মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন তাঁকে সমালোচনা করার অর্থ দেশদ্রোহিতা। তাঁর ইচ্ছাই হবে দেশের চূড়ান্ত আইন!

আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দার্শনিক পণ্ডিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ১৯৬০ সালে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র নেই, সেইসব দেশে রাষ্ট্রনেতাদের কথাই আইন হয়ে দাঁড়ায়; তাঁদের ইচ্ছাই জনগণের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়। ফলে সেইসব দেশে মানুষের চিত্ত হয় কলুষিত; তাদের আত্মিক অধঃপতন ঘটে।' ...আমরা যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে অভ্রান্ত বলে মনে করি তবে রাজনীতিক দমনপীড়ন সমর্থন পায়। তখন যারাই ঐ ব্যক্তিবিশেষের চাটুকারিতায় অসম্মত হয়

তাদেরই নির্বাক করে দেওয়া হয়; ঐ বিশেষ ব্যক্তির বিরোধিতা ও সমালোচনা করা তখন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হয়।' একদিন যে তাঁর স্বদেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছাকেই সমগ্র দেশের ওপর চাপানোর চেষ্টা হতে পারে, এ আশঙ্কা সেদিন তাঁর মনের কোণেও স্থান পায়নি সম্ভবত। কারণ তাঁর ভরসা ছিল ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে স্বীকৃত আদর্শগুলি।

আজ সেই আদর্শগুলিকেই অস্বীকার করা হচ্ছে, কারণ ওগুলি পশ্চিম থেকে আমদানী। আজ যাঁরা পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতির মাপকাঠিতে এদেশের সদ্য মাথা-চাড়া দেওয়া স্বৈরতন্ত্রের সমালোচনা করছেন, প্রধানমন্ত্রীর খোঁটার পাত্র তারাই। তাঁদের লক্ষ্য করেই প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তাঁদের মানসিকতায় রয়েছে 'পরশাসিত বুদ্ধিবাদ'। প্রধানমন্ত্রীর অনুগামী একদল বুদ্ধিজীবী তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন, পশ্চিমের লিবারেল গণতন্ত্র, হোয়াইট-হাউস হোয়াইট হলের ছাপ মারা গণতন্ত্র এদেশে চলতে পারে না।

কথাটা নতুন নয়। পশ্চিমেরই কোনো কোনো উন্নাসিক পণ্ডিত বহু দিন থেকেই বলছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র—এ সব উন্নত, সভ্য দেশের অলঙ্কার। এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নত, অসভ্য দেশগুলিতে ওসব অচল। আমরা আজ তাদের এই অবজ্ঞাকেই শিরোধার্য করতে চলেছি কোন স্বাদেশিকতার গৌরবে? পশ্চিমী পণ্ডিত গানার মিরডাল (Gunner Myrdal) যখন বলেন ভারতবর্ষের মতো দেশে দারিদ্র্য দূর করতে হলে পশ্চিমী গণতন্ত্রের মতো 'নরম' রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চলবে না, ও-সব দেশে এখন দরকার 'কড়া' রাষ্ট্রব্যবস্থা, তখন তাঁর এই 'নির্দেশ' মহা উৎসাহে লুফে নেন এদেশের কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী কোন্ স্বাজাত্যবোধ ও স্ব-শাসিত বুদ্ধিবাদের নির্দেশে?

পশ্চিমী সভ্যতা থেকে আমদানী-করা আদর্শের মাপকাঠিতে এ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যাচাই করার দুঃসাহস যদি আদমের আদিম পাপের মতোই এক সাংঘাতিক অপরাধ বলে আজ বিবেচিত হয়ে থাকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনিয়ামকদের হঠাৎ জেগে-ওঠা স্বাদেশিক বুদ্ধিতে, তা হলে এই আদিম পাপের দায়ে অভিযুক্ত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয় যে রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পিতা স্বয়ং জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত অনেককেই!

শান্তিনিকেতনের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা যে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে কম ছিল না, ভরসা করি এমন অভিমত

সেই মানুষটি কিন্তু একদিন অসংকোচেই, 'পরশাসিত বুদ্ধিবাদের' খোঁটা উপেক্ষা করেই বলতে পেরেছিলেন; "যখন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়, আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা...। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা, আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য; তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্ম পরিবর্তনে।... য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ বিধির সার্বভৌমিকতা; আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রকারের নির্দেশে কোনো চির-প্রচলিত প্রথার সীমা বেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে কোনো চেষ্টা করছি সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনোদিন মোগল সম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে, যে-তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, 'A man is a man for a that'.
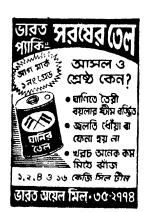
যে-তত্ত্বের জোরে সেদিন আমরা রাষ্ট্রিক স্বাধিকারের দাবি জানিয়েছিলুম, সে তত্ত্বটা নিঃসন্দেহেই পশ্চিম থেকে পাওয়া, পশ্চিমের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ঘটার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে এক নূতন ভাবধারা এদেশের মানুষের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেদিনের সেই চিত্ত-জাগরণ এ দেশের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের সূচনা; আর ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, সেদিন য়ুরোপের সংস্পর্শে এসে আধুনিককালের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না হলে আমরা পেতুম না এক নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শ। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা যখন ঐ আদর্শেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আমাদের রাষ্ট্রজাতিক সত্তা, তখন তাঁরাও বার্কারের মতোই উপলব্ধি করেছিলেন, ঐ আদর্শ আজ আর একান্ত পশ্চিমের নিজস্ব সামগ্রী নয়, বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষের অভীপ্সার অভিব্যক্তিই ঘটেছে ঐ আদর্শে।

এ দেশের রাষ্ট্রিক চিন্তার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস না জেনেও এ দেশের রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়া অধুনা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। বিচিত্র ব্যাপার এই যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়েই, অনুমান করি কেবল পদাধিকার বলেই, এদেশের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়কে খারিজ করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা চলে, যে ঐতিহ্যের সার্থকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এবং সেই ধৃষ্টতাকে ধিক্কার না জানিয়ে যখন এদেশের খ্যাতিসম্পন্ন এক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাকে সাধুবাদ জানানো হয়, তখন দেশের মানসিক দুর্গতির পরিব্যাপ্তি ও আত্মিক অধপতনের গভীরতা দেখে নিশ্চয়ই 'প্রসন্ন গর্ববোধ' অনুভব করি নে, স্বভাবতই দুঃখে ও লজ্জায় অধোবদন হই।

একদিন এক উৎকট স্বদেশিয়ানায় উন্মত্ত হয়ে আমরা বলেছিলুম, "বিদেশী কাপড় অপবিত্র, অতএব তাকে বর্জন করো।" রবীন্দ্রনাথ সেদিন সেই উন্মত্ততাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও। তিনি সেদিন বিদেশী বর্জনের দাবির মধ্যে এক সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন; বলেছিলেন, আধুনিককালে "প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্যে যে চিন্তা করতে হবে তা সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎ

জোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।" বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই শিক্ষারই সাধনা তিনি করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন, "আজ এই বিশ্ব-চিত্ত-উদ্বোধনের প্রভাবে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে আমাদের দীনতা প্রকাশ করা হবে।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পরে তাঁরই হাতে গড়া শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণ থেকে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী (একদিন তিনি এই বিদ্যায়তনেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন, শোনা যায়।) আজ ঘোষণা করেছেন 'বিদেশী চিন্তা অপবিত্র, এদেশের পক্ষে ক্ষতিকর, অতএব তাকে বর্জন করো।' এবং যারা আজও পশ্চিমের রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি জানিয়ে বলছেন, এদেশের মাটিতে তাদের স্থান নেই। এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখে এ ধরনের উক্তি কতখানি শোভন ও সমীচীন, এ প্রশ্ন তোলাও সম্ভবত আজ পরশাসিত বুদ্ধিবাদ দুষ্ট আচরণ বলে নিন্দিত হবে।

প্রাচীনকালে এদেশের মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছিল: 'শ্রুতি ও স্মৃতি হতেই ধর্ম প্রকাশিত, সেইজন্য এ দুই শাস্ত্র তর্কের দ্বারা মীমাংসার বিষয় নয়। যে দ্বিজ যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই দুই মূল শাস্ত্রের অবমাননা করবে, সেই বেদ নিন্দুক নাস্তিককে সাধুগণ সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করবেন।' (মনু, ২।১০-১১) আজ তথাকথিত 'পরশাসিত' বুদ্ধিবাদীদের 'পাষণ্ডী পড়ুয়া' বলে বিদ্রূপ করার যে রেওয়াজ শুরু হচ্ছে, তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিধান মনুর বিধানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতালাভের তিরিশ বছর পরে আমরা কি তবে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্যকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার মনুর যুগে ফিরে যাব। সেকুলারিজমের জয়ধ্বনি দিতে দিতে?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর A vision of Indian History শীর্ষক এক ইংরেজি প্রবন্ধে বলেছেন যে তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসেন এ কারণে নয় যে ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ড সম্পর্কে তিনি এক ধরনের ভৌগোলিক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী, অথবা দৈবক্রমে তিনি ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর অনুরাগের কারণ এদেশের শাশ্বত বিশ্বজাগতিকতার সাধনা। তিনিও একদিন এক গৌরববোধের কথা বলেছিলেন, তবে তা নিছক 'দেশীয়তা' বা 'ভারতীয়' বলে পরিচয়ের গৌরব নয়। তিনি বলেছিলেন সীমাহীন আত্মকর্তৃত্বের চর্চা তার পরিচয় তার সম্বন্ধে গৌরববোধের কথা। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, এই গৌরববোধ 'জনগণধারণের

মধ্যে ব্যাপ্ত হলেই তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।' (স্বরাজসাধন) ভারতবর্ষে জন্মেছি বলেই এদেশ আমার হয়ে ওঠে না ব এদেশ সম্পর্কে 'প্রসন্ন গর্ববোধ' জাগে না। কেবলমাত্র জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করার জনাই একজন আইনস্টাইন বা ফ্রয়েড বা টমাস মান্-এর পক্ষে হিটলারের জার্মানী সম্বন্ধে প্রসন্ন গর্ববোধ অনুভব করা সম্ভব ছিল না। 'মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি—এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ। (সত্যের আহ্বান) সৃষ্টি শক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলার কথাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আজ রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পরশাসন-মুক্ত হয়েও এদেশের মানুষ 'সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চার' অধিকার হারাতে বসেছে। যদি দেশের মধ্যে নির্ভয় আত্মপ্রকাশের সব পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির রাশ টেনে ধরে শুধু রাষ্ট্রনিয়ামকদের নির্দেশ পালনেই আমাদের বাধ্য করা হয়, তবে 'সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলার' সুযোগ থেকেই আমরা বঞ্চিত হব। সেইটাই হবে দেশের সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি। কারণ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, যে সমাজে সত্যের উচ্চারণ দণ্ডনীয়, যে-সমাজ মানুষের কাছে কপট আচরণের দাবি করে এবং চিত্তের স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, সে-সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য।" এমন সমাজ সম্বন্ধে 'প্রসন্ন গৌরববোধ' করবে কোন্ আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নাগরিক?

ইতিহাসের পরিহাস এই যে যাঁরা আজ বুদ্ধির স্বাদেশিকতার আওয়াজ তুলছেন, তাঁরা জানেনও না যে তাঁদের স্বাদেশিকতার বোধটাও পশ্চিম থেকেই পাওয়া। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছেন, "আজ-কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি... দেশবাৎসল্য জিনিসটা দেশে ছিল না, কথাটাও ছিল না।" (ধর্মতত্ত্ব)। 'দোষী হোক বা নির্দোষ হোক, আমার দেশ হলো আমার দেশ," বায়রনের এ ধরনের উক্তির সমর্থন যে এদেশের মনস্বিতার বাণীতে পাওয়া যায় না, একথা আপনাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধেই স্বীকৃত। এবং য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীরাও যেদিন এই 'কট্টর দেশপ্রীতি'র কাছে ন্যায়-নীতি ও সত্যকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেদিন ফরাসী দেশেরই এক মনস্বী লেখক জুলিয়েন বেন্দা তাঁদের ধিক্কার দিয়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম The Betrayal of the Intellectuals বা 'বুদ্ধিজীবীদের বেইমানি।' আজ এদেশে যাঁদের কাছে জুলিয়েন বেন্দার দৃষ্টান্ত দিলে বুদ্ধির পরবশতার পরিচয় দেওয়া হয়, কবি বায়রনের 'কট্টর স্বদেশপ্রীতির দৃষ্টান্ত

তাঁদের কাছে হয়তো বুদ্ধির স্বাদেশিকতার পরাকাষ্ঠা)।

আর যে জাতীয় রাষ্ট্রের স্বার্থের দোহাই দিয়ে আজ এদেশে মানবিক অধিকারগুলি পদদলিত করা হচ্ছে, সেই জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাটিও তো বিদেশ থেকেই আমদানী করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই আবার বলি "পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতিকে সবাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়... এই যে একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর আর পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" (স্বাধিকার প্রমত্তঃ)। প্রধানমন্ত্রী যখন 'পরশাসিত বুদ্ধিবাদকে' ভর্ৎসনা করেন, 'দেশের সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চায় পথ রুদ্ধ করে' 'একটা প্রকাণ্ড ব্যূহবদ্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চাকেই' দেশের বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য বলে নির্দেশ দেন, তখন তাঁকে কে তাঁকে বোঝাবে যে আসলে তিনি দিশী বোতলে স্বাদেশিকতার ছাপ মেরে বিলিতি মদই পরিবেশন করছেন?

আলোচনা

চলতে চলতে

গত ১৯ ফেব্রুয়ারীর দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে শ্রীমৃণাল নাথ মহাশয় জানতে চেয়েছেন কবে জব চার্নক প্রথম সুতানুটিতে পদার্পণ করেন? ২৩-১২-১৬৮৬ না ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে? উত্তরে বলা যায় তিনি তিনবার সুতানুটিতে (বর্তমান কলিকাতার) মাটি স্পর্শ করেন।

প্রথম পদার্পণ : ৪৫,০০০ টাকার ক্রোকী পরোয়ানায় গ্রেফতারের ভয়ে গা ঢাকা দেওয়ার কারণে ২০-১২-১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে দুরুদুরু হৃদয়ে তথায় বাস ফেব্রুয়ারী ১৬৮৭ পর্যন্ত, তৎপরে বিদ্রোহী হিজলির জমিদারের আশ্রয়ে পলায়ন।

হিজলিতে বাস ১৬৮৭-এর ১১ই জুন পর্যন্ত। ইতিমধ্যে অবরোধ, যুদ্ধ, মোগল সেনাপতির পরাজয় ইত্যাদি—তার পর উলুবেড়িয়ায় তিন মাসের বেশী বাস।

দ্বিতীয় পদার্পণ : উলুবেড়িয়া থেকে সুতানুটি সেপ্টেম্বর ১৬৮৭, তথায় বাস চৌদ্দ মাস। ইতিমধ্যে বিলাত থেকে কাপ্তেন হীথ্ তাঁর উপঅলা হয়ে এসেছেন। হীথের নির্দেশে বাংলায় ইংরাজ ব্যবসায় অবসান, তাদের বাংলা ত্যাগ ৮-১১-১৬৮৮। পথে ইংরেজের লুট, চট্টগ্রাম অভিযান, বিফল মনোরথ ইংরেজদের (চার্নক সহ) মাদ্রাজে আশ্রয় ১৬৮৯ মার্চ থেকে।

তৃতীয় পদার্পণ : মোগল সম্রাটের ফর্মান অনুযায়ী বাংলায় ইংরাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। চার্নক প্রধান হয়ে সুতানুটিতে হাজির হলেন মাদ্রাজ থেকে ২৪ অগস্ট ১৬৯০।

কালীকিঙ্কর দে
কলিকাতা-২৯

॥ ২ ॥

৫ই মার্চ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় শ্রীবিমল মিত্রের "চলতে চলতে" লেখায় একটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ল। বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের কোন জায়গাতেই উল্লেখ নাই যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে ও প্রখ্যাত লেখকের বাইবেল সম্বন্ধে এই সব মন্তব্য না করাই ভাল ছিল।

মধ্য যুগে মার্টিন লুথারের আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মযাজকরা সর্ব সাধারণকে বাইবেল পড়তে দিতেন না যার ফলে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা অত্যন্ত প্রসার লাভ করে। ল্যাটিন হইতে মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা হইলে বহু ভুল ধারণা জনসাধারণের মন হইতে দূর হয়। বিজ্ঞানের সহিত বাইবেলের কোন বিরোধ নাই। বাইবেলের জ ব ২৫ : ৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই ও ওই বইয়ের ২৬ : ৭-এ লেখা আছে যে পৃথিবী মহাশূন্যে অবস্থিত। এই রকম বহু বৈজ্ঞানিক সত্য তথা বাইবেলে আছে ও স্মরণ রাখা দরকার যে ৩৫০০ বৎসর পূর্বে এই সব লেখা হইয়াছিল।

গ্যালিলিওর উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহার জন্য ইনকুইজেশনের রোমান ক্যাথলিক পাদরীরা ও তৎকালীন পোপ দায়ী ছিলেন। যতদূর জানি, অনেক কার্ডিনালের ব্যক্তিগত আক্রোশে গ্যালিলিওর উপর অত্যাচার হয়। এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেলকে দোষ দেওয়া উচিত হইবে কী?

সুনীলকুমার মিত্র
বালীচক

॥ ৩ ॥

শ্রীবিমল মিত্রের চলতে চলতে সাগ্রহে পড়ছি। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারীর 'দেশ" দেখলাম, স্মৃতি তাঁকে একটু ভুল খবর দিয়েছে, যেখানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ প্রসংগে লিখছেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তখনো উপাচার্য হননি, উপাচার্য ছিলেন যতদূর মনে পড়ে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার তৎকালীন স্পিকার আজিজুল হক সাহেব। বিধানচন্দ্র উপাচার্য হন ১৯৪২ সালে। সেই প্রথম এমন একজন গুণীজ্ঞানীকে সমাবর্তনে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ [illegible] হল যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট নন [illegible] তিনি হলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। [illegible] হচ্ছে সমাবর্তন উৎসব [illegible]ট হলে হয়নি, হয়েছিল প্রেসিডেন্সি [illegible] ময়দানে। অসুস্থ কবির [illegible] অ্যালবার্ট হলের [illegible] মাধ্যমে। মনে পড়ছে কবি [illegible] কবিতা দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ [illegible]:

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো অযোগ্যের পদে মান মর্যাদা
বিসর্জন।
নিঃসঙ্কোচে মস্তক তুলিতে দাও
উন্মুক্ত আকাশে, উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে!

বীরেন বসু
শিলিগুড়ি

॥ ৪ ॥

শ্রীবিমল মিত্র চলতে চলতে নিবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন টলস্টয় সংগ্রাম ও শান্তি নামে থান ইঁটের মত একখানি বই লিখেছেন। থান ইঁটের কথা থাক এ পরিহাসটুকু না হয় বোঝা গেল। ওয়েলস, শ' এবং আব্রাহাম লিংকনের সম্পর্কে যে সব কথা চলতে চলতে নিবন্ধে শ্রীমিত্র শোনালেন সে সব যে কোন পর্যায়ের পরিহাস সেটা বুদ্ধির অগম্য।

সবচেয়ে অল্প কথা শুনিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ডিমে ডিমময় মুখের কথা বলে। খাবার টেবিলে কি একটা কথা কাটাকাটির ফলে শ্রীমতী লিংকন প্রেসিডেন্ট লিংকনের মুখ লক্ষ্য করে সোজা ডিমের প্লেটটা ছুঁড়ে মারলেন। এবং প্রেসিডেন্টের মুখ ডিমে ডিমময় হয়ে উঠলো। শ্রীমিত্র এই তথ্যটি কোথায় পেলেন? খাবার টেবিলের বিচিত্র কাহিনী শোনাতে গিয়ে তিনি কি এক কল্পকথা রচনা করলেন এবং সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট লিংকনকে নিয়ে একটা পরিহাস করলেন?

ইউ এস আই এস পরিচালিত লাইব্রেরীতে একটি নির্ভরযোগ্য আব্রাহাম লিংকনের জীবনী (লেখক খুব সম্ভবত হেনডন) পাওয়া যাবে। জীবনীকার কিন্তু বলছেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। গৃহযুদ্ধের শেষে জেনারেল গ্রান্ট-এর সংবর্ধনা সভায় প্রেসিডেন্ট লিংকনের পাশে গ্রান্টের স্ত্রীকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। অন্য মহিলার প্রতি লিংকনের স্ত্রীর অত্যধিক জেলাসি ছিল। সেই জেলাসির জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের মুখে কফির পেয়ালা ছুঁড়ে মেরেছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি না, প্রেসিডেন্ট লিংকন আত্মমর্যাদার সঙ্গে ব্যাপারটি শান্ত চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা বোঝাবার জন্য জীবনীকার ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলেন।

বাসুদেব নিয়োগী
জয়পুর

॥ ৫ ॥

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীবিমল মিত্রের 'চলতে চলতে' পড়তে পড়তে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে এক ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজে কাজ করার সময়ে আমার মরিশাস দ্বীপে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভৌগোলিক বর্ণনা যদি না মিলত তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হত যে, শ্রীমিত্র অন্য কোন দেশের বর্ণনা দিচ্ছেন।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, বিমল মিত্র নিছক ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসেননি। জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর একটা নিজস্ব মতবাদ আছে—যেমন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তুলনায় অবধী ভাষায় রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর শ্রেষ্ঠত্ব, সিনেমার (তা সে সত্যজিৎ রায়েরই হোক না কেন) ফলে সমাজের অধঃপতন ইত্যাদি। আমার মনে হয় যে, তিনি মরিশাসের পটভূমিকায় তাঁর নিজস্ব জীবন ও সমাজদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। লেখক হিসেবে তাঁর নিশ্চয়ই সে স্বাধীনতা আছে কিন্তু তার ফলে মরিশাসের যে চিত্রটি তিনি 'দেশ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেটি অসম্পূর্ণ ও একপাক্ষিক।

প্রথমত, মরিশাসে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং দেশটাকে গড়ে তুলতে তাদের দান নিশ্চয়ই অসামান্য। কিন্তু মরিশাসে আরো বহু জাতের লোক আছে—যেমন, ফরাসীদের বংশধর ক্রীয়োল, মিশ্রজাতি, আফ্রিকান, চীনে ইত্যাদি। মরিশাসের সমাজে তাদের গুরুত্ব এবং অবদান নিশ্চয়ই কিছু কম নয়, কিন্তু লেখকের রচনা পড়লে মনে হয় তাদের ভূমিকা যেন নিতান্তই গৌণ। দ্বিতীয়ত, মরিশাসের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা 'রামচরিত মানস' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হলেও গুণসম্পন্ন হয়নি, তারা পৃথিবীর আর পাঁচটা দেশের মানুষের মত সাধারণ মানুষ। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি যে, আমার জন্ম ও শিক্ষা উত্তর-প্রদেশে, সুতরাং 'রামচরিত মানস' আমার অপরিচিত নয়। আমাদের দেশে রামায়ণের প্রভাব অপরিসীম কিন্তু তার জন্যে কতটা ধন্যবাদ আদি রচয়িতা বাল্মীকির প্রাপ্য আর কতটা তুলসীদাসের সেটা বিতর্কাধীন। যাই হোক আমি মরিশাসে দ্বিতীয়বার যেবার যাই, সেদিন ছিল 'দেওয়ালী' উৎসব, ছুটির দিন। দ্বীপের প্রধান শহর 'পোর্ট লুই'তে কোন বিশেষ ধর্মোৎসব চোখে পড়েনি, এমন কি ভারতবর্ষের মতন আলো দিয়ে সাজানো বাড়িও বিশেষ দেখতে পাইনি! তবে দলে দলে লোককে সপরিবার হিন্দী সিনেমার 'ডবল শো'তে যেতে দেখেছি। এতে আমি তাদের প্রতি কটাক্ষ করছি না শুধু তাদের সাধারণত্বই প্রমাণ করতে চাইছি। তৃতীয়ত ভারতীয়দের তুলনায় মরিশাসের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও [illegible] পেয়েছির দেশ' নয়। ওখানেও বেকার সমস্যা এবং দারিদ্র্য আছে এবং অনেক অধিবাসী emigrate করতে উৎসুক। এ ছাড়া সাধারণ মানুষের মত ও-দেশের লোকেদেরও অসুখ বিসুখ করে এবং ডাক্তারের প্রয়োজন হয়—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি নিজে সামান্য অসুস্থ হয়েছিলাম এবং একজন ডাক্তার আমায় দেখতে এসেছিলেন। অবশ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি যে, আমিই বহু বছর পরে তাঁর একমাত্র রুগী কি না।

পরিশেষে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে লেখক যদি মরিশাস সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীকে এতটা প্র[illegible] না দিয়ে আরেকটু objective হতেন এবং বহু অযৌক্তিক কথোপকথনকে একটু যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণ করে দেখতেন (যেমন কোয়াতের সেই পাসপোর্টহীন লক্ষপতি মদ্যপায়ী যুবক) তাহলে রচনাটির মূল্য আরো বৃদ্ধি পেত।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
মন্ট্রীয়াল, ক্যানাডা

আমাদের ঘর চাই

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার দেশ পত্রিকার 'দৃষ্টিকোণ' পর্যায়ে শ্রদ্ধেয়া কবিতা সিংহ "আমাদের ঘর চাই" নামক প্রবন্ধের (অথবা দাবির) এক জায়গায় লিখেছেন (২২৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষ অনুচ্ছেদ), "অতএব হে পুরুষ...যথার্থ আসনে ছাড়া"। একজন পুরুষ হিসাবে আমার বক্তব্য, নারীরা যেরকমভাবে আমাদের ঘরে আসে, সেরকমভাবে তাদের একলার [illegible] আমরা কি সম্ভব? অর্থাৎ এক হাতে

কি ভালি বাজে? অর্থাৎ আমরাও কি একজন নারীর পিতা পতি অথবা পুত্র নই? সাধারণত নারী ও পুরুষের ভিতর এই তিন রকম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো মৌলিক সম্পর্ক তো আমাদের চিন্তা অগম্য।

এ জগতে সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক, অর্থাৎ relative। আমরা 'পুরুষ'—কারণ পৃথিবীতে একদল এমন জীব আছে যারা 'নারী' অর্থাৎ আমাদের 'পুরুষত্ব' একটি আপেক্ষিক জিনিস। কিন্তু লেখিকার নিজেদের যথার্থ আসন অর্থাৎ ঘর চাওয়ার ব্যাপারটি ঠিক বোধগম্য হল না, এবং তিনি নিজেও সেটা ব্যাখ্যা করেননি, কারণ তিনি জানেন না। তিনি লিখছেন (ঐ পাতারই দ্বিতীয় কলমের মাঝামাঝি) "সে ঘর কেমন? আমি জানি না।" অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এ জগতে আপেক্ষিকতাকে eliminate করে কোনো কিছুকেই বোঝা যায় না।

তবে এ কথাও ঠিক, এ জগতে পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে অধিকারও কিছু মাত্রায় সীমাবদ্ধ। নারীদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণটি হল বৈজ্ঞানিক—এবং এ বিষয়ে আমাদের কোনো হাত নেই। দ্বিতীয়টি হল তাদের অধিকারের প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে ১৯ মার্চ সংখ্যায় দেশ পত্রিকায় শর্বরী রায় (কল্পি-৩১)-এর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তবে তাঁর একটা কথায় খটকা লাগল। তিনি লিখেছেন, "নারীকে পরাধীন করেছে পুরুষের আরোপ করা একটা ধারণা—সতীত্ব (chastity)"। এ কথা সত্য যে, এই সতীত্ব নামক জিনিসটা রক্ষা করতে গিয়েই নারীদের অনেক অধিকার সংকুচিত হয়েছে—কিন্তু এটা যে পুরুষ কর্তৃক আরোপিত, সে বিষয়ে তিনি কি করে নিঃসংশয় হলেন? আর তিনি যে নিজেদের পরাধীন বলে ঘোষণা করেছেন—তার কারণ কি একমাত্র পুরুষেরাই নারীদের এই 'সতীত্ব' নামক জিনিসটি হরণ করতে পারে বলে? কিন্তু নারীরাও কি এই 'সতীত্ব' নামক ধারণাটি নিজেদের প্রয়োজনে শঠতার সঙ্গে ব্যবহার করে না? কবিতা সিংহের ভাষায় (২২৭ পৃষ্ঠার শেষ কলমের মধ্যের অংশ), "মিলনে আনন্দ......ধর্ষণ করেছে।" এই সাহসী উক্তির জন্য লেখিকা ধন্যবাদার্হ।

রাজকুমার গাঙ্গুলী
কলিকাতা-৭০০০০৩

॥ ২ ॥

দেশ ৫ই চৈত্র সংখ্যায় 'ঘর চাই' প্রসঙ্গে পুষ্প মিত্রের চিঠি পড়ে কৌতুক বোধ করলাম। 'জেনেটিকস' এখনো শিশু বিজ্ঞান, তাই বর্তমান জেনেটিসিয়ানরা কেউ শ্রীমতী মিত্রের দাবী মত জোর গলায় ঘোষণা করেন নি, মেয়েদের মধ্যে কেউ 'বড় মাপের মগজ প্রতিভা নিয়ে জন্মাবেন না।' তেমন কোনও প্রমাণই বিজ্ঞান দেয়নি। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন হয়তো জেনেটিক্যাল কারণে মেয়েদের মধ্যে গাণিতিক প্রতিভার অভাব থাকতে পারে কিন্তু সেখানেও একটা হয়তো' বর্তমান।

সমাজ-দর্শনের ছাত্রী হিসেবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ও বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিকের মতে মেয়েদের প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ ঘটতে পারে না রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক (বিশেষভাবে সামাজিক) চাপে। শ্রীমতী মিত্র প্রশ্ন করেছেন, নারী-নিউটন নারী-রবীন্দ্রনাথ নেই কেন। একশ বছর আগে কি মাদাম কুরীকেও অসম্ভব মনে করা হত না? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রবেশাধিকার চালু করার যখন প্রথম কথা ওঠে, অনেক বিজ্ঞানী আপত্তি করে বলেছিলেন, শরীরগত কারণেই মেয়েরা কখনো দিনে চার ঘণ্টার বেশী পড়াশুনো করতে পারবে না। সে যুক্তি কি আজ কৌতুকাবহ ঠেকে না? বিজ্ঞানের ধারণা যুগে যুগে পালটায়।

শ্রীমতী মিত্রের মতই আমার জায়া ও জননী ভূমিকায় আমি গর্বিত। কিন্তু নারীর সৃষ্টিশীলতার আর কোন প্রকাশ সম্ভব নয়—এ বিশ্বাস আমার জন্য নয়।

ডঃ সুস্মিতা ভট্টাচার্য
কলিকাতা-২৬।

প্রবাসে বাঙালী

চলতি বর্ষের 'দেশ' এর ২১ সংখ্যায় 'দৃষ্টি কোণ' শিরোনামের নিম্নে 'প্রবাসী বাঙালী' নামক রচনাটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। দুনিয়াভরা বিচিত্র অতি-বিচিত্র ঘটনাগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া লেখক যে 'প্রবাসী বাঙালী' কে পাঠকদের দরবারে উপস্থিত করিয়াছেন—এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। সত্য কথা বলিতে কি একমাত্র প্রবাসী বাঙালীরাই 'প্রবাসে'র মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

প্রবাসের প্রথম দিনগুলি বড়ই হৃদয়-বিদারক লাগে। কিন্তু কিছুকাল বাদে আরও প্রবাসীর সংস্পর্শে আসিলে এই একাকীত্ব ভাবটা কমিতে থাকে। কেননা আর কিছু না হইলেও—একটু পুণ্য-পবিত্র মাতৃভাষায় কথোপকথন করিয়া আমরা মানসিক শান্তি লাভ করি। বাঙালীর বাঙালীত্ব এইখানেই—চলতি ভাষায় যার নাম অতি পরিচিত —"আড্ডা"। একটি আশ্চর্য অদৃশ্য মানসিক ঔষধ।

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঔরঙ্গাবাদ

॥ ২ ॥
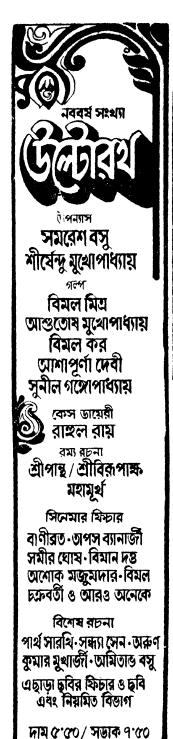
১৯ মারচ ৭৭, ২১ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় 'দৃষ্টিকোণ' পড়লাম, অমিতাভ ভট্টাচার্যের 'প্রবাসে বাঙালী' ভাল লাগল, সত্যিই বাঙালী কোথায় নেই।

মুসৌরীতে সেবার প্রথম দুর্গা পুজো' বলতে লেখক কি গত সেপ্টেম্বরের কথা বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬?

যতদূর জানি মুসৌরীতে প্রথম দুর্গা পুজো হয় ১৯৭৪ সালে। আমরা তখন দেরাদুনে আই পি আই-তে অফিসার ট্রেনী। আমরা সাতজন বাঙালী সেই দুর্গাপুজোয় যোগ দিয়েছিলাম, সেই পুজোর হোতা জি এস আই-এর ডঃ অনিরুদ্ধ বসু।

অসিতরঞ্জন দাস
জয়পুর

॥ ৩ ॥

ছোটবেলায় দেখেছি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ বেরোতো লণ্ডনে প্রবাসী বাঙালীরা দুর্গাপুজো করছেন। কিন্তু সেটা সিকি শতাব্দী আগেকার কথা। আজকের দিনে বাঙালী ছেলেরা মুসৌরী অ্যাকাডেমীতে "মহাসমারোহে সমস্ত আচার মেনে দুর্গাপুজো" করছে এবং ১৯৭৭ সালেও দেশ পত্রিকায় তার আবেগময় বৃত্তান্ত ছাপা হচ্ছে ('দৃষ্টিকোণ' ১৯ মারচ)—ব্যাপারটা একটু হাস্যকর মনে হয় না? তরুণ লেখকের অপরিণত ভাবালুতা এবং উগ্র বাঙালীয়ানাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেই ভালো হতো কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটা বিচলিত হবার মত দিকও রয়েছে।

"দুজনেই মনে মনে ঠিক করে নিলুম যে, ভারতের যে প্রান্তেই যাই, বাংলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে যাবো"—এই কথাটায় যেন কিপলিংকে মনে করিয়ে দেয়। এই মনোভাবকেই কি একসময়ে "হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডেন" বলা হতো? ভারতের একজন নবীন প্রশাসক এইরকম উগ্র কলোনিয়াল মনোবৃত্তির অধিকারী—এটা কি ভয়ের কথা নয়? শ্রীকাকুলমে বাঙালী না পেলে চাকরিতে ইস্তফা দিতে যার ইচ্ছে হয় এরকম সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে সর্বভারতীয় কাজে যোগ দেওয়াটা শুধু নিজের পক্ষে নয়, অন্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। বদরীনাথের হোটেলে কাজ করছেন বলে এক ভদ্রলোক হয়ে গেলেন 'করুণ বাঙালী'—পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরোতে হয়েছে বলে দুই বন্ধুর রোজ রাতে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে হয়, এবং অবাঙালী জনৈক "অবাক বিস্ময়ে" সভা বাঙালীদের কাণ্ডকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়—এই ধরনের সস্তা আবেগ কলেজ ম্যাগাজিনের পাতার বাইরে শোভা পায় না।

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়
দিল্লী

বাংলা বই ও প্রকাশনা

১৯-৩-৭৭-এর 'দেশ' পত্রিকায় 'অভিনন্দ' 'বাংলা বই ও প্রকাশনায়' যা লিখেছেন সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি।

সম্প্রতি কলকাতায় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত এক সেমিনারে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ১৮৫৭ সালে বাংলা বইয়ের প্রকাশন-সংখ্যা ছিল ৩২২। ১৮৭৮ সালে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮৯২। অর্থাৎ সতেরো বছরে ওই সময়ে বাংলা বই প্রকাশনের সংখ্যা প্রায় তিন গুণ (অভিনন্দ কেন যে "প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি" লিখেছেন বুঝলাম না) বেড়েছিল। অথচ ১৮৭৮ থেকে ১৯৭৩ সালে বাংলা বইয়ের প্রকাশনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১০৪-এ! অর্থাৎ এক শ বছরে গড়ে প্রকাশন সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২১২টি।

সমীক্ষাটি কত দূর বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য জানি না। জনসংখ্যা, সাক্ষরতা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও কেন এমনটা হল?

অভিনন্দ মনে করেন, বাংলা বাঙালীর জীবনের সর্বকর্মের অবলম্বন না হওয়ার জন্যই এমনটা হয়েছে। শুনেছি পশ্চিম বাংলায় স্কুল-কলেজে আর্টস্ এবং বিজ্ঞানের সব শাখাতেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয়। তা হলে শুধু এই হিসাবেই তো বহু বইয়ের চাহিদা হওয়া উচিত। এ দেশে প্রকাশকেরা যে শুধু চিত্তবিনোদক গ্রন্থই প্রকাশ করেন সে কথাও ঠিক নয়। কীট, পতঙ্গ, পাখি জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিদেশী ভাষায় কত অজস্র সুন্দর সচিত্র বই বার হয়, যেগুলো স্কুল-কলেজের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের জন্য। যদি মেনেও নিই যে, লোকসানের ভয়ে সাধারণ প্রকাশকরা ও ধরনের বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সাহস করবেন না, তা হলে সেই ক্ষেত্রে ন্যাশনাল বা [illegible]ট্রেটের মত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট সংস্থা কেন সে কাজ করছেন না? [illegible] বা সামান্য ক্ষতির ভিত্তিতে তাঁরা [illegible]মূলকভাবেও সে চেষ্টা করতে পারেন।

তবে আমার মনে [illegible] একটা শঙ্কা আছে। ইংলিশ মিডিয়াম [illegible]লে ক্রমবর্ধমান হারে ছেলেমেয়েদের [illegible]শেষ প্রবাসী বাঙালীদের) পড়ানোর [illegible]লে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে ক্রমশই [illegible]ংলা বইয়ের পাঠকসংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর থেকে কি মুক্তি নেই?

সুশান্ত [illegible]র হালদার
নয়াদিল্লী

পুরোনো বইয়ের পাঠক

"দৃষ্টিকোণে" যেদিন জন্ম হল দেশ পত্রিকায়, সেদিন কোন এক নতুনত্বের আনন্দ, মনটা ভিজিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল বারবার। বাস্তবিক এই নতুনত্বের আস্বাদ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টাও ছিল আমার দ্বিগুণ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সময়টাও অল্প; কিন্তু এই নবীন সন্ধানী মনটা বিভিন্ন লেখক-লেখিকার দৃষ্টিকোণের ছিটেফোঁটার সন্ধানলাভে সতত উন্মুখ ও একাগ্রচিত্ত। এখানেই এ লেখার শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু 'পুরোনো বইয়ের পাঠক' সুজিতকুমার সেনগুপ্ত, দেশ ২৮ ফাল্গুন '৮৩, সব কেমন গোলমাল করে দিল। এজন্য সুজিতবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যখনই মনটা অন্য কোন চিন্তা থেকে বিরত থাকে তখনই এ প্রসঙ্গটা মনে পড়ে যায়। আর ঠিক তক্ষুনি 'দেশ'-এর ঐ সংখ্যাটি খোলবার জন্য হাতটা নিসপিস করে। বোধ হয় মনটাও।

সত্যি ব্যাপারটি দুঃখের। শুধু দুঃখেরই বা বলি কেন। লজ্জারও। আজ বাংলা সাহিত্যে পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। এবং দিন দিন তার পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। পাঠকরা ভাল জিনিসকে আগের তুলনায় মূল্যও দিতে শিখেছেন অনেক বেশী। অন্তত তাঁদের ভালমন্দ

বিচারের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চিঠি লেখা বিভাগগুলিতে এবং রাস্তাঘাটে ও লাইব্রেরীর আনাচেকানাচে। কিন্তু এই পর্যন্তই। সেকালের বহু মূল্যবান পত্র-পত্রিকার রসাস্বাদনে বাঙালী পাঠক আজ ব্যর্থ যেহেতু কোনক্ষেত্রেই তার পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না। কিন্তু এজন্য কারও তো তেমন আফসোস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বাঙালী পাঠকসমাজের এক বৃহৎ অংশ আজ আর একটি অসুবিধা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছেন। আমরা যে রবীন্দ্রনাথের নামে এত গর্ব বোধ করি তাঁর লেখা কে কতটা পড়তে পারি? রবীন্দ্র রচনাবলীর কপিরাইট একমাত্র বিশ্বভারতীর। আর সমগ্র রচনাবলীর দামও অত্যধিক। তাই অধিকাংশেরই কিনতে সাধ্য কুলায় না। যে কোনও লাইব্রেরী থেকে একটা খণ্ড আনতে যান, পাবেন না। যদি পারেন তো ওখানে বসে পড়ুন। আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। রবীন্দ্র রচনাবলীর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৭ম খণ্ড হঠাৎ আমার দরকার পড়ল। এক অতি-পরিচিত ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। সমস্ত শুনে উনি বললেন—ভাই, যতক্ষণ পার তুমি ওখানে বসে পড়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়া চলবে না। জানি তুমি হয়তো ওগুলোর কিছুই ক্ষতি করবে না। কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে একটু যদি কিছু হয়ে যায় আমার গোটা সেটটাই খোঁড়া হয়ে যাবে। কথা আর না বাড়িয়ে সোজা লাইব্রেরীতে ফিরে এসেছিলাম। এবং পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিডিং রুমে কাটিয়ে কাজ সমাধা করেছি। কিন্তু আমরা কতজন কতক্ষণ রিডিং রুমে বসে থেকে এতগুলি খণ্ড ধৈর্য ধরে পড়তে পারি? (লাইব্রেরীকে অবশ্য দোষ দিচ্ছি না। তাঁদের কি-ইবা করার আছে) এসব আজও আমাদের কাছে লজ্জার। দুঃখের। তাই যখনই কোথাও একটা গভীর সত্য নজরে পড়ে যায় তখনই সেখানে দৃষ্টিটা স্থবিরের মতো আটকে পড়ে, যেমনটি সঞ্জিতবাবুর 'পুরোনো বইয়ের পাঠক'-এর ক্ষেত্রে হয়েছে।

উৎপল চৌধুরী
আরামবাগ

বুলেট ক্যাচিং অ্যাক্ট

১৭ সংখ্যা 'দেশ' (১৯ ফেব্রুয়ারী) ৮৮৮ পৃষ্ঠায় 'বিবিধ' কলমে "দুই সন্ধ্যা" প্রসঙ্গে শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় লিখছেন—"দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ছিল ২১ জানুয়ারী, কলামন্দিরে ক্যারিট মেবন সংস্থার শত-বর্ষপূর্তি উৎসবে আধ ঘণ্টার জাদুপ্রদর্শনী দেখালেন প্রিন্স শীল। তাঁর প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল "বুলেট ক্যাচিং অ্যাক্ট"। একটি বুলেট বন্দুকে ভরে ছোঁড়া হবে, যাদুকর সেটি দাঁতে করে ধরবেন। বিংশ শতাব্দীর কোনো জাদুকর যাদুকর খেলাটি দেখাননি। প্রিন্স শীল সেদিনই প্রথম মঞ্চে নামালেন এই খেলা।" আমি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই উক্তির প্রতিবাদ করছি। কারণ, আমার ছেলেবেলায় আগরতলায় আমি প্রফেসর সেন-এর যাদুপ্রদর্শনীতে বহুবার এই খেলাটি দেখেছি। তিনি একটি পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তেন, আর সেটি দাঁতে করে ধরতেন তাঁর বড় ছেলে কানু সেন। প্রফেসর (প্রফুল্লচন্দ্র) সেন এখনও বেঁচে আছেন কি না, ঠিক জানি না। তিনি আগরতলার একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। একাধারে ফটোগ্রাফার অঙ্কনশিল্পী শক্তি মলমের আবিষ্কর্তা সোডালেমনেড প্রস্তুতকারী এবং সর্বোপরি যাদুকর।

ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্য
বোকারো

রঙ্গজগৎ : নাটক

১২-৩-৭৭ তারিখের "দেশ" পত্রিকায়

রঙ্গরূপং-এ প্রকাশিত শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তের চিঠি বেশ সৎ ও সাহসী সমালোচনা, ধন্যবাদ তাঁকে। তবে গুরুত্ব একটু বেশিই দিয়েছেন। আপত্তি এখানে। কেননা ওটি ছড়ি নাচ বা ভেল্কি যাই হোক, নাটক নয়।

আমিও দেখেছি এবার রাজার পালা। হলে বসে যাচ্ছেন না। কিন্তু, শোনা যাচ্ছে না—প্রচণ্ড হাসি প্রায়ই। শ্রীউৎপল দত্ত লোক হাসিয়েছেন বেশ।

জানি, বাংলা নাটকের আধুনিক মঞ্চ-স্থাপনায় নির্দেশনায় শ্রীউৎপল দত্ত একটি উজ্জ্বল নাম। যদিও তিনি শ্রীশম্ভু মিত্রের মতো গভীর ও অন্তর্মুখী নন। তিনি নিতান্ত বহির্মুখী ও তাৎক্ষণিক। তা হোক। তিনি তাঁর ধারায় উজ্জ্বল, সার্থক। কিন্তু এবার রাজার পালায় এ কী দেখলাম! টিনের তলোয়ারও বা কি হয়েছে? তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে।

পরেশ মণ্ডল
বারুইপুর

ক্রীড়া চিকিৎসা

গত ২২শে মার্চ প্রকাশিত "দেশ" পত্রিকা সংখ্যায় "শরীরবিজ্ঞান" বিভাগে ক্রীড়া চিকিৎসা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে পুনঃপ্রকাশিত হোলে বাধিত হব।

নিখিল ভারতীয় ক্রীড়াচিকিৎসা সংস্থা ১৯৭০ সালে স্থাপিত হয় পাতিয়ালায় (কেন্দ্রীয় দপ্তরে)। প্রতি বৎসর বাৎসরিক সভা ছাড়াও নিয়মিত এই সংস্থার "স্পোর্টস মেডিসিন জার্নাল" প্রকাশিত হয় এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর জন্য প্রতি বৎসরে ৩।৪টি সদস্যকে কেন্দ্রীয় সরকার বৃত্তি দেন। পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে ইতিমধ্যেই দুই বৃত্তি এই বৃত্তি পেয়ে কাজ করছেন। ভারত সরকার অনুমোদিত "ভারতীয় ক্রীড়া-চিকিৎসা সংস্থা" এখন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াচিকিৎসা সংস্থা বা "ফিমস" এর (যেমন আরো ৫০টি দেশ) স্থায়ী সদস্য। এখন আমাদের ৮টি প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয়েছে—যথা পশ্চিম বাংলা, বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব।

গত ৬ষ্ঠ বাৎসরিক সভাকালে (অমরাবতী, ১৯৭৬) ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়াচিকিৎসা কোর্স "ফিমস"-এর নিয়মানুযায়ী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারতের প্রায় ২৬০ জন এই শিক্ষাক্রমে আধুনিক ক্রীড়াচিকিৎসার বিষয় প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছেন। পশ্চিম বাংলা থেকে ১৫ জন স্পোর্টস মেডিসিনে ডিপ্লোমা পেয়েছেন যার বিস্তারিত বিবরণ আগেই আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছে যথা ২৬।১০।৭৬ এবং সম্পাদকীয় ২।১১।৭৬।

মনে রাখা দরকার যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ক্রীড়াচিকিৎসা বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ বহুলাংশে নির্ভর করে যে কোন দেশের রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়াও সর্ব-সাধারণের ক্রীড়াকর্ম, শরীরশিক্ষা ও অবসর বিনোদনের সুযোগ সুবিধা, স্বাস্থ্য-সচেতনতা, সাজসরঞ্জাম অর্থাৎ সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য, অনুপ্রেরণা ও দূরদৃষ্টির উপর।

ময়দানে বা নেতাজী স্টেডিয়ামে স্থায়ী সাংবাৎসরিক ক্রীড়াচিকিৎসা কেন্দ্র গবেষণাগার আমাদের এখন একান্ত প্রয়োজন।

অলোক ঘোষ
সভাপতি ভারতীয় ক্রীড়া চিকিৎসা সংস্থা
(কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ শাখা)

নিশিকান্তের ঝরনা ছবি

১৯ ফেব্রুয়ারী প্রচ্ছদ পরিচিতি শীর্ষক আলোচনায় শিল্পী কবি নিশিকান্তের ঝরনা ছবির বর্ণনার সঙ্গে সমালোচকের কিছু মতানৈক্য দেখা গেল।

বাস্তবে ঝরনাটি কলস্বরা ও স্থানটি সাঁচাই নির্জন ছিল।

তবে এই ব্যাপারে আসলে শিল্পীর প্রেরণার উৎসমূলে ঐ উন্মাদিনী কলস্বরা ঝরনাটির সঙ্গে প্রথম শুভদৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তে কবির মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেটি শ্রবণযোগ্য।

১৯৩২ সালের পুজোর ছুটির পর বন্ধু নিশিকান্ত ও আমি কলকাতা থেকে মাস দুয়েকের জন্য নিরুদ্দেশ হই। দেশ-ভ্রমণ ও নিরিবিলিতে স্বাধীনভাবে কিছু ছবি ও স্কেচ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা রাঁচিতে আমার এক নিকট আত্মীয় ওখানকার পুরোনো প্রবাসী বাঙালী [illegible]দের আতিথ্য গ্রহণ করি। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের হুড্রু জলপ্রপাত দেখবার সুযোগ হয়। মনে পড়ে সেদিন আমরা বেশ ভোরে উঠে সারা দিনের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে ওদের মোটরে মহা উৎসাহে যাত্রা করি।

প্রথম সারিতে আমি ও নিশিকান্ত ড্রাইভারের পাশে বসেছি, গৃহস্বামী ও তাঁর ছোট পরিবারবর্গ পেছনের সীটে বসেছেন। গাড়ি হু হু করে ছুটেছে, আমাদের উন্মুখ উৎসুক মনটি কখন ঝরনা দেখবে। তাতেই মশগুল। সকাল উত্তীর্ণপ্রায়, জঙ্গল ঘন থেকে ঘনতর হয়ে এল, চড়াই উৎরাই বাঁকের পর বাঁক পার হচ্ছি, গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসে, আর আমরা একটা বিরাট নির্জনতার গহ্বরের মধ্যে ক্রমশ যেন গাড়ি সুদ্ধ তলিয়ে যাচ্ছি। দূর থেকে একটি ক্ষীণ শব্দ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে আরম্ভ করেছে, ঠিক এই থমথমে মুহূর্তে পেছনের সীট থেকে রাশভারী গৃহস্বামীর কণ্ঠস্বর, তিনি আমাদের কিছু বললেন। ■

"বলতে নিশিকান্ত তোমার এখন ঠিক কি মনে হচ্ছে?"

দূরমনস্ক নিশিকান্তের জবাব, জানেন, মেসোমশাই, আমার কি মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে সামনেই দেখবো লক্ষ লক্ষ প্রাইমাস্ স্টোভ জ্বালা, আর তার ওপর হাজার হাজার মন মাংস বড় বড় হাঁড়িতে সেদ্ধ হচ্ছে তো হচ্ছে!

"মেসোমশাই বললেন, বুঝেছি, তোমার খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।"

বনবিহারী ঘোষ
নিউদিল্লী ১১০০০২

কবি করুণানিধান

১২ই মার্চের 'দেশ' সংখ্যায় সাহিত্য প্রসঙ্গের পাতায় অভিনন্দের লেখা কবি করুণানিধান শতবর্ষ অংশটুকু পড়ে আনন্দবোধ করছি। করুণাধন রোমান্টিক কবি ছিলেন সে কথা ১৩৫৫ সালে কবির সংবর্ধনার সময় কবিশেখর কালিদাস রায় বলেছিলেন, 'করুণানিধানের কবিতার রস উপলব্ধ করিতে হইলে বাস্তব ভুলিয়া স্বপ্নরসের রসিক হইতে হইবে।' সে যুগে এত বড় বঙ্গালী রোমান্টিক কবি আর কেউ ছিলেন না বললেই চলে। তাঁর রচনাভঙ্গীর সঙ্গে অন্য কোন কবির মিল ছিল না। তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন করা হোক এবং তাঁর সমগ্র কবিতার একটা সংকলন প্রকাশ করে জাতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা হোক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই দায়িত্বটা পালন করবেন বলে আমার গভীর বিশ্বাস।

সুজিতকুমার রায়
বোলপুর, বীরভূম।

জাতীয় গ্লানির মূর্তি

গত ১৭ সংখ্যার দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় "জাতীয় গ্লানির মূর্তি"র জন্য ধন্যবাদ। ভারতবর্ষে ভিক্ষুকবৃত্তি ক্রমবর্ধমান। বেশ কয়েক বছর ভিক্ষুকদের নিয়ে গবেষণা করে আমি অনুভব করেছি ভিক্ষুকদের পরিপূর্ণ পুনর্বাসনের যে প্রস্তাব আপনারা করেছেন তা অতি জরুরী।

বিদেশী লেখকের কলমে যে মিথ্যা এবং ভুল ছবি আঁকা হয় সেটা আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সবাই ভিক্ষুক নয়। অনেকের অতীতে ভাল অবস্থা ছিল, এখন ভিক্ষুক। ভারতে কি কি কারণে ভিক্ষুক সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে সত্য তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে স্বদেশ ও বিদেশের জনসাধারণকে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেবার দরকার।

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়
ভিখারী গবেষণা সংস্থা, হাওড়া

তীর্থযাত্রার স্মৃতি

১৯ ফেব্রুয়ারী 'দেশ'এ শ্রীযুক্ত বিমান বিশ্বাস আমার 'তীর্থযাত্রার স্মৃতিঃ প্রসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথ' নামের লেখাটি সম্বন্ধে যথার্থই উল্লেখ করেছেন—ওটা নিমতলা না হয়ে কলভিন সাহেবের ঘাট হবে। ঘটনা যদিও ২৬।২৭ বছর আগেকার এবং তখন কলকাতার রাস্তাঘাট, বিশেষত শ্মশানঘাটগুলো আমার ভাল জানা ছিল না, তবুও তা অবশ্যই এ ত্রুটির কৈফিয়ৎ হতে পারে না। তাই শ্রীযুক্ত বিশ্বাস আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
হুগলি।

চিত্রপ্রদর্শনী

গত ৫ই মার্চ, ১৯৭৭, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্যর চিত্র প্রদর্শনী এবং শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য প্রদর্শনীর সমালোচনা পড়লাম। লিখেছেন সন্দীপ সরকার।

'যশোপ্রার্থী' এই হেড লাইন দিয়ে শুরু করে শ্রীসরকার প্রথমেই শিল্পী শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে ভূষিত করেছেন 'যশপ্রার্থী' বলে। আমি কি এখানে প্রশ্ন রাখতে পারি না যে যশপ্রার্থী কে নয়?

শ্রীসরকার প্রথম কলমের পঞ্চম লাইনে লিখেছেন—'তবে তেমন একটা জমেনি।' এই 'জমানো' বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন? তিনি কি জানেন এই ধরনের আর্টের দর্শক বরাবরই কম।

শ্রীসরকার প্রথম কলমের শেষ প্যারার চতুর্থ এবং পঞ্চম লাইনে লিখেছেন—'বা জলরঙ আর প্যাস্টেল করা কাশফুল আর প্রবহমান নদী।' ক্ষমা করবেন আমার ধৃষ্টতাকে—প্রদর্শনীটি আমি দেখেছি ভাল করেই দেখেছি। কিন্তু প্রবহমান নদীর ছবি কোথাও ছিল না। অথচ শ্রীসরকার শুধু নদী নয়, একেবারে প্রবহমান নদী আবিষ্কার করে ফেললেন। পুকুরের অতগুলো শালুক কি তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল।

শ্রীসরকার তৃতীয় কলমের প্রথম লাইনে লিখেছেন—'নারীমূর্তির কোঁচড়ের মধ্যে ফুটো।' আমার মনে হয় আসল ব্যাপারটাই তিনি বোঝেন নি। তাছাড়া সমালোচনা লেখার সময় ছবির ক্যাপশন পরিবর্তন করে বিকৃত নামকরণ করার মধ্যে কি বিশেষ কোন বাহাদুরি আছে? 'হাঙ্গার দি ভিক্টর' লিখলেই কি যথেষ্ট হতো না?

আমরা যারা দেশের সমালোচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ি তাদের কাছে এই ধরনের সমালোচনা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

তপন চক্রবর্তী
কলকাতা-২৬

এরপর দুজনের ছাড়াছাড়ি

সুতপা মিত্র

রাত্রি যখন বারোটা
গঙ্গায় স্টীমারের ভোঁ
গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি
ঠিক সেই সময় তোমার হাতটা ঝাঁকিয়ে
আমি করমর্দন করলাম তোমার সঙ্গে।

তুমি খুব মিষ্টি ভাবে হেসেছিলে
তোমার মুখে লুকোচুরি খেলছিলো।
আশা আর অনিশ্চয়তা।

আমি যখন পথ হেঁটে ছিলাম
আমার হাতে ছিলো
লাল আর কালো অক্ষরে লেখা
একটি হিসেবের খাতা
মুখে ছিলো বোগেনভিলিয়া হাসি।

যে বাগানটা তোমায় ছেড়ে দিয়ে গেলাম
সেখানে আমি একদিন কত ফুল ফুটিয়েছি
তুমি মালী নও
ওখানে লাল সবুজ পাবে
এবার ওখানে তুমি সাদা উজ্জ্বল ফুল ফোটাও।

রাত্রি যখন ঠিক বারোটা
তোমার হাতটা ঝাঁকিয়ে
আমি করমর্দন করলাম তোমার সঙ্গে।

দিঘি

পরেশ মণ্ডল

আকাশটা হাসি হয়ে চলে যেত
মেঘলা দিঘিতে
বারোমাস

আকাশ না হাসি
কাকে ফেলে কাকে দেখি
কাকে রাখি
ভুল কি তো ভুলে আছে
আলগাভাবে ফেলে বিকেল
মাথার আড়ালে রেখে গেল রেলগাড়ি
বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি
আকাশটা হাসি হয়ে চলে বেড়ায়
আর আড়াআড়ি
মেঘলা দিঘিতে
বারোমাস

অনিবার্য

দময়ন্তী ঘোষ

আমি বলেছিলাম যাবো
কিন্তু যাইনি

অতএব গাছটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো
আমারই যত্নে, প্রচেষ্টায়, প্রার্থনায়
শিকড়ের নোখ
শক্ত থাবায় চেপে ধরলো মাটি
রস উঠলো উপরে
সম্ভাবনায় উজ্জ্বল সবুজ ডাল
ভ'রে উঠলো ফুলে ফলে

হঠাৎ তখনি
কোন অজানা সমুদ্রের
অচেনা ঝড়
আচমকা এসে
বড় অনায়াসে নড়িয়ে দিলো শিকড়
তার বিস্তৃত নোখের নিচে
শুধু ঝুরো মাটি
যেখানে ধরলো সেখানেই ভাঙলো

ঝড়? নাকি উই ধরেছিলো?

আমি বলেছিলাম ঃ যাবো না।
তবু যেতে হ'লো

ভুল করে

অসীম মাহাতা

তার চোখে সব ছিল
নিরন্তর যুদ্ধবাজ সৈন্যেরা
গণ্ডীবদ্ধ ছিল সেই সবুজ সরলতায়
প্রতিটি পল-অনুপল
জড়িয়ে ছিল বিশ্বাসের ঋজুতায়

তার চোখে সব ছিল
বৃষ্টি ধোয়া বালির মত কি
নরম
ক্লান্তি ছুঁয়ে যেত প্রতিটি যুবক শরীর

সে শুধু একদিন সঙ্গোপনে
ভুল করে ফেলে
দিয়ে দেয় মণিময় কৌটো খুলে
অপার শিহরণ
ঈশ্বরের কাছে।

॥ ৪৩ ॥
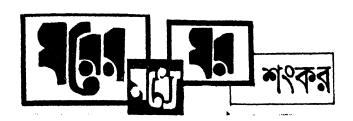
সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে শ্রীমান সহদেবকে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরতে দেখে বেশ আশ্বস্ত হচ্ছিলাম। সুখস্বপ্ন প্রলম্বিত করবার কিছু ফন্দিও মাথায় আসছিল। কিন্তু কপালে সুখ নেই। সহদেবকে ঠাণ্ডা করে তার প্রতিবেদন শোনবার আগেই মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ আমার এবং সহদেবের নাকে এসে পৌঁছলো।

সজাগ সারমেয়র মতো সহদেব তার নাসিকার তাৎক্ষণিক ব্যবহারে মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলো অপরিচিত বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সে কোনোরকম মন্তব্য না করে দেওয়াল-র‍্যাকেটে টাঙানো আধময়লা পাজামাখানা দ্রুত নামিয়ে এনে আমার হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে ওটি যথাসম্ভব দ্রুত পরে ফেলতে সিগন্যাল দিল।

ফায়ার ব্রিগেডের সজাগ কর্মীরা বিপদ-সংকেত পেলে যত দ্রুত প্রস্তুত হতে পারেন আমি তারও আগে আজানুলম্বিত পাজামাতে লজ্জা নিবারণের আপৎকালীন ব্যবস্থা করে ফেলেছি। লুঙ্গির আকারে জড়ানো ধুতিটাকে নিয়ে কী করবো ভাবছি, কিন্তু পরিস্থিতি আর আয়ত্তে রাখা সম্ভব হলো না। ঘরের ভুরভুরে গন্ধ এবার এমনই তীব্র হয়ে উঠলো যে সুঘ্রাণের উৎস যে অতি নিকটেই উপস্থিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না!

সহদেব কোনোরকম ঘোষণা করলো, "মেম সাব!" এবং তার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যিনি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হলেন তাঁকে এর আগে কোনোদিন স্বচক্ষে দেখেছি বলে স্মরণ করতে সক্ষম হলাম না।

কিন্তু সুঘ্রাণের উৎসমতী এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন তাঁর সঙ্গে আমার কতদিনের চেনা। তাঁর সখীভাবাপন্ন হাস্য যেন নিঃশব্দে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "এতো দিন কোথায় ছিলেন?"

অপরিচিতা অবশ্যই সুন্দরী। যদি ইনি বঙ্গললনা হন, তাহলে অবশ্যই বঙ্গালিনী-দের তুলনায় তিনি দীর্ঘাঙ্গিনী। অপরিচিতা অবশ্যই মধুরহাসিনী—তিনি গৌরাঙ্গী বলেই আন্দাজ করছি, কিন্তু শরীরের অনাবৃত অংশে অত্যন্ত উদারভাবে মেক-আপ ফাউন্ডেশন ব্যবহারের লক্ষণ রয়েছে। শুধু মুখমণ্ডল বা গ্রীবা নয়, অনাচ্ছাদিত বাহুলতা উৎসমুখ থেকে সযত্নে ফাউন্ডেশন-ক্রিমে চর্চিত। ব্লাউজের শেষ সীমানা থেকে নাভিদেশে শাড়ির উত্তর-প্রদেশ পর্যন্ত অংশটিও নিখুঁত প্রলেপন থেকে বঞ্চিত হয়নি।

আমার অনভ্যস্ত দৃষ্টি বাহুমূল থেকে হড়কে এই বস্ত্রপ্রচারিত কটিদেশে আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। অতি দ্রুত নজর উঁচু করে মহিলার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র তিনি ফিক করে হেসে ফেললেন।

সুন্দরী এবার ভ্রূধনু ভঙ্গ করলেন এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করলাম ভ্রূর প্রতিটি কেশ সযত্নে উৎপাটিত এবং সেখানে যে কালিমার নিপুণ টান আছে তাকে পাট আঁকা ছবিটি বললে কোনোক্রমেই অন্যায় হবে না।

পটেশ্বরী এবার কোনোরকম উপক্রমণিকা না-করে অভিযোগ করলেন "উঃ কোন্ পাহাড়ের চূড়োয় থাকেন আপনি। কৈলাশের শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে হলেও এতো সিঁড়ি ভাঙতে হয় না। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।"

সুন্দরী এবার সহদেবের দিকে মুখ ফেরালেন এবং নিচু গলায় বললেন, "একটু জল!"

আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আমার ঘরে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। সহদেব আমার অবস্থা বুঝে মুখের দিকে তাকালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলাম, "পানি, সহদেব।"

সহদেব আমার চাকর নয়—আমার ঘরের অতিথিকে পানীয় সরবরাহের হুকুম তামিল করবার কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই। তবু সহদেব আমাকে বাইরের লোকের চোখে হেয় করলো না। "এখনই আসছি, হুজুর", বলে সে ক্ষিপ্রগতি হরিণের মতো প্রায় লাফ দিয়ে অদৃশ্য হলো।

অপরিচিতা সুন্দরীকে দেখে খুবই তৃষ্ণার্ত মনে হয়েছিল। তাঁর মুখে-চোখে একটা করুণ ভাবও ফুটে উঠেছিল—হয়তো লিফট নেই, এতোখানি এক নাগাড়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসতে গিয়ে মহিলার গলা শুকিয়ে উঠেছে।

"জল এখনই আসছে", এই আশ্বাস দিতে গেলাম।

কিন্তু সুন্দরীর মুখভঙ্গী এবার বিদ্যুৎগতিতে পরিবর্তিত হলো। ত্বক্ময় কান্তর মুখশ্রীতে এবার রহস্যময়ী অথচ অন্তরঙ্গ হাসি ফুটে উঠলো। উত্তেজনাহীন অনুচ্চকণ্ঠে সুন্দরী বললেন, "জল না এলেও কিছু এসে যায় না। এই মাত্র আমি আইস-কোল্ড কোকাকোলা খেয়ে এসেছি।"

তা হলে? আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম।

অপরিচিতা শান্তভাবে বললেন, "আসলে লোকটিকে আমিই বিদায় করতে চাইছিলাম। আমাদের দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে আর একটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে থাকুক এটা আমি চাই না।"

আমি একটু নার্ভাস হয়ে উঠছি। কী উত্তর দেবো ভাবছি। কারণ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর যে এখনই জলের গেলাস হাতে ফিরে আসবে তা এই মহিলার আন্দাজ করা উচিত ছিল।

মহিলা এবার তাঁর পরিচয় ঘোষণা করলেন। বললেন, "আপনি আমাকে চিনবেন না—আমি মিসেস পাপি বিশোয়াস।"

পাপি বিশোয়াস! প্রাতঃস্মরণীয় নাম—সুলেখার স্মৃতিবিজড়িত এ-নাম এরই মধ্যে আমি কেমন করে ভুলতে পারি?

পাপি বিশোয়াস বললেন, "আমাকে সোশ্যাল ওয়ার্কার, ট্রাভেল এজেন্ট, বুটিক ওনার যা-খুশি বা থ্রি-ইন-ওয়ান বলতে পারেন।"

বাটিক কথাটা আগে কানে গেলেও বুটিক শব্দটি আগে কখনও শুনিনি। ভাবলাম বাটিক শব্দটিই মেমসায়েবী উচ্চারণে বুটিক হয়েছে।

বোকার মতো আমি জিজ্ঞেস করে বসেছি, "বাটিক ছবি আঁকেন?"

"ও মাই 'গাড'! কেন দুঃখে আমি বাটিকের বিজনেস করতে যাবো? ওসব লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড মেয়েরা করে। আমি বুটিক-ওনার। বুটিক কথাটা শোনেননি?" বকুনি লাগালেন পাপি বিশোয়াস।

পাপি বিশোয়াস এবার ব্যাখ্যা করলেন, "ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড। মানে লেটেস্ট ফ্যাশনের জামাকাপড়, হ্যান্ডব্যাগ, পারফিউমস, এটসেট্রার ছোট্ট দোকান। আপনি পাপি ফ্লাওয়ারের নাম শোনেননি? হোয়াট এ পিটি! ইন্টারন্যাশনাল-ফেমাস বুটিক—আর আপনারা কলকাতায় বসেও নাম জানেন না!"

নিজের ওপরেই রাগ হলো। আমি যে সত্যিই একটা হাঁদাগঙ্গারাম তার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। মনে মনে স্মৃতির সর্বত্র টানাটানি করেও 'পাপি ফ্লাওয়ার'-এর খোঁজ পেলাম না।

কথায় একটু বাধা পড়লো। কারণ শ্রীমান সহদেব ইতিমধ্যে দু'গেলাশ জল হাতে ফিরে এসেছে। মণিপুরী নৃত্যের স্টাইলে মিসেস বিশোয়াস যেভাবে ঠোঁটের লিপস্টিক বাঁচিয়ে সামান্য একটু জল কণ্ঠনালিতে চালান করে দিলেন তা একটি দ্রষ্টব্য দৃশ্য। আমি ঠিক সেই সময়ে ঢক-ঢক করে পুরো গেলাশ জল নিঃশেষ করে দিচ্ছি।

"গুড হেভেনস! আপনি তো দেখছি আমার থেকেও থারসটি!" দাঁতে চিবিয়ে-চিবিয়ে পাপি বিশোয়াস আমার জল খাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে দ্বিধা করলেন না। "এ জানলে এতোখানি জল নষ্ট করতাম না আমি"। পাপি বিশোয়াস তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের রোশনাই ইতিমধ্যেই আমার ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

খালি গেলাশ হাতে সহদেব আবার অদৃশ্য হতে পাপি বিশোয়াস একটু স্বস্তি পেলেন। কিন্তু সেই অনুপাতে আমার অস্বস্তি বাড়লো—সহদেব এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই যেন আমার ভাল হতো।

পাপি বিশোয়াস এবার দন্ত-খচিত থেকে সিগারেট বার করে লিপস্টিকরঞ্জিত দুই ঠোঁটের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরলেন যেন বেচারার সিগারেট জন্ম সার্থক হলো। লাইটারে আগুন জ্বালাতে গিয়ে পাপি বিশোয়াসের খেয়াল হলো সৌজন্যের ত্রুটি হয়ে গিয়েছে। "ও আই অ্যাম সারি", বলে পাপি বিশোয়াস ব্যাগ থেকে সিগারেটের ঝকঝকে প্যাকেটটা বার করে আমার মুখের কাছে ধরলেন।

"নিন, এই সিগারেট এখানে পাবেন না।" মৃদু মন্তব্য করলেন পাপি বিশোয়াস। "আমার আবার ইমপোর্টেড ছাড়া চলে না। সিগারেট দু'দিন না খাবো তাও ভাল, তবু ঐ দিশী ঘাসপাতাগুলো স্মোক করতে পারি না!" মন্তব্য করলেন সুন্দরী।

সুন্দরীর সস্নেহ প্রস্তাব আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করায় পাপি বিশোয়াস একটু অবাক হলেন। "ও মাই লর্ড আপনি স্মোক করেন না? সিগ্রেট না-খেলে ম্যানলি হওয়া যায় না, মিস্টার শংকর!"

নিজের ঘরেই আমি মিইয়ে যাচ্ছি। কোনোরকম উত্তর না-দিয়ে অপরাধীর মতো দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম।

পাপি বিশোয়াস এবার সৌজন্যের আলোক বিকীরণ করে জানতে চাইলেন, "ডু ইউ মাইন্ড, ইফ আই স্মোক?"

"কিছু মনে করবো না—আপনি একশোবার স্মোক করুন", আমি সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলাম।

কিন্তু তবু পাপি বিশোয়াসকে সন্তুষ্ট করা গেল না। অভিযোগ, কৌতুক ও উপদেশের বিচিত্র ককটেল সংগীতে মিশ্রিত করে পাপি বিশোয়াস বললেন, "ইয়ংম্যান, এখনও সমস্ত ম্যানার্স শেখা হয়নি। অন্য কোনো মহিলা হলে খুউব রাগ করতো।"

আমি তো ওঁর কথা শুনে বেশ অপ্রস্তুত। পাপি বিশোয়াস ঠোঁটের

সাঁড়াশি থেকে সিগারেটটা কিছুক্ষণের জন্যে মুক্ত করে আমাকে ট্রেনিং দিলেন, "আমার আপত্তি নেই, আপনি স্মোক করুন বললেই পুরুষ মানুষের দায়িত্ব চুকলো না। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেশলাই অথবা আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে সাহায্য করতে হয়।"

শাজাহান হোটেলের রিসেপশনে কাজকর্ম করলেও কখনও মেয়েদের মুখাগ্নি করিনি। আজ সৌজন্যের ব্যাকরণ অনুসরণ করতে গিয়ে বেশ বিরক্ত হলুম।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে পপি বিশোয়াসের সিগারেট প্রজ্জ্বলিত করতে হলো।

অনেকখানি ধূসর ধোঁয়া এক সঙ্গে ছেড়ে ফরাসী ফ্যাশন ম্যাগাজিনের সুন্দরী-দের স্টাইলে আপনাতে-আপনি-পরিপূর্ণ পপি বিশোয়াস জ্বলন্ত সিগারেটটা দুটি নরম আঙুলের মধ্যে অবহেলাভরে ধরে রইলেন।

পপি বিশোয়াস তাঁর পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বের স্রোতে ইতিমধ্যেই আমাকে কোণ-ঠাসা করে ফেলেছেন। কারণ, কী জন্য এসেছেন, কী কাজ, এসব কোনো প্রসঙ্গ না-তুলেই তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাতে দ্বিধা করলেন না।

আরও একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ত্যাগ করে তিনি বললেন, "আপনার মতো ইয়ং ম্যানেজার তো কলকাতার কোনো ম্যানসনেই দেখি না। সব জায়গায় ওল্ড ম্যান। কম বয়সে যখন রক্ত টগবগ করে ফোটে, তখন এসব কাজ ভাল লাগে? বোরিং মনে হয় না?"

"ভিক্ষের চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া! আমি উত্তর দিই। "চাকরিই পাওয়া যায় না।"

"ওমা! চাকরির আবার অসুবিধে কী? কত লোক আসেন আমার কাছে। আমাকে অবলাইজ করবার জন্যে ছটফট করেন—চাকরি দিতে পারলে ধন্য হয়ে যাবেন!"

লোভ লাগালেও পপি বিশোয়াসের কথাগুলো আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তাছাড়া একেবারে নতুন লোক, প্রথমেই এত ভাল ভাল কথা ঠিক নয়।

পপি বিশোয়াস খানিকটা ধোঁয়া হজম করে বললেন, "আপনাদের এসব লাইনে মাইনে খুব কম, আমি জানি। সুবিধের মধ্যে দুটো একস্ট্রা পয়সা রোজগারের সুযোগ আছে। দু'তিনটে বাড়ির ম্যানেজার-দের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। রেগুলার ডিলিংসও রয়েছে বলতে পারেন।"

পপি বিশোয়াসকে এই মুহূর্তে খুব দয়াবতী মনে হলো। ছটফটে পপি এবার যে-মুদ্রায় স্থির হয়ে রইলেন তাতে তার মসৃণ বাম বাহুমূলের গভীরতম অঞ্চল গুলিও সম্পূর্ণ দৃশ্যগোচর হলো।

পপি বললেন, "যেখানে আমার বুটিক

মহম্মদ হানিফ। বেস্ট অফ রিলেশনস্‌ আমার সঙ্গে। আমার পলিসি হলো, এই বিজনেসে যখন রয়েছি তখন যার যা ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা তার থেকে তাকে বঞ্চিত করবো না। হানিফ সায়েবকে জিজ্ঞেস করবেন, না চাইতে যোগ্যে অন্যের জায়গায় আঠারো অনা দিয়ে দিই ওঁকে।"

একটু হাসলেন পপি বিশোয়াস। "আপনাদের লাইনে নিজেদের মধ্যে তো ভিতরে ভিতরে জানাশোনা থাকে।

জিজ্ঞেস করে দেখবেন হানিফ সায়েবকে। ও-বাড়ির মালিক আচমকা সব ফেলে রেখে পাকিস্তানে পালিয়েছে। হানিফ সায়েবই বলতে গেলে অল-ইন-অল।"

আমি এই মহম্মদ হানিফকে চিনি না—চেনবার তেমন আগ্রহও নেই। কিন্তু পপি বিশোয়াস নিজের খেয়ালেই হড়ে হড়ে করে বললেন, "ম্যানেজারের সঙ্গে ভাল সম্পর্কের হাতে হাতে ফল। হানিফ সায়েব যেভাবে আমাদের হেল্প করেন, বাড়িটর মেয়েগুলোর ওপর নজর রাখেন—আপনাকে কী বলবো!"

একটু হাসলেন পপি বিশোয়াস। "আপনি যখন এ-বাড়ির ম্যানেজার তখন সবই তো বোঝেন। যে পুজোর যে মন্তর। বাড়িটা আমার পক্ষে খুব ইমপর্টান্ট। কারুর ওখানে পায়ের ধুলো ফেলতে সংকোচ হয় না। তবু কখন কী হয় বলা যায় না। কিন্তু হানিফ সায়েব সব সময় এমন কড়া নজর রেখেছেন যে আমার কোনো চিন্তাই হয় না।"

বাড়িটর ব্যাপারটাও এবার একটু গোলমেলে ঠেকছে আমার কাছে। ম্যানেজার হানিফ কী ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকেন তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

পপি বিশোয়াসের সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছে। হাতের কাছে ছাইদানি দেখতে না পেয়ে সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ফেলে দিলেন পপি বিশোয়াস। তারপর বেমালুম আমাকে বললেন, "চটি দিয়ে আগুনটা একটু চেপে দিন তো, মিস্টার শংকর।"

বিপাকে পড়ে অগ্নি-নির্বাপণও আমাকে করতে হলো। পপি বিশোয়াস ততক্ষণে আবার কথা বলতে শুরু করেছেন। বললেন, "আমার সঙ্গে কারবারে কারুও অসুবিধে হয় না, মিস্টার শংকর।"

এবার পপি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী রকম পেয়ে থাকেন আপনারা!"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি বললাম, "মাইনে নামমাত্র।"

"দূরে মশায়!" বকুনি লাগালেন পপি বিশোয়াস, "মাইনের কথা কে জিজ্ঞেস করছে? আর সব?"

আমার তো আকাশ থেকে পড়বার অবস্থা। "আমাকে? উপরি?"

পপি বিশোয়াস মোটেই দমলেন না। প্রত্যুত্তরে উনিও আকাশ থেকে পড়লেন। "ওমা! চৌত্রিশ নম্বরের সুলেখা সেন। ও আপনাদের কিছু দেয় না?"

আমাকে নির্বাক দেখে পপি বিশোয়াসের কী আফসোস। "ওমা! ছি ছি। এতো 'মীন'—একটা পয়সাও হাতছাড়া করে না। আমি তো ভাবতেও পারি না, আমার মান্থলি ব্যবস্থা তো আছেই—তাছাড়া টুকটাক, এটা সেটা মাঝে-মধ্যে পেয়েই যাচ্ছেন। না হলে চলবে কেন—সবারই তো ঘর-সংসার আছে, খরচাপাতি আছে।"

পরবর্তী প্রস্তাব আলোচনার জমি তৈরি হয়েছে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পপি বিশোয়াস আবার ব্যাগ খুলে ফেললেন এবং ভিতর থেকে একটি বিলিতি ফয়েলে মোড়া প্যাকেট বার করে হাতে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন। এবার একটি ট্যাবলেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আর একটি নিজের মুখে পুরে ফেললেন পপি বিশোয়াস।

বললেন, "এখানে পাওয়াই যায় না। মেড ইন জাপান। স্মোকিং-এর পর মুখে রাখলে গলাটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।"

আমার দিকে এগিয়ে দেওয়া ট্যাবলেটের মোড়কটা খুলতে খুলতে পপি বললেন, মুখে পুরে দিন, খুব ভাল লাগবে। গলাটা আপনার এয়ার কন্ডিশন হয়ে যাবে। আমার পুরনো কাস্টমাররা জানে, ওরাই নিয়ে আসে। না হলে, কলকাতায় এসব জিনিস আমি কোত্থেকে পাবো?"

আমার দ্বিধা তখনও কাটছে না। এবার খিল খিল করে হাসলেন পপি বিশোয়াস। "ভয় নেই, আপনাকে বিষ খাওয়াচ্ছি না। মিষ্টি-মিষ্টি টক-টক ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঝালঝাল পিকুলিয়র টেস্ট—কখনও খাননি।"

অগত্যা মুখে পুরতে হলো। জিনিসটার স্বাদ আমার তেমন ভাল লাগছে না। কিন্তু উপরোধে অনেকে ঢেঁকিও গেলেন।

পপি বিশোয়াস এবার আসল প্রসঙ্গে এলেন। জাপানী ট্যাবলেট গালের এক পাশে চালান করে পপি বললেন, "যে জন্য আপনাকে ডিসটার্ব করতে এলাম মিস্টার শংকর। চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা আমি চাই।"

চৌত্রিশ নম্বর! চাবি? আমি কি উত্তর দেবো ঠিক করে উঠতে পারছি না।

পপি বিশোয়াস একগাল হেসে বললেন "ভাবছেন, চৌত্রিশ নম্বরের চাবি চাইবার ইনি আবার কে? সুলেখাকেই তো একমাত্র চিনতাম। কিন্তু জানবেন, আমিই সব! মিস্টার জেঠমালানি আমার বহুদিনের ফ্রেন্ড। বহু ব্যবসা-বাণিজ্য করেছি এক সঙ্গে। আমি সব জানি! সুলেখা সেন যে আজ সকালে বিদায় হয়েছে তাও জানি। এখন লক্ষ্মীটি মিস্টার শংকর চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা আমাকে দিন।"

পপি বিশোয়াসের কথাগুলো বরফঠাণ্ডা হাওয়ার মতো আমার কানের মধ্যে ঢুকছে। এমন কিছু চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা এখনও পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু অজানা আশঙ্কায় আমার সমস্ত শরীরটা শিরশির করে উঠলো।

(ক্রমশ)

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

হৃষীকেশ দেব বর্মণ

হৃষীকেশ দেব বর্মণের ছবি দেখে আমি একটু বিচলিত হয়েছি। মনে হচ্ছে সময়যানে চেপে আমাকে কে যেন পিছিয়ে নিয়ে গেছে। আমি যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে বড় হয়েছি। যুদ্ধের বছরগুলোর আগেকার ছবি মনে আমার না থাকারই কথা। কিন্তু তবু মনে হলো আমাকে যুদ্ধের আগেকার আঁকা ছবির জগতে নিয়ে গেলেন তিনি। যেন বিনোদবিহারী, রামকিংকর আসেননি। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' এবং 'বম্বে গ্রুপের' বিদ্রোহ ঘটেনি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিল্পকলার ক্ষেত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিকার, নেশা বিস্তার না এসব কিছু ঘটেনি। পুরনো কোনো বাড়ি, প্রাসাদ বুঝি হবে ভাঙা ক্ষয়ে যাওয়া। দু একটা বাদুড় চামচিকে অন্ধকারের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যের জগৎ। কিন্তু কেমন যেন রিক্ত, নীরক্ত, বৈভবহীন। পুরোনো বহু ব্যবহৃত, জীর্ণ সব বিষয়। আমাদের পিতা-পিতামহদের এই জগৎ দেখলে মনটা কেমন হাহাকার করে ওঠে (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ১—৭ই মার্চ)।

বুদ্ধজীবনী ঠিক কী করে আঁকলে তার রূপবন্ধ, চিন্তাধারা আধুনিককালের মানুষকে নান্দনিক তৃপ্তি দেবে সেটা ভাববার মতো প্রশ্ন। বিনোদবিহারীর 'হিন্দী সন্ত' বা নীরদ মজুমদারের দেব-দেবী পুরাণের ছবি নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদীর কাছেও কান্ত আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। মীরা বাঈ, বাসবদত্তা সংঘমিত্রা, অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদা এসব ঢের আগেকার এক ধূমাভ পাণ্ডুলিপি। তবু সেই যাদুকরী ক্ষমতা যেন নেই যা না-কী এই প্রস্তর নগরকে জাগাতে পারে।

সন্তোষ মনছান্দা

সন্তোষ মনছান্দার (জ ১৯২৭, শ্রীনগর) রেখাচিত্র দেখে নান্দনিকভাবে উত্তেজিত হবার খোরাক পেয়েছি। বেশির ভাগ ছবি ফেল্ট কলমে আঁকা। সাধারণ গ্রাম্য মানুষজন, হাটুরে দৃশ্যাদিকে ভেঙে ভেঙে সরলতম জ্যামিতিক এবং তারও পরে প্রায় বিমূর্ত নকশার ধার ঘেঁষে আবার ক্রমশ প্রত্যাবর্তন করেছেন মূর্তলোক। মাছ, ঘোড়া, মানুষ—যাই হোক, বাঁধুনি

ঘোড়া সন্তোষ মনছান্দা

রেখাগুলো কঠিন। কোনো চাঞ্চল্য বা ছন্দ এখানে শ্রীযুক্ত মনছান্দার অনভিপ্রেত।

হয়তো কখনো মূল রূপবন্ধকে ঘিরে মোটা ছায়া, হয়তো পরিকল্পিত এবং আপাত অবিনাস্ত জ্যামিতিক আকার—অর্ধ-বৃত্ত, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ এবং এসব আকারের অভ্যন্তরে নানামুখী সরল, বক্র, অ কাবাঁকা বৃত্তাকার, ভাঙা রেখার জাল। কখনো কখনো এসব খেলার সারল্য প্রায় মাটিঘেঁষা লৌকিক—কাঁথা, আলপনা, চিত্রলেখ (motifs) তুলে এনেছেন। আবার কখনো ভাস্কর্যের খসড়া রেখাচিত্র বলেও ভ্রম হয়েছে। কখনো আবার কুচিকুচি রেখার অলংকরণের বাহুল্য ছবিকে বিব্রত করেছে। তবে তেমন উদাহরণ কম।

এসব ছবিল ছবির সহজ ভাষা বা সরলতম রূপের অনুষঙ্গ মনকে গ্রীষ্মের সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ার মতো দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে দেয়। ঘাড় বেঁকিয়ে বসে থাকা নারীরা সব ক্রমশ কেমন হাওয়ায় দোলায়মান ফুল হয়ে যায়। গরুর গাড়ি আরোপিত সারল্য কুসুমযানে পরিণত হয়। কখনো শহর, মোটরগাড়ি শিশু চিত্রের সরলীকরণে আস্তে আস্তে লোকচিত্রের কাছে চলে যায়—কিন্তু এসব ছবিতে নগর-বাসের যন্ত্রণা আসে বিকৃতিকরণের ভঙ্গীতে। তবে শেষের দিকে পুনরাবৃত্তি কিঞ্চিত ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল।

লোকচিত্রকলা

"লোকচিত্রকলা" একটি শিল্পী-গোষ্ঠীর নাম। এতে আছেন নির্মাল্য নাগ, রবীন দত্ত, অমর দে প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী। অর্থাৎ দলটি পুরনো কিন্তু নামটাই শুধু নতুন। শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস তাঁরা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরবেন বলে সংকল্প করেছেন (আকাদমী অব ফাইন আর্টস ২৮শে ফেব্রুয়ারী—৬ই মার্চ)। গোইয়া, ভ্যান গঘ, পিকাসো থেকে শুরু করে আধুনিক মেক্সিকান শিল্পীদের কাজ প্রমাণ করে যে সেটা সম্ভব। কিন্তু তার জন্যে চাই নতুন পুরানকল্প ও রূপবন্ধের অনুসন্ধান, প্রচুর চিন্তাভাবনা এবং অবশ্যই কবজির জোর। রুশী বা পূর্ব ইউরোপীয় সরকার অনুমোদিত চিত্ররীতির অনুসরণে—যার পোশাকী নাম সামাজিক বাস্তববাদ—ভাল পোস্টার আঁকা যায়, ছবি নয়। প্রদর্শিত বহু ছবি পরিষ্কার পোস্টার, ছবি নয়, দর্শকমাত্রই একথা স্বীকার করবেন। তবু ভাবনা চিন্তা করে কিছু ছবি যে আঁকা হয়েছিল সেটার প্রমাণ রয়েছে। ব্যর্থ ছবি ছেড়ে সার্থক ছবির কথা বলা যাক।

প্রথমেই বলতে হয় কুনাল করের কথা। এর একটা সাদা-কালো ছবির মধ্যে কিছু নিরীক্ষার আয়োজন আছে। ছবির নাম 'জীবনের মূল্য'। একটি অনুভূমিক রেখার ওপর পর পর কয়েকটি মানুষ উঠে একটা কাল্পনিক সিঁড়ি হয়েছে। সবার ওপরে বসে থাকা লোকটি পৌঁছে গেছে ওপরে। তেমনি তাঁর 'অবাঞ্ছিত' নামে হলুদ-সাদা অংকনধর্মী বড় কাজটিতে কিছু শুয়ে থাকা মানুষ আছে যাদের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে একটি কুণ্ডলী পাকানো মেয়ের দেহকে। কাজটি মোটের ওপর মন্দ নয়।

পঞ্চানন চক্রবর্তীর মিশ্র মাধ্যমে—জলরঙ, কালি, প্যাস্টেল মিলিয়ে আঁকা ছবিতে অদ্ভুত নৈসর্গিক রূপকে ভেঙে জ্যামিতিক আকারের মধ্যে বেঁধে রঙ নিয়ে কিছু খেলা খেলেছেন। এই ছবিগুলো বেশ, যদিও অন্যদের কাজের সঙ্গে মেজাজে মেলে না।

রবীন দত্তের কাঠকয়লা দিয়ে করা জনৈক বৃদ্ধার মুখ খুবই সংবেদনশীল। বিশেষত চোখের মধ্যে বেদনার ভাবটা খুব সুন্দর ধরেছেন।

নির্মাল্য নাগের তেলরঙ ছাপবার প্রক্রিয়া বা অঙ্কন ভাল। তবে সমস্ত ভঙ্গী এতো নাটকীয় এবং পাড়াপাড়াদের পোস্টারী বোধ হয় যেন। মুষ্টিবদ্ধ হাত আর পেশী দেখলে পাড়ার ব্যায়াম সমিতির ছেলেদের কথা মনে পড়ে। এঁর বক্তব্য এতো সোচ্চার এবং এঁর সংযম আর ব্যঞ্জনা এতো কম যে শেষ পর্যন্ত ছবি বলে মনে হয় না। আসলে প্রথাগত বাস্তব ছবির ভাষা দিয়ে তিনি চীৎকার করে কথা বলছেন। ধরুন ষণ্ডামার্কা আততায়ীকে চিৎ করে ফেলে দিয়েছে একজন পেশীবহুল পাজামাপরা লোক। ছুরিটা হাত খুলে পড়ছে পাশে —ক্যাপসান 'এসব চলবে না'।

রবীন দত্তের ময়দানের একটি মৃত্যু' সবুজ ফেলট গালিচার ওপরে একটা ঘোড়ার মৃত্যুর দৃশ্যের মধ্যে রস আছে। যদিও সিলুট করা মানুষের জটলা সিনেমার ব্যানারের কথা মনে করিয়ে দেয়। রবীন দত্তের অন্যান্য ছবিও মন্দ লাগে না।

বক্তব্যের দিক এঁরা অনেক ভেবেছেন, এবার নান্দনিক দিক সব ভাবার পালা। এই উভয়ই পরস্পর পরিপূরক।

সন্দীপ সরকার

বই নিয়ে মেলা

সুদেষ্ণ রায় চৌধুরী

শেষ দিন দিয়েই শুরু করছি। বিকেল পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা হবে। পরিষ্কার আকাশ। পশ্চিমে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উপর সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এ প্রান্তে রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে কৃত্রিম ফোয়ারা থেকে দোল খেলার পিচকিরির মত জলধারা বেরিয়ে আসছে। গতি অপ্রতিহত। রাস্তাটা পার হলেই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম বা তারা ঘর। তারাঘরের সামনের দিকে মুক্ত অংগনে অগণিত মানুষের ভিড়। বিরাট লাইন। সাপের মত আঁকা বাঁকা ওই লাইনের একেবারে লেজের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বর্ষীয়ান লেখক ও তাঁর স্ত্রী। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। আর কতটুকু সময়ই বা হাতে আছে। ঘণ্টা চারেকের বেশি নয়। রাত নটায় গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সংগে পরিসমাপ্তি ঘটবে দশদিনব্যাপী এই 'বই মেলা'র।

উদ্যোক্তাদের একজন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। লেখককে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন। কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'স্যার, আপনারা আমার সংগে আসুন।' বর্ষীয়ান এই লেখক হলেন অন্নদাশংকর রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লীলা রায়। বিদেশিনী হলেও তাঁর পরনে ছিল শাড়ি। অন্নদাশংকরবাবুর সংগে বই মেলায় দেখা হতেই এই ঘটনাটি জানালেন। দামী দামী শাড়ি নয়, বই কেনবার জন্য যে এত ভিড় হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। বিশেষ করে শেষ রবিবার। সব মিলিয়ে দু লাখ বই-প্রেমিক মেলায় এসেছেন। কালো অক্ষরে বাঁধা নানান দুর্লভ জিনিস চোখে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। ভালভাবে স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অনেকেই করকরে নোটের বিনিময়ে দু-একখানি বইকে সংগী করে বাড়ি ফিরেছেন। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে আবার কেউ কেউ তাঁদের 'প্রিয়তম বইখানি' কিনতে পারেননি। অনেকটা বরের কনে পছন্দ করার মত। কনে পছন্দ হয়েছে বরের। কিন্তু পণের টাকা নিয়ে যত গোলমাল। সাহিত্য আকাদমির স্টলে সদ্য বিবাহিত এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ হল। জারনালিজম-এ এম এ। চেকভ, দানিকেনের বই তাঁর ভাল লাগে। স্বামী ব্যাংকে কাজ করেন। দু-দিন বই মেলায় এসেছেন। অসমিয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার একখানি বই হাতে নিতে নিতে বললেন, 'দেখুন, বই দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পয়সা পাব কোথায়? আমি তো বেকার। স্বামীর উপর কতটা চাপ দেওয়া যায়?"

অর্থাভাব আছে ঠিকই। তাই বলে বইয়ের বিক্রি কিন্তু থেমে নেই। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী—সব মিলিয়ে গতবারে বই মেলায় বিক্রি হয়েছিল
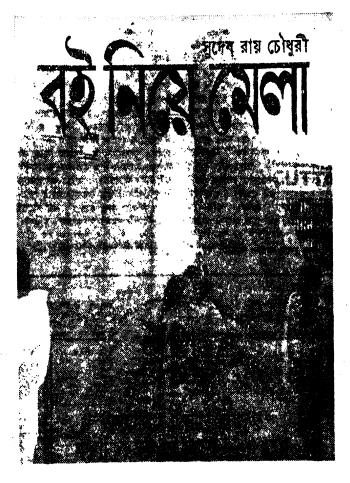
উপর। এবার ওই পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হবে। অথচ এই মেলার বয়স মাত্র দু বছর। কলকাতায় এ ধরনের গ্রন্থ মেলা করার সবটুকু না হলেও অনেকখানি কৃতিত্বের দাবি রাখে বুক সেলারস অ্যান্ড পাবলিশারস গিল্ড। গিল্ডই এই মেলার উদ্যোক্তা।

এবারের মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল কলকাতার বাইরে থেকে একাধিক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার উপস্থিতি। বিদেশী প্রচার সংস্থাগুলির 'গ্ল্যামারের' আড়ালে এঁদের গুরুত্ব চাপা পড়েনি। অসমের রাজ্য পুস্তক পর্ষদের স্টলে দেখা গেল ভারতীয় প্রকাশনা শিল্পের, ইদানীংকালের এক সম্পদ 'হস্তিবিদ্যার্ণব' নামে পুরনো সচিত্র পুঁথির সেই চমৎকার মুদ্রণ, বোমবাইয়ের একটি প্রকাশনের স্টলে ছিল দামোদর ধর্মানন্দের ইতিহাস গ্রন্থের পাশে বিখ্যাত শিল্পী জর্জ কীট চিত্রিত ও অনুবাদিত 'গীতগোবিন্দ', অরুণাচলের স্টলে ভেরিয়র এলউইন সম্পাদিত উত্তরপূর্ব সীমান্তের

একবার খুললে আর বন্ধ করতে মন চায় না।

আবার ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্টলে ঢুকলেই বিদেশী চিত্রকলার স্বাদ পাওয়া যায়। ওই স্টলে ঢুকতেই জনৈকা তরুণী আমার সামনে একখানি প্রকাণ্ড বই তুলে ধরলেন। বললেন, 'এই দেখুন লুভ্যর। মোনালিসা থেকে সব চিত্রের সংগে পরিচিত হতে হলে এই গ্রন্থখানি অপরিহার্য। শুধু ফ্রান্স নয়, সারা বিশ্বের চিত্রকলার সম্ভার স্থান পেয়েছে প্যারিসের লুভ্যর যাদুঘরে। ফ্রান্সের ম্যাজেনড প্রকাশন সংস্থা লুভ্যর-এর মত গ্রীক, মিশর এবং সর্বশেষে ভারতের শিল্পকলার নিদর্শনসমূহের সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ভারতের শিল্পকলা সংক্রান্ত গ্রন্থখানির দাম ছ'শো টাকার মত। দামটা বড্ড বেশি। ওই স্টল থেকে বেরিয়ে আসতেই অন্য আর একটি স্টলের পাশে লেখা দুটি লাইন চোখে পড়ল। 'বই

আমেরিকার তথ্য কেন্দ্রের স্টলটিতেও নানান ধরনের বইয়ের সমাবেশ। বেশ ভিড়। বই সব মলাট দেখেই বেরিয়ে আসতে হল। তার কারণ এই স্টলে বই দেখার আগ্রহ দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এখানে বই বিক্রি হয় না। শুধু দু চোখ ভরে দেখা। পাতা উলটে পালটে মুহূর্তের জন্য হলেও ভাল জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা। একটু এগোতেই ম্যাকমিলান [illegible] [illegible], অ্যালায়েড পাবলিশারস, অকস-ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। আর এপাশে বিকাশ পাবলিকেশনস-এর সাজানো গোছানো বড় স্টলটি অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস মণ্ডপে ওই প্রেসের প্রকাশিত কয়েকজন লেখকের রচনার প্রতিলিপি প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে শেকসপিয়ারের নিজের লেখা পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। আগামী বছরেই এই প্রেসের পাঁচশো বছর পূর্ণ হবে। শেকসপিয়ার এই প্রকাশন সংস্থার প্রথম যুগের একজন লেখক। অকসফোর্ডের জন্মের মাত্র এক বছর আগে ১৪৭৭ সনে ইংলণ্ডের প্রথম বই ছাপা হয় ক্যাকসটনের মুদ্রণশালায়। এই স্টলে আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস হল এডওয়ারড লীয়রের একটি স্বচিত্রিত কবিতার প্রতিলিপি। একশো চার বছর আগে লীয়র ১৮৭৩ সনে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতার ভিড়, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যে তিনি বেশি দিন এখানে থাকতে পারেননি। তবে যাবার আগে এই শহরের নামকরণ করে যান 'হাসলফাসাবাদ' (Hustlefussabad)। লীয়র কলকাতাকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। তারই প্রতি-লিপি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে এই স্টলে। কবিতাটির বিষয়বস্তু 'কলকাতার এক বৃদ্ধ'। ভোজনবিলাসী এই বৃদ্ধের মৃত্যু হয় অতি-লোভে বিরাট এক মাফিন গলায় আটকে। লীয়রের অননুকরণীয় কার্টুন দেখে মনে হয়, বুঝি বা কলকাতা শহরে লীয়র সত্যিই এই মানুষটিকে দেখেছিলেন। আরেকটি প্রতিলিপিতে ১৯১৮ সনের এক পত্রে এজরা পাউন্ড মার্কিনী ইংরেজিতে সাধুবাদ জানাচ্ছেন জেমস জয়েসকে। ঐতিহাসিক আরনলড টয়েনবি, জন হিকস, টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড থেকে শুরু করে জেমস জয়েস—সবারই বইয়ের কম বেশি চাহিদা আছে। আবার ওরিয়েন্ট লংম্যানও পিছিয়ে নেই। তাঁদের প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়ের 'আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস' বই-খানি এরই মধ্যে 'বেসট সেলার'-এর পর্যায়ে পড়ে গিয়েছে।

মেলার উদ্যোক্তা পাবলিশারস অ্যান্ড বুক সেলারস গিল্ড-এর কর্মকর্তারা খুবই ব্যস্ত। এর মধ্যে এক ফাঁকে অন্যতম কর্তা বিমল ধরের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। বয়সে তরুণ, ইনিই হলেন মধ্যমণি। বিমলবাবুর কাছেই জানতে পারলাম গত বছর সাতষট্টিটি প্রকাশন সংস্থা মেলায় যোগ দিয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। মোট ১৩০টি। সারা ভারত তো বটেই, বিদেশ থেকেও কেউ কেউ এসেছেন এই মেলায় যোগ দিতে। যে সব প্রকাশন সংস্থা সরাসরি নিজেরা স্টল নিতে পারেননি তাঁরা ওই ১৩০টি স্টলের মধ্যে কতক-গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের বই প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। এ ধরনের একটি প্রকাশন সংস্থা হল পুঁথি-পত্র। বাংলাদেশের (ঢাকার) সাম্প্রতিককালের উপন্যাস, কবিতা, গল্প সঞ্চয়ন, জীবন-কথার প্রকাশক 'মুক্তধারা' ওই পুঁথিপত্রের স্টলে নিজেদের বই রেখে দিয়েছেন। মেলা কমিটির বিচারে এই পুঁথিপত্রের স্টলটি ডিসপ্লের জন্য দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রথম স্থানাধিকারী হল পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশন পর্ষদ। এ ছাড়া বিশেষ পুরস্কারটি জুটেছে আমেরিকান তথ্যকেন্দ্রের স্টলের কপালে। কমিটির বিচারের খুঁত ধরতে চাই না। তবে বাংলায় না হলেও ইংরেজী বইয়ের অন্ততপক্ষে চার পাঁচটি স্টলের অঙ্গসজ্জা যে খুবই উন্নত মানের ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই পুরস্কারকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর প্রকাশন সংস্থার মধ্যে কিছুটা ক্ষোভও যে প্রকাশ পায়নি সে কথা জোর করে বলা যায় কি?

মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘোরার সময় কখনও কখনও মনে হয়েছে যে, বিদেশের কোন দোকানে ঢুকে পড়েছি। বিশেষ করে ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, পশ্চিম জারমানি, ফ্রান্সের স্টল-গুলির সামনে দাঁড়ালে মুহূর্তের জন্য হলেও মনটা সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারে চলে যায়। সমুদ্রযাত্রা যাঁদের ভাগ্যে নেই তাঁরা অন্ততপক্ষে দুধের স্বাদ ঘোলে

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে কলকাতার বৃহত্তম বই মেলা

দেশ

মেলার মত পাশ্চাত্যের ওই সব দেশের সাম্প্রতিককালের বই ও তার লেখকদের নামের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, সাহিত্য আকাদেমি, পাবলিকেশন ডিভিশন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টরিকাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, আরকিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার স্টলও চোখে পড়ল। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী, কলকাতা, উত্তরবঙ্গ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বইও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

ইংরেজী বইয়ের বেশির ভাগ স্টলই দেখতে সুন্দর। সাজানোও ভাল। তাই বলে বাংলা বইয়ের স্টলের প্রতি কটাক্ষ করছি না। বইয়ের মেলা যে এত বিশাল হতে পারে তার অভিজ্ঞতা অনেকেরই ছিল না। একজন বাংলা বইয়ের প্রকাশক জানালেন, 'এবারই প্রথম আসছি। সামনের বছর ভাল করে স্টল সাজাব।' ইংরেজীর মত বাংলা বইয়ের প্রকাশকদের ক্ষেত্রে একটা কথা প্রযোজ্য। এবং তা হল একটি প্রকাশক অনেক উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা, শিশুসাহিত্য, জীবনচরিত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু বিক্রির বাজারে পাঁচ ছখানি বই যথেষ্ট সর্বাপেক্ষা বেশি কাটতি হয়। কোন প্রকাশন সংস্থার নাম করতে চাই না। মেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একজন পুস্তক বিক্রেতা বললেন, দেখুন, আমরা স্রেফ শরৎ গ্রন্থাবলী আর রাজশেখর বসুকে নিয়ে বেঁচে আছি। অন্যান্য বইয়ের বিক্রি এঁদের তুলনায় খুবই কম।' আবার পাশেই অন্য একটি স্টলে এক ভদ্রলোক জানালেন, 'আমাদের উপন্যাস, কবিতার বাজার খারাপ নয়। তবে সুকুমার রায় ও তার ছেলে সত্যজিৎ-এর ডিমান্ড খুবই বেশি। কিশোর কিশোরীদের কাছে তো বটেই, তরুণ তরুণীদের মহলেও সত্যজিতের কদর যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের চেয়ে কম নয়। এ ছাড়া, শরদিন্দু অমনিবাসের চাহিদাও বেশ।' এইভাবে কারও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন কিংবা একাধিক সাহিত্যিকের বই সম্বল করে বেঁচে থাকতে হয়। নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশকরাও কম পয়সা পাননি।

একটা ইংরেজী বইয়ের স্টলের বিক্রেতা জানালেন, স্যার, ওই দেখুন, আগাথা ক্রিস্টি ট্যাগ করে রাখা আছে। কেউ ছুঁয়েও দেখছে না। অথচ বছর চার পাঁচ আগেও ক্রিস্টির সব বই হটকেকের মত বিক্রি হত। এমনকি পারি মেসনের বইও আর কাটতে চায় না, কাস্টমারদের হাতে তুলে দিলে তাঁরা বলেন, ওতে নতুন কিছুই নেই। অন্য বই দেখান। হেডলি চেজের বাজারে ভাটা পড়লেও এখনও কিছু চাহিদা আছে। বরং সেই তুলনায় বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের সিরিয়াস বই ভাল চলছে। দাম বেশি বলে বিক্রি কম। এই তো দেখুন নোবেল লরিয়েট আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের লেখা 'ক্যানসার ওয়ার্ড' বইখানি এরই মধ্যে পাঁচ ছখানি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। হ্যারল্ড
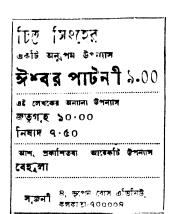
ব্রাজিলের বইয়ের চাহিদাও কিছুটা আছে। আবার জর্জ বার্নার্ড শয়ের অনেক বই পচে যাচ্ছে। শুধু ইংরেজী কেন, আমাদের এই বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা লেখকের বই বাজারে প্রায় অচল। অথচ এর মধ্যে এমন দু'একখানি বই আছে যা প্রকাশের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এই সব লেখকের অনেকে জীবিত এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, তাঁদের নাম উল্লেখ না করাই ভাল।

বই মেলার শুরু ২৬ ফেবরুয়ারি। শেষ ৬ মারচ। শেষের তিনদিন অনেকটা নীলামের মত বই বাজার খোলা হয়। বই বাজারের অভিনবত্বে অনেকেই কৌতুক বোধ করেন। শস্তার তিন অবস্থা কথাটি বোধ হয় এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই শস্তায় বই পাবার আশায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। কোথাও কোন বিক্রেতা মাথায় মজার টুপি পরে ঘণ্টা বাজিয়ে খদ্দের ডাকছিলেন। সেই ছেলেবেলার হকারের কাছে যা লেবে তা দো আনা, লেলে বাবু দো আনা'য় জিনিস কেনার মত। একটা টেবিলের উপর যোলো সতেরো বছরের একটি তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দু হাত তুলে তরুণীটি ইংরেজীতে চেঁচাচ্ছিলেন—টেক দি বেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট বুক। কাছে গিয়ে দেখলাম

'টেক দি বেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট বুক' ফটো : দেশ

তাঁর হাতে রান্নার ইংরেজী বই। পাঁচখানি মোটা বইয়ের দাম মাত্র দু টাকা। সবই বিদেশে ছাপা। ভিড়ের চাপে বই খোঁজা শক্ত। খুঁজেপেতে দেখলে হয়তো দু'একখানি মনের মত মিললেও মিলতে পারে। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছিল এক সেট রান্নার বই। আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন একজন সাহিত্যিক ও কবি। বারট্রান্ড রাসেলের আত্মচরিত বই বাজারে শস্তায় বিক্রি হচ্ছে দেখে তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডটি আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি একখানি ডাক্তারি বই কিনে বই মেলায় আসার সার্থকতা প্রমাণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের বইয়ের চাহিদা বেড়েই চলেছে। ক্রেতাদের সুবিধার জন্য বিশ্ব-ভারতী শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে ডিসকাউণ্ট দিতে চেয়েছিলেন। বিশ্ব-

লীয়রের কবিতার সঙ্গে তাঁরই আঁকা কার্টুন

ফটো : দেশ
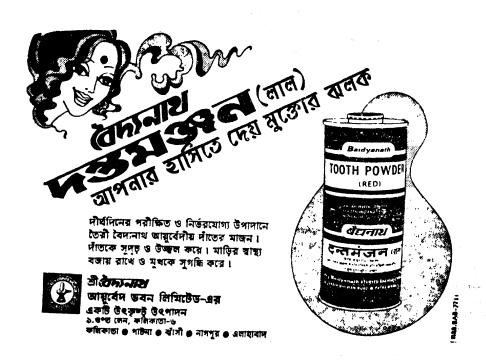
ভারতীর একজন ভদ্রলোক জানালেন, মেলা কর্তৃপক্ষ শতকরা দশ টাকার বেশি ডিসকাউন্ট দেবার ব্যাপারে অনুমতি দেন নি। আবার এর উলটো অভিযোগও পেলাম। কোনও কোনও প্রকাশক এক পয়সাও ডিসকাউন্ট দেননি। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটেও দেখলাম, রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত রচনাবলী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা সহ ছবির বেশ চাহিদা। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্টলে রামকৃষ্ণ, স্বামী অভেদানন্দ, সহ বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক ভালই বিক্রি হয়েছে। এর কাছেই হরেকৃষ্ণ সমাজের স্টল। স্লাইড-যোগে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের গতি প্রকৃতি দেখার জন্য স্টলের সামনে ভিড় জমে যায়। ধর্ম ও দর্শন এবং রাজনীতির উপর শ্রীঅরবিন্দের অনেক লেখা আছে। কিন্তু এবার বই মেলায় শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী যে স্টলে প্রদর্শিত হয়েছে সেখানে অরবিন্দের লেখা প্রেমের কবিতা চোখে পড়ল। কবিতাটির নাম—প্রেম ও মৃত্যু। শ্রীঅরবিন্দ বরদায় অবস্থানকালে ১৮৯৯ সনে এই কাব্য রচনা করেন। প্রেম যে মৃত্যুকে জয় করতে পারে তাই বর্ণিত হয়েছে ওই কবিতায়।

শিশুসাহিত্যের চাহিদাই বেশি। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী সব ভাষাতেই। এর পরই উপন্যাস, ডিটেকটিভ গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি। বাংলা বইয়ের তুলনায় ইংরেজী বইই বেশি বিক্রি হয়েছে। ইংরেজী বইয়ের মধ্যে আবার স্কুল, কলেজ, ইনজিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্য পুস্তকই বেশি বিক্রি হয়েছে। ইংরেজী বই বেশি বিক্রি হবার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা বই, বিশেষত গল্প, উপন্যাস, পাড়ার দোকানে সব সময়ই পাওয়া যায়। তা ছাড়া, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন ও শারদমেলায় অনেকেই বেশি ডিসকাউন্টে বই কিনছেন। পেপার ব্যাকের মধ্যে বিকাশ-এর সাঁইবাবা কিছু চাহিদা ছিল। ঘোরবার সময় মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সংগীতের কলি কানে ভেসে আসছিল। তারই মাঝে দেখলাম কারও হাতে স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো', 'এলিয়টের নির্বাচিত কবিতা', 'জেমস জয়েসের পত্রগুচ্ছ, মিল্টনের সমগ্র কবিতা, বারট্রানড রাসেলের 'প্রবলেমস অব ফিলজফি'। আবার কারও হাতে অমর্ত্যকুমার সেনের 'এমপ্লয়মেণ্ট টেকনলজি অ্যাণ্ড ডেভালেপমেণ্ট'। এক ভদ্রলোক দেখলাম বাজারের থলে নিয়ে এসেছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। থলে থেকে বের করে দেখালেন সৈয়দ মুজতবা আলীর দুহারা আর নরেন মিত্রের একখানি উপন্যাস। বই বাজার থেকে শস্তায় কিনেছেন। দুহারা বইখানি তাঁর খুবই প্রিয়। সঙ্গে একখানি গীতাও নিয়েছেন।

বই মেলায় তিন দিন গিয়েছি। বিকেলের দিকে রোজই ভিড় হয়েছে। বিক্রিও কম নয়। জয়প্রকাশের বিতর্কিত বই থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধীর জীবনী সবই স্থান পেয়েছে এই মেলায়। জাতীয় [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] সত্তর [illegible] মেলায় এখানে [illegible] স্বল্পায়তনের দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁরা চান, এ ধরনের মেলা আরও এক সপ্তাহ রাখা উচিত। উদ্যোক্তারা আগামী বছরে নিশ্চয়ই এ সব ভেবে দেখবেন।

কফি হাউসের কফি লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার মেজাজ আমার ছিল না। চায়ের ওখানেও সমান ভিড়। মাঝে মাঝে বোতলের ঠাণ্ডা জল খেয়েছি। আর গাছের তলায় বসে

পুস্তকপ্রেমীদের সঙ্গে কথা বলেছি। এমন মহিলাও দেখলাম দামী শাড়ির চেয়েও একখানি বইয়ের মত বই কিনতে পারলে খুশী হন। আবার নিন্দুকেরা বলেন, মেলায় অনেকে আবার নিজেকে জ্ঞানী গুণী বলে জাহির করার জন্য দামী দামী এবং মোটা মোটা বই কেনেন। বাড়ির শোকেসে সাজাবার জন্য। একটা স্টলের সামনে দেখলাম ইংরেজীতে লেখা:

evergy child's birth into the world is a new thought of God, an ever-fresh and radiant possibility.

আমাদের কবিও বোধ হয় এই কথাই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে চেয়েছেন—'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। এই শিশুদের বইয়ের খোরাকির ব্যাপারে মেলায় কোন ত্রুটি ছিল না।

শেষের রবিবার ঘুরতে ঘুরতে কখন নটা বেজে গেছে টের পাইনি। হঠাৎ সকলে একসঙ্গে হাততালি দিতে শুরু করলেন। ময়দানের চারপাশে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এর পরই মাইকে ঘোষণা করা হল: বই মেলা শেষ হল। আবার দেখা হবে আগামী বছর।

রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ

রবীন্দ্র-রচনার ইংরেজি অনুবাদ-সূচী: কবিতা ও গান। সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন। পরিবেশক জিজ্ঞাসা, কলকাতা। কুড়ি টাকা।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে তাঁর বহু সংখ্যক কবিতা ও গান ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া অনেক ইংরেজি কবিতা তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। আবার কোনো কোনো বঙ্গীয় কবির বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

শ্রীমতী সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় অসাধারণ পরিশ্রম করে এই গ্রন্থে যে সূচী প্রস্তুত করে দিয়েছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই সেই সূচী-নির্দেশিকাকে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে একটি দুর্লভ মূল্যবান সংগ্রহ রূপে গ্রহণ করবেন।

রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ স্বয়ং কবি ছাড়াও বহুজনে বিভিন্ন সময়ে করেছেন। কেউ কোনো বই অবলম্বনে অনুবাদ করেছেন, কেউ বা স্বনির্বাচিত গল্প কবিতা বা গানের অনুবাদ করেছেন। আবার কেউ ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রজীবন বা সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে প্রয়োজন স্থলে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ করেছেন।

সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে যে সূচী প্রস্তুত করেছেন তাতে রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ এবং অপরের কৃত অনুবাদের মধ্যে কোনো শ্রেণী ভাগ করেন নি। তিনি কালানুক্রমিক রীতিতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং সেই সেই গ্রন্থের অন্তর্গত যে-যে কবিতা ও গান অনূদিত হয়েছে তার তথ্যাদি প্রদান করেছেন। এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে এমন অনেক কবিতা বা গান আছে যেগুলি রবীন্দ্রনাথও অনুবাদ করেছেন আবার অপরেও করেছেন। তবে রবীন্দ্র-রচনার অপরের কৃত অনুবাদের সংখ্যা অনেক বেশি, কবিকৃত অনুবাদের পরিমাণ তুলনায় কম। দেখা যাচ্ছে 'শৈশব সংগীত' থেকে 'শেষ লেখা'—প্রায় সব কাব্যগ্রন্থ থেকেই অজস্র কবিতার একাধিক অনুবাদ হয়েছে এ যাবৎ। সংগ্রাহিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় যে সকল অনুবাদ ছড়িয়ে রয়েছে, যেগুলি এখনও কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি, সেগুলিও যতদূর সম্ভব তাঁর তালিকার অন্তর্গত করেছেন। এ কাজ সত্যই গভীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল।

এই মূল্যবান গ্রন্থখানির পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিশেষে সমালোচকের দু-একটি বিনীত বক্তব্য নিবেদন করা গেল—

(ক) যদি কোনো পাঠক স্বতন্ত্রভাবে জানতে চান রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কোন্ কোন্ কবিতা বা গান অনুবাদ করেছেন, তবে তাঁকে সাহায্য করবার মত একটি নির্দেশিকা থাকলে ভাল হত। নতুবা ২০০ পৃষ্ঠার বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টে তাঁকে এখন আর পাঁচজন অনুবাদকের নামের মধ্য থেকে খুঁজে নিতে হবে কবির নামটি। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই গ্রন্থ পাঠকালে এই পদ্ধতিতেই রবীন্দ্রকৃত অনুবাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিয়েছি। এই তালিকা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কবি তাঁর বিবিধ কাব্যগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি কবিতা ও গান অনুবাদ করেছিলেন এবং তার পরিমাণ সামান্য নয়।

(খ) যদি জানতে চাই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, গুরুদেবের কোন্ কোন্ কবিতা অনুবাদ করেছেন, সে-ক্ষেত্রে উত্তর কেমনভাবে পাবো? গ্রন্থশেষে অনুবাদকদের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা এবং গ্রন্থমধ্যে যে-সকল পৃষ্ঠায় অনুবাদক হিসেবে তাঁদের নামোল্লেখ আছে, গ্রন্থ শেষে নির্দেশিকায় অনুবাদকের নামের পাশে সেই সকল পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকলে পাঠকের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

(গ) বর্তমান গ্রন্থের শেষে একটি দীর্ঘ নির্দেশিকা আছে, সেটি মূল বাংলা কবিতার শিরোনাম ও প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক নির্দেশিকা। রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার শিরোনাম আছে কোনো কবিতার নেই। এক্ষেত্রে কবিতার শিরোনামগুলি যদি এই তালিকা থেকে পৃথক করে রাখা যেত তাহলে কেবল প্রথম পংক্তির তালিকার হিসাব থেকে দেখা যেতে

পারতো রবীন্দ্রনাথের কতগুলি গান এবং কবিতা এ যাবৎ অনূদিত হয়েছে।

'Love, my heatt longs day and night for the meeting"

—এটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত একটি কবিতার প্রথম ছত্র। ধরা যাক পাঠকের হাতে অনূদিত কবিতাটির সম্পূর্ণ রূপ আছে। কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে জানেন না কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য-গ্রন্থের কোন কবিতার অনুবাদ। পাঠক সুধাময়ী দেবীর বইখানি থেকে সেই নির্দেশ পেতে আগ্রহী হবেন। কিন্তু সে নির্দেশ আপাতত এ-বই থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই গ্রন্থের পরিশেষে রবীন্দ্র-নাথের কবিতা ও গানের ইংরেজি অনুবাদের প্রথম পংক্তির একটি বর্ণানু-ক্রমিক সূচী সংযোজিত হওয়া আবশ্যক।

সম্পাদিকা জানিয়েছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক উপন্যাস ছোটগল্প প্রবন্ধ ও ভাষণের অনুবাদ-তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছেন—পরবর্তী খণ্ডে সেগুলি প্রকাশিত হবে। আমরা সাগ্রহে প্রকাশিতব্য খণ্ডটির অপেক্ষায় আছি।"

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিজ্ঞাপন-সংস্থায় উচ্চাশাসম্পন্ন পদে উন্নীত হবার জন্য কি দাম দিতে হয়, কোন্ কোন্ মূল্যবোধ ও বিবেকী চেতনা দিতে হয় বিসর্জন—তা নিয়ে মোটামুটি দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিনিদ্র প্রচেষ্টার সেই ছবি দুটির সঙ্গে আরেকটি ছবি যুক্ত করলেন শ্রীমতী মীরা বালসুব্রমনীয়ন। তাঁর নতুন, সম্ভবত প্রথম, উপন্যাসের নাম **দিনের আলো রাতের আঁধার** (এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, ছ টাকা)।

শ্রীমতী বালসুব্রমনিয়ন-এর উপন্যাসে কর্মক্ষেত্র মুখ্য বর্ণনার বিষয় হয়ে অবশ্য দেখা দেয়নি। সরাসরি ভাবে তিনি যে বিজ্ঞাপন-সংস্থার কর্মজীবনের ছবি ফোটান নি, এটা এক দিক থেকে খুবই ভালো হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটিতে সেই বর্ণনাই ছিল অধিকাংশ জায়গা জুড়ে। তাঁর রচনায় প্রাথমিক ভাবে উচ্চাশাসম্পন্ন স্বামীর সঙ্গে একটি ঘরোয়া ও সাবেকী মূল্যবোধে বিশ্বাসী স্ত্রী-র মানসিক দ্বন্দ্বের, ক্রমশ বড়ো-হয়ে-ওঠা দূরত্বের ছবি ফুটে উঠেছে। বস্তুত তিনি জোর দিতে চেয়েছেন বেশ বোঝা যায়, প্রেমের এক গভীরতম সত্যের দিকে দুটি মানুষকে যা সম্মুখপানে 'চলিতে' এবং 'চালাতে' পারে। সেই প্রেমের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি খুব জোরালো ভঙ্গিতে উপহার দিয়েছেন কর্সোলির পাহাড়-ঘেরা এক জনবিরল বসতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চেহারা, এক মেকী ও অসার মূল্যবোধে বিশ্বাসী কিছু অসহায় মানুষের মুখ, একটি সুস্থ ও সম্পন্ন মেয়ের আকাঙ্ক্ষা বাসনার রূপ। তিনি যে দেখতে জানেন, দেখে জানাতে জানেন—উপন্যাসটি পড়ে এ-কথা মেনে নিতে দ্বিধা জাগে না।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

*

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর **বিক্ষত অন্বেষণ, নিরন্তর** (রচনাবলি, কলকাতা-৩১, আড়াই টাকা) এক যুগ আগের রচনার সঙ্গে একটি দীর্ঘ কবিতার সংযোজন। 'বিক্ষত অন্বেষণ'। ১৯৬২-তে বেরিয়েছিল বই হয়ে, পুনর্মুদ্রণ-কালে 'নিরন্তর' নামের দীর্ঘ কবিতাটি যুক্ত হয়েছে কেবল।

তাঁর 'বিক্ষত অন্বেষণ' [illegible] র্থ হয় নি তারই প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত একগুচ্ছ তাজা কবিতার সংগ্রহ : **অন্ধকার শব্দকোষ** (তাম্রলিপি, কলিকাতা ১৩, দু টাকা)। এই নতুন সংগ্রহে তাঁর আদ্যোপান্ত বদলের ঝকঝকে চিহ্ন, আঁটসাট ভাবনার ও সপ্রতিভ প্রকাশভঙ্গির নির্ভুল নিশ্ছিদ্র পরিচয় সব-ছাপিয়ে চোখে পড়ে। আগের বইয়ের এলানো, ঈষৎ নুয়ে-পড়া ভঙ্গি তিনি সুন্দরভাবে কাটিয়ে এসেছেন। এখন তাঁর রচনার শিরদাঁড়া ঋজু এবং স্বপ্রাণ। এখন তিনি খুব সহজে বলতে পারেন "চাই না তোমার ঝাপসা ভুবন/এখন আমার খুব প্রয়োজন/আমার নিজের ভাষা।" কেননা, তিনি নিজেও জানেন, এর আগে তাঁর "হাতে ছিলো না ছন্দ, ছিলো হিজিবিজি, পায়ে ছিলো না আনন্দ পায়ে ধুলো ছিলো।" তাঁর সেই ধুলো কিংবা হিজিবিজি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এই নতুন কাব্যগ্রন্থে। তিনি 'নিজের ভাষা'ই পেয়ে যেতে চলেছেন ক্রমশ।

খেলার মাঠে

শতবর্ষের ফলই ঘুরে এল

ঠিক যেন ব্রিসবেনের টাই টেস্টের মত ব্যাপার। শতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে একটিই মাত্র টাই টেস্ট হয়েছে এ পর্যন্ত ৮০১টি টেস্ট খেলার মধ্যে। আর ঠিক ১০০ বছর আগের ফলেই মীমাংসিত হল শত-বার্ষিকী টেস্ট। ১০০ বছর আগে মেলবোর্ন মাঠে পৃথিবীর প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড হেরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪৫ রানে। শতবর্ষ পরেও হারল সেই ৪৫ রানে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কি কারসাজি টেস্ট? অর্থাৎ আরও শত বর্ষ ধরে এই খেলার স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্য ফল কি আগে থেকে গড়াপেটা করা ছিল? প্রশ্নকর্তারা অবশ্যই জানেন ফল গড়পেটা করা ছিল না। থাকতে পারেও না। খেলার নাটকীয় পরিণতির জন্যই তাদের রসিকতা মিশ্রিত ওই প্রশ্ন। ক্রিকেটের এটাই বৈশিষ্ট্য। চেষ্টা করলেও টাই টেস্ট হয় না। আবার এমনিতেই ঘটে যায়। সেইভাবেই ঘটে গেল শতবার্ষিকী টেস্টের ফল।

শুধু ফলের জন্য নয়, খেলার নাটকীয় পরিণতি এবং বীরোচিত সংগ্রামের জন্যও শতবার্ষিকী টেস্টের স্মৃতি বহুকাল ক্রিকেট ক্রীড়ামোদিদের মনের পর্দায় আঁকা থাকবে। রেকর্ড বইয়ের পাতায় থাকবে বিস্তৃত বিবরণ।

কোন খেলায় দুই দলের প্রথম ইনিংস ১৩৮ ও ৯৫ রানে শেষ হবার পর দ্বিতীয় ইনিংসে হয়েছে ৪১৯ (৯ উই ডিক্লেঃ) ও ৪১৭ রান? শুধু ১৯২৪-২৫ সিরিজে একবার ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোন টেস্টে ইংলণ্ড চতুর্থ ইনিংসে চারশোর বেশী রান করতে পেরেছে? এবং প্রতিপক্ষ দল ৪৩০ রানে এগিয়ে যাবার পরেও কোন অধিনায়ক বলতে পেরেছেন "কে বলে টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার পকেটে? জয়ের সম্ভাবনা তাদের ৫০—৫০ এর বেশী নয়। এ টেস্ট এখনো আমরা জিততে পারি।"

ইংলণ্ড অধিনায়ক টনি গ্রেগ মুখেই শুধু ওই কথা বলেননি, কাজেও প্রমাণ করেছেন ভাগ্য একটু সহায় থাকলে তাঁরাও শতাব্দী টেস্ট জয়ীর সম্মান পেতে পারতেন। অবশ্যই মেলবোর্ন মাঠের পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছিল। প্রথম দুইদিন বোলারদের সুযোগ দিয়ে শেষ তিনদিন ব্যাটসম্যানদের সুযোগ দিয়েছিল। তবু ইংলণ্ডের সামনে ছিল দুরূহ দায়িত্ব। জয়ের জন্য ৪৬৩ রান করার প্রয়োজন ছিল চতুর্থ ইনিংসে। বিপক্ষের অত বড় রানের সামনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাট করা বড় শক্ত। কিন্তু ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল জয়ের মানসিকতা নিয়ে।

শুরুর আগে খেলোয়াড়দের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য অধিনায়ক টনি গ্রেগ বলে-ছিলেন, আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি। মনে থাকে যেন ডুবন্ত জাহাজ থেকে আমাদের ভেসে এসে কূল পেতে হবে। সত্যিই ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা সেই মানসিকতার অনেকখানি পরিচয় দিয়েছে। সবাই অবশ্য পারেনি। পারলে তো তারা ম্যাচই জিতে যেত। ক্রিকেট সবাই পারেও না। তবু জয় সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল ইংল্যাণ্ড। ৫ উইকেটে ৩৪৬ রান করার পর শেষদিন চা-বিরতির পর যদি মাত্র ৪১ রানের মধ্যে তাদের ৫টি উইকেট পড়ে না যেত তা হলে খেলার ফল হয়তো উল্টে যেত।

শতাব্দী টেস্টে ম্যান অফ দি ম্যাচের সম্মান পেয়েছেন ইংলণ্ডের ২৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান ডেরেক র‍্যানডস, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৭ রান করে। তারতেই র‍্যানডলের টেস্ট অভিষেক হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম খেলে সেঞ্চুরি করলেন। সেঞ্চুরি কথাটির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার চেয়ে র‍্যান-ডলের ইনিংসের গুরুত্ব ও মূল্য অনেক বেশী। এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার রডনি মার্শও দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ১১০ রান। অস্ট্রেলিয়ার কোন উইকেট কিপার এর আগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করতে পারেননি। সেদিক দিয়ে মার্শ যেমন নতুন কিছু করলেন তেমন ওয়ালী গ্রাউটের রেকর্ড ভেঙ্গে উইকেট কিপারের শিকারে এগিয়েও গেলেন। উইকেট কিপার গ্রাউটের টেস্ট শিকার ছিল ১৮৭। মার্শের এখন ১৮৯। সামনে তো আরও দিন পড়ে আছে।

ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচনে বিশেষজ্ঞ-দের বিচার হয়তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। অসাধারণ ইনিংস খেললেও র‍্যানডল তিনটি চান্স দিয়ে-ছিলেন। আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখছি শতবার্ষিকী টেস্টের বড় নায়ক অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি, যিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৬ রানে ৬টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৯ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছেন। শেষ দিন চায়ের পর লিলিই ইংলণ্ডের জয়ের সম্ভাবনা শেষ করে দেন ওল্ড ও আন্ডারউডকে অল্প রানে ফিরিয়ে দিয়ে এবং শেষ খেলোয়াড় হিসাবে দৃঢ়চেতা

নটকে অ উট করে খেলার উপর যবনিকা টেনে।

এবং কি অবস্থার মধ্যে তিনি বল করেছেন। পিঠের সেই বিশ্রী যন্ত্রণাটা আবার দেখা দিয়েছে। খেলা শেষ হবার সংগে সংগে ম্যাচ জয়ের নায়ক লিলিকে পাঁজা কোলে করে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা মাঠের বাইরে আনার পর লিলি ঘোষণা করেন তিনি টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন। অন্তত এক মরসুমের জন্য। তাঁর পিঠের বাথা এখন তাঁকে বড় বেগ দিচ্ছে। তাই এই গ্রীষ্মে ইংলণ্ড সফরের জন্য লিলিকে অস্ট্রেলিয়া দলে নেওয়াও হয়নি।

এই টেস্টে অমানুষিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার রিক ম্যাককসকারও। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪ রান করার পর বব উইলিসের বল মুখে লাগায় ম্যাককসকার স্টাম্পের উপর গড়িয়ে পড়ে উইকেট হারান। দেখা যায় ভূপতিত ম্যাককসকারের মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তাকে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক্স-রে পরীক্ষায় দেখা যায় তার নীচের চোয়াল ভেংগে গেছে। তখনই স্পিল্ট লাগিয়ে মুখ ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়। অত বড় আঘাত সত্ত্বেও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ম্যাককসকার কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করেছেন। তৃতীয় দিন এক ঘণ্টা ব্যাট করে ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন। তার মধ্যে তিনটি চারও মারেন। চতুর্থ দিন আউট হন ২৫ রান করে। ম্যাককসকার ব্যাট করতে এসেছিলেন ৩৫৩ রানের মাথায়। অষ্টম উইকেট পড়ে যাবার পর নবম উইকেট জুড়িতে মার্শের সংগে ৫৪ রান যোগ করে তিনি আউট হন। ওই ৫৪ রানের মূল্য সহজেই অনুমেয়।

বহু প্রচার এবং কর্মময় পরিবেশ রচনা সত্ত্বেও শতবার্ষিকী টেস্টে যেমন আশা করা হয়েছিল তেমন দর্শকসমাগম হয়নি। মেলবোর্ন মাঠের কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিলেন প্রথম তিনদিনের প্রতিদিন এক লাখ করে দর্শক মাঠে উপস্থিত থাকবেন এবং দর্শক ও দর্শনীর দিক দিয়ে এ টেস্ট আগের সব রেকর্ড ভেংগে দেবে। কিন্তু প্রথম দিনের খেলাতেই প্রায় ৪০ হাজার দর্শক-আসন খালি ছিল এবং কোনদিনই দর্শক গ্যালারি পূর্ণ হয়নি।

খেলাটি কিন্তু ক্রমেই উত্তেজনাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। জয়-পরাজয়ের আশা-নিরাশার দোলায় দুলেছে দুটি দল। শেষ দিন রানী এলিজাবেথের মাঠে আগমন ইংলণ্ডের পক্ষে শুভ হয়নি। তিনি মাঠে উপস্থিত হবার আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডের অবস্থা ছিল বেশ আশাপ্রদ। তাঁর আসার পর ১০ মিনিটের মধ্যে র‍্যানডলের গৌরবময় ইনিংস শেষ হয়ে যায় এবং ইংলণ্ডের ইনিংসেও ভাঙ্গন ধরে।

খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল এবং ইংলণ্ড অধিনায়ক টনি গ্রেগ স্বীকার করেন খেলার গতি ও নাটকীয়তা শতবার্ষিকী টেস্টের মর্যাদার সংগে সংগতিপূর্ণ। তাদের জীবনের স্মরণীয় খেলাও। দর্শক সমর্থক খেলোয়াড় সবাই উপভোগ করেছেন পাঁচদিনের ঠাসা উত্তেজনা।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ১৩৮ (গ্রেগ চ্যাপেল ৪০, রডনি মার্শ ১৮, ডেভিড হুকস ১৭, ওল্ড ৩-৩৯, আণ্ডরউড ৩-১৬, উইলিস ২-৩৩, লিভার ২-৩৬)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৯৫ (টনি গ্রেগ ১৮, অ্যালান নট ১৫, লিলি ৬-২৬, ওয়াকার ৪-৫৪)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ৪১৯ (রডনি মার্শ ১১০, ইয়ান ডেভিস ৬৮, ডাগ ওয়াল্টার্স ৬৬, ডেভিড হুকস ৫৬, লিলি ২৫, ম্যাককসকার ২৫, ওল্ড ৪-১০৪, টনি গ্রেগ ২-৬৬, লিভার ২-৯৫)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ৪৭১ (ডেরেক র‍্যানডল ১৭৪, ডেনিস অ্যামিস ৬৪, মাইক ব্রিয়ার্লি ৪৩, টনি গ্রেগ ৪১, অ্যালান নট ৪২, লিলি ৫-১৩৯, ও'কিফ ৩-১০৮)

(অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জয়ী)

একলব্য

দুটি রেকর্ড এবং একটি দৃষ্টান্ত

শতবার্ষিকী টেস্টে দুটি রেকর্ড করেছেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার রডনি মার্শ। কিন্তু যে দৃষ্টান্তটি স্থাপন করেছেন তার তুলনায় রেকর্ডের গৌরব গৌণ।

দুটি রেকর্ড কি? না, অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার হিসাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি—আগে অস্ট্রেলিয়ার কোন উইকেটকিপার যা করতে পারেন নি। আর একটি রেকর্ড উইকেট কিপিংয়ের শিকারে ওয়ালী গ্রাউটের রেকর্ড ম্লান করা। বলা বাহুল্য দুটিই অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড। বিশ্ব রেকর্ড নয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্তটি খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের দিক দিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বসম্পদ।

খেলায় ইংলণ্ডের তখন আধিপত্য। জয়-সম্ভাবনা ক্রমেই রঙীন হয়ে উঠছে। চতুর্থ উইকেটে জুড়ি বেঁধে ব্যাট করছেন অধিনায়ক টনি গ্রেগ ও ডেরেক র‍্যানডল। স্কোরবোর্ডে সওয়া তিনশোর মত রান। জুড়ি ভাঙার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বোলার ও ফিল্ডসম্যানরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওই সময়ে র‍্যানডলের ব্যাট ছুঁয়ে একটি বল আপাতদৃষ্টিতে মার্শের হাতে পৌঁছাতেই ঊর্ধ্বে আঙুল তুলে জুড়ি ভেঙে দিলেন আম্পায়ার টম ব্রুকস। র‍্যানডল ক্রিজ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, পেছন থেকে তাঁকে ডেকে ফেরালেন রডনি মার্শ। আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ক্যাচটি তিনি ধরতে পারেন নি। র‍্যানডলও আউট হননি। আম্পায়ার মার্শের কথা মেনে নিয়ে র‍্যানডলকে ক্রিজে ফিরে আসতে বললেন। তখন র‍্যানডলের নামের পাশে ছিল ১৬১ রান। আর ১৩ রান করে অবশ্য তিনি আউট হয়ে যান।

অধিনায়ক টনি গ্রেগ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় করে রডনি মার্শের খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, খেলার যে অবস্থার মধ্যে মার্শ এই মনোবৃত্তি দেখিয়েছেন তার তুলনা বিরল। অস্ট্রেলিয়া জুড়ি ভাঙতে চেয়েছিল। ভেঙেও গিয়েছিল আম্পায়ারের নির্দেশে। কিন্তু মার্শ অন্যায় আউট মেনে নিতে পারেন নি। মার্শের মত উঁচু-মনা খেলোয়াড়দের জন্যই ক্রিকেটের স্থান এত উঁচুতে। মার্শদের জন্য ক্রিকেটে ন্যায় নীতিবোধ ও মাহাত্ম্যের মহিমা।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে মার্শের অবশ্য আরও রেকর্ড আছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মরসুম অনেক ছোট। মার্শ ছাড়া কোন উইকেটকিপার এক মরসুমে ৫০টি শিকার পাননি। ১৯৭৫-এ মার্শের শিকার ছিল ৬৪টি, মাত্র ১৪টি ম্যাচে। তাছাড়া এক ওয়ালী গ্রাউট ছাড়া পৃথিবীর আর কোন উইকেট-কিপারের ২৫টি টেস্টে ধৃত শিকারের গৌরব আছে? গ্রাউটের ছিল ২৪টি টেস্টে। এখন পৃথিবীর নামী উইকেট কিপার ইংলণ্ডের অ্যালান নট শত শিকারের কৃতিত্ব পান ৩০টি টেস্টে। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে একটি বিশ্ব রেকর্ডও আছে মার্শের। তবে যুগ্মভাবে সারের উইকেট কিপার এ লংয়ের সঙ্গে। ১৯৬৪ সালে সাসেক্সের বিরুদ্ধে লং ধরেছিলেন ১১টি ক্যাচ। ১৯৭৫-৭৬ মরসুমে শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ও উইকেটকিপার মার্শও ১১টি ক্যাচ ধরেছিলেন ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে।

রডনি মার্শ

উপরন্তু ওই ম্যাচে করেছিলেন ৭৬ রান। ১৯৭২ সিরিজে ইংলণ্ডে টেস্টে ২৩টি শিকারেরও একটি রেকর্ড আছে মার্শের।

ব্যাট এবং উইকেট কিপিংয়ে নটের মতই মার্শের দক্ষতা। মার্শ কিন্তু স্বীকার করেন নটই তাঁর অনুপ্রেরণা।

জন্ম ১৯৪৭ সালের নভেম্বরের ৪ তারিখে। বড়ভাই গ্রাহাম মার্শ নামকরা গলফ খেলোয়াড়। রডনির ছোটবেলা থেকে আগ্রহ ক্রিকেটে। উইকেট কিপিংয়ে একটু খ্যাতি হবার পর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলার জন্য ভর্তি হন কলা শাখায়। যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন খেলার সুযোগ পান সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ১০৪ রান এবং উইকেটের পেছনে সদাজাগ্রত তৎপরতা দেখে ক্রিকেট পণ্ডিতেরা বুঝে নেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট গগনে একটি নতুন তারকার উদয় হচ্ছে।

অভিজ্ঞ ব্রায়ান ট্যাবারের বদলে অনভিজ্ঞ ২৩ বছর বয়সী মার্শকে যখন নির্বাচক স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, নীল হার্ভে এবং স্যাম লক্সটন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। কিন্তু মার্শের উইকেট কিপিং এবং ব্যাটের হাত প্রমাণ করে দেয় সমালোচকদের চেয়ে ব্র্যাডম্যান-হার্ভে-লক্সটনের ক্রিকেট জ্ঞান অনেক বেশী।

বহু খেলাতেই ব্যাটের চমক দেখিয়েছেন রডনি মার্শ। পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট সেঞ্চুরি আছে। পাকিস্তানের বোলিংকে খান খান করে একবার ঝড়ের বেগে ২৩৬ রান করেন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কোণঠাসা অবস্থার মধ্যে মার্শ ৯১ রান করে দলের মনোবল ফিরিয়ে এনেছিলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে মেরেছিলেন চারটি [illegible]।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট কিপার হিসাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার জন্য মার্শকে হয়তো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হত না, যদি ১৯৭২ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ঘোষণা করে দেওয়া না হত। ওই মেলবোর্ন মাঠেই ৯২ রান করে নট আউট ছিলেন। ইনিংস ঘোষণার পর অনেকেই সমবেদনা প্রকাশ করে বললেন, মাত্র ৮টি রান তো বাকি ছিল। সেঞ্চুরি করার সুযোগ কি দেওয়া যেত না? সহানুভূতি প্রদর্শকদের দিকে চেয়ে হেসে রডনি বললেন, আমি তো ৯৯ রানের মাথায়ও আউট হয়ে যেতে পারতাম!

শতবার্ষিকী টেস্টের পরিপ্রেক্ষিতে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ক্রিকেটার ইন্টারন্যাশনালে স্মৃতির রাজাদের নিয়ে যে স্মৃতিচারণ করেছেন তাতে উইকেট কিপার হিসাবে উল্লেখ করেছেন বার্ট ওল্ডফিল্ড, ডন টালন ও গডফ্রে ইভান্সের নাম। লিলী ও ম্যাকডোনাল্ডকে বলেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার জুড়ি। অবশ্য [illegible] স্থান দিয়েছেন [illegible]।

উইকেটের পেছনে ৫ ফুট ৮ই ইঞ্চি উঁচু ও ১৫০ পাউন্ড ওজন নিয়ে যিনি এই [illegible] কাজ করেন [illegible] এবং শারীরিক পটুতা সহজেই অনুমেয়।

মুকুল

অরণ্যদেব লী ফক

ক্রীতদাসটা গেল কোথায়?
তার বদলে হাঙর এল কী করে?

কী হয়েছে?
হাঙর! তার উপরে খুলির ছাপ!

সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী....
আসলে জুনকরকে যখন জলে নামানো হল, অরণ্যদেব তখন একটা হাঙর মারছেন।

হাঙর মেরে দড়ি কেটে জুনকরকে তিনি মুক্ত করেন .....

...তারপর হাঙরটাকে দড়ির সঙ্গে বেঁধে দেন...

নিঃশ্বাস নাও... আবার ডুব দেব।
আঃ...!

??!!!
১৮

একসপেরিমেন্ট করে সেটা নিশ্চয় একসপেরিমেন্ট করে দেয়া উচিত। সবাই যে করছেন এমন বলছি না। কিন্তু সিনেমা করার নামে আমাদের গল্পগুলো নিয়ে এমন কান্ড করা হয় যে তারপর নিজেদের নামের সঙ্গে সেগুলোকে কোনোভাবে যুক্ত দেখতে আমরা স্বভাবতই কুঁচকে যাই। বুঝতে পারি সিনেমার প্রয়োজনে কাহিনীতে, চরিত্রায়ণে হয়তো কিছু-কিছু পরিবর্তন অনিবার্যভাবে এসে যায়। কিন্তু তা বলে তো কোনো লেখকের পক্ষেই তার কাহিনী নিয়ে সব রকম তালগোল পাকানো সহ্য করা সম্ভব নয়।

"যাক গে, জীবন-যে-রকম-এর ব্যাপারে যা যা ঘটেছিল সেটাই বলি। স্বদেশবাবু তো এলেন বললেন আমার উপন্যাস নিয়ে ছবি করবেন একসপেরিমেন্টাল ছবি। সত্যজিৎ রায় ছাড়া আমার উপন্যাস নিয়ে আর তো বিশেষ কেউ ছবি করেন নি। সুতরাং স্বদেশবাবুর কথায় আমি খুব উৎসাহ পেলাম ভাবতে ভালো লাগলো যে আমার উপন্যাস নিয়ে একটা নতুন ধরনের একসপেরিমেন্টাল ছবি হতে পারে।

"স্ক্রিপ্টটা লিখেছিলেন নির্মাল্য আচার্য যিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে "এক্ষণ" পত্রিকার সম্পাদনা করেন। স্ক্রিপ্টটা আমার বেশ ভাল লাগলো মূলত দুটো কারণে। প্রথমত, আমার গল্পটা নিয়ে কোনো যা-তা কান্ড করা হয় নি, এবং গল্পের স্পিরিটটা নষ্ট হয়ে যায়নি। দ্বিতীয়ত, যদিও সিনেমার ব্যাপারে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ স্ক্রিপ্টটা থেকে যতদূর আমি ছবির সম্ভাব্য রূপটা ভাবতে পারলাম তাতে মনে হল যে এ-ছবিতে নিঃসন্দেহে একটা নতুন স্বাদ পাওয়া যাবে। অন্তত আমার খুব ভালো লাগলো, এবং ভালো লাগলো বলেই জীবন-যে-রকম ছবির ব্যাপারে আমার কোনোই আপত্তি রইল না। ও'রা বললেন ও'রা আমার গল্পটা পাঁচ হাজার টাকায় কিনবেন।

"এর কিছুদিন পরে স্বদেশবাবুরা আবার ঘুরে এলেন। সঙ্গে কিন্তু এবার আর নির্মাল্যর স্ক্রিপ্টটা নেই। বললেন, ও ধরনের স্ক্রিপ্ট থেকে ছবি হয় না, ও-সব বড্ড আর্টি ব্যাপার। আমি বললাম, কিন্তু আপনারা তো একসপেরিমেন্টাল ছবিই করতে চাইছেন আর আমি সেই বুঝেই তো কোনো আপত্তি করিনি। তাতে ও'রা বললেন কিন্তু ওরকম স্ক্রিপ্ট-এর পেছনে প্রডিউসার-ডিসট্রিবিউটার টাকা ঢালবে না। তার চেয়ে এই ভদ্রলোক আর একটা স্ক্রিপ্ট বানিয়েছেন শুনুন, দেখবেন সব
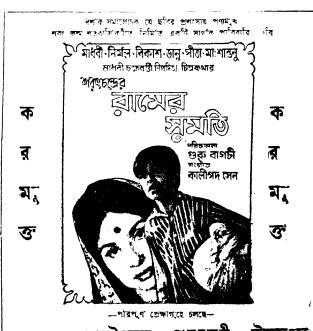
রকম ব্যাপারট্যাপার আছে, কমার্শিয়ালি লেগে যাবে।

"স্ক্রিপ্ট তো শুনলাম। এবং শুনতে-শুনতে ক্রমাগত আঁতকে উঠতে লাগলাম। গল্পটা যে আমার, সেটাও ভাবা যায় না, সব উলটে পালটে এমন করে দিয়েছেন তার চেহারা। তবে হ্যাঁ, যে জিনিস তৈরি হয়েছে তার মধ্যে এখন সব কিছু আছে সেটা ঠিক, ক্রাইম, রগরগে মেলোড্রামা, গিলট-কনশাসনেস, একেবারে যা-তা ব্যাপার। আর মূলে চরিত্রগুলোও পালটে গেছে! আমার গল্পের নায়ক ছিল দীপু। এখানে দীপু প্রায় বাদ। নায়ক হয়ে গেছে দীপুর দাদা, রঞ্জিৎ মল্লিক আর দীপুর বদলে দীপুর দাদাকে কেন নায়ক হতে হল বলতো? যেহেতু দীপুর দাদার সঙ্গে প্রোডিউসারের মতে ওয়াহিদা রেহমানকে দারুণ মানায়! দীপু আর নীলাঞ্জন দুই ভাই। বসন্ত চৌধুরী এদের বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন। আমার উপন্যাস অনুসারে ছবিটি হলে ওসব জলটল, লঞ্চ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া মেলোড্রামা, এ সব কোনো ব্যাপারই থাকতো না। কিন্তু স্ক্রিপ্ট-এ বসন্তকে একটি লুকোনো বিবাহ ও বউ দেয়া হয়েছে। এই গোপন-স্ত্রীর চরিত্রেই কেয়া অভিনয় করছিলেন। এই লুকোনো বিয়ের কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে বসন্তকে আবার একজন ব্ল্যাকমেল করছে ছবির আগাগোড়া। মেলোড্রামাকে আরো জোরদার করার জন্যে আবার মেয়েটিকে অন্ধ করা হয়েছে।

"যাই হোক, আমি জানালাম এ স্ক্রিপ্ট অনুমোদন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরে ডিস্ট্রিবিউটর নামে কথিত কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এঁরা জলের মতো হুইস্কি খান, সসস করে কথা বলেন। দেখা গেল, ছবির গল্প সম্পর্কে এঁদের অনেক বক্তব্য আছে। এঁরা নিজেরাই ইচ্ছে মতন ঘটনা জুড়ে দিতে চান। সব মিলিয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার। সবাই মিলে আমায় তখন বোঝাতে লাগলেন যে বাংলা ছবির অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ, আমি যদি এ ধরনের স্ক্রিপ্ট অনুমোদন না করি ছবিটা হবে না আর তাহলে অনেক গরীব টেকনিশিয়ানস বেকার হয়ে যাবে, এমনিতেই তাদের সংসার চলে না। আমি শেষকালে ভাবলাম, যাকগে—মরুকগে, ছবিটা হলে যদি কিছু গরীব টেকনিশিয়ানস কিছু পয়সাকড়ি পায় তাতে আপত্তি করব না। সেই মর্মে অনুমতিপত্র লিখে দিলাম। শুধু বললাম, ছবির নামটা যেন ওঁরা পালটে দেন, এবং আমার নাম যেন এ ছবির সঙ্গে কোনোভাবেই সংযুক্ত না থাকে।

"দেখলাম ছবির নামটা ওঁরা বদলালেন না এবং আমার নামটাও বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলেন। ওয়াহিদা রেহমান কিন্তু অভিনয় করতে এসে স্ক্রিপ্ট দেখে খুব শকড হয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তিনি খুব আশা করেছিলেন একটা ভালো গল্পে অভিনয় করার সুযোগ পাবেন, কিন্তু এটা কি? লজ্জার সঙ্গে তাঁকে বলতে বাধ্য হলাম, গল্পটা আমার বলে চালানো হলেও ওটা ঠিক আমার গল্প নয়। তাঁর চরিত্রটাকে আমি ঐভাবে ভাবিনি। এমন একটা ধারণা অবশ্য বাজারে চলতে পারে যে আমি টাকার লোভে গল্পটা বিক্রি করে দিয়েছি। শুধুমাত্র একসপেরিমেন্টাল ছবি হবে বলেই আমি রাজী হয়েছিলাম গল্পটা দিতে। টাকার দাবী আমার সামান্যই ছিল। এবং টাকাটা আমি অ্যাডভান্স বা এক সঙ্গে চাইওনি। ওঁরা এ পর্যন্ত আমায় পাঁচ হাজারের মধ্যে দেড় হাজার টাকা দিয়েছেন। তারপর আরো দুটো চেক দেন। ফল্স চেক। বাউন্স করেছে।"

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমিত ভঞ্জ, নিমু ভৌমিক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, **গণদেবতা**/পরিচালনা : তরুণ মজুমদার

ফটো : দেশ

বোম্বাই থেকে

এখনও টাইটেলবিহীন মোহন সেগালের নতুন ছবির শুটিং দেখার জন্য সুপ্রজা স্টুডিওতে আমন্ত্রিত একদল সাংবাদিকের আমরা সংগী হয়েছিলাম। জায়গাটি বোমবাই থেকে ষাট মাইল দূরে এবং দেখে স্টুডিও বলে মনেই হয় না। বস্তুত ফাঁকা একটা জমির একধারে বিরাট এক সাইনবোর্ড দেখেই শুধু বুঝতে হয় সত্যিই এটা স্টুডিও। স্থানটি বোমবাই-পুনে সড়কের ওপর খোপোলি এবং পেন যেতে পশ্চিম-ঘাটের পাদদেশে অবস্থিত। চতুর্দিকে সুউচ্চ পর্বতমালা থাকায় স্থানটির একটা আলাদা সৌন্দর্য লক্ষ করা গেল। মোহন সেগল স্থানটি নির্বাচিত করেছেন এর সঙ্গে বন্দীপুর সংরক্ষিত বনের মিল আছে বলে। কারণ, ছবির অধিকাংশ দৃশ্যই তোলা হবে শেষোক্ত বনে।

আমরা পৌঁছই মধ্যাহ্নভোজের সময় এবং তখনই আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয় ছবির নায়ক ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কথাবার্তা যেন শেষ করে নিই। কারণ ধর্মেন্দ্র অনতিবিলম্বেই বোমবাই চলে যাবেন সেন্সর কর্তৃক আটক "ধরমবীর" ছবির একটি দৃশ্য নতুন করে তোলার জন্য। ফলে বাকি দিনটা আমাদের কাটাতে হল কতকগুলি বন্যপ্রাণীর সঙ্গে একটি পূর্ণবয়স্ক সিংহ, দুটো চিতা, দুটি বাচ্চা ভালুক এবং ছটি বানর, সখ্যতা করে। এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর ভূমিকা এক রেঞ্জার সাহেবের।

ছবির নাম কি রাখা হবে জানতে চাইলে মোহন সেগল বললেন, 'কর্তব্য' নাম রাখা যেতে পারে, তবে এখনও কিছু স্থির করিনি। এছাড়া 'জঙ্গল', 'বনপাল', 'বনরাজ' নামও রাখা যায়। মোহন সেগল এ ছবির 'স্টান্টম্যান' এস এস দাসের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেন। শ্রীদাস জানান ধর্মেন্দ্র খুবই নির্ভীক তাই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে কোন অসুবিধা ঘটে না এবং বন্য জন্তু নিয়ে অভিনয়কালে ডুপ্লিকেটকে দিয়ে কাজ করাবার পক্ষপাতী তিনি নন।

জন্তুগুলিকে নিয়ে কতকগুলি দৃশ্য তোলা আমরা দেখি এবং শৃঙ্খলমুক্ত অবস্থায় ওদের ছেড়ে দেওয়ার সময় আমরা সরে পড়ার চেষ্টা করতে থাকি। চিতাগুলির মুখ সেলাই করা জেনেও আমরা স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। জন্তুগুলি ছিল মিসেস পরামশিবম নামক এক মহিলার তত্ত্বাবধানে। সিংহ বাঘের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ

জানান। আমাদের মধ্যে সাহসী ক'জন যাঁরাই সে-আমন্ত্রণ রক্ষা করে।

এ ছবির নায়িকা রেখা এবং বিনোদ মেহরাকে দেখা যাবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভূমিকায়—খল-নায়কের চরিত্রে। এছাড়াও অভিনয়ে আছেন রঞ্জিৎ, নিরূপা রায়, ফরিদা জালাল, ব্রহ্মচারী, শিবরাজ প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত পিয়ারীলাল।

—সুরঞ্জন

নাট্যজগৎ

জগন্নাথ চেতনা

আপনি কি ক্রিকেট অনুরাগী? তবে মাঝে মাঝে আপনি সংশয়ের শিকার হতে বাধ্য। ভারতীয় ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবে যারা সেঞ্চুরী করেছেন, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরা কেউ আর জীবনে সেঞ্চুরীর মুখ দেখেন নি। প্রথম খেলাতেই সেঞ্চুরী মনে সংশয় আনে। এই দশকের প্রথমার্ধে চেতনার প্রথম প্রযোজনা 'মারীচ সংবাদ' সকলকে চমকে দিয়ে আলোড়ন এনেছিল। এরপর কয়েকটি প্রযোজনা ততটা আশা পূরণ না করতে পারায় অনেকেই যখন ভারতীয় ক্রিকেটের কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন, তখন এই দশকেরই শেষার্ধে তাঁদের প্রযোজনা 'জগন্নাথ' দর্শককে আপ্লুত করেছে শ্রদ্ধায়। সেঞ্চুরীর পর ওঁরা এবার রেকর্ড করেছেন।

আপনি কি বিদেশী অনুপ্রেরণায় বীতশ্রদ্ধ? তবে সবিনয়ে বলি, এবার বোধহয় আপনার মত বদলাবার সময় এল। বিদেশী অনেক তত্ত্ব ও পরিমণ্ডল এদেশের আবহাওয়ায় অনেকবারই খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সামান্য একটি গল্পের অনুভূতি দিয়ে যে নাট্যশরীর—সে স্বাতন্ত্র্যে স্বমহিম, বিশ্লেষণে ক্ষুরধার, প্রয়োগ চিন্তায় কবিতার সহোদরা। "সকলের মত আমিও স্বপন দেখতাম। স্বপন দেখারও একটা বয়স থাকে। আমি ভাবতে চেষ্টা করতাম কোথায় মানুষের ক্ষমতা, কোথায়ই বা তার দুর্বলতা। বাইরে থেকে যা দেখি তাই কি সত্যি, মনের ঠিকানা কবে কে পেয়েছে?... আমার বরাবরই সহানুভূতি শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের প্রতি। তাঁর তো মানুষ মেলে না—না চিন্তায় অথবা শক্তির, অথচ তাঁদেরও মানসিক অনুভূতিগুলো আছে বিচিত্র ভাব প্রতীক্ষায়। লু শুনের এই চিন্তার মমতাসিঞ্চনে রূপকার অরুণ মুখোপাধ্যায়—চেতনার প্রয়োগপ্রধান।

আপনি কি 'অভিনয়' অনুরাগী? তবে আপনাকে হয়ত হতাশ হতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ের যে ধারণা আপনি লালন করে আসছেন, সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে বাধ্য। অভিনয় কতটা স্বাভাবিক হতে পারে জগন্নাথ তার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। প্রথাগত মাতাল, প্রত্যাসন্ধ নির্বোধ প্রভৃতি যে সব চরিত্রায়ণের চরম থিয়েটারী ঢংয়ে আমরা এতদিন অভ্যস্ত ছিলাম, সেই অভ্যাসে চিড় ধরিয়েছে চেতনা। জগন্নাথের ভূমিকায় অরুণ মুখোপাধ্যায় কখনও উচ্চকিত নন অথচ [illegible] অভিব্যক্তি কত নিদারুণ [illegible] পারে, স্টেজের চলাফেরা কতখানি স্থির হয়ে উঠতে পারে, সারাক্ষণ নিচুগলায় কথা বলেও দর্শক হৃদয়ে কিভাবে মোচড় দিতে হয়, অজান্তে গলায় কখন একটা কান্নার পিণ্ড ঘনিয়ে আনতে হয়, তিনি জাদুকরী নৈপুণ্যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। শিবশঙ্কর ঘোষ, গৌতম চক্রবর্তী, উত্তম মুখোপাধ্যায়, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না মিত্র, নন্দিতা বসুচৌধুরী, সুমিতা দাশগুপ্তা সকলে মিলে যে টিমওয়ার্ক রচনা করেছেন সে যেন দৃঢ় পিনদ্ধ সনেট, চোদ্দ অক্ষরের পরিমিতি কোথাও হারালেই যেন ছন্দভ্রষ্ট হয়ে যেত। দুটি বিশেষ চরিত্রে সমীর মুখোপাধ্যায় ও আলোক দত্তের অভিনয় অনেককেই সচেতন করবে। আগেই বলেছি কেউ কোথাও অভিনয় করেননি, যেখানে একটু অভিনয়ের চেষ্টা হয়েছে সেখানেই সামান্য ছন্দপতন। মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ মুখোপাধ্যায় ও বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী তিনজনেই চোখে পড়েন প্রথাগত সু-অভিনেতা রূপে যেটা এই নাটকের টিমওয়ার্কে মানানসই নয়।

আপনি কি নাট্যকার? চেতনার জগন্নাথ আপনার অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। জগন্নাথ নাটকে ঘটনাস্রোত অব্যাহত থেকেছে, একই সঙ্গে তিনটি ঘটনা দেখানো গেছে, ফ্লাশব্যাক অথবা কল্পদৃশ্য হয়েছে অনায়াস, কোথাও কোন ধাক্কা লাগেনি। আজকাল অনেক নাটকেই কাহিনীসূত্র ধরানোর জন্য সূত্রধারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, এবং নাটকের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও প্রায়শই শুধু তার কথার বোঝা বাড়িয়ে তোলা হয়। জগন্নাথ নাটকের একটি ভূমিকা আছে, যাকে বলা যায় মূল নাটকের খণ্ডচিত্র নিয়ে পূর্বকথন। আমি ঘড়ি ধরে দেখেছি এই পর্বভাষণের সময় লেগেছে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট, অথচ একদম শুরুর চমক থেকে এই চল্লিশ মিনিট দর্শকেরা কোন সময় ধূমপানের জন্য ব্যাকুল হন না—এই চল্লিশ মিনিটের সবটাই (সামান্য ২/৩ মিনিট ছাড়া) দর্শকেরা ভাসতে ভাসতে চলেন, ঘটনার ঘনঘটায় নয়, ঘরোয়া সংলাপের পারিপাট্যে, তারপর মূল নাটক যখন আরম্ভ হয় তখনও দর্শক আবেগে ভাসতে পারেন না কারণ

হাল ধরে রাখেন নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধিদীপ্ত প্রযোজনার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ জগন্নাথ।

আপনি কি চলচ্চিত্র অনুরাগী? তা বাংলা ফিল্মের এই বন্ধ্যা যুগে জগন্নাথ আপনাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে যা ভাল ফিল্মে দেখার মেজাজের সমগোত্রীয়। বিভিন্ন সময় যে কম্পোজিশন, বিরতি আগে সতুপের মত হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা মাতালদের দুপাশ দিয়ে জগন্নাথ ও নন্দের ধীর গতি, মনোরমা যেখানে আনমনা হয়ে বসে আছে, জগন্নাথ শুধু দূর থেকে দেখে অথবা রিভলভার নিয়ে প্রতিশোধ নেবার কল্পদৃশ্য সব কিছুই যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্রের মত খণ্ডদৃশ্য মূকাভিনয় একই অঙ্গে এত রূপ অভাবনীয়। বাংলা নাটক আর কখনও বোধহয় সিনেমার এত কাছাকাছি আসতে পারেনি।

আপনি কি নাটকে আঙ্গিক বিশ্বেষী? সময়ে সময়ে আঙ্গিক যে নাটককে বিড়ম্বিত না করে, নাট্য প্রতিমার চালচিত্র রচনা করে, জগন্নাথ তার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অভিনয়ের মত এ নাটকের মঞ্চ নিরাভরণ অথচ গভীর (মঞ্চ—সুবিমল রায়)। নাটকের চরিত্র অনুযায়ী দুপাশের বিভিন্ন প্ল্যাটফরম লাল ও কালো রঙের। মাঝখানে একটি যূপ-কাষ্ঠ। সময় বিশেষে চরিত্ররা সেখানে যখন মাথা রাখে আমরা তখন সহজেই বুঝতে পারি বিভিন্নভাবে সমাজে কত বলি হয়। মুহুর্মুহু আলো তার রং পাল্টায়, চরিত্র ও ঘটনাকে রাঙিয়ে দেয় আনন্দে ও বিষাদে (আলো—দীপক মুখোপাধ্যায়)। এই নাটকের সঙ্গীত একটি সম্পদ। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের আবহচিন্তা এই নাটকে নতুন ডাইমেনশন এনেছে। বিভিন্ন সময়ে সরোদ, বাঁশি, তার-সানাইয়ের ব্যবহার, বরুণদার সঙ্গে জগন্নাথের কথা বলার সময়, মনোরমাকে দূর থেকে দেখার সময় খমকের ধ্বনির সঙ্গে জগন্নাথের ভঙ্গী অথবা জগন্নাথের কথা বলা, বন্দী অবস্থায় বীরদর্পে চলার সময় আবহ অব্যক্ত অনেক কিছুই দর্শক শ্রবণে পৌঁছে দিয়েছে। মাতালদের দৃশ্যে নাচ বাঁদরনাচ তার সঙ্গে ফিসফিসানি "তোকে ভালবাসে। তুই পাবি না" পরে তার পূর্ণ প্রয়োগ নাটককে এক লহমায় অমৃত আস্বাদী করে তুলেছে। সঙ্গীতের পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। বিশেষত চার লাইনের গান 'বাঁচতে যে কি সুখ', আর একটি গানে যেখানে পেছনে জগন্নাথের ছেলেবেলা গুঞ্জরণ করে ফেরে, তার সাথে গলা মেলায় যুবক জগন্নাথ মনোরমাকে সামনে রেখে—সেটা সম্পূর্ণ কাব্যের আওতায় পড়ে।

আপনি কি সমালোচক? তবে বিপদ আছে। কারণ, সমালোচক মাত্রেই 'মাছি মন'। ত্রুটি আবিষ্কারে আপনি উদগ্র। এই সাদামাপ্টা স্বাভাবিক নাটকেও অনেক প্রথাগত রূপ আপনাকে বিব্রত করতে পারে। এই নাটকের মেক-আপ কনভেনশন ভাঙেনি। বলি যে দেয়, তার যথারীতি তান্ত্রিকের পোশাক এবং দাড়ি রাখে। বিপ্লবীর চশমা থাকে না, লেখক হলেই চশমা। উইলগুলি স্পষ্টতই উইল। অত্যন্ত সুঅভিনয় সত্ত্বেও এই নাটকে গাঙ্গুলি মশাইয়ের প্রাতঃকৃত্যের ব্যাপারটা সামান্য বেমানান। যদিও প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনটাও স্বাভাবিক নিয়ম, তবুও...। মোক্ষদার কাটা কাটা সংলাপের মধ্য দিয়েই তাঁর চরিত্র বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু সে যখন মনোরমাকে দাশমশাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য মন্ত্রণা দেয় তখন সে পরিচিত ছকে বাঁধা পড়ে—মনে হয়, শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' গল্পের রাসমণি, গোলক চাটুজ্জের জন্য জ্ঞানদাকে যুক্তি দিচ্ছে। এই ধরনের একটি নিয়ম ভাঙার প্রযোজনায় এই সব ত্রুটির জন্য সামান্য কিছু আক্ষেপ রয়ে গেল। কিন্তু এসব ত্রুটি, ত্রুটিই নয় সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল যার জন্য আমার আক্ষেপ বেশী, সেটা হল—অরুণ মুখোপাধ্যায় শিল্পী মনের মাধুরী দিয়ে যে নাট্যপ্রতিমা রচনা করেছেন, প্রতিবেদক হিসাবে আমি হয়তো বোঝাতেই পারলাম না—সে প্রতিমা কতখানি তিলোত্তমা!

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুমিতা দাশগুপ্ত জগন্নাথ

বিবর্ণ মালায় বর্ণাঢ্য সন্ধ্যা

ওরা সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল ভীড় করে। ও'দের মধ্যে অনেকে স্বাধীনতার পরে আলো দেখেছেন প্রথম, অনেকে চল্লিশ পার হয়েছেন, যৌবন এবং কৈশোরের অনেক স্মৃতি সামনে দেখে চোখ ঝকঝক করে উঠেছিল। এক পাশে কয়েকজন প্রবীণ বাস সন তারিখ নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন, অবাক বিস্ময়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের কথা শুনছিল অনেক তরুণ। 'অভিনয়' পত্রিকাকে ধন্যবাদ, বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে তাঁরা প্রায় একশ বছরের পুরোনো থিয়েটার পত্রিকার প্রদর্শনী উপলক্ষে তরুণদের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনলেন, যেটা এই যুগে দুর্লভ।

বিবর্ণ অনেক পত্রিকা। এর মধ্যে গিরিশচন্দ্র সম্পাদিত সৌরভ (১৮৮৫), মিনার্ভার মুখপত্র রঙ্গভূমি (১৯০১), মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রঙ্গমঞ্চ, অমরেন্দ্রনাথের নাট্যমন্দির (১৯১০), থিয়েটার সাপ্তাহিক (১৯১৪), শিশির, নাচঘর আরও অনেক সেকালের পত্রিকা—কিছুদিন আগের সলিল চৌধুরী সম্পাদিত গণনাট্য, উৎপল দত্ত সম্পাদিত পাদপ্রদীপ থেকে এই বছরে প্রকাশিত থিয়েটার বুলেটিন পর্যন্ত প্রচুর পত্রিকা ও'রা সযত্ন নিষ্ঠায় সংগ্রহ করেছিলেন। এর সঙ্গে আরও প্রদর্শিত হয়েছে কিছু ওপার বাংলার থিয়েটার সাময়িকী এবং নাটকের বই, যার সম্পর্কে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহাল নই।

সাময়িকপত্র থেকে যেমন সময়কে ধরা যায়, সে রকম আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। বিবর্ণ পাতা ওলটাতে ওলটাতে অনেক কথাই মনে আসে। অনেক কথাই আজ হাস্যকর, আবার অনেক কথা আজও মূল্য হারায় নি। জনপ্রিয় নাটক মানেই সর্বজনপ্রিয় নয়। দর্শকের মধ্যে অনেক বিদগ্ধ জন থাকেন, যাঁরা সহজ জনতোষিণী প্রক্রিয়ায় ভোলেন না।
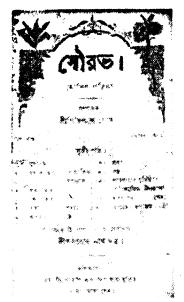
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

গিরিশচন্দ্র সম্পাদিত, 'সৌরভ' পত্রিকার টাইটেল পেজ

'বাংলাদেশী নাট্যকার এতদিন নির্বিবাদে নাটক লিখিবার জন্য ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন.....দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস এমনভাবে আওরঙ্গজেবের দরবার হইতে তলোয়ার ঘুরাইয়া চলিয়া যান, যে দেখিলে মনে হয় তিনি পুলিশ কোর্টের এজলাস হইতে শ্যামবাজার যাইতেছেন। .....ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়, জয়পুরের রাজা রামসিংহ স্বচ্ছন্দে ভারতবিজয়ী সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা ভার্যা উদীপুরীর সঙ্গে ইয়ার্কি দিতেছেন। মোগল হারেম সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই।'

এই ইতিহাস বিকৃতি কি এখনও হয় না? মঞ্চের শিল্পীরা কিছু দর্শকদের সম্পর্কে যা ভাবতেন আজও সেই ভাবনা বদলানোর দিন এসেছে কি? তুলসীদাস লাহিড়ী ১৩৫৮-৫৯ সনের নাট্যালোক পত্রিকায় লিখছেন, 'দুই বন্ধু এক নাটক দেখছে। পিছনের আসনে বসে আমি মন্তব্য শুনতে পাচ্ছি। একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করল ঐ যে রেলের সিগন্যালের মত উঁচুতে কি একটা দেখতে পাচ্ছি—ওটা কি রে?'

'দূর বোকা, পাহাড়ের উপর চাঁদ উঠেছে ওটা'

'আচ্ছা নীল কাপড়ের ফাঁকে রোলারের মত নড়ছে, ওটা কি রে?'

'নীল কাপড় নয়—ওটা নদীর জল—রোলার নয়, ঢেউ।' বাইরে এসে সেই বন্ধুই মহাউৎসাহে বলতে লাগল, মাইরি একটা সিনারিতেই টাকা উঠে এল। কি নদী! কি ঢেউ! মেয়ে দর্শক অনেকে মূল নাটক অনুকরণ না করে অভিনেত্রীর কাপড়ের পাড় টিপ গহনা লক্ষ্য করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পর্দায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভূমিকা দেখে মুগ্ধ হয়ে পথে নটের সাক্ষাৎ পেয়ে পদধূলি নেয়, এও দেখেছি। ......এরা আসল রসের সন্ধান পায় না।' কতকগুলি মজাদার বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি। 'আমাদের রাজশ্রী রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মতিথি উপলক্ষে মহা সমারোহ কাণ্ড! রঙ্গালয় পত্রে, পুষ্পে, পতাকায় ও আলোক মালায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করিবে। সন্ধ্যা ৭॥ সাড়ে সাতটায় বাজী পোড়ান হইবে তৎপরে অভিনয় আরম্ভ হইবে।' (পাশাপাশি মনে রাখতে হবে বহু নাটক দেশদ্রোহিতার অপরাধে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।) আর একটি বিজ্ঞাপন : 'নবীন প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণ! এস দেখিয়া যাও।' একটি ছড়ায় বিজ্ঞাপন 'কেয়াবাৎ নাচ পরিপাটি ছাঁচ কেয়াবাৎ গান/যেন কোয়েলের তান/পোষাকের ছটা—বিজলীর ঘটা/রূপরাগ নিমকহারাম বানচাল।' এছাড়া বিভিন্ন আকর্ষণীয় দৃশ্যের জমকালো বর্ণনা অথবা উপহার দেবার প্রতিযোগিতার খবর অনেকেই রাখেন। এ কালে বিজ্ঞাপনের ঢং পাল্টেছে। 'প্রতিটি দৃশ্য প্রাপ্তবয়স্কদের' বলাই এখন যথেষ্ট। আগে বিজ্ঞাপিত হত 'মহিলাদের জন্য সুবন্দোবস্ত' বাচ্চাদের রাখার জন্য সুব্যবস্থা 'গরমের জন্য হাত পাখা' এখন বিজ্ঞাপিত হয় থিয়েটার সংলগ্ন চাইনীজ রেস্তোরাঁর বাড়তি সুযোগ। একটি বিজ্ঞাপনে দেখছি [illegible] মঙ্গলবার ৮ই এপ্রিল ১৯২৬ সন্ধ্যা ৭টায় মাত্র এক রাত্রির জন্য 'বঙ্গীয় নাট্যকলার ক্রমবিকাশ'। যাঁদের নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য অভিনীত হয়েছে, তাঁদের নাম মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ডি এল রায়, অমরেন্দ্রনাথ, অতুলকৃষ্ণ, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, বরদাপ্রসন্ন, অপরেশচন্দ্র। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন সে তালিকাও চমকপ্রদ। কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা অমৃতলাল, নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ ইন্দুবাবু, দুর্গাদাস, তিনকড়ি চক্রবর্তী নরেশ মিত্র তুলসী চক্রবর্তী অহীন্দ্র চৌধুরী, হাঁদুবাবু, কুঞ্জবাবু। 'নবান্ন' থেকে আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাটকের নির্বাচিত দৃশ্য যদি সব শ্রদ্ধেয় শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে আধুনিক ক্রমবিকাশের কেউ পরিচয় দিতে সচেষ্ট হন তবে আমরা কৃতজ্ঞ হব। সেকালের মঞ্চ সম্পর্কে একটি পত্রিকার ছড়া উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না—

> বিস্তারে চারিধারে কি গন্ধ মূত্র
> চীৎকারে চাকরানী কাঁচ মেয়ে পুত্র
> হুংকারে সিটে বসে বোতলের শিষ্য
> চক্ষুতে জাগে ওটা নন্দীর দৃশ্য।
> পানরাঙা ফুৎকারে ভিজে যায় গাত্র
> ফট ফাট সোডা ভাঙে বপ সারারাত্র
> সযত্নে পোষা হেথ মশাকের বংশে
> চেয়ারেতে ছারপোকা ফটাফট দংশে।
> হর্দম কর্দম ধুলো ঢোকে চক্ষে
> অ্যাকটিং দেখে বলি কর কালী রক্ষে
> কমেডির অভিনয়ে তেড়ে আসে কান্না
> ট্রাজেডিতে হো হো হেসে দম কেউ পান না
> ঘরে ফিরে ঘুমিয়েও উঠি দাদা আঁতকে
> আমরণ ভুলি না সে থিয়েটারী রাতকে।

একালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যার মধ্যে বহুরূপী, অথবা উদ্যোক্তা অভিনয় পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা আরও অনেক

তরুণকুমার, সৈকত পালচৌধুরী 'এই ছিল মনে' পরিচালনা : সুধীর সরকার

বিশেষ পত্রিকা বহুদিন পাতা উল্টে দেখার মত। ভবিষ্যৎ গবেষকের প্রেরণা জোগাবে। অধুনালুপ্ত গন্ধর্বের মননশীল প্রবন্ধ অথবা থিয়েটার পাক্ষিক-এর সমালোচনাগুলি একালের সচেতন থিয়েটার কর্মীর উদাহরণ হয়ে থাকবে। সমালোচনা প্রসঙ্গে আর একটি কথা. প্রায় দুই দশক আগে 'বহুরূপী ও রক্তকরবী' প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের যে দীর্ঘ আলোচনা 'পাদপ্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত সে রকম সারগভ আলোচনা সব যুগেই প্রত্যাশিত। প্রথঃ মুখবন্ধ ছিল এই রকম, 'শম্ভুবাবুর সূক্ষ্মরসবোধ এবং প্রয়োগ-কৌশলের অভিনবত্বে এমন এক নাটক সৃষ্টি হয়েছে য বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যকে ধরে তাকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। বিগত পঁচিশ বৎসরে বাংলা দেশে কোন নাটক এ করতে পেরেছে বলে জানা নেই। এটা স্বীকার করতেই রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ-সাধকদের হৃদকম্প উপস্থিত হয় শম্ভু মিত্র এক প্রচন্ড ব্যতিক্রম'। ঐসংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ভিক্ষা নয়, সরকার কি সামান্য খরচে অ্যাসবেসটস দিয়ে ছাদ করে প্রত্যেক শহরে মঞ্চ তৈরী করতে পারেন না? তবে থিয়েটার-এর দলগুলি বাঁচে। সকলে জানেন কিনা জানি না, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক শহরে রবীন্দ্র ভবন বা টাউন হল বা রেলওয়ে মঞ্চ আছে। সেগুলি ফাঁকাই পড়ে থাকে। খুব কম ভাড়া—কিন্ত আমন্ত্রিত অভিনয় ছাড়া খুব কম দলই নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বাইরে অভিনয় করেন। নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায়, কলকাতায় শো করার থেকে খরচা অনেক কম। প্রতিটি দলই পারেন মাঝে মাঝে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কাছাকাছি ছড়িয়ে পড়তে এবং বিরাট লোকসানের বোঝা কমাতে।

অভিনয় পত্রিকা তাঁদের নির্বাচিত ১৯৭৬-এর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পুরস্কৃত করা ছাড়াও সম্বর্ধনা জানিয়েছেন 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য' রচয়িতা ডঃ অরুণকুমার মিত্রকে এবং ডঃ অরুণ সান্যালকে তাঁর 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও লেবেদফ' গ্রন্থের জন্য। মফঃস্বলের কয়েকটি নাট্যদলও পুরস্কৃত। অনুষ্ঠান শেষে শ্রীরামপুরের 'সংহানা' গোষ্ঠী অভিনয় করেন 'ইক্যুয়েশন'।

মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অনুষ্ঠান ও অভিনয় এবং সামনের সামান্য জায়গায় এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর হয়েও অনেককে সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। অনেক বড় বড় পুরস্কার সভার মত এখানে ঢাক বাজেনি কিন্তু কান পাতলে (এবং থাকলে) মঙ্গল শঙ্খ শুনতে পাওয়া গেছে নিঃসন্দেহে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

জাপানী কাবুকির একটি দৃশ্য

নাট্যাঙ্গন

কাবুকির ভাষার বেড়া

সাড়ে তিন শ' বছরেরও বেশি পুরোনো জাপানের সুপ্রসিদ্ধ কাবুকি নৃত্যনাট্য এই প্রথম আমরা ভারতবর্ষে দেখলাম। শুধু ভারত কেন, এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও কাবুকি এর আগে কেউ দেখেনি। এই প্রথম। প্রথম কারণ জাপানের নিজস্ব কৃষ্টি এবং মেধার এই শিল্পাঙ্গ এর আগে বড় একটা দেশের বাইরে যায়নি। কয়েকবারই আমেরিকা এবং ইউরোপে গেছে, কিন্তু সেরকম সাড়া পায়নি। কলকাতায়, রবীন্দ্র সদনে ১২ মার্চ আমরা যে কাবুকি দেখলাম তাতে এই প্রসিদ্ধ নাচ এবং নাটকের বিদেশে সমাদৃত হওয়া মুশকিল। কোন ক্ল্যাসিকাল স্তরের নাচ বা নাটকের যেটা প্রধান লক্ষণ, প্রধান গুণ কথার ভাষায় পাঁচিলকে টপকে যাওয়া—তা কাবুকি, অন্তত যে কাবুকি আমরা কলকাতায় দেখেছি, করে উঠতে পারেনি। অবশ্য জাপানী কনসুলেটের তত্ত্বাবধানে আমরা কাবুকির ওপর যে তথ্যচিত্র দেখেছিলাম সে নাটকে এবং নাচে ভাব-অভিনয়ের পরিশীলন এত উঁচু পর্যায়ের ছিল যে সিনেমার মাধ্যমে দেখেও আমরা তার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইনি। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যের সে কাবুকি মনটাকে ভেজাতে পারেনি। এবং সে না পারার সমস্ত কারণই কিন্তু ভাষার বেড়া নয়। অভিনয়ের গুরুত্ব যদি আরও বেশি থাকত 'সুগাওয়ারা দেনজু তেনারাই কাগামি'র মত বিষয় যদি আর থাকত, হয়ত দর্শকের প্রতিক্রিয়া অনেকটা অন্য রকম হত। যে পালাটার নাম বললাম সেটা সেদিনের তিনটে নিবেদনের একটা—ক্ল্যাসিকাল জাপানের বীরত্ব এবং আনুগত্যের একটা উপাখ্যান নিয়ে। জাপানের ছায়াছবির মাধ্যমে, জাপানের সাহিত্যের মাধ্যমে, এবং জাপানী ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জাপান সম্পর্কে যা জানি তা আমাদের এই দেশ এবং জাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল করে। সেদিনের কাবুকিতে রূপকথার ওপর জোর না দিয়ে ইতিহাস বা সামুরাই ঐতিহ্য জাতীয় কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব রাখলে ভাল হত। কারণ সাদামাঠা রূপকথাগুলো আমাদের মন কাড়েনি।

'সুমিদা ওয়া' এবং 'ওয়ামি নো দানমারির' দেখে রংচঙের ঘোর ধরেছে। অত্যন্ত স্টাইলাইজড গতিবিধি—স্বচলাফেরা একটা বাস্তবের ভাবনা দেয়, সরলরেখা যেখানে প্রায় অনুপস্থিত—বেশ মোলায়েম একটা মনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। পুরুষের অভিনয়ে মহিলা চরিত্রগুলি (প্রসঙ্গত, কাবুকিতে মহিলাদের অভিনয়ও পুরুষেরাই করে) যথেষ্ট মনোরঞ্জক দেখিয়েছিল। তবে বারবারই প্রশ্ন জেগেছে, দুটো নিবেদনেই নৃত্যাংশ এত সীমিত ছিল কেন? নৃত্যের চলনে একটা শক্তি আছে যা কথিত ভাষার অপেক্ষায় থাকেনা। সেদিনের ভাষাসঙ্কটের অনেকটা লাঘব হত নাচ একটু বেশি থাকলে। তবে উন্মুক্ত কণ্ঠে জানাতে বাধা নেই যে, যে পোষাক বা ভঙ্গীতে উপনীত হওয়ার জন্য কাবুকির সমস্ত কলাকুশলীর চেষ্টা সেরকম কিছু কিছু ভঙ্গী আমাদের ভীষণ মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে 'সুগাওয়ারা দেনজু তেনারাই কাগামি' নাটকে। কাবুকির সেই কারণে, দেহাতী সুরের গানও স্থানে স্থানে প্রাণে বেজেছে।

—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

হেলো শ্যাম্পু–ঠিক আপনার মত চুলের যত্নের জন্যে!

প্রোটীন সমৃদ্ধ
হেলো এগ্ শ্যাম্পু দিয়ে
আপনার চুলকে অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও
স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল ক'রে তুলুন।

বাড়তি গুণে সমৃদ্ধ এগ্ প্রোটীন যুক্ত এই ফর্মুলা—
আপনার চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়, চুলকে সম্পূর্ণ আয়ত্বে
আনে। ঝরঝরে ঝলমলে সহজাত সৌন্দর্য্য এনে আপনার
চুলকে করে তোলে প্রানবন্ত।

স্বাভাবিক সুস্থ চুল চান—
তো আজই যত্ন নিতে শুরু করুন হেলো দিয়ে

হেলো কসমেটিক শ্যাম্পু : এই বিশিষ্ট সুষম ফর্মুলা ব্যবহার করে দেখুন— আপনার চুল কত বেশী নরম, রেশমের মত চিক্কন হয়ে ওঠে!

হেলো লেমন ফ্রেশ শ্যাম্পু : তেলা চুলকে করে তোলে সহজাত সৌন্দর্যে দীপ্ত, ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝলমলে উজ্জ্বল।

হেলো কনসেনট্রেট শ্যাম্পু : রাশি রাশি সমৃদ্ধ ফেনার জন্যে একটুখানিই যথেষ্ট। এতে চুল নরম থাকে, আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনে।

কেবল হেলো
শ্যাম্পুগুলিতেই আছে
নিখুঁত সুষম ফর্মুলা!

দেশ

বেগন®
বেট

দু'ভাবে অনন্য ক্রিয়াশীল
আরশোলা আর মাছির থেকে রেহাই পেতে

বেগন বেট কিভাবে
কাজ করে:
যেখানেই আরশোলা আর
মাছি দেখবেন সেখানেই
বেগন বেট ছিটিয়ে দিন: এর
প্রতি এই সব পোকামাকড়
খুব তাড়াতাড়ি আপনা
থেকেই আকৃষ্ট হবে—এবং
এতে শক্তিশালী উপাদান
'বেগন' থাকায় এরা চিরতরে
নিপাত যাবে নিশ্চিতভাবে।

OBM/7757 BEN

বেগন®
বেট
বায়ারের প্রমাণিত অধিক প্রভাবশালী কীটনাশক

সূচীপত্র

MAFATLAL
GROUP

চীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ নীরেন সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "স্পর্শ" (কাটা কাগজের ছবি বা "কোলাজ" ৩'×৩') —দ্বিমাত্রিক পট কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিভ্রম ও ভারসাম্যের জন্যে সাদা চৌকোর পাশে হলুদ চতুষ্কোণটি রেখেছেন। তেমনিভাবে নীরস তরুবনের পাশে ত্রিমাত্রিক হামাগুড়ি দেওয়া শিশু ও আপেল। রচনা আড়াআড়ি ভাবে নির্মিত। চারপাশে শূন্যস্থান ছেড়েছেন দুঃসাহস ভরে। নিষ্পাপ শিশু কি পাপপুণ্যের প্রতীক আপেলটার দিকে এগিয়ে তার সারল্য হারাবে? নীরেনের চিত্রে যেন রহস্যময় ব্যঞ্জনা।

সুবোধ ঘোষের গল্প-সংকলন

ভারত প্রেমকথা ১৫·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

স্বীকারোক্তি ৫·০০

বুদ্ধদেব বসুর নাটক

কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ ৬·০০

বিমল করের উপন্যাস

ভুবনেশ্বরী ৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প-সংকলন

ভালোবাসার অনেক নাম

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস

হৃদয় ৬·০০

বিমল মিত্রের গল্প-সংকলন

প্রেম পরিণয় ইত্যাদি ৭·০০

বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস

নগ্ন নির্জন ৫·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস

সময়, আমার সময় ৫·০০

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস

বৃষ্টির পরে ৬·০০

শংকরলাল ভট্টাচার্যের উপন্যাস

এই আমি একা অন্য ৪·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-সংকলন

কল্পকুহেলি ১০·০০

সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ গল্প-সংকলন | পঞ্চদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

এক ডজন গপ্পো ১০.০০

প্রকাশিত হল

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার আবহে প্রায়শই জড়িয়ে থাকে এক দুরযানী স্বপ্নমায়া, আধখোলা দরজার মতো অপ্রাতিরোধ্য রহস্যের হাতছানি। আজকের শব্দচাতুরি-ক্লিষ্ট বাংলা কাব্যজগতে তাঁর শুদ্ধতা-অন্বেষী তন্ময় কাব্যসাধনা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কোনও চিৎকৃত ঘোষণা বা চমকপ্রদ নাটকীয়তার হাতুড়ির বাড়ি মেরে কাব্যপাঠকের মনোযোগ সজোরে আকর্ষণ করতে তিনি সচেষ্ট নন, আদিম মন্ত্রের অনুরণনময় অ-লৌকিক উচ্চারণে তিনি চান তাকে আবিষ্ট করতে, নম্র মৃদু অনুভবের আলতো টোকায় তার বুকের ছোট্ট দরজাটা খুলে দিতেই একান্ত আগ্রহ তাঁর। তাঁর কবিতায় কখনও ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট ডোরে গাঁথা, কখনও বা আপাতবিচ্ছিন্ন ধ্বনিময় শব্দবিন্যাসে অবচেতনের গভীর ছেড়ে উঠে আসে কোনও আধচেনা চরিত্রের আদল, কোনও রহস্যময়ের কাহিনীর আভাস, কোনও অচেনা আবহের আমেজ, চেতন-অবচেতনের সামান্তরালে কোনও সংগোপন কল্পনার জাল, যেন প্রায় পরাবাস্তবের ছোঁয়া-লাগা পরিচিত প্রাত্যহিকের দৃশ্য, খ্রীষ্টজীবনের তীব্র অনু-ষঙ্গখচিত কোনও বেদনার্ত উপলব্ধি। আত্মাপন প্রদর্শনীনিস্পৃহ সজলের কবিতায় প্রকৃত কাব্য-রসপিপাসুর নিবিড় আস্বাদনের সামগ্রী আধারিত হয়ে আছে॥ দাম ৫·০০ ॥

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবিতা-সংকলন

স্বপ্নে উপকূলে

আনন্দ বাগচীর

নতুন কবিতার বই

উজ্জ্বল ছুরির নীচে

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সংসারে এক সন্ন্যাসী ৭·০০

মতি নন্দীর উপন্যাস

দুঃখের বা সুখের জন্য ৫·০০

ভ্রাংশু গুপ্তের উপন্যাস

মহাকরণ ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ঘুণপোকা ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৩৯

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৪
শনিবার ২৬ চৈত্র ১৩৮৩

ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন

ভারতের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনে জনতা দলের প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেস দলের অন্তর্ধান ভারতীয় জাতিক জীবনের একটি ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন ও নবতর পরিণামের সংকেত হিসাবে দেশের ও বিদেশের সর্বত্র অভিনন্দিত হবে। স্বাধীন ভারতের জীবন বিগত ত্রিশ বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন প্রকারে কংগ্রেসের শাসনিক নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। তাই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় এবং জনতা দলের জয় ভারতের রাজনীতিক জীবনে একটি অভিনব প্রকারের ঘটনা, জাতীয় পরিণামের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা বলে মনে করতে হয়। জনতা দলের প্রতি নাগরিক জনের বিপুল সমর্থন আরও একটি অর্থবহ ইঙ্গিত, এবং কংগ্রেসীয় নেতৃত্বের সম্পর্কে বিপুল অনাস্থার পরিচয় বলে বিবেচিত হবে। ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত শাসনে ও প্রশাসনে অভ্যস্ত হয়েও দেশের জনসাধারণ যেন সেই নেতৃত্বের প্রতি মান্যতা ও সমর্থনের সমূহ অবসান ঘটিয়ে দিল। এর আগে কংগ্রেসীয় নেতৃত্বে পরিচালিত শাসনিক রীতি-নীতি ও ক্রিয়ার বিরুদ্ধে বহুজনের সমালোচনা ও অভিযোগ মুখরিত হয়েছে, বিক্ষোভ প্রবল হয়েছে, তবু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের সংহতি বিপর্যস্ত হয়নি। কিন্তু এইবার দেখা গেল যে, কংগ্রেসের রাজনীতিক নেতৃত্বের এবং শাসনিক ক্ষমতার বনিয়াদ যেন প্রবল এক বিরুদ্ধ মহাপ্লাবনের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তলিয়ে গেল। ভারতের স্বনামধন্য এবং প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞ রাজনীতিক নেতা, শ্রীমোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় বহু কৃতী রাজনীতিকের সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং দেশবাসীর মন একটি নূতন আশাবাদে প্রসন্ন হবে যে, নূতন নেতৃত্ব জাতির জীবনে নূতন সফলতা ও সমৃদ্ধির আহ্বান করতে যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শিত করবেন।

গণতান্ত্রিক জীবনের পক্ষে দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন সংগঠনের দুই প্রধান দলের আবির্ভাব অথবা অস্তিত্ব একটি আকাঙ্ক্ষিত সার্থকতার সত্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং, অনেকেই মনে করবেন যে, কংগ্রেস এখন বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে গণতান্ত্রিক জীবনেরই সহায়ক একটি কর্তব্যের দীক্ষা নিয়েছেন। এর আগে সংসদীয় ক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতায়, সম্পন্ন এবং সুসংহত কোন বিরোধী দল দেখা যায় নি। রাজনীতিক যোগ্যতায় কংগ্রেসের বিপক্ষ জনতা দল, এবং জনতা দলের বিপক্ষ কংগ্রেস দল উভয়েই সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুগত আদর্শাচারের ক্ষেত্রে একটি আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতার সার্থক দৃশ্য বলে বিবেচিত হবে। দেশবাসী চাইবে, ক্ষমতাসীন জনতা দল এবং বিরোধীর ভূমিকায় আসীন কংগ্রেস দল উভয়েই তাঁদের কৃতিত্বের উৎকর্ষে জাতির জীবনে নূতন একটি মাঙ্গলিক ঐতিহ্যের সূচনা করুক। কেউ এই অমোঘ নৈতিক সত্যটিকে অস্বীকার করতে পারে না যে, গণতন্ত্রের জীবনে শুধু একটি শক্তিশালী দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য উপভোগ করবার দৃশ্যটি গণতন্ত্রেরই একটি বিপদাপন্ন অবস্থার দৃশ্য।

জনসাধারণের মনের একটি লঘু প্রশ্নেরও অবসান হয়েছে বলে মনে হয়। ত্রিশ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায় ও কর্তব্য যাঁরা পালন করেছেন, তাঁরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের মানুষ। গুজরাটী মোরারজী ভাইকে প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে পেয়ে দেশবাসী এখন বিশ্বাস করতে পারবে যে সেই একঘেয়ে উত্তর-প্রাদেশিকতায় চিহ্নিত প্রধানমন্ত্রিত্ববাদ এই প্রথম ভারতের রাজনীতিক জীবনের নেপথ্যে চলে গেল। অবশ্য এই সত্যটিও অস্বীকার করা চলে না যে, ভারতের রাষ্ট্রিক জীবনে প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটিকে প্রাদেশিক রীতিতে সমবণ্টিত করবার কোন নীতি থাকতে পারে না। গুজরাটী মোরারজী ভাই সারা ভারতের সকল রাজ্যের নাগরিকজনের শ্রদ্ধার আস্পদ, তাঁকে গুজরাটী অভিলাষের বিশেষ প্রতীক বলে মনে করবার কোন অর্থ হয় না যেমন জওহরলাল নেহরুকে নিতান্ত উত্তরপ্রাদেশিক অভিলাষের প্রতীক বলে কেউ মনে করেনি।

এবারের সাধারণ নির্বাচনের ফল অনুযায়ী যদি কোন মানচিত্র অঙ্কিত হয়, তবে দেখা যাবে যে, এই নির্বাচন যেন ভারতকে দুই ভিন্ন মানচিত্রে খণ্ডিত করে দিয়েছে। উত্তর ভারতের নির্বাচনী ফলের মানচিত্র সমূহ-প্রকারে জনতা দলের জয়ের গৌরবের রঙে রঞ্জিত হয়েছে। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতের নির্বাচনী ফলের মানচিত্র কংগ্রেসের সফলতার ত্রিবর্ণে অনুরঞ্জিত। জনজীবনের অনেক অংশে একটি বিশেষ বিস্ময়ের জিজ্ঞাসা এই ঘটনার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পরিপোষণ না করে বরং এটাই মনে করা ভাল যে ভারতের মতো বিরাট দেশে, বত্রিশ কোটি ভোটারের দেশে এ ধরনের বিস্ময়ের সম্ভাবনা অস্বাভাবিক নয়।

জনতা দলের দ্বারা সংগঠিত রূপায়িত ও পরিচালিত নূতন শাসনিক নেতৃত্বের কাছে দেশবাসীর আশার দাবি অনেক। জনতা দলও মুক্তকণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশবাসীর আশার দাবিকে সম্মানিত করেছেন। কোন সন্দেহ নেই যে, জনতা দলের তথা নূতন সরকারের প্রয়াস ও অধ্যবসায়ের আন্তরিক প্রকাশ বাস্তবক্ষেত্রে দেখতে পেলে দেশবাসী আশ্বস্ত হবে। জনতা দল এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই অঙ্গীকারের বাণী উচ্চারিত করেছেন যে, গরীব জনসাধারণের দুঃখ এবং অভাব দূরীভূত করাই হবে সরকারের প্রথম-প্রধান কর্তব্য। এই অঙ্গীকারের নিহিতার্থ নিশ্চয় এই যে, দ্রব্যমূল্য কমবে এবং প্রয়োজনের সামগ্রী সুলভ হবে। স্বাধীন ভারতের ত্রিশটি বছরের সকল মুহূর্তে দেশের মানুষ যে এই আশা-কেই তাদের প্রিয়স্বপ্ন করে রেখেছিল যে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব ঘুচুক, দাম ও দরের উগ্র উচ্চতা খর্বিত হোক। ইতিহাসের বিচার-বাণীতে এই দুঃখকর ঘোষণাই উচ্চারিত হবে যে, ত্রিশ বছরের মধ্যে কংগ্রেস-সরকার এইটুকু গরীবপোষা মমতার কাজ করতে পারেননি। তাই জনতা সরকারের কাছে দেশবাসীর আশার প্রথম দাবির প্রথম কথা এই যে নতুন সরকার [illegible] ভারতের সংসারে [illegible] একটি [illegible] ও [illegible]।

দৃশ্যপট

[illegible] সরকার [illegible] শুরু [illegible] ভালভাবে হয়নি তা সকলেই স্বীকার করবেন। প্রথম থেকেই ঝগড়ার সূত্রপাত। প্রথম ঝগড়া হল প্রধানমন্ত্রীত্ব নিয়ে। তারপর ঝগড়া কে ওপরে কে নীচে তাই নিয়ে। তারপর কিছুটা মতবিরোধ চলল দফতর বণ্টন নিয়ে।

জনসাধারণ যে এই দশা দেখে হতাশ হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর শুধু হতাশ বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে, বলা উচিত বিক্ষুব্ধ। জনতা ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতাদের আচরণে জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ কারণ গোড়াতেই এই ধরনের নোংরা এবং ছেলেমানুষী ঝগড়া তাঁরা আশা করেননি।

এই ঝগড়ার জন্য অবশ্য গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতারা যত দায়ী জনতা পার্টির নেতারা ততটা নন। গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতারা কীভাবে আশা করলেন যে জগজীবনবাবু প্রধানমন্ত্রী হবেন [illegible] মুশকিল। জগজীবন জরুরী অবস্থার সমর্থক ছিলেন। [illegible] চুপচাপ [illegible] শ্রীমতী গান্ধীর সবকিছু সমর্থন [illegible] জগজীবন [illegible] মানেন। জগজীবন গোড়ায় জনতা পার্টিতে যোগ দিতেও রাজি হননি। জগজীবন জনতা পার্টির তুলনায় সামান্য কয়েকজন এম পির নেতা। জগজীবন আগেও মোরারজীর চেয়ে উঁচু আসনে বসেননি তবু গণতন্ত্রী কংগ্রেস দাবি করল জগজীবনকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।

আসলে মনে হয় নির্বাচনের ফলাফল যদি অন্যরকম হত অর্থাৎ যদি জগজীবন বাবুরা ব্যালান্সিং ফ্যাক্টর হতেন তাহলে জনতা পার্টি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী না করে কোনও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনই করতে পারত না। ফলাফল সেরকম হল না বলেই গণতন্ত্রী কংগ্রেস সেভাবে চাপ দিতে পারল না।

নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রী কংগ্রেসের এই [illegible] লোকচক্ষে তাঁদের দলের মর্যাদা বাড়ায় নি।

*

দিল্লিতে অনেকের কাছেই শুনেছি গণতন্ত্রী কংগ্রেসের এই মনোভাবের জন্য প্রধানত দায়ী বহুগুণা এবং দলের সি পি আই পন্থীরা। বহুগুণা ভাল সংগঠক, কিন্তু বেশ প্যাঁচোয়া লোক। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে চরণ সিং তাঁর বড় শত্রু। বহুগুণা সেইজন্য বরাবর চেয়েছেন চরণ সিং-এর হাতে যাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর না যায়, যাতে তিনি ক্যাবিনেট এক নম্বর না হতে পারেন। কিন্তু মোরারজী তাতে কিছুতেই রাজি হননি। সি পি আই পন্থীরা চেয়েছিলেন বহুগুণার হাতে পররাষ্ট্র দফতর যাক। মোরারজী তাতেও রাজি হননি। পররাষ্ট্র অটল-বিহারীকে দিয়েছেন।

জয়প্রকাশ গোড়াতেই বলেছিলেন আলাদা গণতন্ত্রী কংগ্রেস না রেখে সবাই জনতা পার্টিতে যোগ দিন। ফলাফল প্রকাশের পরও তিনি তাই বলেছিলেন। জগজীবন রামের তাতে খুব আপত্তিও ছিল না, কিন্তু বহুগুণা এবং তাঁর সি পি আই-পন্থী সঙ্গীরা তাতে রাজী হলেন না কিছুতেই। তাঁরা প্রথম থেকেই আলাদা দল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞায় অটল। ফলাফল প্রকাশের পরও যদি গণতন্ত্রী কংগ্রেস জনতা পার্টিতে যোগ দিত তাহলেও জগজীবনবাবু অতি অবশ্যই উপপ্রধানমন্ত্রী হতেন।

সি পি আই-পন্থীরা এই গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। জগজীবনবাবুর স্বার্থে নয়। সি পি আই-পন্থীরা মনে করছেন ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেস দলে সুবিধা না হয় তাহলে এই গণতন্ত্রী কংগ্রেস হবে তথাকথিত প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের আখড়া। সেই আশাতেই তাঁরা গণতন্ত্রী কংগ্রেসকে আলাদা দল রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

*

সি পি আই-পন্থীরা কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব দখল করার জন্যও সবিশেষ সচেষ্ট। এই ব্যাপারে তাঁদের প্রথম মতলব হল সঞ্জয় গান্ধী, বংশীলাল প্রভৃতিকে পারটি থেকে বের করা এবং দলের নেতৃত্ব বরুয়া-রজনী প্যাটেল-চন্দ্রজিৎ যাদব-সিদ্ধার্থ রায়ের হাতে তুলে দেওয়া। তাঁরা তারপরই চেষ্টা করবেন শ্রীমতী গান্ধীর পুনরভ্যুত্থানের সব পথ বন্ধ করে দিতে। এইজন্য তাঁরা প্রয়োজন হলে জগজীবন রামকেও আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী।

চবন বিরোধী নেতা হওয়াটাও সি পি আই-পন্থীরা পছন্দ করেন নি। কারণ চবনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন স্বয়ং শ্রীমতী গান্ধী। সি পি আই-পন্থীরা চেয়েছিলেন বরুয়া বিরোধী নেতা হোন।

কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে অধিকাংশ "প্রগতিশীল কংগ্রেসীই" পরাজিত। প্রগতিশীল কংগ্রেসী নির্বাচিত হয়েছেন পনেরো ষোল জন মাত্র। সি পি আই-পন্থীরা এবং রাজ্যসভার কিছু প্রগতিশীলকে নিয়ে একটা জোট গড়তে চাইছেন।

সি পি আই মার খেয়েছেন এই নির্বাচনে, সি পি আই-পন্থী কংগ্রেসীরা মার খেয়েছেন, কিন্তু তবু এঁরা নিষ্ক্রিয় নন। তাঁরা এই অবস্থায়ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের মাধ্যমে, কংগ্রেসের প্রগতিশীলদের মাধ্যমে তাঁদের কাজ হাসিলের চেষ্টা করছেন।

*

রাজনারায়ণ এবং জরজ ফার্নানডেজ মন্ত্রিসভায় যোগদান নিয়ে যা করলেন তাতেও মানুষ ক্ষুব্ধ।

মোরারজী এঁদের মন্ত্রিসভায় নিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। এরা বাইরে থাকলে নতুন সরকারের পক্ষে নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করতেন। স্বভাবত এঁরা বিরোধিতাই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হলে কখনও কখনও রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয় এঁদের তা বোঝা উচিত।

তবে, এঁরা সরকারে ঢুকেও নানা সমস্যার সৃষ্টি করবেন। সেটা কবে করেন এবং কীভাবে করেন তাই দেখার।

জনতা পার্টি ও গণতন্ত্রী কংগ্রেসের নেতারা যেন ভুলে না যান যে জনসাধারণ বহু আশা করে তাঁদের ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। এখন তাঁদের বহু কাজ করতে হবে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে হলে। এদেশের সাধারণ মানুষ আশা করে না যে রাতারাতি সব পাল্টে যাবে। তবে তারা দেখতে চায় যে নতুন সরকার এবং নতুন মন্ত্রীরা নিষ্ঠা সহকারে কাজ করছেন, তাঁরা ফালতু জিনিস নিয়ে ঝগড়া করছেন না এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার চেয়ে দেশের উন্নতিতেই বেশি আগ্রহী।

২৮-৩-৭৭

নবারুণ গুপ্ত

বৈদেশিকী

[illegible]

দুনিয়ার প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে মেয়ে এখন একমাত্র শ্রীলংকার শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক। ইস্রায়েলের গোলডা মেয়ার গেছেন, ভারতবর্ষের ইন্দিরা গান্ধীও গেলেন, টিমটিম করছেন খালি একা তিনিই। কিন্তু তাঁর মেয়াদ আর কদিন? এ প্রশ্ন লোকের মুখে মুখে ফিরছে তাঁর স্বদেশে। বিদেশেও কথাটা উঠেছে ওয়াকিবহাল মহলে। জোর করে তাঁকে গদি থেকে টেনে নামানো অবিশ্যি হচ্ছে না। তবে সে চেষ্টাও যে হয়নি এমন নয়, ভবিষ্যতেও আর হবে না এ কথাও হলফ করে বলা যাচ্ছে না। উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যোগসাজস দেশের অতিবামরা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল বছর ছয় আগে ক্ষমতা কব্জা করতে কিন্তু পারে নি। বিদ্রোহীরা চেয়েছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের পাল্লা চুকে দিয়ে চীনে কম্যুনিস্ট ধাঁচে দেশকে ঢেলে সাজাতে। অনেক কষ্ট করে তাদের দাবাতে পেরেছিলেন শ্রীমতী বন্দরনায়েক। তাঁর সে বিপদে তাঁর পাশে অনেক দেশই এসে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্রোহীরা আপাতত ঠাণ্ডা। কিন্তু তাই বলে তিনি তো আর মৌরসী পাট্টা নিয়ে গদিতে বসেন নি। ক্ষমতা পেয়েছেন ভোটের লড়াইয়ে জিতে। সে লড়াই আর এক প্রস্থ হবার সময় এসে গেছে। কী হবে তাতে?

অবিশ্যি নির্বাচন যদি মোটে না হয় তো হলে ভিন্ন কথা। সে সম্ভাবনার কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারু কারু ধারণা সেই মতলবই তিনি ভাঁজছেন। তবে তা হাসিল করা শক্ত। অন্য দলগুলো তাতে বাগড়া দেবেই—বিরোধীরা তো বটেই যারা এতকাল তাঁকে মদত দিয়েছে তারাও। তা ছাড়া, আমলারাও হয়তো বেঁকে দাঁড়াবে, আরা হয়তো নির্বাচন মুলতুবি রাখতে চাইবে না। তেমন হলে ফৌজও হয়তো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই নির্বাচন হবে না এ কথা চট করে বলতে পারছেন না শ্রীমতী বন্দরনায়েক যদিও ইচ্ছেটা তাঁর তাই। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে তিনি এখন একেবারে একা। দোসর বলতে তাঁর আর কোনো দল নেই দেশে। তিনি যে কথাবার্তা বলেছেন তামিল সংযুক্ত মুক্তি ফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে লোকে আন্দাজ করছে তার উদ্দেশ্য নির্বাচন মুলতুবি রাখা। তামিল দল শ্রীমতী বন্দরনায়েকের সঙ্গে ভিড়ে নির্বাচন বন্ধ রাখার প্রস্তাবে সায় দিলে প্রধানমন্ত্রী ভোটের ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলেও পেতে পারেন।

নির্বাচন বন্ধ করা যদি নাও যায় তা হলেও নির্বাচনী যুদ্ধে নামতে [illegible] বন্দরনায়েক। তারা তাঁর দলের সঙ্গে হাত মেলালে তাদের ওপর ভরসা করেই হয়তো তিনি নির্বাচনী দরিয়া পাড়ি দেবার উদ্যোগ করবেন। কিন্তু সহজে কী তামিলরা তাদের ভাগ্য সঁপে দিতে চাইবে শ্রীমতী বন্দরনায়েকের হাতে? দেশে তিনি যে সিংহলী ভাষা চালু করেছেন তাতে তামিলদের ঘোর আপত্তি। দেশের গোড়ামিও তামিল আর সিংহলীদের মধ্যে বনিবনা হতে দেয়নি। এখন ভোটের তাগিদে তামিলদের সঙ্গে ভাব করতে চাইলেই কী তারা সব ভুলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজী হবে? তবে রাজনীতিতে কী আর হয় না? তাই তামিলদের নেতাদের বাগে আনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক। আর তামিল নেতারাও গোসা করে খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকেননি। মনে তাঁদের যাই থাকুক না কেন, তাঁরা আলাপ আলোচনা চালিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। আপস করতে নিমরাজীও হয়েছেন বোধ হয়। সাহায্য যদি তাঁরা শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী বন্দরনায়েককে মদত দেন তা হলে তার দাম আদায় করবেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা।

নির্বাচন হয়েছে শ্রীলংকায় এর আগে সাত বছর হলো। সেবার দারুণ জিতেছিলেন শ্রীমতী বন্দরনায়েক। তাঁর নিজের দল শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি আইনসভায় যে ১৫১টা আসনে ভোটাভুটি হয় তার মধ্যে পেয়েছিল ৯১টা। সে দলের দোসর তিনিকপন্থী লংকা সমসমাজ দল পেয়েছিল ১৯টা। শাসক জোটের আর এক শরিক কম্যুনিস্টরা কব্জা করেছিল ৬টা। অন্যদিকে পুরোনো শাসক দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি কুল্লে ১৭টা আসন পেয়ে বনে গেল বিরোধী দল। এর পর দেশের সংবিধান পালটে ফেললো গদিয়ান জোট। শ্রীলংকা প্রজাতন্ত্রের সাজ পরে দুনিয়ার আসরে নামলো। নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি হয়েছিল ১৯৭২এ। সে সংবিধান চালু হলেও পুরোনো আইনসভাই বহাল রইলো, নির্বাচনের হাঙ্গামা না পুইয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়েক রয়ে গেলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্তত আরও পাঁচ বছরের জন্যে। সে পাঁচ বছরও দেখতে দেখতে কেটে গেছে। ২২ মে ১৯৭২এ নতুন সংবিধান চালু হয়েছিল, নতুন আইনসভা গড়ার কাজ তার আগেই হওয়া উচিত। হিসেব মতো ২১ মে শ্রীলংকায় আইনসভার আয়ু ফুরিয়ে যাচ্ছে।

[illegible] জোড়জাড় তাঁর আগেই হওয়া দরকার আর সে কথা শ্রীমতী বন্দরনায়েক বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু হাওয়াটা আর তাঁর দিকে যে নেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে উপনির্বাচনের গতিক দেখে। তার ওপর শাসক জোটে ভাঙন ধরেছে। লংকা সমসমাজ পার্টি জোট ছেড়েছে ১৯৭৫-এর আগস্টে। এবারে গেল কম্যুনিস্টরা। যেটা আরও বেশী শ্রীমতী বন্দরনায়েকের কাছে ভয়ের সেটা হচ্ছে তাঁর নিজের দল শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে বসেছে। পাঁচজন সদস্য দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে গড়েছেন নতুন দল। নাম দিয়েছেন পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অর্থাৎ গণজনতন্ত্রী দল। শিল্পমন্ত্রী টি বি সুবাসিংহেও ইস্তফা দিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছেন। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছেন শ্রীমতী বন্দরনায়েক। তাঁর ভয় নির্বাচন হলে তাঁর ভরাডুবি হবে, গদি ছেড়ে তাঁকে বসতে হবে আবার বিরোধীদের মুখ্য প্রধানের আসনে। নির্বাচন মুলতুবি রাখতে পারলে হয়তো তাঁর ফাঁড়া কেটে যাবে। কিন্তু তিনি কবুল করে বসে আছেন তিনি স্বৈরাচারী নন—ঠিক সময়ে নির্বাচন তিনি করবেন।

শ্রীলংকার আইনসভার বৈঠক দুম করে মুলতুবি রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠক আবার শুরু হবার কথা ১৯ মে। তারপর তার মেয়াদ মোটে আর দুদিন। তখনই পাকাপাকি জানা যাবে নির্বাচন আদৌ হচ্ছে কি না, আর হলে কবে হবে। অন্য সব দলই চাপ দিচ্ছে নির্বাচনের জন্যে বিশেষ করে বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি। তার নেতা জে আর জয়বর্দনে তো মুখিয়ে আছেন। বামপন্থীরাও বসে নাই। লংকা সমসমাজ দল ডাক দিয়েছে বামপন্থী মোর্চা গড়ে তোলবার জন্যে। সে ডাকে বোধ হয় সাড়া দেবে নতুন গড়া পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আর কম্যুনিস্ট দল। একটা যুক্ত কর্মসূচী গড়ার চেষ্টা তারা করছে। মনে হচ্ছে এবার আসরে নামবে অতি বামপন্থীরাও। তারাও গড়ে তুলেছে আরও একটা নতুন দল জাতিকা বিমুক্তি পেরামুনা নাম দিয়ে। ১৯৭১-এর বিদ্রোহের দুধান জেলেছিলেন এদের নেতারাই। এখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁরা কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন নয়া জমানা পত্তন করাতে ভোটের লড়াইয়ে কেল্লা ফতে করে। দেখা যাচ্ছে শ্রীমতী বন্দরনায়েকের অবস্থা বেশ সঙীন।

নববাজ

অচেনা চীন

মৈত্রেয়ী দেবী

॥ ৪ ॥

মহানগরী পিকিং-এ পৌঁছলাম—তখন সন্ধ্যা, কিন্তু মনে হল যেন গভীর রাত্রি। প্লেনে আমাদের সঙ্গে বিদেশী বিশেষ কেউ ছিল না। বস্তুত থেকে আর কে পিকিং যাচ্ছে! ছিল কিছু চীনা। এয়ারপোর্টও নিঝুম। বরফ পড়ছে। কোনো মতে জামাকাপড়-ব্যাগ সামলিয়ে বাসে ওঠা গেল। একটু পরেই বাস টারমিনালে এসে থামল। অন্ধকারের মধ্যে লম্বা কালো ওভারকোট পরা দুজন ছায়ামূর্তি বাসে উঠে এলো। শুনতে পেলাম একজন বলছে, "মেম্বারস অব দি ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি, ফলো মি, আদারস প্লিজ রিমেইন সীটেড।" ইংরেজের মত নয়, বিলিতী স্কুলে পড়া ভারতীয়ের মত উচ্চারণ। আমরা উঠে পড়লাম। একে একে বাস থেকে নামছি। পোটলাপুঁটলি নিয়ে আমার ভাঙা পায়ে নড়বড় করে নামাটা অন্ধকারেও কারো গোচর হবে ভাবিনি। কে একজন হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে আমার হাত ধরে সাহায্য করলে—ওয়াচ আউট (লক্ষ কর)—এবারে গলার স্বরটা আমার ভালো লাগল, যেন বহু দিনের পরিচিত। পরে বুঝেছিলাম সে লী। আমার এক মাসের প্রবাস বাসের নিত্যসঙ্গী হয়েছিল। তাকে মনে পড়লে মনে হয় চীন দেশে আমার একটি পুত্র আছে। আত্মীয় আছে।

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ পরিচ্ছন্ন, বড় বড় সোফা, সামনে ছোট ছোট টেবিলের উপর ঢাকা-দেওয়া চায়ের পেয়ালায় চায়ের পাতা দেওয়া আছে, জুঁই ফুল মেশানো। আমরা গিয়ে বসবার পর কয়েকজন অল্পবয়সী মেয়ে, অলিভ রঙের গলাবন্ধ কোট পরা, বড় বড় ফ্লাস্ক থেকে গরম জল সেই পাতার উপরে ঢেলে দিল। এইরকম ব্যবস্থা সর্বত্র। ও-দেশে কোথাও টী-পট ব্যবহার হতে দেখিনি। পরিচয়পর্ব চলছে—সেই সঙ্গে সঙ্গে ধূমায়মান ওডি-কোলন নিষিক্ত তোয়ালে চিমটে দিয়ে দিয়ে আমাদের পরিবেশন করলে। ওদের এই ভব্য গরম তোয়ালে দিয়ে অভ্যর্থনা বড় সুন্দর। আগে আমরা যখন খালি পায়ে হাঁটতাম তখন এদেশে পাদ্য অর্ঘ্য ও

তোয়ালে বড় কাজোপযোগী। গরম তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে নিলে ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। জাপানেও এই নিয়ম আছে। আজকাল ইয়োরোপের প্লেনে এর অনুকরণ হচ্ছে। বি-ও-এ-সি-র প্লেনেও তোয়ালে পরিবেশন করতে দেখেছি। আর প্লেনে সর্বদাই 'ফ্রেশনার' বলে প্যাকেটে মোড়া যে সুগন্ধি ভেজা রুমাল দেওয়া হয় তাও মনে হয় এই চীনা ও জাপানী প্রথার অনুসরণ। এক দেশের এইরকম সুপ্রথাগুলি অন্য দেশের অনুকরণযোগ্য।

আমাদের অভ্যর্থনায় চীন ও ভারতের বহুদিনের মৈত্রীর কথা বারবার উচ্চারিত হল। অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন চীনের বিদেশের মৈত্রী সমিতির [illegible] ওয়াং পন নান ও [illegible] চেয়ারম্যান [illegible] চি ও অন্যান্য অনেকে। মিলিটারির [illegible] একজন ছিলেন। প্রথমেই মনে হল এসব ব্যাপারে আবার মিলিটারি কেন? আমাদের মিলিটারি সম্বন্ধে [illegible] অনীহা আছে। মিলিটারী [illegible] তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম চীনারা সেসব অর্থ বদলে দিয়েছে। ওরা এরকম অনেক শব্দেরই অর্থ বদলে ফেলেছে। শব্দটা একই [illegible] ভাবটা অন্য, তাই প্রথম কিছুদিন আমার বুঝতে সময় লেগেছে। ভারত সরকার থেকে আমাদের অ্যাম্বাসাডর শ্রীনাটরাজন ও তাঁর বর্মী পত্নী উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সুশ্রী, সুভাষ শ্রীমেনন। পরে আমাকে কেউ কেউ বলছিলেন শ্রীনারায়ণের উপস্থিত থাকার অর্থ আমরা ভারত সরকারের প্রেরিত ডেলিগেশন রূপে [illegible] হচ্ছি। কথাটা হয়তো ঠিকই। কারণ, সোভিয়েট

দেশে বা যেখানেই ডেলিগেশনে গিয়েছি, আমাদের দূতাবাস থেকে কেউ উপস্থিত আছেন এমন দেখিনি। আমি যতবার যত দেশে গেছি, কোথাও আমাদের দূতাবাসের অস্তিত্বই আমার গোচরে আসেনি। তাঁরা যে আমাদের সাহায্য করবার জন্যই ওখানে বজায় হালে আছেন সে কথা তাঁদের বা আমাদের সচরাচর স্মরণে থাকে না। শুধু একবার রুমানিয়াতে অবাঙ্গালী একজন দক্ষিণ ভারতীয়, এম্ব্যাসীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী বড় যত্ন করেছিলেন সেটা ব্যক্তিগত। যা হোক, শ্রীনারায়ণন অমায়িক ও ভদ্র। চীনারা ছাড়া বেশ কয়েকজন ইয়োরোপীয় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এবং তখনই স্থির করলাম এদের একজনের সঙ্গে অন্ততঃ বেশীক্ষণ কথা বলবার সুযোগ করতে হবে, জ্ঞাতব্য তথ্য জানবার জন্য। এঁদের মধ্যে ছিলেন রুইআলি নামে প্রসিদ্ধ নিউজিল্যান্ডবাসী লেখক ও কবি। তিনি পঞ্চাশ বছরের উপর এদেশে বসবাস করছেন, যদিও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। এডগার স্নো-র বইতে এঁর কথা উল্লেখ আছে। আর ছিলেন মা-হাই-তে, যাঁর অপর নাম জর্জ হাতেম। তাঁর স্ত্রী স-ফেই। ডাঃ হান্সমুলে ও ডাঃ রিচার্ড ফ্রই—একজন জার্মান ইহুদী,

একজন ইয়োরোপীয় ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী এবং স

অন্যজন অস্ট্রিয়ান। এতগুলি বিদেশী এ-দেশে কি করছে এবং কেনই বা প্রথম দিনই আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে তা পরে বুঝতে পারলাম। এঁরা সকলেই ডঃ কোটনিসের বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁদের বললাম, আমি একটা বই লিখব, আমায় আপনাদের একটু সাহায্য করতে হবে। তাঁরা বললেন, একটা কেন দুটো বই লেখ—অবশ্য সাহায্য করব। এঁদের মধ্যে রুইআলিকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগল।

লাউঞ্জ থেকে বেরুবার আগে ভারি গরম ওভারকোটগুলি আমাদের দেওয়া হল। ওরকম কোট আমাদের দেশে কারুই কাজে লাগে না—অতএব আমাদের যা কোট ছিল

তা নিতান্তই পাতলা। বাইরে শুধু বরফ পড়ছে নয়, ঠান্ডা হিম বাতাস। একখানি বড় কালো গাড়ি দাঁড়িয়েছিল—সেটি দলপতির জন্য। আর ছিল ছাই রঙের অনেকগুলি গাড়ি। আমি ও বংসলা, সঙ্গে একজন, ইনটারপ্রটার, একটা গাড়িতে উঠলাম। সে কে আজ আমার স্মরণ নেই। কারণ, সেই মুহূর্তে তারা কেউই আমাদের কাছে বিশেষ হয়ে ওঠেনি। পরিচয় ও অপরিচয়ের পার্থক্য এই। বরফ-ঢাকা নির্জন বনভূমির মধ্য দিয়ে অজানা পথ দিয়ে আমরা চলেছি—দু ধারে নিষ্পত্র বৃক্ষের ছায়াহীন অরণ্য, পথের আলোতে মৃদু আলোকিত। হেডলাইটের আলো ও রাস্তার আলো মিলে পথে যেন আগুনের আভা, এরকম আলো নাকি কুয়াশা কেটে চলতে পারে। আমেরিকাতেও ব্যবহার হয়, কিন্তু সেখানে শীতকালে আমি থাকিনি। চলতে চলতে আগ্রহভরে দেখতে লাগলাম—পথ জনহীন, মাঝে মাঝে ২।১টা সাইকেল ট্রাক ও ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। বড় বড় সোনালী অক্ষরে লাল বনাতের উপরে বাঁধানো লেখা মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে। মাঝখানে একটি স্তম্ভ ঐ রকম লেখায় সজ্জিত। ছবির মত লেখা, ছবির মতই সযত্নে আঁকা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওগুলো কি? দোভাষী বললে, স্লোগান। আমি চমকে উঠলাম, আমার ভালো লাগল না। ওই লেখাগুলো এত সুন্দর যে, কথাটা বেমানান মনে হল। কারণ, আমাদের কাছে শ্লোগান কথাটার সঙ্গে একটু নিন্দা জড়িয়ে আছে, শ্লোগান হচ্ছে বুলি—শূন্যগর্ভ কথা। কেন এরকম অর্থ হয়েছে ঐ শব্দটার? কারণ, আমরা বারবার দেখেছি শ্লোগানরূপে যেগুলো উচ্চারিত হয় মানুষকে উদ্যোগী উৎসাহী করবার জন্য, কাজে তা করা হয় না। এরকম বহু শ্লোগান আছে, তার এখনই একটা মনে পড়ছে—'গরীবি হঠাও'। যদি সত্যি গরীবি হটত তাহলে ওটা সারগর্ভ বাণী হত। যেহেতু সে উদ্যোগ কোথাও সত্য হল না তাই ওটা বুলি হয়ে গেল। এইরকম বারবার হয়ে হয়ে শ্লোগান শব্দটার যে মানেটা আমাদের কাছে প্রতিভাত, চীনে সে অর্থ নয়। ওখানে ওগুলো সত্যগর্ভ বাণী—"grasp revolution and increase production".

এটা শ্লোগান কিন্তু আর্ট শ্লোগান নয়। এ-কথা ক্রমে যখন স্পষ্ট হতে লাগল তখনই বুঝতে পারলাম—ওদের ভাষা ও আমাদের ভাষায় পার্থক্য আছে। একই শব্দ আমাদের যা-বোঝায়, ওদের কাছে তা অন্য ভাব প্রকাশ করে।

পিকিং শহরের বড় রাস্তা খুব চওড়া, মস্কোর মতই—তবে গাড়ি বিশেষ নেই। ট্রাক, জীপ, মালবাহী, যন্ত্রপাতিবাহী

লোকজন গাড়ি আছে। আর আছে সাইকেলের স্রোত। মাও-সে-তুং নাকি বলেছিলেন, প্রত্যেক চীনাকে তিনি একটি সাইকেল দেবেন। তা বোধ হয় দিয়ে গেছেন। সাইকেলে কেউ কেউ মোটর লাগিয়েছে, কেউ বাক্স বেঁধেছে। ক্রুশ্চেভ নাকি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, দুজন চীনের জন্য একটা করে প্যান্ট থাকে, আর দুজন চীনার মধ্যে একটা সাইকেল। সত্যি বলেছিলেন কিনা জানি না। যদি বলে থাকেন, অন্যায় করেছেন। গুলির আঘাত মানুষ ভুলতে পারে, বিদ্রূপের আঘাত ভোলে না। ট্রলি-বাস ও ওমনিবাস চলে। যথেষ্ট ভিড়। ট্রাম নেই। মেট্রো আছে—আমি দেখিনি, অন্যরা দেখেছিল।

পিকিং হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে আমার মনে পড়ল আমি আর একটা হোটেল পিকিং-এ থেকেছি, সেটা মস্কোতে। আজ এই দুই নামে কত পার্থক্য হয়ে গেছে! এ হোটেলের দুটো অংশ, পুরোনো অংশটা শুনলাম ফরাসীরা করেছিল, নূতন অংশটা পরে তৈরী। হোটেলটি বেশ বড়, ঝকঝকে পরিষ্কার, তবে জাঁকালো নয় বাহুল্যবর্জিত। হোটেলে ঢুকে সোজা এগিয়ে এসে দু দিকের এলিভেটারগুলির মাঝখানের দেওয়ালে লাল কাপড়ের উপর সোনালী অক্ষরে সুশোভিত ইংরেজী লেখা—'We have our friends in every country.' মাও-সে-তুং-এর বাণী আলোতে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের মধ্যে একজন রেভলিউশনারি ঐ বক্তব্যর সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করে গর্বভরে আমার দিকে তাকালেন। আমিও তখন মনে মনে আর এক কবির রচনায় একাত্ম হয়ে গর্ব বোধ করছিলাম—

সব ঠাঁই, মোর ঘর আছে, আমি
  সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে
  আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া!

আমার সংগে এই কবিতা আবৃত্তি করতে পারে এরকম কেউ সেখানে ছিল না কিন্তু কবিতাটা মনে পড়তেই আমার নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে গেল। আমি ঐ জ্বলজ্বলে লেখাটার দিকে তাকিয়ে সত্যকে নমস্কার করলাম। সত্য একই তা যে দেশে যার মুখেই উচ্চারিত হোক।

আমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার এই চীন ভ্রমণের কাহিনীতে আমি কিছু বাদ দেব না। অর্থাৎ আমি তার হাতে ধরে যেখানে যেখানে গিয়েছি, যা কিছু দেখেছি সব দেখিয়ে দেব! অবশ্য সব আমার মনে পড়বে না। তবু যা পড়ে তাতেও তাই অনেক সামান্য কথা থাকবে। বিজ্ঞেরা মনে করবেন, এ আবার লেখবার কি হল। কিন্তু যারা—আমার সংগে ভ্রমণ করতে চায় তারা খুশী হবে।

আমরা বোধ হয় পাঁচতলায় আশ্রয় পেয়েছিলাম—এক-এক ঘরে দুজন করে। আমি আর বৎসলা দুই নারী একটি ঘরে আশ্রয় পেলাম। আমার ভালই লাগল। বিদেশে আমার হোটেল-ভীতি হয়ে গেছে। একলা ঘরে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। আমি বললাম, "ডাঃ কোর্টনিস আমরা সব সময় এক সংগে থাকব।" তিনি বললেন, "দেখা যাক।"

পিকিং হোটেলে বিলিতী খাবারও পাওয়া যায়; কিন্তু আমরা বললাম চীনে এসেছি চীনে খাওয়াই উচিত—শুধু সকালের প্রাতঃরাশ হোক বিলিতী। প্রথমেই ওরা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা তো বীফ খান না! সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, না না। আমার আশ্চর্য লাগল—এত রেভলিউশনের কথা বলি অথচ সামান্য সংস্কার ছাড়তে পারি না। কোনো জিনিস খাওয়া না-খাওয়া অভ্যাস ও রুচির উপর নির্ভরশীল, সেটা ঠিকই। কিন্তু বীফ খাওয়া তো তা নয়, তাতে জাত যায়। শাস্ত্রে নিষেধ। এই নিয়ে একটা দেশ ভাগ হয়ে গেল। কোথায় গরুর হাড় পড়ে আছে, তাই নিয়ে মানুষের হাড় বার করা হয়েছে কতকাল ধরে। কেউ কেউ হ্যামও খান না। প্রথম দিনই বুঝলাম, ওখানকার চীনা খাবার কলকাতার হোটেলে আমরা যেমন খাই তার চেয়ে অন্যরকম।

ভোরবেলা উঠে পর্দা সরিয়েই দেখা গেল অদূরে নিষিদ্ধ নগরী—ও থিয়েননানমেন স্কোয়ার এবং স্বর্গীয় শান্তির দ্বার (gate of heavenly peace) সব বরফে ঢাকা। মস্কোর রেড-স্কোয়ারের মত ঐখানেই সব বড় বড় জমায়েত হয়। ঐখানেই জনতা অপেক্ষা করে ছিল, যখন মাও-সে-তুং গেটের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। আর তার পাশেই গেটের উল্টো দিকে Great Hall of the people—ঐখানেই যত মহতী সভা, অভ্যর্থনা, ব্যাংকোয়েট। আবার ঐখানেই চীনের মহান নেতা শেষশয্যায় শায়িত ছিলেন আর দেশবাসী তাঁদের অশ্রুজলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

৭ই ডিসেম্বর খাবার টেবিলে আমাদের জানানো হল যে কিছু পরেই Committee for Chinese People's association for friendship with foreign countries -এর একজন বিশিষ্ট সভ্য আমাদের সংগে আমাদের ভ্রমণের স্থানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে

াসেছেন। এই সমিতিই আমাদের নিমন্ত্রণ রেছে।

পিকিং-এ প্রথম রাত্রি খুব আরামেই রামে নিদ্রা দিয়েছিলাম। ঘর যথেষ্ট গরম ছল। কিন্তু নিদ্রা হয়নি শুধু জ্ঞানসিং হাড়োর। ইনি এক বর্ণও ইংরেজী বলতে বা ঝতে পারেন না। এর ঘরে সঙ্গী ছিলেন হাকবি। মহাকবি দক্ষিণের লোক, সম্ভবত তিনিও হিন্দী বোঝেন না। তিনি প্রচুর ধূমপান করেন এবং মদ্যও। এদিকে খিংড়জী ওসব রসেই বঞ্চিত। বন্ধ ঘরে কয়েক প্যাকেট ধূমপানের পর ঘর যখন ধোঁয়ায় ভরা, জ্ঞানসিং-এর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল—তিনি ভাবলেন, একটু বাইরে যাই। আর তক্ষুনি জ্ঞানসিংএর মতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হল—আসলে দুটো অ্যাকসিডেন্ট। জ্ঞানসিং বেচারা এই প্রথম ভারতের বাইরে পা দিয়েছে। হোটেলের তালাচাবির রহস্য কিছুই জানা নেই। ডাঃ বাসু বলেছিলেন বটে এখানে তালা বন্ধ করার দরকার নেই, কিন্তু সেকথা প্রথম দিকে আমরা কানে নিইনি। যাহোক, চাবিটা টেবিলের উপর রাখা ছিল। জ্ঞানসিং ধূমায়িত ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা টেনে দিতেই তালা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আর উপায় নেই। মহাকবির মদ্যতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙেই না। তখন সারা রাত পায়চারি করে ভোরের দিকে রিসেপসানে কাউকে পাওয়া গেল, যে বুঝতে পারল এবং 'মাস্টার কী' দিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে তিনি ভাবলেন চানটা সেরে নিই। শীতের শেষ রাতে চান শুরু করে বিজাতীয় কলগুলি চালাবার কৌশল না জানা থাকায় ঠাণ্ডা বরফজলে স্নান শেষ হল। আমেরিকাতে আমারও একবার ওই অবস্থা হয়েছিল। সেখানে আবার যেন প্রত্যেকটি তালার কৌশলই পৃথক। গভীর রাত্রে গৃহস্থকে বেল বাজিয়ে ঘুম ভাঙাতে হল। তিনি জড়িতকণ্ঠে বললেন, "তোমায় যে চাবী দিয়েছিলাম!"

'খুলছে না।'

'ওহো, ভুলে গিয়েছিলাম বলে দিতে যে, বাঁদিকে একটু চেপে ঘোরাতে হয়।'

ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা মং সিইন জু (Meng Hsein ju)-এর সঙ্গে মিটিং-এ বসলাম আমাদের ভ্রমণ-তালিকা স্থির করবার জন্য। প্রথমে একটি তালিকা ছিল, তাতে উত্তরের কোনো কোনো স্থানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু শীতের ভয়ে সেগুলি বর্জন করে দক্ষিণের দিকে যাওয়া স্থির হল। আমার মত অজ্ঞ লোক কিছুই বলতে পারল না, কোথায় গেলে ভাল। কিন্তু অনরা রীতিমত আলোচনা করে স্থানগুলো ঠিক করলেন। এবং পূর্বে ওরা যে প্রোগ্রাম দিয়েছিল তার অদলবদল হয়ে গেল। যেমন, আমাদের দারিয়ন যাবার কথা ছিল, তার বদলে যাওয়া হল 'কুইলীন'। তারপর ছিল উইশি (Wusih), তার বদলে 'কুনমিং' ও 'শিশোয়া পান্না' যাওয়া স্থির হল। কাজেই চোখ বেঁধে ঘোরাবার প্রশ্নটা এখানে একটু বদল হয়ে যায়। কারণ, তাঁদের 'সাজানো' জায়গায় তো আমরা গেলামই না। আর আমাদের জন্য কত জায়গাই বা সাজাবে?

ভ্রমণ-তালিকা তৈরী হয়ে গেলে মং বললেন আপনাদের ...

আপনারা এখন দোভাষীদের নিয়ে ফ্রেন্ডশিপ স্টোরে যান ও সেখানে গিয়ে গরম গেঞ্জি জাতীয় জিনিস কিনে ফেলুন। প্রত্যেককে এক-একটি খামে ১৩০ ইয়ান করে দেওয়া হল। শুনলাম এক ইয়ান ভারতীয় চার টাকার তুল্য। কিন্তু জিনিসের দাম অনুসারে তার চেয়ে বেশীই মনে হল। ফ্রেন্ডশিপ স্টোর আমাদের গোছের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। শৌখীন জিনিস অনেক আছে। জড়োয়া গহনা পর্যন্ত। পুরোনো চৈনিক শিল্পবস্তু, জেড ইত্যাদির ও বহুমূল্য হাতির দাঁতের গৃহসজ্জা, কাঠের খোদাই করা পর্দা ইত্যাদি মনোরম মূল্যবান জিনিসে তিনতলা ভরা। অন্য তলায় দরকারী জিনিসপত্র। শৌখীন জিনিসগুলি বেশির ভাগই বিদেশীরা কেনেন —রপ্তানিও হয়। আমরা দু-একটা খুচরো জিনিস কিনলাম। আমি দুই ইয়ান দিয়ে জোড়া গরম দস্তানা কিনলাম। খুঁজেছিলাম চীনা চাষীরা যা ব্যবহার সেই রকম কোট। এই দোকানটি এমন খুব কাছে। এখানে বিদেশীরাই বেশী করে। একটা ঘরে দেখলাম প্রচুর তি কার্পেট। তিব্বতী কার্পেট খুব বি জিনিস। এখন এ দেশেও তৈরী হ

চীনের দেওয়ালের উপর জার্নাসিং ও তাঁর দোভাষী শ্রীমতী সু

কিমও এই কার্পেট তৈরী হত। সে কথা আগেই বলেছি। খুবই সম্ভব তিব্বতেও সেই রকমই ছিল। এখন নিশ্চয় ঘড়ির কাঁটা দেখে ঠিক সময়ে কারখানায় এসে বুনতে হচ্ছে—এই হচ্ছে স্বাধীনতা খোয়ানোর দুঃখ।

আমরা শুনলাম যে, চীনে সব দোকানেই এক দাম। একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন দোকানে ভিন্ন ভিন্ন দাম হবে না। তা দোকানের পরিপাটী যাই হোক। ফ্রেণ্ডশিপ স্টোর খুব বড় না দোকান, তা, হলেও দাম একই হবে। তবে জিনিসের তারতম্য আছে। এখানে প্রসাধনদ্রব্য, মিংক কোট, গহনা ও ভেলভেট পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যে চীনাদের তুলো-ভরা কোট খুঁজছি তা পাওয়া যায় না। সাধারণ সুতী বা গরম গেঞ্জিও পাওয়া গেল না। সু আমাকে বলল যে, অন্য জায়গায় পাওয়া যায়, সেখানে খুব ভিড়। আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললাম, সেইরকম বাজারেই আমি যেতে চাই। তখন ঠিক হল খাওয়াদাওয়ার পরে সেই সাধারণ বাজারে যাওয়া হবে।

সু মেয়েটি বড় ভালো, কিন্তু সে ইংরেজী বোঝে না। হিন্দী বোঝে। সে জানসিং হংড়ার দোভাষী। মুশকিল হয়েছে এই যে, তার হিন্দী ও জানসিং-এর হিন্দীতে অনেক তফাত। কাজেই যে সমস্যার উদ্ভব হয় সেটা এড়াবার জন্যই বোধহয় সুযোগ পেলেই সু আমার কাছে পালিয়ে আসে। কিন্তু ধিংড়া লোকসান করবার পাত্র নয়। বলে সু, তুমি কার কাজ করছ—আমার না শ্রীজীর?

যাই হোক, আমরা সবাই মিলে এই সাধারণের গম্য বাজারে গেলাম। এটাও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সত্যিই ঠেলাঠেলি—গরম জিনিসের জন্য একরকম কুপন, সুতীর জিনিসের অন্য কুপন। খুচরো জিনিস টাকা অর্থাৎ ইয়ানেও বিক্রি হচ্ছে। ফ্রেণ্ডশিপ স্টোরে কোনো চীনাকে বাজার করতে দেখিনি—সব বিদেশী। এখানে সব চীনা। আমরা খুব সন্তর্পণে টাকা খরচ করছিলাম। কারণ এই এক শ' ত্রিশ ইয়ানে এক মাস চালাতে হবে। ভারত সরকার যে কটি আমেরিকান ডলার আমাদের দিয়েছেন, সকলেরই মনোবাসনা সেগুলি দিয়ে ফেরার পথে হংকং-এ জিনিস কেনা হবে। সকলেই বলে, হংকং-এ জিনিসের ছড়াছড়ি এবং চোরের রাজা। খুব দরাদরি করতে হয়। তা হোক, হংকং-এ জিনিস কেনবার ব্যগ্রতা আমাদের কম নয়। তাই পিকিং-এর চীনা বাজারে আমরা সামান্যই জিনিস কিনলাম। অনেকে সুতের গেঞ্জি কিনলেন সোয়েটারের মত, তিনচার ইয়ান দাম হবে। আমি চৌদ্দ ইয়ান দিয়ে একটি তুলো-ভরা কোট কিনলাম। সুন্দর কোট—খুব গরম। ঐ কোটেই চীনের ঠাণ্ডা কাটিয়ে এসেছি।

সেই দিন অর্থাৎ ৭ তারিখ রাত্রে মৈত্রী সমিতির সভাপতি আমাদের সম্মানার্থে ব্যাঙ্কোয়েট দেবেন। এই ভোজে আমাদের রাষ্ট্রদূত নারায়ণন্ ও তাঁর স্ত্রীও নিমন্ত্রিত হলেন। সরকারী ডেলিগেশন ছাড়া এরকম নাকি হয় না। সত্যিই খুব কম রাষ্ট্রদূতই এভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। একজন বিদেশী মহিলা লিখেছেন যে, দূতাবাসের বিদেশী বাসিন্দাদের দুঃখ যে, চীনারা তাদের সঙ্গে খায় না। অবশ্য ঐ এক মাস ভ্রমণকালে আমাদের ভ্রমণ-সঙ্গীরাও সচরাচর কেউ আমাদের সঙ্গে একত্র-ভোজন করেননি—ব্যাঙ্কোয়েট বা ভোজসভা ছাড়া। ৭ তারিখ দুপুরবেলা আমি ডঃ বসুকে বললাম, আমি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তাঁকে আমি রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিন' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ দিয়ে বললাম, আপনার বক্তৃতা যখন টাইপ হবে, এটিও করিয়ে দেবেন। তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ কবিতা আপনি এখনি অনুবাদ করেছেন?'

আমার সঙ্গে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত একটি বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা ছিল, তাতে আমি ১৯৬১ সালে পিকিং-এ যে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণ এবং ছবি ছাপিয়েছিলাম—আর চি-সি-লিন

দেখা হল। তাঁকে ইয়োরোপীয়ান না বলে ইউরেশীয়ান বলা চলে। ...ওঁর মধ্যে চীনা রক্ত আছে। কিন্তু তিনি ভাবে-ভঙ্গীতে পুরো ইয়োরোপীয়। ইনি লেখিকা হান সুয়ান। চীন সম্বন্ধে তাঁর লেখা বিখ্যাত। এঁর চীনা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। শুনলাম পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-বাসী কোনো ভারতীয়কে বিবাহ করেছেন। চীনের সঙ্গে সংযোগ এঁর অটুট।

এঁর মুখেও 'গ্যাং অব ফোর'-এর কথা শুনলাম। এইখানে যদি কেউ না জানেন তবে তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখা ভালো যে, এই চারজন ব্যক্তি যাঁদের বর্তমান চেয়ারম্যান পার্টিবিরোধী চক্রান্তের দায়ে অভিযুক্ত করে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ওয়াং হুং ওয়েন (Wang Hung Wen), চাং চুন-চিয়া (Chang chun chia), চিয়াং চিং (Chiang ching) ও ইয়াও ওয়েন-যুয়ান (Yao Wen-yuan)। এর মধ্যে চিয়াং চিং এঁদের প্রিয় নেতা মাও-সে-তুং-এর চতুর্থ পত্নী। কালচারাল রেভলিউশানের সময় অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল থেকে এঁরা প্রাধান্য লাভ করেন ও ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। এঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশেষত চিয়াং চিং-এর চু এন-লাই বিরোধী কার্যকলাপ দেশের লোককে এঁদের প্রতি বিরক্ত করে তোলে। মাও-সে-তুং-এর মৃত্যুর পর এঁরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন। তখন হুয়া কুয়া ফেং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এঁদের বন্দী করে ফেলায় এঁদের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে। এসব কথা শুনেছি আর ভাবছি, ইনি মাও-সে-তুং-এর পত্নী; এঁর সম্বন্ধে এরা সকলে এত বিমুখ হল কি করে। এমন সময় আমাদের দলের তারাচাঁদ গুপ্ত, যিনি নাকি চীন সম্বন্ধে দু'শোখানা বই পড়েছেন হান সুয়ান-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি এক জায়গায় পড়লাম যে, আপনি কউক বলেছেন যে, চিয়াং চিং যদি ক্ষমতায় আসেন তবে আপনার চীনে ঢোকা অসম্ভব হবে?" হান সুয়ান বললেন, "ঠিক তা নয়। আমি বলেছিলাম, চিয়াং চিং যদি ক্ষমতায় আসে তবে আমি আর চীনে যাব না।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" তিনি বললেন, "ঐ ক্ষমতাপ্রয়াসী অহঙ্কৃতা নারী নিশ্চয় আমাকে তার জীবনী লিখতে বলত। আমি চেয়ারম্যানের জীবনী লিখেছি, অতএব তারও লিখতে হবে। সেটা আমি কখনও করতাম না।"

"আচ্ছা, আপনারা তো চিয়াং চিং-কে কোনো দিনই পছন্দ করেননি বলছেন। তা হলে মাও-সে-তুং থাকতে তা বলেননি কেন?"

"আমরা বৃদ্ধকে কষ্ট দিতে চাইনি। তা ছাড়া তিনি তো জানতেন, তিনি হুয়া কুয়া ফেং-এর উপরই নির্ভর করেছিলেন।"

চিয়াং চিং সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। সেসব পরে যথাস্থানে বলব। এখন আমি আমার পাঠকদের সঙ্গে চীন ভ্রমণে বেরিয়েছি; যেমন যেমন দেখছি তেমনি বলে যাব।

এবার ভোজসভার বর্ণনায় ফিরে যাওয়া যাক। চীনা ভোজ্যের মধ্যে মাংসই সর্বপ্রধান। যদিও উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের রান্নার পার্থক্য আছে। সর্বপ্রথম টেবিলে সাজানো থাকে ১০।১২ রকম ঠান্ডা খাবার। ছোট ছোট টুকরো নানারকমের মাংস—মুরগি বা শুয়োর, মাছভাজা, বাঁশের টুকরো, জেলিফিশের সরু সরু করে কাটা রংগীন তরকারি ইত্যাদি। এর সঙ্গে থাকে লাল রঙের ওয়াইন। মিষ্টি, অ্যালকহল নেই বললেই হয়। অপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ গ্লাসে সাদা জলের রং—'মথাই'। মাথাই খুব কড়া কেউ কেউ বললে, বিলিতী ভডকার চেয়ে কড়া। তা ছাড়া কেউ যদি বীয়ার হুইস্কি খায় তা হলে তা দেয়। ঠান্ডা খাওয়ার পর আসে গরম খাবার। ...

হংস-রোস্ট পিকিং ডাক। অর্থাৎ ... বই বিখ্যাত খাদ্য। তা ছাড়া বড় ... টুকরো দিয়ে শুয়োরের মাংস। তার ... অংশ খুব কম। এদেশে চীনা ... র তরকারির অংশ যত থাকে, ওখানে তা নয়।

মাংস খাওয়া হয়ে গেলে আসে, মাছ। মাছ একেবারে বড় একটি দুটি মাছের মুড়ই সাজানো নকল চোখে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকে। মাছ রান্না খুব ভালো কিন্তু ইয়োরোপীয়দের মত কাঁটা বার করা নয়। কাঁটা সমেত থাকলেও সরু সরু চপ-স্টিক দিয়ে সুন্দর বেছে ফেলে। এই মাছ-মাংসের ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি আসে। মিষ্টির প্রচুর্য বেশী নেই। দুধের মিষ্টি তো নেই বললেই চলে। মনে হয় ডালের মিষ্টি। একদিন মাত্র আইসক্রিম পেয়েছিলাম। আর থাকে টেবিলে সাজানো মান্দা বলে একরকম রুটি। ভাজা-করা গজার মত—ভাপিয়ে নেওয়া। তিব্বতী রান্না মোমো-মশলার মধ্যে মাংসের পুর দিয়ে ফোটানো জলে সিদ্ধ করে নিতে হয় তাও এখানে খুবই খাওয়া হয়। তরকারির মধ্যে এখানে ছিল বাঁধাকপি ও সেলারী। খাওয়ার মধ্যে মধ্যে ইয়োরোপের মত 'টোস্ট' করার রীতি খুব প্রবল। চীন ভারত-মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষা করে, চিরদিনের বন্ধুত্ব কামনা করে। বর্তমান ডেলিগেশনের স্বাস্থ্যকামনায় বারবার মথাই-এর গ্লাস গ্লাসে ঠেকিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেলে বলে 'গাম্বে'! অর্থাৎ বটমস্ আপ্ (একেবারে উল্টে ফেলা)। যদি কেনো মদ্যভীত লাল রঙের ওয়াইন তোলেন, অন্যপক্ষ জোরা-জোরি করেন 'মাথাই' খাবার জন্য—আমার সামনে বসে একটি মহিলা দেখলুম চালাকি করে নিজের মাথাই স্বামীর গ্লাসে ঢেলে দিয়ে নিজের গ্লাসে লেমনেড নিয়ে নির্বিকার বসে রইলেন। কিন্তু এক চুমুকে 'গাম্বে' করায় শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন! মাথাই একেবারে লঙ্কা-চেবানো ঝাল।

আমাদের প্রথম দিনের ডিনারে মদ্য-প্রীত মহাকবি ক্রমে তুরীয় হয়ে গেলেন। তাঁর এক পাশে বসেছিলেন মা-হাইতে বা জর্জ হাতেম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার জীবনের ফিলসফি কি?" মহাকবি নির্বিচারে বললেন, 'অ্যানার্কিসম'। আমি বললুম, "অ্যানার্কিসম আবার ফিলসফি নাকি?"

"নিশ্চয় তুমি অমুকের বই পড়েছ, তমুকের বই পড়েছ বলে অনেক সাম্যবাদের নাম বলতে লাগলেন। আমি বললুম, "না, এঁদের বই আমি পড়িনি, পড়বার ইচ্ছাও নেই।" তখন মহাকবি বললেন, 'তুমি খালি রবীন্দ্রনাথ পড়েছ। তিনি বাঙালীয় কবি ইনডিভিজুয়ালিস্ট কবি। আমি রেভলিউ-শনারি কবি, ইন্টারন্যাশনালিস্ট কবি।" আমি বললুম, "বেশ।" ইতিমধ্যে কবিত্বের উত্তেজনায় মহাকবির সামনে স্থিত সিগারেটের ছাইয়ের স্তূপে ধাক্কা লেগে সারা টেবিলময় ছড়িয়ে যেতেই মা-হাইতে ঈষৎ হেসে বললেন, "এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে তুমি অ্যানার্কিস্ট!"

চীনে খাবারের কথা আর একটু বলে এ পর্ব শেষ করব। খাওয়া শেষ হয়ে এলে আসে সুপ এবং ভাত। আর ফল এলে বোঝা গেল ভোজ শেষ। ভাত কেন পরে আসে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ভাত দিয়ে পেট ভরাতে চায় না, মাংস দিয়ে ভরাতে চায়!

সেদিন ডিনারের পরে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের ব্যালে দেখতে গেলাম। নাচ, অভিনয় ও সাজ খুব চমৎকার লাগল কিন্তু বিষয়বস্তু কেজো। যেমন—আপেল ফল পাড়া, তাচাইতে শস্য ফলানো। রেল, রোড, খেলা—এসব বিষয়ে নাচ। আমি আর বংসঙ্গা পাশাপাশি বসে রেজিমেন্টেড আর্ট নিয়ে আলোচনা করলাম। সেটা আমাদের পিকিং-এ দ্বিতীয় দিন। ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক ভাবতে হয়েছে। সে কথা পরে যথাস্থানে বলব।

(ক্রমশ)

নিঃশব্দ বিপ্লব

ভারতের ষষ্ঠ লোকসভার সাধারণ নির্বাচনকে অনেকে 'রক্তপাতহীন নিঃশব্দ বিপ্লব' নামে অভিহিত করেছেন। সত্যিই তাই। নিঃশব্দ বিপ্লবই বটে। নইলে যে কংগ্রেস দল গত ১৯৭১ সালের লোকসভার নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়েছিল, এবারের নির্বাচনে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো দূরের কথা, এক-তৃতীয়াংশ মাত্র আসনও দখল করতে পারল না! নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে একটি যুগের শেষ হয়ে আর একটি নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে—স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের একটানা ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের অবসান হয়ে ভারতে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের জন্ম হতে চলেছে? কাজেই, এটা বিপ্লব ছাড়া আর কি!

কিন্তু এই অসম্ভব সম্ভব হল কি করে? কোন্ ভেজবাজির বলে?—জে-পি, জনতা-হাওয়া, ইন্দিরা-স্বৈরতন্ত্র, না কি কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্ব? আসলে এর প্রত্যেকটিই এক-একটি খণ্ড-কারণ বলে প্রতীত হলেও, একমাত্র ও মূল কারণ কিন্তু একেবারেই অন্য। সেটি নিঃসন্দেহে ভোটের 'পোলারাইজেশন'—দুটি মাত্র শিবিরে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়া। এমন ঘটনা একবার ঘটেছিল পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে ১৯৬৯ সালে। সেবারে এখানেও ঐরকম ভোজবাজি ঘটেছিল। দুটি মাত্র শিবিরে ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে অধিকতর ভোটপ্রাপ্ত শিবির যুক্ত ফ্রন্টের দখলে এসেছিল আনুপাতিক অনেক বেশী আসন। এটাই গাণিতিক নিয়ম। এবার কেন্দ্রেও ঠিক তাই হয়েছে। এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ভোট দুটি মাত্র শিবিরে ভাগ হয়েছে। এরকম যদি এর আগে কখনও ঘটত, অর্থাৎ কংগ্রেস-বিরোধী ভোট একটি মাত্র শিবির-ভুক্ত হত, তা হলে, যেহেতু কংগ্রেস বা কংগ্রেসী জোট এর আগে আর কোনও লোকসভা নির্বাচনে কখনই শতকরা পঞ্চাশটির বেশী ভোট পায়নি, তিন [illegible] এরকম শোচনীয় পরাজয়ই তাঁদের [illegible]। এমন কি, এর চেয়েও খারাপ [illegible] ছিল না।

চূড়ান্ত ফলাফল

দল	আসন
জনতা পার্টি	২৭০
কংগ্রেস	১৫৩
সি এফ ডি	২৮
সি পি আই এম	২২
এ ডি এম কে	১৯
আকালি দল	৮
সি পি আই	৭
পি ডবলু পি	৫
আর এস পি	৪
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩
মুসলিম লীগ	২
আর পি আই (খো)	২
ন্যাশনাল কনফারেন্স	২
কেরল কংগ্রেস	২
ডি এম কে	১
ইউ ডি এফ	১
এচ এস পি ডি পি	১
এম জি পি	১
নির্দল	৮
নির্বাচন বাকি	৩
মোট	৫৪২

ভোটের পোলারাইজেশন যদি কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ না হবে, অন্য যে কারণ-চতুষ্টয়কে আপাত-প্রতীয়মান খণ্ড-কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এককভাবে সেগুলির কোনওটি কিংবা যুক্তভাবে সবগুলিই কারণ হত, তা হলে সারা ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই নির্বাচনী ফলাফলের চরিত্র অন্তত একই হত। কোথাও, কোনও রাজ্যে, কংগ্রেস বা কংগ্রেসী জোট সবগুলিই বা প্রায় সবগুলি আসন দখল করে নিল, আবার কোথাও বা তা জনতা কিংবা জনতা-জোট—এমন হত না। পোলারাইজেশন-এর জন্যই এমনটি হয়েছে। যে রাজ্যে যে শিবিরে অধিকতর ভোট পড়েছে, সেই রাজ্যে সেই শিবিরই প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় অনেক বেশী আনুপাতিক আসন লাভ করেছে।

অন্ধ্র, আসাম এবং কর্ণাটক রাজ্যে কংগ্রেসের সাফল্য সবচেয়ে বেশী। এই তিনটি রাজ্যের মোট ৮৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৭৭টি, জনতা [illegible]। এর কারণ কি? কংগ্রেস তো এ তিনটি রাজ্যে কারও সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়নি—একাই লড়েছে।

এই তিনটি রাজ্যই কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। গতবারের লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটকের সবগুলি আসনই কংগ্রেস একা দখল করেছিল। এ ছাড়া, এ রাজ্যগুলিতে জনতা পার্টির শরিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র সংগঠন কংগ্রেস ছাড়া আর কারও কিংবা কংগ্রেস ফর ডেমোক্রাসি দলের কোনও অস্তিত্বই নেই বললেই হয়। সংগঠন কংগ্রেসেরও যেটুকু আছে তা নামমাত্র। উপরন্তু, এ তিনটি রাজ্যে ভোট দুটি মাত্র শিবিরে ভাগ হয়নি; এখানে তৃতীয় শিবিরের উপস্থিতি ছিল। তিন রাজ্যেই সি পি আই তৃতীয় শিবির হিসেবে লড়ছে। আসামে জনতা সব আসনে প্রার্থীও দিতে পারেনি।

কেরল ও তামিলনাড়ুতে মোট ৫৯টি আসন। এ দুটি রাজ্যে জনতা-জোট পেয়েছে মোট ৪টি আসন—জনতা ৩ এবং ডি এম কে ১। তাও তামিলনাড়ুতে। কেরলে জনতা-জোট একটিও আসন পায়নি।

এ দুটি রাজ্যে জনতা বা কংগ্রেস উভয় দলের শক্তিই অতি সীমাবদ্ধ—ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত নয়। কেরলে দুই কমিউনিস্ট পার্টি এবং তামিলনাড়ে দুই

প্রধানমন্ত্রী : মোরারজী দেশাই

ডি এম কে-ই প্রধান শক্তি। কংগ্রেস এবং জনতা বিরোধী দলভুক্ত ঐ দুই পক্ষের অন্যতম অংশীদার মাত্র। এখানে উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের এবং কেরলে জনতা দলের সংগঠনশক্তি প্রায় শূন্য। ফলে, ভোট পুরোপুরি 'পোলারাইজেশন'-এর ফলে যে শিবির লাভবান হয়েছে, তার অংশীদার হিসেবে কংগ্রেসেরও তুলনামূলক লাভ হয়েছে। আর, অল্পতর ভোটপ্রাপ্ত শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দল হিসাবে জনতা-জোটের ক্ষতি হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশী।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যেও জনতা দল একটিও আসন পায়নি। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস ছিল এ রাজ্যে শেখ আবদুল্লার জাতীয় সম্মেলন দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ; আর, সংগঠনশক্তিতে দুর্বল জনতা একা। উপরন্তু; তারা সব কয়টি আসনে প্রার্থীও দিতে পারেনি। মোট ৬টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসনে ছিল তাদের প্রার্থী।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের প্রতিটি কেন্দ্রের ফলাফল দেওয়া হল। অবশ্য, শুধু-মাত্র বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রার্থীর নাম, তাঁদের দলগত পরিচয় এবং প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা। দলগত পরিচয়ে কয়েকটি সাংকেতিক অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলির পূর্ণরূপ হবে এইরকম:

জ—জনতা পার্টি। ক—কংগ্রেস। গ-ক—গণতন্ত্রী কংগ্রেস বা সি এফ ডি। কম—সি পি আই। কম-মা—সি পি আই এম। ডি—ডি এম কে। আ-ডি—এ ডি এম কে। অ—আকালি দল। পি-ডব্লু—পি ডব্লু পি। আর—আর এস পি। ফ—ফরোয়ার্ড ব্লক। মু—মুসলিম লীগ। মু-ও—বিরোধী মুসলিম লীগ। আর-পি—আর পি আই (খো)। এন—ন্যাশনাল কনফারেন্স (কাশ্মীর)। কে-ক—কেরল কংগ্রেস। কে-ক-পি—কেরল কংগ্রেস (পিল্লাই)। ইউ ইউ ডি এফ (নাগাল্যান্ড)। এচ-এস—এচ এস পি ডি পি (মেঘালয়)। এম—এম জি পি (গোয়া)। নি—নির্দল।

পশ্চিমবঙ্গ—৪২

মেদিনীপুর ॥ সুধীর ঘোষাল (গ-ক) ১৮০০৬১; নারায়ণ চৌবে (কম) ১৪৫৯৩৭।

হাওড়া ॥ সমর মুখোপাধ্যায় (কম-মা) ২৩৬৫৩০; নিত্যানন্দ দে (ক) ১৩১৭৯৯।

আরামবাগ ॥ প্রফুল্লচন্দ্র সেন (জ) ২৯৮৩৭১; শান্তিমোহন রায় (ক) ৯০৯৩৪।

ডায়মন্ডহারবার ॥ জ্যোতির্ময় বসু (কম-মা) ২৬৭৮৯০; বীরেন মোহান্তি (ক) ১১১৪৮৬।

জয়নগর ॥ শক্তিকুমার সরকার (নি) ১৮০৫৮৭; নির্মলকান্ত মণ্ডল (ক) ১১৯৯৫০।

শ্রীরামপুর ॥ দিনেন ভট্টাচার্য (কম-মা) ২৬৫০৭১; যদুগোপাল সেন (কম) ১২০২৫৬।

হুগলি ॥ বিজয়কৃষ্ণ মোদক (কম-মা) ২২৩৮১৮; বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) ১১৭৫৫৯।

বারাসত ॥ চিত্ত বসু (ফ) ২০৩৬৯৪; রণেন সেন (কম) ৮৭৯০০।

উলুবেড়িয়া ॥ শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (কম-মা) ২২৫৫৮৫; নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য (ক) ১১১০৮৪।

কুচবিহার ॥ অমর রায় প্রধান (ফ) ২৩৬৫২১; বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী (ক) ১২৩৬৬৩।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : চরণ সিং

বাঁকুড়া ॥ বিজয় মণ্ডল (জ) ১৭৫৬৬৪; শংকরনারায়ণ সিংদেও (ক) ৯৫৫৮৭।

দুর্গাপুর ॥ কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (কম-মা) ২১৮৮৩৩; মনোরঞ্জন প্রামাণিক (ক) ১২৭৪০২।

আসানসোল ॥ রবীন সেন (কম-মা) ১৬৩৪৯২; সৈয়দ মোহম্মদ জালাল (ক) ৯১২৬৫।

পাঁশকুড়া ॥ আভা মাইতি (জ) ২০০৭০৪; ফুলরেণু গুহ (ক) ১০২৫৬৭।

দমদম ॥ অশোককৃষ্ণ দত্ত (জ) ২১০৪০০; ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (কম) ১৮১৯৫১।

মথুরাপুর ॥ মুকুন্দকুমার মণ্ডল (কম-মা) ১৮৮২২৭; পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর (ক) ১৪৬৬৩৫।

পুরুলিয়া ॥ চিত্তরঞ্জন মাহাতো (ফ) ২০০৯৮৫; পশুপতি মাহাতো (ক) ৭৪৩৩৩।

কাঁথি ॥ সমর গুহ (জ) ২৮৪৫০১; সুধাংশুশেখর পাণ্ডা (ক) ৮৯,৯৯৫।

ঝাড়গ্রাম ॥ যদুনাথ কিসকু (কম-মা) ১৫৯৪৩৩; অমিয় কিসকু (ক) ১১১৮৩৮।

বর্ধমান ॥ রাজকৃষ্ণ দাঁ (জ) ১৯০৩১৮; শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু (ক) ১১৯৩১৫।

কাটোয়া ॥ ধীরেন বসু (ক) ১৭৯৯২৭; মোহম্মদ হাবিবুল্লা (কম-মা) ১৬৮০৪৭।

তমলুক ॥ সুশীলকুমার ধাড়া (জ) ২৫৩৯৬৬; সতীশচন্দ্র সামন্ত (ক) ১৩৫৩৭৪।

বালুরঘাট ॥ পলাশ বর্মন (আর) ২০৬১১২; রাসেন্দ্রনাথ বর্মন (ক) ১৫১৫৪৯।

কৃষ্ণনগর ॥ রেণুপদ দাস (কম-মা) ১৯৮৪৩০; শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) ১০৭৪৬২।

নবদ্বীপ ॥ বিভা ঘোষ গোস্বামী (কম-মা) ১৯৩৭১৪; নিতাইপদ সরকার (কম) ১০৬৪২৮।

বিষ্ণুপুর ॥ অজিতকুমার সাহা (কম-মা) ২৪৪৩৭০; গৌরচন্দ্র লোহার (ক) ১১৩৯৯৬।

কলকাতা উত্তর-পূর্ব ॥ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (জ) ২৩৭৭৮৭; হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কম) ১০৮০২৮।

কলকাতা উত্তর-পশ্চিম ॥ বিজয়সিংহ নাহার (গ-ক) ১৭৯৬৮১; অশোক সেন (ক) ১১০০৮৪।

কলকাতা দক্ষিণ ॥ দিলীপ চক্রবর্তী (জ) ২২৫৫৫৬; প্রিয়রঞ্জন দাস মুনসী (ক) ১৫৭৬১৬।

যাদবপুর ॥ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (কম-মা) ২৩৬০৮৫; মোহম্মদ ইলিয়াস (কম) ৯৭৪৫০।

ব্যারাকপুর ॥ সৌগত রায় (ক) ২৯৫২৫১; মোহম্মদ ইসমাইল (কম-মা) ১৫৪৫৩৭।

বসিরহাট ॥ আল হজ এম এ হান্নান (জ) ১৬৮৬৪৪; এ কে এম ইশাক (ক) ১৫৬৪৫৮।

আলিপুরদুয়ার ॥ পীযূষ টির্কে (আর) ১৬৭৮৬৫; টুনা ওরাঁও (ক) ১২৭২৯৭।

বোলপুর ॥ শরদীশ রায় (কম-মা) ১২৮৯৬৩; দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায় (কম) ৯৩০১২।

রায়গঞ্জ ॥ হায়াত আলি (গ-ক) ১৮৮৬৯৪; আনোয়ারুল আবেদিন (ক) ১২১৫৭০।

বীরভূম ॥ গদাধর সাহা (কম-মা) ১৩৬৫১৭; বৃন্দাবন সাহা (ক) ১০৫৯৬৮।

দার্জিলিং ॥ কৃষ্ণবাহাদুর ছেত্রী (ক) ১০৯৫২০; রতনলাল ব্রাহ্মণ (কম-মা) ৯১০৪০।

বহরমপুর ॥ ত্রিদিব চৌধুরী (আর) ২০৪৮০৯; সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) ১০২৬২৯।

মুর্শিদাবাদ ॥ সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা (জ) ১৪০৯২৭; আজিজুর রহমান (ক) ১০৪৮৩৮।

জংগীপুর ॥ শশাংকশেখর সান্যাল (কম-মা) ১৬৫০০৮; লুৎফুল হক (ক) ১৫২৯২২।

জলপাইগুড়ি ॥ খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (নি) ১৭৩৪৮৪; মায়া রয় (ক) ১১৫৭৮৬।

মালদহ ॥ দিনেশচন্দ্র জোয়ারদার (কম-মা) ১৯৭২৫১; প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় (ক) ১৬০৪৫০।

অন্ধ্র—৪২

ওয়ারংগল ॥ এস বি গিরি (ক) ২,৫১,২১১; জঙ্গা রেড্ডি (জ) ১,২৮,৫৮৯।

নেলোর ॥ দোড্ডাবারাপু কামাক্ষয়া (ক) ২,৭২,১৮৪; প্রপণ্ড ভানুরাজু তুম্মালাগুণ্টা (কম-মা) ১,২৯,৪০৪।

করিমনগর ॥ এম সত্যনারায়ণ রাও (ক) ২,১০,৩৪৯; যুব্বাদি গৌতম রাও (জ) ৯৬,৩০১।

হিন্দুপুর ॥ পি বায়াপ্পা রেড্ডি (ক) ২,৩৬,৭৯৭; কে রামচন্দ্র রেড্ডি (জ) ১,৪৬,৭৬৪।

অনন্তপুর ॥ দারুর পুল্লাইয়া (ক) ২,১৫,২৭৯; ভি নারায়ণস্বামী (জ) ১,৭৩,০৭২।

আদিলাবাদ ॥ জি নরসিংহ রেড্ডি (ক) ২,৬৭,৪১০; গোপিডি গংগা রেড্ডি (জ) ৯৬,২৪৪।

পেড্ডাপল্লী ॥ ভি তুলসীরাম (ক) ২,০৯,১৮৭; বাংগুর লক্ষ্মণ (জ) ১,০৪,১১০।

মর্চিলিপত্তনম ॥ অনকিনীডু মগান্তি (ক) ২,৬২,৫৫১; ভাদ্দে শোভনাদ্রিশ্বর রাও (জ) ১,৮৫,৬২২।

হনমকোণ্ডা ॥ পি ভি নরসিংহ রাও (ক) ২,৩১,৫৯৩; পি জনার্দন রেড্ডি (জ) ১,৫৩,৯১০।

খাম্মাম ॥ জলগম কোণ্ডালা রাও (ক) ২,০৮,৬১৭; ইয়াল্লামনচিলি রাধাকৃষ্ণ মূর্তি (কম-মা) ১,২২,৬২৮।

মিরি অলগুডা ॥ জি এস রেড্ডি (ক) ২,১৭,৪৫০; ভীমী রেড্ডি নরসিংহ রেড্ডি (কম-মা) ১,৬৭,৭৫১।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী : জগজীবন রাম

মাহবুবনগর ॥ জে রামেশ্বর রাও (ক) ২,১৬,৪৫৫; ভি কে সত্য রেড্ডি (জ) ১,২১,৯৬৬।

বাপাতলা ॥ অনকিনীডুপ্রসাদ রাও (ক) ২,৫৩,৯৩৮; জাগরলামুদি চন্দ্রমৌলি (জ) ২,১০,৪৯২।

তিরুপতি ॥ তম্বুরো বালকৃষ্ণাইয়া (ক) ২,৪০,৩৯৪; অল্লম কৃষ্ণাইয়া (জ) ২,০০,২৯৪।

রাজমপেট ॥ পোথুরাজু পার্থ সারথি (ক) ২,৩৩,৮৪৪; পি থিম্মা রেড্ডি (জ) ১,৭৯,২৯৩।

বিশাখাপত্তনম ॥ দ্রোণমরাজু সত্য-নারায়ণ (ক) ১,৭১,৬৫৭; তেন্নেতি বিশ্ব-নাথম (জ) ১২৮৮২৮।

নরসাপুর ॥ আল্লুরি সুভাষচন্দ্র বোস (ক) ২,৫৬,৫১৯; উদ্দারাজু রমণ (কম-মা) ১,৪২,১৬২।

পার্বতীপুরম ॥ বাইরিচরলাকিশোর চন্দ্র সূর্যনারায়ণ দেও (ক) ১৭৪৪৫৪; সত্যপ্রসাদ থটরাজ বীরবর থোডারমল (জ) ১,৫১,৭১০।

অমলাপুরম ॥ কুসুম কৃষ্ণমূর্তি (ক) ২,৭১,৯৮২; বি ভি রামন্যায় (জ) ১,৩৫,৯৯৩।

ভদ্রাচলম ॥ রাধাবাই আনন্দ রাও (ক) ১,৫৫,১৯৮; পি রাণী রমণ রাও (জ) [illegible]

কু[illegible] ॥ কান্ড়ুল ওবাল রেড্ডি (ক) [illegible] উৎকীর রামী রেড্ডি (জ) [illegible]

এ[illegible] ॥ বোম্মা অর্জুনার মণ (ক) [illegible] চিন্তা কুমারী (জ) ১,৫৬,[illegible]

ন[illegible]পেট ॥ কে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি (ক) [illegible] ইন্দ্রি কোটি রেড্ডি (জ) [illegible]

ন[illegible] ॥ আবদুল লতিফ (ক) [illegible] পেন্নী জগন্মোহন রেড্ডি (জ) [illegible]

নগরকুর্নুল ॥ মাইলালা ভীষ্ম দেব (ক) ২,৩৮,৩৮৮; পদ্রাপাগা রাধাকৃষ্ণ (জ) ১,১৫,৬২৫।

নান্দিয়াল ॥ নীলম সঞ্জীব রেড্ডি (জ) ২,৫৮,১৬৭; পেন্ডেকান্তি বেংকট সুব্বিয়া (ক) ২,২২,৪০৪।

তেনালি ॥ মেদুরি নাগেশ্বর রাও (ক) ২৪৪৯২৮; গুন্টুর বাপান্নাইয়া (কম ম) ১,৪৭,১৮১।

বিজয়ওয়াড়া ॥ গোড়ে মুরাহারি (ক) ২০১৭৩৩; গোট্রিপতি মুরলীমোহন (জ) ১,১১,৬৯৬।

সিদ্দিপেট ॥ জি বেংকটস্বামী (ক) ২,৩২,৩৭৭; টি এন সদালক্ষ্মী (গ ক) ১,২৩,৫০৭।

ওঙ্গোলে ॥ পুলি বেংকট রেড্ডি (ক) ২৫২২০৬; এম বেংকয়া নাইডু (জ) ১,৬২,৮৮১।

আলমাবাদ ॥ এম রামগোপাল রেড্ডি (ক) ২৫২২৯১; গঙ্গা রেড্ডি (জ) ৯২,৮৯৩।

কাকিনাড়া ॥ এম এস সঞ্জীব রাও (ক) ২৬৯০১৭; ভাস্তি মটিয়ালা রাও (জ) ১,৪৫,৭৪৯।

রাজামান্ড্রি ॥ এস বি পি পট্টভিরাম রাও (ক) ২,৯২,৩২৩; এম ভি এস সুব্বারাজু (জ) ১৭৫৫৬৪।

কুর্নুল ॥ কে বিজয়ভাস্কর রেড্ডি (ক) ২,৭০,৭৪১; সোমাপ্পা (জ) ৭১,৩৮৫।

মেডক ॥ মল্লিকার্জুন (ক) ২,৩৯,৮১৩; নরসিংহ রেড্ডি (জ) ৯৬৩০৩।

আনাকাপল্লী ॥ এস আর এ এস আপ্পালানাইডু (ক) ১,৯৯,২২৮; পি ভি চলাপতি রাও (জ) ১,৬৩,২৯২।

গুন্টুর ॥ কে রঘুরামিয়া (ক) ২,৯০,৯১৪; কে সদাশিব রাও (জ) ২,০৫,৩৮৫।

শ্রীকাকুলাম ॥ বি রাজাগোপাল নাইডু (ক) ১,৮৭,১২৫; জি লাচান্না (জ) ১,৭৪,৩১১।

চিত্তুর ॥ পি রাজগোপাল নাইডু (ক) ২,৯২,২৫২; এন পি চেঙ্গালরায়া নাইডু (জ) ২,১৪,৪০৫।

হায়দরাবাদ ॥ কে এস নারায়ণ (ক) ১,৫৬,২৯৫; সুলতান সুলাহুদ্দিন আওয়াইসাই (নি) ৯১২২৪।

বাম্বিলি ॥ পি ভি জি রাজু (ক) ১৭২০১৫; পি পুন্ডরীকাক্ষাচারী (জ) ১,১১,৫০৭।

সেকন্দারাবাদ ॥ এম এম হাশেম (ক) ১৬০২৩০; টি লক্ষ্মীকান্ত [illegible] (জ) ১,৫৬,৩৬৩।

আসাম—১৪

শিলচর ॥ রসিদা হক চৌধুরী (ক) ১,৩৪৬৩৪; নুরুল হুদা (কম-মা) ১,১০,০৮৫।

করিমগঞ্জ ॥ নীহাররঞ্জন লস্কর (ক) ১,২৭,৫৪৫; নীলাময় দাস (জ) ৭৭,১৫৪।

তেজপুর ॥ পূর্ণনারায়ণ সিংহ (জ) ১,২৯,৫২৭; বিজয়চন্দ্র ভগবতী (ক) ১,২৩,৩৭৯।

কালিয়াবর ॥ বেদব্রত বড়ুয়া (ক) ১,৫৫,৫২৪; অজিতকুমার শর্মা (জ) ৮৪,২৭১।

স্বায়ত্তশাসিত জেলা ॥ বীরেন ইংটি (ক) ৬২,৪৩২; সোনারাম থাউসেন (নি) ৩১,৭৩২।

নওগাঁ ॥ দেবকান্ত বড়ুয়া (ক) ১,৭৬,৬০৫ ; ইন্দ্রেশ্বর গোস্বামী (জ) ১,২২,৩৮৬।

গৌহাটি ॥ রেণুকা দেবী বরকাকতি (জ) ১,৪৯,২৫৫ ; দিনেশ গোস্বামী (ক) ১,১২,৮১৫।

জোড়হাট ॥ তরুণ গোগোই (ক) ১,৪৮,৯০২ ; দুলালচন্দ্র বড়ুয়া (জ) ১,২০,২১৫।

লখিমপুর ॥ ললিতকুমার দোলে (ক) ১,৬২,৭৫০ ; মহানন্দ বোরা (জ) ৯৭,৫১৮।

মঙ্গলদই ॥ হীরালাল পাটোয়ারী (জ) ১,৬২,৬০৩ ; ধরণীধর দাস (ক) ১,১২,৬০১।

ধুবড়ি ॥ আহমেদ হুসেন (ক) ১,৫১,৩২৮ ; জহিরুল ইসলাম (জ) ১,৫০,৭৩৮।

ডিব্রুগড় ॥ হরেন ভূমিজ (ক) ১১১৮৮২ ; গোপাল বরগোয়া (জ) ১০৫৬৭৩।

কোকরাঝাড় ॥ চরণ নার্জারি (নি) ১,৮৬,৮০৮ ; চরণীধর বসুমাতারি (ক) ১,৪৩,৯০৫।

বরপেটা ॥ ইসমাইল হুসেন খান (ক)... ; বিশ্ব গোস্বামী (জ)...।

উড়িষ্যা—২১

ফুলবনী ॥ শ্রীবৎস দিগাল (জ) ৯৭,৩৫৯ ; বক্সী নায়েক (ক) ৯৬,৭১৬।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী : অটলবিহারী বাজপায়ী

বোলাঙ্গির ॥ আইনথু সাহু (জ) ১,৩৯,১০৬ ; অনঙ্গ উদয় সিংদেও (ক) ৮১,৩৭৯।

কেওনঝর ॥ গোবিন্দ মুণ্ডা (জ) ১,১৩,৭৯০ ; আর সি মহাপাত্র (ক) ৬৬,০৫৫।

সুন্দরগড় ॥ দেবানন্দ অমত (জ) ১,২৬,১২৮ ; গয়াধর মাঝি (ক) ৭৫,০৭০।

ঢেনকানল ॥ দেবেন্দ্র শতপথী (জ-ক) ১,৫৩,০০৮ ; রাজা কামাখ্যা প্রসাদ সিংদেও মহীন্দ্র বাহাদুর (ক) ৯৪,৫২৩।

ময়ূরভঞ্জ ॥ চন্দ্রমোহন সিং (জ) ৯৯,০৭৮ ; সি পি মাঝি (ক) ৮৭,৭২৫।

কালাহান্ডি ॥ পি কে দেও (নি) ১,১৭,৮০৩ ; গঙ্গাধর হোতা (ক) ৬২,৫৫৯।

নওরঙ্গপুর ॥ খগপতি প্রধান (ক) ৬৮,১৯৩ ; রবি সিং মাঝি (জ) ৬৫,১৬৫।

কোরাপুট ॥ গিরিধর গোমাঙ্গো (ক) ৭৮,৪৯৪ ; মুক্তিকা পাঙ্গামা (জ) ৬৪,০৬৫।

সম্বলপুর ॥ গণনাথ প্রধান (জ) ১,৭৬,২২১ ; বনমালী বাবু (ক) ১,১১,৯৮৭।

বালেশ্বর ॥ সমরেন্দ্র কুণ্ডু (জ) ১,৯০,২১৯ ; শ্যামসুন্দর মহাপাত্র (ক) ১,৩০,৭৫৮।

আসকা ॥ রামচন্দ্র রথ (ক) ১,২১,৭২১ ; এ এন সিংদেও (জ) ১,১৭,৯৪৪।

ভদ্রক ॥ বৈরাগী জেনা (জ) ১,৯৮,৯৭৭ ; অর্জুনচরণ শেঠী (ক) ১,২৭,৪০০।

দেওগড় ॥ পবিত্রমোহন প্রধান (জ) ১,১৭,০৫৭ ; বালকুমার প্রতাপ গঙ্গাদেব (ক) ১,০৭,০১৫।

ভুবনেশ্বর ॥ শিবাজী পটনায়েক (কম-মা) ১,০৬,৯৬০ ; চিন্তামণি পাণিগ্রাহী (ক) ১,০১,৪৯১।

কেন্দ্রাপাড়া ॥ বিজু পটনায়েক (জ) ২,৬৫,৮২৯ ; ভাগবৎ প্রসাদ মোহান্তি (ক) ১,২২,৪৮০।

পুরী ॥ পদ্মাচরণ সামন্তসিংহার (জ) ১,৭৯,৮০২ ; বনমালী প[illegible]ক (ক) ১,০৬,২৬১।

বহরমপুর ॥ আর জ[illegible] রাও (ক) ১,১৯,১০২ ; ভি শঙ্কর গিরি ([illegible]) ৬৯,০৯৫।

কটক ॥ শরৎকুমার কর (জ) ১,৭৬,৪৭৮ ; জানকীবল্লভ পটনায়েক (ক) ১,২৬,০৬৩।

জাজপুর ॥ রামচন্দ্র মল্লিক (জ) ১,৭২,১১১ ; বৈষ্ণবচরণ মল্লিক (ক) ১,২১,৫৩১।

জগৎসিংপুর ॥ প্রদ্যুম্ন কিশোর বল (জ) ২,২৮,৬২০ ; বাসুদেব মহাপাত্র (ক) ১,১৮,৬৬৯।

কেরল—২০

মুকুন্দপুরম ॥ এ সি জর্জ (ক) ২,২৩,০৯৫ ; এস সি এস মেনন (নি) ২,২০,৮৭৫।

ওট্টাপালাম ॥ কে কুনহাম্বু (ক) ২,৩২,৬১২ ; সি কে চক্রপাণি (কম-মা) ১,৯৬,৬৯১।

আলেপ্পি ॥ ভি এম সুধীরন (ক)

,৭০,৪৫১ ; ই বালনন্দন (কম-মা) ,০৬,৪৩৫।

কান্নানের ॥ সি কে চন্দ্রাপ্পান (কম) ,২৫,৩২৮ ; ও ভরতন (কম-মা) ,১২,৪৫১।

ত্রিবান্দ্রাম ॥ এম এন গোবিন্দন নায়ার (কম) ২৪৪২৭৭; পি বিশ্বম্ভরন (জ) ,৭৪,৪৫৫।

বাডাগারা ॥ কে পি উন্নিকৃষ্ণন (ক) ,৫৩,৪৬২ ; আ গিল শ্রীধরন (জ) ,৯৫,৩৯২।

মুভেলিকারা ॥ বি কে নায়ার (ক) ,৩৮,১৬১ ; বি জি ভারগিস (নি) ,৮১,৬১৭।

কাসার গড় ॥ রামচন্দ্রন কাডান্নাপাল্লি (ক) ২,২৭,৩০৫ ; এম রামান্না রাই (কম-মা) ২,২২,২৬৩।

পালঘাট ॥ এ সান্না সাহিব (ক) ,০৭,৬০৪ ; টি শিবদাস মেনন (কম-মা) ,৯২,৭৩৩।

ইডুক্কি ॥ সি এম স্টিফেন (ক) ২৭১৯০; এম এম যোসেফ (কে-ক-পি) ,৪৮৪৮১।

কুইলন ॥ এন শ্রীকান্তন নায়ার (আর) ,৭২,৩৭৭ ; এন রাজাগোপালন (নি) ,৫৯,২১৭।

মনজেরি ॥ ইব্রাহিম সুলেইমান সাইত (ম) ২,৬৪,২৩৫ ; বি এম হুসেন (ম-ও) ১,৬৭,০৯৪।

ত্রিচুর ॥ কে এ রাজন (কম) ,২১,৮১৫ ; অরবিন্দাক্ষন (কম-মা) ,৮৪,৩০৯।

চিরায়িনকিল ॥ ভায়ালার রবি (ক)

কৃষি ও সেচ মন্ত্রী : প্রকাশসিং বাদল

২,৩৭,২১৬; কে অনিরুদ্ধন (কম-মা) ১,৭৬,৩৯৬।

আদুর ॥ পি কে কোডিয়ান (কম) ২,২৭,৯৩৯ ; কে চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী (কম-মা) ১,৮৭,৩৭২।

কালিকট ॥ সয়ীদ মোহম্মদ (ক) ২,৩১,০৬৩ ; এম কমলম (জ) ২,১৭,৩৫১।

পোন্নানি ॥ জি এম বনাতওয়ালা (ম) ২,৬৯,৪৯১ ; এম মইদীনকুট্টি হাজি (মু-ও) ১,৫১,৯৮৫।

মুভাট্টুপুঝা ॥ জর্জ কে ম্যাথু (কে-ক) ২,৪৪,২৮৭ ; কে এম যোসেফ কুরোপাপ্পধম (কে-ক-পি) ২,০৪,৯৬৭।

এর্নাকুলাম ॥ হেনরি অস্টিন (ক) ২,২৭৮৯৬ ; কে জি রবীন্দ্রনাথ (কম-ম) ২,২০,৬১১

কোট্টায়ম ॥ স্কারিয়া টমাস (কে-ক) ২,৫২,৩৮৭ ; বার্কে জর্জ (কে-ক-পি) ১,৭৩,৬৯২।

কর্ণাটক—২৮

কনকপুরা ॥ এম ভি চন্দ্রশেখর মূর্তি (ক) ১,৯১,১১১ ; এম ভি রাজশেখরন (জ) ১,৮৭,৪৫৯।

টুমকুর ॥ কে লাক্কাপ্পা (ক) ২,৩৭,০৪৬ ; এস মল্লিকার্জুনিয়া (জ) ১,৬১,৬৭৯।

ধারওয়ার দক্ষিণ ॥ এফ এচ মহসীন (ক) ২,৩৯,২১০ ; সি বি ইব্রাহিম (জ) ১,৫৭,২৭০।

বিদার ॥ শংকরদেব (ক) ১৬৮৪৭৩; রামচন্দ্র বীরাপ্পা (জ) ১১৮২৯৮।

বাগলকোট ॥ এস বি পাতিল (ক) ২,১২,০৯৩ ; কে কে টুনগাল (জ) ১,৪০,২৯৫।

চিকমাগালুর ॥ ডি বি চন্দ্র গউডা (ক) ২,০৮,২৩৯; বি এল সুব্বাম্মা (জ) ১৪৩৬৭১।

উদীপি ॥ টি এ পাই (ক) ২২৪৭৪৮ ; ডি এস আচার্য (জ) ১,২১,৩২৬।

ধারওয়ার উত্তর ॥ সরোজিনী মহিষী (ক) ২০৫৫২৩; জগন্নাথরাও যোশী (জ) ১,৫০,৮৫৩।

চিক্কোডি ॥ বি শংকরানন্দ (ক) ১,৭২,৩৩৬ এল বি কাম্বলে (জ) ১,২৭,৪৫৩।

বাংগালোর উত্তর ॥ সি কে জাফর শরিফ (ক) ১৯৪,৬৬৯ ; এম চন্দ্রশেখর (জ) ১,৫৪,৪৮৫।

দাভানগেরে ॥ কোন্ডাজ্জী বাসাপ্পা (ক) ২,৪৪,২০০ ; কে জি মহেশ্বরাপ্পা (জ) ১,৫২,০৭৪।

কোলার ॥ জি ওয়াই কৃষ্ণন (ক) ১,৯৬,২৯০ ; ওয়াই রামকৃষ্ণ (জ) ১,২৩,২৭৪।

বেল্লারি ॥ কে এস বীরভদ্রাপ্পা (ক) ২,৫৪,৫৭৯ ; এন থিপ্পান্না (জ) ১,১৩,০৪৫।

কেনারা ॥ সিদ্দারামেশ্বর স্বামী বাসায়া (ক) ২,২৩,৪৫১ ; এস এ আলভারেজ (জ) ৯৭,৬৭২।

গুলবর্গা ॥ সিদ্দারামা রেড্ডি (ক) ১৪৪৩৮১; গোবিন্দ পি নাদেয়ারাজ (জ) ১০২৯৪১।

চিত্রদুর্গা ॥ কে মাল্লান্না (ক)

২২৭৯১৪; এচ সি বোরাইয়া (জ) ১৪১২৫৯।

হাসান ॥ এস নানজেগ গাউডা (জ) ২০৭৫৬০; জি এল নাল্লিউর গাউডা (ক) ২০৬৪৭৯।

কনারা ॥ বি পি কদম (ক) ১১৫৭০৭; এম রামকৃষ্ণ হেগড়ে (জ) ১৬১৪৯৪।

চামারাজনগর ॥ বি রাচিয়া (ক) ২১৪২০২; ভি শ্রীনিবাস প্রসাদ (জ) ১৪২৬১৫।

শিমোগা ॥ এ আর বদরীনারায়ণ (ক) ২৩৬০৬৫; জে এচ প্যাটেল (জ) ১৬১২২৯।

বেলগম ॥ এ কে কোটরা শেঠী (ক) ১৭৮৩৩১; পি বি পাতিল (জ) ১১৪৩২৯।

বাঙ্গালোর দক্ষিণ ॥ কে এস হেগড়ে (জ) ২২১৯৭৪; কে হনমন্তিয়া (ক) ১৮০৮০৯।

মান্ডিয়া ॥ কে চিক্কালিঙ্গাইয়া (ক) ২০০৩৬০; এম শ্রীনিবাস (জ) ১৯৫০০৮।

চিকবাল্লাপুর ॥ এম ভি কৃষ্ণাপ্পা (ক) ২০৭৫৮৯; জি নারায়ণ গাউডা (জ) ১৫৯১১৫।

রাইচুর ॥ আর মাল্লাপ্পা (ক) ২১২২৩২; এম নাগাপ্পা বাসাপ্পা (জ) ৭৫৮১০।

ম্যাঙ্গালোর ॥ জনার্দন পুজারী (ক)

আইন, বিচার ও কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী: শান্তিভূষণ

২৩৩৪৫৮; এ কে সুব্বিয়া (জ) ১৫৫১৩০।

মাইশোর ॥ এইচ ডি তুলসীদাস (ক) ১৯৫৬৫৭; এম এস গুরুপদস্বামী (জ) ১৫৩৯৮৯।

দাদরা ও নগর হাভেলি—১

দাদরা ও নগর হাভেলি ॥ রামুভাই আর প্যাটেল (ক) ১১৩২৪; দেবজী আর গোন্দ (জ) ৭৬৭৮।

লাক্ষাদ্বীপ—১

লাক্ষাদ্বীপ ॥ পি এম সয়ীদ (ক) ৯৬০০; মোহম্মদ কয়া (নি) ৬৭৮৬।

চণ্ডীগড়—১

চণ্ডীগড় ॥ কৃষণ কান্ত (জ) ৭০৮০৮; সৎপাল কাপুর (ক) ৩০,৩৮২।

মণিপুর—২

মণিপুর অউটার ॥ ইয়াংমাশো শাইজা (ক) ১০৫১১১; সেথখোজন (এম-পি) ২৯০৪৯।

মণিপুর ইনার ॥ এম টম্বি সিং (ক) ১,০৫,৭৪০; মোহম্মদ আলিমুদ্দিন (এম-পি) ৪০০৮৯।

ত্রিপুরা—২

ত্রিপুরা পশ্চিম ॥ শচীন্দ্রলাল সিংহ (গ-ক) ১০৪৮৫৮; তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (ক) ৯৯৮১১।

ত্রিপুরা পূর্ব ॥ কিরীট বিক্রম কিশোর দেববর্মা (ক) ১৩৩৯০৭; দশরথ দেব (কম-মা) ১২০৬৮৮।

মেঘালয়—২

শিলং ॥ এচ এস লিংডো (এচ এস) ৫৫৫৭২; পি জি মরবানিয়াং (ক) ৫১৯৭৫।

টুরা ॥ পূর্ণ এ সঙ্গম (ক) ৪০২৮৮; মোদি কে মারক (এ-পি) ১৬২৫৪।

নাগাল্যান্ড—১

নাগাল্যান্ড ॥ রা... শাইজা (ইউ) ১২৪৬২৭; হোকিশে শেমা (নি) ১১৬৫২৭।

পণ্ডিচেরী—১

পণ্ডিচেরী ॥ এ পাঝানুর (আ-ডি) ১১৫৩০২; পি আনসারি ডুরাইস্বামী (জ) ৯৬১০১।

অরুণাচল—২

অরুণাচল পূর্ব ॥ বাকিন পেরটিন (নি) ২৮৫৫৭; নাইওডেক ইওনগম (ক) ২০৯০৯।

অরুণাচল পশ্চিম ॥ রিনচিন খণ্ডু খিরমে (ক) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

সিকিম—১

সিকিম ॥ ছত্র বাহাদুর ছেত্রী (ক) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

তামিলনাড়ু—৩৯

পালানি ॥ সি সুব্রমনিয়ম (ক) ১৮৯৭; স্বামীনাথ গাউণ্ডার (ডি) ১১২৯।

রাসিপুরম ॥ দেবরাজন (ক) ২৭৫২১২; ভি বেঙ্কট চলম (জ) ১৪১৭৭৪।

রামনাথপুরম ॥ পি আনবালাগন (আ-ডি) ২৯৭৬১২; এম এস কে সাথিয়েন্দ্রন (ক) ১২২৪৮২।

মাদুরম ॥ এন কুড়নথাই রামালিঙ্গম (ক) ২২০২; এস গোবিন্দস্বামী পিল্লাই ১৯৭৯৩৭।

গোবিচেট্টিপালায়ম ॥ কে এস রামস্বামী ২৫৫১২০; এন কে কারুপ্পুস্বামী ১৪৯৬৬২।

তেনকাসি ॥ এম অরুণাচলম (ক) ১০৬৯; এস রাজাগোপালন (জ) ৭১৯৩।

শ্রীপেরুমবদুর ॥ এস জগন্নাথন (আ-ডি) ২৩৯৬৩২; টি পি এলুমালাই (জ) ১৭০০।

চিদাম্বরম ॥ এ মুরুগেসান (আ-ডি) ৮৪০৬; এন রাজঙ্গম (ডি) ১৬৯১৭২।

তিরুচেঙ্গোডে ॥ আর কোলানথাইভেলু (আ-ডি) ৩০৩৭৩৮; এম মুথুস্বামী (ডি) ১৫৫৮।

নাগপাট্টিনম ॥ এস জি মুরুগাইয়ান (ক) ২৭৮৯১৯; এম করুণানিধি (ডি) ২৬০৯।

কৃষ্ণাগিরি ॥ পি ভি পেরিয়স্বামী (আ-ডি) ২২২৯৭৯; এম কমলনাথন (ডি) ১৭৫১।

মাদ্রাজ উত্তর ॥ এ ভি পি আসাই থম্বি (ডি) ২৫০৮৫২; কে মনোহরণ (আ-ডি) ১৭৪৯।

মাদ্রাজ দক্ষিণ ॥ আর বেংকটরামণ (ক) ১০৩৩; মুরসোলি মারন (ডি) ১২০৪।

পেরমাবালুর ॥ এ অশোক রাজ (অ-ডি) ১০৪৬; জে এস রাজু (ডি) ১৪৬০১৯।

টিণ্ডিবনম ॥ এন আর লক্ষ্মীনারায়ণ ২৩৩১৫৫; ভি কৃষ্ণমূর্তি (ডি) ১৬৭০।

তিরুজেলভেলি ॥ ভি অরুণাচলম (আ-ডি) ৩,০৪,৫৬১; সামসুদ্দিন (ক দিরাভান) ১,২১,৮৬৯।

পেরিয়াকুলাম ॥ এস রামস্বামী (আ-ডি) ৮,১০০; পালানিভেল রাজন (ডি) ৩,৭০৮।

থানজাভুর ॥ এস ডি সোমসুন্দরম (আ-ডি) ২,৮৯,০৫৯; এল গণেশন (ডি) ১,৩১৬।

পোল্লাচি ॥ কে এ রাজু (আ-ডি) ৯,৩৮৮; সি টি দণ্ডপাণি (ডি) ১,১৯৪।

কোয়েম্বাটুর ॥ পার্বতী কৃষ্ণন (কম) ২,৬৭,৪২৪ ; লক্ষ্মণ থেবর (জ) ২,৪৬,২৪৬।

ডিন্ডিগল ॥ কে মায়া থেবর (আ-ডি) ২,৮৩,৩৪১ ; এ বালসুব্রহ্মণিয়ম (কম-মা) ১,৯৪,১১৭।

শিবকাশি ॥ ভি জয়লক্ষ্মী (ক) ২,৭১,৫৬৮ ; জি রামানুজম (জ) ১,৫৬,৭২০।

নাগেরকয়েল ॥ কুমারী অনন্তন (জ) ২,৪৪,৫২৬ ; এম মোজেস (ক) ১,৭০,২৯০।

কারুর ॥ কে গোপাল (ক) ৩,১৫,২৫৯ ; এম মীনাক্ষিসুন্দরম্ (জ) ১,৬৯,৭৩৯।

মাদ্রাজ মধ্য ॥ পি রামচন্দ্রন (জ) ২,৫৯,৪৩৭ ; কে রাজা মোহম্মদ (আ-
১,৮৬,০২৬।

ধরমপুরী ॥ কে রামমূর্তি (
২,০৯,৯০৮ ; পি পোন্নুস্বামী (
১,৩৪,২২৩।

নীলগিরি ॥ পি এস রামলিঙ্গম (
ডি) ২,৪১,৭৭৭; এম কে নানজা গাউড
(জ) ১,৮২,৪৩১।

শিক্ষা, সমাজমঙ্গল ও সংস্কৃতি মন্ত্রী: **প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র**
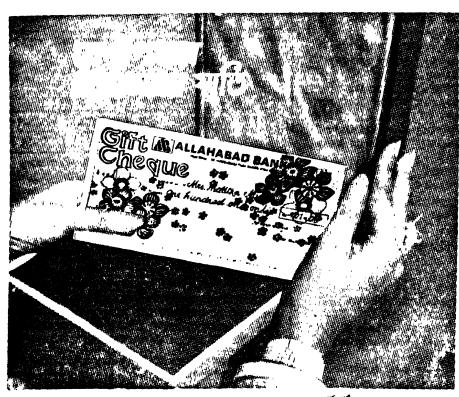
তিরুপাত্তুর ॥ সি এন বিশ্বনাথন (আ-ডি) ২.৫৭,৩২২; সি কে চিন্নারাজি গাউন্ডার (ডি) ১,৫৮,৬৫৬।

তিরুচেঙ্গুর ॥ কে টি কোশলরাম (ক) ২.৭২,৩৩৮; এডুইন দেবদাসন (জ) ১,৫২.১৪৮।

শিবগঙ্গা ॥ পি থিয়াগারাজন (আ-ডি) ৩,৩৮,৯৯৯; আর রামনাথন চেট্টিয়ার (জ) ১,২৭,৪৬৬।

চিঙ্গলেপুট ॥ আর মোহনরঙ্গম (আ-ডি) ২৩৬৮১৮; এরা সেঝিয়ান (ডি) ২০১১৭৯।

পুডুকোট্টাই ॥ ভি এস ইলানচেঝিয়ান (আ-ডি) ৩৪২১২০; ভি ভৈরব থেবর (জ) ১১৮৫০৫।

ওয়ান্ডিওয়াশ ॥ বেণুগোপাল গাউন্ডার (আ-ডি) ২৬৭৯৩০; ভুরাই মুরুগন (ডি) ১৮৬৭৯৮।

আর্কোনম ॥ ও ভি আলাগেসান (ক) ২৪৩৮১৮; এন বীরস্বামী (ডি) ১৮৫৯৫৪।

ভেল্লোর ॥ ভি দণ্ডায়ুধপাণি (জ) ২২০৯৯৪; এ কে এ আবদুল সামাদ (নি) ২১৭৮৩৩।

কুড্ডালোর ॥ জি ভুবরাহন (ক) ২৩১৯২৮; এস রাধাকৃষ্ণণ (জ) ১৪২০৭১।

সালেম ॥ পি কান্নন (আ-ডি) ২৫৪১৬৮; কে রাজারাম (ড) ১৭৪৫৩৪।

তিরুচিরাপল্লী ॥ এম কল্যাণসুন্দরম (কম) ২৭৬৩৯০; ওয়াই বেংকটেশ্বর দিক্ষিদার (জ) ২০০৩৪৫।

মাদুরাই ॥ আর ভি স্বামীনাথন (ক) ২৯৯৩০৯; পি রামমূর্তি (কম-মা) ১৬৪৯৬৪।

উত্তরপ্রদেশ—৮৫

মথুরা ॥ মণিরাম বাগরি (জ) ,৯৬,৫১৮; রামহিত সিং (ক) ৮১,২৫৩।

আকবরপুর ॥ মঙ্গল দেও বিশারদ (জ) ,৮১,০৮২; রামজী রাম (ক) ৬৯,২৫৬।

খেরি ॥ এস পি শাহ (জ) ১,৭৩,৮১৩; সি বালগোবিন্দ ভার্মা (ক) ৯৯,৫০৯।

আগ্রা ॥ শম্ভুনাথ চতুর্বেদী (জ) ২,৫৭,৪৭২; অচল সিং (ক) ৯৬,৯২০।

ফতেপুর ॥ বসির আহমেদ (জ) ২,২৭,৮০৮; সন্ত বক্স সিং (ক) ৫৭,৩১৯।

ফৈজাবাদ ॥ অনন্ত রাম জয়সোয়াল (জ) ২,১৩,৭১৯; রামকৃষণ সিংহ (ক) ৬৫,৯১৬।

গাড়োয়াল ॥ জগন্নাথ শর্মা (জ) ১,৮০,৯৪৪; চন্দ্রমোহন সিং (ক) ৭৬,৩৫১।

উন্নাও ॥ রাঘবেন্দ্র সিং (জ) ২,২৫,১২২; জিয়ারুর রহমান আনসারি (ক) ৬৪,২৪৮।

বড়া বাঁকি ॥ রাম কিঙ্কর (জ) ২০৬০১৬; বৈজনাথ কুরিল (ক) ৫৮,৬৫০।

লখনৌ ॥ হেমবতী নন্দন বহুগুণা (গ-ক) ২,৪২,৩৬২; শীলা কাউল (ক) ৭৭,০১৭।

শাহজাহানপুর ॥ সুরেন্দ্র বিক্রম (জ) ২৪২০২৬; কুনোয়ার জিতেন্দ্রপ্রসাদ (ক) ৮৬,৬০২।

হামিরপুর ॥ তেজ প্রতাপ সিং (জ) ১৬৫৪৮৮; স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (ক) ৮৪,২১৩।

ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী: বিজু পট্টনায়েক

সীতাপুর ॥ হরগোবিন্দ ভার্মা (জ) ১,৯৪,৪০০; জগদীশচন্দ্র দীক্ষিত (ক) ৮৪,৪২৫।

আলমোড়া ॥ মুরলী মনোহর যোশী (জ) ১,৫৩,৪০৯; নরেন্দ্র সিংবিস্ত (ক) ৭৬,১৩৩।

আমেথি ॥ রবীন্দ্র প্রতাপ সিং (জ) ১,৭৬,৪১০; সঞ্জয় গান্ধী (ক) ১,০০,৫৬৬।

প্রতাপগড় ॥ রূপনাথ সিং যাদব (জ) ২,০৬,৩৩৯; দিনেশ সিং (ক) ৫৭,০১১।

কনৌজ ॥ রাম প্রকাশ ত্রিপাঠী (জ) ২,৮৭,৬১২; কলরাম সিং যাদব (ক) ১,১৬,৫৭০।

রায়বেরিলি ॥ রাজ নারায়ণ (জ) ১,৭৭,৭১৯; ইন্দিরা গান্ধী (ক) ১,২২,৫১৭।

বাগপত ॥ চরণ সিং (জ) ২,৮৮,০০১; রাম চন্দর বিকল (ক) ১,৬৪,৭৬৩।

ফিরোজাবাদ ॥ রামজীলাল সুমন (জ) ২,৩২,৬৭৯; রাজারাম পিপ্পল (ক) ৭৫,৯১৫।

বালিয়া ॥ চন্দ্রশেখর (জ) ২,৬২,৬৪১; চন্দ্রিকা প্রসাদ (ক) ৯৫,৪২৩।

হরিদ্বার ॥ ভগবান দাস (জ) ২,৫৫,০৯১; সুরেন্দর লাল (ক) ৭৬৬৯১।

হাপুর ॥ কুনোয়ার মাহমুদ আলি খান (জ) ২,৬৮,০৭৪; বি পি মৌর্য (ক) ১,৩২,৬৭৭।

দেওরিয়া ॥ উগ্র সেন (জ) ২,৫৪,৮৬৪; বিশ্বনাথ রাই (ক) ৭৬,৯৬১।

মোহনলালগঞ্জ ॥ রামলাল কুরিল (জ) ২,০৩,৪৪৫; গঙ্গা দেবী (ক) ৪৭,৭০৩।

ঝাঁসি ॥ সুশীলা নায়ার (জ) ২২২১২৮; গোবিন্দ দাস রিছারিয়া (ক) ৯১,৬৩৩।

মিসরিখ ॥ রামলাল রাহী (জ) ২,০৬,৭২৭; শান্তাপ্রসাদ (ক) ৮০,৫৭৪।

বাণিজ্য, অসামরিক সরবরাহ ও সমবায়মন্ত্রী: মোহন ধারিয়া

পিলিভিট ॥ মোহাম্মদ সামসুল হাসান (জ) ২,৩৮,৬৯১; মোহনস্বরূপ খান (ক) ৬৬,০১৫।

কৈরানা ॥ চন্দন সিং (জ) ২,৪২,৫০০; শফাকত জং (ক) ৯৫,৬৪২।

সুলতানপুর ॥ জুলফিকার উল্লা (জ) ২,৩২,৩৩০; কেদারনাথ সিং (ক) ৬৬,৭৯৬।

ফুলপুর ॥ কমলা বহুগুণা (জ) ২,০৫,০৩৮; রামপুজন প্যাটেল (ক) ৮২,৬৪৬।

মহারাজগঞ্জ ॥ শিবনলাল সাক্সেনা (জ) ১,৮৪,০৯০; রঘুবর প্রসাদ (ক) ৫২,০৯৯।

এটা ॥ মহাদীপক সিং (জ) ২,৬৮,১৩৫; মুস্তাফা রসিদ শেরওয়ানি (ক) ৮৬,৬১৬।

সম্ভল ॥ শান্তিদেবী (জ) ২,১৪,৫২০; যুগল কিশোর (ক) ৮১,৬৫৬।

বাঁশগাঁও ॥ ফিরঙ্গী প্রসাদ (জ) ২,২৫,১৪৫; সুখদেও প্রসাদ (ক) ৭৪,০৫১।

চাইল ॥ রাম নীহার রাকেশ (জ) ১,৭৪,০১২; জগদীশ প্রসাদ (ক) ৫৭,২৯১।

জৌনপুর ॥ যাদবেন্দ্র দত্ত দুবে (জ) ২,০৯,৯২৩; রাজ দেও সিং (ক) ১,১০,০৫১।

বাহরাইচ ॥ ওম প্রকাশ ত্যাগী (জ) ১,৮৬,৯৪৬; যোগীন্দর সিং (ক) ৮৫,৫২৭।

বুলন্দশহর ॥ মাহমুদ হাসান খান (জ) ২,৯২,৬১১; কুমার সুরেন্দ্রপাল সিং (ক) ৮১,৫৯৮।

সাহারানপুর ॥ রসিদ মাসুদ (জ) ২৬৩৭৭৭; জাহিদ হাসান (ক) ১,০০,৩৯২।

লালগঞ্জ ॥ রাম ধন (জ) ২,৫৩,০৬৮; লালসা (ক) ৮৮,৯৮৮।

এলাহাবাদ ॥ জনেশ্বর মিশ্র (জ) ১,৯০,৬৯৭; বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (ক) ১,০০,৭০৯।

রামপুর ॥ রাজেন্দ্রকুমার শর্মা (জ) ২,৩৭,৭০৮; জুলফিকার আলি খান (ক) ১,৪৯,৬৩০।

ঘোসি ॥ শিবরাম (জ) ১,৯১,১৯০; রামকুমার (ক) ৭৭,৫৫৮।

মাছালিশহর ॥ রাজকেশর সিং (জ) ২,১১,১৯৩; নাগেশ্বর দ্বিবেদী (ক) ৭৪,১৩৭।

সৈদপুর ॥ রাম সাগর (জ) ২৬৭১৩৫; সঙ্কটপ্রসাদ শাস্ত্রী (ক) ৭৭,০৮৭।

সালেমপুর ॥ রামনরেশ কুশোয়াহা (জ) ২,৫৩,৬৫৯; তারকেশ্বর পাণ্ডে (ক) ৭২,৭৩৮।

নৈনিতাল ॥ ভা র ত ভূ ষ ণ (জ) ১,৯৬,৩০৪; কৃষ্ণচন্দ্র পাং (ক) ১,১১,৬৫৮।

বিলহাউর ॥ রামগোপাল সিং (জ) ২,৬৫,৩০৬; সুশীলা রোহাতগি (ক) ৮৮,১৩১।

জালাউনার ॥ রামচরণ (জ) ২,৭৬,৪২৯; রাম সেবক (ক) ৯১,১৫৪।

গাজীপুর ॥ গৌরীশঙ্কর রাই (জ) ১,৯৫,২৫৮; জৈনুল বাশার (ক) ১,০০,৯১৩।

বস্তি ॥ শিউ নারায়ণ (জ) ২,১৬,৫৪২; অনন্তপ্রসাদ ধুসিয়া (ক) ৭৬,১৬৫।

আলিগড় ॥ নবাব সিং চৌহান (জ) ২,৮০,৮১১; ঘনশ্যাম সিং (ক) ৯০,০৫৩।

আজমগড় ॥ রাম নরেশ (জ) ২,৩৮,৯৮৫; চন্দ্রজিৎ যাদব (ক) ১,০১,১৭৫।

বান্দা ॥ অম্বিকা প্রসাদ (জ) ১,৩৮,৪৪৮; রামেশ্বর প্রসাদ (ক) ৮১,৩৫৩।

রসায়ন ও সার মন্ত্রী ঃ
হেমবতীনন্দন বহুগুণা

হরদই ॥ পারমাই লাল (জ) ৯১,৮৭৩; কিন্দার লাল (ক) ৭৭,৫৮৬।

গোরখপুর ॥ আর হৃষীকেশ বাহাদুর (জ) ২৩৮৬৩৫; নরসিংহ নারায়ণ পান্ডে (ক) ৫৫৫৮১।

পাড্রাউনা ॥ রামধারী শাস্ত্রী (জ) ২১৫৬৬০; জেন্দা সিং (ক) ৯৬৫৬২।

এটাওয়া ॥ অর্জুন সিং বাডোরিয়া (জ) ২৭৬২১৪; শ্রীশংকর তেওয়ারী (ক) ৬৬০৪৯।

বলরামপুর ॥ নানাজী দেশমুখ (জ) ২১৭২৫৭; রাজলক্ষ্মী কুমারী (ক) ১০৩২৪৮।

ফরুখাবাদ ॥ দয়ারাম শাক্য (জ) ২৬৩২৮৭; আওধীশচন্দ্র সিং (ক) ৭৬৮৬২।

বেরিলি ॥ রাম মূর্তি (জ) ১৯৬১৪৭; সতীশ চন্দ্র (ক) ৮৪৪৬২।

আওনলা ॥ ব্রিজরাজ সিং (জ) ১৯৬৭০৩; সাবিত্রী শ্যাম (ক) ৫৯৫১৫।

মীরাট ॥ কৈলাস প্রকাশ (জ) ২৫৩০৩৫; শাহ নওয়াজ খান (ক) ১২৮৩০৩।

রবার্টসগঞ্জ ॥ শিউ সম্পৎ (জ) ২৩৫১৬৪; রাম স্বরূপ (ক) ৭২১২০।

মৈনপুরী ॥ রঘুনাথ সিং ভার্মা (জ) ২৮৯৪২৬; মহারাজ সিং (ক) ৬৪৩০৪।

ঘাটামপুর ॥ জওয়ালাপ্রসাদ কুরিল (জ) ২৭১৮৫৪; রাধেশ্যাম (ক) ৮৬৩৫০।

কানপুর ॥ মনোহর লাল (জ) ২৬৯৬২৯; নরেশচন্দ্র চতুর্বেদী (ক) ৯৫৩৪০।

কাইজারগঞ্জ ॥ রুদ্র সেন (জ) ১৯০৮০৭; কুনোয়ার রুদ্রপ্রতাপ সিং (ক) ৬৬০১১।

জালেসার ॥ মুলতান সিং চৌধুরী (জ) ২৬৯০৫৪; রোশন লাল (ক) ৬২৫০৮।

গোন্ডা ॥ সত্যদেও সিং (জ) ১৫৭৯৬৩; আনন্দ সিং (আম্‌ভাইয়া) (ক) ৮৬৬৯৭।

দোআরিয়াগঞ্জ ॥ মাধবপ্রসাদ ত্রিপাঠী (জ) ২৬৬৮৭৬; কেশবরাও মালব্য (ক) ১০৮০৫০।

শাহাবাদ ॥ গঙ্গা ভক্ত সিং (জ) ১৯১৩৮৭; ধরমরাজ সিং (ক) ৯৭৮৩৯।

খলিলাবাদ ॥ ব্রিজভূষণ তেওয়ারী (জ) ২৭১৩৯৫; কৃষ্ণ চন্দ্র (ক) ৯৩৫৫৫।

আমরোহা ॥ চন্দ্রপাল সিং (জ) ২০৯৮৯৫; সাত্তার আহমেদ (ক) ৭৩৪০১।

মুজাফফরনগর ॥ সয়ীদ মুর্তাজা (জ) ২৭০৬৪৪; বরুণ সিং (ক) ৮৭৯৮৫।

হাথরাস ॥ রামপ্রসাদ দেশমুখ (জ) ৩০০৯০৭; চন্দ্রপাল শৈলানী (ক) ৯২৯৮২।

বিজনোর ॥ মহীলাল (জ) ২৫৮৬৬৩; রাম দয়াল (ক) ৮২৮৪৯।

মোরাদাবাদ ॥ গুলাম মোহাম্মদ খান (জ) ১৯৬৬৪৮; ডি এন সিংহ (ক) ৫৭৭১৭।

বারাণসী ॥ চন্দ্রশেখর (জ)......; রাজারাম শাস্ত্রী (ক)......।

চান্দৌলি ॥ নরসিং (জ)......; চন্দ্রা ত্রিপাঠী (ক)......।

মির্জাপুর ॥ ফাকির আলি (জ)......; আজিজ ইমাম (ক)......।

গুজরাট—২৬

মান্ডভি ॥ ছিটুভাই ডি গামিট (ক) ১৮৩৬০৯; মুকুন্দভাই চৌধুরী (জ) ১৪৪০০৬।

তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী ঃ এল কে আদ্বানী

বনসকণ্ঠা ॥ মোতিভাই আর চৌধুরী (জ) ১৬৮৬৬৩; পোপটলাল এম যোশী (ক) ১০৩৮৬৩।

পোরবন্দর ॥ ধর্মসিংভাই ডি প্যাটেল (জ) ১৪৩২৫২; গোমিনভাই কে ধামি (ক) ১১৮৮২৩।

সুরেন্দ্রনগর ॥ আর কে অমিন (জ) ১৩১৯২৭; মনুভাই শাহ (ক) ১৩৪৪৯৬।

আনন্দ ॥ ঈশ্বরভাই সিং দলাসিং চাভ্‌ড়া (ক) ২২১০১৯; প্রিন্সিপসিং কে যাদব (জ) ১৫৮৩২০।

জুনাগড় ॥ নরেন্দ্র পি নাথোয়ানী (জ) ১৬৭৫৬৭; রতুভাই অদানি (ক) ১০৫৭১৪।

মেহসানা ॥ সোমন্‌ ভাই পি দামং (ক) ১৩৫৩৮; গোবিন্দ সিং নিন্‌মা (জ) ৮৬১৪৫।

মেহসানা ॥ মণিবেন ভি প্যাটেল (জ) ২,৪০,৭৭৬; নটবরলাল এ প্যাটেল (ক) ১১৮৬৬১।

আহমেদাবাদ ॥ আচসান জাফরি (ক) ১৮৭৭১৫; ব্রহ্মকুমার ভাট (জ) ১৭৭৭০২।

ভবনগর ॥ প্রসন্নবদন এম মেহতা (জ) ১২৮৭৯২; ছবিলদাস মেহতা (ক) ১১৭৬৫৫।

কচ্ছ ॥ অনন্তরাই দাভে (জ) ১১৫৫১৪; মহীপতরাই মেহতা (ক) ১০৫৬১৭।

বলসার ॥ নানভাই এন প্যাটেল (জ) ১৬১৮৬১; নির্মলা বেন প্যাটেল (ক) ১৩৩৮৯৭।

আমরেলি ॥ দ্বারকাদাস এম প্যাটেল (ক) ১৪০৫৮৬; নরসিংহদাস গোনধিয়া (জ) ৮১৫৮০।

পাটন ॥ খেমচাঁদভাই সোমাভাই

যোগাযোগ মন্ত্রী : জর্জ ফার্নান্ডেজ
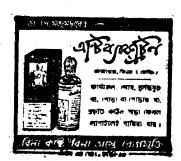
চাওয়াড়া (জ) ১৮২৯৭৩; পূনমচাঁদভাই মিঠাভাই বনকর (ক) ১০৯৪০৭।

রাজকোট ॥ কেশুভাই এস প্যাটেল (জ) ১৪৩০৫১; অরবিন্দ প্যাটেল (ক) ১২৭২৫০।

ব্রোচ ॥ আহমেদভাই মোহম্মদভাই প্যাটেল (ক) ১৮৯৮১২; সুলেমান উনিয়া (জ) ১২৬১১৬।

সবরকণ্ঠা ॥ এইচ এম প্যাটেল (জ) ১৬৪৫০২; কুমারশ্রী রাজেন্দ্র সিংজী (ক) ১২৬৪৪০।

বরোদা ॥ ফতেসিংরাও গায়কোয়াড় (ক) ২,১৯,১০১; মনভাই প্যাটেল (জ) ১,৭৮,১৭৮।

ধন্ধুকা ॥ নটবরলাল বি পারমার (জ) ১,৩৪,৫২৭; বলবন্তরাই আর রাঠোর (ক) ১,০৬,৭৬১।

গান্ধীনগর ॥ পুরুষোত্তম জি মবলংকর (নি) ২,২১,৯৬৭; গোবিন্দভাই সি প্যাটেল (ক) ১,৬১,৮৫০।

কাপাদবনজ ॥ শংকরজিস ওয়াঘেলা (জ) ১,৮৮,৩৯০; নটবরসিং রাঠোড় (ক) ১,২০,৪১৯।

গোধরা ॥ হিতেন্দ্রভাই কানাইয়ালাল দেশাই (ক) ১,৩৮,৬৩৪; হেমিং পিলু মোদী (জ) ১,০৭,২০৫।

সুরাট ॥ মোরারজী দেশাই (জ) ২,০৩,২০১; যশোবন্ত চৌহান (ক) ১,৮৪,৭৩৩।

কাইরা ॥ ধরমসিংভাই দেশাই (ক) ২,১১,৮৮৪; শংকরভাই ওয়াঘেলা (জ) ১,৭০,০৪০।

ছোট উদয়পুর ॥ অমরসিং রাঠোয়া (ক) ১৭০৩৪০; মণিহরভাই রাঠোয়া (জ) ১২৯২২০।

দিল্লী—৭

নিউ দিল্লী ॥ অটলবিহারী বাজপায়ী (জ) ১৩৯৩৩১; শশীভূষণ (ক) ৫৪০০৭।

দিল্লী সদর ॥ কে এল গুপ্ত (জ) ১৪৪২৪৩; এ এন চাওলা (ক) ৬৪৫৭২।

দিল্লী পূর্ব ॥ কিশোর লাল (গ-ক) ২৪০১৯৪; এচ কে এল ভগত (ক) ১০৭৪৮৭।

চাঁদনী চক ॥ সিকান্দার বখত (জ)......; সুভদ্রা যোশী (ক)........।

আউটার দিল্লি ॥ ব্রহ্ম প্রকাশ (জ)......; দলীপ সিং (ক)........।

করোলবাগ ॥ এস এন সরসুনিয়া (জ) ....; টি সোহন লাল (ক)........।

দিল্লী দক্ষিণ ॥ বিজয়কুমার মালহোত্রা (জ)........; চরণজিৎ সিং (ক)........।

বিহার—৫৪

সমস্তিপুর ॥ কর্পূরী ঠাকুর (জ) ৪,০১,৮৬৫ ; যমুনা প্রসাদ মণ্ডল (ক) ৭৪,৪৬১।

দারভাংগা ॥ সুরেন্দ্র ঝা সুমন (জ) ৩,০৬,৮৫৭ ; রাধানন্দন ঝা (ক) ৯৪,৮৫৫।

কাটিহার ॥ যুবরাজ সিং (জ) ২,১৫,০৭৪ ; তারিক আনোয়ার (ক) ৮৫,২৮৫।

সাসারাম ॥ জগজীবন রাম (গ-ক) ৩,২৭,৮৪৯ ; মুঙ্গেরি লাল (ক) ৮৪,১৬৯।

কোডার্মা ॥ রিতলাল প্রসাদ ভার্মা (জ) ১,৬৯,৩৮৭ ; চপলেন্দু ভট্টাচার্য (ক) ৫০,৩৫৯।

হাজারিবাগ ॥ বসন্ত নারায়ণ সিং (জ) ১,৮৬,০৫৮ ; দামোদর প্যাণ্ডে (ক) ৪৪,৯৪১।

মজফফরপুর ॥ জর্জ ফার্নাণ্ডেজ (জ) ৩,৯৬,৬৮৭ ; নীতীশ্বর প্রসাদ সিংহ (ক) ৬২,৪৭০।

ধানবাদ ॥ অরুণকুমার রায় (নি) ২,০৫,৮৯৫ ; রামনারায়ণ শর্মা (ক) ৬৩,৬৪৬।

বাঙ্কিয়া ॥ রামজীবন সিং (জ) ১,৪৬,৭৭২ ; সূর্য নারায়ণ সিং (কম) ৯৯,১৪০।

বেতিয়া ॥ ফজলুর রহমান (গ-ক) ১,৮৬,৪৮৬ ; কেদার পাণ্ডে (ক) ৯০,১৫৮।

আরা ॥ চন্দ্রদেও প্রসাদ ভার্মা (জ) ৩,২৩,৯১৩ ; বলিরাম ভগত (ক) ১,১৩,০৩৬।

শিওহর ॥ ঠাকুর গিরজানন্দন সিং (জ) ২,৪১,৬৭২ ; হরিকিশোর সিং (ক) ১,৭৪,৬৪৩।

থাগারিয়া ॥ জ্ঞানেশ্বর যাদব (জ) ২,৩০,৬৮৭ ; জয়নারায়ণ মেহতা (নি) ৮১,৩৯৫।

খুনতি ॥ কারিয়া মুণ্ডা (জ) ৯১,৮৫৯ ; এন ই হোরো (নি) ৩৬,৯৭৬।

আরারিয়া ॥ মহেন্দ্র নারায়ণ সর্দার (জ) ২,২১,৮২৯ ; দুমারলাল বৈঠা (ক) ১,১৩,২৯৫।

মধুবানী ॥ নাথুনি রাম (জ) ৪,২৯৭৮৫ ; মহাবীর চৌধুরী (ক) ৬৭,০৮৪।

মুঙ্গের ॥ শ্রীকৃষ্ণ সিং (জ) ৩,৩৭,৭৫৮ ; ডি পি যাদব (ক) ১,৬৪,১৪৯।

ছাপরা ॥ লালু প্রসাদ যাদব (জ) ৪১৫২৪২ ; রাম শেখর প্রসাদ সিং (ক) ৪১৫০৪।

দুমকা ॥ বটেশ্বর হেমব্রম (জ) ১১৫৩৮৬ ; পৃথীন চাঁদ কিশু (ক) ৬২১৩২।

চাতরা ॥ সুখদেও প্রসাদ ভার্মা (জ) ২০৩৮৭৮ ; শঙ্কর দয়াল সিং (ক) ৬০৩৪৪।

পালামৌ ॥ রামদেনি রাম (জ) ২০১৮৬১ ; কমলা কুমারী (ক) ৩৯০২২।

মহারাজগঞ্জ ॥ রামদেও সিং (জ) ৩৪৫৫১৯ ; দারোগাপ্রসাদ রাই (ক) ৯৩৭০৩।

সহর্ষ ॥ বিনায়ক প্রসাদ যাদব (জ) ৩০৬৯৯৪ ; চিরঞ্জীব ঝা (ক) ১১৮২৮৮।

জামশেদপুর ॥ রুদ্রপ্রতাপ সারংগী (জ) ১৩১৪১৯ ; ভি জি গোপাল (ক) ৬৭৬৬৬।

গয়া ॥ ঈশ্বর চৌধুরী (জ) ৩৪১০০০ ; মিসরি সদা (ক) ৯২৬৮২।

রাজমহল ॥ ফ্রাংক অ্যান্টনী মুরমু (জ) ১৪৮৬৭৭ ; যোগেশ চন্দ্র মুরম (ক) ৫৬১৯১।

বৈশালী ॥ দিগ্বিজয় নারায়ণ সিং (জ) ৪৩৫৭৫৭ ; নওল কিশোর সিং ৭০২৬০।

বাড় ॥ শ্যামসুন্দর গুপ্ত (জ) ১৭২২২৭ ; ধরমবীর সিং (ক) ১০১৯৪৫।

গিরিডি ॥ রামদাস সিং (জ) ১৬৪১২০ ; ইমতেয়াজ উদ্দীন আহমদ (ক) ৮৫,৮৪৩।

বাগাহা ॥ জগন্নাথ প্রসাদ স্বতন্ত্র (জ) ১৩৮৪৪৩ ; ভোলা রাউত (ক) ৯৭৭৫৫।

জাহানাবাদ ॥ হরিলাল প্রসাদ সিংহ (জ) ৩১৭৯৩৪ ; চন্দ্রিকা প্রসাদ যাদব (ক) ৬৬৯৮৪।

ঝানঝারপুর ॥ ধনিকলাল মণ্ডল (জ) ৩০৫৫৫৪ ; জগন্নাথ মিশ্র (ক) ১৪৮০৭৩।

লোহারডাগা ॥ লালু ওরাঁও (জ) ১৪২২৭৪ ; কার্তিক ওরাঁও (ক) ৭৭৩৯১।

বেগুসরাই ॥ শ্যামনন্দন মিশ্র (জ) ১৮৫৩৮০ ; তারকেশ্বরী সিংহ (ক) ১৫০১৫৪।

সীতামাড়ী ॥ শ্যামসুন্দর দাস (জ) ২৬১৩২১ ; নগেন্দ্রপ্রসাদ যাদব (ক) ১৭১২২৭।

বাঁকা ॥ মধু লিমায়ে (জ) ২৩৯৫৫০; চন্দ্রশেখর সিং (ক) ৭৪৮৬৬।

বক্সার ॥ রামানন্দ তিওয়ারি (জ) ২৮৫৩৮০ ; অনন্তপ্রসাদ শর্মা (ক) ৮২১১৯।

মোতিহারি ॥ ঠাকুর রমাপতি সিং (জ) ১৬৭৭৩২ ; বিভূতি মিশ্র (ক) ৯৩৭৭৯।

সিওয়ান ॥ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ বর্মা (জ) ৩২৫০৩০; মোহম্মদ ইউসুফ (ক) ৯৩,০৫৪।

কিষণগঞ্জ ॥ হালিমুদ্দিন আহমদ (জ) ১৬৮১৭৫ ; জামিলুর রহমান (ক) ৮৮০৪৫।

রাঁচি ॥ রবীন্দ্র ভার্মা (জ) ১৩০৯৭৮; শিউপ্রসাদ শাহ (ক) ৬৮২২২।

হাজিপুর ॥ রামবিলাস পাসোয়ান (জ) ৪৬৯০০৭ ; বালেশ্বর রাম (ক) ৪৪৪৬২।

মাধেপুরা ॥ বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডল (জ) ৩০১০৭০ ; রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাদব (ক) ১০০৩৫৯।

পাটনা ॥ মহামায়া প্রসাদ সিংহ (জ) ৩৮২৩৬৩ ; রাম অবতার শাস্ত্রী (কম) ৫৯২৩৮।

বিক্রমগঞ্জ ॥ রাম অওধেশ সিং (জ) ২৪৮৫৭৮; রামসুভগ সিং (ক) ৯৬৮২৭।

মধুবনী ॥ হুকুমদেও নারায়ণ যাদব (জ) ২০০৫৪৩ ; ভোগেন্দ্র ঝা (কম) ১৪৩৪২২।

গোড্ডা ॥ জগদম্বী প্রসাদ যাদব (জ) ২৫০৭৪৯ ; জগদীশ নারায়ণ মণ্ডল (ক) ৯১৭৫৮।

ভাগলপুর ॥ রামজী সিং (জ) ৩,০৪,৭৯১; ভগবৎ শা আজাদ (ক) ১,২০,০৭৩।

সিংভূম ॥ বাগুম সামব্রুই (নি) ১,২৬,২৮৮; মোরান সিং পূর্তি (ক) ২৪,৪২২।

পূর্ণিয়া ॥ লাখনলাল কাপুর (জ) ১,৯৯,০৩৪; মাধুরী সিং (ক) ১,০৬,৯৯৭।

আওরঙ্গাবাদ ॥ সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (জ) ২,৫১,১৩৯; রামস্বরূপ যাদব (ক) ১,৩০,৬৯২।

রোসেরা ॥ রামসেবক হাজারী (জ) ৩,১১,২৪০; রাম ভগবৎ পাসোয়ান (ক) ১,১৬,৭৩৪।

নালন্দা ॥ বীরেন্দ্রপ্রসাদ (জ)......; বিজয়কুমার যাদব (কম)......।

গোপালগঞ্জ ॥ ডি এন তিওয়ারি (গ-ক) ...; আবদুল গফুর (ক)......।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী: রাজনারায়ণ

মধ্যপ্রদেশ—৪০

মহাসমুন্দ ॥ ব্রজলাল ভার্মা (জ) ১৮২০৫৪ ; শ্রীকৃষ্ণ আগরওয়াল (ক) ১০২৫২৭।

মোরেনা ॥ ছবিরাম অর্গল (জ) ১৭২৯৫৯ ; বাধ রাম (ক) ৯১৬৫৫।

বিলাসপুর ॥ নিরঞ্জন প্রসাদ কেশরোয়ানী (জ) ১৫০০৩৯ ; অশোক রাও (ক) ১৩৭২১২।

বেতুল ॥ সুভাষচন্দ্র আহুজা (জ) ১০৮৬৬১; এন কে সালভে (ক) ৮১৭৩৭।

শাদোল ॥ দলপত সিং পারেস্তি (জ) ১৬৪৬৫২; ধন শাহ প্রধান (ক) ৬৮০৯৩।

মান্দসোর ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে (জ) ১৯৯৬৮৮ ; বাসীলাল গান্ধী (ক) ১৪৮৫৮১।

গোয়ালিয়র ॥ নারায়ণ কৃষ্ণ শেজওয়ালকর (জ) ২১৯৮৩৮ ; সুমের সিং (ক) ৬৭৬৪৬।

দামোহ ॥ নরেন্দ্র সিং (জ) ২৪৭৪৫১ ; বিঠলভাই প্যাটেল (ক) ৯৮০৩২।

রাজনন্দগাঁও ॥ মদন তিওয়ারি (জ) ১৭৮৪৭৬ ; রামসহায় পাণ্ডে (ক) ৯০৫৪৩।

খাণ্ডোয়া ॥ পরমানন্দ ঠাকুরদাস গোবিন্দজীওয়ালা (জ) ১৮২০২৪; গঙ্গাচরণ দীক্ষিত (ক) ১২৮০০১।

বালাঘাট ॥ কে এল জৈন (আর-পি) ১৫৩৯৮০ ; সি ডি গৌতম (ক) ১০৪২৭২।

মান্দলগড় ॥ গোবিন্দরাম মিরি (জ) ১১৬০৩৮; গোণ্ডিলাল প্রসাদ অনুরাগী (ক) ১০৩৮৩৪।

খাজুরাহো ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ নায়েক (জ) ২৪৪৬৪১ ; শিবনারায়ণ খারে (ক) ৮২৮৫৬।

শাজাপুর ॥ ফুলচাঁদ ভার্মা (জ) ২০৮৭৮৭। বাপুলাল মালবা (ক) ১৫৩৯৯৫।

হোসাঙ্গাবাদ ॥ এচ ভি কামাথ (জ) ২০৮৫৯৬ ; নীতিরাজ সিং চৌধুরী (ক) ১০০৪২৫।

দুর্গ ॥ মোহন ভাইয়া (জ) ১৭৭৯২২; চন্দুলাল চন্দ্রকর (ক) ১২৬৩৪৭।

সরগুজা ॥ লারাং সাই (জ) ১৬৫৯৫২ ; বাবুনাথ (ক) ৬৫৭৬৯।

মাণ্ডলা ॥ শ্যামলাল ধুর্ভে (জ) ১২৬৬৮৬; মংরু গানু উইকে (ক) ৫৩৮৪৭।

জাঞ্জগির ॥ মদন ভাইয়া (জ) ১১৮৬৬৫ ; রাম গোপাল তিওয়ারি (ক) ১০৫০৯৬।

ভুপাল ॥ আরিফ বেগ (জ) ২,৩১,০২৩; এস ডি শর্মা (ক) ১,২২,৪৯৭।

ধার ॥ ভরতসিং গুলাবসিং (জ) ১,৭০,৯১০; মাঙ্গিলাল আদিবাসী (ক) ১,২৪,৭৩৬।

রাজগড় ॥ পন্ডিত বসন্তকুমার রামকৃষ্ণ (জ) ২,২৬,৫৭৮; কানাইয়ালাল ভুরাভাই (ক) ৭৫,০৪৩।

রায়পুর ॥ পুরুষোত্তমলাল কৌশিক (জ) ১,৮৬,২৯৬; ভি সি শুক্লা (ক) ১,০২,৬৮৪।

কানকের ॥ এ ডাউসিং (জ) ১,৫১,-৩৯২; অরবিন্দ নেতাম (ক) ৯৭,৬১৫।

সাগর ॥ নর্মদাপ্রসাদ রাই (জ) ১,৭৩,-৯২২; সাহাদ্রাবাই রাই (ক) ১,০৪,৯৯৩।

জব্বলপুর ॥ শারদ যাদব (জ) ১,৯৪,-৫১৬; জে এন আওয়াস্থি (ক) ১,১৮,৬২৫।

ছিন্দওয়ারা ॥ জি শংকর মিশ্র (ক) ৯৯,৩৯৬; প্রতুলচন্দ্র দ্বিবেদী (জ) ৯৭,০২৭।

ইন্দোর ॥ কল্যাণ জৈন (জ) ১,৭৪,২৭৮; নন্দকিশোর ভাট (ক) ১,৩৭,৬৮২।

বিদিশা ॥ রাঘবজী (জ) ২,১৮,২৭৬; গাফরানাজাম (ক) ৯৪,৫৪২।

বস্তার ॥ দৃগপালশাহ কেশরীশাহ (জ) ১,০১,০০৭; লম্বোদর ওয়ালিয়ার (ক) ৫০,৯৫৩।

সাতনা ॥ সুখেন্দ্র সিং (জ) ২,৪৯,৯৩৮; রামচন্দ্র বাহপাই (ক) ৯৭,৩৬১।

ভিন্দ ॥ রঘুবীরসিং মাছান্দ (জ) ২,৪১,২৬৭; রাঘব রাম (ক) ৮০,৩৭৩।

খারগোনে ॥ রামেশ্বর পাটিদার (জ) ১,৬৩,৮৩৪; সুভাষ যাদব (ক) ১,২৭,৯৭৬।

সিধি ॥ সূর্যনারায়ণ সিং (জ) ১,৪১,-৯৬৮; রণবাহাদুর সিং (ক) ৬৫,৪৯৫।

খুরজা ॥ মোহনলাল (জ) ২,৮৯,৭৩৭; চরি সিং (ক) ৬৩,৯২০।

ঝাবুয়া ॥ ভগীরথ ভানোয়ার (জ)...... দিলীপ সিং ভুরিয়া (ক)......।

শিওনি ॥ নির্মলচন্দ্র জৈন (জ)........; ঠাকুর রঘুরাজ সিং (ক)........।

উজ্জয়িনী ॥ হুকুমচাঁদ কাছোয়াই (জ) .....; (ক)......।

মহারাষ্ট্র—৪৮

রাজাপুর ॥ মধু দন্ডবতে (জ) ২২০৮৫৫ ; গোপাল রামচন্দ্র মায়েকর (ক) ১০৪৪৭৩।

সাতারা ॥ যশবন্তরাও বলবন্তরাও চবন (ক) ২৬০৫৬২ ; নীতীন জগন্নাথ লাভনগারে (জ) ৬৮৯৬১।

রত্নগিরি ॥ চন্দ্রকান্ত কাশীনাথ পারুলেকর (জ) ১৭৩০০৪ ; শান্তারাম লক্ষ্মণ পিঙ্গ (ক) ১৪৭৭০৪।

মানদেশ ॥ কেশবরাও শঙ্করবাও ধোন্দগে (পি-ডব্লু) ২৫৩৭৩৬; গোবিন্দরাও রামচন্দ্র মহাইসেকর (ক) ১১৯৯১৬।

সোলাপুর ॥ সুরযরতন ফতেচাঁদ দামানি (ক) ১৮৩৪২৪; মদাপ্পা বন্দাপ্পা কাডাডি (জ) ১৪৯৩৮১।

চিমুর ॥ ঠাকুর কৃষ্ণরাও দাগোজী (ক) ২৩১৯০২ ; ঘোড়িচোর মনোহর রাঘোজী (জ) ১৭১৯৩৩।

লাহানু ॥ লাহানু শিদাবা কম (কম-মা) ১৯৬৮৬৭; লক্ষ্মণ কাকাদিয়া ডুমাড়ু (ক) ১৪১৩১৩।

আকোলা ॥ বসন্তরাও পুরুষোত্তম সাঠে (ক) ২০৮৪৫৮; মোতিরাম উদয়ভানু লাহানে (জ) ১৪৬৯৬৯।

কোপারগাঁও ॥ একনাথরাও বিঠলরাও ভিখে (ক) ১৮১০১৩ ; কিশোর রামেশ্বর পাওয়ার (জ) ৮২৪৬৯।

ইচালকারান্জি ॥ মানে রাজারাম

(বালাসাহেব শংকররাও) (ক) ২১১৩০১; কাকাসাহেব গোপালরাও দেশাই (জ) ১৭৭৯৪৫।

ভির ॥ গঙ্গাধর আপ্পা বুরাডে (কম-মা) ১৯৭৪৯৭; লক্ষ্মণ শংকররাও দেশমুখ (ক) ১৪৫৬০০।

এরান্ডোল ॥ সোনুসিং ধনসিং পাতিল (জ) ১৮২৮৮০; কৃষ্ণরাও মাধবরাও পাতিল (ক) ১৬৮৮৬৬।

খেদ ॥ এম ডি মগর (ক) ১,৫৭,৯৪৭; এম টি পাতিল ভুজবল (জ) ১৩৮৪২১।

সাংলি ॥ গোটখিন্দে গণপৎরাও তুকারাম (ক) ১৯২১২৫; বসুদেও দাজি যাদব (জ) ১৩৫৮৩১।

বোম্বাই উত্তর-মধ্য ॥ অহল্যা পি রঙ্গনেকর (কম মা) ২২৮১২৩; আর ডি ভান্ডারে (ক) ১,৫৮,২০৮।

পান্ধারপুর ॥ থেরাট স্যাম্ডিফেন ভীওয়ান (ক) ২০৩৭০৯; কাদে তাতিয়াসাহেব মনোহর (নি) ১০৫২৫৭।

নাগপুর ॥ জেব মানচার্সা আওয়ারী (ক) ১,৭২,০১০; ভাউরাওদেওয়াজী খোবরাগাড়ে (আর-পি) ১,৩০,৪৫৭।

আহমেদনগর ॥ আন্নাসাহেব পণ্ডুরং সিন্ধে (ক) ১,৭৯,৫৫০; মৌনানরাও আবাসাহেব গাড়ে (জ) ১১৪৭৩৭।

বোম্বাই উত্তর ॥ মৃণাল কেশব গোরে (জ); ২৭৮২৪৬; রিদোয়ান হ্যারিস (ক) ১,৩১,১৫৬।

পুনে ॥ মোহন মনিকচাঁদ ধারিয়া (জ) ২,০৯,৭৭২; বসন্ত বিঠোবা থোরাট (ক) ১৬১৭৫৫।

কারাড ॥ প্রেমালাবাই দাইসাহেব চবন (ক) ২,৪৩,৩০৫; ভাউসাহেব বলবন্ত দেশাই (পি-ডব্লু) ৭২৪৯০।

হিঙ্গোলে ॥ চন্দ্রকান্ত রামকৃষ্ণ পাতিল (জ) ১৪৪৯৯১; বালাজীরাও গোপালরাও দেশমুখ (ক) ১,০৯,২৪০।

মালেগাঁও ॥ হরিশংকর মাহালে (জ) ১,৪৪,৫৫৫; জামারু মঙ্গলু কাহান্ডোলে (ক) ১,২৯,১১৮।

ওসমানাবাদ ॥ তুকারাম সদাশিব শৃঙ্গারে (ক) ১,৬২,৯৩৪; কমলাকররাও রুক্মজী সারওয়াড়ে (জ) ১০১০৯০।

আওরঙ্গাবাদ ॥ বাপু আর কালদাতে (জ) ২,০০,৯৭৮; চন্দ্রশেখর রাজুরকর (ক) ১,৪৩,৮৬৪।

সাংলি ॥ গণপতরাও তুকারাম গটখিন্ডে (ক) ১,৯২,১২৫; বাসুদেও দাজি যাদনব (জ) ১,৩৫,৮৩১।

কোলহাপুর ॥ দজিবা বলবন্তরাও দেশাই (পি-ডব্লু) ১,৮৬,০৭৭; শংকররাও দত্তাত্রেয় মানে (ক) ১,৮৫,৯১২।

স্পীকার : নীলম সঞ্জীব রেড্ডি

ওয়ার্ধা ॥ এস ভি গোড়ে (ক) ২,১৯,৪৪২; জে বি ধোতে (নি) ১,০২,৭৮৮।

ওয়াশিম ॥ ভি পি নায়েক (ক) ২,১৩,৩৭৯; এস এস খান্ডারে (আর-পি) ১,৪০,১৮২।

ভান্ডারা ॥ এল বি মানকর (জ) ২,১১,১০৬; সি বি গুপ্ত (ক) ১,৫৯,৪৭৩।

বারামতী ॥ শম্ভাজীরাও সাহেবরাও কাকাডে (জ) ২,০৩,১৪৮; বিঠলনাগর গ্যাডগিল (ক) ১,৭২,৪৪৮।

থানা ॥ এম রামচন্দ্র কাশীনাথ (জ) ২,৩০,৫০২; ডি পি শিবরাম (নি) ১,৪৭,৭৫৬।

কুলাবা ॥ দিনকর বালু পাতিল (পি-ডব্লু) ১,৯৯,৪৬৩; এস বি সাবন্ত (ক) ১,৪৬,১৪২।

বোম্বাই দক্ষিণ ॥ রতনসিং গোকুলদাস রাজদা (জ) ২,২৬,৮৯৩; আর সি আংকলেশ্বরিয়া (ক) ১,৬২,৪৯৯।

বোম্বাই দক্ষিণ-মধ্য ॥ বাপু চন্দ্রসেন কাম্বলে (জ) ১,৯৪,৭৮৬; ভি আর হোসিং (ক) ১,৪১,০৮৩।

বোম্বাই উত্তর-পূর্ব ॥ সুব্রমনিয়ম স্বামী (জ) ২,৬০,৬৯৯; আর জি কুলকার্নি (রাজারাম) (ক) ১,৩৭,৫৭৭।

বোম্বাই উত্তর-পশ্চিম ॥ রাম জেঠমালানি (জ) ২,৪৬,৪৪৬; এইচ আর গোখেল (ক) ১,৫২,৯৪৭।

ধুলে ॥ ডি এন পাতিল (ক) ১,৭৮,৭৩৫; ইউ এল পাতিল (জ) ১,২৬,৫৮৬।

নান্দুরবার ॥ এস এচ নায়েক (ক) ১,৮৬,৯৪৯; ডি ডি পাদভি (জ) ১,১৯,৫০৯।

নাসিক ॥ ভি জি হান্ডে (জ) ১,৬৪,২৫৮; বি জি থ্যাকারে (ক) ১,৫৩,০১৭।

Interpub/GSC/2/76 Ben
সিন্থল
শারীরিক দুর্গন্ধ দূর করে, সুরভিত রাখে
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
ভারতের একমাত্র সুরভিত সাবান, যা, আপনার গায়ের ঘামেভেজা দুর্গন্ধ একেবারে দূর করে।
আপনাকে এতো সজীব ও স্নিগ্ধ রাখতে অন্য কোন সাবান পারেনা।
ত্বক-বিশেষজ্ঞেরা রূপলাবণ্য অটুট রাখার জন্যে এই সাবান সুপারিশ করে থাকেন।

রাজস্থান—২৫

গালিম্বর ॥ লালিয়া ভাই (জ) ১৮০৪৩২; দেবীলাল (ক) ৮১১৩৫।

টঙ্ক ॥ রাম কানোয়ার (জ) ২৪০৮১০; বনোয়ারীলাল বেরোয়া (ক) ৭৮৮৯৩।

উদয়পুর ॥ ভানুকুমার শাস্ত্রী (জ) ২৪০১৮১; কুন্দনলাল শ্রীমালী (ক) ৯৩১২৫।

নাগাউর ॥ নাথুরাম মির্ধা (ক) ১৮৯২৯০; কিষণলাল শাহ (জ) ১৬৯১৩৯।

চিতোরগড় ॥ শ্যামসুন্দর (জ) ২২৯০৪৮; আনোয়ারুল আনোয়ার (ক) ৯১৩৬৬।

চুরু ॥ দৌলতরাম শরণ (জ) ২৫৯৫৯২; মোহম্মদ উসমান আরিফ (ক) ১০৬৭০১।

বিকানীর ॥ হরিরাম মক্কাসার (জ) ২১১৪৩৬; রামচন্দ্র চৌধুরী (ক) ১১৪১৯২।

বারমের ॥ তন সিং (জ) ১১১৫৭৪; খেত সিং (ক) ১০৩২৪৯।

ঝুনঝুনু ॥ কানহাইয়া লাল (জ) ২৩৩৭৩৪; শিবনাথ সিং (ক) ১০৬৭৮৩।

ভিলওয়ারা ॥ রূপলাল সোমানি (জ) ২২৭৬৪৯; রামপ্রসাদ লাধা (ক) ৯৯২৫৭।

যোধপুর ॥ রণছোড় দাস গাট্টানি (জ) ১৭৪২২৫; পুনমচাঁদ বিশনয় (ক) ১৫২৬০০।

বায়ানা ॥ শ্যামসুন্দর লাল (জ) ২১৩৮৬২; জগন্নাথ পাহাড়িয়া (ক) ৯৭১৯৪।

আজমীর ॥ শ্রীকরণ শারদা (জ) ২১২২৮৪; বিশ্বেশ্বর নাথ (ক) ১০৮০৩৬।

জালোর ॥ হুকুম রাম (জ) ১৬৮২৬০; বিদা রাম (ক) ১১২২৫৮।

সাওয়াই মাধোপুর ॥ মীঠালাল মীনা (জ) ২১৪১২৫; চুট্টনলাল (ক) ৮৮৩১৫।

কোটা ॥ কৃষ্ণকুমার গোয়েল (জ) ২৪১৮৩৫; কিরীট ভাই (ক) ৯২৪৫১।

আলোয়ার ॥ রামজীলাল যাদব (জ) ২,৩৪,১৫১; হরিপ্রসাদ শর্মা (ক) ৬১,৬৭৩।

গঙ্গানগর ॥ বেগা রাম (জ) ২,০৪,৮১২; বীরবল (ক) ১,৩৯,৪৫৭।

ভরতপুর ॥ রামকিষণ (জ) ২,৫৬,৮৮৭; রাজবাহাদুর (ক) ১,০০,৩৯৭।

জয়পুর ॥ শ্রীকরণ শারদা (জ)......; এন ভারগোয়া (ক)......।

বিরোধী নেতা : ওয়াই বি চবন

শিকার ॥ জগদীশ ওরাসাদ (জ)......; শ্রীকিষণ (ক)......।

ভাউসা ॥ নাথু সিং (জ)......; নওলকিশোর শর্মা (ক)......।

পাঞ্জাব—১৩

সাংরুর ॥ সুরজিৎ সিং বার্নালা (আ) ২৯১৩৭১; রণজিৎ সিং (ক) ১২৬৩২২।

ভাতিন্দা ॥ ধান্না সিং গুলশান (আ) ২৬২৮৬৪; গুলজার সিং (ক) ৮৭৫৫৩।

লুধিয়ানা ॥ জগদেব সিং তালওয়ান্দি (আ) ২৯৬১১৯; দেবিন্দার সিং গরচা (ক) ১৯২৫২৫।

আম্বালা ॥ সুরয ভান (জ) ২৬৪৫৯০; রাম পরকাশ (ক) ৯৯০৯৬।

জলন্ধর ॥ ইকবাল সিং ধীলন (আ) ২৬১৫৫৮; স্বরণ সিং (ক) ১৪৩৪৫০।

তর্ন তারন ॥ জাঠেদার মোহন সিং টুর (আ) ২,৫৭,২৮৩; জি এস ধীলন (ক) ১,৭৭,৩১৩।

ফরিদকোট ॥ পরকাশ সিং বাদল (আ) ২,৮২,৭১৩; অবতার সিং (ক) ১,৮২,০১২।

ফিরোজপুর ॥ নির্বাচন পরে হবে।

হোসিয়ারপুর ॥ বলবীর সিং (জ)......; দরবারা সিং (ক)......।

অমৃতসর ॥ বলদেব প্রকাশ (জ)......; ......(ক)......।

পাতিয়ালা ॥ গুরুচরণ সিং (আ)......; ......।

রোপার ॥ বসন্তসিং খালসা (আ)......; বুটা সিং (ক)......।

ফিল্লাউর ॥ ভগৎ রাম (কম-মা) ২৭৬৯৭৩; গুরুচরণ দাস (ক) ১২৭৯৪২।

হরিয়ানা—১০

সোনেপট ॥ মুখতিয়ার সিং (জ) ৩৪৬৯০০; সুভাষিণী (ক) ৬৬৬৭৭।

শিরসা ॥ চাঁদ রাম (জ) ২৭০৮৬১; দলবীর সিং (ক) ১১৭৬৯৩।

কার্নাল ॥ ভাগওয়াৎ দয়াল (জ) ৩৪০৯৬১; জগদীশ প্রসাদ (ক) ৬৪১২৫।

রোহটক ॥ শের সিং (জ) ৩,২০,৫৫০; ফুল সিং (ক) ৬০,৯০৫।

ফরিদাবাদ ॥ ধরম বীর বশিষ্ঠ (জ) ১,৮৪,৯৪৮; খুরশীদ আহমেদ (নি) ১,৫৭,৬১৫।

মহেন্দ্রগড় ॥ মনোহর লাল (জ) ২,৫৫,৮৮১; বীরেন্দর সিং (জ) ১,৯২,৮৬৭।

কুরুক্ষেত্র ॥ রাঘবীর সিং (জ) ৩,২২,১৬৪; দেব দত্ত (ক) ৭১,৩২২।

ভিওয়ানি ॥ চন্দ্রাবতী (জ) ২,৮৯,১৩৫; বংশীলাল (ক) ১,২৭,৮৯৩।

হিসার ॥ ইন্দার সিং (জ) ৩,২২,৪৫৬; যশোবন্ত সিং (ক) ৭৯,০৭২।

গুরুদাসপুর ॥ যজ্ঞদত্ত শর্মা (জ) ২,০৪,৮০২; প্রবোধ চন্দর (ক) ১,৭৬,৬৮০।

জম্মু ও কাশ্মীর—৬

অনন্তনাগ ॥ মোহম্মদ সফি কুরেশী (ক) ৭৯৬৬৯; আব্দুল রাজ্জাক মীর (নি) ৭১৪০৬।

উধমপুর ॥ করণ সিং (ক) ১৩০২৭২; ওমপ্রকাশ সরফ (জ) ৭১৩১৬।

লাডাখ ॥ পরে নির্বাচন হবে।

বরামুল্লা ॥ আবদুল আহাদ ভাকল (এন) ১৪৭২২২; সৈয়দ আলি শাহ জিলানি (নি) ১০০২০২।

শ্রীনগর ॥ আকবর জাহান বেগম (এন) ২,১০,০৭২; মৌলানা ইফতিকার হুসেন (নি) ৮৭,৪৩১।

জম্মু ॥ বলদেব সিং (নি) ১,৫৩,৮৩৭; বলরাজ পুরী (এন) ১,২৫,৮৯৮।

আন্দামান ও নিকোবর—১

আন্দামান ও নিকোবর ॥ মনোরঞ্জন ভক্ত (ক)......; কে আর গণেশ (গ-ক)......।

গোয়া দমন দিউ—২

পানাজি ॥ শিবরাম অমৃত কাসব (এম) ৬৬,৯৩৩; পুরুষোত্তম কাকোদকর (ক) ৫৫,৮৬৭।

মোর্মুগাও ॥ এফ ই মার্টিনহো (ক) ৬১,২৮৩; আর ডি ফ্রান্সিসকো (এম এ) জি) ৫১,৮১৫।

হিমাচল প্রদেশ—৪

মান্ডি ॥ নির্বাচন পরে হবে।

সিমলা ॥ বালক রাম (জ) ১৭২৭৬৩; জালাম সিং (ক) ৮৫৪৭২।

কাংড়া ॥ দুর্গা চাঁদ (জ) ১৫৭৮৩২; বিক্রম মহাজন (ক) ১১৮৮২৮।

হামিরপুর ॥ রণজিৎ সিং (জ)......; ......(ক)......।

মিজোরাম ১

মিজোরাম ॥ আর তোথুয়ামা (নি)......; ......।

আসামের ১টি, দিল্লির ৪টি, হিমাচল প্রদেশের ১টি, রাজস্থানের ৩টি, বিহারের ২টি, পাঞ্জাবের ৪টি, মিজোরামের ১টি, উত্তর প্রদেশের ৩টি, মধ্যপ্রদেশের ৩টি এবং আন্দামান ও নিকোবরের ১টি আসনে বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর শুধুমাত্র নাম ও দলগত পরিচয় দেওয়া হয়েছে; তাঁদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা জানা যায়নি বলে দেওয়া গেল না।

এ ছাড়া, উত্তরপ্রদেশের ৩টি কর্ণাটকের ১টি মধ্যপ্রদেশের ২টি, মহারাষ্ট্রের ৮টি, রাজস্থানের ৩টি এবং গুজরাটের ১টি আসনের বিস্তারিত ফলাফলও পাওয়া যায়নি।

সংকলক : রাধাকান্ত শী

কোথায় কারা কত আসন পেলেন

রাজ্য	জনতা	কংগ্রেস	সি এফ ডি	সি পি আই এম	এ ডি এম কে	আকালি	সি পি আই	অন্যান্য দল	নির্দল
অন্ধ্র	১	৪১							
আসাম	৩	১০							১
উড়িষ্যা	১৪	৪	১	১					১
উত্তরপ্রদেশ	৭১	[illegible]	১৪						
কর্ণাটক	২	১৬							
কেরল		১১					৪	৫	
গুজরাট	১৬	১০							
জম্মু ও কাশ্মীর*		২						২	১
তামিলনাড়ু	৩	১৪			১৮		৩	১	
ত্রিপুরা		১	১						
নাগাল্যান্ড								১	
পশ্চিমবঙ্গ	১১	৩	৩	১৭				৬	২
পাঞ্জাব*	৩			১		৮			
বিহার	৪৬		৮						
মধ্যপ্রদেশ	৩৭	১						১	১
মণিপুর		২							
মহারাষ্ট্র	১৯	২০		৩				৬	
মেঘালয়		১						১	
রাজস্থান	২৪	১							
সিকিম		১							
হরিয়ানা	১০								
হিমাচল*	৩								
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল									
অরুণাচল		১							১
আন্দামান ও নিকোবর		১							
গোয়া দমন দিউ		১						১	
চণ্ডীগড়	১								
দাদরা ও নগর হাভেলি		১							
দিল্লী	৬		১						
পণ্ডিচেরি					১				
মিজোরাম									১
লাক্ষাদ্বীপ		১							
মোট	২৭০	১৫৩	২৮	২২	১৯	৮	৭	২৪	৮

* এই রাজ্যগুলিতে একটি করে আসনে নির্বাচন পরে হবে।

॥ ৬৪ ॥

পপি বিশোয়াসের সুদীর্ঘ তনুদেহের দিকে আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে আছি। পপির শেষ কথাগুলো আমার কানে বাজছে: "সুলেখা সেন যে আজ সকালে বিদায় হয়েছে তা জানি। এখন লক্ষ্মীটি, মিস্টার শংকর, চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটা আমাকে দিন।"

মনে মনে আমি ডায়ালগ তৈরি করছি। নিঃশব্দে পপি বিশোয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি রিহার্সাল দিচ্ছি: "পপি বিশোয়াস, তুমি কে হে? তোমাকে তো আমি চিনি না জানি না। কোন্ অধিকারে সোজা আমার ঘরে ঢুকে এসে তুমি এই ভাবে চৌত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি চাইবার সাহস দেখাচ্ছ?"

পপি বিশোয়াস আমার নীরবতার অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। সর্বত্র বিজয়িনী হওয়াটা বোধ হয় তাঁর এমনই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে পপি অল্পক্ষণেই অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

পপি ভাবছেন আমি বোধ হয় স্রেফ কুঁড়েমি করেই চুপচাপ বসে আছি। ছটফটে পপি একটু আদুরেভাবেই অভিযোগ করলেন, "এখনও শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করছে বুঝি? দুপুর বেলায় কী করে ঘুমোন, মিস্টার শংকর?"

বোধ হয় পপি বিশোয়াসের হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমি পুরুষমানুষ। ঠোঁট উল্টে বললেন, "আপনারা পুরুষমানুষ! আপনাদের দুপুরে ঘুমোনোও মাপ। মেয়েদের কথা বলবেন না। চোখে ঘুম জড়িয়ে এলেও জলের ঝাপটা দিয়ে দুপুরে জেগে থাকতে হয়। দিবানিদ্রা মেয়েদের ফিগারের বারোটা বাজায়। ওই যে সুলেখা সেন। আমি শুনেছি, দুপুরেও চান্স পেলে ঘুমিয়ে নেয়। কয়েকটা মাস যাক—তারপর কী হয় দেখবেন! ফিগারের যদি টুয়েলভ-ও-ক্লক না বাজে তো কী বলেছি!"

আমি এখনও নিরুত্তর।

কিন্তু পপি বিশোয়াসের নিদ্রাভাষ্য সহজে বন্ধ হলো না। তিনি বলে চললেন, "আপনারা পুরুষমানুষেরা বেশ আছেন। দুপুর বেলায় ঘুমুলে আপনাদেরও পেটের কাছে নেয়াপাতি ভাব জমা পড়ে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। পুরুষমানুষদের একমাত্র ইমপর্টান্ট ফিগার হলো ব্যাঙ্ক ফিগার আর মেয়েদের বডির ফিগার।"

মুখের হাসি চাপা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। পপি বিশোয়াস তা লক্ষ করে উল্লসিত হলেন এবং একতরফা কথার বেগ আরও বাড়িয়ে দিলেন।

ঠোঁট আর একবার উল্টে পপি বললেন, "একথা আমি মিস্টার জেঠমালানিকেও বলেছি—কিন্তু তিনি হাসেন নি। বরং গম্ভীরভাবে আমাকে তারিফ করেছেন সত্যি কথা বলবার জন্যে।"

আমাকে এখনও চৌত্রিশ নম্বরের চাবি সম্বন্ধে তৎপর না হয়ে উঠতে দেখে পপি বিশোয়াস একটু অবাক হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, "কী হাঙ্গামা বলুন তো। এসব আমার মোটেই ভাল লাগে না। জেঠমালানিদের ওখান থেকে খবর দিল, কোনো অসুবিধে হবে না। সব টিপ টপ থাকবে। থ্যাকারে ম্যানসনেই চাবি রয়েছে। চাইলেই পাওয়া যাবে।"

আমি মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ছক কাটতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই সময় নীরবতাই সবচেয়ে নিরাপদ।

পপি বিশোয়াস বলে চললেন 'এখানে এসে কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঐ সুলেখা মেয়েটা যেন কেমন! কাকে কী দিয়ে গেছে ঠিক-ঠিকানা নেই।"

আমি এবার গম্ভীরভাবে উত্তর দিই, এ-ব্যাপারে ম্যানসন বাড়ির ম্যানেজারের কী করবার থাকতে পারে? সুলেখা সেনের কাজ-কর্মের জবাবদিহি করার দায়িত্ব নিশ্চয় আমার নয়।

আমার কথাগুলো কিন্তু মিসেস বিশোয়াসের কানে ঢুকলোই না। তিনি আপন মনে বলে চললেন, "কোথাও গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা আমার অভ্যেস নয়। মিস্টার জেঠমালানির ব্যাপারটাও বুঝি না। এতো বড়ো ফ্ল্যাট রেখেছেন, অথচ একটা সব-সময়ের চাকর রাখেননি। সব কাজ কী আর পার্ট-টাইম লোক দিয়ে হয়? ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার করে লাভ কী তোদের? কিছু মনে করবেন না ভাই..."

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিবেদনের আগে কুশলী পপি বিশোয়াস আমার কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। কী এমন ব্যাপার, যাতে আমার মনে করবার থাকতে পারে? আমার সম্পূর্ণ দৃষ্টি স্বভাবতই পপি বিশোয়াসের মুখের ওপর সংহত হলো।

আরো একটা সিগারেটে পাঁপ বিশো-য়াসের সুন্দর মুখে প্রজ্বলিত হলো। কুমারী সিগারেটের প্রথম টানটি যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করলেন পাঁপ। তারপর বললেন, "এই ইণ্ডিয়ানদের কথা বলছি। যত বড়লোকই হোক, নজর বড্ড নিচু হয়। মানুষের দাম, কাজের দাম, প্রাণ থাকলে দিতে চায় না। বাড়ির ঝি-চাকরের রেটে সবাইকে মাইনে দিতে পারলেই খুশী হয়। সায়েবদের ব্যাপারটা কিন্তু আলাদা। যত ছোট প্রতিষ্ঠানের সায়েব হোক, আমি তো দেখছি, ওরা মানুষের দাম কমাতে ব্যস্ত নয়। এই তো গতকালই এক ইংরেজ ছোকরা এসে-ছিল আমাদের বুটিকে গার্ল ফ্রেন্ডের সন্ধানে।"

দ্বিতীয় কিস্তি সিগারেটের ধোঁয়া উপভোগ করলেন পাঁপ বিশোয়াস। তারপর বলে চললেন, "আমাদের লোলিতা, এদিকে এত স্মার্ট, কিন্তু পার্টি দেখে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, দাম অনেক কমিয়ে বলেছে। ইণ্ডিয়ান হলে, এর পরেও দরদস্তুর করতো এবং যাবার সময় বড় জোর ঐটুকু পয়সা ফেলে কেটে পড়তো। কিন্তু সায়েবের কথা শুনুন..."

পাঁপ বিশোয়াস তৃতীয়বার সিগারেটের ধূমপান করলেন, এবং শান্তভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রশস্তি গাইলেন, "সায়েবদের কথাই আলাদা সাধে কি আর আমরা ওদের টপ প্রেফারেন্স দিই।"

আমি ওঁর মুখের দিকে আবার তাকা-লাম। পাঁপ পুনরাবৃত্তি করলেন, "ঠিকই বলছি। চাকরি-বাকরি থেকে আরম্ভ করে আমাদের লাইনের কাজে-কর্মে সব জায়গায় ফরেন কোম্পানি এবং ফরেন পার্টির ফার্স্ট প্রেফারেন্স। এই আপনি। এখন যদি ফরেন কোনো কোম্পানিতে কাজ পান,
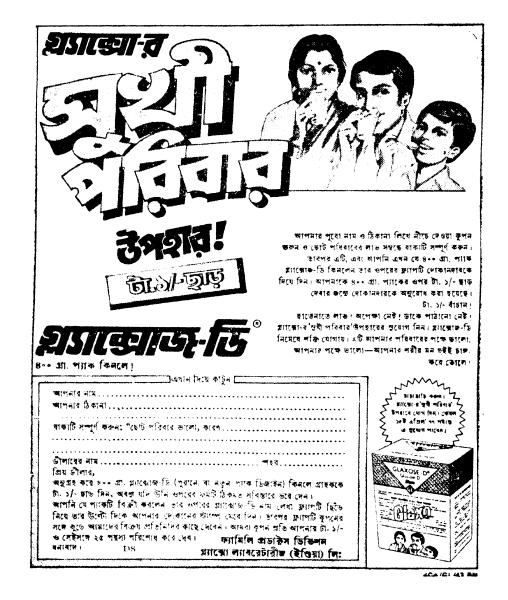
তা হলে কী এখানে বসে থাকবেন?"

চাকরির ব্যাপারটা আমাকে অকারণে সুড়সুড়ি দেয়। এ-ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, এই বুঝি সত্যিই কোনো দশটা-পাঁচটার নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি জুটে গেল।

পপি বিশোয়াস আবার আরম্ভ করলেন, "যা বলছিলুম, আমাদের সায়েব গেস্টের কথা। লোলিতার কাজেকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে সায়েব তো চারগুণ টাকা বার করে ফেললেন। লোলিতা প্রথমে ভাবলে সায়েব হিসেবে ভুল করছেন। নতুন ফরেনারদের ওরকম হয় থাকে, টাকার সঙ্গে পাউন্ড বা ডলারের অংক ঠিক মেলাতে পারে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমার টিমের মেয়েরা খুব অনেস্ট।"

একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে নিলেন পপি বিশোয়াস। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, "লোলিতা বোকার মতো সায়েবকে বলে ফেলেছে, তুমি ঠিকভাবে গুনেছ তো?" সায়েব সঙ্গে-সঙ্গে বলেছেন, আমি অঙ্কে খুবই স্ট্রং। কিন্তু তোমাকে আমি নির্লজ্জভাবে কম দিতে চাই না। লোলিতা মেয়েটা তো এখনও কচি আছে—এতো কম সার্ভিসের জন্যে এত টাকা সে কখনও দেখেনি। তাই একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল সে। একটু বোধ হয় ভয়ও পেয়েছিল—বেশী টাকার লেনদেন ঘটিয়ে অন্য কোনো গোলমালে ফেলবে কিনা।"

"অন্য কী গোলমাল?" আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হই।

একটু হেসে পপি বিশোয়াস বললেন, "কত রকমের গোলমাল। আমাদের লাইনে কি গোলমালের শেষ আছে! এই ধরুন চোরা চালান, কিংবা প্রাইভেট খবরাখবর জোগাড় করা। তাছাড়াও পার্সোনাল অনেক গোলমেলে ব্যাপার থাকে...সেসব বিবরণ মুখ ফুটে পুরুষ মানুষকে বলা যায় না। তবে আমার মেয়েদের এসব ব্যাপারে পই-পই করে ট্রেনিং দেওয়া থাকে। বেশী পয়সার লোভে গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে বিপদ ডেকে আনবে না, বা শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট করো না। আমার পলিসি হলো, সোজা পথে থেকে অনেস্টলি আর পাঁচজনের মতো যতটা পারো রোজগার করো।"

আমি অবাক হয়ে পপি বিশোয়াসের কথা শুনে যাচ্ছি। প্রায় অপরিচিতা কোনো মহিলা যে এইভাবে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেতে পারেন তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

সিগারেটের শেষ ধোঁয়া ছাড়লেন পপি বিশোয়াস। তারপর সগর্বে নিবেদন করলেন, "আমার পলিসির কথা আমার আন্ডারের মেয়েরা জানে। কত মেয়েই তো এই একটি কারণেই অন্য জায়গায় মোটা রোজগার ছেড়ে দুদণ্ডের শান্তির জন্যে আমার কাছে আসতে চায়, মিস্টার শংকর।"

পপি বিশোয়াস যে নিজের বিজনেস-পলিসি সম্বন্ধে খুবই গর্বিতা সে বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ পোষণের সুযোগ নেই।

বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি লোলিতা প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা চালাতে লাগলেন। "লোলিতা হাজার হোক আমার নিজের হাতে গড়ে-পিটে তৈরি-করা মেয়ে। সে অতগুলো নোট দেখে স্বভাবতই একটু সন্দেহ করেছে। কিন্তু সায়েব ছেলেটা সোজাসুজি আদর করে বলেছেন 'তোমাকে আমি বেশী কিছু দিচ্ছি না, মিস্ ইন্ডিয়া। আমার নিজের দেশে ডবল পয়সা দিয়েও এর হাফ সার্ভিস পাওয়া যাবে না।'"

প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন পপি বিশোয়াস। "এসব কথা শুনে এক এক সময় ইচ্ছে হয় এক্সপোর্ট লাইনেই চলে যাই। তা হলে, আপনাদেরও আর এইভাবে জ্বালাতন করতে হয় না।"

পপি বিশোয়াস হয়তো ভেবেছিলেন, এবার আমি ক্ষমাপ্রার্থী হবো এবং ওঁর মূল্য বুঝে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনস্কামনা সফল করতে সহযোগিতার হাত এগিয়ে দেবো।

কিন্তু আমি এখনও মনস্থির করে উঠতে পারি নি। মনে মনে বিভিন্ন কাল্পনিক পরিস্থিতি নিয়ে রিহার্সাল দিয়ে চলেছি।

পপি বিশোয়াস এখনও অধৈর্য হয়ে উঠলেন না। আমাকে এখনও কোনো প্রত্যুত্তর দিতে না-দেখে পুরনো গল্পটার রেশ টেনে চললেন—"তা হলে সায়েবদের গুণ দেখুন। দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্যে

মিথ্যে কথা বলতে পারতো। কিন্তু ওদের মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের মতো জিলিপির প্যাঁচ নেই। আমার ফার্স্ট হাজবেন্ড বলতেন, জিলিপির মতো প্যাঁচালো খাবার ইণ্ডিয়া ছাড়া ওয়ার্ল্ডের আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর জিলিপিই একমাত্র খাবার যার সর্বভারতীয় ক্যারাকটার আছে—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা যেখানেই যাবেন সেথ নেই জিলিপি পাবেন।"

পাঁপ বিশোয়াস এবার আড়চোখে নিজের মনিবন্ধে বন্দী ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তাঁর সময়সূচী যে আমার অকারণ নিষ্কর্মে বিলম্বিত হচ্ছে তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি।

পাঁপ বিশোয়াস এবার সোজাসুজি বিজনেস টক আরম্ভ করলেন। পাঁপ চেয়ারের ওপর একটু হেলে পড়ে বললেন, "মিস্টার শংকর, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। আস্তে আস্তে সব হবে। কিন্তু এখন চৌত্রিশ নম্বরের চাবিটার একটা গতি করুন, প্লিজ!" শেষ শব্দটা জিভের ওপর এমনভাবে গড়িয়ে দিলেন তিনি যে অনেকক্ষণ কানে বাজতে লাগলো।

পাঁপ বিশোয়াসকে এইভাবে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এবার আমার কঠিন হবার পালা। কিন্তু নিজের এই ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না।

সুতরাং পাঁপ বিশোয়াসকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে বাক্‌যুদ্ধে নামতে হলো। সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে পাঁপ বিশোয়াস থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করলাম। বললাম, "একটু পরে আমার সঙ্গে নিচের অফিসঘরে দেখা করলে ভাল হয়।"

আমার অপ্রত্যাশিত উত্তরে পাঁপ বিশোয়াস বোধ হয় একটু বেশী আশ্চর্য হলেন। তিনি ভ্রূ কাঁপিয়ে আধো-আধো সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো, মিঃ শংকর?"

আমি এবার আরও গম্ভীর হয়ে বললাম, "এটা প্রাইভেট ঘর। এখানে মেয়েদের আসাটা ঠিক শোভন নয়।"

এবার লজ্জায় জিভ কাটলেন পাঁপ বিশোয়াস। "ওমা! মেয়েদের এখানে 'নো অ্যাডমিশন' বুঝি! বলবেন তো এতোক্ষণ! আপনার এই বেয়ারাটাও কী রকম? একটা টাকা বকশিস পেয়ে মাথা ঘুরে গেল—সমস্ত আইন-কানুন ভঙ্গ করে সোজা আমাকে এখানকার পথ দেখিয়ে দিল!"

আমি কোনোরকম প্রতিবাদ করছি না। পাঁপ বিশোয়াসদের মোটেই বিশ্বাস নেই। এঁরা চটলে অনেক রকম অপকর্ম করতে পারেন। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তিনি এখান থেকে সরে অফিস ঘরে চলে যান ততই মঙ্গল।

পাঁপ বিশোয়াস বোধ হয় ভেবেছিলেন এবার আমি একটু নরম হবো। কিন্তু আমাকে অটল দেখে মনে মনে তাঁর রাগ বাড়ছে।

গলার সুরে চাপা ব্যঙ্গ মিশিয়ে পাঁপ মন্তব্য করলেন, "কী করে জানবো, মিস্টার শংকর, যে এখানে মেয়েদের পা পড়ে না? জানলে, কে আর সেধে অপমান হতো বলুন?"

এবার পাঁপ বিশোয়াস হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর দৃষ্টি যে পেশাদার ডিটেকটিভ থেকেও প্রখর তার প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত হলাম। আমার ঘরের এক কোণে পেরেকের গায়ে পাঁপ বিশোয়াস কী যেন আবিষ্কার করে সবিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেওয়ালের কোণে আমার চোখ যেখানে গিয়ে পড়লো সেখানে মেয়েদের একটি লাল সিল্কের রিবন শোভা পাচ্ছে। আমার ঘরে চুলের এই রিবন শোভা পাবার কোনো যুক্তি নেই। অকস্মাৎ মনে পড়লো সে-রাত্রে সুলেখার বেণীতে সুদৃশ্য লাল ফিতে শোভা পাচ্ছিল। সেদিন বাবার সঙ্গে রাত কাটাবার সময় সুলেখা নিশ্চয় ফিতেটা খুলে পেরেকের গায়ে টাঙিয়ে রেখেছিল। তারপর সকালে তাড়াতাড়িতে ওটা নিয়ে যাবার কথা সে ভুলেই গিয়েছে।

লাল সিল্কের ওই ফিতেটুকু কোনো রমণীর দৈহিক উপস্থিতির অস্বস্তিকর সাক্ষ্যরূপে ওখানে এই মুহূর্তে হাওয়ায় দুলছে। ফিতেটা এতক্ষণেও আমার নজরে পড়েনি, অথচ কত সহজে পাঁপ বিশোয়াসের সন্ধানী রাডারে ওটির অস্তিত্ব ধরা পড়লো।

পাঁপ বিশোয়াস মুচকি হেসে এমনভাবে তাকালেন যেন আমার ভিতরটা এক্স-রে আলোয় দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। পাঁপর চোখের তারাগুলো উজ্জ্বল রঙীন বিজলী বাতির মতো কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়ে জ্বললো আর নিভলো। তারপর পাঁপ বিশোয়াস এমনভাবে চোখের ইঙ্গিত করলেন। যার অর্থঃ "আমার কিছুই বুঝতে বাকী নেই।"

বেশ অস্বস্তি বোধ করছি। পাঁপ বিশোয়াস কী বুঝতে পারছেন ওই সিঁদুরে লাল রঙের ফিতেটা কার কবরীতে এতোদিন শোভা পেয়েছে?

পাঁপ বিশোয়াস নিজেই এবার ফিতের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং ওটিকে ওখান থেকে নামিয়ে এনে আমার সামনে রেখে ফিক করে হেসে বললেন, "হয়তো ঝড়ে উড়ে এসেছে বাইরে থেকে!"

কোনোরকম উত্তর দেবার ক্ষমতা এই মুহূর্তে আমার নেই। ইতিমধ্যে পাঁপ বিশোয়াস আবার মিষ্টি হাসলেন এবং আমাকে বেশ একটু প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, "আমি আপিসেই যাচ্ছি। ওখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

লাল ফিতেটা [illegible] পুনর্মিলন দৃশ্যকে আর একবার আমার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলো। আরও কিছুক্ষণ ওই দিকে তাকিয়ে থাকলাম, কিন্তু চেষ্টা করেও অসাবধানী সীমার ওপর রাগ করতে পারলাম না। ভাবছি ওটা আজই সীমার পিসির ঠিকানায় ডাকে পাঠিয়ে দেবো। কেউ যদি ভুলে কিছু ফেলে যায় সেটা ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব তো গৃহস্বামীর।

কিন্তু এসব ভাববার সময় এখন নয়। নিচে অফিস ঘরে পাঁপ বিশোয়াস তো আমার জন্যে সময় গুনছেন।

পাঁপ বিশোয়াস আপিস ঘরে একা বসে নেই। দূর থেকে দেখলাম, রামসিংহাসনের সঙ্গে তিনি বেশ আলাপ জমিয়েছেন। দুজনে বেশ আলোচনা চলেছে। আমাকে দেখেই [illegible] গল্প-করা বন্ধ হলো। আমার হাতেই পাঁপ বিশোয়াসের

দায়িত্ব দিয়ে সে নিজের কাজে বেরিয়ে গেল।

এই সব লোকের সঙ্গে বিরাধীপক্ষকে অন্তরঙ্গ হতে দেখলেই আজকাল আমার চিন্তা হয়। ভিতরের খবর কতখানি বাইরে চলে গিয়েছে তা আন্দাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

পপি বিশোয়াস কী এরই মধ্যে দেহের ওপর আরও এক প্রস্থ সুগন্ধি স্প্রে করেছেন? কারণ সেন্টের মিষ্টি গন্ধ যেন হঠাৎ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। একগাল হেসে পপি বললেন, "আমি আবার মুখে চাবি দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। ইস্কুলে এর জন্যে ক্লাশ টিচার আমার নামে রিটেন কমপ্লেন পর্যন্ত করেছেন। সামনে যাকে পাই তার সঙ্গে কথা বলতে হয় আমাকে—হাতের গোড়ার কাউকে না পেয়ে আপনাদের রাম সিংহ সনকে পাকড়েছিলাম। ভারি ভদ্র লোক। বললে, আপনি বসুন। ম্যানেজার সায়েব এলেন বলে।"

এবার আর বিশেষ বাড়তি কথাবার্তা নয়। পপি বিশোয়াস আমার দিকে তাকিয়েই বিজনেস টক শুরু করলেন। পপি বললেন, "দেখুন, মিস্টার শংকর, টেলিফোনে জেঠমালানি হাউস থেকে আমাকে যা-বলা হয়েছিল, এখানে এলেই চাবি পাওয়া যাবে। বুঝতেই পারছেন, দরজায় দরজায় চাবি ভিক্ষে করাটা আমার বিজনেস নয়। কত পার্টি গাড়ি পাঠিয়ে, সাজানো গেস্ট হাউসের সমস্ত ফেসিলিটি দেখিয়ে, সাধ্যসাধনা করে—তবু আমাকে পায় না।"

আত্মপ্রচার পর্ব শেষ করে পপি অভিযোগ করলেন, "এখানে এসে চাকরের কাছে খোঁজ করে জানলাম, চাবি আপনার জিম্মায় চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন আমার সময় বেশী নেই। স্পেশাল গেস্টের জন্যে ব্যবস্থা আমাকে পাকা করতে হবে। তাই নিজেই ছুটে এসেছি। আজকাল নিজে আমি আর কাজকর্ম বড় একটা করি না—সবই অন্য অন্য মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। ওদের দু'একজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছি। তবে মাঝে-মাঝে দু'একটা কাজ নিতে হয়—মেয়েদের দেখাবার জন্যে যে আমি এখনও অচল অধুলি হইনি। তাছাড়া খুব ইমপর্টান্ট পার্টি হলে নিজের ঘাড়ে বোঝা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।"

বিনা দ্বিধায় পপি বিশোয়াস তাঁর 'কাজ'-এর কথাগুলো কেমন হুড়হুড় করে বলে চলেছেন।

পপি বললেন, "মিস্টার জেঠমলানি আজকের ব্যাপারে সব জানেন। ওঁর নিজেরও একটু ইন্টারেস্ট আছে। বিশ্বাস না-হলে ওঁকে ফোন করে দেখুন। আমার প্রবলেম শুরু হলো দুপুরের দিকে। কিন্তু আমার স্পেশাল গেস্টকে আমার নিজের ফ্ল্যাট বা বুটিকের এয়ারকণ্ডিশন স্টোর রুমে আনতে চাই না। বড় জানাজানি হয়ে যায় আমার ওখানে। বহুলোকের নজর ওদিকে—কে আসছে, কে যাচ্ছে, সে নিয়ে রিসার্চ শুরু হয়ে যায়। আমার এই স্পেশাল গেস্টকে আমি রিসার্চের বাইরে রাখতে চাই। সেই সময় মিস্টার জেঠমালানির কথা মনে পড়লো। উনিও পার্টির পরিচয় শুনে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সুলেখার আজই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাবার কথা। সুতরাং আপনার কোনো অসুবিধে নেই।"

পপি আরও বললেন, "আমার গেস্টের কথা সব শুনলে আপনিও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝবেন। সেসব আপনাকে বলবোখন। এখন চাবিটা দিন, ফ্ল্যাটটা একবার নিজের চোখে দেখে নেই। এইসব সুলেখা-টুলেখার ওপর আমার তেমন ফেথ নেই—হয়তো গেস্ট হাউসকে ওয়ারহাউসের মতো অগোছাল করে রেখেছে।"

আমার মাথাটা একটু ঝিম-ঝিম করছে। পপি বিশোয়াস ভাবলেন, আমি বোধ হয় সন্দেহ করছি উনি জেঠমালানিরদের লোক নন। উনি বললেন, "আর সময় নেবেন না, মিস্টার শংকর। আমাদের সময়ের দাম খুব—টাইম ইজ মানি। লজ্জার কিছু নেই। আপনি আমার সামনেই জেঠমালানিকে ফোন করে দেখুন।"

অবশেষে আমাকে মুখ খুলতে হলো। তার আগে বারবার চেষ্টায় আমি নিজেকে শান্ত ও সংযত করে নিয়েছি। আমি বললাম, "মিসেস বিশ্বাস, আমি দুঃখিত। চৌত্রিশ নম্বরের চাবি এখন পাবার সম্ভাবনা আর নেই। যিনি ভাড়াটে তিনি এই ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

"কী বললেন?" বোমা ফাটলেও পপি বিশোয়াস এতোটা আশ্চর্য হতেন না।

ওঁর ও আদ-সাব থেকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে আমি মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

ক্রমশ

আপনার টিয়াঁরা কোনটি?

আপনি কি ভাবে আপনার শ্যাম্পু পছন্দ করেন? বোতলের আকৃতি দেখে? রংদেখে? অথবা গন্ধ শুঁকে ভালো লাগলে? শ্যাম্পু কেনার সময় মনে রাখবেন আপনার চুলের প্রয়োজনেই কিনছেন। সেইকারণে, বিভিন্ন প্রকারের চুলের জন্যে, টিয়ারা পাঁচটি বিভিন্ন প্রকারের শ্যাম্পু তৈরী করেছে। আপনার কোনটি প্রয়োজন, খুজে বেছে নিন

টিয়ারা এগ শ্যাম্পু:
নির্জীব ও কর্কশ চুলের জন্যে। তাজা ডিমের সংমিশ্রণে তৈরী, চুলের পক্ষে পুষ্টিকর এই শ্যাম্পু অ্যালবুমেন, মিনো এসিড, ও ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি'তে ভরপুর।

টিয়ারা শিকাকাই শ্যাম্পু:
সব রকম চুলের কোমল ও চিরাচরিত যত্নের জন্যে। প্রকৃতির স্বাভাবিক পুষ্টিকর উপাদান, আপনার চুলের জন্যে কত সহজে পাচ্ছেন।

টিয়ারা সুপার ফোম:
যাঁরা পয়সা বাঁচাতে চান, তাঁদের জন্যে। মাত্র একটুখানিতে অপর্য্যাপ্ত ফেনা হয়। —চুলকে নিখুঁতভাবে পরিষ্কার ও মোলায়েম করে।

টিয়ারা ল্যানোলীন শ্যাম্পু:
কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত চুলের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই শ্যাম্পু ঐরকমের চুলকেও বশে এনে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করে। চুল আরও নরম হয় এবং সহজেই সামলানো যায়।

টিয়ারা লেমন শ্যাম্পু:
টাটকা লেবু দিয়ে তৈরী—চুলের বাড়তি তেলকে বিনষ্ট করার প্রাকৃতিক উপায়। এর ফলে, চুলের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উপচে পড়ে।

টিয়ারা মানে একটি সুন্দর মুকুট। আমাদের শ্যাম্পুর নাম টিয়ারা. কারণ এটি আপনার চুলে সৌন্দর্য্যের মুকুট পরিয়ে দেয়।

ভারতে প্রস্তুতকারী: জে.কে. হেলেন কার্টিস লিমিটেড, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮

Interpub/JKC/1/76 BN

অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন:
স্প্যান্সার এণ্ড কোং লিমিটেড, মাদ্রাজ, ডি ওয়ালডী এণ্ড কোম্পানী (প্রাইভেট), লিমিটেড, কলিকাতা ও মার্কেটিং ডিভিশন, জে. কে. হেলেন কার্টিস লিমিটেড, বোম্বাই ও দিল্লী।

গীতিকার সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়

কিছুদিন আগে পরলোকগত প্রখ্যাত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার রায় একটু উত্তেজিতভাবেই আমার সঙ্গে দেখা করেন, তাঁর হাতে ছিল একটি মোটাসোটা সিনেমা পত্রিকা। এতে একটি প্রবন্ধে তাঁর পিতার রচিত একাধিক সুবিখ্যাত গান নাকি আর একজন গীতিকারের লেখা বলে উদ্ধৃত হয়েছে। এমন ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আগেও যে ঘটত না এমন নয়। হেমেন্দ্রকুমারের জীবিতকালেও এটা ঘটেছে। ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত "সুরলেখা" নামক তাঁর স্বরচিত গানের সংকলনগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলছেন—"গান লিখেছি প্রায় চারশোর কাছাকাছি। এও দেখছি আমার অনেক গান বাজারে চলছে এবং লোকে তার কোন কোনটির রচয়িতা বলে অন্যের নাম করে এবং কোন কোনটির রচয়িতা যে কে, তা কেউ জানে না। আবার আমার অনেক গানের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরে ছন্দভঙ্গ তো করে বটেই, সেই সঙ্গে রূপ বদলে উল্টো অর্থকেও প্রকাশ করে। এইসব নানা কারণে এই গানের বইখানা প্রকাশ করলুম। যদি আমার এই প্রথম গানের বইখানিকে পোকায় না কাটে তবে ক্রমে ক্রমে অন্য গান-গুলিও প্রকাশ করব।" কিন্তু বোধ করি আর কোন গানের সংগ্রহ তিনি জীবদ্দশায় প্রকাশ করে যেতে পারেননি। সেগুলিকে আজ একত্র করা কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দেশের বহু গীতিকারের সমগ্র গানের কোন সংকলন গ্রন্থ নেই। রেকর্ড কোম্পানীগুলির কাছ থেকেও এ বিষয়ে প্রায় কিছুমাত্র সহায়তা লাভ করা যায় না। অতএব একজনের রেকর্ড হামেশাই অন্যের নামে পরিচিত হয়ে চলেছে। "ডিসকোগ্রাফী" আমাদের দেশে খুব কমই দেখা যায়। বর্তমানে একমাত্র শ্রীমান কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য বহু বাধা সহ্য করেও এই কাজে অগ্রবর্তী রয়েছেন। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সুরকার কমল দাশগুপ্তের সুর দেওয়া ও গাওয়া রেকর্ড-তালিকাটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা বলে তাঁকে সাধুবাদ জানাই। আবার অতি উৎসাহীদের কল্যাণে বেশ কিছু জনপ্রিয় গান সাম্প্রতিককালে নজরুল ইসলামের গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এইসব অসাধু প্রচেষ্টা বা অজ্ঞতাজনিত ঘটনাগুলি নিতান্ত পীড়াদায়ক সন্দেহ নেই এবং এর একমাত্র প্রতিকার প্রখ্যাত গীতিকারদের নির্ভরযোগ্য গীতি সংগ্রহের প্রকাশ। এরকম কাজ আজকাল যে না হচ্ছে তা নয়, তবে এ বিষয়ে আরও ত্বরান্বিত হলেই ভাল হয়।

আমরা ইদানীংকালের অনেক গীতি-কারের কিছু কিছু সংবাদ রাখি, কিন্তু কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গানগুলি সম্বন্ধে খুব কম সংবাদই বর্তমানে পরিচিত। প্রদ্যোৎবাবুর কাছ থেকে জানা গেল তাঁর পিতা রেডিওর অনুমোদিত গীতিকার ছিলেন না, তাই আকাশবাণীর শিল্পীরাও তাঁর গান সম্বন্ধে কোন উৎসাহ পোষণ করেন না। অথচ আজ যে আমরা সিনেমা, থিয়েটার বা রেকর্ডে পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত গানগুলি শুনতে পাচ্ছি তার মূলে ছিলেন সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনি বহু যত্নে সে যুগের নট, নটী, গায়ক, গায়িকার কণ্ঠকে কাব্য সঙ্গীতের জন্য পরিমার্জিত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মত ব্যক্তিও এবিষয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কোন এক "দাসী"র (আজ বেঁচে থাকলে অবশ্যই "দেবী" হতেন) কণ্ঠে তাঁর একাধিক গান শুনলে বোঝা যাবে সে বিকৃতি কী পরিমাণের বিকৃতি। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরের সঙ্গে তেমন নিবিড়-ভাবে যুক্ত ছিলেন না কোনদিনই, রবীন্দ্রনাথ তো সাধারণ রঙ্গালয়ের ধারে কাছেও যান নি। অথচ হেমেন্দ্রকুমার প্রত্যক্ষভাবে এঁদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন, কিছুটা সামাজিক ভ্রূকুঞ্চন সহ্য করেও। বহু নটীও তাঁর বাড়িতে নিয়মিত এসেছেন এবং গান

শ নিয়েছেন। তিনিও তাঁদের অতি সমাদরে আতিথ্য প্রদান করেছেন।

হেমেন্দ্রকুমার যখন প্রমোদজগতের গানের দিকে আকৃষ্ট হন তখনও আমাদের দেশে গিরিশ বা গিরিশোত্তর যুগ চলেছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ নির্দেশে যেসব গান রচিত হয়েছিল সেগুলি অনেকাংশে বিকৃত হয়ে গিয়েছে। আমরা আমাদের কৈশোরে এরকম বহু গান রঙ্গালয়ে বা আসরে হতে শুনেছি; আজ নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম স্বরলিপির সঙ্গে তুলনা করে এইটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এমনকি দেবকণ্ঠ বাগচী নিজেও তাঁর শেষ বয়সে এই বিকৃতিকে রোধ করতে পারেননি। এই সময়ে সাধারণ পর্যায়ে গানের জগৎটাই ছিল এলোমেলো এবং লোকে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন।

হেমেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬৩ সালে। তিনি খুব অল্প বয়স থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীত ও অভিনয়ের জগতেও তাঁর পরিচিতি ঘটে। মোটামুটি দীর্ঘ জীবনে তিনি যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন

এবং যেভাবে তাঁর ধারণা গড়ে উঠেছিল তার বহু বিবরণই তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে গেছেন। এই পত্রিকাতেই বছর পনেরো ষোলো আগে "পূর্বপত্র" পর্যায়ে শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমেন্দ্রকুমারের সংগে একটি চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে সীতা নাটকে তাঁর অভিনয় নৃত্য পরিকল্পনার প্রসংগ ছিল। তাঁর আদর্শ ছিল অজন্তা ইলোরার দেহভঙ্গীগুলিকে নটীদের অঙ্গপ্রত্যংগে রূপায়িত করা। প্রদ্যোৎবাবু ও তাঁর পিতার কাছ থেকে শোনা সেই সব বৃত্তান্ত আমাকে শোনালেন।

গানের ক্ষেত্রেও তাঁর এইরকম একটি পরিচ্ছন্ন চিন্তা ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের সংগে নিবিড় পরিচয়ের ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রঙ্গালয় বা রেকর্ড উভয়ক্ষেত্রেই গতানুগতিক অপরিশীলিত ধারাগুলির পরিবর্তন আবশ্যক। এই বিশেষ আইডিয়া নিয়েই তিনি সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। এতে তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর গান করেছেন তাঁরাও সার্থকতার নতুন সোপান বেয়ে একটি উন্নততর প্রমোদজগতের সংগীতকে সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর "সুরলেখা" যখন বেরিয়েছে তখন অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে বিরাজমান। তাঁর গাওয়া অত্যন্ত বিখ্যাত বেশ কয়েকটি গান এই বইটির অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে "অন্ধকারের অন্তরেতে, চোখের জলের মন ভিজিয়ে, ধরার মেয়ে ধরার মেয়ে, নয়ন যদিন রইবে বেঁচে, বঁধু চরণ ধরে বারণ করি, মনকুসুমের রং ভরা এই পিচকারিটি রাধে" প্রভৃতি বিপুল জনপ্রিয় গান। দু চারটি গান ধীরেন দাস এবং হরিমতি নাম্নী গায়িকার কণ্ঠে রেকর্ড হয়েছিল। শচীন দেববর্মণ তখন সবে উঠতি গায়ক। "এই কাননের ফুল নিয়ে যাও" এই গানটি তিনি রেকর্ড করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর প্রথম রেকর্ড—"ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে" এই গানটিও হেমেন্দ্রকুমারের লেখা। প্রদ্যোৎবাবু জানালেন শচীন দেববর্মণের আর একটি বিখ্যাত গান "ও কালো মেঘ বলতে পার" এ গানটিও তাঁর পিতা লিখে দিয়েছিলেন। এগুলি এই গ্রন্থে নেই। কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠেও এমন অনেক গান আছে যা এই বইতে পাওয়া যাবে না, যথা—"মন নিয়েছে মনের ঠাকুর, মহারাজা একলা ঘরে মাতাল যেমন মদ পিয়াসী"—ইত্যাদি বহু সমাদৃত গান। উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে হেমেন্দ্রকুমার কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে করেছেন ;—"নবীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক সোদরোপম পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র দে অনুগ্রহ করে আমার অনেকগুলি গানে চমৎকার সুরসংযোগ করেছেন এবং তাঁর কবিত্বময় অপূর্ব কিন্নরকণ্ঠ আমার অনেক গানকে আশাতীতরূপে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তিনিই আমার গানের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম প্রচারক। এই জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী এবং দুটো মৌখিক শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে ঋণভার আমি হালকা করতে চাই না। ত্রিপুরার কুমার ও আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীন দেববর্মণ আর একজন উদীয়মান গায়ক। তিনিও আমার কয়েকটি গানে মধুর সুর দিয়েছেন এবং তাঁরও সুন্দর কণ্ঠের গুণে আমার কয়েকটি গান অনেকের কাছে পরিচিত হয়েছে। এছাড়া নানা নাটকের জন্য লিখেও গানগুলিতে স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কবিভ্রাতা নজরুল ইসলাম, স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রথীচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি সুর দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করেছেন। জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কোন কোন গানে সুর দিয়েছেন। কয়েকটি গানে আমি নিজেই সুর দিয়েছি।"

দুঃখের বিষয় যে কটি গানে হেমেন্দ্রকুমার নিজে সুর দিয়েছিলেন সেই সবকটি গানের যদি উল্লেখ করে যেতেন তাহলে ইতিহাসের দিক থেকে ভাল হত। হেমেন্দ্রকুমার একদা গান শিখেছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর একজন প্রধান শিষ্য মহীম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। অতএব গানের কান এবং সংগীত সম্বন্ধে ধারণা তাঁর খুবে প্রখর ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হেমেন্দ্রকুমারের এই সংকলন গ্রন্থটিতে এমন অনেক বিখ্যাত গান আছে যেগুলি উদ্ধৃত না করলেও চলে, কিন্তু কয়েকটি গান আছে যেগুলির সুর আমাদের মুগ্ধ করেছিল অথচ কারা এ গানগুলি রেকর্ড করেছিলেন তা আজ আর মনে নেই। মিস বীণাপাণির গাওয়া এই রকম একটি গান এই গ্রন্থে রয়েছে।

অধীর বাতাস বয়ে যায় সখি
কে আর ভরিবে জীবন ডালা
ঝরিয়া গিয়াছে মরমকুসুম
কি দিয়ে সজনী গাঁথিব মালা
আজো মনে আছে কতদিন আগে
সেধেছিল বাঁশী আদর সোহাগে
সে দুটি নয়ন মিলনপিয়াসী
সে দুটি অধর অমিয়ঢালা
সেই তো হাসিছে রূপালী চাঁদিনী
গেয়ে গেয়ে চলে নটিনী তটিনী
তবু কেন এই মোহন ভুবনে
আমারি ফুরালো গানের পালা

সংগীত মহলে গতিবিধির পরিচয় হেমেন্দ্রকুমার বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর "যাঁদের দেখেছি" নামক প্রসিদ্ধ এবং চিত্তাকর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থটি অনেকেই পড়েছেন তথাপি তাঁর বর্ণিত কয়েকটি বিশেষ চিত্র আবার তুলে ধরছি যাতে করে এই মানুষটি সংগীতরসে কতখানি অভিষিক্ত ছিলেন সেটি এক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া একটি সমগ্র যুগই যেন আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর চমৎকার বলবার ভঙ্গীতে।

প্রখ্যাত সরোদীয়া ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁর তিনি বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়িতে এক আসরে তাঁর বাজনা তিনি প্রথম শোনেন। আর একটি বৈঠকের মজাদার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

"আর এক নতুন বৈঠকেও প্রায়ই তাঁর দেখা পেতুম। সেখানে বৈঠকধারী ছিলেন লাইট হেভিওয়েট পৃথিবী জয়ী কুস্তিগীর বাংলার গৌরব শ্রীযতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবু। সেখানেও যখন তখন বসত গান বাজনার আসর। আগে জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেব ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতির গান হত, তারপর খাঁ সাহেব বার করতেন তাঁর মোহনীয়া বীণা। একদিন গানের পর আরম্ভ হল খাঁ সাহেবের সাধের বীণায় হাসি-কান্নার অভিযান, সুরতরঙ্গের মধ্যে ফুলের মত ভেসে ভেসে উঠতে লাগল নবরসের সব রস। চিত্রার্পিতের মত বসে শুনতে শুনতে হঠাৎ দেখা গেল বেজে গিয়েছে রাত বারোটা। বাড়ির কথা ভেবে খাঁ সাহেবকে সেলাম করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম—সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে খাঁ সাহেব বাজনা থামিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ বিপুল বপু নিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একখানা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেলে বলে উঠলেন কোথায় যাবেন বাবুজী? বাজনা শেষ না হলে এখান থেকে যেতে পারবেন না।...বাধ্য হয়ে বসে পড়লুম, কারণ শিল্পীর মনে আঘাত দেওয়া পাপ। আবার বীণা তার বিচিত্র ভাষায় আলাপ করতে লাগল এবং সেই অপূর্ব আলাপ যখন বন্ধ হল রাত কাবার হতে আর দেরি নেই তখন।"

ভারতী পত্রিকার দপ্তরে তাঁদের একটা বড় রকমের আড্ডা ছিল। সে আড্ডার অনেক আখ্যায়িকার খবর অনেকেই দিয়েছেন; কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার একটি বিশেষ সংবাদ দিয়েছেন—"আমাদের নিয়মিত গায়ক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক অজিতকুমার চক্রবর্তী। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি অতুলপ্রসাদ সেনও সেই আসরে বসে গানের পর গান গেয়েছেন। নজরুল ইসলামও (তখন উদীয়মান) প্রায় এসে গলা ছাড়তেন। আর একটি খবর শুনলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল তুলি আর কলমই ধরেন না, গানের ধারও ধারেন, ভারতীর বৈঠকে এসে তিনি একাধিক স্বরচিত গানে নিজেই সুর সংযোগ করে গেয়ে আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানও শুনেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। এ সম্বন্ধে তিনি বলছেন—"সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন আমাদের পুরাতন বাড়িতে। মা এসে বল[illegible] তোর পড়বার ঘরে কে একটি ভদ্র[illegible] চমৎকার গান গাইছেন। বিস্মিত হয়ে [illegible] নেমে গিয়ে দেখি গালিচার উপর [illegible] ঠেসান দিয়ে বসে আপন মনে [illegible] গাইছেন শরৎচন্দ্রই। কণ্ঠস্বরে ওস্তা[illegible] ছাপ না থাকলেও বড় মিষ্ট গলা। [illegible]ও পারেন ভালো। কিন্তু আমার আবি[illegible] সঙ্গে সঙ্গেই গান থেমে গেল। ব[illegible]নুরোধেও আর গাইলেন না। এর পরে [illegible] আমার ঘরে এসে বসতেন, সেখানে [illegible] দ্বার থাকত অবারিত এবং মাঝে [illegible] আড়াল থেকে তাঁর গান শুনেছি আরো [illegible]য়েকবার। কিন্তু আমার সাড়া বা দেখা [illegible]ই তাঁর গান হত বন্ধ।"

কবি বিহারীলাল সম্[illegible] তিনি লিখছেন—"অক্ষয়কুমারের (বড় [illegible] মুখে নতুন বাংলার গীত কাব্যগুরু বি[illegible]লালের কোন কোন গল্প শুনেছি। [illegible] ভোলা সদানন্দ পুরুষ, সর্বদাই কাব্যরস মশগুলে হয়ে আছেন, নতুন নতুন গান বাঁধেন, সুর দিয়ে গাইতে গাইতে দুই হাতে তক্তাপোশ চাপড়াতে চাপড়াতে তাল দেন।"

দর্জিপাড়ার নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ির বৈঠকেই তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত ওস্তাদ জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের আলাপ হয়। খাঁ সাহেবকে আমরাও দেখেছি। আজকাল অনেকেই হয়ত এঁর কথা জানেন না, তখনকার দিনেও কনফারেন্সে ঘোরা বড় বড় ওস্তাদের মত প্রচারকামী তিনি ছিলেন না। অথচ সংগীতমহলে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। তাঁকে বলা হত ঠুংরির রাজা। হেমেন্দ্রকুমার এঁর কথা বলছেন—"জমীরুদ্দিনের রংটি কালো হলেও দেহখানি ছিল সুঠাম ও মুখখানিও সুদর্শন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর ভাবমধুর চোখদুটি—রীতিমত প্রেমিকের চোখ। গানের সময় সেই চোখদুটির ভিতর দিয়েও দেখা যেত বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। চমৎকার ঠুংরি গাইলেন তিনি, ভিজিয়ে দিলেন মন সাধ্য ধার পাতে। অপূর্ব গানের গলা, গাম্ভীর্য ভরপুর হতে পারে, আবার পেলবতায় তরল হয়েও আসে। তান, মীড়, গিটকিরি কিছুরই অভাব নেই এবং সবই অভিব্যক্ত হয় উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর দরদের ভিতর দিয়ে। জমীর দিল্লের অনেক ঢং মানানসইভাবে তাঁর গানেও তিনি প্রয়োগ

সঙ্গে খাঁ সাহেবের একটা বিরোধ হয়ে গিয়েছিল।

নজরুল সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার এবং তাঁরা দুজনেই এক সময়ে সংগীতজগতে একটা মস্ত বড় আলোড়ন এনেছিলেন। নজরুল যখন নিয়মিতভাবে গান রচনা করে নিজেই সুরে দিয়ে গাইতে শুরু করেননি তখন থেকেই হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। নজরুল তখন প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের রচিত গান গাইতেন। হেমেন্দ্রকুমার বলছেন যে তাঁর গলা যদিচ ভাল ছিল না এবং উচ্চারণে প্রাদেশিকতার টান ছিল তথাপি তাঁর গাইবার ভঙ্গীতে এমন একটি আকর্ষণ শক্তি ছিল যে তিনি শ্রোতাদের বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারতেন। নাট্যজগতে হেমেন্দ্রকুমারকে নজরুলের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হয়েছে কয়েকবার। "কারাগার" নাটকে ধরিত্রীর কয়েকটি গান ছাড়া বাকি সব গান ছিল হেমেন্দ্রকুমারের রচনা। তাঁর প্রত্যেকটি গানে নজরুল চমৎকার সুর দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র একটি গানে তিনি নিজে সুরসংযোগ করেছিলেন, কারণ নজরুলকে হঠাৎ সেই সময় পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গানটি উদ্ধৃত করছি।

সুন্দরী গো সুন্দরী—
সুন্দরী
কী বাণ তুমি রেখেছ ঐ
ডাগর আঁখির তূণে ভরি।
মঞ্জীরে কি মঞ্জুগীতি
চঞ্চলিয়া স্বপন স্মৃতি
চিত্ত মধুপে নৃত্য করে
গুঞ্জরি আর গুঞ্জরি।
ছন্দ একি অন্তরে
ক্রন্দনহীন মন্তরে
মন্তরে
বিশ্ব যেন নিঃস্ব হয়ে
তোমার চাহে গো
মর্মকানন মর্মরিয়া
কি গান গাহে গো
দীপ্ত বাসর তপ্ত বুকে
পুষ্প ওঠে মুঞ্জরি।

হেমেন্দ্রকুমার লিখছেন—"তখন আমি গান রচনার দিকে ঝোঁক দিয়েছি খুব বেশী মাত্রায়। আমার কলমে এসেছিল গানের বন্যা, প্রত্যহই গান রচনা করি। গ্রামোফোনের রেকর্ডে প্রায়ই আমার গান প্রকাশিত হত।"

সঙ্গীতের সেই একটা স্বর্ণযুগ চলে গেছে, যার অনেকটা গেছে আমাদের চোখের ওপর দিয়ে। সংগীতজগতে হেমেন্দ্রকুমারের সংযোগটা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, কবি, গীতিকার, নৃত্যবিদ ও চিত্রশিল্পী। শিশিরকুমারের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যক্রীড়ার যুগান্তকারী সাফল্যের জন্য কম কৃতিত্ব হেমেন্দ্রকুমারের ছিল না; এমনকি কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়কে রঙ্গজগতে তিনিই প্রবেশ করিয়েছিলেন উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়ে। তাঁর পরেও অনেক সাহিত্যিক এসেছেন সংগীত এবং রঙ্গজগতে; কিন্তু এত বড় ব্যাপক ও বলিষ্ঠ প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁদের কেউ এ পর্যন্ত রেখে যেতে পারেন নি। তিনি কারুর কাছে মাথা নত করেননি; কোন প্রযোজক বা পরিচালকদের কথায় ওঠা বসার লোক তিনি ছিলেন না। যেমনটা তাঁর পরবর্তীকালে অধিকাংশক্ষেত্রে দেখা গেছে। সবচেয়ে বড় কথা যে যুগে সংগীতের চির অধঃপতন ঘটেছিল সে যুগে তিনি একটি স্নিগ্ধ রুচিসম্পন্ন কাব্যসংগীতের প্রবর্তন করলেন। হয়ত প্রয়োজনে তাঁকেও কিছু হালকা গান রচনা করতে হয়েছে, কিন্তু একটা অধঃপতিত সমাজকে তিনি তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় যে আদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন তার সাফল্য ও গৌরব অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। আজ পর্যন্ত তিনি কতখানি করে গেছেন তার পরিমাপ করতে আমাদের সঙ্গীত জগৎকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

শার্ঙ্গদেব

পুস্তক পরিচয়

দুই জীবনঃ নজরুল ও নেলী সেনগুপ্তা

নজরুল-জীবনচরিত [নজরুল জীবনের পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য]। ডঃ মিলন দত্ত। প্রসাদ লাইব্রেরির কর্তৃক ২৭ বিধান সরণী থেকে প্রকাশিত। দাম বারো টাকা।

নেলী সেনগুপ্তা। সুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত। চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক ৫৬ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। দাম পনের টাকা।

নজরুলের জীবন নিয়ে বেশ কিছু বই এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে। কিন্তু মোটমুটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলতে যা বোঝায়, এ বইটি ঠিক তাই। লেখককে স্বভাবত অনেক খেটে প্রচুর তথ্য যোগাড় করতে হয়েছে। তথ্য নিয়ে অনেকে অনেক বিতর্ক তুলতে পারেন। কিন্তু অমন বিতর্ক তো সব তাতেই ওঠে। বইটি পড়ে একদিনে আমি কিন্তু নজরুলের জীবনের একটা বড় আকারের ছবি সামনে দাঁড় করাতে পেরেছি এবং আমার অনেক চাপা কৌতূহলের অবসান ঘটেছে, পাঠকহিসেবে এই আমার মোদ্দা লাভ। তবে সবচাইতে ভাল লাগল লেখকের অকপট তথ্য জ্ঞাপনের সাহস এবং নিষ্ঠা। কোন ঢাক গুড়গুড় লুকোছাপা নেই। জীবনী—বিশেষ করে শিল্পীদের জীবনী তো এরকমটিই হওয়া উচিত। অন্তত এই একটি কারণের জন্যে লেখককে ধন্যবাদ—প্রচুর ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গত, লেখক নজরুলের বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডকটরেট পেয়েছেন। বোঝা যায়, এমন একখানি জীবনী লিখে ফেলা তাঁর পক্ষে সে কারণেই হয়তো সম্ভব হয়েছে এবং সেজন্যই তাঁর সংগৃহীত তথ্যে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। এ কথা খোলা-খুলি বলছি আমার একাডেমিক ব্যাপারে মর্মুলি ভক্তি থাকার জন্যে নয়, বরং অ্যাকাডেমিক রচনার গণ্ডলপ্রবাহতুল্য একঘেয়ে বাগাড়ম্বর ও নির্বোধ বাড়বাড়ির বিরুদ্ধে আমার সংস্কার অতি প্রবল। তবু একথা বলছি এ জন্য যে, মিলনবাবুর বইয়ে এতটুকু নীরসতা নেই। ইনি অ্যাকাডেমিক দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো সরল ও মুক্তমন।

অবচেতনায় চির-ছন্নছাড়া, খেয়ালী, হঠকারী ও দুর্দান্ত এক মানুষ নজরুল। পৃথিবীর যেসব শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী জীবন নিয়ে বাজি ধরে জুয়া খেলেছেন, সুন্দর অসুন্দরের মধ্যকার অস্থির দোলককে ধরে ঝালোঝালি করেছেন, এবং যাঁদের 'একহাতে বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য' ছিল, নজরুল তাঁদের একজন—এতে কেনও ভুল নেই। খাঁটি শিল্পীর সব মারাত্মক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে ছিল। এবং ছিল, তা জানবার জন্যেই এই বই পড়া উচিত। অবশ্যই পড়া উচিত।

এ দেশের ইতিহাসের রথের রজ্জু আকর্ষণে স্বদেশীয়দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অনেক মহৎপ্রাণ বিদেশী। তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী নেলী অনন্যসাধারণ। কেমব্রিজের গ্রেদম্পতির একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। সুদর্শন তরুণ বাঙালী ছাত্র যতীন্দ্রমোহনের প্রেমে পড়লেন। তারপর বাঙালী পরিবারের বধূ হয়ে এদেশে চলে এলেন। স্বামীর দেশকেই করে তুললেন স্বদেশ। এবং পরাধীন এক ভিনদেশের সব হলাহল আকণ্ঠ পান করলেন নির্দ্বিধায়। এই বিচিত্র ঘটনা সত্যিই তুলনাবিহীন।

হয়তো এটাই স্বাভাবিক ছিল। চট্টগ্রাম অনেক বীর সুসন্তানের জনক। যতীন্দ্র-মোহন—যাঁকে দেশের মানুষ দেশপ্রিয় নামেই সম্যক চেনেন, বিদেশিনী ভার্যাকে প্রেমের সঙ্গে আরও অনেক কিছু দিয়েছিলেন : ত্যাগ, নিষ্ঠা, সেবা ও সংগ্রামের আদর্শ। তাই দেখি, বিদেশিনী নেলী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছেন এবং আজীবন আমৃত্যু সেই সংগ্রামের বিরতি নেই। দেশ বলতে তিনি ভূগোল বুঝতেন না, নিছক ইতিহাসের তথ্যাবলী বুঝতেন না, বুঝতেন মানুষ। নিপীড়িত মানুষ। দেশভাগের পরও তাই তিনি রয়ে গেলেন তদানীন্তন পাকিস্তানে—এখন যার নাম বাংলাদেশ। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, এটা খুব বড় কথা নয়। বড় কথা—জনগণের মনে নেলী বিরাট এক ভাবমূর্তি। তিনি অবিস্মরণীয়া হয়ে থাকবেন।

নেতাজীকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন লেখক। এই বিরাট চরিত্রকে উপলব্ধি করা খুব সহজ কথা নয়। তবে, লেখক ঝরঝরে ভাষায় গল্পের মতো ঘটনা বিন্যাসে সাজিয়ে নেতাজীর জীবন তুলে ধরার যে চেষ্টা করেছেন, তা প্রশংসনীয়। নেতাজীর সংগ্রামী জীবনের যতখানি আভাস এই বইয়ে মিলেছে, তার জন্য লিখন-কৃতিত্ব অনায়াসেই লেখক দাবি করতে পারেন। বিশেষত, ইতিহাসের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান সন্নিবেশিত থাকায় এই বইটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের প্রচুর সাহায্য করবে। সাধারণ পাঠকও এতটুকু বঞ্চিত হবেন না, কারণ সুখেন্দু-বাবুর বর্ণনাভঙ্গিটি চমৎকার।

পৌরাণিক চরিত্র

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত। প্রথম পর্ব। শিপ্রা দত্ত। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরি। ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম কুড়ি টাকা।

ধ্রুপদী শিল্পের স্বাদ অবিনশ্বর। কথাটা গালভারি শোনালেও উপায় নেই।

বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে মোটামুটি এই 'অবিনশ্বর' শব্দ প্রয়োগেই বোঝানো সম্ভব। সর্বদেশে সর্বকালে তা উপভোগ্য। নতুন সময়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসবে এবং সেভাবেই তর বিচারবিশ্লেষণ হবে। রামায়ণ মহাভারত অজস্র মানুষের কাছে নিশ্চয় ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই আদর কাড়ে। কিন্তু যে শিল্প চায়, তার কাছে এর স্বরূপ শিল্পেই নিহিত। মহাসাগরের উপমা দেব না, কারণ তার জল পেয় নয়, লোনা। বরং এই দুই ভারতীয় শিল্প যেন অনন্ত এক প্রবাহিণী—কাল থেকে কালের ঘাট পেরিয়ে চলেছে। নাকি এই দুয়ে যেন নিহিত রয়েছে মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অস্তিত্ববিষয়ক দর্পণ। সাধু-সন্ত — ভণ্ড — ভাঁড়-বেশ্যা — দালাল — যোদ্ধা—শিল্পী — চাটুকার — স্বৈরিণী —প্রেমিক ও প্রেমিকা — তস্কর — ঘাতক প্রত্যেকেই এ মহাকালদর্পণে নিজেদের দেখে নিতে পারে। অন্তহীন শোক ও সুখ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, প্রেম ও ঘৃণা থরে থরে সাজানো এই ভারতীয় ভাণ্ডারে। ইলিয়াড-অডেসি নিয়ে শ্বেতকায় জাতিবর্গের অশেষ অস্ফালনকে আমি একজন ভারতীয় হিসেবে করুণা করি।

অন্তত শ্রীমতী শিপ্রা দত্তের এই বইটি পড়ার ফলে এই ধরনের গর্ববোধ আমার মধ্যে জন্মেছে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। অনেক প্রখ্যাত কুশলী লেখক অবশ্য অসাধারণ লেখা লিখেছেন এ বিষয়ে। তাঁদের লেখার সঙ্গে তুলনা আদৌ করছি না। কিন্তু দুটি মহাকাব্যকে সামনে রেখে দুটি করে চরিত্র বেছে নিয়ে যে তুলনামূলক আলোচনা লেখিকা করেছেন, তা আগ্রহ জাগায় না শুধু, আরও সচকিত ও সচেতন করে তোলে। লেখিকা এই বইয়ে সীতা ও দ্রৌপদী, রাম ও যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অবলম্বন মুখ্যত বাল্মীকি ও বেদব্যাস, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস। যেহেতু বিষয়টি তথাকথিত ইতিহাস নয়, মহাকাব্য—তাই দূর অতীত ও নিকট অতীতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণে চরিত্রে অবলম্বন করা অলৌকিক হয়নি, বরং আরও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। ৩৩১ পাতার আলোচনা যেন শেষ হয়েও শেষ হল না। তবে না। শ্রীমতী শিপ্রা দত্তের দ্বিতীয় পর্বের জন্য আশা করে থাকলাম।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোনো নায়ক যদি নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করে, পান খাবে কিনা এবং তার উত্তরে হেঁটুঁ 'হ্যাঁ' বা 'না' কিংবা 'খেতে পারি, আপত্তি নেই' গোছের জবাবের বদলে দু লাইনের উত্তর আসে, আর সে উত্তরের নমুনা হয় এই রকম যে "পান তো খাদ্যবস্তু বলেই জানি এবং মেয়েদের অতি প্রিয়ও বটে। এন দিলেই খাবো।" অথবা কোনো নায়ক যদি নায়িকাকে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রোপোজ করার মুহূর্তে বলে যে, "প্রতিদিনের জন্ম একটি নূতন সূর্যোদয়। সুতরাং, আমরা নূতন দিনে নূতন রূপ নিয়ে এগিয়ে যাবো। আমি প্রস্তুত, এখন তোমার মত পেলেই হয়।" তখন বুঝতে খুব দেরি হয় না যে,

ছেলে বা মেয়েটির মানসিক ভারসাম্য কোন স্তরে অবস্থিত এবং এই ধরনের প্রেমের পরিণতি কী।

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর **প্রতিবিম্বের স্বাদ** (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২, আট টাকা) উপন্যাসে সেই অনিবার্যতাকে তিনি রোধ করতে পারেননি। হীরা ফেলে কাঁচের পিছনে' ছুটে-যাওয়া এক নায়কের জীবনের দুটি প্রেমের উপাখ্যান তিনি শুনিয়েছেন। দু ক্ষেত্রেই পরিণতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তবে এই ব্যর্থতার জন্যে শেষ পর্যন্ত দুঃখ বড় হয়ে দেখা দেয় না। কেননা, প্রথম থেকেই এই পরিণতি খুব নিশ্চিত-ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের মনে। অনুধাবন করে নেওয়া যায়, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-গুলি প্রেম নিয়ে ততটা জর্জরিত নয়, যতটা প্রেমের তত্ত্ব নিয়ে। এবং তাত্ত্বিক উপাখ্যান হিসেবে উপন্যাসটি পড়লে স্বীকার করতে দ্বিধা থাকে না যে, নিরঞ্জনবাবু খুবই যত্ন সহকারে এই কাহিনীটি বুনেছিলেন।

১৫৩ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র সংগীতে ছাপার ভুল ছাড়াও 'মিলায়' হয়েছে 'মিলিয়ে'। ইতস্তত বানান ভুলও প্রচুর।

*

দীর্ঘ দিনের কবি বীরেন্দ্রকুমার গুপ্তের প্রায় পাঁচিশ বছরের ইতস্তত রচনা নিয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঝিনুক কুড়াই (পরিবেশক : লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা ৭, পাঁচ টাকা)। নানা বয়সের নানা অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে আসা বীরেন্দ্র-কুমার গুপ্তের এই কবিতাবলীতে তার বিবর্তনের একটি স্পষ্ট চিহ্ন ধরা প[illegible]। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটির একটি [illegible]শেষ মূল্য স্বীকার্য।

তাঁর প্রথম দিকের রচনায় প্রকৃতি ও প্রেম একাত্ম হয়ে মিশে রয়েছে। শুরু থেকেই তিনি কুশলী, বেশ বোঝা যায়। তাঁর রচনায় ছন্দ নির্ভুল, বর্ণনা অবিকল, চিত্ররূপ স্বচ্ছন্দ। সহজ সুরে গভীর কথা বলার প্রবণতাও তাঁর সাধনার অন্তর্গত। সেই কবে তিনি লিখেছিলেন, "পাখিদের মতো বুঝি/মানব ভিতর থেকে আমরাও অনেক সহজ হয়ে গেছি।" লিখেছিলেন— "দূরে দূরে মাঠ/একটি ছবির মতো রয়েছে আছে নীল অরণ্যানী/মনে হয় কাগজের সহজে মলাট।" অথবা "ছিঁড়ালো কুয়াশা, চাঁদ চিকরালো/ঝিকমিকে।/আবার তখন মনে পড়ে যায়/মালতীকে।"

তবে তাঁর সিদ্ধির সার্থকতম প্রকাশ 'সনেট'-প্রতিম কিছু চতুর্দশপদীতে। সুঠাম, সংহত দৃঢ়বদ্ধ এমন বেশ কিছু 'সনেট' তিনি এই বইতে উপহার দিয়েছেন, যা বহুকাল স্থায়ী হয়ে থাকার যোগ্য।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

খেলার মাঠে

সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও খেলার মান বাড়ছে না

আমাদের দেশে, বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গে খেলাধুলো করার সুযোগসুবিধা শুধুই সীমায়িত। মাঠের অভাব, স্টেডিয়াম জিমন্যাসিয়ামের অভাব। অভাব উন্নত মানের ক্রীড়াসরঞ্জামেরও।

কিন্তু স্পোর্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে রাজ্য বছর বছর যে টাকা খরচ করছেন এবং নানাভাবে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন সেটাও কম নয়। এবারও তো বাজেটে শুধু গ্রামীণ খেলাধুলোর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরের কথা বলা যাক।

জেলায় জেলায় এবং মহকুমায় খেলার মাঠ ও প্রয়োজনভিত্তিক স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য অনুদান, সারা রাজ্যে বিভিন্ন খেলার কোচিং ক্যাম্প পরিচালনা এবং খেলার প্রসার প্রচার ও উন্নতির জন্য অন্যান্য খাতের খরচ নিয়ে বিগত আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে ৬০ লাখ টাকা খরচ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে অবশ্য ৭৫ লক্ষ টাকা। ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠকে রাত্রিকালীন ফুটবলের উপযোগী করার জন্য ১০ লাখ টাকা এবং ইডেনে ক্ষুদিরাম হল সংলগ্ন জমিতে টেবল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল প্রভৃতি খেলার ইন্ডোর প্র্যাকটিস হল তৈরির জন্য ৫ লাখ টাকা পৃথক করে রাখা হয়েছে—সে টাকা বিগত আর্থিক বাজেটেরই অংশ। ইন্ডোর প্র্যাকটিস হলের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ২০ লাখ টাকা। ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠকে ফ্লাড লাইটে সাজানোর জন্যও কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকা খরচ হবে।

অতি শীঘ্রই ফ্লাড লাইটের কাজ আরম্ভ করা হবে। ওই ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতিও পাওয়া গেছে। আশা করা যায়, আই এফ এ শীল্ড খেলার আগেই কাজ শেষ হবে। এই বছরের শেষে আরম্ভ হবে মহমেডান স্পোর্টিং-হাওড়া ইউনিয়ন মাঠে ফ্লাড লাইটের কাজ।

শিলিগুড়ির তিলক ময়দান, যেখানে ফুটবল খেলা হয়, ওই জমি খেলার প্রয়োজনে সামরিক কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছেন। তবে দার্জিলিং বা অন্য কোন জায়গায় সমপরিমাণ জমি সামরিক কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। তার জন্য মন্ত্রিসভায় ১৫ লাখ টাকার বাজেটও অনুমোদিত হয়েছে। আপাতত তিলক ময়দানে সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার দু লাখ টাকা অনুদানও দিয়েছেন।

প্রতি জেলায় এবং প্রতি মহকুমায় খেলার মাঠ ও প্রয়োজনানুরূপ স্টেডিয়াম তৈরি এবং কোচিং ক্যাম্প পরিচালনার যে পরিকল্পনা ছিল তা বহুলাংশে সফল হয়েছে বলে ক্রীড়ামন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, মেদিনীপুরে সুইমিং পুল, বর্ধমানে ইনডোর স্টেডিয়াম এবং বিষ্ণুপুরে প্রয়োজনভিত্তিক স্টেডিয়াম তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা অনুদান ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান তিন লাখ টাকার মধ্যে দেড় লাখ টাকা ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ১৩টি স্থানে স্টেডিয়ামের জন্য দেওয়া হয়েছে ১২ লাখ ৪০ হাজার টাকা, ১৫টি স্থানে জিমন্যাসিয়াম তৈরির জন্য দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। ১৬টি খেলার মাঠের জন্যও ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

সারা রাজ্যব্যাপী কোচিং ক্যাম্প পরিচালনার জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৮ লাখ টাকা। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিকস জিমন্যাস্টিকস, খোখো, কবাডি, সাঁতার, টেবিল টেনিস প্রভৃতি সব রকম খেলার ১৩৬টি কোচিং ক্যাম্প শেষ হয়ে গেছে, এখনো চলছে ১৯৬টি ক্যাম্প প্রশিক্ষণ।

এখন সঙ্গতভাবেই একটি প্রশ্ন করা যায়, এই সব সুযোগ সুবিধার হাতেনাতে ফল আমরা কতটুকু পাচ্ছি? রাত্রিকালীন ফুটবলের জন্য একটি মাঠে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। আরও দুটি মাঠেও হচ্ছে। কিন্তু লীগের খেলা কি রাত্রিতে হবে? জনপ্রিয় ক্লাবগুলির খেলাকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে ময়দানে যে তাণ্ডব বাধে তাতে রাত্রিতে খেলানোর ব্যাপারে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার এক বিরাট প্রশ্ন আছে।

কোচিং ক্যাম্পের এত ব্যবস্থা। এন আই এস কোচরাই প্রশিক্ষণ চালাচ্ছেন। সে অনুপাতে কি খেলোয়াড় বের হচ্ছে? মনে হয়, খেলোয়াড়দের মধ্যে আন্তরিকতারই অভাব আছে। খেলার আন্তর্জাতিক মান এবং সর্বভারতীয় মানও এত বেড়ে গেছে যে, নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ছাড়া সম্মুখে এগোনো আর সম্ভব নয়।

জর্জটাউন টেস্ট ড্র

জর্জটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট ড্র হওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের সুবাদে ১—০ এগিয়ে আছে। যেভাবে ব্যাটে-বলে লড়াই চলছে তাতে বাকি দুটি টেস্টের ফল কি হবে এবং কোন দল সিরিজ জিতবে বলা শক্ত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড অবশ্য বলেছেন তাঁর দেশই রাবার পাবে।

জর্জটাউন টেস্টে পাকিস্তান দেখিয়ে দিয়েছে একটি ইনিংসে তাদের ব্যর্থতা ফুটে উঠতে পারে, দুই ইনিংসে নয়। মাত্র ১৯৪ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ৫৪০ রান। ১৯৫৮ সিরিজের ৬৫৭ রানের পর এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দ্বিতীয় বড় ইনিংস।

এই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ছিল ৪ জন পেস বোলার—অ্যান্ডি রবার্টস, কলিন ক্রফট, জোয়েল গার্নার ও বার্নার্ড জুলিয়ান। দুই ইনিংসের ২০টি উইকেটের মধ্যে ১৯টি উইকেটই পেয়েছেন পেস বোলাররা। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোন স্পিন বোলারকে দিয়ে এক ওভারও বল করায়নি। এই পেস বোলারদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের বড় ইনিংস গড়া সত্যিই সাহস এবং শক্তির পরিচয়। বিশেষ করে, প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতায় ২৫৪ রান পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে যতখানি মনের পাটা দরকার ততখানি দেখিয়েছেন ওপেনার মাজিদ খাঁ, কলিন ক্রফটের প্রথম ওভারেই মারেন চারটি বাউন্ডারি। শেষ পর্যন্ত মাজিদ আউট হন ১৬৭ রান করে। তাঁর জীবনের বড় টেস্ট রান।

এ ম্যাচে জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিলিংফোর্ড। দুর্ভাগা গ্রিনিজ। ভারত সফরে এসে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করলেও দেশের মাঠে টেস্ট সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। এ টেস্টে প্রথম ইনিংসে আউট হন ৯১ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রানে। শেষ দিন চা বিরতির ৪৫ মিনিট আগে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ৫৪০ রানে শেষ হবার পর জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৮৭ রান দরকার থাকে, ১৫৫ মিনিটের মধ্যে যা করা অসম্ভব। তবু যেভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার গ্রিনিজ ও ফ্রেডরিকস ইনিংস শুরু করেছিলেন টেস্ট খেলায় সেটা প্রায় নজিরবিহীন। তাঁরা ৫০ রান করেন মাত্র ৩৫ মিনিটে, ১০০ রান ৭৮ মিনিটে এবং ১২৪ মিনিটে ১৫০ রান। গ্রিনিজ ৯৬ রানে পৌঁছে একটি ছয় বা চার মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করায় [illegible] হাকড়ান। বাউন্ডারি লাইনের পাশে তাঁর

ক্যাচটি ধরে নেন ইমরান খাঁ। ফলে দেশের মাঠে সেঞ্চুরি করার ইচ্ছা আপাতত অপূর্ণ থেকে যায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ১৯৪ (ইমরান খাঁ ৪৭, মুস্তাক মহম্মদ ৪১, হারুণ রসিদ ৩২, জোয়েল গার্নার ৪—৪৮, কলিন ক্রফট ৩—৬০, অ্যান্ডি রবার্টস ২—৪৯, জুলিয়েন ১—২৫)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—প্রথম ইনিংস ৪৪৮ (কালিচরণ... শিলিংফোর্ড ১২০, গ্রিনিজ ৯১, কালিচরণ ৭২, রিচার্ডস ৫০, মারে ৪২, মজিদ খাঁ ৪—৪৫)

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ৩৬০ (মজিদ খাঁ ১৬৭, জাহির আব্বাস ৮০, হারুণ রসিদ ৬০, সাদিক মহম্মদ ৪৮, আসিফ ইকবাল ৩৫, ইমরান খাঁ ৩৫, গার্নার ৪—১০০, রবার্টস ৩—১৭৪ ক্রফট ২—১১৯)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস (এক উইকেট ১৫৪ (গ্রিনিজ ৯৬, ফ্রেডেরিকস নট আউট ৫২)

একলব্য
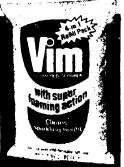
বাংলার তরুণ জিমন্যাস্ট

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী স্পোর্টস ডে সম্মান দিবসে বাংলার শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট হিসাবে সম্মানিত হল বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির ধনঞ্জয় মজুমদার। কোচের সম্মান পেলেন ধনঞ্জয়েরই অন্যতম গুরু সন্তোষ ওঝা।

ধনঞ্জয় এখনো সিনিয়র জিমন্যাস্ট নয়। ১৯ বছর বয়সী ছেলেটি এ বছরই পাঞ্জাবের রূপনগরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় জিমন্যাস্টিকসের জুনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। পোমেল্ড হর্স ও রিংএ পেয়েছে প্রথম স্থান, হোরাইজেণ্টাল বারে তৃতীয় স্থান। সংগৃহীত পয়েণ্টের সংখ্যা ২৭·৯০। প্রথম স্থানাধিকারী মণিপুরের প্রীতি নামে ছেলেটি পেয়েছে ২৮·১০ পয়েণ্ট।

শুধু জাতীয় জিমন্যাস্টিকসে দ্বিতীয় স্থান পাবার সংবাদেই তার স্পোর্টস ডে অনার নয়, কয়েক বছর ধরেই ধনঞ্জয় বাংলার উঠতি জিমন্যাস্টদের পুরোভাগে রয়েছে। ৭৪-৭৫, ৭৫-৭৬ এবং ৭৬-৭৭ পর পর তিন বছরের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। প্রথমবার রিং, হোরাইজেণ্টাল বার ও পোমেল্ডে পায় প্রথম স্থান। ফ্লোরে তৃতীয়। দ্বিতীয়বার রিং, হোরাইজেণ্টাল এবং পোমেল্ডের সঙ্গে প্যারালাল বারের প্রথম পুরস্কারটিও হাতে আসে। ফ্লোরে পায় তৃতীয় স্থান। তৃতীয় বার ছয়টি ইভেণ্টের মধ্যে তিনটিতে প্রথম, বাকি তিনটিতে তৃতীয়। ভল্টিংয়ে আগে কোনবার স্থান পায়নি। ওইবার প্রথম সাফল্য। সুতরাং ধনঞ্জয় এমন একজন জিমন্যাস্ট প্রতিটি বিষয়ে যার কিছু না কিছু দক্ষতা আছে।

অথচ এই ধনঞ্জয়কেই তার মা বৌবাজার ব্যায়াম সমিতিতে নিয়ে এসে বলেছিলেন—ছেলেটার স্বাস্থ্য যাতে ভাল হয়, যাতে আরও পাঁচজন ছেলের মত হেসে খেলে বেড়াতে পারে, পেট ভরে দুটো খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিন।

ধনঞ্জয়ের বয়স তখন এগারো বছর। রোগা পলকা চেহারা। খুবই বিমর্ষ ভাব। যেন কিসের একটা কষ্ট মুখের ভাবে ফুটে আছে। মা জানালেন, কিছু খেতে পারে না। যা খায় হজম হয় না। ব্যায়াম সমিতির কর্তৃপক্ষ রায় দিলেন নিয়মিত ব্যায়াম করাই এর একমাত্র নিদান।

ছেলেটির ঝোঁক ছিল কিন্তু জিমন্যাস্টিকসের দিকে। মদন বড়াল লেনে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ক্লাবের কাছেই বাড়ি। পড়তও স্কোয়ারের অপরদিকে কলিনস ইনস্টিটিউটে। বাবার সঙ্গে যখনই বিকেলে বেড়াতে বের হত বা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত কিছুক্ষণ ক্লাবের পাশে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত ছেলেমেয়েদের জিমন্যাস্টিকসের কলাকৌশল। দিলীপ ওঝা, সন্তোষ ওঝা, শৈলেন ওঝা, দেবাশিস মণ্ডল প্রভৃতি নামী জিমন্যাস্টদের তখন ওখানেই আনাগোনা। ওরা ধনঞ্জয়কে তালিম দিতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরেই রায় দিলেন, ছেলেটির ন্যাক আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই ধরতে পারে কীভাবে হাত পা ও দেহ বিন্যাসে ফিগারগুলি দর্শনীয় হয়।

রিং-এর খেলায় ধনঞ্জয় মজুমদার

ক্লাবে ভর্তি হবার পর কিছুদিনের মধ্যেই ধনঞ্জয়ের বিমর্ষ ভাবটি কেটে গেল। হজমের গোলমালও কোথায় পালিয়ে গেল। জিমন্যাস্টিকসেও গেল বেশ নেশা ধরে। এমন সময়ে এক বিপত্তি। হঠাৎ একদিন হোরাইজেণ্টাল বার থেকে পড়ে গিয়ে ডান হাতখানা ভেঙে গেল। প্লাস্টার বাঁধা হাত নিয়ে তবু নিয়মিত ক্লাবে আসত। হাত ভাঙার জন্য ছমাস অনুশীলন বন্ধ ছিল। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শুরু।

এখনো অবশ্য ব্যতিক্রম নেই। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৭৪-এ হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করার পর গড়িয়াহাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে দু বছর মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যান কোর্স শেষ করে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম টেকনিক্যাল দিকটা ছেড়ে আবার সাহিত্যের দিকে এলে কেন? ধনঞ্জয় বলল গ্রাজুয়েট না হলে তো কোথাও দাঁড়াতে পারব না। তাছাড়া রবীন্দ্র ভারতীতে ভর্তি হয়েছি, বছরে অন্তত দু বছরে সর্বভারতীয় জিমন্যাস্টিকসে প্রতিযোগিতা করতে পারব বলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় জিমন্যাস্টিকসে প্রতিনিধি পাঠাত না। ১৯৭৬-এ প্রথম পাঠিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র ভারতী প্রতিবারই পাঠায়। ৭৬-এ অমৃতসরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ধনঞ্জয়ই ছিল রবীন্দ্র ভারতীর অধিনায়ক।

জিমন্যাস্টিকসের ছয়টি বিষয়ের মধ্যে রিং, হোরাইজেণ্টাল বার এবং পোমেল্ড হর্সে ধনঞ্জয়ের প্রায় সমদক্ষতা। গ্রাউণ্ড এবং প্যারালাল বারে বেশ ভাল। শুধু ভল্টিংয়ে দুর্বল। ওর কোচ জানালেন, ভল্টিং-এ যদি আর একটু ভাল হত তবে প্রতি প্রতিযোগিতায় পয়েণ্ট পেত অনেক বেশী। ব্যালান্স, বডি ফ্লেক্সিবিলিটি, দম সবই মোটামুটি ভাল। কিন্তু বহু প্রতিযোগিতায় নার্ভাস হয়ে পড়ে। যার জন্য অল্পের জন্য মারও খেয়েছে অনেক জায়গায়। এবার রূপনগরে জাতীয় জিমন্যাস্টিকসে যাবার আগে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এবারেও যদি ঘাবড়ে যাও ক্লাব থেকেই তাড়িয়ে দেব।

ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা জহর মণ্ডল বললেন, দেখুন তো ছেলেটার সব আছে। জিমন্যাস্টিকসের জন্য স্পোর্টস স্কলারশিপ পেয়েছে। ফিগারগুলি করেও ভাল। নিখুঁতভাবে রিং ও বারের খেলায় দর্শকদের সৌন্দর্যসত্তাও জাগিয়ে তোলে। তবু অল ইণ্ডিয়ায় যদি নার্ভাস হয়ে বার বার খারাপ ফল করে তবে দুঃখ হয় না?

জহরবাবু আরও বললেন, ভেবেছিলাম আমরা বকাবকি করে ছেলেটির স্নায়ুর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, ও নিশ্চয়ই আরও ঘাবড়ে গিয়ে ফল আরও খারাপ করেছে। রূপনগরের খবরও পাচ্ছিলাম না। ওর মা ক্লাবে এসে শুভ সংবাদ জানালেন, ধনঞ্জয় রূপনগরে বাংলার ও ক্লাবের নাম রেখেছে।

ধনঞ্জয় এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী এবং অনুশীলনেও আগ্রহ আগের চেয়ে বেশী। প্রতিদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে চক্কর মেরে গা ঘামিয়ে নিয়ে অনুশীলন শুরু করে।

মুকুল
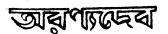
অরণ্যদেব

লী ফক

জুনবরকে নিয়ে আসছে!

ভাল আছে তো?
কী জানি!

সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী ...
পেটে অনেক জল ঢুকেছে!
বেঁচে আছে তো?
সুস্থ হয়ে উঠবে নিশ্চয় ...

জুনবর...
সম্রাট জুনবর...
অরণ্যদেব, ঠিক সময়ে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ!
জেমির কাছে তোমার সন্ধান পাই!

কেউই জানত না। সেইজন্যেই মারা পড়তে বসেছিলুম!
জুনবর... তুমি... আপনি সম্রাট, তা আমি জানতুম না!

একটু বিশ্রাম নাও... তারপর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে!
ইতিমধ্যে কী শিখলে?

শিখেছি যে, ক্রীতদাসের জীবন কত দুঃখময়!
ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটাব!
৪/22

আমিরকে আমার মনে আছে ...আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই!
সাক্ষাৎ-কারটা দারুণ মজার হবে!
এরপর : সাক্ষাৎকার ১৯

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রতিম [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible]

রঙ্গজগৎ

এদেশে, অন্তত বাংলা ভাষায়, চলচ্চিত্রের সিরিয়াস সমালোচনা প্রায় লেখাই হয় নি। তা যদি হতো তা হলে সেই সব লেখা পড়তে পড়তে বাঙালী দর্শকের চলচ্চিত্র ভাবনায় আসতো আরো অনেক সুঠাম ঋজুতা, একটা ছবিকে কোন কোন দিক থেকে দেখা যায়, বোঝা যায়, বিচার করা যায় এবং কাকে সিনেমা বলবো, আর কোনটাকে বলবো না, এ বিষয়ে তাঁরা আরো অনেক বেশি নিশ্চিত এবং দৃঢ় হতে পারতেন এবং তার ফলে ফিল্ম মুভমেন্ট বলতে আমরা যা বুঝি, ইউরোপীয়ান অর্থে, সেটা আমাদের দেশেও

প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র

ঘটতো। কিন্তু এ দেশের চলচ্চিত্রের সমালোচকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিনেমা-ভাবনার বিশেষ-বিশেষ ধরনগুলোকে বুঝিয়ে দেন নি। ফলে এখানে ফিল্ম এসথেটিকস বা ফিল্ম থিওরি নিয়ে বিচিত্র আলোচনা একেবারেই চোখে পড়ে না। যদি পড়তো, তা হলে আজ যারা বাংলা ছবি করছেন তাঁদের অনেকেই ক্যামেরার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেন এবং বাঙালী সিনেমা-দর্শকের কাছে অম্লানজিন জাতীয় বটিকার কদর এমনি দিন দিন বেড়ে যেত না।

কিন্তু এ দেশে যা হয় নি, ইউরোপে তা হয়েছে। এবং হয়েছে বলেই ফিল্ম-মুভমেন্ট ব্যাপারটা খাঁটি ইউরোপীয়। এদেশে কি হয় নি আর ইউরোপে কি হয়েছে সেটা ঠিকভাবে বুঝতে গেলে দু দেশের চলচ্চিত্র-আলোচনার একটা তুলনামূলক মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে অসুবিধে একটাই। আরনহেম থেকে আইজেনস্টাইন, বালাজ থেকে বেজিন থেকে মিৎ চিত্রসমালোচনার এই বহুমুখী ধারার কথা ভাবলেই বোঝা যাবে যে, তুলনামূলক মূল্যায়ন তো দূরের কথা, আমাদের এমন কোনো পুঁজি নেই যে আমরা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারি। চিত্রসমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের কাজ যে কতো নগণ্য সেটা বুঝতে আমাদের কারোই অসুবিধে হবে না যদি একবার ইউরোপীয় সমালোচনার বিস্তীর্ণ পরিধির দিকে তাকাই। এই সংকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে আমি কিন্তু ইউরোপীয় সিনেমা-সমালোচনার একটি দিককেও স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারবো না। শুধু কয়েকটি নাম এখানে উচ্চারিত হবে মাত্র এবং সমালোচনার কয়েকটি ধারাকে শুধু আলাদা করে চিনতে পারবো হয়তো, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তা থেকেই বোঝা যাবে সাগরের ওপারে কি ঘটছে। আর এপারে তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবির পতাকা উড়িয়ে আমরা কি দারুণ সব সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছি।

প্রথমেই বলি, আমাদের একজন হুগো মুনসটারবার্গ-এর প্রয়োজন ছিল। যাঁরা মুনসটারবার্গ-এর 'দা ফটোপ্লে' বইটা পড়েছেন তাঁরা বুঝবেন কেন আমি কথাটা বললাম। যাঁরা পড়েন নি তাঁদের পক্ষে এটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে, ১৯১৬ সালে এই ভদ্রলোক সিনেমার সঙ্গে স্বপ্নের একটা মিল খুঁজে পেয়েছিলেন এবং মানুষের মনটাকে কতদূর এবং কিভাবে ভিস্যুয়ালি একসপ্লোর করা যায় সেটা ভেবেছিলেন। আমাদের এই ১৯৭৭এ একজন লিনডসেরও প্রয়োজন ছিল, কেননা ১৯১৬ সালে তিনিই প্রথম সিনেমার সঙ্গে অঙ্কন ও আরকিটেকচার-এর আত্মীয়তা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন তাঁর 'দা আর্ট অব দা মুভিং পিকচার' বইতে। আহা, যদি আমরাও ভাগ্যজোরে পেতাম নিদেনপক্ষে একজন জারমেন দুলাক, জ্য এপসটিন, এবং এবল গানস—যাঁরা আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে, ১৯২৫ সালটালেই বুঝতে পেরেছিলেন কবিতার সঙ্গে সিনেমার একটা নিবিড় সংযোগ আছে। আর রাশিয়ার কথা বরং না ভাবাই উচিত, ভাবলে অবাক হতে হতে নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে আসে। মনে করুন, ১৯২০ সালে—বাংলা ছবি যখন সবে হামাগুড়ি দিচ্ছে—রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্টেট ফিল্ম স্কুল। আর প্রায় ঐ একই সময়ে খুলেশভ, ভাবটভ, পুডভকিন, আইজেনস্টিন—এঁরা নানান জটিল তর্কের জট ছাড়াতে ছাড়াতে আবিষ্কার করছেন সিনেমার এমন অনেক সম্ভাবনা আর আয়তন যা ছাড়া সম্ভব হত না সিনেমার আধুনিক বিবর্তন। ভাবতে পারেন, ১৯২০ সালে জাপানী 'হাইকু' কবিতা থেকে আইজেনস্টিন উপার্জন করে আনছেন তাঁর 'মনতাজ' থিওরির প্রাথমিক ধারণাটুকু যার ফলে আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে, সিনেমায় একটি ইমেজ-এর সঙ্গে অন্য একটি ইমেজ সংলগ্ন হলে খুঁজে পাওয়া যায় এমন একটি অর্থ বা ব্যঞ্জনা যা আলাদাভাবে ছবি দুটির মধ্যে পাওয়া যায় না। এই তো ক'দিন আগে কলকাতায় জাপানী 'কাবুকি' নৃত্য হয়ে গেল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আজ থেকে কত বছর আগে আইজেনস্টিন এই 'কাবুকি' থিয়েটার থেকেই সিনেমার মূল ব্যাপারগুলোকে—অর্থাৎ লাইটিং, কম্পোজিশান, অ্যাকটিং এবং গল্প—একটা ছান্দিক বন্ধনে সংলগ্ন করতে শিখেছিলেন। এসব ঘটেছিল ১৯২০ থেকে ৩০-এর রাশিয়ায়। আর আমরা ৭০-এর দশকে অসাধারণ, সব্যসাচী, অশনীশ্বর, বহ্নিশিখা প্রভৃতি ছবির মতো 'সৃজনশীল কর্মে' বড় তৃপ্ত ও গর্ববোধ করি, এ সব ছবি তৈরি করার জন্যে আজকের দিনেও পয়সাকড়ি পাওয়া যায় এবং আমাদের অধিকাংশ সমালোচকেরা অটোমেটিকভাবে অ্যাকসেপ্ট করে নেন এ জাতের ছবিগুলিকে, অন্তত কখনই তাঁরা শ্লেষ তুলোধুনো দেন না।

যতদূর মনে পড়ছে ১৯২২ সালটাল থেকে বেলা বালাজ সিনেমার ওপর লিখতে শুরু করেন। পরে ওঁর লেখাগুলো 'থিওরি অফ দা ফিলম' নামে বই হয়ে বেরোয়। বালাজ-এর সঞ্চরণভূমি এমনি বিচিত্র এবং বিস্তীর্ণ যে, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক অনেক কথা বলতে হয়, দু-এক কথা বলে কোনো লাভ নেই। তবু বালাজ-এর কথা আনলাম শুধু এইটুকু জানাতে যে, আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেই তিনি একেবারে পরিষ্কার করে বলে গেছেন সিনেমা আর থিয়েটার-এর মূল চারিত্রিক প্রভেদটা কোথায়। সিনেমার ভাষা আলাদা জাত আলাদা। বেলাজ একেবারে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন যে, সিনেমা 'ফোটোগ্রাফড

(সি ৬৮০০৬)

থিয়েটার' নয়। সিনেমায় দৃশ্যগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভেঙে নেওয়া হয় এবং ক্যামেরার বিভিন্ন কোণ ও দূরত্বে সেগুলিকে মুড এবং তাৎপর্য অনুযায়ী ধরা হয়। অর্থাৎ একই ঘটনার ভিসুয়াল ব্যাখ্যা সিনেমা এবং থিয়েটারে বিভিন্ন। সিনেমার সমস্যাটা হল কিভাবে, কোন কোন অ্যাংগেল থেকে, ঠিক কি ধরনের কম্পোজিশন-এর মাধ্যমে, কেমন আলোছায়ার টেকসচার-এর সাহায্যে একটি দৃশ্য বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হবে। অর্থাৎ একটি মূল সমস্যা হল প্লেসিং অব দা ক্যামেরা, মানে ক্যামেরাটা কোথায় রেখে কিভাবে দৃশ্যটি গ্রহণ করা হবে। বিশ-এর দশকে বালাজ যে সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন তারই তো ক্রমিক বিবর্তনের অন্য নাম সিনেমার ইতিহাস। কিন্তু টালিগঞ্জীয় চিত্র-পরিচালকেরা এই ৭০-এর দশকেও বে-লাজ —অর্থাৎ তাঁরা লজ্জাহীনভাবে থিয়েটারি সিনেমায় নিমগ্ন। এমনকি দত্তার মতো হিট ছবি দেখুন—দেখবেন এ ছবি মূলত ফোটোগ্রাফড থিয়েটার' ছাড়া আর কিছু নয়। মূল গণ্ডগোলটা ক্যামেরা প্লেসিং-এর, কম্পোজিশন-এর। দৃশ্যগুলিকে ভাবা হয়েছে থিয়েটারি ঢঙে। সিনেমার নিজস্ব কম্পোজিশন বা স্টাইল-এর ব্যঞ্জনা সেখানে প্রায় নেই। ডিসকশান টেবিলে ফেলে এসব ছবিকে যদি টুকরো টুকরো করে বিচার করা যায় তা হলে সেখানে আদৌ সিনেমা বলে শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়া যাবে কি না ঘোর সন্দেহ আছে। ভাগ্যিস আমাদের দেশে সিনেমা সমালোচনা বড় নিরীহ, তাই তো অনেকের বাঁচোয়া।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

অমৃতের স্বাদ/অঞ্জলিকা

নিতান্ত সাধারণ স্তরের একটি গল্প, চিত্রনাট্যে প্রচুর অসংগতি, ট্রিটমেণ্ট নিতান্তই মঞ্চঘেঁষা, আর টেকনিক্যাল দৈন্য ছবিটির সর্বাঙ্গে। তা সত্ত্বেও ছবিটি যদি প্রমোদ-পিপাসু দর্শকের মনোরঞ্জন করে থাকে তবে তার কৃতিত্ব প্রধান কয়েকটি চরিত্রের অভিনয়। নবাগত পরিচালক পরিমল ভট্টাচার্য বুদ্ধিমান দর্শকের শ্রদ্ধা আর সম্মান কোনটাই পাবেন না এ ছবি করে, তবে তিনি হয়তো আরও দু-একটি ছবির কন্ট্রাক্ট পেতে পারেন, কারণ তাঁর এ ছবির টিকিট-ঘরের আনুকুল্য লাভের সম্ভাবনা আছে।

পরিচালকের নিজের গল্প এবং চিত্রনাট্য। সুতরাং ভাল-মন্দের সম্পূর্ণ অংশীদার তিনিই। এ-ছবিকে সিনেমা বলা যাবে না কোনক্রমেই—সুস্থ তো নয়ই। তবু এ ছবি চলতে পারে, কারণ আমাদের দেশের বেশির ভাগ দর্শকই ভাল ছবি দেখার চেয়ে ছবির প্রমোদ মূল্যের প্রতিই বেশি আনুগত্য দেখিয়ে থাকেন।

ছবি শেষ হয়েছে হাসি খুশির মধ্যে দিয়ে। কিন্তু শুরুতে ছিল করুণ রস। রিটায়ার্ড বাপ (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং দুই মেয়ের (মাধবী চক্রবর্তী ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়) সংসারে দারিদ্র্য এমনই নিদারুণ যে একখানা আস্ত শাড়িরও বড় অভাব। অথচ মাধবী যখন দার্জিলিং-এ শিক্ষয়িত্রীর চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে গেল তখন তার যা সাজপোশাক তাতে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর প্রথম পুরস্কারটি যে তারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে সেটা জানিয়ে দিতে ভুলে গেছেন পরিচালক। বিবাহিতা না হলে যে-স্কুলে চাকরি পাওয়া যায় না সে স্কুলের প্রিন্সিপাল এতই সরল যে সিঁথিতে সিঁদুর না থাকলেও শুধু মুখের কথাতেই মেনে নেন যে মাধবী রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। আর কোন প্রমাণেরই প্রয়োজন মনে করেন না। সুব্রতাকে কলকাতায় একটি টিউশনি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে যেন ও-বাড়ির ছোট ছেলে সমিত ভঞ্জর সঙ্গে প্রেম করবার জন্যই। মাধবী যাকে মিথ্যে করে স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছে সেই সাহিত্যিক সঞ্জয় সেন (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) যে জাতীয় বই লেখে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে যান তাতে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আসলে ছবির সব ঘটনা এবং চরিত্রই অবিশ্বাস্য। তা সত্ত্বেও এ-ছবি [illegible] দর্শকদের [illegible] তার কারণ [illegible] স্বামী-স্ত্রী [illegible] সম্পর্ক নিয়ে [illegible] এবং প্রধান চরিত্রগুলির চমৎকার [illegible] অভিনয়। শুভেন্দু, মাধবী, সত্য, সুব্রতা, সমিত ইত্যাদি সকলেই জমিয়ে অভিনয় করেছেন।

এই জাতীয় অকিঞ্চিৎকর চরিত্রে শুভেন্দু আর মাধবী যতটা পেরেছেন বাস্তবের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন। সে-জন্য কিছু বাড়তি প্রশংসা তাঁদের প্রাপ্য। চারখানি গানই ছবিতে বেমানান। হীরেন ঘোষের দেওয়া সুরে বৈচিত্র্য তেমন নেই, কিন্তু আবহ-সঙ্গীত রচনায় কিছুটা বৈচিত্র্য তিনি দেখিয়েছেন। ছবির আর একটি বড় গুণ সম্পাদনার চাতুর্য। সম্পাদক অমিয় মুখোপাধ্যায় যে একটা অসাধ্য সাধন করেছেন সেটা ছবি না দেখলে বোঝানো মুশকিল। বিজয় ঘোষের ক্যামেরাও কোথাও কোথাও ছবির মাধুর্য বাড়িয়েছে। এ ছাড়া অসিতবরণের অভিনয়ও কিছুটা প্রশংসার দাবী রাখে—যদিও কি কারণ জানি না চরিত্রটি পর্দা থেকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত।

—রবি বসু

দীপঙ্কর দে, অর্জুন মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা / এক যে ছিল দেশ / পরিচালনা তপন সিংহ

সংগীতাঙ্গ

বেহরাম খাঁ মৃত্যু শতবার্ষিকী

ডাগর ধ্রুপদ ঘরানার উৎস বাহাদুর শাহের যুগ। ঘরানার জনক ছিলেন বাবা গোপাল দাস ওরফে ইমাম খাঁ, এঁরই পুত্র ছিলেন বাবা বেহরাম খাঁ এবং ইনি জয়পুর দরবারের প্রধান সভা-গায়ক ছিলেন। যদিও এঁর পুত্র সদ্দু খাঁ ও আকবর খাঁ সুগায়ক ছিলেন, ডাগর ঘরানার ধারা প্রধানত বেহরাম খাঁর ভ্রাতা হায়দার খাঁর বংশের মাধ্যমেই আমাদের যুগে নেমে এসেছে।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি বেহরাম খাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকী ছিল এবং এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ওস্তাদ আমিনুদ্দীন খাঁ ডাগর পরিচালিত

যদি একই ধরনের কথায় বেদনার দুটি রূপ দেখানো অভিপ্রেত হয়ে থাকে তবে 'আমারে বাঁধবি তোরা, সেই বাঁধন কি তোদের আছে' (গীতিসপ্তালিকা) গানটি প্রত্যাশিত ছিল। আর একটি গোলমাল স্কেল নির্বাচন নিয়ে। আবৃত্তির অবকাশেও স্কেল বদলানোর সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গান গাওয়া হয়েছে একটাই নীচু স্কেলে (সম্ভব 'এ')। ফলে অনেক গানে সম্পূর্ণ মেজাজ আসেনি। যেমন 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' গানে মন্দ্রসপ্তক অথবা পূরবী রাগাশ্রিত 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' গানের খাদের 'নি' কোন সময় স্বাভাবিক নয়। —দেবাশিস দাশগুপ্ত

দু'শো বছরের বাংলা গান

অরূপ শিল্পী গোষ্ঠী ৯ মার্চ রবীন্দ্র-সদনে দুশো বছরের বাংলা গান নামক একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। গত দুশো বছরের বাংলা গানের বিপুল পটভূমিকায়, টপ্পা, আড়খেমটা, আড়াঠেকা, কাওয়ালী, দাদরা এবং বাংলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল রাগসংগীত ও কাব্য-সংগীতের বহু বিচিত্র মনোহর নিদর্শন বর্তমান। সেই অসামান্য গায়কীর নানান ধারার প্রতিফলন এই আসরে দেখা যায়নি। এক নাটসংগীতের বৈচিত্র্যই এত অধিক যে বোধ করি দু-ঘণ্টার প্রোগ্রামে তার অনেকখানিই দেখানো যায় না। তবে গত দুশো বছরে অনেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং গানও রচনা করেছেন, তাঁদের মাঝখান থেকে কিছু গান সংগ্রহ করেও এ রকম একটা আসর করা যায়। এই অনুষ্ঠানটি সেই জাতীয়। গানগুলি প্রায়শই আধুনিক পদ্ধতিতে গাওয়া, এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগের যে ক্লাসিকাল পদ্ধতিগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পীদের মধ্যে দেখা যেত তার কোন নিদর্শন কোন গানেই পরিস্ফুট হল না। আসলে অনুষ্ঠানটি যেভাবে করা হল তাতে এর আখ্যা 'দার্শনিক প্রেক্ষণে বাংলা গান' গোছের কিছু একটা দিলেই ভাল হত। গানের স্তর সাধারণ পর্যায়ের। এ অনুষ্ঠান বিশেষজ্ঞের জন্য নয়, যাঁরা সাধারণভাবে গান শোনেন উৎসুক তাঁদের আগ্রহ কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্তা আঙ্গুরবালা দেবী, শ্রীযুক্তা মহাশ্বেতা ঘোষ ও শ্রীস্নিগ্ধা রায়চৌধুরী। তবলা সংগতে ছিলেন ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁ। ভাবব্যাখ্যা করেছিলেন শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য। সহযোগী শিল্পীদের নাম শ্রীশংকরদেব সাহা, শ্রীখোকন সেনগুপ্ত, শ্রীঅরূপ সাহা, শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীধনঞ্জয় মল্লিক।

—রাজেশ্বর মিত্র
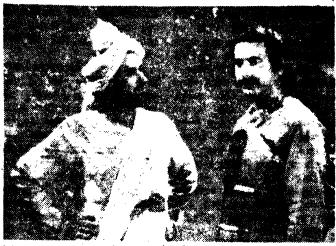
বিপিন মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র/ আনন্দমঠ/ পরিচালনা : সতীশ দাশগুপ্ত

রেকর্ড

এবারের মত বসন্তগত জীবনে

"না আর বলো না/আমার মুখটা চাঁদের মতো/চুলটা মেঘ কালো কালো/চোখটা কালো হরিণ" এই অনুরোধ রসজ্ঞ শ্রোতা-মাত্রই আধুনিক গীতিকারদের উদ্দেশ্যে করতে পারেন। যাই হোক শ্রোতাদের মনের ভাব পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় অসীমা ভট্টাচার্য নিজেই সুর দিয়ে গেয়েছেন। ভদ্রলোকের এক কথা। আধুনিক গানের ভাব, ভাষা সুর এখনও এক রকম আছে। বাবু গৃহঠাকুরতার কথায় অসীমা ভট্টাচার্যের কান্নার ভাবটা জেনুইন। 'ফোটে না ফুল/আসে না ভ্রমর/ভুলেও আসে না কেউ/নিতে গো খবর/...আমি কি ভাবে যে বেঁচে আছি/কিভাবে আমার রাত কাটে দিন/সে খবর নিতে কারো/হৃদয় হয় না উদাসীন।" এই খবর না পাওয়ার বেদনাটি বড় সংক্রামক। এই খবর না নেওয়ায় অসীমা ভট্টাচার্য যেমন হাপুস নয়নে কাঁদেন, খবর না পেয়ে কৌশিক বসু নিজের সুরে প্রচুর অর্কেস্ট্রা সহযোগে চিৎকার করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রতি অন্তরার শেষে হেঁচকি তুলে স্থায়ীতে ফিরে আসেন 'আজ একা একা বসে বসে ভাবি/তোমার উপর আমার নেই কোন দাবি/মনে ওঠে শত প্রশ্নের ঝড়/অনেক দিন তো পাইনি খবর' (কথা—মিলন বসু)। এই রেকর্ডের উল্টোদিকে নাসিরের দেখা পেয়ে তিনি প্রায় নেচে ওঠেন (হিন্দী ছবির টাঙ্গাওয়ালা ঠেকা সমেত)। "নীলগী চোখে তার মায়া টানা/মনের খবর তার হয়নি জানা/... গোলাপী ঠোঁটে তার ফোটে যে গোলাপ/উচ্ছল ছলছল বুকে সে প্রলাপ' এরপর যদি কোনদিন রেকর্ডে রকের আড্ডার গান 'ও পাড়ায় দেখে এলাম লচকদারী ডবকা ছুঁড়ি' জাতীয় গান শুনতে পাই, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। দুজনে দেখা হলেই স্বপ্নের দেশ রচিত হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজ সুর দিয়ে অসীমা ভট্টাচার্যের সংগে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছেন 'স্বপ্নের দেশ'—"এস এইখানে আজ থামি এখানে গান শোনাব আমি" (কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়) সুরে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শোনা পাঁচালীর মত বহু পরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত।

যে কোন শিল্পীব্যক্তিত্বর প্রভাব থাকতেই পারে, এবং তার মধ্য দিয়ে ক্রমশ স্বকীয়তা প্রকট হয়ে ওঠে, কিন্তু অসম অনুকরণ শুধু বিরক্তির খোরাক হয়। বাচ্চু রহমানের 'তোমার সূর্যমুখী' গানে তারসপ্তক এবং 'মেঘ মেঘ সারা আকাশ' গানের মন্দ্রসপ্তকের কষ্টকর স্বরক্ষেপ কণ্ঠের সীমিত ক্ষমতা করুণা জাগায়। অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুর করা দুটি গানের প্রিলিউও প্রায় এক—একেই বোধ হয় স্বকীয়তা বলা হয়ে থাকে। মানসকুমারের সুরে শ্যামলী মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন 'বল না মন হারালে আমার কি হতে পারে/ এ চোখে এ মুখেতে কি কি রং লাগতে পারে?' খুব কঠিন প্রশ্ন। তবে সমবেত প্রচেষ্টায় যদি এভাবে বাংলা গান চলতে থাকে তবে সম্ভাবিত যে রং লাগার আশংকা জাগায় সেটি হল—চুন ও কালি।

অনল চট্টোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুচোখে হারাক আলো' একটি ভিন্ন স্বাদের গান। সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি পরিচিত শিল্পী—বসন্ত বাহারের গান তাঁর পরিচিতি আরও বাড়াবে। নতুন শিল্পীদের মধ্যে সুধীন

সরকার কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে কেদারা রাগাশ্রয়ী 'চোখের আড়ালে হারালে' গানটি এই সার্বজনীন অক্ষমতার জোয়ারের মাঝে শুনতে ভাল লাগে। আরও ভাল লাগে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় দেবীরঞ্জন ব্যানার্জীর সুরে ললিতা ধরচৌধুরীর দুটি গান। বাংলা গানে শ্রীরাধা, তাঁর ননদীরা, শাশুড়ী সয়েত অক্ষর, অমর, অক্ষয়। নির্ভাপ্রিয় ঘোষদস্তিদারের সুরে উৎপলা গোস্বামীর দুটি গান পরিণত প্রতিভার পরিচায়ক। খাম্বাজ ভিত্তিক 'কথা শুধু কথা হয়ে রয়' গানের সঞ্চারীতে যেভাবে 'অস্তাচলের' সুর এসেছে সেখানেই সুরকারের বাহাদুরী প্রমাণিত। আরও ভাল লাগে 'না না না তুমি এমন করে কাছে ডেকো না' (কথা—শান্তিময় কারফরমা) রবীন্দ্রনাথ থেকে আজ পর্যন্ত কতবার কত-ভাবে না যেওনা অথবা 'কাছে ডেকো না' বলা হয়েছে সেটা নিয়ে কেউ গবেষণা করলে মন্দ হয় না।

প্রায় সব গান শুনেই যখন হাসি পায় তখন আরও হাসির জন্য উপরি পাওনা হিসাবে পাওয়া যায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার ও রত্না ঘোষাল অভিনীত হাসির স্কেচ মামা-ভাগ্নে। এঁর আবার স্কেচের শেষদিকে কান্নার মোচড় আনেন। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় বরাবর হাসির সঙ্গে কান্নার রেশ নিয়ে আসার একটা ড্রামাটিক ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়। তবে এবারের প্রয়াসটি অনায়াস নয়, জবরদস্তি।

একই ধরনের কথা ও সুর এবং শাস্ত্রীয় কণ্ঠে এইচ এম ভি নিবেদিত 'বসন্ত বন্দনায়' গানে বসন্ত যখন প্রায় নির্বাসিত, ঠিক তখনই কোকিলের ডাক শোনা গেল। কোকিলটির নাম আরতি মুখোপাধ্যায়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, এমাই এস মালকীর সুরে শিল্পী যে গান গেয়েছেন তারপর বাংলা গানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একেবারে হতাশ হওয়া চলে না। কর্ণাটকী সুরের প্রাণ বাংলা গানে নতুন কিন্তু সম্পূর্ণ চাটি আয়ত্তে এনে দাপটে গাওয়া বোধহয় এই প্রথম। তার বাঁশি যে কোড়ে নিয়ে গেল বাংলা গানে সম্পূর্ণ নতুন রীতির সংযোজন। অন্য তিনটি গানও প্রথম গানের চমক ভাঙতে দেয় না। আকম্পা, গায়কী, অলংকার প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রেই এই বিস্ময়-কর পরিমিতি।

চারটি নজরুলগীতি গেয়েছেন ইলা বসু। কণ্ঠের ক্লান্তি সত্ত্বেও, মেজাজটি অক্ষুণ্ণ। আর একটি সংগ্রহযোগ্য রেকর্ড, অতুল-প্রসাদের ছয়টি গানের সংকলন। গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায় ও বন্দনা সিংহ। স্টিরিও রেকর্ডে কয়েকটি গানে রিভাইরেশন অদ্ভুত কার্যকরী হয়েছে। ছয়টি গানের তিনটি ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন ধরনের গান 'ক্ষমিও হে শিব' এবং 'আর কতকাল থাকব বসে'। 'জয়শ্রী' রাগ বিস্তারে অথবা কীর্তনাঙ্গ গানে, সর্বক্ষেত্রেই প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্যা। একটা কথা জানতে ইচ্ছে হয়—ইলা বসু ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই আধুনিক গানের পরিচিত এবং অভিজ্ঞ শিল্পী। এঁরা এবং আরও অনেকে আজকাল আধুনিক গান ছাড়াও যে অন্য গান করেন, সে কি শুধু শৈল্পিক নিষ্ঠায় বিষয়ান্তরে যাবার প্রয়াস অথবা দিনের ক্লান্তি শেষে, কোন নদীতীরে একাকী নির্জনতায় অবগাহন?

পরলোকগত সুরকার রবীন চট্টো-পাধ্যায়ের সুর করা চোদ্দখানি পুরোন গান একটি লং প্লেইং রেকর্ডে বেরিয়েছে। গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, তালাত মামুদ, উৎপলা সেন ও বনশ্রী সেনগুপ্ত এবং শিপ্রা বসু। বিদেশী চটুলতার চেয়ে দেশজ ঐতিহ্যে তাঁর নির্ভরতা বেশী ছিল। সুরকার হিসাবে চিত্রজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। পরবর্তী কোন সময়ে যদি সাত নম্বর বাড়ি থেকে শেষতম পর্যায় পর্যন্ত কোন একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন বের করা যায় তবে সুরকার হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই আবিষ্কৃত হবে। আর একটি লং প্লেইং রেকর্ডে জনপ্রিয় শিল্পী মিলন গুপ্ত মাউথ-অর্গানে কয়েকটি হিন্দী ফিল্মের হিট গান বাজিয়েছেন, সুতরাং সম্ভাবিত জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমেয়।

নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় ময়মনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' অবলম্বনে 'চাঁদ বিনোদ' লোকগীতিনাট্য একটি লং প্লেইং রেকর্ডে গাঁথা হয়েছে। সুপ্রাচীন লোকগাথায় কণ্ঠ দিয়েছেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং আরও অনেকে। নাটকীয় বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অনেক রকম সুর প্রয়োগ করা হয়েছে এমন কি এক জায়গায় 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের কোটাল নির্ভুলভাবে চকিতে দেখা দিয়ে যায়।

আধুনিক গানে সাম্প্রতিকালে যে-সব ঘরানা চালু, তাঁদের মধ্যে শ্যামল মিত্র অন্যতম। শ্যামল মিত্রের পুরোন চোদ্দটি গানের একটি সংগ্রহ প্রকাশিত, কিন্তু নির্বাচনটি সুখপ্রদ নয়। এইসব গানের কথা ও সুরে একঘেয়েম আসতে বাধ্য। কথার দিক দিয়ে 'তুমি আর আমি' এবং 'মরণের পরে' দুটি বিষয়ের সংখ্যাধিক্য। অথচ এই সংগ্রহে অনেক গান অপরিহার্য ছিল শ্যামল মিত্রের অগ্রগতির সালতামামি করতে। যেমন—'স্মৃতি তুমি বেদনার' (সুর—সুধীরলাল চক্রবর্তী)। 'হংসপাখা দিয়ে' এবং 'ছিপখান তিন দাঁড়' (সুর—অভিজিৎ) 'চৈতালী চাঁদ যাক ডুবে যাক' (সুর—ভূপেন হাজারিকা), সলিল চৌধুরীর 'যদি কিছু আমারে শুধাও' (যদিও আর একটি লং প্লেইং রেকর্ডে গানটি আছে)। এবং নিজের সুরে ভাটিয়ার রাগাশ্রয়ী 'তরীখানি ভাসিয়ে দিলাম' এই গানগুলি থাকলে শ্যামল মিত্রের মর্যাদা আরও বাড়ত বলে আমার বিশ্বাস। একটি প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখানোর জন্য সুনির্বাচন প্রাথমিক কর্তব্য।

একটি স্মরণীয় এল পি রেকর্ড, উমা বসুর (হাসি) কণ্ঠে চোদ্দখানি গান। দিলীপ-কুমারের সুর নিয়ে বেশি আলোচনা হয়নি এবং উমা বসুর সেই অনবদ্য গান যখন শুধু স্মৃতিকে উদাসীন করত, তখন গ্রামোফোন কোম্পানির এই উপহারে গীত-সুধার জন্য পিপাসিত চিত্ত মাত্রেই কৃতার্থ বোধ করবেন। —দেবাশিস দাশগুপ্ত

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

টেলিফোন
৫৩-২২৮০
৫৩-৮৩৫৬

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়, সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১১·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মারফত (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

"মা তোমার বোর্নভিটা খেয়ে নাও
...এটা তোমার পক্ষে ভাল"

"আর স্বাদও কত ভাল দেখ!"

কেননা বোর্নভিটায় আরো বেশী কোকো থাকায় এটি অনেক বেশী সুস্বাদু ও অনেক বেশী পুষ্টিকর হয়ে উঠেছে।

বোর্নভিটার কোকো রক্ত গ'ড়ে তোলার আয়রণে সমৃদ্ধ, এছাড়াও এতে আছে ভিটামিন বি এবং ডি আর ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মত খনিজ পদার্থ। শুধু তা'ই নয়— বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।

আপনার বাচ্চাদের বোর্নভিটা রোজই খাওয়ান, দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত বয়সে মূল্যবান যে-সব পুষ্টিগুণ দরকার—বোর্নভিটা সে-সব যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার ...ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে!

বোর্নভিটা আপনি ৪৫০ গ্রাঃ রিফিল-প্যাকেও পাবেন, যা'তে আপনার বাঁচবে ১৫ পয়সা! বোর্নভিটা টাটকা রাখতে—রিফিল প্যাক থেকে সঙ্গে সঙ্গে বোর্নভিটার এক টিনে ঢেলে রাখবেন।

অধিক কোকো,
অধিক শক্তি, অধিক স্বাদ

OBM-6715-BEN

মশলা
নতুন সাজে
সানরাইজ
স্বাদে ভরপুর স্বাস্থ্য টইটুম্বুর
সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬, পাথুরীয়াঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ যামিনী রায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ মাদল হাতে এই সাঁওতাল যুবকের ছবিতে একটা মাদকতা আছে। কালো আর আকাশী রঙের বর্ডার টেনে ছবিটিকে বাঁধা হয়েছে। তারপর হলুদ রঙের জমিতে এই মেটে রঙের মানুষটাকে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাস্কর্যের মতো তার অবয়ব উঠে গিয়ে বর্ডারে এসে ঠেকেছে। ডান হাতটি ওপরে ওঠে গেছে আর তার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে ডানদিকের নীচের কোণে একটা মাটির পাত্রকে রাখা হয়েছে। আপাত সারল্যের মধ্যে রচনার গাম্ভীর্য এসেছে। রঙ ব্যবহারে সংযম লক্ষণীয়। (ছবিখানি কবি সমর সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ২৯ সংখ্যা
শনিবার ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

জন্মশাসনের বিধি ও বাধ্যতা

'অতিশয় প্রজার ভারে ধরণী হবে না'—কবি দাশরথি রায়ের এই উক্তির যে, ম্যালথাসের অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়েছে বলে এমন ধারণা করবার কোন অর্থ হয় না যে, ঊনিশ শতকের এক জ্ঞানী কবি ঊনিশ শতকের বিদেশীয় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ম্যালথাসের অভিমতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দাশরথি রায়ের উক্তিতে তাঁর সহজ ও সরল উপলব্ধির একটি সহজ অভিব্যক্তি হয়েছে। ম্যালথাসের নীতির সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে কোন কোন অর্থনৈতিক পণ্ডিতের এবং মতবাদের বিশেষ অবদানে মালথাসীয় নীতির প্রতি বিশ্বাস এবং সমর্থনের অভাব নেই। অর্থনৈতিক বিচারের তথ্যগত সাবধান বিশেষজ্ঞ সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্য ছেড়ে এই সত্যের ছবিটি দেখতে পাবেন যে, দ্রুত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা যুগে যুগে ও দেশে দেশে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছে এবং করছে। অতিশয় প্রজার সংখ্যাধিক্য পৃথিবীর [illegible] চোখে বস্তুত একটা দুঃসহ ভার। যে ভার সহ্য করতে ধরণীর ক্লেশ হয়, এবং সেই ক্লেশের কারণে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ খর্ব হয়ে যেতে বাধ্য হয়। বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, জন্মসংখ্যার বৃদ্ধি রুদ্ধ না করে দিতে পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ অতি কঠোর রকমের খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হবে, এবং সেটা অনাবিধ বিপর্যয় সম্ভাবিত করে জাতীয় জীবনের শান্তি ও প্রগতির বনিয়াদ নিদারুণ প্রকারে বিচলিত কিংবা বিনষ্ট করে দিতে পারে।

এ ধরনের সংশয়াপন্ন অনুমান নৈরাশ্যবাদের মতো এক বিষণ্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় বলে অভিযুক্ত হতে পারে। তবু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সীমিত ও সংযত না হলে জাতির ভবিষ্যতের জীবনে খাদ্যের অভাব একটা চিরন্তন অভিশাপ হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : স্বাধীনতা লাভ করবার পর দেশের খাদ্য উৎপাদনের হার ও পরিমাণ অনেক বেড়েছে, কিন্তু জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির কারণে খাদ্যের অভাব ঘটেছে, খাদ্যের দাম বেড়েছে। স্বাধীন ভারতের জনসংখ্যা আঠাশ বৎসরের মধ্যে বস্তুত দ্বিগুণ (প্রায় ষাট কোটি) হয়েছে। দেশের কৃষির ক্ষেত্র বছরে তিন বিঘিত সোনার ফসল প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেও খাদ্যের অভাব থেকেই যাবে, যদি জনসংখ্যার হার অবাধে বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

পরিবার পরিকল্পনা জাতির অর্থনৈতিক প্রসারতার একটি প্রতিশ্রুতি, শুধু সেজন্য নয়, পারিবারিক জীবনের শান্তি আনন্দ ও নিরাপত্তার একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতি বহন করছে বলে পরিবার পরিকল্পনা বস্তুত ব্যক্তির পক্ষে তার জীবনের একটি নৈতিক ব্রতাচারের মতো অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃত হবার উপযোগী গুরুত্ব লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী করণ সিং লোকসভাতে পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে জাতীয় কর্তব্যের যে নীতি ও পদ্ধতির পরিচয় বিবৃত করেছেন, সেটা ভারতীয় জাতির ভবিষ্যতের ভাগ্য নির্বিঘ্ন করবার একটি উদাত্ত অঙ্গীকারের ঘোষণা। বিয়ের বয়সের সীমা বাড়িয়ে দিয়ে ভালই হয়েছে। কিন্তু এমন আশা করবার পরিসংখ্যান এখনই সুস্পষ্ট করে কেউ নির্ণয় করে দিতে পারবে না যে, বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দেবার ফলে ১৯৮০ সালের মধ্যে দেশের জন্মবৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে পেতে শতকরা ১.৫ অথবা ১.৩ মাত্রায় এসে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে সফলতার আঙ্কিক হিসাবটা মোটামুটি একটা আশাবাদের আঙ্কিক হিসাব।

লক্ষ্য করতে হয়, জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা অভিমত বেশ মুখর হয়েছে। এই অভিমতের মধ্যে প্রচলিত সংস্কারের প্রতি মায়াপরবশ চাঞ্চল্যের পরিচয় যতটা পাওয়া যায়, বাস্তব অবস্থার প্রতি মাঙ্গলিক চেতনার পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না। সংস্কারের দৃষ্টিতে বাধ্যতা যতই বাধুক না কেন, ভারতে কোন-না-কোন প্রকারের বাধ্যতার বিধি নীতি ও ব্যবস্থা ছাড়া জন্মসংখ্যার বৃদ্ধির হার সুস্পষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত একটি নিম্নতর মাত্রাতে এসে ঠেকবে না। তা ছাড়া, বাস্তবতার এই ভয়ানক সত্যটিকে স্বীকার করতেই হবে যে, দেশের জনসমাজের মধ্যে এমন অনেক শ্রেণী আছে, যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের হিতাহিত সম্বন্ধে কোনরকমের দায়িত্বভার পোষণ করে না, এবং অজস্র সংখ্যক সন্তানের জনক-জননী হওয়া তাদের জীবনে বস্তুত একরকমের যথেচ্ছাচারের ক্রিয়াফল। শিক্ষামূলক প্রচার ও পরামর্শ এদের মনে এবং আচরণে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিধি গ্রহণ করবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে কখনো সফল হবে কিনা, সন্দেহ। আর্থিক সঙ্গতির পর্যায়ে এরাই আবার সবচেয়ে বেশী অসহায়। এক্ষেত্রে জন্মশাসন করবার বাধ্যতার পদ্ধতি ছাড়া কোন পদ্ধতিই যথোচিত সুফলপ্রসূ হবে না। অনেকের ধারণা নির্বীজ হতে বাধ্য করাই একমাত্র সার্থক পদ্ধতি নয়। হতে পারে, এই শ্রেণীর অভিমতের মধ্যে বড়-রকমের কোন ভুল নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত নীতির মধ্যেও বাধ্যতার প্রশ্রয় নেই। আপাতত নেই। কিন্তু ভারতের জন্মসংখ্যাবৃদ্ধির বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতির নানা জটিলতার সমারোহ লক্ষ্য করলে এই সত্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, নির্বীজকরণই সবচেয়ে সার্থক পদ্ধতি। সব চেয়ে কৌতুকের ব্যাপার এই যে, গর্ভমোচনের অবাধ অধিকার নিয়ে যে-সব বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ এবং প্রচারক এই সেদিনও প্রবল সমর্থন মুখরিত করেছেন, তাঁরাই আবার নির্বীজ করবার পদ্ধতির মধ্যে নৃশংসতা ও 'অনাচার' লক্ষ্য করছেন। অর্থাৎ তাঁদের অভিমতের নীতিটা এই দাঁড়িয়েছে যে, একটি শিশুকে মাতৃগর্ভে অংকুরিত হতে দিয়ে তারপর বিনাশ করা যেন একটা শোভন ও প্রগত সংস্কারের কাজ। নির্বীজ করবার পদ্ধতির মধ্যে কোন শিশুর পক্ষে ভ্রূণাঘাত হবার সম্ভাবনাই নেই। বরং বলা চলে, এই পদ্ধতির মধ্যে কোন নৃশংসতা নেই। যা-ই হোক, আশা করা যায় যে, এইবার পরিবার পরিকল্পনার কাজ বাস্তবতাসঙ্গত রূপে গ্রহণ করবে। কোন সন্দেহ নেই, পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রবৃদ্ধি জাতীয় ভবিষ্যতের একটি বৃহৎ কল্যাণের সার্থক অঙ্গীকার।

এই সপ্তাহ

সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন, ১৯৭৫ সালের ২৭শে জুন রাষ্ট্রপতি যে নির্দেশ জারি করেছেন সেই নির্দেশ যতদিন কার্যকর থাকবে ততদিন মিসা বন্দীদের তাদের আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে আপিল করার অধিকার থাকবে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে রাষ্ট্রপতির যে বিশেষ ক্ষমতা বর্তায় সেই ক্ষমতা অনুসারে ২৭শে জুনের নির্দেশ জারি হয়েছিল। এই নির্দেশে বলা হয়েছে, মিসায় আটক বন্দী সংবিধানের ১৪, ২১ ও ২২ ধারায় এদেশের নাগরিকদের যে সব মৌল অধিকার দেওয়া হয়েছে তা আদায়ের জন্য হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে বা হেবিয়াস করপাস দরখাস্ত করতে পারবেন না। এই তিনটি ধারায় নাগরিকদের মুখ্যত সমানাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আটকের কারণ জানবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলি ছাড়া সংবিধানের ১৯ ধারায় যে সাতটি মৌল অধিকার দেওয়া হয়েছে জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্য সেগুলি থেকেও নাগরিকরা বঞ্চিত হয়েছেন।

এলাহাবাদ, বোম্বাই (নাগপুর শাখা), দিল্লি, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থান এই সাতটি হাইকোর্ট এই বিষয়ে যে রায় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ভারত সরকার ও কয়েকটি রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিলেন। এই আপিলের শুনানীর জন্য সুপ্রিম কোর্টের যে কনস্টিটিউশান বেঞ্চ গঠিত হয় তাতে প্রধান বিচারপতি এ এন রে ছাড়া আরও চারজন বিচারপতি ছিলেন এম এইচ বেগ, ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়, পি এন ভগবতী ও এইচ আর খান্না। এই পাঁচজন বিচারপতি অবশ্য একমত হতে পারেননি। সুপ্রিম কোর্টের রায় সংখ্যাধিক্যের রায়, ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন বিচারপতি খান্না। তিনি বলেছেন, জরুরী অবস্থার কালে হাইকোর্টের হেবিয়াস করপাস রিট জারি করার ক্ষমতা মূলতুবী রাখবার অধিকার সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে দেয়নি। হাইকোর্টের রিট জারির ক্ষমতা সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং রাষ্ট্রপতির নির্দেশের কোন বিশেষ ব্যাখ্যার দ্বারা হাইকোর্টের এই ক্ষমতা লোপ করা যায় না।

অবশ্য সংখ্যাধিক্যের অভিমতই সুপ্রিম কোর্টের অভিমত। এই অভিমত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুকূল হওয়ায় ইতিপূর্বে যে সাতটি হাইকোর্ট এই বিষয়ে বিপরীত রায় দিয়েছিলেন তাঁদের রায় বাতিল হয়ে গেল। এই অভিমতের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে এ বিষয়ে যে সব দরখাস্ত পড়েছে সেগুলি নিষ্পত্তি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে করতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেছেন, এখানে প্রায় ২০০০ হেবিয়াস করপাসের আবেদন জমে আছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পূর্ণ বয়ান না দেখে এই ২০০০ আবেদনের কী ভাবে নিষ্পত্তি হবে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে তিনি অসম্মত হন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী গত মাসে যে প্রস্তাব করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তাতে সম্মত হওয়ায় ভারত সরকার স্থির করেছেন যে এই আলোচনার জন্য তাঁরা ইসলামাবাদে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পাঠাবেন। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন পররাষ্ট্র সচিব। নয়াদিল্লিতে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন, ভারত সরকার এই মাসের শেষে এবং এই আলোচনার খুঁটিনাটি সব কিছু স্থির করার জন্য দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা পারস্পরিক যোগাযোগ রাখছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী ডঃ কর্ণ সিং লোকসভায় ঘোষণা করেছেন, নির্বীজকরণ বাধ্যতামূলক করবার জন্য আপাতত কোন কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করা হবে না। তবে কোন রাজ্য সরকার এরকম আইন পাস করতে চাইলে এবং সে রাজ্যে এই আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা থাকলে ও রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীর এই আইনে সায় থাকলে কেন্দ্র তাতে বাধা দেবেন না। কর্ণ সিং বলেন, দিল্লীর লেঃ গভর্নর রাজধানীতে বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণ চালু করার অনুমতি দেননি। এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, কিন্তু তার জন্য কোন চাপ দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে যে সব গুজব ছড়াচ্ছে তা অস্বীকার করে তিনি বলেন, চাপ দেওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণ সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলা সরকার তাঁদের নীতি এখনও স্থির করেননি। তবে এ রাজ্যে ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি অপারেশন যাঁরা করাবেন তাঁদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ১লা মে থেকে বাড়ানো হয়েছে। এখন দুই বা তার কম সন্তানের পিতা ভ্যাসেকটমি করালে ১০০ টাকা পাবেন, মা যদি টিউবেকটমি করান তিনিও তাই পাবেন। তিন সন্তানের পিতা ভ্যাসেকটমির জন্য পাবেন ৫৫ টাকা, মা টিউবেকটমির জন্য পাবেন ৫০ টাকা, চার বা তার বেশী সন্তানের পিতা ভ্যাসেকটমি করালে পাবেন ৪৫ টাকা, মা যদি টিউবেকটমি করান তা হলে পাবেন ৩০ টাকা। আগে ভ্যাসেকটমির জন্য সব ক্ষেত্রেই দেওয়া হত ৬১ টাকা, টিউবেকটমির জন্য ২১ টাকা।

পশ্চিম বাংলার প্রধান বিচারক শঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেছেন, এ রাজ্যের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে এখন সওয়া দুই লক্ষেরও বেশী মামলা ঝুলছে। বিচার বিভাগকে নির্বাহী (এক্‌জিকিউটিভ) বিভাগ থেকে পৃথক করার পর বিপুল সংখ্যায় বকেয়া মামলা নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। তার উপর নতুন ফৌজদারি বিধি চালু হওয়ার পর দায়রা মামলার সংখ্যাও খুব বেড়ে যাচ্ছে। আগেকার আইনে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করে 'যোগ্য' মামলাকেই দায়রায় পাঠাতেন। নতুন আইনে ম্যাজিস্ট্রেটের এই তদন্তের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁরা সব মামলাই দায়রায় পাঠাচ্ছেন। বিচারপতি মিত্র বলেছেন, নিম্ন আদালতে এখনও ৫৪টি বিচারকের পদ খালি রয়েছে।

গঙ্গার জল বণ্টন সম্পর্কে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে টেকনিক্যাল পর্যায়ে দু' দফা কথাবার্তা হবে, প্রথম দফা আলোচনা ঢাকায় হয়ে গেছে, দ্বিতীয় দফা হওয়ার কথা দিল্লিতে। ঢাকায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন কেন্দ্রীয় সেচ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সি সি প্যাটেল; সাত জনের এই দলের সহকারী নেতা ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জে সি আজমানি। ঢাকায় আলোচনার শেষে দিল্লি ফেরার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে আজমানি বলেন, ফরক্কা প্রকল্পের ফলাফল হুগলী নদীর নাব্যতার ওপর কী হয়েছে তা দেখবার জন্য বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি দল কলকাতায় আসছেন; এই প্রতিনিধি দলের নেতা হবেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা বি এম আব্বাস। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দলকে কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রাম জানিয়েছেন, কলকাতা-হলদিয়া বন্দর ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য ফরাক্কা থেকে ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে প্রয়োজন মত জল পাওয়া যাবে।

৩।৫।৭৬

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

শনৈঃ পন্থা :

পণ্ডিতেরা বলেছেন পথ চলতে, কাঁথা সেলাই করতে কী পাহাড় ডিঙুতে তাড়াহুড়ো করতে নেই—ধীরেসুস্থে ওসব কাজ করতে হয়। উপদেশটা ভিয়েতনাম পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা জানি না, তবে কাজে দেখছি ভিয়েতনামের বামপন্থী নেতারা ওই উপদেশ মেনেই চলছেন। সেখানে তাঁরা চাইছেন রাজনীতিতে নতুন পথ বেয়ে চলতে, দু টুকরো দেশটাকে নির্বাচনী ছুঁচ দিয়ে সেলাই করে জোড়া লাগাতে, বিভেদ-বিচ্ছেদের পাহাড় ডিঙিয়ে একতার সমতলে পৌঁছুতে। কিন্তু তাড়াহুড়ো তাঁরা মোটেই করছেন না। এক বছর হয়ে গেল ভিয়েতনাম থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে মার্কিনীরা দেশে ফিরে গেছে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রপতি থিউ দেশ থেকে বিদেশে ঠাঁই নিয়েছেন। উত্তরের মতো দক্ষিণেও এখন সব শান্ত, সেখানেও ক্ষমতার লড়াই চুকে গেছে—অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারই সেখানে এখন স্থায়ী সরকার, তার ক্ষমতার ভাগীদার বলতে কেউ নেই। দু ভিয়েতনামেই ক্ষমতা কব্জা করেছে কম্যুনিস্টরা।

তবুও কিন্তু ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যায়নি, একাকার হয়ে যায়নি ভিয়েতনামে উত্তর আর দক্ষিণ। দু এলাকার বাসিন্দাদের ভাষা এক পোশাক আশাক এক, সামাজিক রীতিনীতিও এক। তাদের মধ্যে পাঁচিল তুলে দিয়েছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা। ভিয়েতনামে আস্তানা গেড়েছিল গোড়ায় ফরাসীরা, তারপর জাপানীরা, শেষকালে মার্কিনীরা। যে যখনই চেপে বসেছে সেই তার নিজের ঢঙে ভিয়েতনামকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছে। উত্তরে শিল্প গড়ে ওঠেনি, লোকে চিরদিনই চাষবাস করে খায়। দক্ষিণেও প্রায় তাই, তবে কিছু কলকারখানা সেখানে চালু হওয়াতে আধুনিক বৈশ্য সভ্যতার ছোঁয়াচ খানিকটা লেগেছে। উত্তর এলাকায় মার্কিনীরা পাত্তা পায়নি, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল দক্ষিণে। তাদের কায়দাও ছিল আলাদা। ফরাসী-জাপানীদের মতো ভিয়েতনামের মাটি তারা কামড়ে ধরেনি, দেশটা দখল করেনি, করতে চায়ওনি। কিন্তু একের পর এক তাঁবেদার সরকার তারা খাড়া করেছিল দক্ষিণে। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে এ কাজ করছে তা অবিশ্যি মার্কিনীরা কবুল করেনি। তারা সাফাই গেয়েছিল এই বলে যে তারা ভিয়েতনামে লড়ছে কম্যুনিজম রুখতে আর গণতন্ত্র বাঁচাতে।

তামাম ভিয়েতনামের লোক যে কম্যুনিজমে দীক্ষা নিয়েছে এমন দাবি দেশের কম্যুনিস্ট নেতারাও করেন না। এমন কথাও তাঁরা বলেন না দেশপ্রেম তাঁদেরই একচেটে—অকম্যুনিস্টরা দেশকে কেউ ভালবাসে না কী তার মঙ্গল চায় না। কিন্তু কম্যুনিস্ট আর অকম্যুনিস্টদের মধ্যে মতান্তর আপসে মিটিয়ে ফেলা যেতে পারতো যদি মাঝপথে না এসে দাঁড়াতো তৃতীয় পক্ষ দেশের বাইরে থেকে। জলটা ঘোলা করেছিল মার্কিনীরা। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অকম্যুনিস্ট নেতাদেরও তারা রেহাই দেয়নি যখনই দেখেছে তাঁরা তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে রাজী নন। যাঁরা মার্কিনীদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পেরেছেন তাঁদেরই মদত দিয়েছে তারা। এতে লাভ না হয়েছে গণতন্ত্রের, না আমেরিকার। লোকে ধরে নিয়েছে গণতন্ত্রের ধ্বজা যাঁরা ভিয়েতনামে উড়িয়ে বহালতবিয়তে আছেন আসলে তাঁরা ওড়াচ্ছেন মার্কিনী জয়-পতাকা। গণতন্ত্র তাঁদের কাছে মার্কিনী ভিখ নেবার ভেক। মার্কিনীরা বেকুবি না করলে হয়তো সত্যি সত্যি খাঁটি গণতন্ত্রের একটা ঘাঁটি গড়ে উঠতো দক্ষিণ অঞ্চলে। যা উঠেছিল তা নেহাতই ঝুটো।

তবু উত্তর থেকে অনেকে পালিয়ে এসে ডেরা বেঁধেছিলেন দক্ষিণে কম্যুনিজম তাঁদের পছন্দ নয় বলে। তাঁদের আশা ছিল একটা গণতন্ত্রী প্রশাসন গড়ে উঠবে দক্ষিণ এলাকায়, পাশাপাশি দুরকম সমাজ ব্যবস্থাই চালু থাকবে ভিয়েতনামে। মার্কিনী ওপরচালাকি আর সর্দারির দরুন খাঁটি গণতন্ত্রী সমাজ আর প্রশাসন গড়ে তোলার সুযোগ তাঁরা দক্ষিণে পাননি। সেখানে মার্কিনী প্রভাবে গড়ে উঠলো এক দোআঁসলা সমাজ, এক গণতান্ত্রিক প্রশাসনের ঠাট, তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের নাড়ির কোনো যোগ ছিল না। এক সময় মনে হয়েছিল মার্কিনীদের একটা লক্ষ্য বুঝি পূর্ণ হবে, হয়তো আদর্শবাদের ভিত্তিতে দু ভাগ হবে ভিয়েতনাম—উত্তরে বজায় থাকবে কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা, দক্ষিণে টিঁকে থাকবে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হলো না, কেননা যাঁরা আগে গণতন্ত্রের আলখাল্লা চাপিয়েছিলেন তা ঢাকা দিতে চেয়েছিল তাঁদের স্বৈরাচারী মনোভাব। তাঁদের তাসের ঘর তাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো মার্কিনীরা যেতে না যেতেই। উত্তরের মতো দক্ষিণেও কায়েম হলো কম্যুনিস্ট শাসন। মামুলি গণতন্ত্রের কবর হলো দক্ষিণে।

এরপর আর ভাগাভাগির ব্যবস্থা টিঁকতে পারে না। কিন্তু ভিয়েতনামের যাঁরা এখনকার নেতা তাঁরা সবাই প্রায় উত্তরের লোক। ওঁরা মিলনের আগে দক্ষিণের লোকেদের মন তৈরি করে নিতে চান। নইলে অনর্থক গণ্ডগোল হবে, অশান্তি জিয়োনো থাকবে দক্ষিণে। সেখানকার বাসিন্দারা যে ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে, পশ্চিমীদের যে আদর্শে তাদের বিশ্বাস জন্মেছে তা ভালোই হোক আর খারাপই হোক উত্তরের সমাজব্যবস্থা আর চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন। জোর করে নতুন আদর্শবাদ আর ভাবনা তাদের ওপর চাপিয়ে না দিয়ে এখন আস্তে আস্তে তাদের মনটা তৈরি করার আয়োজন করেছেন নেতারা। ভিয়েতনামকে যিনি নিজের জীবন দিয়ে গড়ে তুলেছেন সেই হো চি মিনের অখণ্ড ভিয়েতনামের স্বপ্ন তাঁরা ভুলে যাননি। তা হলেও সে স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্যে আর একটু সবুর তাঁদের সইবে। গেল বছর ৩০ এপ্রিল ভিয়েতনামের মুক্তিযজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়েছিল। তবুও পয়লা মে বিভেদের ঠুনকো পাঁচিলটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলা হয়নি।

তবে তার কাজ আস্তে আস্তে এগিয়েছে ওই এক বছর ধরে। পঁচাত্তরের ২১ নভেম্বর দু এলাকার নেতারা সলাপরামর্শের পর ঘোষণা করলেন ভাঙা ভিয়েতনামকে জোড়া লাগাবার পাকা সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন তবে কবে তা হবে তার তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। এর পর দু এলাকায় ফৌজ এক হয়েছে, দু প্রশাসনের মধ্যে সহযোগিতা চলেছে। দক্ষিণের বাসিন্দাদের মন তৈরী করার জন্যে দেশ জুড়ে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন নেতারা। এক সঙ্গে কাজ করছে দল আর প্রশাসনের প্রচার যন্ত্র। ভিয়েতনামে এখন একটি কম্যুনিস্ট দল—দক্ষিণী শাখা মিশে গেছে উত্তরের সঙ্গে। মিলনের পরের ধাপ হিসেবে দেশ জুড়ে নির্বাচন হয়েছে জাতীয় পরিষদের ২৫ এপ্রিল। এ পরিষদের আসন ৪৯২ তার মধ্যে উত্তরের ২৪৯ আর দক্ষিণের ২৪৩। ভোট পর্ব নির্বিঘ্নে চুকেছে। বিরোধী দল বলে পরিষদে কিছু নেই—সবাই ছিলেন একদলের প্রার্থী। তিরিশ বছর পরে এই প্রথম গোটা ভিয়েতনামে নির্বাচন হলো। এই পরিষদ তৈরি করবে দেশের নতুন শাসনতন্ত্র। মুছে দেবে ভাগাভাগির শেষ চিহ্ন অখণ্ড ভিয়েতনাম গড়ে তুলে।

দেবরাজ

তবুও আছে

বিষ্ণু দে

তখনও চাঁদ ডোবে নি তনু আকাশে,
ওদিকে ওঠে লাজুক লাল দ্যুতি।
কলুষময় যতই হয়,—হোক না সমকাল,—
মৃত্যু হাঁপাও কলকাতার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
স্মৃতির পুঁথি জমায় তত স্বরিতগতি শ্রুতি!
জীবনটাই আমাদের যে ঊর্ণনাভ-জাল!

চেষ্টা নেই? তা নয় ঠিক। নানান মত-প্রয়াসে
নানা মুনির শুভইচ্ছা সুসঙ্কল্প ইত্যাদি
সদাই আছে,—অন্তত তাই এদিক-ওদিক শুনি।

অবশ্যই আছেন বাদী এবং প্রতিবাদী,—
(কিংবা অনাবাদীই!) তাই এখনও দিন গুণি,
এখনও তাই তাকাই ঐ দূরান্তরাকাশে।

মানুষেই নাকি সবার চেয়ে সহায়হীন হাসে?
যতই হাঁকো: তৈয়ার হো কোমরবন্ধ বাঁধো,
যতই হানো নিষ্ঠীবন, যতই বকো কাঁদো—
পরিণতি কি মিথ্যা নয়? জনতা জিজ্ঞাসে।

তবুও আছে অনেক শ্রুতি বিভূতি যার ভালে।
এবং আছে মানবস্মৃতি মৃদং-করতালে॥

তিতির তিতির

অনিরুদ্ধ সেন

তিতির তিতির
নিশীথ বেলা ছোঁও আমাকে তোমার মহাশীতল হাতে
অভ্যুদয়ের মহোৎসবে যখন মুখর শহরতলি,
কীর্তনাঙ্গ সুরলহরী ঘুম ভাঙাল মধ্যরাতে।
পথচারীর কলকণ্ঠে জেগে ওঠে কুঞ্জগলি,
অন্ধ গলি, বন্ধ গলি। অন্ধকারে একলা পথীর
তিতির, আমার সঙ্গী তিতির!

তিতির, সেতো উষ্ণ পাখি, বুকের মধ্যে নিরবধি
হৃদস্পন্দ, মকরন্দ, স্পর্শমাত্রে মধুক্ষরণ!
তুমিই কেবল হিমবাহ, তোমায় ছাড়া কোনো নদী
গলবে না যে মৌন শিবের মেঘজটায়। মনোহরণ
করার মন্ত্র আজও গোপন, তবু তুমি ভোরের শিশির।
তিতির, আমার স্নিগ্ধ তিতির!

শিকল কাটার ফিকির খোঁজো? শিকল যদি পুষ্পমালা
হোত, তবে সাক্ষ্য সুতোর শিথিল বাঁধন কাটতে তুমি?
কারাবাসের অনেক বালাই, পালাই পালাই অনেক জ্বালা;
এই গৃহস্থ আলয় ছেড়ে পালাও যদি, বনভূমি
তোমার আশায় আদিগন্ত—হারিয়ে যাবার অনেক ফিকির।
তিতির, আমার ইষ্ট তিতির!

যখন হাতেতে ছিল উল

সাধনা মুখোপাধ্যায়

যৌবনে প্রচণ্ড ব্যস্ত
    উলের সমস্ত গোলা
        খোলা শেষ হলে
            হাতে থাকে অখণ্ড সময়
কি করে কাটাই তাকে
    কি করে কাটাব
        বৃদ্ধতার সেই এক ভয়
যৌবনে কেটেছে দিন
    ক্ষিপ্রতার ব্যুনোটে ব্যুনোটে
        নেই নেই নেই অবসর
করি তাকে অপচয়
    আড্ডা সহ চা পানে কফিতে
মনের ফাইলগুলো তৈরি আছে
    বাঁধা নেই দীর্ঘসূত্রী কোন লাল ফিতে
ভেতরে ভেতরে তার
    অসাহিত্য পাতাগুলো
        ওড়ে ফর ফর
সেটা তো প্রৌঢ়কাল
    যখন জাবদা খাতা
        চেপে চেপে একের ওপর
তৈরী করে প্রতীক্ষার সহ্যাদ্রি পাহাড়
যৌবন মানেই দাও, দিয়ে দাও আজকেই
        যা আছে দেওয়ার

তখন হৃদয় বলে
    'আহা কি সুন্দর তুমি
        ওহে মন্থর প্রৌঢ়তা
আয়েস চিবোই পান
    বন্ধুর সঙ্গে বলি
        ঢিমে চালে চলতে চলতে
            গেরস্থালী ইত্যাদির কথা
বার্ধক্য আরও কি ভাল
    সব কাজ সারা হলে
        শেষের ঘণ্টার এক ছুটি
যৌবনে যাহার সঙ্গে
    প্রাণ ভরে মিশতে পারিনি
মুখোমুখি শুই বসি
    আমরা দুজন আহা দুটি'
    প্রাচীন বলেন ধমকে
    'ওহে ছোকরা চুপ করো
        শোন শোন এ থিওরি ভুল
এখন কাটে না বেলা
    এখন বন্ধুরা নেই
        উনিটিও শয্যাশায়ী
জমতো তখনই খেলা
    যখন হাতেতে ছিল উল'

কুঁড়ি

সতীর্থ ঘুম থেকে জেগে উঠল প্রায় টা দশেকের সময়। তাকে বুঝে নিতে কোথায় সে আছে। কালকে রাতে কি রাছিল জেগে উঠেও সহসা সে সব কথা পড়েনি তার; আস্তে আস্তে স্মৃতি রে এল;—একে একে সব পরিষ্কার; ারবোধ ফিরে এল। কিন্তু এজন্য মনে ব বেশি খোঁচা লাগছিল না তার। সমস্ত ীরটা কেমন একটা ব্যথায় টাটিয়ে ছিল। দিন পনেরো ধরে নানারকম াচার চলেছে শরীরের ওপর; কালকের নটা সব চেয়ে বেশি হাঙ্গামার ভেতর টেছে; তারপরে অনেক রাতে এসে এই ড়া মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছে। খুব লো করে চান করে নিতে হবে—বেশ করে ল মেখে—না হয় সাবান রগড়ে।

সতীর্থ আস্তে আস্তে নিজের শোবার র চলে গেল। এ ঘরটা গোছানো ঝকঝক কতক করছে। মিসেস মজুমদারই করেছে ব। একটা নতুন তেপয় এসেছে—একটা রম কুশনে আঁটা বড় ইজিচেয়ার, নতুন কটা আতরদান, ওয়াল ক্লক, ক্যালেণ্ডার টো মাত্র, কিন্তু খুব বড় এবং বড় জাতের, দের আভিজাত্যের দিকে তাকালে বেশ াগে মোটামুটি; ছুটো সোফাই বেশ কালভরা, ঘরজোড়া নতুন বৌয়ের মত— রিপাটি, দুটোই আনকোরা।

বিরূপাক্ষের জন্যেই কি এত সব? তীর্থের মন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। মণিকাকে—এতদিনেও যদি স না চিনে থাকে তাহলে কবে চিনবে যার? এক-একটা বড় ফ্যাক্টরিতে দেখেছে স যে চাকার ভেতর কত যে চাকা খাঁজ াটে কাজ করে যাচ্ছে, সমস্ত মেশিনটা কমন সহজে স্বাভাবিকতায় নড়ছে ঘুরছে: -মেশিনের সম্পূর্ণতাকে ধ্যান করা যাক—/ একটা বিসদৃশ খাঁজের দিকে তাকিয়ে থেকে

কি হবে? সতীর্থকে সমগ্রতা হৃদয়ংগম করতে হবে মহিলার—মণিকার।

মণিকাকে চেনেনি কি সে? না যদি তার সম্পূর্ণ নারী সত্যার্থকে উপলব্ধি করে থাকে সতীর্থ তাহলে কার অপরাধ?— মণিকার?—না সতীর্থের নিজের যুক্তি ও ধ্যানের?

ঘরের ভেতর মাঝ মাঘের সকালের আশ্চর্য রোদের চুমকি এসে পড়েছে বড় রোদের সঙ্গে সঙ্গে—দেয়ালে জানালায় মেঝের মোজেয়িকে স্বস্তিকা আলপনায়— উড় উড়ু উড়ুক্কু সব চিল চড়াই শালিখের পায়রার পাখনায়। পূবের দিকে প্রকাণ্ড দুটো জানালা খোলা; তাকালেই সূর্যকে দেখা যায়—যদিও সে দূর দক্ষিণাশ্রয়ী এখন; কোনো উজ্জ্বল অনুভূতির মত সূর্য ঐ মানুষের সময় ও ইতিহাসবৃত্তান্তের সারাৎসার আলোকশীর্ষের মত; যারা আগুনে বাঁচিয়ে রেখেছে—যারা আগুনে—যারা আগুন নয়, বিকেলের নদীর মত স্নিগ্ধ, যারা

আগুনে নিভিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মত জীবাত্মা—মানবসত্তার সেই সব আত্মার মত সূর্য ঐ। কাটা সুতোর অবিরল এলো- মেলো প্যাঁজের মত নদী চলেছে—সেই নদীর জলের ভেতর থেকে মাঘের দুপুরে রাজহাঁস যেমন করে তাকায় তেমনি করে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় সূর্যকে— কিংবা আদি মানবের মত—কিংবা নিরুদ্বস্ত্র, বিশুদ্ধ করে নিতে পারে যদি আজকের মানব নিজেকে তাহলে তার গভীর বোধি- শক্তির দৃষ্টি নিয়ে সূর্যের দিকে—সূর্যের ইঙ্গিতের দিকে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

সতীর্থ যে তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছে টের পেয়েছে ঐ সুদূর সূর্য। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণ- শক্তির নিবিড় পানিপীড়ন বোধ করেছে সতীর্থ—চারদিকে মাঘনীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে—শূন্যে শূন্যে —কন্যা পৃথিবীর কোলে—আলোর নির্ঝরে। একি প্রকৃতির শক্তি না সূর্য দেবী নিজে? সতীর্থের সমস্ত শরীরকে ঝিমোনো বাঘের মত পড়ে আছে দেখে দাউ দাউ করে উঠছে, ঝর্ঝর ঝাউবনানীর মত আলোর চারদিকে পৃথিবীর প্রথম বাঘিনীর দুর্বার স্নিগ্ধতা।

স্বপ্ন...শরীরই শুধু নয় আত্মার প্রতিটি স্নায়ু শিশুসূর্যদীপ্ত হয়ে নিজেকে পিতার মত মনে করছে—মিশে যেতে চাচ্ছে কোনো মহান্ নারীর সঙ্গে। সাদা আগুনের প্রবাহের ভেতর গান ঝরে ধোঁয়ায় ধবল হয়ে উঠে উজ্জ্বলন্ত জলস্রোতের মত চোখ বুজে বসে রইল সতীর্থ।

ঘরের ভেতর এসে মণিকা যে দাঁড়িয়ে- ছিল সে খেয়াল ছিল না তার। রোদ

পোয়াচ্ছ ?' বল্লে মণিকা।

কোনো কথা বল্লে না সুতীর্থ, কাপড় পর্দা বইয়ের মলাটে ছোকছোক ছাক খটাস হাওয়ার কোনো কথা বল্লে না সুতীর্থ, আওয়াজে মণিকার গলা হয় তো তার কানেও পৌঁছয়নি।

'কখন ফিরলে ?' মণিকা আবার বল্লে, 'চোখ বুজে আছ ?'

কাল রাতে নিজে যে সোফায় বসেছিল, সেইখানেই গিয়ে বসল মণিকা। সুতীর্থের কাছ থেকে কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা করে এক আধ মিনিট চুপ করে বসে থেকে নিজেই সে নিস্তব্ধতা ভেঙে বল্লে, 'কখন এলে সুতীর্থ ?'

'কে,—তুমি—'

মণিকা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—সুতীর্থও—তাদের দুজনের দৃষ্টি অনেক দূরে একটা ছোট টিপের ভেতর এক হয়ে মিশে গেছে—উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে থেকে।

'এইমাত্র এলে সুতীর্থ ?'

'হ্যাঁ, এই তো; এই ঘরে।'

'এ কি চেহারা হয়েছে ? কোথায় ছিলে ?'

'অনেক জায়গায়।'

'কোথায় ? খুব মার খেয়েছ মনে হচ্ছে।'

'দেখাচ্ছি তোমাকে।' সুতীর্থ বললে।

'থাক থাক কি দক্ষিণা দিয়েছ পেয়েছ দেখাবার জন্যে ছেঁড়া জামা খুলতে হবে না আর।'

'জামাটা খুলতেই হবে, এখন খুলব কিনা ভাবছি। আমার ট্রাঙ্কে আর জামা আছে ?'

'আমি কি করে বলব ?'

'নেই। বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি।'

'যত টাকা পেটায় তত গরীব—আফিসের ধাড়ি আইবুড়ো।'

'আইবুড়ো ছিলাম ছেলেবেলায়,' সুতীর্থ বললে, 'তারপরে আর এক রকম হল—'

'ও-সব রূপকথা এখন আর চলবে না।'

'পাশ গাঁয়ে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?' সুতীর্থ বললে, 'চলো নিজের চোখে দেখে আসবে।'

'কি আছে সেখানে ?'

'স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী ছেলেপুলে—'

'বেয়ান নেই ? শালী ? শালাবউ ?—স্ত্রী আর শাশুড়ী আছে বুঝি শুধু ?' নদীর মত গলায় মণিকা বললে।

'তোমার চেয়ে শাশুড়ীর বয়স কমই হবে হয়তো।'

সুতীর্থ পূবের দিকের একটা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে গেল।

'ওটা আবজে দিলে কেন ?'

'বড্ড কড়া রোদ আসছে।'

'তোমার চোখের ওপর ?'

'তোমার মুখ টসটস করছে—যেন জ্বর-জ্বালা হল—'

'হল, বেশ হল', মণিকা চোখ বুজে বললে, 'সূর্যের ছ্যাঁকা জ্বরজ্বালায় আরাম। বেশ ছিল তো—কেন জানালাটা টেনে দিলে বাপু—'

'সব জানালাই খোলা আছে, একটা ছাড়া—' সুতীর্থ নিজের মনের স্বাদে প্রীত, খানিকটা উৎসাহিত ও সমাহিত হয়ে বললে, 'প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা মনে পড়ছে আমার। এও যেন সেই মিশরের নীলিমা। নীল নদের পারে শেষ শীতের রৌদ্রে বসে আছি আমি—' জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে রইল সুতীর্থ।

'আর আমি ?'

'তুমি। তুমিও বসে আছ, গীর্জের মূর্তির কাছে যেন,' ঢোক গিলে বললে সুতীর্থ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গলায় মিশর রোদের ডাকপাখি ডেকে উঠল যেন তার—কোন এক ভোরের, কোন এক নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি : তিন হাজার বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে রকম বাতাস ভেসে আসে; কি গভীর সেই নীল আকাশ, সত্যিই খুব বেশী নীল—সেই সাধু-সংসর্গের মত রোদ আশ্চর্য নদী ক্ষেত প্রান্তর জন্মমৃত্যুর অনন্ত রক্তপাতের মতন সেই আলো; নীলের অনেক নীচে বড় বড় সহজের কালি মাখা উদাম নিষ্ফলতার কতশত প্রবঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে নীল—ব্যাঞ্জন শুনেছ না মণিকা ? ওগুলো কি খেজুর গাছ গান গাইছে ? তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চারদিকে—তিন হাজার বছর আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে আজকের দিনের ভেতর—সুতীর্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, কলকাতা-পৃথিবীর দিকে।

'তিন হাজার বছর আগের আজকের

নেক দূরে যেখানে দুজনের দৃষ্টি একটা
লের মতন বিন্দুতে মিশেছে গিয়ে সেই
রাপ্তার ভেতর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে
নকা বললে, 'সময় বলে কেউ যে নেই
মারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'সময় কেটে যায়, তবুও কাটে না?'

'না, না। তা নয়, আমার মনে হয়
দকালের একালের সব সময়ের সমস্ত
তিহাসই এক সাময়িক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন,
বে আশ্চর্য লাগল সুতীর্থের—মণিকার
কে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইল সে;
ললে, 'আমার তো অনেক সময় মনে হয়েছে
রকম। কিন্তু গণিতের হিসেবে এ কি
টেকে?'

'গণিত কি বলে জানি না, কিন্তু
গাণিতিক তুমি বটে; তার চেয়েও বেশী
একটা জিনিস তুমি সুতীর্থ—এই তো
ললে তিন হাজার বছর আগের আজকের
দনের ভেতর। তা হলে সব সময়
সমসাময়িক। তুমিও তো তাই বললে।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে
লে গিয়ে বললে, 'কিন্তু বিজ্ঞান অন্য কথা
লে। বিজ্ঞানকে অমান্য করে কোথায় গিয়ে
দাঁড়াবে?'

'বিজ্ঞানকে সত্যিই জ্ঞানে দাঁড় করাবে।
বিজ্ঞান তো এখনও আধা সত্য। সত্য হবে;
হেঁয়ালিকে সেই তো গিয়ে ধরবে একদিন।'
বলে মণিকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

মণিকা বললে, 'কিন্তু আমাদের জন্যে
অনেক কিছুই হেঁয়ালি হয়ে রইল।'

সুতীর্থ আলো আবছায়া চোখে
তাকিয়ে নিজের সোফায় ফিরে এল।

সুতীর্থের দিকে তাকালো না মণিকা।
সুতীর্থ তাকিয়েছিল দূরে আকাশের শাখা
আগুনের দিকে: সেটা কি সূর্যের, না,
সূর্য সরে গেছে তার শূন্য স্থানের?
মণিকার মুখে কোনো আলো পড়ল কিনা—
কিংবা ছায়া—কোনো ইঙ্গিত এসে মিলিয়ে
গেল কিনা তাকিয়ে দেখবার কথা হয়তো
সুতীর্থের; কিন্তু বিদ্যুৎ নেই—তবুও
বিদ্যুৎ রয়েছে—নারী নেই তবুও দুর্বার
রেতঃক্ষরণ ঐ সকালের, দুপুরের নীলিমায়
—অনুভব করতে করতে অপর কোনো
মানবের মত হয়ে গিয়েছিল সুতীর্থ:
অনেকক্ষণ পরে উঠে সে বাকি জানালাটা
খুলে দিল।

'ঐ জানালাটা আবজে রাখলেই ভালো
হত সুতীর্থ।'

'সরে গেছে সূর্য। এখন আর তোমার
মুখে রোদ পড়বে না।'

'না সে জন্যে নয়. আমি সরে বসেছি—'

'সোফাটাকে আরো ভাল জায়গায়
ঘুরিয়ে দিই?'

'সমস্ত আকাশটাকে দেখা যায়। কী
ভীষণ দানবীয় চেয়ে দেখ—'

'দানবীয়?'

'উর্বশী লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর; ঐ
আকাশের মত।'

কথা বললে না কেউ—অনেকক্ষণ।

'তুমি আমার এই সোফায় এসে বস
সুতীর্থ।'

'আসছি।'

'আমার পাশে বসো।'

রোদের ভেতর দূরে আকাশে চিলের
কান্নাও শোনা গেল। কেমন অপ্রকৃতিস্থ
হয়ে উঠতে চায় মানুষের মন; অথচ প্রকৃতি
সুপরিসরের ভেতর সুস্থির, কেমন আশ্চর্য
প্রাণবত্তায় সঞ্চালিত; মহানুভব।

'কি দেখছ তুমি?'

'এই রোদ নীল আকাশ শহরের মিনার
দালান সাদা বিছানা বঞ্চিত ব্যথা জন্ম-মৃত্যু
ভেদ করে উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি রোজই
থাকে। তুমিই তো বলেছিলে একদিন—
বেবিলনেও ছিল। বেবিলনে ছিল, আমরাও
দেখেছি। কিন্তু তবুও দুজনে মিলে
দেখবার সময় বেশী পাই না।'

সুতীর্থ মণিকার সোফায় এসে বসল;
পাশাপাশি, কিন্তু গা ঘেঁষে নয়। ঘেঁষা-
ঘেঁষি যাতে না হয় সেই জন্যেই একটু
সরেই বসল এদের ভেতর একজন।

'সবই আছে, অথচ কিছুই নেই, মহা-
নগরীর ওপরেও এত বড় আকাশ, এরকম
রৌদ্র, অথচ সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পণ্ড, মানুষের
হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে
ভাইয়ের হাতে।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে
মণিকা বললে, 'চান করে এসো, এখন গেলে
কলে জল পাবে। চৌবাচ্চায়ও আছে। আমি
জ্যোতিকে বলে দিচ্ছি, দু বালতি জল এনে
তোমার চানের ঘরে রাখতে। হবে দু
বালতিতে?'

'ধস্তাধস্তিতে তোমার জামা ছিঁড়ে
গেছে হয়তো। কিন্তু জামায় রক্তের দাগ
কিসের?' মণিকা জামার দিকে তাকিয়ে
সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে।

মণিকা বললে, 'এ তো অনেক রক্ত।
তোমার নিজের গায়ের? না অন্য কারু—'

সুতীর্থ শার্টের বোতাম খুলতে
খুলতে বললে, 'না, আমার না। কি করে
শার্টটা মাড়াল তাই ভাবছি।'

বোতাম খুলতে খুলতে থেমে গিয়ে
ভ্রুকুটি করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে,
রক্তটা কালি মেরে গেছে। তাজা রক্ত নয়
নিশ্চয়ই। এ কবে হল। সত্যিই রক্ত তো?'

'আঃ ছি, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছো
কেন?'

সুতীর্থ শার্ট খুলে ফেলল, বারান্দার
দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'মনে পড়েছ।'

'সে গল্প শুনবে? তাহলে বোস তুমি।'

সুতীর্থ ইজিচেয়ারটা মণিকার সোফার দিকে ঘুরিয়ে একটু কাছে টেনে এনে বল্লে, 'শার্টে যা রক্ত দেখছ, এই নিচের গেঞ্জিতেও তেমনি,—তার নিচেও—'

'মানে তুমি জখম হয়েছ; কখন হলো?'

'কাল রাতে।'

'কাল রাতে! হাসপাতালে যাওনি কেন?'

'এখানে কি হাসপাতাল নেই : তোমার এ বাড়িতে?'

'কাল রাতে তক্ষুনি হাসপাতালে যেতে পারতে তো তুমি'—

দাঁত কড়মড় করে বল্লে মণিকা, 'ওঠো। জ্যোতিকে গাড়ি ডাকতে বলছি; এক্ষুনি চল।'

সুতীর্থ কুঁড়েমি ভাঙতে ভাঙতে আস্তে হেসে বল্লে, 'যে ফেরারী সে যাবে হাসপাতালে। কী ডায়েরি করব আমি বল তো দেখি।'

'ফেরারী! কাকে খুন করলে!'

মণিকা জ্যোতিকে ডাকবার জন্য তেতলার দিকে যাচ্ছিল ফিরে এসে খাটের
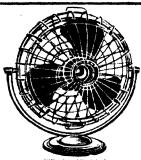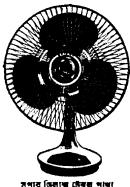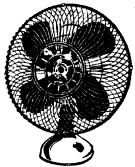
কিনারে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল কিন্তু কি মনে করে তৎক্ষণাৎ তেতলায় চলে গেল। মুহূর্তেই অনেক কিছু ওষুধপত্র ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির সাজসরঞ্জাম সংগে নিয়ে এসে বল্লে, 'কই জামাটা খোলো দেখি।'

কিন্তু জামা খুলে দেখা গেল সুতীর্থের গা একেবারে পরিষ্কার—একটা মশার কামড়ও নেই কোনোদিকে—

মণিকা গালে হাত দিয়ে সোফার এক কিনারে বসে বল্লে, 'তাহলে বিরূপাক্ষ যা বলেছিল সেই কথাই ঠিক?'

'বিরূপাক্ষ? তার সংগে কোথায় দেখা হল তোমার?'

'দেখা হয়েছিল। তুমি ফেরারী? কাকে খুন করলে?'

'তাকে কি করে চিনবে তুমি?'

'কোনো বড়মানুষকে করোনি তো?'

এ প্রশ্ন শুনে মুলো কলা আর ঘণ্টা নাড়ার পুজোর পুরুতের মত মনে হল মণিকাকে—নিজেকেও—নিজের সংগ্রামটাকে। এক আধ মিনিট চুপ করে থেকে বড় কাজ-কর্মের আসরে অগ্রদানী বামুনের মত যেন —একটু বিষদাঁত ঘষে সুতীর্থ বল্লে, 'বড় মানুষেরা তো আমাদের দলে।'

'ও কি, রক্তমাখা জামাটা কখন তুলে আনলে? জানালার গরাদে বেঁধে কি করছ সুতীর্থ: রক্তের নিশান ওড়াচ্ছো?' বলতে বলতে খুব বিরক্ত, পীড়িত হয়ে মণিকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল, রাস্তার দিকের দুটো জানালাও।

'না, কোনো বড়মানুষকে খুন করিনি।'

'কোরো না।'

'কেন করব না বল তো দেখি? আমি হেঁয়ালি সাধছি; তুমি কষে বলো। তুমি ছাড়া কেউ প্যাঁচ খুলতে পারবে না।'

'হেঁয়ালি টেঁয়ালি নয়—কেন মিছিমিছি বিপদ বাড়াতে যাবে?' 'বিপদ তো আছেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কুলি-কামিন এক আধটাকে খুন করলেই হয়ে যায়, ওতেই বেশ গেঁজে ওঠে; বেশ খাসা লপসি লিসপিস পয়দা হয়। ওরা বিপ্লব করতে জানে না, আমাদের দেশে তো কিছুতে না, ওদের সকলকে কেটে ফেল্লেও না। কিন্তু কী হবে একটা মল্লিক, মুখার্জি, হীরাচাঁদ, হুকুমচাঁদকে মেরে।'

সুতীর্থের কথাবার্তা রকমসকমের কেমন একটা বেচাল বিসদৃশতায় মণিকার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ সঞ্চিত হচ্ছিল যেন; টন টন করে উঠল তার।

'হীরাচাঁদ কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না।'

'কি করেছিল সে?'

'কিছু না।'

'এ রক্তের দাগ কিসের?'

'তা পরে শুনবে। আগে বল আজকের এই যুগে আমাদের মতন লোকের পক্ষে ধরে ধরে হেঁসো দিয়ে ঝাড় সাফ করে ফেলাই ভালো—'

'না, তা আমি কি করে বলি। আমার মতে খুন করাই খারাপ।'

'কিন্তু যদি খুন করতে হয় তাহলে কাকে করব?'

'কাউকেই না।'

'বরং গয়ানাথ মালোকেই, তাই না মণিকা?'

'গয়ানাথ মালো কে?'

'নাম শুনেই তো বুঝেছ একটা কেষ্টো-বিষ্টু কেউ নয়। কিন্তু তবুও ছেলেপুলে নিয়ে ওর একটা মস্ত পরিবার। পরিবারটা স্বামী স্ত্রীরই এক জোটে না, আরো কেউ নাক ঢুকিয়ে বংশ বাড়িয়ে গেছে তা জানি না। যা হোক, পরিবারটা না খেতে পেয়ে মরছে।'

'আমরা কি করব', মণিকা বল্লে, 'আমরা তো নিঃসহায়।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল: পায়চারি করতে করতে বল্লে, 'ঠিকই বলছ তুমি।'

মণিকার দিকে ফিরে সুতীর্থ বল্লে, 'আমি গয়ানাথ মালোকে মেরেছি। এ তারই রক্ত।'

'তার রক্ত?'

সুতীর্থ জানালা দুটো খুলে দিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁ, বড়দের কারো নয়; ভয় করবার কিছু নেই।'

'স্ট্রাইক হয়েছিল?'

'কিছুটা হয়েছিল।'

'তোমাদের ফার্মে?'

'আমাদের ফার্মে নয়।'

'তাহলে?'

'এই শহরেই—কোনো কোনো জায়গায়।'

'তুমি কি কলকাতার বাইরে ছিলে এতদিন?'

'না।'

'ধর্মঘটের ব্যাপারে কিছু করেছিলে তুমি?'

'যাতে জেল হয় এমন কিছু করিনি হয়তো।'

সুতীর্থ উঠে গিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে দিল। ফিরে এসে বল্লে, 'কিংবা করে থাকিই যদি, জানবে কে? এই তো এই লোকটাকে খুন করেছি আমি। কি হয়েছে তাতে? খুন যে করা হয়েছে তা বোঝা হবে একদিন। কিন্তু এ নিয়ে গাইগুই করবার মত একটা কুত্তাও থাকে না এসব লোকের।'

(ক্রমশ)

নীললোহিতের চোখের সামনে

মাঝখানে আমার কিছুদিন শখ হয়েছিল সাঁতার কাটার। এমনিতে তো ব্যায়াম ট্যায়াম কিছু হয় না! বাড়ির কাছেই বালিগঞ্জ লেক, সেটারও সৎ-ব্যবহার করা উচিত। একটা খাঁকি হাফ প্যান্ট কিনে ফেললাম। অনেক দিন পর হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরে বেশ স্কুলের ছেলের মতন লাগে নিজেকে, যদিও আমার বুকে, হাতে-পায়ে বড় বড় লোম।

কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গেই ভোরবেলা উঠে লেকে যাই, পাবলিক পুলে, যেখানে চাঁদা টাঁদা কিছু লাগে না, সেখানে অনেক অচেনা নারী পুরুষের সঙ্গে জলের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতরাই। সাঁতার আর সাইকেল কেউ একবার শিখলে আর ভোলে না, এই নীতি অনুযায়ী আমি সাত-আট বছর অনভ্যাসের পর একদিন কায়দা করে লাফিয়ে সাইকেলে চাপতে গিয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়েছিলাম সাইকেল-সমেত। কিন্তু সাঁতারটা সত্যিই ভুলিনি, একটু হাঁপিয়ে গেলেও ছোট লেকটা এপার ওপার করা যায়।

সাঁতার শিখেছিলাম ছেলেবেলায়, তখন হাফ প্যান্ট পরেই সাঁতার কাটতাম আমরা। কলকাতার গঙ্গায় কিংবা গ্রামের পুকুরে। সেই ধারণাটাই আমার রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালিগঞ্জের লেকে অন্য রকম কায়দা। সুইমিং ট্রাঙ্ক নামে এক প্রকার উদ্ভট ধরনের জাঙিয়া পরে সবাই সাঁতার কাটে সেখানে। আমার মতন একজন ধেড়ে লোককে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় দেখে অনেকেই আড় চোখে তাকায়, কেউ কেউ ফিকফিকিয়ে হাসে। ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কয়েকদিন বাদে। কিন্তু তক্ষুনি একটা সুইমিং ট্রাঙ্ক কিনে ফেলতে দ্বিধা হয়। লোক মুখে শুনেছি, জিনিসটার দাম হাফ প্যান্টের তিন গুণ। আমার সাঁতারের ঝোঁক ক'দিন থাকবে কে জানে, শুধু শুধু একটা দামি জিনিস কিনে ফেলবো? তা ছাড়া হাফ প্যান্টেই কাজ চলে যাচ্ছে, নেহাৎ ফ্যাশানের খাতিরে...।

এই সময় একদিন সকালবেলা সাঁতার কেটে ফিরছি, দূরে দেখলাম ঝর্ণাদিকে। ছোট্ট ছেলেটির হাত ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন। প্রথমেই আমার মনে হলো, গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। মাথার চুল আঁচড়ানো হয়নি, ভিজে হাফ প্যান্ট আর গায়ে তোয়ালে জড়ানো, এই অবস্থায়

তুই সাঁতার কাটিস বুঝি?

ঝরনাদির মতন সুন্দরীর সামনে দাঁড়ানো যায়?

ঝরনাদির ছেলে তার আগেই আঙুল তুলে বললো, মা, ঐ দ্যাখো, নীলুকাকা!

ধরা পড়ে গেলাম। আমি এগিয়ে এসে বেশ সহজ ভাবেই বললাম, কি ঝরনাদি, বেড়াতে বেরিয়েছো বুঝি?

ঝরনাদি প্রথমে আমার গোদা গোদা ঠ্যাং সমন্বিত হাফ প্যান্ট পরা অপরূপ চেহারাটা দেখলেন। তারপর বললেন, তুই সাঁতার কাটিস বুঝি? ভালোই হলো। তুই একটু আসবি আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—টুবলুটাকে সাঁতার শেখাবার জন্য ক্লাবে ভর্তি করে দেবো ভাবছি! তোর কোন ক্লাব?

—ক্লাব মানে? আমার তো কোনো ক্লাব নেই।

—তুই তা-হলে কোথায় কাটিস? অমুক ক্লাবে যাস না?

লেকের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি সাঁতার ও দাঁড় টানার ক্লাব আছে। আধুনিকতম পোশাক পরিহিতা রমণী ও বিভিন্ন প্রকারের মোটর গাড়ি ও কুকুর দেখবার জন্য ছাত্র বয়েসে আমরা ঐ সব ক্লাবগুলির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করতাম।

আমি বললাম, ক্লাব ক্লাবের দরকার নেই। আমার ওপর ভার দাও, টুবলুকে আমি চার পাঁচ দিনে সাঁতার শিখিয়ে দেবো।

ঝরনাদি সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তুই সাঁতার শেখাতে জানিস?

—এ আর শক্ত কি? সবাই পারে। তুমি সাঁতার জানো? তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি আমি।

—তোর লাইফ সেভারের সার্টিফিকেট আছে?

—সে আবার কি? সার্টিফিকেট মানে? তুমি দেখতে চাও? তোমাকে আর একবার সাঁতার কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি! আমি সাঁতার শিখেছি গ্রামের পুকুরে। ঐ টুবলুর মতন বয়েসে। ঐ টুকু ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আবার সার্টিফিকেট লাগে নাকি?

—তুই জানিস না, ওরকম ভাবে শেখা আনসায়েন্টিফিক। ছোট ছেলেদের শেখাতে হয় স্টেজ বাই স্টেজ—হাত আর পায়ের ওপর সমান জোর না পড়লে একটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ক্লাবে ট্রেইনড কোচ আছে।

—কিন্তু আমি যেখানে কাটি সেখানেও তো অনেক বাচ্চা ছেলে মেয়ে মা-বাবার কাছে শিখছে। আমি শিখেছিলাম আমার

মায়ের কাছে, আমার তো কোনো অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়নি?

তুই কোথায় কাটিস?

আমি আঙুল তুলে পাবলিক পুলটা দেখিয়ে বললাম, ঐ যে দ্যাখো না, এখানে তো কত লোক সাঁতার......

ঝরনাদি একেবারে আঁতকে উঠলেন। নাক কুঁচকে বললেন, উঃ, অত লোক, কার কী অসুখ আছে কে জানে, সবাই মিলে এক জায়গায়—ক্লাবে নিয়মিত জলে ওষুধ মেশায়...

আমি বুঝলাম, ঝরনাদির শুচিবাতিক আছে। যাদের এই অসুখটা থাকে, তারা কোনো যুক্তি মানে না।

বললাম, ঠিক আছে, যাও তা-হলে!

—তুই একটু আমার সঙ্গে চল না। কোথায় ফর্ম টর্ম পাওয়া যায়, আমি জানি না। তোর সঙ্গে যখন দেখাই হলো—

আমি রাজি হয়ে টুবলুর হাত ধরলাম। টুবলু বেশ স্বাস্থ্যবান ছটফটে ছেলে, ভয় ডর নেই, ওর সাঁতার শিখতে দেরী লাগবে না।

ক্লাবটির মধ্যে ঢুকে দেখলাম, চারদিকে টুকরো টুকরো ভিড়। লোকেরা ফিসফিস করে কথা বলছে। এক জায়গায় একটি বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে একটা বড় ভিড়, মেয়েটি কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

লোকের ফিসফিসানি থেকে বুঝতে পারলাম, মেয়েটিকে তার বাবা এক জায়গায় বসিয়ে রেখে সাঁতার কাটতে গেছে। দু' ঘণ্টা কেটে গেছে, তবু ভদ্রলোক এখনো ফেরেননি। লোকটি অবাঙালী, ক্লাবের অনেকেই তাঁকে চেনেন, তিনি একজন দক্ষ সাঁতারু। তবে তিনি কোথায় গেলেন, খুব সম্ভবত মেয়ের কথা ভুলে গিয়ে হা গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

ভিড় এড়িয়ে আমরা কাউন্টারের দিকে এগোলাম। কাউন্টারের ভেতরেও খুব উত্তেজনাময় আলোচনা চলছে। আমি তিন চারবার বললাম, ও দাদা, শুনছেন, ও দাদা —কেউ কানই দেয় না। এমন সময় আর একটি লোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে, প্রায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, সবাই মিলে চ্যাঁচামেচি শুরু করলো, তারপর সবাই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কাউন্টার ফাঁকা।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, মাঠের সব লোক ছুটছে একদিকে। ঝপাঝপ করে কয়েক জনের জলে লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনলাম।

আমি ঝরনাদিকে বললাম, তোমরা একটু এখানে দাঁড়াও, দেখে আসি ওখানে কী হচ্ছে।

একটু উঁকি মেরেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। অবাঙালী ভদ্রলোকটির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে, পাড়ের কাছেই, কাদার

গেঁথে থাকা অবস্থায়। তিনি দক্ষ ছিলেন কিন্তু ভালো ডাইভার না। সেদিন হঠকারীর মতন তিনি থেকে ডাইভ দিয়েছিলেন। মৃত্যুই হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়েছিল টকে। কাদার মধ্যে গেঁথে রয়েছেন টা ধরে, কেউ লক্ষ্যও করেনি। এত-দে একজনের মনে পড়েছে যে টকে ডাইভিং বোর্ডের সিঁড়ি দিয়ে দেখা গিয়েছিল।

ত্যু যাকে তাকে যখন তখন নেয়। একটি বাচ্চা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে তার বাবাকে না নিয়ে গেলে চলতো অন্য কোনো সময় ঐ লোকটিকেই যেত না?

দা মাথা মৃতদেহটি ধরাধরি করে তিন চারজন। ঘাড়টি এমন ভাবে যে মনে হয় শিড়দাঁড়া ভেঙে গেছে। মেয়েটির কান্না যাতে আমাকে না হয়, তাই আমি দু' হাতে কান দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে এলাম। আমাকে দেখেই ঝরনাদি খানিকটা জ করতে পেরেছিলেন। মুখখানা নি, ফ্যাকাসে। আমি যেই বললাম, লোকটা...। ঝরনাদি অমনি বললেন, প্লীজ, স্পিক ইন ইংলিশ। হি মাস্ট না এনিথিং...

ঝরনাদি বলতে চাইছেন, টুবলু যেন জানতে না পারে। এসব ভয়ংকর কথা য় মতন ছোট ছেলের জানা উচিত নয়। আজকাল মিশনারি স্কুলগুলির দৌলতে ছ' সাত বছরের ছেলেরাও দিব্যি ইংরেজি শিখে যায়। সুতরাং তাদের সামনে কোনো গোপন কথা কিংবা অসভ্য কথা ইংরিজিতেও বলে পার পাবার উপায় নেই। সুতরাং আমি ঝরনাদিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গোপনে সব ব্যাপারটা জানালুম। ঝরনাদি রীতিমতন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কাতর গলায় বললেন, ইস, কী হবে!

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ঝরনাদির খুব কোমল মন, তিনি ঐ অচেনা লোকটির এরকম বেঘোরে মৃত্যুর জন্য খুব ব্যথা পেয়েছেন। কিংবা ঐ ছোট মেয়েটির কথা ভেবেই—। একটু বাদেই আমার সে ভুল ভাঙলো। পৃথিবীর অধিকাংশ মায়েরাই নিজের সন্তানের সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পৃথিবীর আর সব কিছু ভুলে যায়। ঝরনাদি নিজের সন্তানকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষ করছেন। তিনি এখন শুধু ভাবছেন, ঐটুকু শিশুর মনে এরকম একটা ঘটনা কী রকম ছাপ ফেলবে। যদি মনের মধ্যে দৃশ্যটা গেঁথে যায়? যদি কোনো কমপ্লেক্স তৈরি হয়? যদি জল সম্পর্কে সারা জীবনের মতন একটা ভীতি জন্মে যায়?

ঝরনাদি বারবার বলতে লাগলেন, ইস, কেন যে আজই এখানে এলাম? কেন যে আজই এরকম একটা...

বললাম, চলো, তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঝরনাদির বাড়িও বেশী দূরে নয়। আমার ভিজে হাফপ্যাণ্ট প্রায় শুকিয়ে এসেছে, লজ্জাটাও কেটে গেছে এতক্ষণে।

ক্লাব থেকে বেরুবার সময় টুবলু জিজ্ঞেস করলো, মা, আমি সাঁতার কাটবো না?

ঝরনাদি বললেন, না। এ বছর তোমার সাঁতার কাটা হবে না।

—কেন?

ইয়ে, সব ফর্ম ফুরিয়ে গেছে, এ বছর আর ভর্তি করবে না।

—কেন?

—এবার বেশী ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়েছে কিনা

—কে বললো? ওরা তো [illegible] বলে নি

—এই তো তোমার নীলুকাকা [illegible] নিয়ে এলেছেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ছেলেকে মানুষ করার জন্য ঝরনাদি অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যেতে লাগলেন।

বাড়ির কাছাকাছি এসে টুবলু আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিজেই ছুটে গেল আগে আগে।

ঝরনাদি বললেন, আয়, এক কাপ চা খেয়ে যাবি নাকি? দেখিস যেন আজকের

এই ব্যাপারটা টুবলুর সামনে আবার দুম করে বলে ফেলিস না। বাড়িতে মা আছেন—

টুবলু সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠলো. তিনতলার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার ঠাকুমা। তিনি বললেন, এর মধ্যে সাঁতার শেখা হয়ে গেল, টুবলু সোনা?

টুবলু মহা উৎসাহে চেঁচিয়ে বললো, না ঠাম্মি, আমি আজ সাঁতার কাটিনি! ওখানে একটা লোক না, জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারপর কাদার মধ্যে ঢুকে গেছে ভচাৎ করে! একদম মরে গেছে। তার একটা না মেয়ে, খুব কাঁদছে খুব কাঁদছে—তাই আজ ওখানে কেউ সাঁতার দেবে না!

আমি আর ঝরনাদি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোটদের আমরা যতটা ছোট মনে করি, তারা মোটেই ততটা ছোট নয়। টুবলু পুরো ঘটনাটা আমাদের মত জেনে গেছে।

এবং এর পরেও সমস্ত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকে নস্যাৎ করে টুবলু তক্ষুনি ফুটবলটা নিয়ে দুমদাম করে খেলতে লাগলো মহা আনন্দে, আপন মনে।

এপারের অন্ধকার ওপারের অন্ধকার

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

এক ঝটকায় নিবে গেল সব আলো। কার, অন্ধকার। এপারের অন্ধকার এক র্তে ধরে ফেলল ওপারের অন্ধকারকে। ঝটকায়। সামনের মাঠটুকুতে এবড়ো-ড়ো অন্ধকারে জোনাকি টুপটাপ জ্বলে ল। আশেপাশের ঘরবাড়িগুলো সব ধকারে ডুবে গেছে। এখন কতক্ষণে আবার লো আসবে কে জানে। এক ঘণ্টা, দু টা হতে পারে। আবার হয়তো সারা রাত ও আসতে পারে। একটু দূরে ট্রেন নৈ। সারাদিন গোনাগুনতি কয়েকখানা যায়। জানালায়, জানালায় মুখ। কখনো রো সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। পরস্পর সংকোচে তাকিয়ে দেখে। সংকোচের য়োজন নেই। আর কোনো দিন কারো ঙ্গ দেখা হবে না। নীলার এ বাড়িতে ন মনে এই এক খেলা। প্রত্যেকবার খগুলো মনে রাখার চেষ্টা করে, যদি খনো কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অথচ রের ট্রেনটা এলেই আগের ট্রেনের মুখ-লো ভুলে যায়। সকাল সাড়ে আটটায় কটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেনটা যাওয়ার সময় লা কতকগুলো পছন্দসই মুখ ঠিক করে খে। কিন্তু দুপুরের ট্রেনটা এলে আবার কালের ট্রেনের মুখগুলো ঢাকা পড়ে যায়। ধু কদাচিত দু'একটা মুখ চোখে লেগে কে। যেন মনে হয় তাদের অন্য কোথাও খলেও চিনতে পারবে।

প্রতিদিন ট্রেন যায়। সকালে দুপুরে াত্রে। এত অজস্র মুখ। কিন্তু এতদিনের ধ্যেও নীলা একটা চেনা মুখ দেখল না। এতদিন পরে আজ দেখা যাবে। দীপকের আজ রাত্রের ট্রেনে আসার কথা। মাসতুতো ভাই। মা মারা যাওয়ার পর মাসীর কাছে মানুষ হওয়া নীলার কাছে দীপক নিজের ভাইয়েরই মতন। আর এই প্রথম, বিয়ের পর এই প্রথম এ বাড়িতে তার একান্ত নিজের বলতে কেউ আসছে। আজ এতদিন ধরে নীলা ট্রেনের চলে যাওয়া দেখেছে। আজ আসার জন্য অপেক্ষা করছে। রাত সাড়ে এগারোটার ট্রেনে দীপক আসবে। এখন ক'টা বাজে কে জানে। একটু চুপচাপ হয়ে এসেছে বাড়িটা। বড় জা-এর ছেলেটার কান্না শোনা যাচ্ছিল একটানা। আলো নিবে যাওয়ার পর চুপ মেরে গিয়েছে। বোধ হয় অন্ধকারে ওর মা ওকে বুকের দুধ দিচ্ছে। এত বড় ছেলে, ছ বছর বয়স হয়ে গেল, এখনো মায়ের দুধ নইলে চলে না। নীলা কতবার বলেছে, দিদি, এবারে ওর এই অভ্যেসটা ছাড়াও তো। কে শোনে কার কথা। এ বাড়ির রকমসকমই আলাদা। তা ছাড়া, নীলার সম্বন্ধে এদের মনোভাবটা নীলা ঠিক ধরে উঠতে পারে না। আর এসব ব্যাপারে সুমিতকে কিছু বলতেও বাধে নীলার। বাড়ির ছোট ছেলে। কেমন যেন একটু আদুরে ভাব যাই যাই করেও রয়ে গেছে। যেটা নীলার একদম ভালো লাগে না। এই বাড়ির মধ্যে যখন থাকে সুমিতকে কেমন একটু বুদ্ধিহীন দেখায়। মা, বাবা, দাদা, বউদি এই সব কিছুর মধ্যে সুমিত কেমন যেন তরল হয়ে গলে যায়, হারিয়ে যায়। নীলার তখন সুমিতের দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। অথচ এ বাড়িতে এরা সবাই মিলে কেমন যেন দলা পাকিয়ে থাকে। আলাদা করে কাউকে চেনা যায় না। রান্নাঘর থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল, বউমা, তুমি এবার খেয়ে দেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। সাড়ে এগারোটা তো অনেক রাত, ওদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বারোটা বেজে যাবে। অভি আর সুমু তো স্টেশনে গেলই। এই সব ছোট শহরে সাড়ে এগারোটা বারোটা অনেক রাত। প্রথম প্রথম নীলার এত অস্বস্তি গেছে। সাড়ে আটটা ন'টার মধ্যে সব খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। শ্বশুর এখনো রিটায়ার করেননি। এ বাড়িতে একমাত্র খানিকটা ভারিক্কি চালের মানুষ। তার কথার যথেষ্ট মূল্য আছে এ সংসারে। তিনি রাত ন'টার পর আলো জ্বালিয়ে রাখা পছন্দ করেন না। প্রথম প্রথম সুমিতের সঙ্গে এই নিয়ে অনেক মনকষাকষি গেছে। নীলার বেশী কথা বলতে ভালো লাগে না। অথচ এ বাড়িতে সকলেরই সব ব্যাপারে এত হইচই করা অভ্যেস যে, এই কম কথা বলাটা এদের কাছে প্রীতিকর নয়। এক ধরনের অহঙ্কার, অগ্রাহ্য করার মনোভাব বলে মনে হয় এদের কাছে। প্রথম যেদিন নীলা রাত দশটার পর আলো জ্বালিয়ে রেখে বাবাকে চিঠি লিখছিল, সুমিত বলল, 'আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়।' নীলা বলল, 'দেখছই তো চিঠি লিখছি।' 'কাল লিখো' 'কাল সকালে তো একদম সময় পাব না।' 'দুপুরে লিখো'। দুপুরে লিখলে তো সকালের ডাক ধরতে

পারবে না। সুমিত একটু চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, 'এত জরুরী চিঠি কাকে লেখা হচ্ছে?' সুমিতের কথায় কোথাও একটু আধটু বিদ্রূপ মেশানো ছিল। নীলা আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিল, কথা বলে নি। একটাও না। সুমিতও না। তারপর এক সময় ক্লান্ত সুমিতের ঘুমন্ত নিশ্বাস। ধীরস্থির প্রায় ছন্দোবদ্ধ নিশ্বাস। নীলার ঘুম আসেনি। মাঝ রাত্রে উঠে চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালার বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে। সুমিত ঘুমিয়েছে। সুমিতের ধীরস্থির শান্ত নিশ্বাস। নীলার বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে থেকেছে। চোখ জ্বালা করে, নীলা দাঁতের মধ্যে বুকের মধ্যে চেপে ডেকেছে, বাবা, বাবা। এই বিয়ে মোটামুটি বাবার ইচ্ছেতেই। বাবা বলেছিলেন, নীলু, দেখো, আমি বুড়ো হয়েছি, তোমার মা তাই। দীপকের বউ এলে সে তোমা কেমনভাবে নেবে কে জানে। নীলা রা হয়েছিল খুব একটা বেশী না ভেবে এক মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠে আশিসের মুখ, নীলা মন থেকে সরি দিয়েছিল জোর করে। না, না, কক্ষনো আ

াসের কথা ভাববে না নীলা। শেষকালে কিনা নীলা, এত তাড়াহুড়ো করে ন্ত নিলে তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা । নীলার মাথার শিরা দপ করে ছিল, তাড়াহুড়ো! তিন বছর পর হুড়ো! বিয়ের পর সুমিত জানতে ছিল নীলার পুরনো জীবনের কথা, সব বরেরাই চায়। নতুন বিয়ের পর। আশিসের নাম বলেছিল বন্ধু হিসেবে এক সময় আশিস তাকে বিয়ে করতে ছল এ কথাও বলেছিল। কিন্তু শেষটা ন। এখন নীলা ভাবে, ভুল করেছিল। কথা বলা যায় না। বলা উচিত নয়। ত তাকে বিশ্বাস করে না পুরোপুরি। ও একটা সন্দেহ লেগে থাকে সুমিতের গে। একবার নীলা রাগের মাথায় সাও করেছিল, 'সব ব্যাপারে তুমি কর কেন বলতো? তুমি আমায় াস কর নাকি?' 'অবিশ্বাস করার কি একেবারেই নেই?' কিছুটা ন্ক ভঙ্গীর ভান করা সুমিতকে কিন্তু খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হচ্ছিল। মা দাদা বৌদির মধ্যে গলে তরল হয়ে সুমিত নয়। কোথা থেকে বেরিয়ে এক ঘন কঠিন আস্তরণে মোড়া । যখন মাঝখানে থাকে ফাঁকা দূরত্ব। রাত্রে বিছানায় শরীর ছুঁয়ে গেলে সব কিছুর বড় পাল্টে এখন বুকের মধ্যে 'নীলা, তুমি এত কেন? কোথায়।' 'না, তুমি ভীষণ আর তোমার ভীষণ অহংকার, এত দর কেন তোমার নীলা?' নীলার ভেতর পাথর জমতে থাকে! নীলা তোমার আমাকে ভালো-লাগে না, লাগে, পাথর ভাঙে, জল ঝরে, জল, টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো পাথরই এক সময় অনেক রাস্তা পার সমতলে নেমে কাদা হয়ে যায়। বুকের রের পাথর। নীলার বুকের ভেতরের ড়ী নদী, সব পাথর নিয়ে গড়িয়ে আসে সমতলে। কাদা, জল থাকে, জল সরে যায়। ঠাণ্ডা, স্যাঁত সেঁতে।

বাবা বলেছিলেন, নীলা, ভেবে দেখো, র ইচ্ছে না থাকলে হবে না। তবে টাকে আমি দেখেছি। ভালোই মনে নীলা কিছুই ভেবে দেখেনি। ভেবে কি-ই বা ছিল? শুধু সব কিছু ঠাক হয়ে যাওয়ার পর বড় ভয় করত। তখন চোখ জ্বালা করে উঠত। ছেলে- া, তার পর স্কুল কলেজের দিনগুলো র সামনে ঝাঁপাঝাঁপি করত। তখন ক আশিসকেও আর তত বেশী করে পড়ত না। বড় উদাসীন ীন লাগত। কান্না কান্না। াটো অবান্তর স্মৃতিতে ভরে বুকের ভেতরের ঘরদোর উঠোন।

একদিন ভীষণ ঝড় বৃষ্টির রাত্রে বাবার বুকের ভেতর শুয়ে ছিল মুখ গুঁজে। কবে কতদিন আগে সকলে দীপুর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে পলাশ ফুল তুলতে গিয়েছিল। কলেজে টেস্টের রেজাল্ট দেখছে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অরুণাদি বলছেন, নীলা, তোমার কি হয়েছে? তুমি তো চেষ্টা করলে আরো ভালো করতে পারতে। আরো ভালো, আরো ভালো, আরো ভালো। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে আরো ভালো হওয়ার এক দীর্ঘ পদযাত্রায় ক্লান্ত নীলা কিছু ভেবে দেখেনি। কিছু ভেবে দেখতে ইচ্ছেই করেনি যা হয় হোক।

তারপর এই সংসার, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, জা আর তিন বছরের টুকাই। সকাল থেকে ভীষণ জোরে চলতে শুরু করে সংসারের চাকা। অজস্র শব্দ। তারপর বাড়ির তিনজন পুরুষই চলে যায়। হঠাৎ একেবারে একরাশ ঢিলেমি নেমে আসে সংসারটায়। ধীরে সুস্থে আর এক প্রস্থ চা হয়। বড়জা একটু-আধটু নীলার সঙ্গে গল্প জমাতে চেষ্টা করেন। নীলার ভালো লাগে না। বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। সামনের মাঠটুকুতে রোদ জমে থাকে। ঝক-ঝকে রোদ। পৃথিবী বড় তাজা আর লোভনীয় হয়ে ওঠে। নীলার তখন ভালো লাগে না এই দুপুরের ঢিলেঢালা সংসার। কতকালের অভ্যেস একটু একটু করে কেটে যায়। কোন ছেলেবেলায় মামী, নীলা ডাকত মণি, কোন ছেলেবেলা থেকে মণি তাকে আর দীপুকে খাইয়ে তৈরী করে পাঠিয়ে দিতেন। সারাটা সপ্তাহ কাটত প্রতীক্ষায়। শনিবার রাত্রে বাবা আসতেন। শনিবার বাড়ি ফিরে সময় আর কাটতে চাইত না। নীলা চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে থাকত, মণি এসে ডাকত, দীপু এসে ডাকত। দীপু কতবার এসে মিথ্যে করে বলত, নীলু, শীগগীর ওঠ, দেখ মামু এসে গেছে। নীলা উঠত না, বাবার গলার স্বর নিজের কানে না শোনা পর্যন্ত উঠত না। টুকাইকে স্নান করিয়ে

কাজল পরিয়ে পাউডার মাখিয়ে বড়জা নিয়ে এসে নীলার পাশে শুইয়ে দিয়ে 'একটু নজর রেখো তো নীলা' বলে যখন চলে যায়, নীলা শুয়ে থাকতে থাকতে সেই দিনগুলোর সুগন্ধ বুক ভরে টেনে নেয়। এমনি ছোট্ট একদিন সেও ছিল, কিছু মনে পড়ে না, তখন তো মা বেঁচে ছিল, নিশ্চয়ই তাকে শুইয়ে রেখে মা গল্পের বই পড়ত। মায়ের খুব গল্পের বই পড়ার নেশা ছিল। নীলা শুনেছে, কোথায় মা, মাকে মনেও পড়ে না। মণিকে মনে পড়ে। চুল আঁচড়ে দিচ্ছে মণি, টপটপ করে ভিজে চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে। চুল বেঁধে দিচ্ছে মণি। শক্ত করে বেড়া-বিনুনি। বাবা আসার আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে দিচ্ছে মণি। তাকে আর দীপুকে।

সারাটা দুপুর ঘর বাড়ি পড়ে থাকত একা-একা তালা দেওয়া, মণি একটা স্কুলে পড়াত। হলুদ পাড়, নীল পাড়, সবুজ পাড়, সাদা শাড়ি পরে মণি চলে যেত স্কুলে, কদাচিৎ স্কুলের তেমন কোন বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে চিকনের কাজ করা সাদা শাড়িতে-ব্লাউজে মণিকে দেখাত যেন মহিমাময়ী। বড় হয়ে নীলা জেনেছিল মণির এই মহিমার আড়ালে অনেক দুঃখের ইতিহাস ছিল। অনেক দুঃখ বেদনার, যেমন সব মহিমার পেছনেই থাকে। বাবার সঙ্গে মণির সম্পর্কটা ছিল শ্রদ্ধার, হয়তো তার চাইতেও কিছু বেশী, হয়তো দুঃখের, বেদনার, গোপন কিছুও ছিল হয়তো। নীলা কোনো দিন জানেনি। শুধু মনে মনে আন্দাজ করেছে। শনিবার রাত্রে এসে রবিবার সারাটা দিনরাত নীলাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে সোমবার কাকভোরে উঠে বাবা যখন চলে যেতেন মণিকে দেখাত খুব ক্লান্ত, দুঃখী। খেয়ে দেয়ে নীলা, দীপু তৈরী হয়ে চলে যেত স্কুলে। তারপর মণিও। দুপুর বেলাটা ঘরবাড়ি পড়ে থাকত একাএকা। তালা দেওয়া। কিন্তু এখানে দুপুর বেলাটা বড় জড়জড়ি করে কাটে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। পারে না। উঠতে হয়, উঠতেই হয়। শাশুড়ীকে চান করার জন্য, খাওয়ার জন্য বলতে হয়। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করতে হয় মা, মা, বলে। নীলার এত অস্বস্তি লাগে! কোনো দিন কাউকে মা বলে ডাকেনি, হঠাৎ একজন অল্পপরিচিতাকে মা বলে ডাকতে গিয়ে নিজের উচ্চারিত শব্দকে বড় অচেনা মনে হয়। যেন সে নয়। অন্য কেউ উচ্চারণ করল কথাটা। মা বলে ডাকতে হয়নি কখনো কাউকে। মণি কোনোদিন মা না থাকার দুঃখ বুঝতে দেয়নি। বিয়ের দিন মায়ের ছবিতে ফুলের মালা টালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ফটোটার ফ্রেমের গায়ে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল ধূপকাঠি। নীলা সেই প্রথম আলাদা করে মায়ের দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছিল। ফটোর মা হাসছে। রঙীন অয়েল পেটিং। উজ্জ্বল চোখ। কপালে সিঁদুরের টিপ। মাথার ওপরের লাল পাড় কপালের কাছে নেমে এসে একটু ভাঁজ খেয়ে গেছে। মণির সঙ্গে বেশ মিল আছে। একটু ঠোঁট টিপে হাসির ভঙ্গিটা তো হুবহু এক। মণির বয়স হয়ে গেছে। মুখে চোখে বয়সের ঘনগাঢ় ছায়া নেমেছে। মা, মণির চাইতে বড় ছিল। কিন্তু ফটোর মা উজ্জ্বল যুবতী, একটু লজ্জা পাওয়া মুখে হাসছে। চিরকাল এরকমই হেসে যাবে। সেই প্রথম বিয়ের দিন মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দুঃখ তাল-গোল পাকিয়ে বুকের ভেতর থেকে গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। নীলা দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়েছিল। চোখ জ্বালা করছিল। যেন চোখের ভেতর একটা কাঁকর পড়েছে। যেন চোখের ভেতর একটা কালো ছয়কোণা কাঁকর কেবলই গড়িয়ে

চলছে। ধাক্কা মারছে ছয় দিকে। ক্ষত বিক্ষত করছে ছয় দিক। তারপর একসময় সেই কাঁকরটা গলে গলে জল হয়ে নামে চোখ থেকে। দীপু এসে ডাকে নীলা, বড় মমতা মাখানো গলায়।

আশিসের ঘন ভ্রূর ওপর সরু সরু ভাঁজ পড়েছে। বড় বড় চুল এসে পড়েছে কপালে। মুখ এক দিকে ফেরানো। এত তাড়াহুড়োর কি আছে আমার মাথায় আসছে না। আমার পক্ষে এত তাড়াহুড়ো করে কিছু করা সম্ভব নয়। আমাকে অনেক কিছু ভাবতে হয়, হবে। তোমরা মেয়েরা এত সহজে অধৈর্য হয়ে যাও। ভাবো তুমি, আশিস ভেবেই যাও। বাবা এসে বলছে, নীলু ভেবে দেখ, ছেলেটাকে আমার ভালোই মনে হয়। দীপুর বৌ এসে যদি তোকে ঠিক মেনে না নেয়! বাবা আসলে তুমি নিজেও ভয় পাচ্ছিলে কিন্তু। দীপুর বৌ এসে তো তোমাকেও মেনে নেবে না।

দীপু এসে বলল, নীলা, তোর বর কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম হবে। তোর লাক ভালো, আমার বেলায় দেখিস খেঁদি পেঁচীর বেশী জুটবে না।

সেই দারুণ হ্যান্ডসাম বর এই সুমিত। হাঁটা চলার সময়, চুল আঁচড়ানোর সময়, যখন মনোযোগ দিয়ে শেভ করে নীলা একটু দূর থেকে আলাদা করে দেখেছে। সত্যিই সুমিত দেখতে বেশ ভালোই। শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর জা কেউই তেমন কিছু খারাপ নয়। কাউকেই আলাদা করে দোষ দেওয়ার মত কিছু নেই। শুধু কেউই যেমন হলে নীলার ভালো লাগত তেমন নয়। শ্বশুরকে বাবা বলে ডাকতে গিয়ে নীলার জিভ থমকে যায়। চোখ জ্বালা করে ওঠে। নিজের বাবাকে মনে পড়ে যায়। মনে হয় এই ভদ্রলোক যাকে বাবা নামে ডাকতে হয়, সে যেন জোর করে তার প্রিয় নামটাতে ভাগ বসাচ্ছে।

সংসার তার নিজের গতিতে চলে। মাঝে মধ্যে শাশুড়ী ডাকেন, ছোট বৌমা, বড়জা ডকে নীলা, আর সুমিত চাকরি করে সংসার করে। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা মাঝে মধ্যে ভরে যায়।

এই ছোট শহরে এখনই মনে হয় অনেক রাত যখন এক ঝটকায় সব আলো নিবে গেছে। রান্নাঘরে কুপী জ্বালানো হয়। শ্বশুরের ঘরে মোমবাতি জ্বালানো হয়। বড়জার ঘরে হারিকেন জ্বালানো হয়। এই বারান্দাটুকু থাকে অন্ধকার, অন্ধকার। নীলার ভীষণ ভালো লাগে. এইটুকু সময় নীলা ভীষণ একা, নিজের মত এই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। সবাই বার বার বিরক্তির শব্দ করে। কতক্ষণে আলো আসবে বলে অধীর প্রতীক্ষা করে। আর নীলা মনে মনে ভাবে যত দেরী হয় ততই ভালো।

মাঝে মাঝে এক ঝটকায় সব আলো নিবে যায়। এপারের অন্ধকার হাত বাড়িয়ে ওপারের অন্ধকারকে জড়িয়ে ধরে। নীলা এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের মাঠটুকু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি জ্বলে ওঠে টুপটাপ। দীপু তার বৌকে নিয়ে আসবে। সবাই বিরক্ত হচ্ছে. এই অসময়ে আলোটা গেল! নীলার ভালো লাগছে। এরকম অন্ধকারেই দীপু আসুক। রান্নাঘরে কুপী জ্বলবে। বড়জার ঘরে হারিকেন জ্বলবে। দীপু এলে যে যার নিজের মত আলো নিয়ে এগিয়ে আসবে। নীলা সবার পেছনে থাকবে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার হয়ে। কেমন আছিস নীলা? কেমন আছিস দীপু? ভালো, ভালো।

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

শ্রীমতী নিবেদিতা বসুর প্রদর্শনী

সম্প্রতি ৩রা এপ্রিল থেকে শ্রীমতী নিবেদিতা বসুর কাজ প্রদর্শিত হলো আকাদমী অব ফাইন আর্টসে। সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীতে অধিকাংশ কাজ বিক্রী হয়ে গেল। অন্যান্য কুমোর-শিল্পীর কাজের অল্পাংশ মূল্যে উনি কাজ বিক্রী করেছেন। স্বল্প লাভে শিল্পীসুলভ অভিমান ছিল না বলেই বহু লোক ভীড় করে এসে কাজ কিনেছে।

তাঁর কাজের প্রধান গুণ হলো সারল্য। ভারতীয় মৃৎপাত্রের আকার ও রূপ নিয়ে, তিনি নিজের নান্দনিক বোধের সাহায্যে মাটির জিনিসপত্র তৈরী করেছেন। বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিবর্তে কাঠকুঠোর আঁচে এসব পুড়িয়েছেন। কাঠের আঁচ সব সময় সমান হয় না। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং প্রতিটি

পটারী নিবেদিতা বসু

পাত্র অনন্য হয়। রঙের ব্যাপারেও নানা রকম মজা হয়। বৈচিত্র্য তৈরী হয়। কারিগরী দিকটাকে তিনি শিল্পের দুর্লভ জায়গায় এনে ফেলেছেন।

আমরা আশা করব তিনি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবেন। আগামী প্রদর্শনীতে নতুন কাজ দেখাবেন।

অনুসন্ধান অরুণ দাশগুপ্ত

অরুণ দাশগুপ্তের চিত্রকলা

১লা—৭ই এপ্রিল অরুণ দাশগুপ্তের তৈলচিত্রের প্রদর্শনী হলো আকাদমী অব ফাইন আর্টসে।

অরুণ মাঝারী ও বড় ক্যানভাসে ছবি এঁকেছেন। বেশির ভাগ সময় তুলি ব্যবহার করলেও, মাঝে মাঝে শিল্পীর ছুরি—'স্প্যাচুলা'—ব্যবহার করেছেন। সাধারণভাবে পেছনে একটা রঙের প্রাধান্য আর মাঝখানে একটা জায়গায় কিছু পরস্পর পরিপূরক ও বিরোধী রঙের সমাহার। পেছনের প্রধান রঙের একঘেয়েমী কমানোর জন্যে মনুষ্য মূর্তির দেহ ও কাপড়-জামার মধ্যে নানা রঙ নিয়ে খেলেছেন। অবশ্য মানুষ নয় মেয়েমানুষ। কারণ তাঁর জগতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। ডাগর, দীঘল সেই সব কৃষ্ণকলি—কোংকনী, মারাঠী অন্তজ, ব্রাত্য। শহরে এসেও সরল। কলুষ এবং দারিদ্র্য এদের স্পর্শ করে না। কোথাও তারা সিমেন্ট বালি গামলায় তুলে মিস্ত্রীর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। ছাগল নিয়ে বাবুদের সামনে দুধ দুইয়ে দিতে চলে। বেলা পড়ে গেলে গলির বাঁকে জলকে চলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরচর্চা করে।

রূপারোপের মধ্যে একটু আধিক্য দেখা যায়। ভঙ্গীর মধ্যে ছন্দ স্থির। ঝড়ের আগে যেমন গাছের পাতা নড়ে না। এ এক আশ্চর্য গতিহীন জগত। হয়তো কিছুটা অমৃত শেরগিলের আর বাকীটা বিপ্রভর ছবি ও বিষয়বস্তুর প্রভাব অরুণের ওপর পড়েছে। এটা কাটিয়ে ওঠার মধ্যেই তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাঁর কাছে আমরা আর একটু ফুট-ফটানী, আর একটু জ্বালা-যন্ত্রণা চেয়েছিলুম। তরুণ বয়সে নিস্তরঙ্গ স্নিগ্ধতা ঠিক সাজে না। এই স্বেচ্ছা-বাণপ্রস্থ ইচ্ছা-মৃত্যুর নামান্তর হতে পারে।

পরবর্তী প্রদর্শনীতে আরো পরিণত কাজ দেবেন তিনি একথা জানি।

সুনীলমাধব সেন

বহুকাল প্রখ্যাত শিল্পী সুনীলমাধব সেনের প্রদর্শনী দেখিনি। সম্প্রতি মনোহর দাস তড়াগে তাঁর রেখাচিত্র ও জলরঙের ছবি দেখলাম। সামান্য কয়েকটা ছবি ছিল, তাও ১৯৪৮-৫২র মধ্যে করা। সুনীলমাধবের এই ধরনের কাজের, সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবু ভাল লাগল।

তাঁর এই শ্রেণীর কাজের গন্ধটা ভারতীয়। অবশ্য তাঁর মধ্যে সব সময় আধুনিক মনস্কতা কাজ করে গেছে, এটা বেশ বোঝা যায়। পটের সমস্তটা জুড়ে রয়েছে একটি মানুষ। দ্বিমাত্রিক পটভূমিতে সামান্য স্থানও ছাড়া হয়নি। কালি-কলম বা রঙের ছোট ছোট দাগ দিয়ে কাজ করেছেন। রূপারোপের মধ্যে লৌকিক সারল্য লক্ষণীয়। সাধারণ মানুষের কথাকার তিনি। তাদের জীবন, মানসিকতা আর ধর্মবিশ্বাস তিনি মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। একটি গ্রাম্য লোকের হুঁকো খাওয়া, একজন মেছুনী ভক্ত

হ‍ুঁকো খাওয়া সুনীলমাধব সেন

হনুমানের হাতে রাম-সীতা, খোল হাতে লোকটি, দশভূজা দুর্গা—কাজগুলো বেশ উপভোগ করা গেল। তার সাম্প্রতিক কাজ দেখতে পেলে আরো ভাল হতো।

পার্থপ্রতিম দেব

রবীন্দ্রভারতীর শিল্পকলার তরুণ অধ্যাপক পার্থপ্রতিম দেবের প্রদর্শনী হয়ে গেল আকাদমী অব ফাইন আর্টসে। এঁর ছবিতে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুজ্জ্বল গূঢ় সমাচার নেই। নিসর্গের প্রতি মোহাবেশ কিংবা অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা, সংক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক নেই। এমন কী নেই পুরাণকল্পের প্রতিভাস।

চোখের দেখা এবং বস্তু জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, চোখ নেহাৎ দেখার জন্যে সব কিছুকে সাজায়, বদলায়, রঙ লাগিয়ে নেয় এবং এর ফলে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের মধ্যে কেমন একটা কাজের সম্পর্ক গড়ে ওঠে—এই সব বিষয়ে অফুরান তাঁর জিজ্ঞাসা। চাক্ষুষ বিভ্রমের ফলে আমরা প্রতি মুহূর্তে কেমন পরাস্ত হই, মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি সে-বিষয়ে তাঁর সীমাহীন কৌতূহল।

তিনি জ্যামিতিক ছকে পট ছকে ফেলে, কোনো এক জায়গায় গুরুত্ব সহকারে কাজ করে, ফাঁকা জায়গা শুধু রঙ দিয়ে ভরে একটা বিস্তারের ভাব তৈরী করেছেন। 'পপ' আর্ট ও কোলাজের কাছে তিনি ঋণী। কতক ছবিতে একজোড়া পুরুষের মুখ—প্রতিকৃতি। নীচে পেটিস, কখনো ছিপি খোলা লেমনেডের বোতল বা ছোট ছোট গড়ানো পাথর। থমথমে মধ্যবিত্ত মুখ কিন্তু চোখ জ্বলজ্বল করছে। কতক ছবিতে চতুর্ভুজের মধ্যে চতুর্ভুজ ছোট হয়ে চলেছে। প্রথম চতুর্ভুজের চার বাহুতে চারজন মানুষ, কিংবা শেষতম চতুর্ভুজের ভূমিতে একজন ছোট্ট মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এবং তার ছায়া বড় হয়ে সকল চতুর্ভুজের নীচের অংশটা গ্রাস করছে।

পার্থপ্রতিমের ছবিতে কিসের একটা
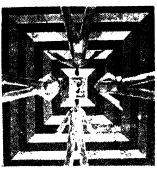
পার্থপ্রতিম দেবের ছবি

ক্ষীণ আভাস। কিন্তু এমন নিরাশক্ত ও নির্বেদ যে চিত্রাতিরিক্ত বক্তব্য স্পষ্ট নয়। আলুর ছাপ দিয়ে ছাপা ছবি অবশ্যই অভিনব। কাচের ফ্রেমে আলুর ছাপ রীতিমত রোমহর্ষক ব্যাপার সন্দেহ কী! কিন্তু মুনশীয়ানা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রেশ রেখে যায় না। রঙ ও অঙ্কন সম্বন্ধে সম্ভবত নতুন করে আরো ভাবতে হবে।

অশোক সেন

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে সম্প্রতি প্রদর্শিত অশোক সেনের ছবির উলঙ্গ আদিম মানুষগুলো যূথচারী হলেও তাদের সরল জীবনযাত্রার মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘুণ ধরেছে।

গানবাজনা অশোক সেন

তাই দল বেঁধে থাকলেও একরকম বৈনাশিক জগতে বাস করে। তাঁর আঁকার সঙ্গে ব্যঙ্গচিত্রের সাদৃশ্য যেন রয়েছে, যদিও এখানে যন্ত্রণাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। হয়তো একজন উলঙ্গ নারী অশোভন ভাবে নাচছে, পাশে একজন পুরুষ বিকট ভঙ্গী করে গান গাইছে, আরেকজন, বাজাচ্ছে খোল। সাইকেল চালকেরা রাস্তায় এসে কোনো অজ্ঞাত কারণে পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে পড়ে। গোষ্ঠী জীবনই ভেঙ্গে পড়েনি শুধু, ব্যক্তিমানুষের হৃদ-পদ্মেও কীট। প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত চুম্বনের মাধুর্য হারিয়েছে। আমাদের চাল-চলনে রয়েছে এক নির্বোধ অহমিকা এবং প্রহসনের যথেষ্ট উপাদান।

তিনি তেল রঙ স্প্রে করে পটভূমি তৈরী করেছেন একটা কোনো ডিজাইনের কথা মাথায় রেখে। স্প্রে করা এই ছোট ছোট নানা রঙের বিন্দুর ওপর কালো রেখা দিয়ে দ্রুত মানুষজনের ছবি এঁকেছেন। একটা বন্য আদিমভাব তাঁর ছবিতে আছে। অবশ্য স্প্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবার ফলে রঙ কখনো কোথাও জেবড়ে গেছে। মানুষ-জন এঁকে তাদের ওপর কাজ তেমন একটা করেননি। তুলির কোনো কাজ নেই। ফলে জোরালো বক্তব্য থাকলেও তাঁর তুলি ব্যবহারের দক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই হয় না।

কাচচিত্র : কাত্যায়ন সাকলাত

হয়তো স্টেইন্ড গ্লাসকে কাচচিত্র বললে আপনার আপত্তি হবে না। ১লা এপ্রিল ব্রিটিশ পেইন্টের ডেকর সার্ভিস চিত্রশালায় কাত্যায়ন সাকলাতের প্রদর্শনীতে আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে—বড় আশা করেছিলাম। আপনি কেন এলেন না বলুন তো? নিখরচায় এমন বিমল আনন্দ প্রদর্শনী ছাড়া আর কিসে পাবেন?

কাচচিত্রের প্রসঙ্গ তুললেই আপনার মনে হবে গথিক ক্যাথিড্রালের কথা। মধ্য-যুগীয় খ্রীষ্ট ধর্মের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অনুষঙ্গের বিষয় মনে আসা বিচিত্র নয়—মঠ, মোহন্ত, উপবাস, উপাসনা। তা ছাড়া

আছে ইউরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত। এমন কি কলকাতার সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল ও আরো দু-একটা গির্জায় চলনসই কাচচিত্র দেখা যাবে। নকশী রঙীন কাচ সাজিয়ে সীসের বাঁধন দিয়ে জুড়ে জানালায় লাগানোর রীতি সহস্রাধিক বছরের পুরনো। কাচের ওপর জীবনের ঘটনার ছবি আঁকা শুরু হয় ৯ম শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্মানীতে। কাচচিত্রের প্রাচীনতম যে-নিদর্শন টিঁকে আছে আজো তা ১১শ শতাব্দীর কাজ, রয়েছে অগসবার্গে। বাইজেনটাইন স্থাপত্যে দেওয়ালের প্রাধান্য। তাই শিল্পীরা মোজাইক করে দেওয়ালচিত্র এঁকেছেন। গথিক স্থাপত্যে প্রাধান্য পেল জানালা। জানালার জন্যেই কাচচিত্র। স্বচ্ছ রঙীন কাচ আবিষ্কারের ফলে নকশী কাচ-চিত্র সহজেই তৈরী হলো।

সাধারণত ছবি আমরা দেখি প্রতি-ফলিত আলোয়। অর্থাৎ ছবি দেখার আলোর সময় উৎস থাকে আমাদের পেছনে। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে আলোর উৎস থাকে কাচচিত্রের পেছনে। কাচচিত্র ভেদ করে এসে আলো আমাদের অক্ষিগোলকে আঘাত করে। প্রতিক্রিয়ার এই ভিন্নতার জন্যে নান্দনিক অভিজ্ঞতাও হয় অন্য রকম।

কাচচিত্র বিষয়ক দুটো গল্প বলি। একবার কাচচিত্রের রঙীন প্রতিচিত্রের একটা বইয়ের পাতা ওলটাবার সময় আমি টেপ রেকর্ডারে জন সিবাস্টিয়ান বাকের অর্গানের জন্যে বিরচিত প্রেলিউড ও ফিউগ ইন ডি মাইনার শুনি। এর পরে ছিল সেজার ফ্রাংক এবং মেসাইয়ার অর্গানের জন্যে রচিত সুর। অর্গানের মেঘমন্দ্র সুরের সঙ্গে ছবি দেখার এক অনন্য অভিজ্ঞতা। কখনো উদাত্ত সমুদ্রের উচ্ছলিত আবেগ। কখনো ঝড়ের দিন উন্মেল গাছের উদ্বেগ। কখনো সাগ্নিক ক্রন্দনাসে রাতের সমুদ্রের গম্ভীর মৃদঙ্গের গুরু গুরু বোল। মন্ত্রমুগ্ধ আমি বইয়ের পাতা উলটে চলেছি। সার্তার (Chartes), বুউস (Bourges), ক্যান্টারবেরী এবং ইয়র্কের মধ্যযুগীয় গথিক ক্যাথিড্রালের ছবি।

আমার একটা চটি বই ছিল। বইয়ের বিষয়বস্তু অদ্ভুত। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি। গথিক ক্যাথিড্রালে আগুন লাগলে কাচচিত্রের সীসে গলে যায় এবং কাচও ঝনঝনিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একবার এক বীভৎস অগ্নি-কাণ্ডে ইয়র্কের ক্যাথিড্রালের এই দশা হয়েছিল। পরে মন্দির সংস্কারের সময় কে যেন ভাঙা কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে এলোমেলো লাগিয়ে দেয় কোনো রকমে।

কাচ-চিত্র কাত্রায়ুন সাকলাত

এর বহুদিন পরে একজন শিল্পী (আমার সেই বইটি কোনো পুস্তক-বৎসল বন্ধু 'মৃত' করে দেয়, তাই নাম মনে নেই) ধৈর্য সহকারে "জিগ স' পাজেলর" মতো করে বহু পরিশ্রমে কাচগুলোকে আগের মতো সাজিয়েছিলেন।

শ্রীমতী সাকলাত ইউরোপীয় কাচ-চিত্রের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন। বিনয়ী তিনি তাই বিভিন্ন ক্যাথিড্রালের কাচচিত্রের স্লাইড তিনি দেখিয়েছেন ইউরোপের ধ্রুপদী সঙ্গীত বাজিয়ে। একটা কথা আমার মনে হয়েছে—এই শতাব্দী ঠিক যেন কাচচিত্র আঁকার অনুকূল নয়। গথিক যুগ শেষ হবার পরে ইংলণ্ডে গথিক রিভাইবালের সময় এবং ভিক্টোরিয়ার আমলে কাচচিত্র আঁকা শুরু হয় আবার। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও পরে 'ভিক্টোরিয়ানা' সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধা ও সার্বিক নৈরাশ্যের জন্যে কাচচিত্র পুনঃ-প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চাপা পড়ে। এর বহু পরে জন পাইপার তাঁর সহকারী পেট্রিক রেনটিয়ানসের সহযোগিতায় ইংলণ্ডের আউনডাল স্কুলের উপাসনা-কক্ষে কাচ-চিত্র করেন। পাইপার জাত রোমান্টিক, কিন্তু বোধ হয় ভুল শতাব্দীতে তাঁর জন্ম। সংশয়, নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের যুগে প্রত্যয়ের কথা ঠিক যেন সত্যি মনে হয় না। সার্তার ক্যাথিড্রালের 'শেষ নৈশ ভোজ'-ও পাইপারের 'পথ, জীবন এবং সত্য' তুলনা করলেই পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়। পাই-পারের তুলনায় নৈশ ভোজের রীতি অনেক সহজ। পাইপার খৃস্টকে দৈবী পর্যায়ে উন্নীত করতে গিয়ে অস্বাভাবিক ও অমানবিক ক'রে তুলেছেন। অবিশ্বাসের মধ্যে প্রত্যয়ের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সুর হয়েছে চড়া, যদিও তাঁর দক্ষতার তুলনা নেই। মধ্য যুগে সাধারণ মানুষের অক্ষর-পরিচয় না থাকায়, চার্চ ধর্মকাহিনী চিত্রের ভাষায় বলার জন্যে শিল্পীর সাহায্য নিতেন। রেনেসাঁসের সময় বাস্তব জগতের বিষয়ে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়। কাচচিত্রের অলৌকিক [illegible] অনুত্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়।

তাছাড়া মধ্যযুগের সমাজ ছিল পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজকেন্দ্রিক। এখন যুগ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের। পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে। শিল্প সে অর্থে আর সর্বজনীন নয়, সামাজিক নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত। সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন কোনো বোধ বা বোধি নেই। সকলকে তৃপ্ত করতে পারে নেই এমন কোনো মহৎ বিষয়। পাইপার বা তস্য শিষ্য এবং শ্রীমতী সাকলাতের গুরু পেট্রিক রেনটিয়ানস খৃস্টধর্মের ঐতিহ্যের ওপর জোর ক'রে নির্ভর করতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রীমতী সাকলাতের উপায়?

আমার মনে হয় তিনি এসব জানেন। সমস্ত কিছু ভেবে চিন্তেই তিনি এগিয়েছেন। তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান এবং নিষ্ঠা তাই প্রশংসনীয়। ১৯৭৪ সালে তিনি কাচচিত্রের কাজ শিখতে ইংলণ্ডে যান। ডেকর সার্ভিসে তাঁর প্রদর্শনী হয়তো ভারতবর্ষে কাচচিত্রের প্রথম প্রদর্শনী। বস্তুত এক বছরের মধ্যে তিনি এই মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত সকল কৌশল আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন। কাচে কীভাবে রঙ ব্যবহার করলে আলোকে কাজে লাগানো যাবে, কিভাবে আঁকতে হবে, স্বাভাবিক বিরতি ও সীসের পাতের বাঁধনগুলো কেমনভাবে রাখলে রচনার সামগ্রিকতা ব্যাহত হবে না, কোথায় অঙ্কন, কোথায় শুধু রঙ এবং কোথায় আলোর ঔজ্জ্বল্য রাখতে হবে তা তিনি জানেন। মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় রীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। কখনো গুহামুখের মতো ভাব। কোথাও সুন্দর মানুষের একটা মুখ। কখনো পাত্রের মধ্যে থেকে ধোঁয়া ওড়ে, নীচে দুটি পাখি বসে। কোথাও সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে মাছ। মায়াময় এক জগতে নিয়ে গেছেন তিনি হাত ধ'রে। তাঁর কাছে অনেক প্রতিশ্রুতি পেলাম। কাচ-চিত্রকে তিনি ভারতীয় জল হাওয়ার সঙ্গে মেলাবেন মনে হয়।

—সন্দীপ সরকার

‘শ্রীকান্ত’: চার পর্বের ছন্দ

অমলেন্দু বসু

একটি স্মৃতির উল্লেখে আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাবনা করব।

সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ প্রথম যৌবনে একবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সেবারে তাঁর কাছে একটি মূল্যবান কথা শুনেছিলাম। সম্ভবত সেটা ইংরেজি ১৯২৫ সাল। আজ পঞ্চাশ বছর পরে সঠিক সন তারিখ স্মরণ করতে পারছি না, তবে সেবার ঢাকা নগরীর অনতিদূরে মুন্সিগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে-অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অধিবেশনের পরে তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন এবং একদিন আমন্ত্রিত হয়ে শহরের প্রসিদ্ধ উকিল নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে গিয়েছিলেন। সেদিন সে-গৃহে নরেনবাবুর আত্মীয় বন্ধু স্নেহভাজন কিছু লোকের সমাবেশ হয়েছিল, তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। এই সমাবেশে কে যেন শরৎবাবুর কাছে একটি প্রশ্ন নিবেদন করেছিলেন : আপনার উপন্যাস রচনায় কোনো পদ্ধতি আছে কি? আপনি কি কাহিনীর সবটা ভেবেচিন্তে গোছগাছ করে’ তার পরে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন, না কি লেখার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটি স্বাধীন প্রাণবত্তায় অভাবিতপূর্ব মোড় নিতে থাকে?—শরৎবাবু বলেছিলেন : আমি যখন লিখতে বসি, কাহিনীর গোটা ছক আমার কল্পনায় উজ্জ্বল এবং সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আমি চাইলে, ধরুন, কাহিনীর চ্যাপটার সতেরো প্রথমে লিখে তারপরে প্রথম চ্যাপটারে চলে যেতে পারি।

সেদিনকার আলোচনায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আজ আর জীবিত নেই, আছেন হয়তো তখনকার তরুণ-তরুণীদের কেউ কেউ যাঁরা আজ প্রবীণতায় ও বার্ধক্যে মন্থর। এই দীর্ঘ অন্তর্বর্তীকালে শরৎচন্দ্রের কথাটি আমি অসংখ্যবার নিজ মনে আলোড়ন করেছি, কেবল শরৎ-সাহিত্য-চিন্তন কালে নয়, অন্যান্য বহু ঔপন্যাসিকের রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে চিন্তন উপলক্ষেও। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কোনো বিশেষ এবং পুনরাবৃত্ত কাঠামো এবং ছাঁদ আমাদের লক্ষ্যসাধ্য কি? ভাষাশ্রিত শিল্পে—অর্থাৎ সাহিত্যে—স্রষ্টার সৃজনী কর্ম কি সচেতন অথবা অচেতন বা অবচেতন আবেগের দ্বারা চালিত? প্রশ্নটির দার্শনিক ও সামাজিক তত্ত্বের মধ্যে আপাতত প্রবেশ না করে’ (আমার ‘স্বভাবকবি’ নামক প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি) শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী-গঠনের ছন্দ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করা যাক।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে, কোনো উপন্যাস সম্পূর্ণ রচিত হওয়ার শুরুতেই কাহিনীর ছক তাঁর কল্পনায় সম্পূর্ণ হয়ে থাকত। এহেন প্রাক-রূপায়ণ সম্পূর্ণতা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য নয়। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে একজন বঙ্গীয় ঔপন্যাসিকের নাম এবং একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিকের নাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং টমাস হার্ডি। এদের রচনা পড়ে’ মনে হয় (কিছু জৈবনিক তথ্যদ্বারাও এই মনে হওয়া বলীয়ান হয়) যে এঁরা যেন রচনাকর্মে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিজ নিজ মনোজগতে কাহিনীসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, সেই কাহিনীসৌধের প্রতিটি ইঁট ও পাথর কোথায় কিভাবে বসবে তা-ও যেন ফুট ইঞ্চি অবধি নিরূপিত করার পরে উপন্যাসটির রচনাকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার চিন্তার বিষয় হচ্ছে, শরৎচন্দ্রও কি এই ধরনের শিল্পী ছিলেন? যে ‘শ্রীকান্ত’ কাহিনী চারটি পর্বে বিধৃত ও বিস্তৃত, সে-কাহিনীর যাবতীয় ঘটনা, চরিত্র, চরিত্র ও ঘটনার সংশ্রব ও সংঘাত, সমগ্র কাহিনীর সমতল ও বন্ধুর স্তরগুলি, তার কখনো সরলিত কখনো বঙ্কিম গতিভঙ্গি, কখনো দ্রুতচূর্ণিত কখনো বৃত্তায়িত অলস মন্থর প্রবাহ, এসব কি শরৎচন্দ্রের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল রচনাকর্মের পূর্বেই? অর্থাৎ, তিনি যে বলেছিলেন যে, প্রথম পরিচ্ছেদ রচনার পূর্বেই তিনি সপ্তদশ পরিচ্ছেদ লিখতে সত্য? প্রশ্নটির গ্রহণযোগ্য উত্তরের সঙ্গে জড়িত হয়েছে শরৎচন্দ্রের শিল্পকৌশল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। শরৎ-সাহিত্যে সমাজচিন্তা নিয়ে আমরা তিন চার যুগ ধরেই নিবিষ্ট থেকেছি, আপাতত তাঁর শিল্পীপ্রকৃতি নিয়ে কিছু কালাতিপাত করা অযৌক্তিক হবে না।

যে-প্রশ্ন তুলেছি তার উত্তর নিহিত আছে একটি তথ্যে, ‘শ্রীকান্ত’র প্রকাশকালের পঞ্জীতে। এই পঞ্জী লক্ষ্য করা যাক। ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়, ‘শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী’ এই শিরোনামে; ১৩২২ সালের মাঘ মাসে শুরু হয়ে একটানা মাসে মাসে বিকশিত হয়ে ১৩২৩ সালের মাঘ মাস অবধি তেরো মাসে সম্পূর্ণ হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৩২৪ সালের মাঘ মাসে। (এখানে প্রসঙ্গত বলা যায় যে পুস্তকাকারে শ্রীকান্ত-কাহিনী প্রথম প্রকাশের তুলনায় পরিমার্জিত। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থগুলির সংস্করণে সংস্করণে যে পরিমার্জনা হয়েছিল তার নিপুণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।) ‘শ্রীকান্ত’ (দ্বিতীয় পর্ব) : ধারাবাহিক মাসিক প্রকাশ—‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৪ সালের আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত, পরে ঐ বৎসরেরই অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র মাস অবধি, ১৩২৫ সালের বৈশাখ থেকে আষাঢ় ও ভাদ্র এবং আশ্বিন মাস। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ, ১৩২৫ সালের ভাদ্র মাসে। ‘শ্রীকান্ত’ (তৃতীয় পর্ব) : ধারাবাহিক মাসিক প্রকাশ—‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৩২৭ সালের পৌষ, ফাল্গুন এবং ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৩০ সালের চৈত্র মাসে। ‘শ্রীকান্ত’ (চতুর্থ পর্ব) : প্রথম প্রকাশ, ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শুরু হয়ে ১৩৩৯ সালের মাঘ সংখ্যা অবধি একটানা; পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসে।

এই তথ্যগুলি থেকে আপাতত দুটি বিষয়ে আমাদের নজর পড়া দরকার। এক :

প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থের শিরোনাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' এবং লেখকের ছদ্মনাম ছিল শ্রীকান্ত শর্মা। গ্রন্থের শিরোনাম বদলে গেল পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়। লেখকের স্বনামও সূচিত হল। দুই : প্রথম পর্বের প্রথম কিস্তির প্রকাশ কাল থেকে চতুর্থ পর্বের আখেরি কিস্তি অবধি পুরো ষোল বছরের ব্যাপ্তি। যখন ধরে নিই যে প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশের কিছু পূর্বেই—আনুমানিক এক বৎসর—কাহিনীর রচনা শুরু হয়েছিল এবং চতুর্থ পর্বের প্রথম প্রকাশের কিছু পূর্বেই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল, তখন হিসেব মতো বলা যায় যে, শ্রীকান্ত কাহিনী রচনায় শরৎচন্দ্র প্রায় পনেরো বৎসর ব্যয় করেছিলেন। একটি মাত্র কাহিনী রচনার পক্ষে এই কাল অসাধারণ রকমে দীর্ঘ।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত সমালোচনায় বারংবার বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর রচনাগুলি আত্মজীবনীমূলক। আমার নিজ বিশ্বাস যে এই সমালোচনা ভ্রান্ত ও এই মহৎ লেখকের মূল্যাবিকারী। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ও দীর্ঘ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন—তেমন আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে পাচ্ছি না—তবে দুয়েকটি কথা এখনই বলা যায়। শরৎচন্দ্র প্রথম পর্বে লেখকের নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীকান্ত শর্মা'। ছদ্মনাম। কিন্তু ছদ্মনাম কেন? শরৎচন্দ্র সচরাচর ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন না (যেমন করেন হিন্দী উর্দু লেখকরা এবং ভাগলপুরের একজন খ্যাতনামা লেখক, 'বনফুল') আগাগোড়া একটি মাত্র ছদ্মনামের তন্নিষ্ঠ প্রয়োগ তো কখনোই করেননি। এই ছদ্মনাম-প্রয়োগ আসলে একটি শিল্পরীতি। ছদ্মনাম হচ্ছে শিল্পীর ছদ্মসত্তার লক্ষণ। এহেন শৈল্পিক ছদ্মসত্তা পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাসে সুপরিচিত ও মূল্যবান রীতি। অনেক দেশে, অনেক কালে, অনেক শিল্পে আমরা এই ছদ্মসত্তার প্রমাণ পাই মুখোশ বা মাস্ক্‌-এর প্রয়োগে। কথাকলি নৃত্যে, যবদ্বীপের নৃত্যে, কিছু মধ্যযুগীয় ইওরোপীয় নাটকে, ইতালির কমমেদিয়া দেল আর্ট নামক নাট্যে, জাপানী নোহ্‌ নাট্যে, ইয়েট্‌সের কবিতায় (আমি অতি সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম) শিল্পীর ছদ্মসত্তার নিদর্শন পাই। শিল্পে (আপাতত বিশেষ করে সাহিত্য-শিল্পের কথা চিন্তা করছি) শিল্পীর যে-সত্তা প্রতিভাত হয়ে থাকে, যে-কাহিনীর ও চরিত্রের প্রকাশ হয়ে থাকে, সেই সত্তা-কাহিনী-চরিত্র কখনই প্রাকৃত-জীবনের সত্তা-কাহিনী-চরিত্রের সামর্থ নয়, যদিচ এই শৈল্পিক সত্তা-কাহিনী-চরিত্রের আদি বা মূল প্রাকৃত-জীবনে অস্ফুট অগোছালো অবস্থায় সুপ্ত থাকতে পারে। শিল্পে বিধৃত জীবন শিল্পীর আত্মজীবনী নয়, প্রাকৃত জীবনের রসান্বিত রূপ। আত্মজীবনী তো সবাই লিখতে পারে। শিল্পিত জীবনী রচনা শিল্পীর হাতেই সম্ভব। —কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?—কে সেই শিল্পসত্তাবান মানব যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা আহুতি দেব? সে কি উইলিয়ম শেকসপিয়র নামে এক ব্যক্তি যিনি নিজের চেয়ে আট বছরের বড়ো এক যুবতীর প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন? সে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে জনৈক ব্যক্তি যিনি নাকি (আমরা গপ্পো শুনেছি) নিমের শরবত খেতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসতেন? শিল্পীর সত্তা এত হালকা নয়। শিল্পী-ব্যক্তিত্ব তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্বের সীমায় নিগড়াবদ্ধ থাকে না, থাকতে পারে না। সাহিত্যকর্মে আত্মজীবনী-সন্ধানী পণ্ডিতেরা কীট্‌সের উক্তিটি স্মরণ রাখলে নিজ কর্মের প্রতি সুবিচার করবেন : As for the poetical character itself ....it is not itself—it has no self — it is everything and nothing — it has no character —(কবি চরিত্র সম্বন্ধে বলন, এর কোনো স্বকীয়তা নেই, অহংচেতনা নেই, একে বলা যায় সব কিছুই, আবার কিছুই নয়, এর কোনো চরিত্রই নেই)।—সে জন্যই শেকস্‌পিয়র একই কালে ইয়াগো এবং ওথেলো, ক্যালিবন এবং মিরান্ডা, শাইলক এবং পোর্শিয়া। রবীন্দ্রনাথ একই কালে গোরা ও হারাণবাবু, শচীশ ও শ্রীবিলাস, কুমুদিনী ও শ্যামাসুন্দরী। ছদ্মনাম প্রয়োগের দ্বারা শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছিলেন—আমার সাহিত্য সংবেদনায় আমি তেমনটিই বুঝেছি—যে শ্রীকান্তর কাহিনী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির কাহিনী নয়, একটি প্রাকৃতোত্তর শিল্পিত সত্তার কাহিনী। 'শিল্পস্বভাবের' এই যে রীতির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দিলাম, সে-রীতির মোক্ষম সমর্থন পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রেরই কয়েকটি উক্তিতে : "শ্রীকান্ত—শ্রীকান্ত, আপনারা আমার উপন্যাস পড়তে বসে' অনুগ্রহ করে' ঘটনা ও পরিস্থিতির ওপর জোর দেবেন না। কারণ আমি ঘটনার সৃষ্টি উপন্যাসের আসল জিনিস বলে' মনে করিনে। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে চরিত্রসৃষ্টি। তার সঙ্গে ঘটনা আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করতে হয় না। আমার চরিত্রগুলির অন্তরালে কোন কোন স্থলে বাস্তব হয়তো থাকতে পারে। চিত্রের background হিসাবে, তার বেশী নয়।" আরেক চিঠিতে লিখছেন : "রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাব? ওসব বানানো মিছে গল্প। 'শ্রীকান্ত' একটা উপন্যাস বই তো নয়। ও সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।" আরেক চিঠিতে লিখছেন : "রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই।...সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক মিথ্যে।" (শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ, প্রথম সম্ভার, ৪১৩ পৃঃ) এই 'বেবাক মিথ্যে' আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অবনীন্দ্র-রচনার কয়েকটি উক্তি : "এখন গল্প শুনবে তো তুল্প নাও, জল্পনা রাখ, কল্পনা কর...হিস্টরি পড়ে' কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে?" "সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না।" "ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক।"

যাঁরা 'শ্রীকান্ত'-কাহিনীতে আত্মজীবনী আবিষ্কার করেন তাঁরা শরৎচন্দ্রের নিজ উক্তি সম্বন্ধে প্রত্যয়বান ও শ্রদ্ধাবান নন, তাঁরা শিল্পসৃষ্টির অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া সম্বন্ধে অচেতন।

'শ্রীকান্ত' কাহিনী আত্মজীবনী নয়, শিল্পকর্ম, সুতরাং শিল্পের স্বধর্মে এই কাহিনীতে একটি সব-ছোঁওয়া সুর, একটি সব-জড়ানো ছক, একটি সর্বোত্তীর্ণ ছাঁদ লক্ষ্যসাধ্য। 'শ্রীকান্ত'-কাহিনী একটি বিশেষ জাতের কাহিনী, অতএব এর সুর-ছক-ছাঁদও সেই বিশেষ জাতের সঙ্গে সঙ্গত। এই কাহিনীর বিশেষ জাত বলতে কী বুঝব? আমার প্রস্তাব যে, এই বিশেষ জাত এই কাহিনীর প্রথম নামকরণে সূচিত হয়েছিল। প্রথমে কাহিনীর নাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী।' নামটি শরৎচন্দ্র পরে কেন ত্যাগ করেছিলেন জানি না, কিন্তু এই আদি নাম বর্জন এক হিসাবে খুবই সঙ্গত হয়েছিল। বস্তুত চার পর্বে বিস্তৃত সমগ্র কাহিনীর কথা যখন চিন্তা করি অথবা [illegible] কোনো একটি বিশেষ পর্বের কাহিনী[illegible] কথা চিন্তা করি, 'ভ্রমণ' শব্দটি কুপ্রযুক্ত বলে মনে হয়। শ্রীকান্ত যখন রেংগুনে গেল সেই অভিজ্ঞতাকে ভ্রমণ বলা যায় না, কেননা শ্রীকান্ত টুরিস্ট্‌ বা ট্রাভেলার হিসাবে যায়নি, ভ্রমণোদ্দেশ্যে বর্মাদেশে যায়নি, গিয়েছিল নেহাৎ চাকুরির সন্ধানে। অন্যান্য পর্বেও যখন যেখানে গেছে, সেসব যাতায়াতগুলিকে—ভাগলপুরে, সাঁইথিয়ায়, পাটনায়, সতীশ ভরদ্বাজের ক্যাম্পে, গঙ্গামাটিতে, কলকাতায়, মুরারিপুরে—ভ্রমণ বলা শব্দার্থের প্রতি কিঞ্চিৎ অত্যাচার করা হবে। শ্রীকান্ত ভ্রমণকারী নয়, বরং নিজকে সে যে শব্দে অভিহিত করেছে—সে 'ভবঘুরে'। আমার অনুমান কাহিনীকথন একবার শুরু করার পরে শরৎচন্দ্র 'ভ্রমণ' শব্দটির অসঙ্গতি বুঝতে পেরে ওটিকে বর্জন করলেন এবং শিরোনামটিকে আর বেশি পরিবর্তন না করে মূল চরিত্রের নামানুসারে কাহিনীর নামকরণ করলেন। কিন্তু তাঁর সৃজনী কল্পনায় এই কাহিনী-

পর্বগুলির যে ছন্দ নির্ধারিত হয়েছিল সে-ছন্দের সূচনা পাওয়া যায়, শিরোনামে পরিবর্জিত 'ভ্রমণ' শব্দটিতে।

ইংরেজিতে যাকে 'ন্যারেটিভ' বলে, সেই কাহিনীকথনের একটি বড়ো অংশ বিশেষত সাহিত্যের ইতিহাসের আদি ও মধ্যকালে ছিল ভ্রাম্যমাণ, চলমান, স্থান থেকে স্থানান্তরে গতিপরায়ণ জীবনের ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কথিত কাহিনী। প্রাচীনকালে যেসব ক্যারাভান বা বণিক-শ্রেণী এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করত, তাদের পথশ্রম লাঘব করার অন্যতম উপায় ছিল কাহিনী-শ্রবণ। এই ভ্রামামাণতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংরেজ কবি চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস্ এবং লাটিন লেখক আপিউলেইয়ুস-এর গোল্ডেন অ্যাস্, এ দুটি বইয়ের উল্লেখ করতে পারি। রেনেসাঁস যুগে ইওরোপে ডন কুইকসোটের কাহিনী, অথবা নিউ অ্যাটলান্টিসের কাহিনী, অথবা তার পরের শতকে গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী, স্মলেট-রচিত উপন্যাসগুলি, এমনি করে আমরা অসংখ্য কাহিনী দেখতে পাই যেগুলি ভ্রাম্যমাণ জীবনের কাহিনী। আমাদের বাংলা সাহিত্যের বর্তমান শতকে অন্ততঃ তিনটি উপন্যাসের কথা এই মুহূর্তে আমার স্মরণে আসছে যাদের নামকরণে চলমান জীবনের ধারণা বিধৃত : 'পথিক', 'বেদে', 'পথের পাঁচালী।' পথচলা জীবনের ভিত্তিতে নির্মিত কাহিনীতে অবশ্য কাহিনীর প্রচ্ছদপট বারংবার বদলায়; সেই পরিবর্তনের সঙ্গে আরো বদলায় কাহিনীজড়িত নরনারী; এই চরিত্রবৈচিত্র্যের ফলে বিভিন্ন জীবনধারণা মোসেইক-ছাঁদে মিলিত হয়। আমার সাহিত্য সংবেদনায় আমি বুঝি যে শ্রীকান্ত-কাহিনীতে শরৎচন্দ্র এমনি এক মোসেইক-ছাঁদ মেলাবার কল্পনা করেছিলেন। দৃশ্যপট বারেবারে পাল্টাচ্ছে; ঘটনাস্থল বদলাচ্ছে; চরিত্রগুলির পরিবর্তন হচ্ছে; এইসব পরিবর্তনের ফলে পাঠকচিত্তে নতুন নতুন আবেগ-কল্পনা-চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যে ভাবরূপ পাঠকচিত্তে মুদ্রিত হয়ে থাকল তাকে মাত্র একটি বাক্যে, মাত্র একটি তত্ত্বে, মাত্র একটি বর্ণ-রঞ্জনে অভিহিত করা যায় না। এই কাহিনী-শিল্প হচ্ছে পথের পাঁচালীর শিল্প, বৈঠকখানার শিল্প নয়, শয়নকক্ষের বা অফিসঘরের বা ক্লাবগৃহের বা এমন কি পল্লীসমাজের শিল্প নয়।

আমার সংবেদনায় আমি দেখতে পাই শ্রীকান্ত-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে এই পথের পাঁচালী শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রথম পর্বের গোড়া থেকে চতুর্থ পর্বের সমাপ্তি অবধি এই কাহিনী-প্রবাহ চলেছে; তার ঘটনাস্থল বদলাচ্ছে, ঘটনা, চরিত্র সুরের খেলা বদলাচ্ছে। আমরা ক্যালেইডোসকোপের মধ্য দিয়ে দেখছি পরিবর্তনশীল জগৎ, কিন্তু দর্শক থাকছেন অপরিবর্তিত। পথের পাঁচালী ঢংয়ের কাহিনীকথনেও একটি দর্শকচিত্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীতে অপুর চিত্তে বিধৃত হয়েছে যাবতীয় ঘটনা ও দৃশ্য। 'শ্রীকান্ত'-কাহিনীতে যাবতীয় ঘটনা ও দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে শ্রীকান্তর মনোমুকুরে। তিনটি চরিত্র—শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, রতন—চারটি পর্বেই উপস্থিত, অন্য চরিত্রেরা আসে আর যায়, অথবা একবার চলে' গেলে তারপরেই অদৃশ্য হয়। অভিজ্ঞতার ক্যালেইডোসকোপে দর্শক আগাগোড়া একজনই : শ্রীকান্ত। আরো লক্ষ্য করি যে শ্রীকান্তর চরিত্র চারপর্বের পর্বান্তরে তেমন কিছু পরিবর্তন লাভ করেনি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর চরিত্রের পরিবর্তন, মৌলিক, এমন কি রতনও যেন কিছু পরিমাণে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। এই শ্রীকান্ত তাহলে স্রষ্টার প্রতিভূ, লেখকের শৈল্পিক মুখোশ (লেখকের নিজ সত্তা নয়)। শ্রীকান্তর দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এই জীবনের ছায়াচিত্র দেখব সেটাই লেখকের অভিপ্রায়

চারপর্বের এই কাহিনী যখন পথেরই পাঁচালী, এই চারটি আলাদা পর্বের মধ্যে কোন্ ছন্দ বিদ্যমান থেকে পর্বগুলিকে এক সুরে বেঁধেছে? দেখতে পাই এ-জীবন যে ভবঘুরে, সে কেবল শ্রীকান্তর অপরিবর্তনশীল চরিত্রের জন্যই নয়, শ্রীকান্তকে ঘর বাঁধতে দেয় না সেই শক্তি, সেই নারীশক্তি, যে তাকে ভালোবাসে, ভালোবেসেছে নয় বছর থেকে, আজ ঘর বাঁধতেও চায়, অথচ কোন্ এক অনির্ণেয় অন্তর্নিষেধে বারবার সরিয়ে দিচ্ছে। শ্রীকান্ত-কাহিনীর শৈল্পিক ছন্দ হচ্ছে এই পুনরাবৃত্ত কাছে টানা—দূরে সরানোর ছন্দ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের দোলা। প্রতিটি পর্বের অন্তে বিপ্রকর্ষণ, প্রতিটি পর্বের (শেষ তিন পর্বের) শুরুতে বিপ্রকর্ষণ পর্যায়ের সমাপ্তি এবং নবীভূত আকর্ষণের নূতন অধ্যায়। এই আসা-যাওয়ার অমোঘ ছন্দের প্রভাবেই দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে এ হেন বাক্য দিয়ে : "এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই আবার তাহার ছিন্নসূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে।" তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে এ হেন বাক্য দিয়ে : "একদিন যে ভ্রমণ-কাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদঘাটিত করিবার আর আমার প্রবৃত্তি ছিল না।" চতুর্থ পর্ব শুরু হয়েছে প্রায়-অনুরূপ আত্মসমীক্ষা দিয়ে : "এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত...আমার ভাগ্যেই বা পুনঃ পুনঃ এমন ঘটে কেন?... এমন করিয়া কি চিরজীবন কাটিবে?"—প্রতিবারে এই আত্মসমীক্ষার অন্তে আবার ছেঁড়া সুতোয় জোড়া লাগে, আবার আসে হাসিকান্নার এক অধ্যায়, অধ্যায়ের অন্তে আবার বিচ্ছেদ। "অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা", এই কান্নাহাসির দোল, এই অনিঃশেষ আসা-যাওয়ার ছন্দ। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-কাহিনীর চারপর্ব এই অনিঃশেষ ছন্দে অনুরণিত হয়ে এক মহৎ শিল্পকর্মে উদ্ভাসিত হয়েছে।

যখন আমরা এই চারপর্বে বিধৃত ছন্দের দোলা বুঝতে পারি তখন আরো বুঝতে পারি কোন্ অর্থে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে তিনি প্রথম পরিচ্ছেদ রচনা করার পূর্বেই সপ্তদশ পরিচ্ছেদ রচনা করতে পারতেন। আসলে স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের কল্পনায় উজ্জ্বল থাকত ছন্দের দোলা। তিনি জানতেন প্রতিটি পর্বে এই ছন্দের গতি কেমন হবে। কীভাবে মিলনের পথে এগোবে কাহিনী, সেই অন্তর্বর্তী মিলনের সোপানগুলির পারম্পর্য তাঁর সৃজনী কল্পনায় উদ্ভাসিত হ'ত, সেই সোপান-পরম্পরার অন্তে আছে যে বিচ্ছেদ, যে দূরে সরানোর দুঃখ, যে আপাত-সমাপ্তি, সে সমস্তই শরৎচন্দ্রের কল্পনায় স্পষ্ট হ'ত। সুতরাং কোন্ ঘটনা আগে, কোন্‌টি পরে, কোন্ চরিত্র কোন্ ঘটনার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করবে এবং কীভাবে করবে তাও জানতেন এই চতুর শিল্পী এবং সেই জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে প্রথম পরিচ্ছেদ না লিখে প্রথমেই সপ্তদশ পরিচ্ছেদ লিখতে পারতেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁর এই উক্তি আক্ষরিকভাবে সত্য এমন মনে করি তাহলে ভুল করব এবং অসংবেদী চিত্তে শিল্পের সন্নিকট হব। শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীর প্রতিটি বর্ণনা, চিন্তা, কথোপকথন বিধাতার মতো পূর্ব-নির্দিষ্ট করে রাখতেন এমন কোনো আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাই না, এমন নির্দিষ্টতার কোনো প্রয়োজনও নেই বরং প্রবহমান স্রোতস্বিনীর মতো কাহিনীর প্রবাহ বহুদূর পর্যন্ত তরঙ্গে তরঙ্গে তৎক্ষণ-উৎসারিত বেগে এগিয়ে যায় স্বাভাবিক গতিতে। শুধু এই বিশদ প্রবহমান খাদ-নিখাদ-ধৈবতের সঙ্গমের ঊর্ধ্বে, এই স্বরসপ্তকের সমবায়ে যে এক সমন্বয়ী সুরেলা ছন্দ উৎসারিত হয়, সেই সুরেলা ছন্দ শিল্পী শরৎচন্দ্র শুনতে পেতেন রচনা শুরু হওয়ার আগে থেকেই।

আলোচনা

প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

২২শে ফাল্গুন ১৩৮২-র 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ' পড়েছি। লেখাটিতে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য কিছু পাওয়া গেল। ভেবেছিলাম চিঠিপত্রের মাধ্যমে এই নিয়ে আলোচনা পড়া যাবে এই পত্রিকার পাতাতেই, কিন্তু সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত নিরাশ হয়েছি। লেখাটি সম্পর্কে আমাদের সামান্য দু'একটি বক্তব্য ছিল. আশা করি তা জানাতে অনুমতি দেবেন।

প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্বন্ধ নিয়ে গবেষণার কাজ নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান হবে। কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্র-মণ্ডলীর অন্যান্য কোন-কোন চরিত্র সম্বন্ধে gossip বা conjecture কি অবান্তর নয়? শুধু এক খাজাঞ্চীর মুখের কথাই কি আজ ইতিহাস বলে বিবেচিত হবে? বিশেষ করে পরলোকগত। শ্রদ্ধেয়া মীরা দেবী সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্যগুলি অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমরা শিশুকাল থেকে মীরা দেবীকে আত্মীয়ার মতন জেনে এসেছি। তাঁর মর্যাদা বোধ, মার্জিত ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন রুচি ও রসবোধ আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে। তিনি চাপা স্বভাবের ছিলেন কিন্তু তাঁর স্নেহপ্রবণ মনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। ছাত্রী বয়সে শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা আমরা ও'র সঙ্গেই করতাম। সে সব দিনের মধুর স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে বহু 'intellectual type' মানুষের 'অতি সাধারণ . বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন' জীবনসঙ্গী জুটেছে কিন্তু তাতে তাঁদের পরস্পরের প্রতি সখ্যতায় কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। মীরা দেবী সম্বন্ধে 'cold type' অথবা 'অতি সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন' ইত্যাদি মন্তব্যগুলি তাই একেবারেই আপেক্ষিক, অথবা বিবেচনাহীন কথা। দুঃখের বিষয় তাঁর প্রিয় আত্মীয় বন্ধুরা অনেকেই এখন পরলোকে, তবু এখনও তাঁর স্নেহধন্যা যাঁরা আছেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে একমত হবেন।

শান্তা দেবী আমাদের বলেছেন, "যে মানুষ মৃত, চিরতরে যাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ, আজ-কাল তাঁদেরই নিয়ে নানা উদ্ভট গল্প বা জল্পনা-কল্পনা করার প্রবণতা বেড়েছে।" এই সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী আমাদের বলেছেন, "কোনও মানুষ সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করি তখন দোষগুলি নিয়ে যদি বলি তখন গুণগুলির বিষয়েও বলা প্রয়োজন। নয়তো আসল চরিত্রচিত্রণ হয় না। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের পুত্র কন্যারা মহামানবের সন্ততি হওয়ার দরুন, তাঁদের সম্বন্ধে নানা আলোচনা, নিন্দা প্রশংসা হবেই। মীরা দেবীর দোষের কথা প্রভাতবাবু লিখেছেন। তাঁর একটি গুণের কথা আমি বলি। তিনি অসাধারণ সত্যবাদী ছিলেন এবং অপ্রিয় হতে পারেন জেনেও তিনি সত্যতে স্থির থাকতেন। এই জন্য নিশ্চয়ই অনেকে তাঁকে পছন্দ করেননি। আমার মনে হয় তাঁর চরিত্রের এটা একটা বড় দিক।"

শান্তশ্রী নাগ, শ্যামশ্রী লাল,
পারমিতা বিশ্বনাথন,
কলকাতা-৪৫

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা 'শরৎকুমার চক্রবর্তী' আমার খুল্লতাত ছিলেন।

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় (সংখ্যা ৬ মার্চ, ১৯৭৬) প্রকাশিত 'প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথ' প্রবন্ধে দেখিলাম আমার পিতৃব্যের নাম শরৎকুমারের পরিবর্তে "শরৎচন্দ্র" লিখিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে আরও একটি ভ্রম দেখিলাম। শরৎকুমার ১৯২২ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসিয়া জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে থাকেন নাই, সম্ভবত ১৯১২ সালে আসিয়াছিলেন, ১৯১৮ সালে আমার বেলাকাকীমার মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব ১৯২২ সালে তাঁহাদের জোড়া-সাঁকোয় থাকিবার প্রশ্নই আসে না।

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী
মজঃফরপুর

রামায়ণ সমস্যা

ইদানীং রামায়ণের ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহ্য নিয়ে পণ্ডিতমহলে যে বাদ-প্রতিবাদ ও আলোচনা চলছে, আশা করি তার প্রতি একই সময়ে বিদ্বজ্জন ও সাধারণ পাঠক উভয়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। রামায়ণের উৎস সন্ধানের এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৩ মার্চ দেশ-এ প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্র সেন-এর 'রামায়ণ-সমস্যা' প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান গবেষণা বিশেষ। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় প্রধানত রামায়ণ ও বাল্মীকির ঐতিহাসিকতা, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল এবং রাম-সীতার সম্পর্ক নিয়ে তথ্যবহুল বিস্তৃত আলোচনা করে উপরি-উক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কেই কিছুটা আনুমানিক হলেও মোটামুটি একটা যুক্তি-পূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে প্রয়াস পেয়েছেন। দুরূহ এই প্রচেষ্টার জন্যে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখকের মতে দেখতে পাচ্ছি, উপনিষদের কালই হলো রামায়ণের রচনাকাল, আর রামায়ণ লিখিত

হয়েছে ত্রেতাযুগে অর্থাৎ তৃতীয় যুগে। তাই যদি হয় তাহলে আদিকাব্য রামায়ণকে স্বাভাবিকভাবেই দ্বাপর (দ্বিতীয়) যুগে লিখিত মহাভারতের পরবর্তী রচনা বলে সাব্যস্ত করতে হয়।

কিন্তু এখানেই আমার খটকা। এবং এ প্রসঙ্গেই আমি দুটি বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমত, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই পর্যায়ক্রমিক যুগ বিভাগের প্রশ্নে তিনি প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, "আমার ধারণা আসলে দ্বাপর ও ত্রেতা যুগ বলতে এককালে বোঝাত দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ। তাতে দ্বাপর ও ত্রেতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও বজায় থাকে। কারণ স্পষ্টতই দ্বাপর শব্দের মূলে দ্বি আর ত্রেতা শব্দের মূলে ত্রি" (দেশ। ১৩ মার্চ। পৃঃ ৪৪৮)। কিন্তু আমার বক্তব্য, দ্বাপর ও ত্রেতা শব্দের মূলে যথাক্রমে দ্বি ও ত্রি হয়েও ঐ দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আসল অর্থ কী দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ? তথাকথিত দ্বাপর ও ত্রেতা যুগ বলতে কী এমন বোঝাতে পারে না, যে যুগে যথাক্রমে দুই ও তিন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা অবতারের আবির্ভাব হয়েছে? কারণ দ্বাপর-এর 'পর' কথাটার মানে যদি 'শ্রেষ্ঠ' ধরি তাহলে দ্বাপর যুগের অর্থ কী এই-ই দাঁড়ায় না, যে যুগে দুই-ই (অর্থাৎ দুই অবতারই) হলেন শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ দ্বাপরে অবতার কৃষ্ণ ও বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে বলেই এ'রাই হলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তেমনি 'ত্রেতা'য় স্পষ্টতই ত্রি বা ত্রিকে প্রাপ্তি। অর্থাৎ ত্রেতা যুগ বলতে বুঝি যে যুগে 'তিন'কে (অর্থাৎ তিন অবতারকে) লাভ করা গেছে। যেমন ত্রেতায় আবির্ভাব হয়েছে বামনদেব, পরশুরাম ও রামের। এবং যেহেতু রাম প্রভৃতির আবির্ভাব কৃষ্ণ প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্বেই ধরা হয়ে থাকে (লেখক-উদ্ধৃত রামায়ণের নাগরাজার কাহিনী থেকেও বোঝা যায় রামচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ববর্তী), সেহেতু সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই পর্যায়ক্রমিক যুগ বিভাগের দিক থেকে দেখতে গেলে ত্রেতাকেই দ্বাপরের পূর্বে স্থাপন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে মনে হয় চতুর্যুগের অন্তর্ভুক্ত ত্রেতাই হলো দ্বিতীয় যুগ আর দ্বাপর তৃতীয় যুগ।

দ্বিতীয়ত, রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে কাহিনী-রচনার কাল হিসেবে কোন্‌টি আগে বা পরে লিখিত হয়েছে আমার তা জানা নেই, কিন্তু কাহিনী-বর্ণিত ঘটনার কাল বিচারে রামায়ণ কাব্য যে মহাভারতের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব নয় এমন কথা বোধ হয় আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের একটি লেখা থেকে আন্দাজ করা যায়। তিনি লিখেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৪২ অব্দে ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ইক্ষ্বাকুবংশের বৃহদ্‌বল নামক রাজা নিহত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে গণিয়া গেলে শ্রীরাম ত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বতন। শতবর্ষে চারি পুরুষ গণিলে সাড়ে সাত শত বৎসর। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯২ অব্দের নিকট-বর্তী কালে শ্রীরাম ছিলেন" ('রামোপাখ্যান' —যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। উক্ত হিসেব মত দেখা যাচ্ছে, রাম এখন থেকে আনুমানিক ৪৬৬৮ (২৬৯২+১৯৭৬) বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে 'রাম আবির্ভূত হয়েছিলেন কোন যুগে'—লেখকের এ প্রশ্নের (দেশ। ১৩ মার্চ। পৃঃ ৪৪৮) তেমন কোনো সদুত্তর না পাওয়া গেলেও রাম যে কত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার একটা হদিস পাওয়া যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাম যে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র তাও প্রমাণিত হয়।

অনিলবরণ চক্রবর্তী
হুগলী।

নীল লোহিতের চোখের সামনে

১০ই এপ্রিল ১৯৭৬ সংখ্যায় 'বই চুরির অভিযান' সম্পর্কিত নকশাটিতে একটি তথ্যের ভুল চোখে পড়ল। নীললোহিতকে দোষ দিই না—তাঁকে যিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন তিনিই হয়তো ভুল তথ্য দিয়ে থাকবেন। মুর্শিদাবাদ কাহিনীর রচয়িতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের মহানুভবতার দিক তুলে ধরতে গিয়ে তিনি তাঁর পরিচয়দান সূত্রে তাঁকে 'ইস্কুল মাস্টার' হিসাবে পরিচিত করেছেন। ঐতিহাসিক সম্পর্কে ইতিহাস বিকৃতি না থাকাই উচিত মনে করে জানাচ্ছি, এই পরিচিতিটুকু সম্পূর্ণ ভুল। স্বর্গীয় নিখিলনাথ মহাশয় আমার আত্মীয় এবং আমার কৈশোর স্মৃতির উপর নির্ভর না করে আমি তাঁর পুত্র অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়কে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি—তিনি প্রথম জীবনে হাই-কোর্টের উকীল এবং উত্তরকালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুরোধে 'এথোড়া' ইত্যাদি অঞ্চলে তাঁদের জমিদারীর নায়েব বা ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন দিনই তিনি ইস্কুল মাস্টারী করেননি। আশা করি নীললোহিত এই ভ্রমটুকু সংশোধন করে দেবেন।

নক্ষত্র রায়
কলিকাতা-২৫

॥ ২ ॥

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ তারিখে প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় "নীললোহিতের চোখের সামনে" খুব ভাল লাগলো। লেখক

তিনিই বলেছেন, খাতা দেখে গান গাইলে গানের মাধুর্য যেন অনেকাংশে কমে যায়। আমি নিজেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত, একসময়ে নিজেও কিছু কিছু গান করেছি। কতদিন গান অভ্যাস করি না। কিন্তু এখনও আমার প্রায় সব গানগুলিই মুখস্থ আছে। অথচ আমার ৮।৯ বছরের ছোট মেয়ে গান গাইছে খাতা দেখে! তার এই স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করি। এই খাতা দেখে গান একেবারে ভাল লাগে না।

জনৈকা পাঠিকা
কলকাতা-২৩

জেন অস্টেন

গত ২৪শে এপ্রিলের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'সাহিত্য প্রসঙ্গ'-র অন্তর্গত 'জীবন ও রচনাকর্ম' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে বেশ পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। হতে পারলাম না এই কারণে যে, অভিনন্দ্য 'Pride and Prejudice' 'Emma' প্রভৃতির লেখিকা জেন অস্টেনকে তাঁর এই নিবন্ধে তেমন উঁচু আসন দিতে পারেননি দেখে। তাঁরা জেন অস্টেনকে কেউ প্রথম সারির লেখক বলবেন না, তবু বৃটিশ চরিত্রে এক ধরণের সৌজন্য ও কর্তব্যবোধ লক্ষ করা যায়। গত ডিসেম্বর মাসে মিস জেন অস্টেনের দুশো বছর পূর্ণ হয়ে গেল বলেই এই রচনাটি ('জেন অস্টেনের জগৎ') পাঠকদের উপহার দেওয়া হয়েছে—এই উক্তির মধ্যেই আমরা ইংরেজ মহিলা লেখিকার প্রতি অভিনন্দন একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দেখতে পাই। অথচ আমরা জানি উপন্যাসের ইতিহাসে, সারা পৃথিবীর উপন্যাসের ইতিহাসে, শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকার যে-কোন বিচারের মানদণ্ডে, ইংরেজ মহিলা লেখিকা জেন অস্টেনের উঁচু আসন সর্বজনসম্মত ও অবিচলিত, তিনি স্বাধিকার মহিমায় মহিমান্বিতা। তা না হলে কৃতী উপন্যাস লেখক Disraeli, যিনি বহুবার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি কি করে এই ইংরেজ লেখিকার Pride and Prejudice'—উপন্যাসটি ১৭ বার পড়েন এবং কি করেই বা Coleridge, Tennyson, Sir Walter Scott, Macaulay, Sidney Smith-র মত সাহিত্যের দিকপালেরা তাঁর উপন্যাসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। নিশ্চয়ই লেখিকার সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁরা এমন কিছু অতিলক্ষণীয় বস্তু দেখেছেন যার জন্যে প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ। এখন সেই বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনায় আসা যাক। অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু বসুর মতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল তিনটি।

(১) জেন-এর রচনায় প্রধান স্থান মানুষের, নর-নারীর। তাঁর সমবয়সী কবি-গণ যেখানে নিসর্গ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, জেন তখন সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন।

(২) জেন-এর লেখায় প্রতি ছত্রের গভীরে একটা অনুপম Irony, ভারতীয় অলঙ্কার তত্ত্বে যাকে বলা হয় শ্লেষ, তা-ই, বিদ্রূপ নয়, নঞর্থক মনোভাব নয়, কৌতুকোজ্জ্বল প্রসন্নতা যাতে একই কর্মের, একই চিন্তার বা উক্তির, একই মানুষের একাধিক ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। এই Irony আধুনিক ইংরেজ চরিত্রের এবং আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের মহামূল্যবান লক্ষণ। কিন্তু এ-বিষয়ে জেন-এর প্রাধান্য আজ পর্যন্ত অবিসংবাদিত।

(৩) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জেন অস্টেনের যাবতীয় কাহিনীতে Point of View, যাকে বলব দৃষ্টিকোণ, সেটি নারীর দৃষ্টিকোণ। পৃথিবীর সাহিত্য সুদীর্ঘকাল পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই রচিত হয়েছে, জেন অস্টেন ঢাক না পিটিয়ে একটা যুগান্তকারী বিপ্লবসাধন করেছিলেন, যদিচ তাঁর জীবন-দর্শন ছিল সম্পূর্ণত বিপ্লব বিরোধী, রক্ষণশীল, সে-বিপ্লব হচ্ছে, নারীর দৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য ধর্ম।'

বারিদবরণ ঘোষ
চুঁচুড়া

সাহিত্যিকের প্রথম শোকসভা

১৭ই এপ্রিল ১৯৭৬ সংখ্যায় সুজিত-কুমার সেনগুপ্তের ভারতীয় সাহিত্যিকের প্রথম শোকসভা প্রবন্ধে, ৮৭৮ পৃঃ—"উপায়ান্তর না দেখে চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ ও রবীন্দ্রনাথ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সভার সভাপতি হতে আহ্বান করেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও সে যুগের বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যার গুরুদাস ছিলেন গোঁড়া হিন্দু।"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার হাই-কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস কনিংহাম সাহেবের স্থলে ডক্টর গুরুদাস চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে প্রথম ছয় মাসের জন্য ও তৎপরে স্থায়িভাবে বিচারপতি নিযুক্ত হন, সেই সময় স্যার কোমার পেথারাম কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ডক্টর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকলিন। কলিকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ ষোল বৎসর বিচারপতির কার্যকালে ডক্টর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৪-এ জুন তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন।

ভবানী ঘোষাল
কলিকাতা-১১

পনেরো

দরজা খুলে ঘরের আলো জ্বালল মীরা; সুরপতির দিকে তাকাল। বলল, জামা কাপড় ছেড়ে নিন তাড়াতাড়ি!"

সুরপতি মীরাকে দেখছিল। প্রায় সর্বাঙ্গই ভেজা মীরার। বলল, "আপনি?"

"আপনি আগে সেরে নিন, আমার একটু দেরী হবে বাথরুমে।" বলে মীরা আর দাঁড়াল না, বাইরের বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল।

নিজের ঘরে এল সুরপতি, আলো জ্বালল। জানলাগুলো সকাল থেকেই বন্ধ। দরজাও বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে সারাদিনের বন্ধ বাতাসের গন্ধ ও গুমোট। সুরপতি দুটো জানলা খুলে দিল। ঠাণ্ডা ভিজে বাতাস এল হু হু করে। এদিকে বুঝি এবার বৃষ্টি আসার পালা। মেঘ ডাকছে।

সুরপতি শুকনো পাজামা, গেঞ্জি নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে, মাথা গা মুছে পোশাক বদলাবার সময় সুরপতির সেই একই রকম পুরোনো অস্বস্তি হচ্ছিল। এই তিন চার ঘণ্টার মধ্যে কিছু যেন একটা ঘটে গেছে, পলতার বাগানবাড়িতে যে ঝড়-বৃষ্টি এসেছিল—সুরপতি বুঝতে পারছে না—সেই দুর্যোগ কোথাও কিছু ঘটিয়ে দিয়ে গেছে কিনা, কিন্তু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কোনো মানুষের পক্ষেই জানা সম্ভব নয়, একটা ঝড় আচমকা উঠে এলে কতক্ষণ চলবে, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলেও কতক্ষণ তা স্থায়ী হবে। সুরপতি হিসেব করে সঠিক বলতে পারবে না কতক্ষণ টানা ঝড় বৃষ্টি চলেছিল। ঘণ্টা খানেক কি তার বেশীও হতে পারে। কখনও ঝড় কিছুটা কমেছে, বৃষ্টি বেড়েছে, কখনও বৃষ্টি কমেছে, ঝড় বেড়েছে। শেষ বিকেলেই সব ঘনঘোর হয়ে গেল। কাঠ কয়লার আঁচড়ে আঁকা ছবির মতন আকাশ, জল, মাটি, গাছপালা। সব কালো হয়ে বৃষ্টিতে একাকার হয়ে যাচ্ছিল, ঝড়ে গাছপালা তছনছ হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাত মীরাকে এত ভীতার্ত করছিল যে সেই ছোট ভাঙা মন্দিরের চাতালে মীরা প্রায় সর্বক্ষণ সুরপতিকে আঁকড়ে ধরে রাখছিল।

মীরা আর সুরপতি যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাস দিচ্ছে দমকা, দু জনেই ঝড়ে জলে ভিজে গিয়েছে, বাগানে জলকাদা, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, মাথার ওপর দিয়ে কালো মেঘ ভেসে যাচ্ছে হুহু করে।

বাগান বাড়ির বারান্দায় প্রমথরা সকলে দাঁড়িয়ে ছিল, উদ্বেগ আর আশঙ্কা নিয়ে: মেয়েরাও ব্যস্ত, উৎকণ্ঠ। বিরক্ত।

সুরপতিরা সামনে আসতেই প্রমথরা তাদের দেখল। প্রায় সর্বাঙ্গ-সিক্ত এই দুটি মানুষকে আগ্রহ, কৌতূহল, বিস্ময়, সন্দিগ্ধ চোখে সকলেই কেমন লক্ষ করতে লাগল। চাপা ধিক্কার ও বিদ্রূপও যে না ছিল এমন নয়। মীরাকেই যেন আরও নজর করে দেখছিল সকলে। মীরার পিঠের দিক যদি বা সামান্য কম ভিজেছে সামনের দিকটা ভিজে সপসপ করছিল, শাড়ি জামা গায়ে লেপটে রয়েছে, জল পড়ছে পায়ের দিকে।

প্রমথ একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে মীরার চোখে চোখে তাকাল। তারপর সুরপতিকে বলল, 'কী ব্যাপার?'

সুরপতি বলল, 'গঙ্গার দিকে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এসে গেল।'

প্রমথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল।

মেয়েরা বারান্দার খানিকটা ভেতর দিকে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো একটা লণ্ঠন জ্বলছিল দোর গোড়ায়। থমথমে ভাব জমে উঠেছে। মীরার দিকে আর কেউ সরাসরি তাকাচ্ছিল না। অবস্থাটা অস্বস্তিদায়ক।

শিশিরই কথা বলল, 'তোরা আমাদের ভীষণ ঘাবড়ে দিয়েছিলি। যে-রকম ঝড় জল! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল আমার। শুনতে পাস নি?'

মাথা নাড়ল সুরপতি। 'আমরা মাথা বাঁচাতে ওদিকে একটা ভাঙা ইটের মন্দিরে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'বেশ করেছিলি। তাড়াতাড়ি নে; স্টার্ট করব। এখন একটু ঢিলে রয়েছে, আবার কখন ঝেঁপে আসবে।'

শিশিরের বউ মীরাকে গা-মাথা মুছে নিতে বলল।

একটু পরেই বাগানবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। প্রমথ আর ত্রিদিব গাড়িতে এল না। তারা জগবন্ধুদের সংগে

স্টেশন যাবে, অমলও রয়েছে, ওদিক দিয়ে ফিরবে। বেশীর ভাগ মেয়েরাই শিশিরের সংগে গাড়িতে ফিরে যাবে। সেটাই সুবিধের।

ফেরার পথে গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে শিশির আর সুরপতি। পেছনে মীরা, প্রণতি, ছন্দা, শিশিরের বউ আর কিছু ধোওয়া-মোছা বাসন।

শিশির যেন কোনো অস্বাভাবিক আবহাওয়া হালকা করার জন্যে এলোমেলো কথা বলছিল : কখনও মজার কথা বলার চেষ্টা করছিল, কখনও কোনো পুরোনো গল্প বলছিল, মেয়েদের সংগে স্ত্রীর সংগে ঠাট্টা তামাশার কথা বলছিল। সুরপতি প্রায় চুপচাপ। তার শীত করছিল। পেছনে মেয়েরাও বড় কথা বলছে না। মীরা কেমন জেদীর মতন বসে, কথাও বলছে না, গ্রাহ্যও করছে না কাউকে।

কলকাতায় পেঁছবার পথে চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হল, আজকের ঝড়-বৃষ্টির আয়োজনটা সামান্য ছিল না। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে, কোথাও হয়নি—আঁধি উড়ে গিয়ে এই সন্ধ্যের মুখে সব ঘোলাটে করে রেখেছে, বাতাসে ধুলো জমে আছে। মেঘ রয়েছে আকাশ জুড়ে। সোঁদা গন্ধ দিচ্ছে কোথাও কোথাও। কলকাতায় পেঁছে বোঝা গেল, এদিকেও ঝড়বৃষ্টি আসতে পারে।

মীরাদের বাড়ির কাছে নামিয়ে শিশির চলে যাবার পর সুরপতি দেখল, এদিকের আকাশও ঘটা করে সেজেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। রাস্তার বাতি-গুলো যে কোনো মুহূর্তে নিবে যেতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মীরা বলল, 'আপনার শীত করছে?'

সুরপতি শীতটা সামলে নিয়েছিল, বলল, 'না। আপনিই বেশী ভিজেছেন।'

'একদিন তো—! কী হয়েছে!'

মীরা আর কিছু বলল না। রাধাকেও ডাকল না নীচে থেকে। ঘরের চাবি খুলল।

সুরপতি ঘরে একলাই বসেছিল। এদিকে এখনও জোর বৃষ্টি নামে নি। ঝির-ঝিরে এক পশলা বৃষ্টির পর থেমে গেছে। ধুলোর গন্ধও আর ছিল না। দুরান্ত কোনো বৃষ্টির ভিজে বাতাস বয়ে আসছিল। সামান্য গা সিরসির করে ওঠায় জানলা বন্ধ করে দিল সুরপতি। মাথাটা ধরে উঠছে।

আরও খানিকটা পরে মীরা এল। মাথার চুল এলো, পিঠের দিকে ছড়ানো। একেবারে সাদা শাড়ি পরেছে, সদ্য পাট ভাঙা, কালো পাড়। গায়ের জামাটাও সাদা। মুখ চোখ পরিষ্কার, ধবধবে, কোনো প্রসাধন নেই। কেমন একটা আর্দ্র স্নিগ্ধ ভাব তাকে জড়িয়ে রয়েছে।

চা করে এনেছিল মীরা। দুজনের জন্যেই। বলল, "নিন, চা খান—, বিকেলে তো চা খেতে পান নি। শুধুই ভিজেছেন।"

মীরার গলার স্বর সামান্য ভাঙা শোনাল। ঠান্ডা লেগেছে বোধ হয়।

সুরপতি চা নিল। বলল, "আবার কি স্নান করলেন?"

"না! আবার—!" মীরা বাঁ হাতে মাথার ছড়ানো চুল কাঁধের পাশ থেকে সরাল। গলায় শব্দ করল—ঠান্ডায় গলা জ্বালা করছে। টাগরার কাছে শব্দ হল।

সুরপতি চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম পেল। মাথাটা ধরে আসছে। হয়ত চায়ের পর ছেড়ে যাবে।

মীরাও চা খেতে লাগল। সে বিছানায় বসেছে।

"এদিকেও ভাল বৃষ্টি হবে" সুরপতি অন্যমনস্কভাবে বলল।

মীরা এমন করে চোখ তুলল যেন বৃষ্টি সে দেখেই এসেছে।

খুঁজে পেতে সুরপতি ঘরে সিগারেটের প্যাকেট পেয়েছিল একটা। গোটা পাঁচেক রয়েছে এখনও। সিগারেট ধরাল। "কটা বাজল এখন?"

"প্রায় আট।"

"প্রমথ ফিরতে রাত করলে ভিজবে।"

"বলল তো পরে ফিরবে। বন্ধুদের সংগে রয়েছে।" মীরা উদাসীন গলায় বলল।

সিগারেটের ধোঁয়া চোখে লেগেছিল সুরপতির, ডান চোখের পাতা বুজে এল, ছলছল করল সামান্য। প্রমথ কী অসন্তুষ্ট হয়েছে? বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাকে। কথাও বলে নি বড় একটা। মীরা না সুরপতি—কার ওপর সে বিরক্ত? না দুজনের ওপরেই? সুরপতির আবার বাগানবাড়ির সেই দৃশ্য মনে পড়ল। অস্বস্তি বোধ করল সে।

জিব আর টাগরায় শব্দ করে গলা ল। তারপর তাড়াতাড়ি চায়ের রিয়ে রেখে বার কয় জোরে জোরে বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল আচমকা, ন অজস্র গাছের পাতা বাতাসের কেঁপে উঠল শব্দ করে।

রা নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে ঠান্ডাই লেগে গেল বোধ হয়।... স ভেজাভিজির শাস্তি...। পনার কাপটা দিন—চা আরও নিয়ে আসি।"

রপতি চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার মীরা উঠে দাঁড়াল।

দিকেও বৃষ্টি নামল। শেষ শীতের ভুজল অল্প শীত এনেছে। রাতে ঠান্ডা বাড়বে। সুরপতি কান পেতে বৃষ্টির ঝাপটা শুনতে শুনতে অন্য- হয়ে পড়ল। আজকের বিকেলটা কে সাজিয়ে রেখেছিল—কেমন করে গেল আচমকা কে জানে! মাঝে মাঝে র মনে হয়, কে যেন—যাকে দেখা বোঝা যায় না—সেই মানুষটা কিছু সাজিয়ে রাখে জীবনের। রেখেছিল। নয়ত কেমন করে মীরা সুরপতি মন্দিরে দাঁড়িয়ে এক তুমুল ষ্টিতে ভিজে এল। ইটের ভাঙা টা নিতান্তই ছোট, ওটা মন্দির ছিল, ন কিছু তাও বলা মুশকিল। ইটের বললেও বলা যায়। মাথার ওপর আচ্ছাদন ছিল এই যা রক্ষে। মীরা, সুরপতি প্রমথর বউ হিসেবে আজ নিতাই দেখছে—সেই মীরাকে তখন চ্ছিল না। কিছু একটা হয়েছিল দুর্যোগের ভীতি শুধু নয়, যে মানুষকে বোধহীন করে—তেমন সুরপতি অনুভব করছিল—মীরা কোনো গভীর সান্নিধ্যের জন্যে ব্যাকুল পড়েছিল। এই ব্যাকুলতার জন্যেই -যার কিছু অবশিষ্ট মীরার চোখে লেগে ছিল—প্রমথর চোখে পড়েছে। ই বুঝতে পারছে না, প্রমথ তার স্ত্রীর স এবং চোখমুখের চেহারা দেখে সন্দেহ করেছে কিনা! অন্যদের দৃষ্টিও তির পছন্দ হয়নি।

নিয়ে মীরা আবার এল। সুরপতি হাত রেখে চোখ বুজে বসে ছিল। শব্দে মুখ তুলল।

দিয়ে মীরা সামনেই দাঁড়িয়ে থাকল তারপর বিছানায় গিয়ে বসল।

"কী ভাবছেন?" মীরা গায়ে চাদর ছ এবার।

না, কি আর...!"

অত ভাবনার কিছু নেই," মীরা উপেক্ষার গলায় বলল। নিজের ও আবার চা এনেছে।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে সুরপতি বলল, "প্রমথ আবার বৃষ্টির মধ্যে পড়ল।"

মীরা সুরপতিকে লক্ষ করছিল; বলল, "আপনার দুশ্চিন্তা বন্ধুকে নিয়ে, না অন্য কিছু?"

সুরপতি মীরার গলার চাপা বিদ্রূপ এবং ঈষৎ ঝাঁঝ বুঝতে পারল। বলল, "প্রমথ বোধ হয় অসন্তুষ্ট হয়েছে।"

"কেন হবে?" মীরা শক্ত স্পষ্ট গলায় বলল, "বাড়িতে যে তার বউকে চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধুর কাছে ছেড়ে রেখে যেতে পারে—বাইরে এক দু' ঘণ্টা সে বউকে বন্ধুর সঙ্গে মিশতে দিতে পারে না?"

সুরপতি চুপ করেই থাকল।

অপেক্ষা করে মীরা বল, "আপনার বন্ধুকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।"

সুরপতি নীরব।

বৃষ্টির শব্দ ছাড়া সারা বাড়িতে অন্য কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেমন এক নীরবতা অন্তঃস্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছিল। সুরপতি আর মীরাকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। কিছু সময় কেউ কোনো কথা বলল না. মীরাই প্রথমে অধৈর্য হল, বিছানার ওপর বাঁ হাত রেখে চাদরে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের ভাঙা ছায়া দেখল. মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল সুরপতির দিকে। সুরপতি নিঃসাড় বসে আছে। বৃষ্টির সেই একই রকম শব্দ।

মীরা যেন সহসা কোনো ঘোর থেকে জেগে উঠল। হাতের কাপ নামিয়ে রেখে গলায় শব্দ করল। বলল, "একটা কথা আজ জিজ্ঞেস করি। করব?"

সুরপতি সচেতন হল না পুরোপুরি, অনামনস্কভাবেই বলল, "বলুন।"

মীরা কোলের ওপর হাত জড় করল। পা কেঁপে উঠল সামান্য। বলল, "সেই কবে কী ঘটেছিল, আমার কাছে তো কেমন ছেলেমানুষিই মনে হচ্ছে. সেই জের কি আপনি এখনও সত্যি সত্যি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন?"

সুরপতি মীরার চোখের তারায় চোখ রেখে নির্বাক থাকল। পরে বলল, "আমরা কে যে কোন্ জেরটা টেনে নিয়ে যাই, জানি না।"

"ও কি কথা হল কোনো?"

"কেন?"

মীরা কোনো রকম অপ্রস্তুত বোধ না করে বলল, "আমায় কবে ভা[illegible] লেগেছিল আপনার সেটা মনে রেখে [illegible]পনি জীবন কাটাবেন এ আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করার কথাও নয়।"

"তবে?"

"আমার জীবনের দু একটা টুকরো কথা হয়ত আপনি জানেন, তা থেকে কেমন করে বুঝবেন..."

মীরা কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, "আপনার কথাই বলুন, শুনি।"

"কী হবে বলে!"

"আপনি নাকি বন্ধুকেও কিছু বলতে চান না। কেন?'

"বলার কিছু নেই," সুরপতি ম্লান হেসে বলল, "মামুলি মানুষ। পেটের ধান্ধায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনো দু পয়সা বেশী রোজগার হয়েছে খেটেখুটে। কখনও কম। এইভাবেই কেটে গেছে।"

"আপনার পেট চালানোর গল্প তো আমি জানতে চাইছি না—," মীরা বলল, "খাওয়া-পরার গল্প শুনে আমার কী হবে!"

"[illegible]?"

মীরা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বলব?"

"বলুন?"

"আপনার ভালবাসার কথাই বলুন—," মীরা যেন সামান্য লঘু গলায় বলল। পরিহাস-ছলে।

সুরপতি কোনো রকম অস্বস্তি প্রকাশ করল না। মীরাকে দেখতে দেখতে বলল, "সে-গল্পও বলার মতন নয়।"

"কেন?"

"আমি নিজেই বুঝলাম না।"

"কী বুঝলেন না? ভালবাসা কাকে বলে—?" মীরা ঠোঁট টিপে হাসল।

"তা ঠিক, কাকেই বা বলে," সুরপতি বলল।

মীরা যেন গলা পর্যন্ত কোনো কথা টেনে এনেছিল, নামিয়ে ফেলল; সুরপতিকে পরিষ্কার চোখে দেখতে লাগল। শেষে বলল, "আজ দুপুরে আপনি অন্য কথা বলেছেন।" মুখের হাসি মুছে গেল মীরার।

"কোন্ কথা?"

"আপনি বলেছিলেন, আমায় দেখতে এসেছিলেন।"

সুরপতি কথা বলল না। মীরার দিকেও চোখ নেই। মাথার চুল টানল, চোখ বন্ধ করল, মুখের ওপর হাত বুলিয়ে নিল। যেন ক্লান্ত লাগছে এইভাবে একটা সিগারেট ধরাল।

মীরা অধৈর্য হয়ে বলল, "বলুন।"

সুরপতি মীরার দিকে তাকাল। বলল, "আপনাকে ঠিক দেখতে আসিনি। এখানে হঠাৎ এসে পড়ে দেখেছি। না দেখারই কথা, তবু দেখলাম।"

"দেখে কী মনে হল?"

এক মুখ ধোঁয়া টেনে নিল সুরপতি। ধীরে ধীরে ছাড়তে লাগল। পরে বলল, "আমার মতন।"

অবাক চোখে চেয়ে থেকে মীরা বলল, "আপনার মতনই! মানে?"

"একই রকম। কোনো একটা অভাব নিয়ে আমাদের কেটে গেল।" সুরপতি মৃদু, এলোমেলো গলায় বলল, "প্রমথ আপনার ভালবাসার মানুষ নয়।"

মাথা নাড়ল মীরা। "না, এরা কেউ আমার ভালবাসার লোক নয়।"

"নীরেন্দ্রও ছিল না," সুরপতি বলল, "আমিও নয়।"

মীরা স্থির চোখে চেয়ে থাকল।

সুরপতি বলল, "কাল রাত্রে আপনি আমার ঘরে এসেছিলেন আমি জানি।" বলে দরজার দিকে তাকাল, চুপ করে থাকল কয়েক দণ্ড, আবার বলল, "এ-বাড়িতে আসার পর থেকে আমার কেমন মনে হয়েছিল একদিন না একদিন আপনি আসতে পারেন। কেন মনে হয়েছিল জিজ্ঞেস

জানবেন না। হয়েছিল। হয়ত নিজের সঙ্গে আমি বাজি লড়ছিলাম। দরজা খুলে রেখে শোবার অভ্যেস এখন আর আমার নেই। আগে ছিল। শ্যামা আমায় দরজা বন্ধ করে শুতে দিত না।" সুরপতি যেন কিছু ভেবে ইচ্ছে করেই শ্যামার নামটা বলল।

মীরা কৌতূহল ও আগ্রহের চোখে সুরপতিকে দেখল। "শ্যামা আপনার স্ত্রী?"

"না; বোন। মাসতুতো বোন। বেনারসে থাকত।"

মীরা যেন দ্বিধা বোধ করছিল, বুঝতে পারছিল না, শ্যামা কেন সুরপতিকে দরজা বন্ধ করে শুতে দিত না। সুরপতির বুকের অসুখের জন্যে? ভয় পেত? "শুতে দিত না কেন? অসুখের জন্যে?"

মাথা নাড়ল সুরপতি। "অসুখ ঠিক নয়; তবু বলতে পারেন অসুখ।" সুরপতি বুঝতে পারল না—হঠাৎ কেন সে কথা বলার সময় সহজ বোধ করছে। নিজের কথা বলতে তার আর অনাগ্রহ নেই, দ্বিধা নেই; বরং কোনো তাড়নায় বা ইচ্ছায় সে যেন স্বেচ্ছায় সমস্ত কথাই বলতে চায়। সিগারেটটা আঙুলে রেখেই সুরপতি বলল, "আমরা অনেকেই একটা অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকি। কোনো না কোনো রকমের। শ্যামারও ছিল। আমারও। রমাও তো অসুখ নিয়ে ছিল। তরু।"

মীরা ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল। শ্যামা, রমা, তরু...এরা কারা? সুরপতি কাদের কথা বলছে? কিসের সম্পর্ক তার এদের সঙ্গে? চোখের ভুরু ঘন হয়ে এল মীরার, জোড়া ভুরু কুঁচকে এল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। বলল, "এরাও কি আপনার বোন?"

সুরপতি বলল, "রমা শ্যামার বড় বোন। তরু গ্রামের মেয়ে। আমি কিছুদিন মুর্শিদাবাদের দিকে স্কুল মাস্টারী করেছিলাম। তরু আমার বাড়ির কাছেই থাকত। একটা পা ছিল না। কাটা ছিল।"

মীরা কেমন অপ্রসন্ন হল। তার চোখ মুখ গম্ভীর। বলল, "আপনার স্ত্রী কে?"

"এরা কেউ নয়। আমার স্ত্রীর নাম ছিল বকুল।"

মীরা দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "অনেক মেয়েকেই তো আপনি তা হলে চিনতেন।" মীরার গলার স্বরে ধার ছিল, হয়ত বিদ্রূপও।

সিগারেটটা ফেলে দিল সুরপতি। হঠাৎ নেশা হয়ে গেলে যেমন হয়, সুরপতি কেমন একটা ঝোঁক ও অদ্ভুত আবেগ বোধ করতে লাগল। বলল, "আপনি আমার কাছে ভালবাসার গল্প শুনতে চেয়েছিলেন, আমার জীবনের। এরা কেউ আমার পুরোপুরি ভালবাসার মানুষ নয়, তবু এরা ছিল, জীবনে এসেছিল। যেমন নীলেন্দুরা কিংবা প্রমথ আপনার এসেছে।"

মীরার চোখমুখ গরম হয়ে উঠল হঠাৎ। সুরপতি কি তাকে অপমান করছে? চোখের মধ্যে জ্বালা জ্বালা করে উঠল। "এরা তবে আপনার আধাআধি ভালবাসার মানুষ?"

"বোধ হয় সকলে তাও নয়—" সুরপতি বলল। "তরু ছিল গ্রাম্য, সরল, সাধারণ। তার কাছে মায়া-যত্ন ছিল। কিন্তু মেয়েদের শরীরের কোনো কোনো খুঁত পুরুষমানুষ পছন্দ করে না। তরুর একটা পা কাটা ছিল, কোমর থেকে ঝুলত। বেচারী তরু। কিন্তু পা-কাটা মেয়ে নিয়ে জীবন কাটানো যায় না।" বলতে বলতে সুরপতি চোখ বন্ধ করল। সেই বৈশাখ দুপুরের আমবাগানের ছবি যেন তার চোখের সামনে খুলে পড়ল। কোনো সন্দেহ নেই সুরপতি সেদিন তরুর [illegible] প্রত্যঙ্গের, পুরুষের পক্ষে যা মোহের [illegible] প্রয়োজনের—তার কাছাকাছি এই বিকৃতি বীভৎসতা সহ্য করতে পারেনি। তার ঘৃণা হয়েছিল। তরুর কোনো দোষ নেই। কিন্তু এই বীভৎসতাকে উপেক্ষা করে সুরপতি তরুকে নিত্য শয্যাসঙ্গিনী করতে পারত না।

সুরপতি বলল, "তরুর ছিল পা-কাটা; আর রমার ছিল অন্য অসুখ। তার কী হয়েছিল জানি না—অমন ধবধবে ফরসা রঙ ধীরে ধীরে নীল দাগে ভরে উঠছিল। কালশিটে পড়ে যেমন নীল থেকে কালো হয়ে আসে—সেই রকম। হাত পা গলা মুখ দাগে দাগে ভরে গেল। রমা চেয়েছিল দাগগুলো ঢেকে রাখবে। রমা তার শরীর মন সবই ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। নিজেকে আড়াল করার লুকিয়ে রাখার এই প্রাণপণ চেষ্টা তাকে কিই বা দিল। রমাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হল। ও আমায় কোনোদিন কিছু বুঝতে দেয়নি। আমায় হয়ত ভালবাসত। বুঝিনি। যদি বা বুঝতে দিত—তবু কি জানি..."

মীরা বলল, "আপনি ভালবাসতে

"না, রমার অসুখ শুধু গায়ের চামড়ার নয়; মনেরও।"

"মনেরও?"

"ওর কোনো প্রকাশ ছিল না। জীবনের কোথাও কোনো প্রকাশ থাকবে না—সুখের নয়—দুঃখের নয়, ভালবাসার নয়, ঘৃণার নয়—তেমন মানুষ নিয়ে আমি কী করব! সাংসারিক জীবন শুধু নয়—মানুষের সমস্ত অনুভব যেখানে শুধু চাপাই থাকে তাকে জীবন বলে না।"

মীরা শুনছিল। বৃষ্টির শব্দ কখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাতাসের ঝাপটা লাগছিল বারান্দার দিকে।

শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। মীরা বলল, "আর শ্যামা?"

সুরপতি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিল। মাথার ওপর হাত তুলল; ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। কিছুক্ষণ একইভাবে বসে থেকে হাত নামাল, মাথা সোজা করে মীরার দিকে তাকাল। বলল, "শ্যামা আমার স্ত্রী হতে চেয়েছিল।"

মীরা কেমন অবাক হল। "বোন না!"

"মাসতুতো বোনকে বিয়ে করতে আমার বাধত না। শ্যামারও নয়। তার কাছে অনেক কিছুর কোনো দাম ছিল না। চলতি নীতিটীতি, সংস্কার, নিষেধ সে মানত না। ও ছিল আশ্চর্য রকমের স্বেচ্ছাচারী। শরীর মন কোনো কিছুতেই তার খুঁতখুঁতেপনা ছিল না। নিজেকে ছাড়া শ্যামা অন্য কিছু গ্রাহ্য করত না।" বলতে বলতে সুরপতি থামল।

মীরা দেখছিল, একটা মানুষ কেমন বদলে যায়। এই সুরপতি প্রথম যেদিন এসেছিল সেদিন তাকে দেখে একরকম মনে হয়েছিল মীরার। পরের দিন আর-এক রকম। তারপর মাত্র চার পাঁচটা দিনের মধ্যে সুরপতি কত বদলে গেল। মানুষটা যে বদলাল তা নয়, মীরা ওকে যত বেশী করে চিনছে, দেখছে—লোকটার কোনো তল পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আবার গরম লাগায় গায়ের চাদর আলগা করে দিল মীরা।

সুরপতি শ্যামার কথা ভাবছিল। শ্যামার কোনো কিছুই ভুলে যাবার নয়; সুরপতি শ্যামার প্রায় সবটাই চিনেছিল। নিজের স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা; নিজের প্রয়োজন ও জেদ—শ্যামাকে এমন একটা চেহারা দিয়েছিল যে সুরপতির মনে হত, শ্যামা কোনো ভয়ংকর যাদুকরীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। সুরপতি ওকে ভয় পেত।

মীরা কেমন অদ্ভুত গলায় বলল, "শ্যামা কিছু মানত না বলেই আপনি বুঝি মানালেন?"

মাথা নেড়ে সুরপতি বলল, "না, তা নয়। শ্যামা হাতের মুঠো খুলে তার বাইরের সমস্তই দিতে পারত—কিন্তু ভেতরে সে অন্যরকম ছিল। শ্যামা ভাবত, তার পছন্দের পুরুষমানুষ তার কেনা হয়ে থাকবে, তার খেয়ালের চাকর। ও ছিল ভীষণ স্বার্থপর, আত্মসুখী, নিষ্ঠুর। শ্যামা আমায় সমস্ত দিক থেকে গ্রাস করতে চেয়েছিল।" সুরপতি বলতে বলতে কাতর ও বিষণ্ণ হল। থেমে গেল। শেষে দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি পালিয়ে এলাম।"

মীরা স্থির হয়ে বসে থাকল। মনে মনে যেন শ্যামার একটা চেহারা গড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। অল্পক্ষণ কোনো কথা বলল না মীরা, পরে জিজ্ঞেস করল, "আর আপনার স্ত্রী?"

সুরপতি বলল, "ঘটনাচক্রে বকুল আমার স্ত্রী হয়েছিল। প্রেম ভালবাসা পছন্দের কোনো ব্যাপার নেই। রাঁচিতে হেম মণ্ডলের চামড়ার কারবারে বকুল চামড়ার গুদোম দেখত। হেম মণ্ডলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে আমার কাছে এসেছিল।

বুনো ধরনের মেয়েমানুষ। বছর দেড়েক ছিল—তাতেই আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার কাঠের কারবার ডুবতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন হাজার কয়েক টাকা চুরি করে সে পালাল। আমি বাঁচলাম।"

মীরা কিছুক্ষণ সুরপতির মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকল, তারপর মুখ ফেরাল। দেওয়ালে রুমকির ছবি, এখান থেকে দেখা যায় না ছবিটা। হালকা রঙের একটা ক্যালেন্ডার সামান্য তফাতে। কেমন করে যেন কয়েকটা আঁচড় লেগেছে দেওয়ালে। বাইরে বৃষ্টি নেই। কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এখনও বাতাস রয়েছে ঝোড়ো। নিঃশ্বাস ফেলল মীরা বড় করে। সুরপতি যা বলল, এ কী তার ভালবাসার গল্প? যদি ভালবাসার গল্প হয়—তবে মানুষটা কোথাও দাঁড়াল না কেন? কেন ঘর-সংসার করে বসল না?

পরেই মীরার মনে হল, ঘর-সংসার করে বসলেই কি সুখ শান্তি উড়ে এসে জুড়ে বসে? মীরা তো করেই এই সংসার নিয়ে বসেছে। কিন্তু কেন সে তৃপ্তি পায় না? কেন তার জীবন এমন বিস্বাদ? দিন কেটে যাচ্ছে অবশ্য। প্রমথ তার কাছে অভ্যাসের মতন, কর্তব্যের মতন। প্রমথ তাকে যথার্থই কোনো আনন্দ দিতে পারে না। কে জানে প্রমথ যদি তার পছন্দের মানুষ হত হয়ত মীরা এরকম হত না। দার্জিলিঙের জামাইবাবু, কিংবা এর ওর সঙ্গে যেরকম মেশামিশি ছিল মীরার, তাতে সে দেখেছে—প্রমথ প্রায় প্রত্যেকের তুলনায় ভোঁতা, ম্যাড়মেড়ে সাধারণ। প্রমথ বউ নিয়ে আদিখ্যেতা করতে পারে, লোকের কাছে তার বরাত-

জোরে পাওয়া সুন্দরী স্ত্রী দেখিয়ে ডগমগ হতে পারে, নিজের বাড়ির দায়-দায়িত্ব মীরার কাঁধে চাপিয়ে হালকা নিশ্চিন্ত হতে পারে, কিন্তু প্রমথ বোঝে না—বা জানেই না—তার বউ এতে কৃতকৃতার্থ হয় না। মীরা এমন কিছু চেয়েছিল—যা তার কাছে সত্য হবে। হল কই?

মীরা যেন অনেক দিনের চাপা কোনো বেদনাকে বুকের ওপর ভেসে উঠতে অনুভব করল। করে নিঃশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে। বড় বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ, মলিন দেখাচ্ছিল তার মুখ। কিসের অস্বস্তিবশে কিংবা অন্যমনস্কতার দরুণ চাদরটা খুলে ফেলল।

সুরপতি অন্যমনস্কভাবে আবার সিগারেট ধরাল। হয়ত ভেতরে ভেতরে কোথাও তার স্নায়ু অবসাদে শিথিল হয়ে আসছিল।

দীর্ঘ সময় দুজনেই নীরব। যেন কোনো দূরত্ব যা পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল ছিল ক্রমশই তা ঘুচে যাচ্ছে, পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে আসছে।

মীরা হঠাৎ বলল, "আপনি বড় বেশী খুঁতখুঁতে। এত খুঁতখুঁতে হলে সংসারে কিছু পাওয়া যায় না।"

সুরপতি মীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "বোধ হয় তাই।...আমি নিজেই মাঝে মাঝে ভাবি এত খুঁতখুঁত করে কিবা লাভ হল!"

"করলেন কেন?"

মুখের কাছে ধোঁয়ার ঝাপসা কেটে যাবার পর সুরপতি বলল, "কী জানি, আমি আমার চোখ ও মনের পছন্দ মতন কাউকে খুঁজেছিলাম। শুনলে হয়ত ভাববেন—ছেলেমানুষি কথা বলছি। তা নয়। আমি বোধ হয় নিজের রুচিমতন সেই কবে—আমার প্রথম যৌবনে, সৌন্দর্য ও ভালবাসা খুঁজেছিলাম। টুকরো টুকরো করে কিছু পেতে চাইনি। কাজ চালাবার মতন করে কোনো মেয়েকে পাওয়া আমার সইতো না।"

"এতে লাভ কী হল? কিছুই তো পেলেন না।"

"কপাল মন্দ" সুরপতি ম্লান করে হাসল।

মীরা কিছু ভাবছিল। বলল, "আপনি কি সত্যিই আমায় ভালবেসেছিলেন?"

সুরপতি মীরার চোখের তারার দিকে, সেই ব্যাকুল অথচ বিষণ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, "কেউ জোর করে ভালবাসার কথা বলতে পারে না। বোধ হয় বেসেছিলাম।"

কি যেন মীরার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগাল। সিরসির করে উঠল। বুকের তলায় কেমন গলে যাচ্ছিল তার সমস্ত অনুভূতি। মীরা বলল, "আমি তো বাসি নি।"

"তবু আপনি আমার ঘরে মাঝরাতে আসেন!"

মীরা এবার আর চমকে উঠল না; অবাকও হল না। বুকের মধ্যে চাপা শ্বাস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কষ্ট হল। সামান্য সময় যেন সেই কষ্টটা সামলাবার জন্যে মুখ নীচু করে থাকল। মীরা বুঝতে পারল না—কেন সে সুরপতির ঘরে গিয়েছিল কাল? আগের দিন শেষ রাতে ঘুম ভেঙে উঠে আসা এক কথা। তার ফিরে যাবার সময় সুরপতির ঘরের দরজা খোলা দেখে তার কৌতূহল ও দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু কাল মাঝরাতে কেন গিয়েছিল মীরা? কেন চোরের মতন সুরপতির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল? কেন এক দুর্বোধ্য বেদনায় সে গুমরে কেঁদে উঠেছিল পাছে সুরপতির ঘুম ভেঙে যায়—পালিয়ে এসে বারান্দায় বসে কেঁদেছে! কেন এমন হল? মীরা কী খুঁজতে, কাকে দেখতে এত সন্তর্পণে সুরপতির ঘরে ঢুকেছিল?

স্তব্ধ, নিঃসাড় ঘরে মীরা মুখ নীচু করে বসে থাকল। সুরপতিও নীরব।

খুবই আচমকা এই স্তব্ধতা ভেঙে কলিং বেল বেজে উঠল। মীরা চমকে উঠেছিল। বেল বাজছে তো বাজছেই। বিশ্রী, কর্কশ, বীভৎসভাবে বেলটা বাজতে লাগল।

মীরা উঠল। বিরক্ত হয়েছে ভীষণ।

প্রমথ ফিরেছে।

সুরপতি ঘরে বসেই বুঝতে পারল প্রমথ ফিরে এল। দরজা বন্ধর শব্দ, কি যেন বলল প্রমথ, শোনা গেল না। প্রমথ বসার ঘর থেকে প্যাসেজে এসেই সুরপতির ঘরের দিকে আসছে; পায়ের শব্দ পেল সুরপতি।

প্রমথ ঘরে এল। মাথার চুল উসকো-খুসকো, জলেঝড়ে উদভ্রান্ত যত না তার বেশী তাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। অনেকটা মদ খেয়েছে। চোখ লাল। পাতাগুলো ফুলে উঠেছে। মুখ টসটস করছিল। পায়ে জোর নেই, টলছে। হেঁচকি তুলছিল।

প্রমথ ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দু পা এসে দাঁড়াল। সুরপতিকে দেখতে লাগল।

সুরপতি প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, কিসের যেন প্রচণ্ড আক্রোশ; ঘৃণা, তিক্ততা নিয়ে প্রমথ দাঁড়িয়ে আছে।

প্রমথ একবার বিছানার দিকে তাকাল। মীরার গায়ের চাদর পড়ে আছে।

সুরপতি বলল, "তোর এত দেরী হল?"

প্রমথ কথা বলল না। মাথা নাড়তে লাগল।

কাচের গ্লাসে ভরতি করে জল এনে মীরা

প্রমথ মুখ ফিরিয়ে দেখল মীরাকে। জল নিল।

মদের গন্ধ বৃদ্ধি সহ্য হচ্ছিল না মীরার, প্রমথর পাশ থেকে সরে দু পা এগিয়ে এল।

হে'চকি তুলল প্রমথ। জল খেল সামান্য। তারপর সুরপতির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "তুই শালা আমার বউকে—" বলতে না বলতে, জড়ানো কথার মধ্যেই প্রমথ হাত তুলল। টলে যাচ্ছিল প্রমথ। ক্ষিপ্ত, হিংস্রভাবে হাত তুলে একেবারেই আচমকা হাতের গ্লাস ছ'ড়ে মারল সুরপতিকে।

সুরপতি চোখমুখ বাঁচাবার জন্যে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। গ্লাসটা তার মাথায় এসে লাগল। আওয়াজ হল ঠক্ করে, জোরে। কাচের টুকরো আর জল ছড়িয়ে পড়ল সুরপতির চারপাশে।

মীরা শুধু সুরপতির অস্ফুট যন্ত্রণার স্বর শুনতে পেল। এত আচমকা, অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল যে সে একেবারেই বিমূঢ়, নির্বাক।

প্রমথ খেপার মতন মাতাল গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "শালা স্কাউন্ড্রেল, বদমাশ, শুয়ারের বাচ্চা। তোকে বন্ধু বলে ঘরে এনেছিলাম। তুইও শালা ওই হারামজাদা মাগীটার সঙ্গে...ছি ছি ছি...আমার মুখ দেখাবার কিছু থাকল না, ছি ছি।"

প্রমথ কিছু গ্রাহ্য করল না, চেঁচাতে চেঁচাতে টলতে টলতে বাইরে চলে গেল।

সুরপতি মাথা থেকে হাত নামাল। হাতময় রক্ত।

মীরা নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়েছিল। দ্রুত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল। সুরপতির হাতে রক্ত। কানের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

বিহ্বল, ভীত হয়ে মীরা তাড়াতাড়ি সুরপতির মাথা ধরে ফেলল। যন্ত্রণায় কেমন নীল হয়ে গেছে সুরপতির মুখ। চোখ বন্ধ করে আছে। তার কোলের ওপর, চেয়ারে, পায়ের কাছে ভাঙা কাচের টুকরো।

মীরা শিউরে উঠল। প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "ইস—স, মাথাটা গেছে।" বলতে বলতে দিশেহারা হয়ে বাইরে ছুটে গেল।

সুরপতি হাতটা আবার মাথায় তুলল। নামাল। দেখল তার কপাল বেয়ে গড়িয়ে রক্ত পড়ছে, গালে নেমে এল। কানের পাশ দিয়ে গড়ানো রক্ত ঘাড়ের দিকে নামছে।

ততক্ষণে মীরা আবার এসে গেছে। জল আর কাপড়ের টুকরো নিয়ে, তুলো নিয়ে।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান—আমি দেখছি—" মীরা সুরপতির মাথার চুল সরিয়ে, সরিয়ে আঘাতটা খ'ুজছিল। রক্তে চুল জড়িয়ে গেছে, জলে ভেজা মাথা।

বড় বেশী রক্ত পড়ছিল। মীরা সুরপতিকে বলল, "একটু উঠুন, নীচে নেমে বসুন।"

সুরপতির কোল থেকে কাচের টুকরো ফেলে দিল মীরা। হাত ধরে উঠিয়ে মাটিতে বসাল।

সুরপতি চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। যন্ত্রণা যেন স্নায়ু থেকে আরও কোনো গভীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

মীরা মাথা ধুইয়ে দিচ্ছিল, রক্ত পরিষ্কার করছিল। সুরপতির কপাল, কান, গলা, হাত পরিষ্কার করে দিতে দিতে মীরা থরথর করে কাঁপছিল, কাঁদছিল। হঠাৎ মীরার মনে পড়ল, মাত্র পরশু সে স্বপ্ন দেখেছে, সুরপতির মাথায় সে আবির মাখিয়ে দিয়েছিল, অথচ আবিরের লাল নয়—মাথা চু'ইয়ে, কান, কপাল গড়িয়ে শুধু রক্তই পড়ছিল। সুরপতির মুখ, গলা বেয়ে রক্ত পড়তে পড়তে জামা ভিজে গেল। মীরা এত রক্ত দেখে নি। সে দিশেহারা হয়ে ভয় পেয়ে সুরপতিকে কুয়োতলায় নিয়ে যেতে চাইছিল। জল ঢেলে পরিষ্কার করে দেবে।

স্বপ্নটা সেখানেই ভেঙে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল মীরা। কে জানত সেই স্বপ্ন মাত্র দুদিন পরেই এমন করে সত্য হয়ে দেখা দেবে। মীরা স্বপ্নে যত ব্যাকুল, বিভ্রান্ত হয়েছিল—এখন তার চেয়ে বেশী বিমূঢ় ও কাতর বোধ করছে। মীরা জানে না, কোন গভীরতম দুঃখ ও হাহাকার বুকে নিয়ে আজ সে এত যত্ন করে, নিজেরই দেওয়া কোনো আঘাতের মতন সুরপতির এই আঘাতকে শুশ্রূষা করছে।

সুরপতি দুর্বল গলায় বলল, "ছেড়ে দিন। আমি বরং কোনো ডাক্তারখানায় যাই।"

"না। এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি।"

"হয়ে যাবে।" বলে যন্ত্রণা চাপার শব্দ করল সুরপতি মুখে। বলল, "আমার এমনই কপাল—একই জায়গায় বার বার লাগছে।" সুরপতির মনে হচ্ছিল— সেই প্রথম যৌবনে ঠিক ওই জায়গায় নীলেন্দু তাকে মেরেছিল: পরিণত যৌবনে শ্যামাও রেগে গিয়ে কাচের গ্লাস ছ'ড়ে তাকে ওই জায়গাটাতেই আঘাত করেছিল। আর আজ প্রমথ মারল। প্রতিবার একই জায়গায় কেন এই আঘাত? কেন এই রক্তপাত?

মীরা এক হাতে কাটা জায়গায় একরাশ তুলো প্রাণপণ শক্তিতে চেপে রেখেছিল। কাঁপছিল মীরা। অন্য হাতে সুরপতির ভেজা মুখ আঁচল দিয়ে মুছে দিচ্ছিল। শাড়ি লালচে হয়ে যাচ্ছিল।

অদ্ভুত এক কান্না—যা জড়ানো, গভীর, গুমরে গুমরে ওঠা—সেই কান্না কাঁদতে কাঁদতে মীরা বলল, "স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। তবু হল! সেদিন আমি এই স্বপ্নই দেখেছিলাম...।"

সুরপতি চোখের পাতা খুলে, মীরাকে দেখবার চেষ্টা করল। বলল, "হয় না। তবু যদি হয়—এই আশা...। আপনি দুঃখ পাবেন না। অনুশোচনার কোনো কারণ আপনার নেই।"

মীরা সুরপতির মুখ মুছিয়ে দিল। চোখের জলে তার দৃষ্টি বর্ষার নদীর মতন ঝাপসা। গলা বুজে যাচ্ছিল মীরার। তবু বলল, "সেদিন পারি নি। আজও পারলাম না।"

সুরপতি কোনো কথা বলল না। বুকের কোন গোপনে সেই ব্যথা দেখা দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাইরের বাতাস টেনে নেবার জন্যে মুখ হাঁ করল সুরপতি। মীরার ঘ্রাণ তার নাকে লাগছিল।

সমাপ্ত

আঃ...কি
মনমাতানো
তাজা স্বাদ!
NOGA
ORANGE SQUASH

এক নজরে

দুটি কৃত্রিম হৃদপিন্ড। বাঁ পাশেরটি তৈরি করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। ডান পাশেরটা সোভিয়েত বিজ্ঞানী। এ ব্যাপারে দু দেশের বিজ্ঞানীরা এখন মিলে মিশে কাজ করছেন। অবশ্য এ সব নিয়ে এখনও পরীক্ষা চলছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এ ধরনের হৃদপিন্ড রক্ত জমাট বাঁধাকে রোধ করবে, শরীরের চাহিদা অনুযায়ী রক্ত সংবহনে সাহায্য করবে। আরও একটা লাভ, একজনের হৃদপিন্ড আর একজনের শরীরে প্রতিস্থাপন করলে 'রিজেকশনের (পরিত্যক্ত) সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা হয়ত থাকবে না।

খুনীর সংখ্যা বাড়ছে

ইংলন্ডের অফিস অফ্ হেলথ ইকনমিকস-এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পনের বছরে ইংলন্ড এবং ওয়েলস-এ নরহত্যা, শিশুহত্যা এবং নানা রকম অস্ত্রের দ্বারা জখমের হার বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ওই সব খুনজখমের ঘটনা এবং সূত্রাবলী বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, বিশেষ করে যারা তরুণ, বয়েস যাদের কুড়ির কাছাকাছি, তাদের মধ্যেই এই অপরাধ বৃদ্ধির হারটা যেন বেশি। প্রতি দশ লক্ষে পনের জন। এ সব খুনের পিছনে ঠান্ডামাথার ভূমিকা নেই বললেই চলে। কোন তাৎক্ষণিক ঘটনায় হিংস্র প্রবৃত্তির বিস্ফোরণই এ-সব খুনের কারণ। এ-ছাড়া আর এক ধরনের খুন যেন দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। শিশু খুন। এবং ঝক্কিটা এক বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশি। রেজিস্ট্রার জেনারেলের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫০-এর দশকে প্রতি সাতটি খুনের ঘটনায় মধ্যে একটি ঘটনা ঘটত ছুরি মারামারির ফলে। ১৯৭০-এর দশকে ছুরি মারামারির ফলে হত্যার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি তিনটি খুনের মধ্যে একটি। ১৯৫০-এর দশকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনা ১৯৭০-এর দশকের তুলনায় বেশি ঘটত। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১৯৫০ সালে প্রতি সাতটি খুনের মধ্যে যেখানে একটি খুন হত বিষ প্রয়োগে, সেখানে ১৯৭০-এর দশকে বিষ প্রয়োগে হত্যার হার এসে দাঁড়িয়েছে প্রতি পঞ্চাশজনে (খুন) একজন। পিস্তল, বন্দুক এবং বিস্ফোরকের সাহায্যে হত্যার হার আগেও যা ছিল এখনও প্রায় তেমনিই রয়েছে। দশটি খুনের মধ্যে একটি। ১৯৭০-৭৪ এ ইংলন্ড এবং ওয়েলসে প্রতি ছয়টি খুনের মধ্যে একটি ঘটেছে মস্তাধিক্তির দরুন।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুনের বহর যে হারে বেড়েছে তার তুলনায় ইংলন্ড এবং ওয়েলসের ঘটনা যেন বালখিল্যের মত। গড়ে দশগুণ বেশি।

যেমন, ১৯৭৩ সালে ইংলন্ড এবং ওয়েলসে যেখানে খুন হয়েছিল গড়ে প্রতি দশ লক্ষে দশজন, সেখানে মার্কিন দেশে এই হিসেবটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি দশ লক্ষে ১০৫ জন। সেখানকার কয়েকটি বড় শহর যেমন ডেট্রয়েট বা সেন্ট লুইতে ইংলন্ড এবং ওয়েলসের তুলনায় এই হার ৫০ গুণ বেশি। ইংলন্ড এবং ওয়েলসে স্ত্রী-হত্যার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

অপরাধবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, গত পনের বছরে খুনীর সংখ্যা বেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সব চেয়ে বেশি। অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির মূল কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন বড় বড় শহর। উন্নয়নশীল-দেশগুলিতে এ ধরনের উপদ্রপ তুলনায় অনেক কম হলেও আগের চেয়ে বেশ কিছু বেড়েছে। এখানেও সেই একই কথা। খুন বাড়ছে বড় বড় শহর বা শহরতলীতে। এদের মধ্যে কলকাতা, দিল্লি এবং বোম্বাই-এর মত শহরও পড়ে।

অপরাধবিজ্ঞানীদের মন্তব্য, কজন খুন হল, তার সমীক্ষা করতে গেলে পুলিশের ডায়ারির ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয় সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তার বাইরেও অনেক ঘটনা ঘটে—সন্তর্পণে—যে সব ঘটনা পুলিশ কোনদিনই হদিশ করতে পারে না। কখনও বা খুনী এমনভাবে কাজ হাসিল করে অনিবার্য খুন সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা ধরতেই পারেন না যে এটা খুন। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাল রেখেই এ ধরনের খুন যেন বাড়ছে। গত কয়েক দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ, নানা রকম বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম। ঠান্ডা মাথার খুনীরা এদের সাহায্য নিয়ে এমন নিখুঁত-ভাবে খুন করে যে, যে খুন হচ্ছে সে নিজেও বুঝতে পারে না যে সে খুন হচ্ছে। চিকিৎসকদের চোখেও তার মৃত্যু অনেক সময় স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বিশেষজ্ঞরাও তার সূক্ষ্ম সূত্র বুঝে উঠতে পারেন না। পুলিশের ডায়ারির পাতায় এ সব ঘটনার কথা লেখা সম্ভব হলে খুনের সংখ্যা যে কত সঠিক জানা যেত।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এক বছরের কাছাকাছি বয়েসের শিশুদের জীবন সংশয়ের সম্ভাবনাটাই বেশি।

প্রশ্ন এই, ভ্রূণ হত্যার একটি সামাজিক কারণ না হয় বোঝা যায়, কিন্তু শিশু হত্যার পিছনে কি ধরনের প্রবণতা কাজ করে?

এর সংক্ষিপ্ত উত্তর : এক, স্বামী হয়ত স্ত্রী পরিত্যক্ত। স্ত্রী স্বামী পরিত্যক্তা। ওদের মধ্যে আবার বিয়ে হল। স্বামীর আগের স্ত্রীর থেকে পাওয়া একটি ছেলে

ছিল। অথবা স্ত্রীর আগের স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া একটি শিশু। বিয়ের পর এই শিশুকে নিয়েই হয়ত বাঁধল গোলমাল। স্ত্রী তার নিজের গর্ভজাত সন্তানকে ভালবাসতে পারল না শেষ পর্যন্ত। অথবা স্বামী স্ত্রীর আগের স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া ছেলেটিকে। দ্রুত চলমান জীবনের মধ্যে পরপর দুদণ্ড বসে মানবিক প্রস্তুতির মাধ্যমে এমন পরিস্থিতির সমাধান করার সময় নেই কারোর। ফলে ধিক ধিক আগুন। অবশেষে চরম পরিস্থিতির মধ্যে শিশুহত্যাকেই তারা সমাধানের পথ হিসেবে বেছে নিল। দুই, দারিদ্র্য। দিনের পর দিন বুভুক্ষু শিশুর কান্না সহ্য করতে না পেরে শিশু হত্যা। তিন, সন্দেহ। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন পরস্পরের প্রতি তারা শ্রদ্ধা হারায়, বিশ্বাস হারায়। ওই সময় কোন সন্তান জন্মালে স্বামী অনেক সময় স্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতিনী মনে করেন। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। যার পরিণতি শিশুহত্যা।

তরুণ ছেলেমেয়েদের অপরাধী করে তোলার মূলে মুখ্যত কাজ করে পারিবারিক পরিস্থিতি। অন্তত মধ্যবিত্ত এবং সঙ্গতি-সম্পন্নদের মধ্যে তো বটেই। এই সব পরিবারের বাবা মা-রা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট স্থিতিশীল, কিন্তু বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। বাবা মোটামুটি ভাল চাকরি করেন। তিনি চান আরও বড় চাকরি, আরও টাকা, গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন—জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তাঁর কাছে এই সব স্থূল বস্তু! মার কাছে ওই সব স্থূল সম্পদের মূল্য ছেলে মেয়ের চেয়েও বেশি। বেশিরভাগ সময় তিনি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, নিজেকে দেখান এবং দেখান তাঁর সম্পদ (অবশ্য আসলে বেচারা স্বামীর) আশপাশের পাঁচজন এবং আত্মীয়দের। এ সব করতেই তাঁর সময় কেটে যায়। এঁদের কোন জীবনদর্শন নেই। যে ধরনের ব্যক্তিত্ব মানুষকে মানবিক করে তোলে, এঁদের মধ্যে তার একান্ত অভাব। নিজের ছেলে মেয়েদেরও এঁরা ফার্নিচারের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করেন না। প্রতিবেশীর ওপর টেক্কা মেরে কে কার ছেলেমেয়ের জন্যে কত খরচ করতে পারেন সেটা দেখান। এই ইত্যাদি।

ফলে এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ছেলেমেয়েরা যখন বড় হতে থাকে, ক্রমে স্থূল মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। যা ক্রমে তাদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্বহীনতা গড়ে তোলে। এবং অবশেষে দুর্ভাগ্যবশত যখন অনাকাঙ্ক্ষিত কোন পরিস্থিতি বা পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে—কখনও কখনও অপরাধী হয়ে ওঠে।

ছোট বয়েস থেকেই ছেলেমেয়েরা চায় —ঘরে—যিনি তাঁদের নায়ক হতে পারেন। আদর্শে ভালবাসায়, মানবিকতায়। বাবা মার কাছ থেকে সেটা যখন তারা পায় না, তাদের মন তখন বহির্মুখী হয়। তখন সে পাড়ার কোন দাদাকে (যিনি হয়ত জাত অপরাধী) গ্রহণ করে নায়ক হিসেবে। অতঃপর অপরাধ জীবনের শুরু।

অনেক সময় স্ত্রী-পুরুষ বিয়ে করে তাদের গ্ল্যামার দেখে। চেহারা অথবা অর্থকৌলিন্যের গ্ল্যামার। পশ্চিমে তো এ ব্যাপারটা অনেকদিন ধরেই আছে। এদেশেও কিছু কিছু পরিবারের মধ্যে এটা এসেছে। মুশকিল এই, শেষ পর্যন্ত গ্ল্যামারের সঙ্গে শুরু হয় মানসিক সংঘাত, অনেক সময় মানসিক সহঅবস্থান এর ফলে ভেঙে যায়। কোন কোন স্ত্রী-হত্যার পিছনে এ ধরনের মোটিভও কাজ করে।

গুরুদের পাল্লায় পড়ে তরুণ ছেলে-মেয়েরা মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। এই সব মাদক দ্রব্যের অনেকই আবার শরীরে জৈবিক কার্য-কলাপের ওপর প্রতিক্রিয়া করে। তাদের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার ক্ষতি হয়। কেউ কেউ সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে যায়। কখনও বা মানসিক রোগী।

সংবাদে দেখা যাচ্ছে, নিউইয়র্ক, ডেট্রয়েট, লস অ্যাঞ্জেলেস প্রভৃতি শহরে পনের থেকে পঁচিশ বছরের অনেক ছেলে-মেয়ে খুন করে সত্যিকারের যে কোন 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য নিয়ে তাও নয়। ধরা পড়ার পর দেখা গেছে, বেশির ভাগই তারা মাদকের আবেশে নিমজ্জিত। হাতের কাছে পড়ে থাকা ঢিলকে উদ্দেশ্যহীনভাবে, অনেক সময় মনের অগোচরে—ছুঁড়ে দেবার মত ওই অবস্থায় তারা খুন করে

হত্যা কেন করে, তারা অনেক সময় নিজেরাও বুঝতে পারে না। তরুণদের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক কৌতূহলও কাজ করে যথেষ্ট।

তবে একটা কথা ঠিক, মন্তব্য করেছেন একজন মনোবিজ্ঞানী, অর্জিত অপরাধ প্রবণতার পিছনে কাজ করে মুখ্যত তিনটি কারণ: এক, দারিদ্র্য: দুই, স্নেহ-ভালবাসার অভাব এবং তিন, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ব্যাপারে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ব্যর্থতা।

প্রশ্ন এই, এই সব খুনের পিছনে কতটা সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করে এবং কতটা অর্জিত প্রবৃত্তি।

শেষোক্ত প্রবৃত্তিটি সম্পর্কে একটু পরিষ্কার হয়ে নেয়া দরকার।

মনস্তাত্ত্বিকদের মত, অর্জিত প্রবৃত্তি বলতে কিছু নেই। মানুষের যা কিছু প্রবৃত্তি বা প্রবণতা তার সবই সে অর্জন করে জন্মসূত্রে। এ ক্ষেত্রে বাহক হল জীবকোষের কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের মধ্যেকার সুতোর মত আণুবীক্ষণিক সেই সব বস্তু, যার নাম ক্রোমজোম। আর দাতা হয় বাবা, না হয় মা, অথবা উভয়েই। বাইরের পরিবেশ উদ্দীপ্ত করলেই তবে অপরাধীর ক্রোমজোমের মধ্যে সংরক্ষিত সেই অপরাধ প্রবণতা বা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। এখন সে সুযোগ সন্ধান করে। অবশেষে অপরাধ। বলা বাহুল্য, এ যুক্তি মেনে নিলে বলতেই হয়, অপরাধ সব মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। শুধু দরকার, অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্যে যে ধরনের পটভূমি তাই।

হয়ত এ কথা ঠিক। তবু, এটাও হয়ত মিথ্যে নয়, একই পরিবেশে, একই অবস্থার মধ্যে পড়ে কেউ অপরাধ করে, কেউ করে না, এমনই বা ঘটে কেন? ঘুষের কাছাকাছি থেকেও অনেকে ঘুষ নেয় না, হিংস্র হওয়ার মত পরিস্থিতি ঘটলেও কেউ কেউ হিংস্র হতে পারে না, যে অবস্থার মধ্যে পড়ে একজন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে খুন করে বসে, আর একজন যথেষ্ট দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতা থাকতেও খুনের জন্যে হাত তোলে না—এমন ঘটনাও তো দেখা যায়? এদের ক্ষেত্রে এমন এক বিপরীতমুখী প্রবণতা কাজ করে, সে প্রবণতাও হয়ত জন্মগত, অথবা অর্জিত, যা কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ধূমায়িত অপরাধ প্রবণতাকে অবদমিত করে। যার ফলে হিংস্র হয়ে ওঠার মত ঘটনা ঘটলেও, সে হিংস্র হতে পারে না, খুনী হতে পারে না, অন্যায়ের আশ্রয় নিতে অপরাগ হয়। বিপরীতমুখী ওই প্রবণতা দুর্বল হলে তবেই অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষ তখনই অপরাধ করে।

এ-সব কথা ভেবেই অপরাধ প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে তিন রকম মানুষের কথা হয়ত ভাবা যায়। এক, যে সব পরিবেশ এবং পরিস্থিতির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সক্রিয় হয়, অথচ তাদের মধ্যে থেকেও মানসিক ভারসাম্য হারায় না, নিয়ম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আচরণ করে, এমন ধরনের মানুষ। দুই, এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তারা যারা জন্মসূত্রেই প্রচণ্ড অপরাধ প্রবণতা নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। বারুদের স্তূপে যৎসামান্য স্ফুলিঙ্গ যেমন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটায়, ঠিক তেমনি সামান্যতম ঘটনাতেই মুহূর্তে এরা কম বয়েস থেকেই মানসিক ভারসাম্য হারায়, ন্যূনতম বিবেচনা, বিচারবুদ্ধি ক্ষমতা এবং ধৈর্য এদের মধ্যে লোপ পায়। এদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ থাকে কম, যথাযথ চেষ্টার ফলেও তা গড়ে তোলা শক্ত হয়। এদের আচরণ এবং অপরাধ করার পদ্ধতি কখনও হিংস্র। কখনও এমন শান্ত যে, পাঁচজনের চোখে ধরা পড়া শক্ত। এরা মনে করে, অপরাধ করার জন্যেই এরা জন্মেছে। তার বাইরে সুস্থ জীবনের কথা ভাবার মত ক্ষমতা এদের কম। তিন, সমাজবিজ্ঞানীদের চোখে শেষোক্ত এই শ্রেণীর মানুষ ঠিক অপরাধী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এদের জীবন-ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, এরা কেউ আদর্শ পরিবারের সন্তান, যে সব পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলে, তার মধ্যে জন্মেও জীবনের বেশ কিছু সময় যথেষ্ট ধৈর্য, যথেষ্ট বিবেচনা এবং মানবিক মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়ে তারা জীবন কাটায়। অবশেষে নানা রকম পরিবেশের মধ্যে পড়ে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়ে যায় পরাজিত সম্রাট, এর পর প্রথম পর্যায়ে চলে আত্মহনন। অতঃপর মানসিক ভারসাম্য লোপ। কখনও পর্যায়ক্রমিক, কখনও একটানা। এমন অবস্থার মধ্যে পড়েই এ-সব মানুষ অবশেষে অপরাধী হয়ে ওঠে। অসামাজিক আচরণ করে। খুন করে। যৌন অপরাধ, শিশু হত্যা, সম্পত্তির ক্ষতি—এ-সবের মাধ্যমে নিজের প্রবণতাকে চরিতার্থ করতে এগিয়ে যায়। এরা জন্মসূত্রে হয়ত অপরাধী নয়। পরিবেশ এবং পরিস্থিতি এদের অপরাধী করে তোলে। এক কথায় প্রবৃত্তিকে এরা অর্জন করে। বলতে বাধা নেই, এ ধরনের অপরাধীর সংখ্যাই এখন দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে বড় বড় শহরে এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। এবং যে হারে বাড়ছে, তাতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সমাজ-বিজ্ঞানীরাই এখন আতঙ্কিত।

*

আতঙ্কিত আমরাও।

জানি না, আমাদের সমাজ-বিজ্ঞানীরা এ সমস্যাটি নিয়ে হাতে কলমে কতটা কি করছেন। করলেও, যতটুকু জানি সে সব

কাজ খুবই বিক্ষিপ্ত এবং সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যেই এখনও সীমাবদ্ধ। অথচ অনেকেই স্বীকার করবেন, যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় থাকে দুটি দিক। মানুষ এবং বিষয় আশয়। এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক মান। কি ভাবে বিষয় আশয় তৈরি হবে, তাদের ব্যবহার, বিকেন্দ্রীকরণ—সেটা নির্ভর করে মানুষের ওপর। এ-কথা ভেবেই হয়ত বলা চলে, আমাদের সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার ওপর ব্যাপক এবং যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে কাজ করা দরকার। দরকার এ ব্যাপারে ব্যাপক পরিকল্পনার। শৌখিন গবেষক দিয়ে গুটিকয় মানুষের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে শুধু গবেষণাপত্র ছাপিয়ে এ কাজ হবে না। দরকার একটি বাহিনী সৃষ্টি করা। যে বাহিনীর কাজ হবে বড় বড় শহর শুধু নয়, ছোট ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র গিয়ে অনুসন্ধান চালান। আর এর ফলেই যে সব সমস্যা চোখে পড়বে তার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা নিয়ে সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হয়ত অসুবিধা হবে না।

সমরজিৎ কর

ঘরের বাইরে

ভীড়ু

তামিল ভাষায় ভীড়ুর অনেক মানে আছে। তার মধ্যে একটি গৃহ বা বাসা। গত ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর, শ্রীমতী চম্পালক্ষ্মী ভেঙ্কটাচলম উদ্বোধন করলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভীড়ুর। চম্পা তামিলনাড়ু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অক্লান্ত কর্মী সমাজসেবী। মেয়েদের মঙ্গলের ব্যাপারে তো উনি সর্বদা সব কিছু করতে প্রস্তুত।

নতুন ভীড়ু হচ্ছে একটি সুন্দর ছোট্ট বাড়ি। ওয়াই ডবলিউ সি এ-র, এলাকার মধ্যে বাগান ঘেরা কুটির। তারই গৃহপ্রবেশ হলো। পাঁচটি মানসিক রোগ যাঁদের হয়েছিল, এখন নিরাময় হয়েছে, তাঁরা এসেছেন এ বাড়িতে থাকতে। কি আনন্দ, কি সুখ! আনন্দ তাঁদের মাত্র নয়, আনন্দ সমস্ত পরিবেশকে প্রফুল্ল করেছে। পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি মানুষ খুশি। মানসিক রোগের হাসপাতালের কর্তারা আর যারা সমাজসেবী মনস্তাত্ত্বিক তারাও যোগ দিয়েছেন গৃহপ্রবেশের উৎসবে। হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাওয়া পাঁচটি মেয়ে যেন এ সৌভাগ্য চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা সন্ত্রস্ত, তারা বিস্মিত। এ গৃহে তাঁদের সঙ্গে এসেছেন একজন ঘরের মা আর একজন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজসেবিকা।

মাদ্রাজ ওয়াই ডবলিউ সি-এর নবজীবন কমিটির পরিকল্পনা এটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মানসিক রোগের সম্পূর্ণ নিরাময়ে বড় একটা কারও আস্থা ছিল না। লোকে নাক সিঁটকে বলতো 'পাগল'। চিকিৎসার বদলে বদ্ধ পাগলকে জেলে পুরে দেওয়া হত। বিদেশে এখন চিকিৎসার ধারা বদলেছে। আমাদের দেশেও মানসিক চিকিৎসার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু নিরাময়ের পর পরিবার অনেককেই ফেরত নিতে নারাজ। বহুক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে নারাজ, বহুক্ষেত্রে রীতিমত ভয়ে পিছিয়ে যায়। একটি মেয়ের কথা শুনেছিলাম। সে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলো। স্বামী, সন্তান ভরা সুখের সংসার। কিন্তু কেউ তাকে আর পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। ভরসা পায় না। প্রতিবেশীরাও আতঙ্কে অস্থির। সে ফল কাটবার জন্য ছুরি হাতে নিলে লোকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যায়। শেষে মেয়েটি আবার অসুস্থ হয়ে সেই হাসপাতালেই ফিরে যায়। নবজীবন পরিকল্পনা হয়েছে এদের নবজীবন দানের জন্য। সুস্থ হলে যক্ষ্মারোগীর আশ্রয় হয়, বিকলাঙ্গের হয় কিন্তু এরা যে একেবারে সমাজের বাইরে, পতিত।

এই জিনিসটিই দেখেছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবিকারা। গত আঠারো মাস ধরে মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে যাওয়া-আসা করতেন। রোগিনীদের সঙ্গে ঘরে বসে খেলা করতেন, কখনও বা বেড়াতে নিয়ে যেতেন। আত্মীয়স্বজনকে চিঠি লিখে দিতেন। দু'একজনকে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাকী? কেউ যে ঘরে ফিরে নিতে চায় না। কাজেই ওদের জন্য ঘর চাই, যত্ন চাই, স্নেহ চাই। তখন তাঁরা ঘরের পরিকল্পনা করলেন। ভারতে এ রকম আশ্রয় এই প্রথম ও মাদ্রাজ ওয়াই ডবলিউ সি-এর নবজীবন কমিটি তাই জন্য ধন্যবাদার্হ।

গৃহের অধিবাসিনীরা আস্তে আস্তে বসবাসের ব্যবস্থায় নতুন জীবনের স্বাদ পাচ্ছেন। মানসিক রোগের হাসপাতাল সংলগ্ন থেরাপী সেন্টারে কাজ শিখতে বাসে করে যাচ্ছেন। পুতুল তৈরি, কাগজের ঠোঙা বানানো, সাবান বানানো ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা আছে। নিরাময়ের পর স্বনির্ভর হওয়া ভিন্ন এ শিক্ষায় মানসিক শান্তি আসে না। অশান্ত মন একাগ্রচিত্তে কাজ করবার সুযোগ পায়। ডাঃ পিটার ফার্নান্ডেজ এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর। তিনিও নবজীবন পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন মানসিক রোগীর সেবায়।

নবজীবনবাসিনীরা বহুদিন পর গৃহবাসের সুখ অনুভব করছেন। তাই গৃহের সমস্ত কাজ খুশি মনে করেন। সেলাই, রান্না, কাপড়কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, ঝাড়া পোঁছা সব তাঁরা নিজে হাতে করেন।

নবজীবন কমিটি আশা করেন, শীঘ্রই নবজীবন গৃহের প্রশস্ত আয়োজন হবে আর অন্তত পঞ্চাশজন অধিবাসিনী সেখানে আশ্রয় পাবেন। প্রথম প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থের।

নবজীবনের উদ্দেশ্য সমাজের সঙ্গে এই হতভাগ্য মানুষদের যোগ স্থাপনা করা। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারা যেন পরস্পর নির্ভরশীল জনসমুদ্রে একজন হতে পারে। সমাজও যেন বুঝতে পারে তারা মানসিক গরমিলে কষ্ট পেয়েছে। তা যে কোন দিন যে কোন লোকের হতে পারে। সুস্থ মন আর অসুস্থ মনের মাঝের পর্দা বড় পাতলা। সেটুকু সরে যেতে সময় বেশী লাগে না। মানসিক ব্যাধি অন্য দশটা দেহের ব্যাধির মত। তাতে কলঙ্কের কিছু নেই। কে কোন অবস্থায় পড়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আমরা জানি না। এই তো দেখুন সীমা। তার বাবা মারা যান যখন সে শিশু। বাঙ্গালোরে এক অনাথালয় থেকে তাকে পোষ্য নিলেন সন্তানহীন এক দম্পতি। শিশু বড় হলো। তার পালক পিতা ছিলেন যৌনবিকার-গ্রস্ত। সীমার সীমাহীন দুঃখের মধ্য দিয়ে কামলালসা চরিতার্থ করে তিনি সীমাতে সংক্রমিত করলেন যৌনব্যাধি। পাড়াপড়শীর সাহায্যে সে মাদ্রাজের হাসপাতালে ভর্তি হলো। কিন্তু দারুণ ব্যাধি তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটালো। ১৯৬৮ সালে সে মানসিক রোগের হাসপাতালে ভর্তি হলো। আজ তার ৩৭ বৎসর বয়স। পড়াশুনো কিছু করেছে। নবজীবনের নতুন আলোতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে নতুন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এ দুঃখ আপনার বা আমার মেয়েরও তো হতে পারতো।

সুমিত্রা ছিল কলকাতায়। হয়তো যাওয়া-আসার পথে কোনদিন তাকে দেখেও বা থাকবেন। সুমিত্রার বিয়ে হয়েছিল। আড়াই বছর বাদে একটি শিশু কন্যার জন্মের পরে তার মস্তিষ্কবিকার দেখা দেয়। তার মায়েরও নাকি এই হতো। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রোগ। কিন্তু সুমিত্রার স্বামী তাকে ত্যাগ করলেন। ঘুরতে ঘুরতে সে দক্ষিণ ভারতের ছোট শহরের রাস্তায় পৌঁছলো। পথের পাগলি। পুলিশ পাঠিয়ে দিল মাদ্রাজের হাসপাতালে। একটু ভাল হলে তাকে বালিকাসদনে দেওয়া হলো। কিছু কাজকর্ম লেখাপড়া শিখলো কিন্তু তার যে যত্ন, যে স্নেহের প্রয়োজন ছিল তা মিললো না। তাই বিকার আবার দেখা দিল। সুমিত্রার হাতের তৈরি ব্যাগ বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু তার হতভাগ্য জীবন এতটুকু ভালবাসার পথ চেয়ে থাকে। কে দেবে তাকে সহানুভূতি, কে করবে তাকে আদর?

আলো আঁধারের আবছা গোধূলিতে এ রকম কত লোক আছে কে বা খবর রাখে। মানসিক রোগীদের একটি হাসপাতালের খবর হচ্ছে—হাজারে ১০ থেকে ৩৯টি মানুষ মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। আসল হিসেব হয়তো আরও বেশী। তাদের চিকিৎসা দরকার। হয় চিকিৎসা হয় না, নয়তো মানসিক রোগের হাসপাতালে তারা সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা পরিবারের কলঙ্ক, অসুবিধায় আপনজন। তাই তাদের মৃত্যু হয় জেল বা হাসপাতালের চৌহদ্দিতে। হাসপাতালে অন্য রোগীর সঙ্গে বাস করে সেরে গেলেও আবার অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উপায় কি?

চিকিৎসা জগতে মনস্তত্ত্বের অংশ আজ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন জাপানী পদ্ধতিতে তো বলা হয় দেহের প্রত্যেক রোগের একটি করে বা একাধিক মানসিক কারণ থাকে। মানসিক বিকারের বেলায় তো কথাই নেই। 'রেড বিয়ার্ড' নামে জাপানী ছবিতে দেখেছিলাম ডাক্তার (রেড বিয়ার্ড) হাসপাতাল খুলেছেন এই মনস্তত্ত্বের মহাসত্য অবলম্বন করে। কোথাও বা স্ত্রীর অন্যায় ব্যবহারে স্বামী যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত কোথাও বা পরিবারের উপেক্ষায় ছেলেমেয়ে অসুস্থ। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছিল। ১৭ বছর তার বয়স। বদ্ধ পাগল। তার মা অল্প বয়সে মারা যান। শিশুকন্যাকে মানুষ করেছিলেন পিতা। ভালবাসার অভাব ছিল না। কিন্তু উপার্জনের জন্য তাকে বাইরে যেতে হতো। মেয়েটি অল্প বড় হয়ে ঘরদোর সামলাতো। একদিন মুদিখানায় কি যেন কিনতে গিয়েছিল সেখানে মুদি এই কুসুমকলির মত অপরূপ রূপসী বালিকাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি অসহায়। পিতাও জানলেন না। ক্রমশঃ তার বিকট মানসিক বিকার দেখা দিল। সে ক্ষিপ্ত হলো, নরঘাতী হলো। তাকে রেড বিয়ার্ডের

হাসপাতালের কোনও এক কুটিরে আলাদা বন্ধ ঘরে রাখা হল। তার রাগ পুরুষজাতির উপর। বিশেষ যে পুরুষ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে তাকে সে হত্যা করে। প্রথম সে প্রশ্রয় দেয়, পরে মাথার চুলে লুকোনো এক ধারালো ছুঁচের মত জিনিস দিয়ে হত্যা করে। ভেবে দেখুন সমাজের অন্যায়ে যার জন্ম, সমাজ তাকে কলঙ্ক বলে দূরে ঠেলে রাখতে চায়!

নবজীবন গৃহের মত আরও শত শত গৃহ আমাদের সারা দেশে দরকার। মানসিক অসুস্থতা চিকিৎসাযোগ্য তো বটেই। চিকিৎসার পর তারা সুস্থ মানুষের মত সমাজের একজন হতে পারলে তবেই সমাজের কলঙ্কভঞ্জন হবে। সমাজের যে কোন পতিতকে কলঙ্ক মনে করা এক বিশেষ কলঙ্কের লক্ষণ।

মনস্তত্ত্বের খবর

মানসিক বিকার এবং স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে, আমরা স্বাভাবিক মানুষ বলে যাদের দেখি তারাও মানসিক অশান্তির কোন না কোন জটে ভুগছেন। বিদেশে জট খুলবার কাজকে মনস্তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ রূপ দিয়েছে। একটি স্বাভাবিক সুন্দরী যুবতী। মনস্তাত্ত্বিক দেখছেন সে সমাজে বেশ আনন্দ করে মেলামেশা করে কিন্তু বিয়েতে ভয় পায়। মনের জট খুলতে গিয়ে ধরা পড়লো তার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। সে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করেছিল কিন্তু ফল হয়নি। সে তার বাবা ও মা দুজনকেই ভালবাসতো। অসহায় শিশুর ভালবাসা উপেক্ষা করে বাবা ও মা দুজনেই ঝগড়াঝাটি করে অশান্তি করতেন। শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি। সেই ক্ষত তার সারা জীবনে শুকোয়নি। সে বিবাহ করতে নারাজ। আবার ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে? থাক। বিয়ে করেই কাজ নেই।

মনস্তাত্ত্বিক বলছেন, সে নিজেই জানত না আসল কারণ। নিজের অগোচরে বিবাহের প্রতি তার একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠেছিল। নিজের অগোচরে বহু লোকের জীবনে বহু কিছু ঘটে। এমনকি চারপাশে পাঁচজন যা বুঝতে পারে তা নিজের বুঝতে দেরি হয়। যা অনুভব করলেন, যা চিন্তা করলেন তা তলিয়ে গেল আর হারিয়ে গেল। একটিমাত্র ঘটনা হারায় না। হারায় অনেক কিছু। চিন্তাগুলো হারিয়ে যায়। তাতে জগৎ আপনি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, যে দৃষ্টিকোণ হয়তো আপনার বহু অজানা প্রভাবে প্রভাবিত। এভাবে বহু লোক জগতে জীবন কাটায় যেন স্বপ্নের আবেশে চলাফেরা করছে, কাজ করছে, ভাবছে, চিন্তা করছে। মনস্তাত্ত্বিকরা কখনও বা তাদের জাগিয়ে তোলেন। সত্যকে বুঝতে সাহায্য করেন। তারা নিজেদের চিনতে সময় নেয়। এমনকি অন্যকে ভুল বোঝাও মানসিক রোগ বিশেষ। ভেবে দেখুন, সারাক্ষণ মনে হচ্ছে সবাই আপনার প্রতি অন্যায় করে যাচ্ছে। সাংঘাতিকভাবে আঘাত পান। হয়তো তার কারণ সত্য নয়। আপনার স্বপ্নে দেখা অবাস্তব অনাবশ্যক ভুল। এভাবে বহু মানুষ মানসিক কষ্ট নিয়ে কাল কাটাচ্ছেন। পাগল বা বদ্ধপাগল হন নি কিন্তু মনটি সুস্থ নয়।

শ্রীমতী

বিদেশী বই

জন গার্ডনার পেশায় ইংরাজীর অধ্যাপক। তাঁর প্রথম দিকের বইগুলি আর পাঁচজন অধ্যাপকের মতোই গবেষণা পুস্তক। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং মোটা এবং ভারী। ১৯৭০ দশকে এসে গার্ডনার লিখতে শুরু করেছেন উপন্যাস এবং এরই মধ্যে মার্কিন সাহিত্যিক মহলে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। আমাদের হাতে যে ছোট উপন্যাসটি এসেছে সেটি অতীব সুখপাঠ্য এবং চমকপ্রদ।

দশম শতকের একটি বীর কাব্য গাথার নাম বিওআলফ্। এটি প্রাচীনতম ইংরাজী সাহিত্যের নিদর্শন। এই গাথাটি বিদ্বান-মহলে উচ্চ প্রশংসিত। গাথার বিষয় একটি রাক্ষস। যে রাক্ষস শক্তিশালী দিনেমার রাজা হ্রগারের রাজত্বে এসে বার বার হানা দেয়। ইচ্ছামতো তুলে নিয়ে যায় হ্রগারের রাজপ্রাসাদের বীরেদের। অবহেলে ভেঙে ফেলে সমস্ত প্রতিরোধ। সে রাক্ষস গ্রেণ্ডেল। পাহাড়ের গুহায় তার বাসা। হাস্যকর তার আচরণ। নৃশংস ভাবে হাস্যকর। শেষ পর্যন্ত গ্রেণ্ডেল মারা যায় বীর বিওআলফের হাতে। তার পরও গ্রেণ্ডেলের মা আসে প্রতিশোধ নিতে। কিন্তু বীরেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়।

এই পুরাতন গল্পটিই নূতন করে শুনিয়েছেন জন গার্ডনার। এবারের কথক গ্রেণ্ডেল নিজেই। বক রাক্ষসের গল্প বলছে বকরাক্ষস। তার নিজের দৃষ্টি কোণ থেকে। গ্রেণ্ডেল কুৎসিত, গ্রেণ্ডেল নোংরা, গ্রেণ্ডেল বীভৎস। গ্রেণ্ডেল ভেবে দেখেছে মানুষ নানা জাল বুনে চলে। সামাজিকতার জাল, শাসন-ব্যবস্থার জাল, ধর্মের জাল। গ্রেণ্ডেল তাই ক্ষিপ্ত তরা মানুষের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্রোধ। তার সংকল্প সে মানুষকে গুঁড়িয়ে দেবে। আর তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য মানুষদের রাজা হ্রগার। গার্ডনার গ্রেণ্ডেলকে একজন খাঁটি নিহিলিস্ট করে গড়ে তুলেছেন। নিজেকে নিহিলিস্ট বলেছে। কিন্তু পুরো নিহিলিস্ট হতে পারেনি বলে দুঃখ করেছে।

গার্ডনার বোধহয় আসলে কবি। তাই তাঁর গদ্য হয়ে উঠেছে কবিতার মতো ব্যঞ্জনাময়। গ্রেণ্ডেলের চোখ দিয়ে যখন আমরা মনুষ্যসমাজ দেখি তখন হঠাৎ বুকের মধ্যে চমক লাগে। গ্রেণ্ডেল বলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি মানুষকে ধ্বংস করা। নেকড়ে কখনো নেকড়েকে মেরে ফেলে না। মানুষ মানুষকে মারে ক্ষুধার জন্য নয় শুধুই মারবার তাগিদে। রাক্ষস বোধ হয়, সত্যি কথাই বলেছে মানুষের গ্রেণ্ডেল যে ভাবে মনুষ্য সমাজ বর্ণনা করেছে, তাতে দেখতে পাই যে সে সব সময়েই আড়াল থেকে আমাদের দেখছে। আমরা জানি না কিন্তু আমাদের এক রাক্ষস সব সময়ে দেখতে পাচ্ছে—এ এক ভয়াবহ অনুভূতি। গার্ডনারের হাতে কিন্তু গ্রেণ্ডেল শুধুমাত্র ভয়ানক আর বীভৎস নয় সে পরম রসিক। মানুষের ধর্ম নিয়ে সে রসিকতা করে। মানুষের তৈয়ারী বিপ্লব নিয়েও সে রসিকতা করে। লুকিয়ে থেকে পুরোহিতকে বলে—আমি রুদ্র তুমি আমাকে পরম পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা কর। প্রধান পুরোহিত

Grendel by John Gardener Ballantine Books, New York, $1.25.

বলে, পরম পুরুষ সবচেয়ে অযৌক্তিক। তারপর আনন্দে অধীর হয়ে বলে রুদ্র আমার ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন। তার সংগীরা তাকে বিদ্রূপ করে। গ্রেণ্ডেল চুপ করে যায়। গ্রেণ্ডেল এক জ্ঞানী ড্রাগনকে খুব ভক্তি করে। এরকম জ্ঞানী দার্শনিক ড্রাগন সহজে পাওয়া যায় না। পাঠক ড্রাগনের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে লাভবান হবেন। মানুষ কতটা বোকা সেটা জলবৎ বুঝে যাবেন। কিম্বা সেই জ্ঞানী কৃষক যে বলে বিপ্লব মানে অসত্যের পরাজয় নয়, কিংবা বৈধ শক্তির জয় নয় আসলে বিপ্লব হলো ক্ষমতার লড়াই। যে জেতে সে স্বাধীন যে হারে সে দাস। মানুষের বীরত্বকে গ্রেণ্ডেল যে ভাবে ব্যঙ্গ করেছে তার বর্ণনা দিতে গেলে রসভঙ্গ হবে। পড়তে খুব ভাল লাগবে।

গ্রেণ্ডেল অতি নিঃসঙ্গ। গ্রেণ্ডেলের সঙ্গে মানুষের একটাই মিল। তাদের ভাষা এক। গ্রেণ্ডেল মানুষের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করতে চায় কিন্তু পারে না। গ্রেণ্ডেলকে তখন ভীষণ করুণ লাগে। আগেই বলেছি আখ্যানটির ভাষা ব্যঞ্জনাময়। একদম শেষের দিকে একটি বর্ণনা আছে। সেখানে গ্রেণ্ডেল একটা পাহাড়ী ছাগল মারবার চেষ্টা করছে। ছাগলটার ভীষণ রোখ। সে মরবে কিন্তু তাড়া করেই যাবে। তার মাথা গ্রেণ্ডেল থেঁতলে দিয়েছে—দাঁত সমস্ত পাথরের ঘায়ে পড়ে গিয়েছে। তবু কিন্তু সে পাহাড়ের ওপর উঠেই আসছে আর আসছে। গ্রেণ্ডেল পালিয়ে আসে। পাঠকের মনেও শিহরন জাগে। মনে পড়ে যায় মৃত্যুও এমনি করেই বোধহয় ছুটে আসে।

গ্রেণ্ডেলকে মরতেই হয়। বিওআলফ করে মানুষ নিজেকে নূতন করে গড়তে পারে সেখানেই তার সঞ্জীবনী শক্তি। তাই তার সামনে পড়ে গ্রেণ্ডেল জীবনে প্রথম দিশাহারা হয়ে পড়ে। গ্রেণ্ডেল অতি সহজেই বিওআলফের একজন সংগীকে ধ্বংস করলেও বিওআলফের কাছে পরাজিত হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

গ্রেণ্ডেলকে যেমন মরতেই হয় তেমনি মানুষকেও গ্রেণ্ডেলদের মেরে ফেলতেই হয়। কিন্তু কিং কং সিনেমা শেষ হবার পর যেমন মনে হয় কেন কংকে মরতে হবে। তেমনি এই বইটি শেষ করেও মনে হবে যেন লেখক একটু দুঃখিত গ্রেণ্ডেলের জন্য। মনুষ্য সমাজের জন্য। সত্যি পরীরা আর আসে না রাক্ষসরাও আর নেই।

গার্ডনারের লেখায় আরো একটি জিনিষ আছে। তাঁর বর্ণনাভঙ্গী অতি চমৎকার। তিনি অতি সহজেই পাঠককে সেই আদিম যুগে নিয়ে যান। যেখানে মানুষ দুর্দান্ত শীতের সঙ্গে লড়াই করছে। পাঠক একেবারে কাছ থেকে দেখতে পায় সেদিনের পানভোজন উৎসব। তার পর উন্মত্ততা। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই-এর ঝংকারও কানে বাজে।

গার্ডনারের জন্ম ১৯৩৩-এ। তিনি লেখা শুরু করেছেন দেরীতে। কিন্তু পুষিয়ে দিচ্ছেন ভাল লেখা দিয়ে। আজ মার্কিন সাহিত্যে দুটি ধারা। এক সহজ রাস্তা যৌনরসাত্মক বালিশের মতো মোটা বই। নিউ জার্নালিজমের কায়দায় লেখা। আর এক হলো দুর্বোধ্য মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস যা পড়তে গিয়ে শুধুই হাই ওঠে। কাউকে কাউকে পড়তেই হয় কারণ তা না'হলে বুদ্ধিজীবী খেতাবটা মারা যাবে। বাকীরা দূরে সরিয়ে দেয়। এযুগে এমন একটি সুন্দর বই পড়ে খুব ভাল লাগলো।

প্রিয় শর্মা

পুস্তক পরিচয়

অনুবাদ : গল্প সংকলন

প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ। অনুবাদ—প্রসূন মিত্র। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লি। দাম আট টাকা।

বাংলা সাহিত্যে যেমন শরৎচন্দ্র, হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দের স্থান এবং মর্যাদাও অনেকটা সেই ধরনের। হিন্দি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমচন্দের আবির্ভাবও সেই সময়ে যখন বাংলায় শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তার শীর্ষে। শরৎচন্দ্রের আগে বাংলাদেশে আরো অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ কোন নজির নেই, সেই কারণে প্রেমচন্দ তৎকালীন হিন্দি সাহিত্যে আরও আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব। ঠিকই, প্রেমচন্দের আগে হিন্দি সাহিত্য ছিল রূপকথার জগতে বন্দী, তখনকার গল্প উপন্যাসে ছিল সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক-নায়িকা ও প্রেম, তৎসহ 'ভিলেন' এবং বিরহ এবং সর্বশেষে মিলন ও ভিলেনের পতন। এরকম একটা ছককাটা গণ্ডি থেকে প্রেমচন্দ হিন্দি সাহিত্যকে নিয়ে এলেন সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখময় জীবনযাত্রার বিরাট বিস্তৃত চিত্রশালায়। তাঁর সাহিত্য বিশেষত নড়বড়ে পল্লীসমাজের জীবনচরিত; মূর্খ, অবহেলিত, প্রপীড়িত গ্রামজীবনের নিটোল খতিয়ান।

বাইশটি গল্পের এই সংকলন গ্রন্থের অন্যতম গল্প 'দুধের দাম।' গ্রামের জমিদারের চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় ডাক পড়ে জমাদার গুদড় আর তার বউ মুঙ্গীর—যাদের হাতে থাকে পাড়াগাঁয়ের আঁতুড় ঘরের কর্তৃত্ব, যাদের ছাড়া সমাজ চলে না অথচ সমাজ সুবিধেমতো যাদের বিলকুল অস্বীকার করে। জমিদারপুত্র সুরেশ মায়ের দুধের অভাবে মুঙ্গীর দুধ খায় আর মুঙ্গীর বাচ্চা ছেলেকে খেতে হয় বাইরের অখাদ্য। মুঙ্গী মারা গেলে চামচিকের মতো শরীর নিয়ে তার ছেলে মঙ্গল জমিদারের পাতকুড়োনো খেয়ে বেঁচে রইল, যেমন বেঁচে থাকে টমি, মঙ্গলের কুকুর। একদিন সুরেশদের উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে মঙ্গল টমিকে বলে, "লোকে বলে, দুধের দেনা শোধ করা যায় না। কেন যাবে না? এই তো ওরা আমার মায়ের বুকের দুধের দাম এইভাবে আমাকে শোধ করে দিচ্ছে।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি আখ্যানের অবতারণা করা গেল, এরকম আরও অসংখ্য বাস্তব ছবি নিপুণ বুননে এই সংকলনে গ্রথিত। পেশায় শিক্ষক প্রেমচন্দের আদর্শবাদিতা তাঁর রচিত একাধিক কাহিনীকে পরম মানবিক মূল্য দিয়েছে, আবার তাঁর নিজের জীবনের ছায়াপাতও ঘটেছে তাঁর রচনায়। লেখকের আট বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান, তাই বোধহয় তাঁর অনেক গল্পের চরিত্রই অল্প বয়সে মাতৃহীন।

প্রেমচন্দ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সন্ত সরোজ'র ভূমিকা শরৎচন্দ্রকে দিয়ে লেখাবার জন্য কলকাতায় এসে শরৎচন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর গল্প পড়ে শোনান। ভূমিকাকার রাধাকৃষ্ণ বলেছেন, গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র নাকি বলেছিলেন —"বাংলা ভাষায় রবিবাবু ছাড়া আর কেউ এমন লেখা লিখতে পারবে না। আপনার গল্প সংগ্রহের ভূমিকা লেখার যোগ্যতা, আর যারই থাক, অন্তত আমার নেই।" এ উক্তির সত্যতা যাচাই গবেষকরা করবেন, কিন্তু একথা ঠিক, প্রেমচন্দ সেই বিরল প্রতিভা —যার শিল্পরচনা জনচিত্তজয়ী কিন্তু তথাকথিত অর্থে জনপ্রিয় নয়। প্রেমচন্দ কলাচতুর আধুনিক সাহিত্যিক নন, তাই হয়তো বা অধুনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত, কিন্তু সাহিত্যের মূল প্রাঙ্গণে তাঁর আসন দীর্ঘস্থায়ী ও অবিচল।

প্রসূন মিত্রের অনুবাদ সাবলীল; বুক ট্রাস্টের প্রকাশনা সুষ্ঠু।

ছোটদের বিজ্ঞান

করে দেখ (তৃতীয় খণ্ড)। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আশা প্রকাশনী, ৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা : ৭০০০০৯। পাঁচ টাকা।

চিনির দানায় আগুন লাগালে জ্বলে না একথা সবাই জানে। কিন্তু একটু মাথা ঘামালেই যে জ্বালানো যায় সে কথা জানেন ক'জন? অথবা লেবু থেকে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় ক'জন এমন ঘটনা পরীক্ষা করে দেখেছেন? অথবা আংশিক জলপূর্ণ কাচের গ্লাসে এক টুকরো বরফ ভাসিয়ে দিয়ে বলা হল, হাত না লাগিয়ে বরফ-টুকরোটি তুলুন দেখি? হ্যাঁ, তোলা যায়। কিছুটা বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা থাকলেই এসব কাজ করা শক্ত হয় না। প্রবীণ বিজ্ঞান লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য করে দেখ বইটিতে এ সব ব্যাপার নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞান মগজ দিয়ে বোঝার জিনিস নয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করার ব্যাপার। লেখক এই বইটিতে মোট আঠারোটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। যেগুলি স্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বসে যৎসামান্য খরচ করে নিজেরাই করে মজা পেতে পারে, বন্ধুদের সেই সঙ্গে তাক লাগাতেও।

প্রত্যেকটি পরীক্ষার শেষে লেখক সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সংযুক্ত করেছেন। ফলে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড যে ম্যাজিক নয়, কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ সেটা সহজেই বুঝে ওঠা যায়। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ছাপার আগে আর একটু ভাল করে সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। এর অভাবে দু-একটি বিষয় শুধু অস্পষ্টই থেকে যায়নি, ছোটদের মনে বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, সারফেস টেনসন বা তল-টানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক লিখেছেন, 'যে কোন তরল পদার্থের উপরিতলে সূক্ষ্ম একটা পর্দার মত আস্তরণ থাকে। এই পর্দাটা তরল পদার্থের উপরিতলকে যেন বেশ জোর করে টেনে রাখে। একেই বলা হয় তলটান।' পর্দার মত আস্তরণ কথাটা যেভাবে বলা হয়েছে তাতে কেউ কেউ ভুল বুঝতেও পারে। আর একটি পরীক্ষায় লেখক লিখেছেন, 'তলটানের ফলে জলের উপরিভাগ কুব্জ পৃষ্ঠের মত উপরের দিকে ঈষৎ বেঁকে থাকবে।' কথাটা কি ঠিক? পারদের ক্ষেত্রে উপরের দিকে মাঝের অংশটি ঠেলে ওঠে, জলের বেলায় কিন্তু হয় উল্টো। এ ছাড়া দামের ব্যাপারে প্রকাশক আর একটু উদার হতে পারতেন। ৭১ পাতার বই, বিষয়বস্তু কিন্তু আছে মাত্র ৬২ পাতায়। অথচ দাম পাঁচ টাকা। সাধারণ দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ দামটা অনেক বেশি।

সংগীত

ভারতীয় সংগীত ইতিহাস। সুকুমার রায়। ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ১২। বার টাকা।

গ্রন্থকার অভিজ্ঞ সঙ্গীতবিদ। এই গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজভাবে রচিত। ভারতীয় সঙ্গীতের আদিযুগ, মধ্য যুগ এবং বর্তমান যুগের জ্ঞাতব্য তথ্য ও বহু জীবনী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা গান সম্বন্ধেও একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে। আমাদের সঙ্গীতসাহিত্যে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন গ্রন্থ খুব বেশী নেই। গ্রন্থকার তাঁর প্রদত্ত তথ্যগুলিকে কিংবদন্তি, মতভেদ ও মতামতের জট থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থপাঠে কৌতূহলী পাঠক ও ছাত্রসমাজ নিঃসংশয়েই উপকৃত হবেন।

ঠুমরী কী বন্দিশ। অমিয়কুমার রায়। এস চন্দ্র অ্যান্ড কোং, ৪, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। পাঁচ টাকা।

গ্রন্থে পঁয়ত্রিশটি বিখ্যাত হিন্দী ঠুংরির স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার নিজে সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বহরমপুর থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি প্রধানত সঙ্গীতাচার্য শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর শিষ্য। চিন্ময়বাবু "মগনপিয়া" নামে যে সব হিন্দী গান রচনা করেছেন তারও কয়েকটি স্বরলিপি এই গ্রন্থে আছে। ঠুংরি সম্বন্ধে স্বরলিপি রচনা করা দুঃসাধ্য, কারণ যৎতালে মাত্রা অনুযায়ী শব্দগুলি সাজানোর বহু অসুবিধা দেখা দেয়। ঠুংরির শিল্পীরা এ সব গান তবলার সঙ্গে গাইলেও অনেকটা ছাড়াভাবে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী মাত্রা ভাগ করে গেয়ে থাকেন। গানগুলি সুনির্বাচিত এবং ঠুংরি সম্বন্ধে খুব কম স্বরলিপি গ্রন্থের এটি একটি সুন্দর সংকলন। একটু অভিজ্ঞ শিল্পীরা এই গানগুলি সামান্য আয়াসে তুলে গাইতে পারবেন। এই অভিনব প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

উপন্যাস

কয়েদখানা। প্রলয় সেন। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী : ১৫।৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম বারো টাকা।

রক্তের মত গাঢ় লাল মলাটের বইয়ের নাম দেখে স্বভাবতই একটু চমকে উঠতে হয়। না, কোন কয়েদখানার চোর, বদমাশ খুনী অথবা তথাকথিত বিপথগামী বিভ্রান্ত মানুষের কাহিনী নয়। বরং বলা যায়, সমকালীন সমাজের সুস্থ, সবল, শিক্ষিত, আপাতশান্ত, মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়েই এই কাহিনীর বিস্তার। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে ঘূর্ণায়মান এই মানুষগুলি ক্রমেই এক অসুস্থ অস্থির বিভ্রান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার অসহায় শিকার হয়ে পড়ছে। আর এভাবেই যেন গোটা সমাজটা হয়ে উঠছে এক নিষ্ঠুর কয়েদখানা, যে কয়েদখানা থেকে কোনদিন মুক্তি পাবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। লেখক এই বাতাসের মত অদৃশ্য অথচ অমোঘ কয়েদখানাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর গভীর অন্তর্লীন বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয়। এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই, এই কেন্দ্রচ্যুত উন্মার্গগামী সমাজের রূপচিত্রণ অত্যন্ত নিবিড়, সত্যানুগ ও কিছুটা যেন নির্মম।

বহু পাত্র-পাত্রী, ঘটনা সম্বলিত এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে, যে পরিবারের ছোট ছেলে অনুতোষ কট্টর বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ফেরার, হয়ত বা মৃত। বড় ছেলে মহীতোষ চাকরি এবং জীবনকে সমার্থক ভেবে এই জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে চাকরি হারিয়ে সেও ক্রমেই যেন উদ্যমহীন স্থবিরে পরিণত। মহীতোষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী মাধুরী ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পৌঁছল অফিস পাড়ায়। কিন্তু রান্নাঘর থেকে এই নারীমুক্তি ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচার শারীরিক কামনা-লালসা পূর্তিতে পর্যবসিত। স্বামী, সংসার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায় মাধুরীর ভাবনা, 'জীবনধারণের জন্য একটা মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই চাই, একটা পারিবারিক পরিচিতি চাই—তাই আছি এ সংসারে। নইলে তোমরা আমার কেউ নও।' মেজ ছেলে স্বার্থপর প্রিয়তোষ, যে রিনাকে বিয়ে করে আলাদা হয়ে থাকার পরিকল্পনা করে, সেই রিনাই হঠাৎ একদিন দুম করে বিয়ে করে বসে পাড়ার এক মস্তান ভুট্টাকে। অন্যদিকে মহীতোষদের রূপহীনা ছোট বোন রেখা

প্রেমিকের কাছে বঞ্চিত হয়ে টিউটোরিয়ালের মালিক প্রৌঢ় হরবিলাসের আগুনে সমর্পণ করে নিজেকে। আর এসব কিছুর নীরব দর্শক ওদের বাবা, এককালের বিপ্লবী ললিতমোহন। যিনি এক জটিল আত্মসমীক্ষায় নিমগ্ন হয়ে ভাবেন, বিপ্লব, আদর্শ, দেশের জন্য আত্মত্যাগ ইত্যাদির পেছনে নিজের জীবন যৌবন সঁপে ভুল করেছিলেন তিনি। অথচ তারই এক বিপ্লবী সহকর্মী দ্বিজপদ আজ লক্ষপতি। ললিতমোহনের স্ত্রী সুহাসিনী হাসতে ভুলে গেছেন। নিখোঁজ ছেলের প্রতীক্ষায় বাতাবীলেবু গাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন প্রতি রাতে। এ এক অদ্ভুত সময়, এ এক জটিল সমাজ, যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব এবং ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন হয় অর্থ-কৌলিন্যের মাপকাঠিতে। গোষ্ঠীবদ্ধ, সমাজবদ্ধ ব্যক্তি আজ একক দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন, আত্মপরিচয়হীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গ ভাবনার কয়েদখানায় নির্বাসিত। সমাজ সচেতন লেখক প্রলয় সেন আধুনিক সমাজের এই ভাঙন, মূল্যবোধহীনতা, সার্বিক অধঃপতন এবং সর্বোপরি বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যক্ষ করেও মানুষের চিরন্তন কল্যাণবোধের ওপর খানিকটা আস্থা রেখেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত মহীতোষকে ক্লীবত্ব ছেড়ে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় এবং লক্ষ্যহীনভাবে অবিরাম ভেসে বেড়ানোয় ক্লান্ত মাধুরীর এখন ঘরে ফেরার পালা। বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত সমাজের কথা নিয়ে উপন্যাস লেখা হলেও পড়তে কখনোই ক্লান্তি আসে না। এক সুপাঠ্য সাবলীল ভাষায় লেখা এই উপন্যাস পাঠককে শেষ পর্যন্ত অনায়াসে তরতর করে টেনে নিয়ে যায়।

তবু ছোট্ট একটা কথা। একই শব্দের (যেমন: বেশি, বেশী; বাড়ি, বাড়ী; ইদানিং, ইদানীং ইত্যাদি) দু' রকম বানান চোখকে খানিকটা পীড়িত করে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"সোনার রোদে যাচ্ছে ডুবে ভুবন ওই/ এ সোনায় কি গয়না হবে? স্যাকরা কই?" শরৎ-বন্দনার ছলে লিখেছিলেন বনফুল। বস্তুত এ-সোনায় যাঁরা অলংকার নির্মাণ করতে পারেন তাঁরা সাধারণ স্বর্ণকার নন, আমরা তাঁদেরই কবি বলে চিনি।

শুধু শরতের সোনা নয়, ষড় ঋতুর ষড়ৈশ্বর্যময় রূপবর্ণনার কারবারী যাঁরা তাঁদের সকলকে নিয়ে একখানি প্রণাঙ্গ সংকলন করার ইচ্ছেরই প্রকাশ ঘটেছে বীণা

চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **ছয় ঋতু** (শতদল-পো গ্রন্থমালা, হাওড়া ১, বারো টাকা) নামের সংগ্রহ গ্রন্থটিতে। কিন্তু সকলকে এক গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে ধরার কাজটি খুব সহজ নয়। বীণা চট্টোপাধ্যায়কে তাই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, শুধু মাত্র 'জীবিত প্রবীণ ও নবীন কবিদের কবিতা' নিয়েই সংকলনটি প্রকাশিত হোক। শুধু প্রতিটি ঋতুর আরম্ভে, পূর্বসূরী কবিদের ঋতু-বিষয়ক কবিতা রচনার স্মারক হিসেবে, তিনি ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি করে কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সমস্যা তাতে বেড়েছে বই কমেনি।

কেননা, জীবিত প্রবীণ ও নবীন কবিদের মধ্যে যাঁরা কবি তাঁরা কেউই ঋতু-বন্দনার নামে স্তুতিমূলক পদ্য লিখে দায় সারেননি। ঋতুর উল্লেখ থাকলেই সেটা ঋতু-বিষয়ক কবিতা হয় না। সম্পাদিকা সে-কথাটা মনে রাখলে, আরম্ভে বরং গভার, আধুনিকদের কবিতা রাখতেন। তা হলে অন্তর্ভুক্ত কবিদের রচনার সঙ্গে প্রারম্ভিক কবিতার ব্যবধান এতটা দুস্তর হতো না। জীবনানন্দের হেমন্ত কি বুদ্ধদেব বসুর শীত অথবা সুধীন্দ্রনাথের বর্ষা আধুনিক কবিদের এই সংকলনের সঙ্গে যতটা মানাত, তেমন আর কিছু নয়। তা ছাড়া, পুরনো কবিদের নির্বাচনই বা সুষ্ঠু বলা যায় কী করে? রবীন্দ্রনাথের 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' কি ঋতু-বন্দনার চরম উদাহরণ?

শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর একটি ভূমিকা প্রথমে রয়েছে। তিনিও জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, বিস্মিত হয়েছেন 'বৈশাখের সন্তান' রবীন্দ্রনাথের রৌদ্র-রসাত্মক কবিতা বাদ পড়ায়। তাঁর ভূমিকার কিছু অংশও অবশ্য কম বিস্ময়কর নয়। যেমন, "অলোক-রঞ্জনের কাছে শীতের ফুল আকন্দই আকন্দ।" স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিংবা "হেমন্ত ও শীতের বর্ণনার অসুবিধা এই যে, ধানের বর্ণনা এসে যায় দুটোতেই।" ধানের বর্ণনা এলে যে কী অসুবিধে তা অবশ্য ব্যক্ত করেননি তিনি। কবিতাও কি 'ধান দিয়ে যায় কেনা?'

*

করুণার পাত্র (ভাবনা প্রকাশ, কলকাতা-৬, তিন টাকা) তুষারাভ রায়চৌধুরী রচিত প্রথম উপন্যাস। এর আগে 'বিষাদ ও ভগ্নহৃদয়' নামে তুষারাভের একটি গল্পগ্রন্থ অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে।

'করুণার পাত্র' বইতে করুণার পাত্র কে? প্রথমেই মনে হবে, প্রচ্ছদপটে 'করুণা'র 'ক' অক্ষরটি যিনি লিখেছেন তাঁর কথা। একটি প্রশ্নচিহ্নকে উল্টো করে ধরলে যেমন দেখায় তেমন একটি 'ক' লিখে অকারণে অক্ষরটিকে বড়ো করে যেভাবে এই নামটিকে দিয়েছেন শিল্পী, তাতে প্রথমদর্শনে 'রুণার পাত্র' পড়া অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এ তো গেল বাইরের ব্যাপার। উপন্যাসের বিষয়ে অবশ্য করুণার পাত্র এই কাহিনীর মুখ্যচরিত্র, শুকদেব। লাজুক, আত্মবিশ্বাসহীন একটি যুবক কীভাবে রাতারাতি বদলে গেল, অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারি হয়ে প্রমাণ করল নিজের কর্মক্ষমতা, তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা, শুধু তাই নয়—যে-সহকর্মিণীকে দূর থেকে প্রেম-বিচ্ছেদেও ছিল দ্বিধা দুর্বলতা ও ভীরুতা তাকেও সরাসরি প্রস্তাব করে বসল—তারই একটি স্বল্পায়তন আলেখ্য তুষারাভর এই প্রথম উপন্যাস।

অফিসের পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক কিছু কিছু বর্ণনায় তুষারাভ অবশ্যই পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন, কিছু সংলাপও বেশ স্বচ্ছন্দ।

পত্রিকা

Commerce: Annual Number 1975. Editor . Vadilal Dagli. Manek Mahal, 90 Veer Nariman Road, Bombay-20. Price : Rs. 10.

Commerce, with special supplement on State of West Bengal, February 28, 1976. Editor; Vadilal Dagli. Price : Rs. 2.50.

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা মূলত কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। আবার এই কৃষি নির্ভর করে জলের উপর। কমার্স পত্রিকার এই বার্ষিক সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠা ভারতের জল সমস্যা নিয়েই আলোচিত। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানীয় জল ও অন্যান্য কাজে কি-ভাবে লাগানো যায়, তা বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত। এই জলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মৌসুমীর ভবিষ্য-দ্বাণী, বন সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের পরিকল্পনা, শহরে পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা, সেচ-পরিকল্পনা, নোনা জলকে লবণমুক্ত করা, নদীর দূষিত জল জমি, মাছ-চাষ ও পানীয় জলের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করছে প্রভৃতি সমস্যা এসে পড়েছে। ১৯৫৭ সাল থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই ওই এলাকায় পাহাড় কেটে কৃত্রিম হ্রদ বা জলাধার তৈরির কাজ এখনই আরম্ভ না করলে ভবিষ্যতে অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে দামোদরের জলে কারখানার দূষিত পদার্থ ফেলবার বিষয়ও আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যায় আছে ১৭টি প্রবন্ধ। লেখকদের মধ্যে আছেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শঙ্কর ঘোষ, ভোলানাথ সেন, নবগোপাল দাশ, ইন্দ্র সেন, স্থপতি সন্তোষকুমার ঘোষ, হিমাংশু রায়, প্রভৃতি।
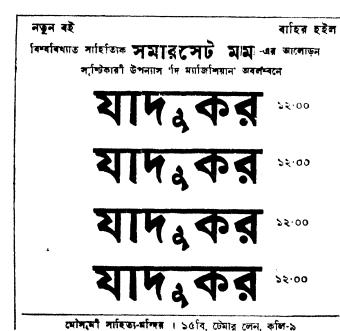
খেলার মাঠে

ফুটবলের পর ক্রিকেট, ক্রিকেটের পর হকি। পর্যায়ক্রমে প্রধানত এই তিনটি খেলাকে কেন্দ্র করে ময়দানপাড়ায় চাঞ্চল্য। মরসুম ভাগের মূল কাঠামো এখনো বজায় আছে। কিন্তু অবস্থার হেরফেরে অনেক সময়েই ময়দানে ঘটেছে তিনটি খেলার সহ অবস্থান।

এবারের কথাই ধরা যাক। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেও ক্রিকেট শেষ হলো না। ক্রিকেটের পরে মরসুমী খেলা হকি কিন্তু আগেই শেষ হয়ে গেছে। আবার ক্রিকেট শেষ না হতেই শুরু হল ফুটবল। অবশ্য মরসুমী ফুটবল শুরুর কিছু দেরি আছে। ইংলণ্ডের রুক টাউন ফুটবল ক্লাবের প্রদর্শনী খেলা দিয়েই ১৯৭৬ সালের ফুটবল মরসুমের শুরু হল।

এ বছরের ফুটবল জমবে? বলা শক্ত। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল অদল বদলের পর আমি লিখেছিলাম, খেলোয়াড়রা মাঠে না নামা পর্যন্ত এবং কয়েকটি খেলায় তাদের ভূমিকা পরখ না করা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় কোন দল কতখানি শক্তিশালী এবং কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ক্রীড়ামান যাই হোক—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং—তিন প্রধানকে কেন্দ্র করে সভ্য-সমর্থক এবং ক্রীড়ামোদিদের উৎসাহ উদ্দীপনায় ময়দানপাড়ায় জোয়ার আসবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মুশকিল দেখা দেবে এবার চ্যারিটি খেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থায়। যেহেতু আগামী শীত মরসুমে এম সি সি দল ভারত সফরে আসছে, সেহেতু ইডেনে টেস্ট ক্রিকেট হবেই। নিউজিল্যান্ড দল আসছে এম সি সি-র আগে। কলকাতায় অবশ্য নিউজিল্যান্ডের টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয়নি। উঁচু মহলে চেষ্টা চলছে যাতে ভারত-নিউজিল্যান্ড টেস্ট ইডেনেও হয়। যদি নাও হয়, ভারত-ইংলন্ড টেস্ট তো হবেই। সুতরাং ক্রিকেট পীচের ক্ষতির সম্ভাবনায় ইডেনে এ বছর ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা যাবে না। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান মাঠেই চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু তিনটি বড় ক্লাবের সভ্য-সমর্থক সংখ্যা এখন এত বেশি এবং চ্যারিটি ম্যাচ দেখার জন্য সাধারণ ক্রীড়ামোদির এত আগ্রহ যে, টিকিট বিলি বাটোয়ারা করা আই এফ এ-র মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সম্ভবত সমস্যা দেখা দেবে কোন মাঠে খেলা হবে তা নিয়েও। কারণ, ইস্ট-বেঙ্গল মাঠে খেলা মোহনবাগানের না-পছন্দ। মোহনবাগান মাঠে যেতে ইস্ট-বেঙ্গলের আপত্তি। এ ছাড়া ছোট মাঠে বড় খেলার ব্যবস্থায় নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তো আছেই। আছে আই এফ এর সাংগঠনিক সমস্যাও।

সম্ভবত এইসব কারণে এবং ফুটবলকে সারা বাংলায় ব্যাপক [illegible] ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে মুখ্যমন্ত্রী [illegible]শংকর রায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক সভা ডেকে আই এফ এ গভর্নিং বডির সদস্যদের কাছে বলেছেন, দলাদলি ছাড়ুন, ফুটবলে সবরকমের সাহায্য দেব। কয়েকজন ঝানু প্রবীণ ক্রীড়াকর্মকর্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই এদের খেলার মধ্যে দেখে আসছি। দেখছি অনেকেই খেলা নিয়ে রাজনীতি করছেন। তাতে সামগ্রিকভাবে খেলার ক্ষতি হচ্ছে। খেলার মধ্যে রাজ-নীতির কোন স্থান নেই। যদি রাজনীতি করতে চান আমার দলে (কংগ্রেস দল) আসুন। কিংবা আরও অনেক দল আছে সেই সব দলে যান। রাজনীতি করার প্রচুর সুযোগ পাবেন। কিন্তু দোহাই, খেলা নিয়ে আর রাজনীতি করবেন না।"

সত্যিই ফুটবল মরসুমের সুষ্ঠু সমাপ্তির ক্ষেত্রে রাজনীতি এক বাধা। আই এফ এ গভর্নিং বডির অনেক সদস্য এবং অনেক ক্লাব কর্মকর্তাই রাজনীতি করে থাকেন। কেউ কেউ কোর্ট-কাছারীর আশ্রয় নেন। তাতে ফুটবলের ক্ষতিই হয়। এ সম্পর্কে সজাগ থাকার প্রয়োজন আছে।

যতদিন ফুটবল স্টেডিয়াম না গড়ে ওঠে ততদিন মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল মাঠে চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রিকেটের নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। ক্রিকেট বোর্ডের অলিখিত নীতি, বাংলা-বোম্বাই খেলা যদি এক বছর হয় বাংলায়, পরের বছর বোম্বাইতে। এইভাবেই চলচে পর্যায়ক্রমে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার মাঠের সমস্যা এইভাবে মিটতে পারে। এবং প্রথমবারের সমস্যা মিটতে পারে টসের মাধ্যমে।

ফুটবল মরসুমে হয়তো আরও সমস্যা দেখা দেবে। সব কিছু আন্দাজ করা যায় না। গত বছর মহমেডান স্পোর্টিং মাঠের গ্যালারি ভাঙবে, বহু দর্শক আহত হবে, একটি ছেলে মারা যাবে—কে ভাবতে পেরে-ছিল? কেই বা আন্দাজ করতে পেরেছিল ওই কারণে বহুদিন খেলা বন্ধ থাকবে? ফুটবল শুরুর আগে এ সম্পর্কেও সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

আর যা নিয়ে প্রায়ই মাঠে হামলা হয় সে সম্পর্কে সাধারণকে কি কিছুটা ওয়াকি-বহাল করা যায় না রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে? আমি ফুটবল আইনের কথা বলছি। আইনের অজ্ঞতা কিন্তু অনেক অশান্তির মূল কারণ।

স্পিন বনাম পেস

একদিকে অ্যান্ডি রবার্টস, বার্নার্ড জুলিয়েন, কিথ বয়েস, ভ্যানবার্ন হোল্ডার, অন্যদিকে ভগবৎ চন্দ্রশেখর, বিষেণ সিং বেদী, এরাপল্লী প্রসন্ন। প্রধানত স্পিন ও পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতের ব্যাটসম্যানদের মোকাবিলা এবং মারের কলাচাতুর্য দেখতে দেখতে ক্রিকেটের আনন্দসাগরে ডুবে ছিলাম। না কোন ক্রিকেট মাঠে নয়, সোসাইটি সিনেমা হলে। ১৯৭৪-৭৫ মরসুমে ভারতে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজকে নিয়ে তৈরী হয়েছে 'স্পিন বনাম পেস' নামক ফুল লেংথের ফিল্ম।

দু ঘণ্টার এই চিত্রে পাঁচটি টেস্টকেই ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্রিকেটে একদিনের খেলাই হয় ৬ ঘণ্টা। পাঁচদিন-ব্যাপী এক একটি টেস্ট। সুতরাং প্রায় দেড়শো ঘণ্টার ঘটনা দুই ঘণ্টার মধ্যে দেখানোয় নিশ্চয়ই ক্যামেরার ওস্তাদি আছে। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে যেন মাঠে বসেই টেস্ট খেলা দেখছি।

কিছু কিছু জিনিস ছবিতে আরও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ক্রিকেট পীচ থেকে একশো দেড়শো গজ দূরে বসে খেলা দেখতে হয়। সব সময় বোঝা যায় না বলের রকমফের, হাতের চাতুরি, স্পিনের জাদু ও পেসের গতি বা সুইং। কোন বলটা ব্যাটসম্যানরা কিভাবে খেলছেন, কি ভুল করছেন তাও সব সময় দূর থেকে ঠাহর করা শক্ত। ছবিতে এই জিনিসগুলিই ভাল করে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে

যখন দেখানো হয়েছে স্লো-মোশানে। এই কারণেই বোধ হয় ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছবিটা সবার পক্ষে যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ।

টেস্ট খেলার টিকিটের অভাবে যাঁরা রেডিওর ধারা বর্ণনা শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান তাঁরা এ চিত্র দেখে চোখকে কিছুটা সার্থক করতে পারবেন। মফস্বল শহরের ক্রীড়ামোদী, যাঁদের টেস্ট ক্রিকেট সম্পর্কে একটা ধারণা আছে, দেখার সুযোগ কোনোদিন পাননি, তাঁদের কাছেও এক চমৎকার সুযোগ উপস্থিত করেছেন ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশন। শুনেছি, সরকারের কাছ থেকে ছবিটি কিনে নিয়েছেন সোসাইটি সিনেমার কর্তৃপক্ষ। প্রমোদ কর ছাড় দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর হলে তারা ছবিটি নিয়মিত দেখাবেন তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে। সঙ্গত কারণে এই চিত্রের প্রমোদ কর ছাড় হওয়া উচিত।

একলব্য

ভারত-নেপাল মোটর র‍্যালির বিজয়ীরা

ভারত-নেপাল মোটর র‍্যালিতে এবার যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন কৃতিত্ব তাঁদের অনেকখানি। মোটর রেস বলতে আমরা সাধারণত বুঝি শব্দ বা আলোর গতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে রকেটের গতিতে গাড়ি চালানো। তাতে থাকে রোমহর্ষক উত্তেজনা, সংঘর্ষের সংঘাত এবং কখনো মৃত্যুর হাতছানি। কিন্তু এনডিওরেন্স ও রিলায়েবিলিটি র‍্যালি হচ্ছে সংযম, সাবধানতা, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা। এতে আগে যাবার প্রশ্ন নেই। পেছনে পড়লেও ক্ষতি নেই। সুসমঞ্জস গতি বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাল্লা অতিক্রম করাই সাফল্যের শেষ কথা।

অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া এবং ইন্ডো-নেপাল মোটর র‍্যালির যৌথ উদ্যোগে একারকার এই প্রতি-যোগিতা শুরু হয় কলকাতা থেকে ১৬ এপ্রিল তারিখে। গন্তব্য পথ ছিল কলকাতা পানাগড় - বারাই - সাসারাম - বেনারস-গাজিপুর - গো র ক্ষ পু র - সানৌলি-পোখরা-কাঠমাণ্ডু। মোট দূরত্ব ১৩৭৫ কিলোমিটার। প্রতিযোগী ছিল চল্লিশটি মোটর ও ২২টি মোটর সাইকেল। গাড়িগুলির সওয়ারের সংখ্যা কিন্তু অনেক। মোটরে ছিলেন ড্রাইভার, কো-ড্রাইভার, নেভিগেটর ও কো-নেভিগেটর। মোটর সাইকেলে ড্রাইভার ও নেভিগেটর। টানা প্রায় ২৫ ঘন্টার অভিযানে যাঁরা বিজয়ীর পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের দলের মধ্যেদের তালিকাটি আগে দেওয়া যাক।

মোটর কার : ১ম—রণেন দত্তগুপ্ত (চালক), ভরত পারেখ (নেভিগেটর), কমল বসু রায় (কো-নেভিগেটর) পুরস্কার—ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা। ২য়—ইন্দ্রজিৎ গুহ (চালক), বিশ্বজিৎ গুহ (নেভিগেটর), সমর বসু (কো-নেভিগেটর), পুরস্কার—ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা। ৩য় ননীগোপাল চন্দ (নেভিগেটর), শ্যামাপ্রসাদ সরকার (চালক), পুরস্কার—ট্রফি ও ২ হাজার টাকা। ৪র্থ—পার্থসাধন বসু (চালক), দীপঙ্কর ধাড়া (নেভিগেটর), পুরস্কার—ট্রফি ও এক হাজার টাকা।

মোটর সাইকেল : ১ম—সৌম্যজিৎ নাগ ও রঞ্জিত ঘোষ, পুরস্কার—ইয়েজদি মোটর সাইকেল, ২য়—তারাপদ সাহা ও রঞ্জন মিত্র, পুরস্কার—বি এস ডবলিউ মোটর সাইকেল, ৩য়—বিশ্বজিৎ সাহা ও সুশীল নায়ার, পুরস্কার—ইয়ামাহা মোটর সাইকেল, ৪র্থ—রবীন্দ্র মিত্র ও এস চক্রবর্তী, পুরস্কার—রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেল।

এনডিওরেন্স ও রিলায়েবিলিটি র‍্যালিতে সাফল্যের ক্ষেত্রে চালকের কৃতিত্বই মুখ্য নয়। নেভিগেটর অর্থাৎ নির্দেশকেরও সম কৃতিত্ব। বরং বলা উচিত, সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে নেভিগেটরের ক্যালকুলেশনের উপর।

পাল্লাপথের কোন স্থান থেকে কোন স্থান পর্যন্ত প্রতিযোগীরা ঘন্টায় কত কিলোমিটার বেগে যাবেন, প্রতিযোগী-দের হাতে দেওয়া কন্ট্রোল বুকে তার নির্দেশ থাকে। পথের নানা স্থানে থাকে

প্রথম—রণেন দত্তগুপ্ত ও ভরত পারেখ

চেক পোস্ট এবং গোপন চেক পোস্ট। সেখানে পরীক্ষকরা মিলিয়ে নেন সময় ও গতির সঙ্গে সমতা আছে কি-না। এক মিনিট আগে পৌঁছলে ১০ পয়েন্ট নষ্ট হবে, এক মিনিট পরে পৌঁছলেও নষ্ট হবে ১০ পয়েন্ট, যেমন মোটরে ফার্স্ট প্রাইজের অধিকারী ভরত পারেখ ও রণেন দত্তগুপ্তের একটি চেক পোস্টে দু মিনিট দেরিতে পৌঁছনর ফলে ২০ পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইন্দ্রজিৎ-বিশ্বজিৎ-সমর দের নষ্ট হয়েছে ৪০ পয়েন্ট, একটি চেক পোস্টে দু মিনিট আগে এবং একটি চেক পোস্টে দু মিনিট পরে পৌঁছনর জন্য।

গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখাই বড় কথা। কিছু পথ বেগে এবং কিছু পথ মধ্য-গতিতে যাবার উপায় নেই। কেননা পরীক্ষার গোপন ঘাঁটিতে ধরা পড়লে বেশি পয়েন্ট কাটা যাবার আশংকা। চালকের নিয়ন্ত্রণ এবং নেভিগেটরের ক্যালকুলেশন—সময়ের গতিকে ভগ্নাংশের দ্বারা সূক্ষ্ম-ভাবে ভাগ করাই সাফল্যের চাবিকাঠি। মাদ্রাজের এক মোটর প্রতিযোগীর দুজন নেভিগেটর ছিলেন দুজন মহিলা। নেপালের এক গাড়িতেও একজন মহিলা ছিলেন।

বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্বে বিভিন্ন মোটর র‍্যালির পুরস্কার জয়ী। এ ছাড়া অন্য খেলাধুলার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা আছে। যেমন ভরত পারেখ মোটা-মুটি ভাল টেবল টেনিস খেলোয়াড়। ইন্দ্রজিৎ গুহ অতীতের রাইফেল শ্যুটার। ব্যারাকপুরে ক্যালকাটা মোটর স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত হাইস্পিড মোটর রেসে রণেন দত্তগুপ্ত একবার প্রথম স্থান এবং একবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। মোটর ভিহিকেলের ইন্সপেক্টর ননীগোপাল চন্দ চতুর্থ স্থান দখল করেছিলেন অল ইন্ডিয়া হাইওয়ে মোটর র‍্যালিতে।

মোটর কার ও মোটর সাইকেলের প্রতিযোগিতায় গতি ও সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রথম স্থানাধিকারী সৌম্যজিৎ ও রণজিত আসানসোলের প্রতি-যোগী। প্রথম যোগ দিয়েই প্রথম হলেন। এদিক দিয়ে বিশ্বজিৎ সাহার তৃতীয় স্থান দখল অপ্রত্যাশিত। কারণ বিশ্বজিৎই বাংলার একমাত্র প্রতিযোগী, যিনি প্রতি বছর মাদ্রাজের শোলাভরমের হাই স্পিড মোটর রেসে যোগ দিয়ে পুরস্কার নিয়ে আসছেন।

মোটর স্পোর্টস প্রধানত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং বেশির ভাগ প্রতিযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা নিজে ব্যবসায়ী। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের সাফল্য কৃতিত্বের দাবি রাখে। আর বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে গুহ পরিবার। দুই ভাইয়ের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ অ্যাডভোকেট, বিশ্বজিৎ চার্টার্ড অ্যাকাউ-ট্যান্ট। কো-নেভিগেটর ওদের পিসতুতো ভাই এঞ্জিনিয়ার। সময় ও গতির গণনা করেছেন মুখে মুখে।

ইন্দ্রজিৎ ও ভরত পারেখকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাদের ঘুম পায়নি? পঁচিশ-ছাব্বিশ ঘন্টা টানা মোটর চালাতে এক ঘেয়েমি বোধ হয়নি? ওরা জানাল, মানসিক উত্তেজনায় ঘুম বিদায় নিয়েছিল, আর পথের দু ধারে সারি সারি মানুষের অভিনন্দনে অভ্যর্থনায় প্রতিযোগিতার নেশাতেই মেতে ছিলাম। এক সময় দেখলাম আমরা কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছে বিশাল জনারণ্যে মিশে গেছি।

মুকুল

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

স্যামরডের কনে জোটেনি! বেচারা!
কে ওই চালিয়াতকে বিয়ে করবে!

ওরা জানে না, কনের জন্যে আমি আসিনি! যার জন্য এসেছিলুম, তা পেয়েছি।

ওয়াম্বেসি গ্রামে।
স্যামরড, তুই সোনাবেলায় গিয়েছিলি কেন? তোর তো বিয়ে ঠিক হয়নি! তবে?
সে তুমি বুঝবে না!

প্রবাদটা কি ভুলে গিয়েছিস?
ওসব বুজরুকিতে আমার বিশ্বাস নেই, বাবা!
কুমতলবে যে সোনাবেলায় যায়, তার মৃত্যু অনিবার্য।

আর নয়, পালাই!
ওরা অবাক হয়ে যাবে।

কে আসছে, দ্যাখ!
কিরে সোনার খবর কী?
হাহা..

প্রমাণ চেয়েছিলে! এই দ্যাখো প্রমাণ!

অর্ধেক বালি, অর্ধেক সোনা! এ বস্তু কোথায় পেলে?
!!
ASSAYER OFFICE
৭

নাট্য সমালোচনা

নট-নটী

(রঞ্জনা)

নাটকের ভিতরে নাটক দেখার একটা আলাদা সুখ বা রোমাঞ্চ আছে। 'নট-নটী'-তে সেটা পাওয়া যায় যখন দর্শক গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা ও প্রফুল্ল-র দৃশ্য একের পর এক মঞ্চে অভিনীত হতে দেখেন। 'আবু হোসেনে'র দৃশ্যও 'নট-নটী'-তে রয়েছে। 'নট-নটী' (রচনাঃ গণেশ মুখোপাধ্যায়) বাংলা রঙ্গমঞ্চের অতীত ইতিহাস নিয়ে রচিত। পুরোটা হয়তো ইতিহাস নয়, তার সঙ্গে কল্পনাও রয়েছে কিছুটা। তবু এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় জীবনের ঘটনা এবং বিনোদিনীর কথা আবার জানানো হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের থিয়েটারে আগমন এবং বিনোদিনীর কৃপালাভ। শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের অনেকখানিই নাটকে দেখানো হয়েছে। 'নট-নটী' মূলত গিরিশ-চন্দ্রের কাহিনী। সেই সঙ্গে তদানীন্তন নাট্যজগতের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গও আছে। বিনোদিনী প্রসঙ্গ এবং মঞ্চের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথা আরও থাকলে ভাল হত। এই নাটকে বিনোদিনী কুলবধূ হয়ে নাট্যজগত থেকে বিদায় নিলেন।

'নট-নটী' সুগ্রথিত নাট্য-কাহিনী নয়, তবু পুরনো রঙ্গমঞ্চের তথ্য সম্ভারে নাট্য-গল্পের আমেজ আছে। ক্ষেত্রমণির উপ-কাহিনী নাট্য-সমৃদ্ধ। প্রফুল্ল একই সঙ্গে দুই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল। একটাতে গিরিশচন্দ্র নিজে নেমেছিলেন। ওই দুই প্রফুল্ল-র দৃশ্য 'নট-নটী'তে দেখানো হয়েছে। প্রফুল্ল নাটকের দৃশ্য আরও কম থাকলে ভাল হত, এই কারণে নাটকের শেষ দিকটা ক্লান্তিকর। তাছাড়া বিভিন্ন জনের কাহিনী একই নাট্য-সূত্রে বাঁধা সম্ভব হয়নি বলে নাটকটি কেমন যেন অসংবদ্ধ মনে হয়েছে। তবে নাট্যকার-পরিচালক গণেশ মুখো-পাধ্যায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের অতীত দিনের শিল্পীদের সংগ্রাম ও যন্ত্রণার যে চিত্র এঁকেছেন সেটা দর্শকদের মনে দাগ কাটে। বাংলা থিয়েটারের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে এই নাটক চিহ্নিত হবে।

'নট-নটী'-তে এই কালের শিল্পীরা

"নানা রঙের দিনগুলি" (পরিচালনা : কনক মুখার্জি) ছবিতে সুমিত্রা মুখো-পাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। গিরিশচন্দ্রের ভূমিকায় কার্তিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অতি অভিনয়ের দিকে ঝোঁক। তবে তাঁর কণ্ঠস্বর ভাল, চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁকে চরিত্রে মানিয়েছে সুন্দর। শ্রীরামকৃষ্ণর বেশে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর যেমন অভিনয় করেছেন এখানেও তাই দ্রষ্টব্য। মলিনা দেবীর গঙ্গামণি একটি বিশিষ্ট চরিত্রসৃষ্টি। আবু হোসেনের নাচ-গানের দৃশ্যে মলিনা দেবীর অভিনয় স্মরণীয়। বিনোদিনীর ভূমিকায় অতি

"নট-নটী" নাটকে মলিনা দেবী

চমৎকার অভিনয় করেছেন বাসন্তী চট্টো-পাধ্যায়। চৈতন্যলীলায় নিমাইয়ের চরিত্রে তাঁর অভিনয় আরও সুন্দর। তাঁর গানও প্রশংসনীয়। সুরূপা এবং কুরূপা ক্ষেত্রমণির উভয় রূপেই অভিনয়ের দক্ষতা দেখিয়েছেন দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিশেষ টাইপ-অভিনয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়ি করেছেন, হয়ত দর্শকের হাততালিই তার কারণ। নরেন্দ্রনাথ হিসাবে সুধাংশু মাইতি ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ। তাঁর গানের গলাও ভাল। দানাকালী বেশে সন্তোষ দত্ত গোড়ায় একটু বেশি কৌতুকাভিনয় করলেও পরে তাঁর অভিনয় বেশ সংযত। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে দুর্গা-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দেব, অশ্রু ভট্টাচার্য, অনিল মুখোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ প্রশংসা পাবার মতো অভিনয় করেছেন।

'নট-নটী' যেহেতু কল্পিত নাট্য-কাহিনী-নির্ভর নয় তাই এর শেষ দৃশ্যও তথ্যসমৃদ্ধ—নট-নটীদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে নাটকের পরি-সমাপ্তি। এই দৃশ্যের পরিকল্পনা খুব সুন্দর। নাটকে হীরক মুখোপাধ্যায় আলো-ব্যবহার ও শিল্প-নির্দেশনায় দর্শকদের অবাক করে দেবার মতো কাজ করেছেন। ভিশন বা দিব্য-দর্শনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখানো অনবদ্য। নাটকের বিবিধ আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে গান, যার সুন্দর সুর দিয়েছেন অনিল বাগচি। প্রযোজনাগত উৎকর্ষে 'নট-নটী' বিশিষ্ট, বিশিষ্ট বিষয়বস্তুতে।

চিত্র সমালোচনা

জিন্দগী ঔর তুফান

(কীর্তিমান ফিলমস)

জিন্দগীর ইরাদা অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জানবার আগে নায়ক সাজিদ খানকে যে-সব কষ্টকর ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে তার ভিতর দিয়ে পরিচালক উমেশ মাথুর হিন্দী ছবির অনেকগুলি উপকরণ খুব সহজেই সাজাতে পেরেছেন। নাচ-গান, সেকস ও মারামারি কোনটাই বাদ যায়নি। এদিকে আবার ছবিটি এক নভেলের (রচনা : মহাবীর অধিকারী) ভিত্তিতে তৈরি, যাতে রয়েছে জারজ সন্তান কাহিনী-নায়কের সপক্ষে এক জোরদার সওয়াল। গল্পে, বলা বাহুল্য, সমাজই দোষী বলে সাব্যস্ত। তবে অনাথ আশ্রম থেকে বেরোবার পর নায়ক যত কষ্ট পেয়েছে তার সবটার জন্য পরিবেশ বা মানুষের ঘৃণাই দায়ী নয়, তার নিজের বোকামিও আছে। নায়ক সাজিদের জীবনে রেহানা সুলতান ও দুই যোগিতাবালী (ও'র দ্বৈত ভূমিকা) এসেছেন। তাতে ও'র জীবনে প্রণয়ভঙ্গের ট্র্যাজেডিও দেখা গেছে। তবে ও'র জীবনের তুফানে শক্তভাবে হাল ধরেছে বাজারের পোরিন বাঈ (সুলভা দেশপাণ্ডে)—ও'র চাইতে বয়সে বড়। ওদের এই সম্পর্কের মধ্যে গল্পের উপকরণ আছে, যা সত্যিই কিছুটা জটিল। আর যে-সব ঘটনা বা ষড়যন্ত্র তার বেশির ভাগই সাজানো তথা হিন্দী চিত্র-মাফিক।

সাজিদ শেষ পর্যন্ত শান্তি পেয়েছেন দুই যোগিতাবালীর এক যোগিতাকে নিয়ে, যে বাড়ির ঝি—ডি-গ্ল্যামারাইজড। লেখক বা পরিচালকের বক্তব্য বোধ হয় এই যে সমাজের নীচের লোকদের সুখ বা শান্তি নীচের লোকরাই দিতে পারে। বক্তব্যের বোঝাটা ছবিতে এমনিতেই একটু বেশি যা নেপথ্য গানে (লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরারোপিত) ও সংলাপে বার বার ঘোষিত। তবু এই হিন্দী ছবিতে একটা গল্প আছে, তাও আবার অবৈধ সন্তান নিয়ে। এটাই বা কম কী!

শুটিং চলছে ...

"পরিণয়মঙ্গল" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে মিঠু মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

এবারে বৈশাখের প্রথম দিনে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে পরিণয়মঙ্গল ছবির শুভসূচনা হল। শুটিং শুরু হচ্ছে ফ্লোরে। ফ্লোরের এক ভাগ শুটিং জোন। এখানে দেখা যাচ্ছে কলাকুশলীরা রীতিমত ব্যস্ত। ট্রলি লাইন পাতা হয়েছে লম্বা করে। ট্রলির ওপর ক্যামেরা। ক্যামেরার এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে আসা চলছে। আলো করা হয়ে গেলে নায়িকার ডামি দাঁড় করান হল নির্দিষ্ট স্থানে। সাউনড-বুম সন্তর্পণে এগিয়ে আসে সকলের মাথার ওপর দিয়ে। স্থির হয়ে দাঁড়ায়। কোথাও কোন রকম ত্রুটি আছে কি না দেখে নেওয়া হয়। সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্র নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায় এসে উপস্থিত। পরিচালক যাত্রিক ওরফে দিলীপ মুখোপাধ্যায় দৃশ্যটি বুঝিয়ে দিলেন। কেমন করে তাঁকে ধীর পায়ে চলতে হবে। কখন তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হবে। কিরকম হবে তাঁর চাহনি। মিঠু ধীরে ধীরে চরিত্রের মধ্যে সমর্পণ করলেন নিজেকে। দেয়ালে টাঙান মা-র বাঁধান ছবির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তাঁর চোখের পাতা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। অতীত তাঁকে টানছে। 'মা-র কথা খুব মনে পড়ছে আমার!' সংলাপ উচ্চারিত হয় নির্জনে। লাল রঙের রাউজ লাল-পাড় গরদের শাড়ি পরেছেন মিঠু। সদ্য স্নান করে আসবার পর স্নিগ্ধতা তাঁর চোখে মুখে। তাঁর টুকরো টুকরো কথায় হাসিতে ভরে উঠেছে গোটা পরিবেশ।

রাজ চিত্রের প্রথম ছবি 'পরিণয়মঙ্গল' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী থেকে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। আজকের মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। মিঠু মুখোপাধ্যায়ের বিপরীতে এ ছবির নায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সমি[illegible] ভঞ্জ। চিত্রগ্রহণ করছেন : অনিল গুপ্ত শিল্পনির্দেশক : সুবোধ দাস।

* * * *

এই ঘরের আয়নায়—একসঙ্গে অনেক গুলো মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কো[illegible] মুখ সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকের কোন [illegible] কোন অংশ স্পষ্ট। কিংবা টুকরো টুকরো অংশ মিলিয়ে একজন। বাবুমশাই। [illegible] দশকের কলকাতার এক বাবুমশা[illegible] তাঁর সারা গায়ে দামী আতরের গন্ধ ফিনফিনে ধুতি আর পাঞ্জাবীতে তিনি বে[illegible] আকর্ষণীয়। পাঞ্জাবীতে নানারকম কার[illegible] কার্য। জরিদার ধুতির কোঁচার তোড়া চু[illegible] করার ফলে ফুলঝাড়ি হয়ে আছে। পা[illegible] দাড়িতে আগুন [illegible]। [illegible] চলে সি[illegible]

শ্যুটিং চলছে : "বাবুমশাই" ছবির সেই দৃশ্যে অনুপকুমার, মহুয়া রায়চৌধুরী, গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো : দেশ

করে সিঁদুর পরেছেন, টকটকে লালরঙের দামী বেনারসী তাঁর অঙ্গে। মুখে প্রসাধনের বাহুল্যতা চোখে পড়ে না। কখনও তিনি উচ্ছল। কখনও তিনি সহজভাবে কথা বলছেন। কখনও বা অভিমানে বিক্ষিপ্ত। বাড়ির পুরাতন ভৃত্য নফর তাঁকে বুঝতে পারে। একটু দূর থেকে সে তাঁকে লক্ষ্য করে। কাছাকাছি আসতে পারে না। শত হলেও সে ভৃত্য। কিন্তু আজ সে এক অপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি। বাবুমশাইয়ের কাছে যদিও এটা প্রত্যাশিত। এমন আত্মভোলা পরোপকারী মানুষ, নফর জীবনে কমই দেখেছে। তাঁর স্নেহের ভালবাসার ছায়ায় ছায়ায় কাটিয়ে দিতে চায় ইহকাল। পরকালের কথা সে ভাবে না। নফরের নতুন পরিচয়, বাবুমশাইয়ের ছোট্ট ভাই। এবার ঐ মেয়েটির কি হবে। পাথরের মূর্তির মত স্থির। কথা বলতে গেলে যার ঠোঁট নড়ে,—কিছুই বলতে পারে না, শুধু কাঁদে। বিপর্যয়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে সে কাঁদবে না ত কি করবে। ওর নাম রানী। বাবা নেই মা নেই, নেই সাতকুলে কেউ। ওকে এ বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছেন বাবুমশাই। কে ওর দেখাশোনা করবে? ভার পড়ল নফরের ওপর।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ঢুকে বাঁ দিকে ফ্লোরে পরিচালক সলিল দত্ত'র 'বাবুমশাই' ছবির গল্প এখন এখানে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (বাবুমশাই), নবাগতা গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় (বউরানী), অনুপকুমার (নফর) এবং মহুয়া রায়চৌধুরী (রানী)—ত্রিশ দশকের পটভূমিকায় নির্মিত জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের সেটে সংলাপে অভিব্যক্তিতে সংবদ্ধ হয়ে আছেন। ক্যামেরার পজিশন দ্রুত পরিবর্তন করা হচ্ছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দৃশ্যটি প্রায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

শ্যুটিং-এর অবসরে নবাগতা গায়ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গায়ত্রী বলছেন, 'ছোটবেলা থেকে অভিনয়ের শখ ছিল। তেমন সুযোগ-সুবিধে হয়নি। বলতে পারেন হঠাৎ-ই সিনেমায় অভিনয় করতে এসে গেলাম। স্ক্রীন টেসট হবার সময় ভীষণ নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু প্রথম দিন শ্যুটিং করতে এসে সেরকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। বরং স্বাচ্ছন্দে অভিনয় করেছি।...অভিনয়ের সংজ্ঞা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে আমার কাছে সেটা স্বাভাবিক। চরিত্র বুঝে নিয়ে যা স্বাভাবিক তাই করি।...প্রথম ছবি রিলিজ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমাকে দেখতে হবে দর্শকরা কিভাবে গ্রহণ করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দর্শকরা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবেন না।...আমি পরিচালকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তিনি আমাকে যেভাবে করতে বলছেন করছি। অন্তত করবার চেষ্টা করছি। আমি সফল হলে কৃতিত্ব তাঁর অনেকখানি পাওনা।...আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি কাজে।'

প্রতিভা ক্রিয়েশনস-এর এ ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সামনের মাসে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে প্রাচীন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে। বিমল মিত্রের কাহিনী থেকে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সুরকার মান্না দে। চিত্রগ্রাহক : বিজয় ঘোষ। শিল্পনির্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী। চিত্র সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন : বসন্ত চৌধুরী, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন দাস, অলকা গাঙ্গুলী, দীপ্তি রায়, দিলীপ বসু এবং ছায়া দেবী।

* * * *

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর একটি ফ্লোর আপাতত ত্রিশ সালের পটভূমিকায় একটি বিচারকক্ষে রূপান্তরিত। ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়। মহাজন গোবিন্দ সরদারকে খুন করবার অভিযোগে ঘিনুয়ার বিচার হচ্ছে। ঘিনুয়া, সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত। বলিষ্ঠ যুবক। সে একজন ভাল শিকারী। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো তার নিত্যনৈমিত্তিক। অল্প কিছুদিন আগে 'ডুংরী'কে বিয়ে করেছে।

মৃণাল সেনের রঙীন হিন্দী ছবির একটি দৃশ্যে রবার্ট রাইট ও শেখর চট্টোপাধ্যায়
ফটো—দেশ

'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) ছবিতে দীপংকর দে, আরতি ভট্টাচার্য ও অনুপকুমার

একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সে। ঘিনুয়ার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। তার মনে পড়ছে মহাজনের বিকৃত মুখ। মহাজনের দৌড়। মহাজনের অত্যাচার। ডিসট্রিক্ট কমিশনার সাহেব তাকে ভালবাসে কেননা, ঘিনুয়া প্রথম শ্রেণীর শিকারী। কিন্তু এখন সে সাহায্য করতে পারে না। কারণ ঘিনুয়া খুনী। ঘিনুয়া তীব্র স্বরে বলতে থাকে—'সাহেব, তুমি ও একদিন বলেছিলে জঙ্গলের ভয়ানক জন্তু-জানোয়ার শিকার করে আনতে, পুরস্কার দেব। আমি এনেছি, এই জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ানক জানোয়ার শিকার করে এনেছি।' পাবলিক প্রসিকিউটর বাধা দেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই, মহাজন গোবিন্দ সরদারকে কোনক্রমে জানোয়ার বলা চলবে না। স্বীকার করতে হবে সে মানুষ খুন করেছে। প্রসঙ্গত ডিকট্রিকট কমিশনার ও পাবলিক প্রসিকিউটর মুখোমুখি। পরিচালক মৃণাল সেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি 'শট' 'টেক' করলেন। কখনও ক্যামেরা স্থান পরিবর্তন করছে। কখনও শিল্পীরা। উপর্যুপরি কয়েক দিন ধরে শুটিং চলছে। এই দৃশ্যে, ডিসট্রিকট কমিশনার ও পাবলিক প্রসিকিউটর, চরিত্র দুটি রূপায়িত করছেন রবার্ট রাইট ও শেখর চট্টোপাধ্যায়। মিঃ রাইট এ দেশে এসেছেন ক' মাস আগে। ঘটনাচক্রে ছবিতে অভিনয় করছেন। এবং তাঁর স্ত্রীও, ডিসট্রিকট কমিশনারের স্ত্রীর ভূমিকায়। জানা গেল, এ পর্যায়ের কাজ শেষ হলেই শুটিং মোটামুটি শেষ। শ্রীসেনের প্রথম রঙিন হিন্দী ছবি। ছবির নাম এখনও পাকাপাকি হয়নি। ভাবা হয়েছে 'মৃগয়া'। প্রধান চরিত্র ঘিনুয়া, রূপ দিচ্ছেন পুনা ফিলম অ্যানড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রত্যাগত স্নাতক মিঠুন চক্রবর্তী। ডুংরী : মমতাশংকর। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে শতাধিক শিল্পী। উল্লেখ-যোগ্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সজল রায়-চৌধুরী, রেণু রায়চৌধুরী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ননী গাঙ্গুলী, গীতা কর্মকার এবং অনুপকুমার। আলোকচিত্রশিল্পী: কে কে মহাজন। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবতীচরণ পানিগ্রাহীর রচনা থেকে চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালক মৃণাল সেনের।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

বোমবাইয়ের ভবন [illegible] রুনা লয়লার প্রথম অনুষ্ঠানে, পরে [illegible] হলে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে [illegible] উপস্থিতি এবং প্রথম ভারতীয় ছবিতে [illegible] গান রেকর্ডিং উপলক্ষে লতার অভি[illegible] জ্ঞাপন প্রভৃতি ব্যাপারগুলো উ[illegible]যোগ্য। সংগীত জগতে নবাগতদের আবির্ভাব সম্পর্কে লতা খুবই নিস্পৃহ [illegible] শোনা গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের না[illegible] প্লেব্যাক গায়িকা বাণী জয়রাম তো [illegible] অভিযোগ করেন যে লতার কোপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি হিন্দি চিত্রজগত ছাড়লেন।

লতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে সেটা এবার খণ্ডন হতে পারে। তাছাড়া ভারতে আসার আগে রুনা গায়িকা হিসেবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন। এখন হালচাল দেখে মনে হচ্ছে লতার সৌপ্রমেসীতে যদি সামান্যতম আঘাতও কেউ হানতে পারে তবে সে হলো রুনা। লতার দিক থেকে বলা যায় উনি অনেক বড় হৃদয়ের অধিকারিণী।

রুনা কল্যাণজী আনন্দজীর সুরে

'আবির্ভাব' (পরিচালনা : অমিতাভ দাশগুপ্ত) ছবিতে জয়শ্রী রায়, তরুণকুমার

"এরা এক যুগ" (পরিচালনা : অর্চন চক্রবর্তী) ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

একটি হিন্দি ছবিতে দুটো গান গেয়েছেন। তারপর উনি ঢাকা চলে যান কিন্তু বোঝা যায় যে উনি শীগগীরই আবার ফিরছেন। ভারতে রুনার জনপ্রিয়তার জন্য বোমবাই টি ভি অনেকটা কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। বোমবাই টি ভি-তে ওঁকে বহুবার দেখা গেছে। জনসাধারণের চোখে পড়েন তখনই। কিন্তু রুনা যা লাভ করেছেন মাত্র দুটো স্টেজ কনসার্টে কেউ তা আশা করতে পারে না। তার কারণও আছে। মিষ্টি এবং তৈরী গলা ছাড়াও ওঁর মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার এক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। ওঁর চেহারার মধ্যে এমন আকর্ষণীয় ভাব রয়েছে যে লোকে মুগ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রুনা এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার প্লেব্যাক গান গেয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাষায়—বাংলা, সিনধি, পানজাবি এবং উরদু।

• • •

উনিশশো চৌত্রিশের 'দেবদাস' হিন্দি ফিলম জগতে সাড়া জাগিয়েছিল। নায়ক নায়িকারা ছিলেন সায়গল, চন্দ্রাবতী এবং যমুনা। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। 'দেবদাস' আবার ছবি হচ্ছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার। এবারের পরিচালক গুলজার, প্রযোজক কৈলাস চোপরা, নায়ক নায়িকারা হলেন ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী এবং শর্মিলা ঠাকুর। নায়িকাদের ওঁদের ইমেজের বিপরীত ভূমিকায় দেখা যাবে। হেমা পার্বতী, শর্মিলা চন্দ্রমুখী।

বড়ুয়া সাহেবের পর দ্বিতীয়বার 'দেবদাস' তৈরী করেন বিমল রায় আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে। সেবার হিরো ছিলেন দিলীপকুমার, সুচিত্রা সেন পার্বতী এবং বৈজয়ন্তীমালা চন্দ্রমুখী। ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য বৈজয়ন্তীমালাকে শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার ফিলম ফেয়ার পত্রিকা থেকে দেওয়া হয়। বৈজয়ন্তী পুরস্কার গ্রহণে অসম্মত হন। কারণ ওঁর মতে উনিই নায়িকা ছিলেন।

সুরঞ্জন

মে দিবসের অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের উদ্যোগে গত দু' বছরের মত এ-বছরও রবীন্দ্র সদনে মে দিবস উদ্যাপন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে যাঁরা শিল্পী ছিলেন তাঁরা কেউ পেশাদার নন, এই রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষ এবং তাঁদের পরিজনবর্গ, কিন্তু অনুষ্ঠান পরিবেশনায় যে কৃতিত্ব তাঁরা দেখিয়েছেন তাতে অনায়াসে তাঁদের স্থান করে দেওয়া যেতে পারে পেশাদার শিল্পীদের পাশে। অনুষ্ঠানে লোকগীতি এবং লোকনৃত্যের প্রাধান্য ছিল বেশি। লোকসংস্কৃতির আঞ্চলিক রূপটি অবিকৃত রূপেই পাওয়া গেছে শিল্পীদের কাছে। জলপাইগুড়ির শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন তন্মধ্যে লোকগীতি এবং মাছুয়া নৃত্য। দার্জিলিং-এর শিল্পীদের কাছে পাওয়া গেছে নেপালী গীত ও লোকনৃত্য, সেই সঙ্গে তাঁরা পরিবেশন করেছেন রাসলীলা এবং মাপ্‌প্রাজিয়া নৃত্য। পুরুলিয়ার শিল্পীরা দেখিয়েছেন তাঁদের বিখ্যাত ছৌ নৃত্য। হাওড়ার শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন গুজরাটি লোকনৃত্য এবং তাপসী নৃত্য-নাট্য। কাওয়ালী গানের আসর বসিয়েছিলেন চব্বিশ পরগণার শিল্পীরা। নজরুলের গান পরিবেশনের দায়িত্বও নিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের একটি অংশ যন্ত্রসংগীতও শুনিয়েছেন। কলকাতার শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন লোকগীতি এবং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানের সঙ্গে নাচ। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধন সংগীত গেয়ে শোনান বর্ধমানের শিল্পীরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে নৃত্য সহযোগে মে দিবসের গান পরিবেশন করেন চব্বিশ পরগণার শিল্পীরা। পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলার শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র এবারের আসরে অনুপস্থিত ছিল। আগামী বছরে তাঁদেরও দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। পৌরোহিত্য করেন শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য।

"বনশ্রী বাসু" (পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

গীতবিতান শিক্ষায়তন

কাশিমবাজার রাজবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এবার সম্পন্ন হল গীতবিতান শিক্ষায়তনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব এবং সমাবর্তন সভা। এই উপলক্ষে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানের প্রথম সন্ধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যগীত পরিবেশিত হল। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতে ছিলেন সর্বাণী সেন-গুপ্ত, অদিতি বসু, মিতালি বিশ্বাস, স্বপ্না রায় এবং প্রবাল দাস। শেষোক্ত শিল্পীর 'দেবতা জেনে দূরে' মনে দাগ কাটে। শুদ্ধ কল্যাণে খেয়াল গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেন কেকা সেনগুপ্ত। মধুমিতা ভট্টাচার্যের ভরত-নাট্যম এবং মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেষিত হিমাংশু দত্তের গানও উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। রঞ্জিত নন্দী এবং প্রণব সেনের পরিচালনায় সম্মেলক গীটার বাদন একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। সম্মেলক লোকনৃত্যেও প্রশংসনীয় অনুশীলনীর পরিচয় ছিল। একক নৃত্যে মণিপুরি নাচে অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর। রীণা মুখোপাধ্যায় যে একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় শিল্পী তার প্রমাণ ছিল 'বসন্ত তার গান লিখে যায়' গানের স্বচ্ছন্দ পরিবেশনায়।

আনন্দবর্ধন

নজরুলগীতির একক আসর

এলাম, দেখলাম, জয় করলাম ব্যাপারটা এমন চমকপ্রদ নয়। দিলীপ চক্রবর্তী চমক দেখাবার চেষ্টায় চতুর কোন মতলব নিয়ে গান শোনাতে হাজির হয়েছিলেন এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই। তবে তাঁর যত্ন ছিল, আন্তরিকতা ছিল—নজরুল গীতির

"দম্পতি" (পরিচালনা : অনিল ঘোষ) ছবিতে মালা সিন্‌হা

আঙ্গিক ও স্বভাব আপন ক্ষমতা অনুসারে অনুধাবন করার আগ্রহ ছিল। ডমরুপানি সঙ্গীত সংস্থার উদ্যোগে রামমোহন মঞ্চে তাঁর একক অনুষ্ঠানে আগ্রহ ছাড়া আরও যে লক্ষণটি প্রকাশ পেল তা গায়কের দুঃসাহস। গলা কিছুটা খারাপ থাকা সত্ত্বেও সাহস করে নানান ধাঁচের গান বেছে নিয়ে-ছিলেন। আঠারোখানি গানের অনেক-গুলিতে তাঁর সে সাহস ফলবতী হয়েছে। দুজন তবলিয়া তারক সাহা এবং স্বপন মুখোপাধ্যায় তাঁকে পালা করে সাহায্য করেন। প্রথম জন সুস্থির, দ্বিতীয় চঞ্চল। একের মাত্রাজ্ঞান ছিল, অন্যের আতিশয্য। গানগুলির মাঝে মাঝে গদ্যে গানগুলির মূল লক্ষ্য ও প্রাসঙ্গিকতার বর্ণনা করার ভার নিয়েছিলেন অরুণাভ গাঙ্গুলী। তাঁর পঠনরীতি সত্যিই গদ্য জাতীয়—সব ক্ষেত্রে গদ্যেও যে কাব্যময়তার অপরিহার্য শর্ত আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না।

—সুররসিক

দরবার মিউজিক সারকল

দরবার মিউজিক সারকলের অনুষ্ঠান। গান গাইছেন সুনন্দা পট্টনায়ক। রাগ মালগুঞ্জি। বিশাল বিস্তার, ঝলমলে তান, বিচিত্র লয়—সুতরাং গান জমতে দেরী হল না। আরও মজা এনেছিলেন তবলিয়া সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। নিজে কোথাও দাপা-দাপি করলেন না। বরং ঠিক ঠিক মাপজোক রেখে গায়িকার পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ আর কলাবতীর কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন। মনোরঞ্জন গানের কায়দা কানুন ভালই রপ্ত করেছেন—তান লয়ের নানান কার-সাজিতে তাঁর গলা খোলে ভাল। সবচেয়ে আশার কথা তাঁর পরিবেশনার ঢংটিতে মৌলিকতার ছাপ আছে। তাঁর কলাবতীর দ্রুত একতালের বন্দীশটি এখনও কানে লেগে আছে। সোহনলাল শর্মা হারমোনিয়মে তোফা সঙ্গত করলেন—কিন্তু সঙ্গতের মূল দায়িত্ব ছিল যাঁর ওপর তিনি, অর্থাৎ, সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলাকে বেখাপ্পা রকম খেপিয়ে তুলে-ছিলেন। অথচ অন্য আর এক তরুণ তবলিয়া অরুণ ঘোষাল শঙ্কর ঘোষালের ললিত পঞ্চম রাগটিকে যথোচিত সমীহ করে চলতে পারলেন। গায়কের গায়ন-রীতি বনেদী আভিজাত্যের দাবি করতে পারে। মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায় ও রেখা চট্টোপাধ্যায় দুজনে মিলে আভোগী কানাড়া শুনিয়ে-ছিলেন। তুলনায় মঞ্জুশ্রী পরিণত, যদিও স্বরচ্যুতি এবং পুনরাবৃত্তি ইত্যাদির দোষে অনুষ্ঠানটি অসম থেকে যায়। সেদিন আর যাঁরা গান শোনালেন তাঁরা হলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমরনাথ পশুপতিনাথ। সোহনলাল শর্মা হারমোনিয়মে বাজিয়ে-ছিলেন হংসধ্বনি। যেমনি পাকা হাত, তেমনি তাঁর রসবোধ—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। তবলা ধরেছিলেন শ্যামল বসু—ব্যস, সোহনলালের আর কিছু ভাবনা ছিল না।

—সুররসিক

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৫১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে			
(জাহাজ ডাকে)	১১১·০০ টাকা	৬৯·৫০ টাকা	x
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

ল্যাকমে
এক্সাটিকা
ট্যাল্ক
এক্সাটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাকমে

কামাকড় যে
কি তাড়াতাড়ি
বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!
ফিনিট
ছড়ান বাড়ীতে
নিয়মিতভাবে,
বাড়ী পোকামাকড়
মুক্ত করুন, নিরাপদ
অথচ নিশ্চিতভাবে!
ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা'
ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
উড়ন্ত পোকামাকড়—
মাছি, মশা, পতঙ্গ, ডাঁশ আর ভীমরুলের জন্যে। বন্ধ ঘরে ফিনিট স্প্রে করুন যতক্ষণ না ঘর কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। ১৫ মিনিট পরে ঘর খুলে দিন।
বুকেহাঁটা পোকামাকড়—আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, ডানাহীন মাছি, কেন্নো-বিছে, এঁটুলি, "সিলভার ফিশ"-এর জন্যে।
যেখানে সম্ভব সোজাসুজি স্প্রে করুন। যেসিন নর্দমা থেকে নিয়ে সম্ভব মত সমস্ত লুকোবার জায়গায় স্প্রে করুন। সপ্তাহে একবার কি দুবার স্প্রে করবেন।
মনে রাখবেন, ফিনিট টিনের গায়ে আরও তথ্য দেওয়া আছে। সেগুলি নিশ্চয় করে পড়ে নেবেন।
মনে রাখবেন, পোকামাকড় শুধু বিরক্তিকর নয়, নানান রোগও ছড়ায়। ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন।
FINIT
HOUSEHOLD
insecticide
FOR FLYING - CRAWLING INSECTS
POISON
HP
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
NET CONTENTS 1 LITRE
বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী ফিনিট বহু উদ্দেশ্যসাধক কীটনাশক—মাছি, মশা, আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী!
অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক ফিনিট। মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা:
ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন!
নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!
HP
হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড
CMHPF-3-244-Ben

সাধনা
দশন
সাধনা
টুথ পেষ্ট
সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
শাখা ভারতের সর্বত্র
Sadhana

একমাত্র ওডোমস সুনিশ্চিত ২-ভাবে আপনাকে মশার কামড় থেকে রক্ষা করে

রাতে নিশ্চিন্তে আরামে ঘুমোতে আপনাকে সাহায্য করে।

ওডোমসের মত অন্য কোন মশা তাড়াবার জিনিষ
আপনাকে মশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না:

এর গন্ধ পেলেই মশা পালায়

এর অদ্বিতীয় উপাদান আপনার গায়ে মশা
বসতে দেয় না—সারা রাত।

ওডোমস আজ সারা ভারতময় সবচেয়ে বেশী
কাটতির মশা তাড়াবার জিনিষ তাতে
আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

মশা আসার আগেই ঘরে

ওডোমস

কিনে রাখুন

CHAITRA-BLS-86 BEN

জ্যোতির্ময়ী দেবীর
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

সোনা রূপা নয়

।। কুড়ি টাকা ।।

প্রবোধকুমার সান্যালের
আত্মস্মৃতিচারণ

বনস্পতির বৈঠক

দুই খণ্ড—৩৮,

নির্মলকুমারী মহলানবিশের
রবীন্দ্রজীবনের শেষ অধ্যায়

বাইশে শ্রাবণ ৬,

অনুরূপা দেবীর

মন্ত্রশক্তি ৭,
জ্যোতিঃ হারা ৭,

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

লীলাভূমি ৫,

সমথনাথ ঘোষের

নীলাঞ্জনা ৯,
বাঁকা স্রোত ৬॥

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

গান্ধী পরিক্রমা ১২॥

জরাসন্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি

নিঃসঙ্গ পথিক দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৩৬,

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
সাহিত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল

স্বর্গাদপি গরীয়সী

১ম—৬॥০, ২য়—৫, ৩য়—৮,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কলকাতার কাছেই

।। নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ।।
লাইব্রেরী সংস্করণ—১৮, ; পেপার ব্যাক—৬

উপকণ্ঠে

লাইব্রেরী সংস্করণ—২৫, ; পেপার ব্যাক—১০,

ছাত্রদের উপযোগী ও চিরকালের সঙ্গী
শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্পসংকলন
প্রমথনাথ বিশী : প্রণয় কুণ্ড সম্পাদিত

গল্প-বিতান ৫॥

১৩৮৩ কেমন যাবে ও বর্ষফল পঞ্জিকা

ভৃগুজাতকের সাধনার ফল
মধ্যে যাঁরা অর্ডার দিয়ে বিফল হয়েছেন, তাঁদের জন্য
আবার কিছু বই পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। চার টাকা

[প্রবীণ অধ্যাপকদের লিখিত বিস্তৃত আলোচনা সহ]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরণ্যক

অন্নদাশঙ্করের

পথে প্রবাসে

।। সাত টাকা ● (সুলভ সংস্করণ) বর্তমান মূল্য তিন টাকা ।।

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

(সি ৩১৮১৮)

সূচীপত্র

ল্যাকটোজেন

মিল্ক সিরিয়াল

শিশুদের উপযোগী
স্বয়ংসম্পূর্ণ পুষ্টিকর
একমাত্র
শক্ত আহার

তিনমাস বয়সের পর থেকে আপনার শিশুকে একবার দুধের বদলে ল্যাকটোজেন মিল্ক সিরিয়াল খাওয়ানো শুরু করুন, যখন আর কোন শক্ত আহার আপনার শিশুকে খাওয়ানো যায় না, এই শিশুখাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সব রকমে পুষ্টিকর—এতে আছে বিশুদ্ধ ঘন দুধ, শস্যদ্রব্য আর চিনি এবং এগুলি এমনভাবে মেশানো যাতে আপনার শিশু প্রয়োজন মত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় পদার্থ পেতে পারে।
আরও আছে বহুবিধ ভিটামিন, খনিজ লবণ ও লৌহ।
তৈরী করাও সহজ—রান্নার ঝকমারি নেই। সুন্দর এর স্বাদ ও গন্ধ।
আপনি নিজেই একবার পরখ করে দেখুন না।

দুধ, চিনি, শস্যদ্রব্য আপনি একাধারেই পাচ্ছেন, আপনি শুধু যোগ করবেন একটু জল—আহার প্রস্তুত।

Nestlé cares

LMCC-11 BEN

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ সুনীলমাধব সেন

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ 'ক্লাউন' (১৩"×২১" টেম্পারা, বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে) সুনীলমাধবের ছবির রূপারোপ, রেখার ছন্দ এবং রঙ সর্বদা চোখকে টেনে নেয়। এখানে সার্কাসে ক্লাউনকে মজাদার ক'রে উপস্থিত করাই তাঁর লক্ষ্য। বিশেষত গোল চোখের নিষ্পাপ সারল্য এবং গোঁফজোড়ার ভারিক্কি চালটা লক্ষ করার মতো। পায়ের মধ্যে আছে নৃত্যের তাল। প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে লাল, সবুজ আর হলুদ রঙ। আরো কিছু সম্পূরক ও বিপরীত বর্ণ রেখা আর বিন্দুর মতো করে ছড়ানো। নাগরা, জামা, ঘাঘরা সব কিছু অতি যত্নের সঙ্গে এঁকে জমিয়ে তুলেছেন ছবিটাকে।

সম্পাদকীয়

৪৩ বর্ষ ॥ ৩২ সংখ্যা
শনিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

ভোটাধিকারীর বয়স

ভোটাধিকারী হতে হলে ন্যূনতম কত বয়স হওয়া দরকার? প্রচলিত নির্বাচন আইন অনুযায়ী একুশ বছর বয়স হলেই ব্যক্তির ভোট দেবার অধিকার এসে যাবে। প্রায় পাঁচ বছর আগে, উনিশশো একাত্তর সালের শেষাশেষি নভেম্বর লোকসভাতে সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়েছিল যে, ভোটাধিকারী হবার বয়স আরও কম করে নির্দেশিত করা হবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলতে আঠার বছর ও তার বেশী বয়সের ব্যক্তির ভোটাধিকার বোঝাবে। সরল করে বলা চলে, সরকারের ঘোষিত নীতির বাণীতে বলা হয়েছিল যে, আঠারো বছর বয়স হলেই ব্যক্তি ভোট দেবার অধিকারী বলে বিবেচিত হবে। বিস্ময়ের বিষয়, সেই ঘোষণার প্রায় পাঁচ বছর পরে আজ সরকার আবার ঘোষণা করেছেন যে, ভোটাধিকারী হবার বয়সের মাত্রা কম করা, অর্থাৎ একুশ থেকে আঠারোতে পরিণত ও নির্দিষ্ট করা সম্ভব হবে না। সরকার তাঁর ঘোষিত অঙ্গীকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই মত-পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্যের যে বিবরণ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, ভোটাধিকারের নিম্নমাত্রার বয়স আঠারো বছর নির্দিষ্ট করবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে সরকার দেখেছেন যে, এর ফলে নির্বাচনের আয়োজন ও ব্যবস্থার জন্য প্রবন্ধতার দরকার হবে যে, কার্যত সেটা অত্যন্ত বিপুলভারের একটি উদ্যম হয়ে দাঁড়াবে। অতিরিক্ত প্রায় তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ভোটারের জন্য মতদানের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করতে হবে, বস্তুত যেটা একটা দুরূহ রকমের সমস্যা। তা ছাড়া, সব রাজ্যের সরকার এক্ষেত্রে একমত হয়ে ভোটারের বয়সের মাত্রা কমিয়ে দেবার ওই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারেননি।

মানবীয় জীবনের বাস্তব সত্যের নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী বিচার করে প্রশ্ন করা চলে, সাধারণভাবে যোগ্যতার বয়স বলে বিশেষ একটি বয়স চিহ্নিত হতে পারে কি? কায়িক পূর্ণতা ও পরিণত অবস্থা যে বয়সের অবদান, একমাত্র সেই বয়সটা সব ক্ষেত্রের সব যোগ্যতার সমুচিত বয়স নিশ্চয়ই হতে পারে না। কর্তব্যবিশেষে ব্যক্তির যোগ্যতা ও প্রতিভার যথার্থ বিকাশের বয়স বিশেষিত হয়ে থাকে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারীর যোগ্যতার কাছ থেকে এইটুকু আশা করবার সঙ্গত ও সার্থক যুক্তি আছে যে, দেশের ও জাতির জীবন, সুখ-দুঃখ ও স্বত্ব-নিয়মের ভাল-মন্দ রূপ ও বিষয়ের পরিচয় বিচার করে বুঝবার মত মানসিক বিজ্ঞতা তার থাকবে। এ হেন বিজ্ঞতার সার্থক বয়স কি একুশ বছরের চেয়ে কম হতে পারে? তরুণ সমাজের মানসিক যোগ্যতার ও উৎকর্ষের অনেক পরিচয় এদেশের ক্ষেত্রে প্রকট হতে দেখা গেলেও এমন প্রশ্নের পক্ষে সদ্যুক্তি আছে যে, আঠারো বছর বয়সের তরুণ ব্যক্তির মনের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সত্যের বিচার ও নাগরিক বিজ্ঞতা কি সত্যই যথার্থ বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠ? এবং বলিষ্ঠ হলেও কি সেটা তার নিজেরই জীবনের পরবর্তী কালের বিচারবুদ্ধির তুলনায় কম বলিষ্ঠ নয়? গণপ্রতিনিধিদের নাম করে অত্যুৎসাহের বাগাড়ম্বরতা এতটা বেপরোয়া হতে পারে না, যার ফলে এক-একটি সাধারণ নির্বাচনের পরিণাম জাতির পক্ষে বস্তুত একটা ভাগ্যের বাধা হয়ে উঠতে পারে। তরুণ বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ সম্পর্কে প্রশংসিত করেও এই সত্য স্বীকার করতে হয় যে, প্রৌঢ়-প্রবীণের বিচারবুদ্ধি গুণে-মানে নিকৃষ্ট নয়। বিশ্ব-জীবনের অভিজ্ঞতাও ঠিক করে রয়েছে যে, জ্ঞানের বিচক্ষণতা, সেটা সর্বতোভাবে প্রবীণ-প্রতিভার দান না হলেও প্রধান দান। গবেষক বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক শিল্পী এবং বিদ্যাবত্তার ও কারু-কীর্তির অধিকারী জ্ঞানবানের বেশির ভাগই হলো প্রৌঢ় বিজ্ঞতার প্রতিনিধি মানুষ। সিপাহী বিদ্রোহ নামক রাজনৈতিক-সামরিক বিদ্রোহ-নামক কর্মকাণ্ডের বেশীর ভাগ কর্মী ছিলেন তরুণ বয়সের সিপাহী। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যোদ্ধৃগুণে তরুণ সৈনিকই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সামরিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আজও দেখা যায় যে, পলিতকেশ বয়স্কের যোগ্যতা এবং বিজ্ঞতার মান, প্রতিভা ও কৃতিত্বের মান উচ্চতর। আশি বছর বয়সের বাবু কুনোয়ার সিং স্বয়ং বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীর পরিচালনা প্রত্যক্ষভাবে পালন করতে যেমন সক্ষম ছিলেন, তেমনই আধুনিক কালেও দেখা যায় যে, সামরিক কর্তব্যের পুরোভাগে বয়স্কের প্রতিভা তরুণের প্রতিভার তুলনায় বেশী কাজ করতে সক্ষম। শেলি-কীটস্ তরুণ বয়সেই বড় কবি হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ফাউস্টের রচয়িতা প্রবীণ গ্যেটে এবং প্রায়-বৃদ্ধ উপন্যাস-লেখক ভিক্টর হুগো সাহিত্য-কীর্তিতে মহান্ প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

কথিত আছে যে, কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন তাঁর পুত্র গৌতম-বুদ্ধকে এই শর্তে রাজ্যের ভিতরে নূতন ধর্ম প্রচারের অধিকার দিয়েছিলেন যে, গৌতম-বুদ্ধ কখনও একুশ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে ভিক্ষু-ব্রতে দীক্ষা দিতে পারবে না। ধারণা করতে হয় যে, রাজা শুদ্ধোদন একুশ বছর বয়সটিকে পরিণত বিচারবুদ্ধির ন্যূনতম বয়স বলে মনে করতেন। যাঁরা আঠারো বছর বয়সের ব্যক্তিকে ভোটের অধিকারী হতে দেবার নিয়ম পছন্দ করেন না, তাঁদের সামাজিক অপ্রগতির নিদারুণ প্রতিনিধি বলে মনে করবার কোন যুক্তি নেই। নির্বাচনে ভোট দেওয়া সরল অর্থে এবং গূঢ় অর্থে সামান্য কর্তব্যের ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে তরুণের অভ্যুদয় নামে কোন কাঙ্ক্ষণীয় আদর্শের প্রশ্রয় থাকতে পারে না, থাকলেও বুঝতে হবে যে, একুশ বছর বয়সটা অন্তত তারুণ্যেরই বয়স। এর চেয়ে কম বয়সের তারুণ্য অন্যক্ষেত্রে যতই মর্যাদা অর্জন ও গ্রহণ করুক না কেন, নির্বাচনের মধ্যে তার প্রবেশ না থাকলেও গণতন্ত্রের কোন সৌষ্ঠব বিকৃত হবে না। এ সত্য তরুণেরাও উপলব্ধি করেন যে, চিন্তা ও বিচারশক্তির গায়ে মাংসপেশী নেই, সুতরাং বয়সে প্রৌঢ় হলেও ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধির বলিষ্ঠতার কোন সঙ্কোচন হয় না।

এই সপ্তাহে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী চবন সংসদে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, কানাডা সরকার ভারত ও কানাডার মধ্যে দুই দশকের পারমাণবিক সহযোগিতা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ার একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়েছেন। কানাডা সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত সেখানকার সংসদে ঘোষিত হয়েছে ১৮ই মে যেদিন পারমাণবিক শক্তি হিসাবে ভারতের বয়স দু বছর পূর্ণ হল। রাজস্থানের পোখরানে ভারতের সফল পারমাণবিক পরীক্ষার তারিখ ১৮ই মে ১৯৭৪ তারিখের মিল থেকেই বোঝা যায়, চুক্তি রদের প্রকৃত কারণ রাজস্থানের পারমাণবিক পরীক্ষা।

নয়াদিল্লিতে কানাডার হাই কমিশনার ১৮ই মে তারিখেই চবনকে তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত জানান। দু দিন পরে সংসদে তাঁর বিবৃতিতে চবন বলেন, কানাডা সরকারের এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক। ভারত সরকার কানাডার কাছে নতুন কোন সহযোগিতার প্রত্যাশা করেননি, তাঁরা চেয়েছিলেন ১৯৬৩ ও ১৯৬৮ সালের দুটি চুক্তিতে কানাডা যে-সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই সহযোগিতা যেন বন্ধ না হয়। কিন্তু কানাডা সরকার সেই চুক্তিমাফিক দায়িত্ব পালনেও অস্বীকৃত হয়েছেন।

১৯৭৪-এর পারমাণবিক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কানাডা সরকার ভারতের সঙ্গে সব রকমের পরমাণু সহযোগিতা বন্ধ করেন। ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ কানাডাকে জানান, এই বিস্ফোরণে ভারত-কানাডা সহযোগিতা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হয়নি, কানাডা যে প্লুটোনিয়াম সরবরাহ করেছিল তা এই পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর কাছে এই বিষয়ে ভারতের নীতি ও বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন। তারপর প্রায় দু বছর ধরে নয়াদিল্লি ও অটোয়ার বিভিন্ন স্তরে এই সহযোগিতা পুনরারম্ভের জন্য আলোচনা হয়।

চবন তাঁর সংসদের বিবৃতিতে প্রকাশ করেছেন, মারচ মাসে নয়াদিল্লিতে দুই দেশের মধ্যে যে শেষ আলোচনা হয় তাতে একটি খসড়া চুক্তি অনুমোদিত হয়। স্থির হয় এই খসড়া চুক্তিতে দুই দেশের সরকার সম্মতি দিলে আবার সহযোগিতা আরম্ভ হবে। এই খসড়া চুক্তিতে কী ছিল তা চবন বলেননি। তবে নয়াদিল্লির এক রিপোরটে প্রকাশ, কানাডার সহযোগিতার মেয়াদ যতদিন শেষ না হয় ততদিন কোন পারমাণবিক পরীক্ষা না করতে ভারত সরকার রাজী হয়েছিলেন। খসড়া চুক্তিতে এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কানাডা সরকারের সহযোগিতা বন্ধের একতরফা সিদ্ধান্তে স্পষ্ট বোঝা যায়, কানাডার ইচ্ছা ভারত সরকার প্রকারান্তরে নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন চুক্তির (সংক্ষেপে এন পি টি-র) পক্ষপাতদুষ্ট শর্তগুলি মেনে নিন।

যে সব দেশের সঙ্গে কানাডার পারমাণবিক সহযোগিতার চুক্তি আছে পাকিস্তান তাদের অন্যতম। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো যখন অটোয়ায় যান তখন তাঁকে বলা হয় যে, কানাডার সাহায্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের কাজে যাতে ব্যবহৃত না হয় তার জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের প্রয়োজন। সফরের শেষে ভুট্টো ঘোষণা করেন এই রক্ষাকবচ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। করাচীর পারমাণবিক রিঅ্যাকটর প্রকল্পে কানাডা সহযোগিতা করছে।

কানাডার একতরফা সিদ্ধান্তের ফলে রাজস্থান ও মাদ্রাজের রিঅ্যাকটর প্রকল্পে ওই দেশের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। এই দুটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যাই যথেষ্ট। কানাডা সরকার বলেছেন, মাত্র একটি ক্ষেত্রেই সহযোগিতা বন্ধ হল। অন্যান্য বিষয়ে দুই দেশের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

মৌলানা ভাসানি শেষ পর্যন্ত ফরাক্কা অভিযান প্রত্যাহার করেছেন। তিনি সীমান্ত থেকে ছয় মাইল দূরে রাজশাহীর শিবগঞ্জ পর্যন্ত এসেছিলেন। সেখানে এক জনসভায় তিনি অভিযান প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন; তবে সঙ্গে সঙ্গে হুমকিও দিয়েছেন, ১৬ই আগস্টের মধ্যে ভারত যদি বাংলাদেশকে বেশী জল না দেয় তা হলে তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। তা ছাড়া বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যও বর্জন করবে।

অভিযান পরিত্যক্ত হওয়ায় ভারত সরকারের স্বস্তি বোধ স্বাভাবিক। তবে তাঁরা লক্ষ করেছেন যে গঙ্গার জল বণ্টন নিয়ে যখন দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে ঠিক সেই সময় বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রচারের ও মৌলানা ভাসানির ফরাক্কা অভিযান সংগঠনের প্রতিবাদ করে এবং দুই দেশের স্বার্থে এই সব প্রচার আবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে যে পত্র দেওয়া হয়েছিল তার কোন উত্তর ঢাকা থেকে পাওয়া যায়নি।

ইসলামাবাদে সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যে সব যুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলি ১৭ থেকে ২৭শে জুলাই-এর মধ্যে কার্যকর করা হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী চবন সংসদে বলেছেন, অ্যামবাসাডর বিনিময় ও অন্যান্য যোগসূত্র পুনঃস্থাপন প্রায় একসঙ্গে ওই এক সপ্তাহের মধ্যেই করা হবে।

কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া স্বর্ণ সিং-এর নেতৃত্বে যে সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করেছিলেন সেই কমিটি তার চূড়ান্ত রিপোরটে সুপারিশ করেছে যে সংবিধানের ভূমিকায় ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বদলে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হোক। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কমিটির খসড়া রিপোরট ও চূড়ান্ত রিপোরটে কিছু তফাত আছে, তবে দুটি রিপোরটেই বলা হয়েছে, ভারতের পক্ষে সংসদীয় ব্যবস্থাই সবচেয়ে উপযোগী এবং তার বদলে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু করার কোন যৌক্তিকতা নেই। স্বর্ণ সিং বলেছেন, রিপোরটটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিচার করে দেখবে এবং এই রিপোরটের ভিত্তিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেবে তা সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

স্বর্ণ সিং কমিটি অন্য যে সব সুপারিশ করেছে তাদের মধ্যে একটি হাই কোরটের রিট জারি করার ক্ষমতা সম্পর্কে। কমিটির খসড়া রিপোরটে এই ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু চূড়ান্ত রিপোরটে বলা হয়েছে, যেহেতু আমলাতান্ত্রিক বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে সংবিধানের এই ধারাটি নাগরিকের রক্ষাকবচ সে-হেতু হাই কোরটের রিট জারির ক্ষমতা সংকোচ করা হবে না। কমিটির আর একটি সুপারিশ হল, শিক্ষা ও কৃষিকে সংবিধানের রাজ্য-তালিকা থেকে যুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা।

২৪।৫।৭৬

শংকর ঘোষ

বদেশিকী

অঙ্গীকার

ফ্রাংকো মারা যাবার পর স্পেনে যা ছে তা নামে রাজতন্ত্র হলেও আসলে ফ্যাসিতন্ত্রেরই রকমফের। ফ্রাংকো মারা ন ১৯৭৫-এর ২০ নভেম্বর। দু দিন রই রাজার তখতে বসেন রাজকুমার জুয়ান র্লস। তিনি অবিশ্যি ২০ অক্টোবর থেকে স্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করে াসছিলেন। তবে সেটা নেহাতই একটা ইরের ঠাট। সরকার চালাচ্ছিলেন ফ্যাসিবাদী ইরা। এখনও তাঁরাই হর্তাকর্তা, সামনে াড়া রেখেছেন শিখণ্ডীর মতো রাজা প্রথম র্লস জুয়ানকে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী য়েছেন রাজার আমলে আরিয়াস নাভারো। স্পেনের ফ্যাসিবাদীদের সংগঠন জাতীয় আন্দোলনের নেতা হয়েছেন তিনিই ফ্রাংকোর জায়গায়। তিনি অবিশ্যি দু নম্বর ফ্রাংকো না—সে হিম্মত তাঁর নেই। তবে ক্ষমতা তিনিই কব্জা করেছেন, তিনি থাকতে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে স্পেন মুক্তি পাবে কিনা সন্দেহ। তাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা রে তিনি যদ্দিন বেঁচে থাকবেন তদ্দিন চালিয়ে যাবেন তা তিনি গোপন রাখেননি।

ফ্রাংকো বেঁচে থাকতে ফ্যাসিবিরোধীরা মাথা চাড়া দেওয়া দূরে থাকুক শক্ত একটা সংগঠনও গড়ে তুলতে পারেনি। তাদের নেতারা হয় ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থেকেছেন নয়তো দেশ ছেড়ে আস্তানা পেতেছেন বিদেশে। এখন তাঁরা আস্তে আস্তে মুখ খুলেছেন, বিক্ষোভ দেখাবার চেষ্টা করছেন, চেষ্টা করছেন লোককে তাতিয়ে তুলতে। সরকার তাঁদের কোনো কথা কানে তোলা দরকার মনে করছেন না, যাকেই সন্দেহ করছেন তাকেই জেলে পুরছেন, হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন বামপন্থীদের এই বলে যে ফ্রাংকোর সঙ্গে তাঁর ভাবধারা কবর দেওয়া হয়নি। কথাটা যে সত্যি তা বামপন্থীরা বিলক্ষণ জানে বিশেষ করে কম্যুনিস্টরা। এক পোষাকী রাজতন্ত্র ফিরে আসা ছাড়া স্পেনে কিছুই যে বদলায়নি তা তারা অস্বীকার করছে না। তবে একটা জিনিসের বদল হয়েছে—লোকের ভয় ভেঙেছে, ফ্যাসিবাদে। জাদু স্পেনে কেটে গেছে। লোকে তাই সোজাসুজি দাবি করছে যুগের হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অধিকার।

পুরোনো চাল যে পুরোপুরি আর চলবে না তা রাজা কার্লসও বুঝেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরিয়াস নাভারোও। তবে মত তাঁদের এক নয়। কার্লস বেশ জানেন এ যুগে সেকালের মতো যা খুশি তাই করার ক্ষমতা চাইবার মতো বোকামির কোনো মানে হয় না—শাহানশা বাদশা বনতে তিনি চানওনি। তিনি চান বিলেত-হল্যান্ডের মতো আইনের বাঁধনে আটকানো রাজা হতে। তা করতে গেলে দেশের নতুন সংবিধান চাই। চাই গণতন্ত্রী প্রশাসন। তাঁর ইচ্ছে স্পেনে তাই হোক, গণতান্ত্রিক হাওয়ায় লোকের গা জুড়োক—স্পেনে অনেকেই এখন তাই চায়। দেশে প্রজাতন্ত্র হোক আর নাই হোক গণতন্ত্র হলেই তারা খুশী হবে। তাতে রাজা থাকলেও তাদের আপত্তি নেই যদিও রাজভক্ত বড় একটা স্পেনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে লোকের ভাবটা হচ্ছে আগে তো জমানা পালটাক, গণতন্ত্রের আমেজ দেশের প্রশাসনে লাগুক তারপর দেখা যাবে রাজা আর রাজতন্ত্র থাকবে কী যাবে। এটা স্পষ্ট স্পেনের বেশির ভাগ লোকই আজ গণতন্ত্রের দিকে।

বাদে পুরোনো কট্টর ফ্যাসিবাদী ফ্রাংকোর চেলারা। তবে তারাও এটুকু বুঝছে গণতন্ত্রের ভেক ধরা ছাড়া তাদেরও বাঁচার পথ নেই। যারা ওদের মধ্যে একটু বুঝদার তারা প্রধানমন্ত্রী আরিয়াস নাভারোকে পরামর্শ দিয়েছে লোককে এই প্রতিশ্রুতি অন্তত দেওয়া হোক যে গণতান্ত্রিক সংবিধান একটা দেশে খুব শীগগিরই চালু হবে। গতিক যে সুবিধের নয় তা প্রধানমন্ত্রীও বুঝছেন। কিন্তু কারুর সঙ্গে পরামর্শ না করে ২৮ এপ্রিল তিনি যে ঘোষণা করেছেন তাতে তপ্ত তাওয়ায় তেল পড়েছে। না ডান না বাঁ কেউই তাতে খুশী হয়নি। সবাই চটেছে। উগ্রপন্থীরা তলে তলে তৈরি হচ্ছে একটা কান্ড বাধাবার জন্যে। আরিয়াস বলেছেন তিনটে কথা। এক, স্পেনে দোতলা আইনসভা তৈরি হবে। নিচের তলায় হবে আর পাঁচটা গণতন্ত্রের মতো নির্বাচন গোপন ব্যালটে, ভোট দেবার অধিকার থেকে কম্যুনিস্ট ছাড়া কাউকে বঞ্চিত করা হবে না। ওপর তলার জন্যে নির্বাচনের বন্দোবস্ত থাকবে না, সেখানকার সভ্যদের বাছাই করা হবে। দুই, দেশের একটা সুপ্রিম কোর্ট থাকবে। সেটা হবে মৌলিক অধিকারের রক্ষাকবচ। তিন, রাজা হবার যোগ্যতার বয়েস ৩০ থেকে কমিয়ে করা হবে আঠারো। মেয়েদেরও সিংহাসনে বসার অধিকার মেনে নেওয়া হবে নতুন বিধানে।

ঠিক হয়েছে এসব ব্যাপারে লোকে কী চায় তা জানবার জন্যে জনমত যাচাই করা হবে অক্টোবরে। তারপর আসছে বছর নির্বাচন হবে দেশজুড়ে লোকের যদি তাই মর্জি হয়। ধরতে গেলে এমন কিছু বলেননি আরিয়াস যার বিরুদ্ধে নীতিগত আপত্তি তোলা যায়। জনমত যাচাই তো উত্তম কথা, এর সঙ্গে স্বৈরাচারের কোনো সম্পর্ক নেই। আইনসভা হবে নির্বাচন মারফত, সে নির্বাচনে সাবালকরা ভোট দিতে পারবে। এতেই বা এত আপত্তি কিসের? আর রাজার ব্যাপারে যে নতুন নিয়ম করার কথা বলা হয়েছে তাতেও তো খুঁত ধরার কিছু নেই। অবিশ্যি ওর বয়ান তৈরি হয়েছে এমনভাবে যাতে রাজতন্ত্র নিয়ে টান না পড়ে। নইলে সোজাসুজি রাজা-রানী থাকা উচিত কিনা এ প্রশ্ন তুললে হয়তো লোকে সরাসরি না-ই বলে দিতো। রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যেই মনে হয় চালটা চালা হয়েছে। কিন্তু তা না হয় হলো। আরিয়াসের অন্য দুটো প্রস্তাব নিয়ে সোরগোল কিসের? কেন তা কী দক্ষিণপন্থী কী অকম্যুনিস্ট বামপন্থী কারুরই মনে ধরছে না?

কথাটা প্রস্তাবগুলোর ভালো মন্দ নিয়ে নয়, কথাটা উঠেছে গণভোট আর নির্বাচনের সময় নিয়ে। যারা বদল চায় তাদের আর তর সইছে না। রাজা চেয়েছিলেন গণভোট আর নির্বাচনের পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে। বামপন্থীরাও তাই চেয়েছিল। তারা অবিশ্যি রাজতন্ত্র বজায় রাখতে নারাজ। যারা উদার-নৈতিক তারাও তড়িঘড়ি নির্বাচনের পক্ষপাতী। উগ্র দক্ষিণপন্থীরা অবিশ্যি এসব কিছুই চায় না—তারা চায় বন্দুকের কুঁদো মেরে আর সঙীন উঁচিয়ে লোককে দাপটে শাসন করতে ফ্রাংকোর ঢঙে। যদি আরিয়াস দু' এক মাসের মধ্যে গণভোটের ব্যবস্থা করতেন তা হলে এত হইচই হতো না। সবাই নেমে পড়তো কোমর বেঁধে ভোটের লড়াইয়ে। এখন তার ছ' মাস বাকি। এই ছ' মাস কী যে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। যারা গোলমাল লাগাতে চায় তারা ছ' মাস সময় পেয়েছে। এই ছ' মাস ধরে তারা ঘোঁট পাকাবে। হয়তো শুরু হয়ে যাবে বাঁয়ের সঙ্গে দক্ষিণের লড়াই। পয়লা মে বামপন্থীরা হাঙ্গামা খানিকটা বাধিয়েছিল। তা অবিশ্যি বেশী দূর গড়ায়নি। কিন্তু বাঁধ যদি একবার ভেঙে যায় তা হলে কী আর নির্বাচন হবে স্পেনে?

দেবরাজ

আমার এই ছন্দহীন মেঘাচ্ছন্ন বিড়ম্বিত জীবনের আর এক অসংবদ্ধ পরিচ্ছেদ-কাহিনী রচনার পূর্বে সুরূপা প্রমদারূপা দিব্যাভরণভূষিতা দেবী পৃথিবীকে নতমস্তকে স্মরণ করি।

"ওঁ সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।
পৃথিবীমর্চয়ে দেবীং সর্বলোকধরাং ধরাম্ ॥"

হে উদাসীনা, হে বিচিত্রছলনাময়ী, তুমিই আমার প্রথম প্রণতি গ্রহণ করো।

—ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

আমাকে মনে পড়ে কী? সেই কতদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের তলায় ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের আদালতী কর্মক্ষেত্রে এক অপরিণতবুদ্ধি কৃশকায় বালকের সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। দেশ পত্রিকার পাতায় মধুসূদনদাদারূপী এক বিদেশী ব্যারিস্টারের গল্প শুনিয়ে সে নিজেকে ধন্য করেছিল। ছলনাময়ী এই পৃথিবীতে সেই তার প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপ।

তারপর আবার দেখা হয়েছিল আলোয়-আলোকিত চৌরঙ্গীর সুবৃহৎ শাজাহান হোটেলে। পরম সুহৃদ স্যাটা বোসের স্নেহপ্রশ্রয়ে নগর কলকাতার আর এক বিস্ময় তার হৃদয়ের ক্যামেরায় আলো-আঁধারিতে ধরা পড়েছিল। অনভিজ্ঞ অতিথির চোখের সামনে বিচিত্র মানব-মানবীর এক অন্তহীন শোভাযাত্রা সেদিন যেন কোনো কল্পলোক থেকে এই পৃথিবীতে অকস্মাৎ নেমে এসেছিল।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, সামান্য-সাদাসিধে সেই সামান্য সৌভাগ্যও স্থায়ী হলো না। হোটেলের চাকরি হারিয়ে, মধ্যরাতে জনহীন কলকাতার রাজপথে নেমে এসে সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় শংকর এই সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার পাতায় আপনাদের শেষ নমস্কার জানিয়েছিল।

শতাব্দীপ্রাচীন শাজাহান হোটেলের বহুবর্ণ নিয়ন-আলো তখনও আপন খেয়ালে জ্বলছে আর নিভছে—আর আমি ভাবছি, অতঃ কীম্? আমার না-আছে অর্থ, না-আছে বিদ্যা, না-আছে কোনো পরিচয়। আমার আপনজন নেই, আশ্রয়দাতাও নেই। এবার আমি কোথায় যাবো?

চাকরি এবং আশ্রয় এক সঙ্গে হারিয়ে সাময়িকভাবে বোধহয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। সান্ত্বনা ও সাহায্যের আশায় প্রথম ছুটেছিলাম সদানন্দ রোডে এক সচ্ছল আত্মীয়ের বাড়িতে। বাণিজ্যলক্ষ্মী সম্প্রতি আমার এই আত্মীয়ের প্রতি বিশেষ সদয়া হয়েছেন; শাজাহান হোটেলের ছোট ব্যাংকোয়েট রুমে কয়েকবার পার্টি দেবার ব্যাপারে তাঁকে আমি বিশেষ সাহায্য করেছি।

চামড়ার ব্যাগ ও সতরঞ্চি-মোড়া বিছানা হাতে তাঁর সুসজ্জিত গৃহে আমাকে প্রবেশ করতে দেখে এই আত্মীয় মনে মনে বিশেষ শঙ্কিত হলেন। শাজাহান হোটেল থেকে আমি বরখাস্ত হয়েছি জেনে তাঁর দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পেলো। সিগারেটে সুখটান দিয়ে বরফঠান্ডা কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, "এত ঘন ঘন তোমার চাকরি যায় কেন? [illegible]ার অ্যাজ আই নো, শাজাহান ইজ এ গুড্ প্লেস।" সিগারেট ফেলে ভদ্রলোক এবার তাঁর নিত্যসঙ্গী চাবির রিংটা ডান হাতের আঙুলে আপন মনে ঘোরাতে লাগলেন।

আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না-করেই শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "নিশ্চয় ওখানকার পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছিলে?" তাঁর পরবর্তী মন্তব্য : "বাঙালীদের ওই এক মহৎ দোষ! মন্দির থেকে শ্মশান পর্যন্ত এভরিহয়ার শুধু পলিটিক্স আর পলিটিক্স।" মৃদু একটি টেকুর তুলে তিনি উপদেশ দিলেন, "ওরে বাবা, জেনে রাখবে, পলিটিক্স থেকে হানড্রেড টাইমস পাওয়ারফুল আর একটা ফোর্স রয়েছেন, তার নাম ইকনমিকস। রাজনীতি উইদাউট অর্থনীতি ইজ লাইক রাইফেল উইদাউট বুলেট!"

আমার স্বল্পপরিসর কর্মজীবনে পলিটিক্সের নামগন্ধ ছিল না। এ কথা এই সন্দেহপ্রবণ আত্মীয়কে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না।

আমার মনের মধ্যে কয়েকদিনের আশ্রয় প্রার্থনার পরিকল্পনা রয়েছে তা আঁচ করে আত্মীয়মহোদয় দূরে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। সেই কাপ-ডিস আমার দিকে অবহেলাভরে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, "এই যে আমার বিজনেস দেখছো, সব আমি নিজের জোরে করেছি—কোনো আত্মীয়-স্বজন আমার জন্যে কুটোটি পর্যন্ত নাড়েনি। আমার ইকনমিকসের একটা প্রিন্সিপ্যাল হলো, বিজনেসে কোনো আত্মীয়-স্বজনকে না-নেওয়া।"

আমি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি। জীবনসংগ্রামে সম্মানিত এই আত্মীয়টি সদম্ভে নিজের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা শুরু করলেন, "এটা হলো বিলিতী স্টাইলের বিজনেস ফিলজফি।"

"সায়েবরা বুঝি ব্যবসায় আত্মীয়স্বজনদের দেখেন না?" আমি অসহায়ভাবে জানতে চেষ্টা করি। এবিষয়ে আমার কোনোরকম অভিজ্ঞতা নেই।

ভদ্রলোক ভারিক্কী চালে উত্তর দিলেন "একই আপিসে দুই সাহেব ভাই কাজ করেছে এমন আপিস আছে—কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত গোল্লায় গেছে।" এই বলে ফিস ফিস করে দু

একটা বিখ্যাত বিদেশী কোম্পানির নাম শোনালেন আমার আত্মীয়। এই সব জাঁদরেল কোম্পানির নাকি এখন ডুবু-ডুবু অবস্থা। শ্রদ্ধেয় আত্মীয় তারপর বললেন, "আমার প্রিন্সিপ্যাল হলো, শা-ওয়ালেশ কোম্পানির। বড়সায়েব থেকে বেয়ারা পর্যন্ত এক বংশের দুজনের ওখানে স্থান নেই। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা লিখিত ওই অর্ডার দিয়ে গিয়েছেন। রাম না-জন্মাতেই রামায়ণ লেখা একেই বলে, বুঝেছো!"

না-বুঝেও কোনো গতি নেই। আর সময় নষ্ট না করে সদানন্দ রোডের আত্মীয় আমাকে দ্রুত বিদায় করলেন, বাড়িতে কয়েকদিন আশ্রয় দেবার কথাও তুলতে দিলেন না। তাঁর শালার সুবৃহৎ ফ্যামিলি নাকি আগামী কালই কলকাতায় বেড়াতে আসছেন, এমন একটা খবর আগেই এসে

কালিঘাট ট্রাম ডিপোর কাছেই সনা দাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এ সেকেন্ড ক্লাস কামরা থেকে নেমে আমা দেখেই সনাতন দাস জিজ্ঞেস করে "সায়েব না? কেমন আছেন?"

সনাতন এক সময় শাজাহান হোটে বেয়ারার চাকরি করতো। যথাস

শাজাহানের চাকরি ছেড়ে দূরদর্শী সনাতন সাহেবপাড়ার এক অফিসারস ক্যানটিনে কাজ নিয়েছিল।

সনাতন অনেকদিন আগে হোটেল ছাড়লেও শাজাহানকে একেবারে ভুলতে পারেনি। সনাতন সাগ্রহে আমার কাছে হোটেলের খবরাখবর জানতে চাইলো এবং ওখানকার সাম্প্রতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলো।

স্যাটা বোসের জন্যে চোখের জল ফেললো সনাতন। আমার জন্যেও বেচারা বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। কোনো একটা কাজের জন্যে সনাতন কালিঘাট পাড়ায় এসেছিল, কিন্তু সে প্রোগ্রাম পাল্টে ফেললো। সামান্য ইতস্তত করে সনাতন বললো, "সায়েব, যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা কথা বলি। কোথায় এখন থাকবার জায়গা খুঁজবেন, আমার কোয়ার্টারে চলুন।"

সামান্য ক্যাণ্টিন কর্মচারী সনাতন দাসের মহানুভবতায় আমার বাকশক্তি রহিত। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সনাতন বললো "এতো কী ভাবছেন সায়েব? আমি যদি আপনার আত্মীয় হতাম, তা হলে কি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন?"

"সনাতন।"

"কী বলছেন সায়েব?" সনাতন সহজভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার আপিসের নাম শা-ওয়ালেশ তো?"

"মোটেই না। আপিসের নাম ফোর্ডসন কোম্পানি। আপনি ভুলে গেলেন সায়েব, আপনাকে তো নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। ঠিকানা লেখা ঝক-ঝকে কার্ড আমার আত্মীয়ও তো আমাকে দিয়েছিলেন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

সারা জীবন ধরে কত লোক আমাকে তাঁদের নাম ঠিকানা দিয়েছেন। শিল্পপতি কড়াশির সঙ্গে সদানন্দ রোডের আত্মীয়র নাম পরিচয় আমিই করে দিয়েছিলাম। সেই পরিচয় থেকে আমার আত্মীয় বেশ প্রভাবান হয়েছেন, কিন্তু কে তা মনে রাখে?

ক্যামাক স্ট্রীটের কাছে ফোর্ডসন কোম্পানির আপিসের লাগোয়া এই ছোট্ট কোয়ার্টার। সনাতন নিজেই আমার মালপত্তর নামালো। সে এখনও আমাকে সায়েব বলছে। আমি সনাতনকে অনুরোধ করেছি, আমি এখন তোমার সায়েব নই। এখন তুমি আমার বন্ধু, আশ্রয়দাতা, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকো।" কিন্তু সনাতন সেসব কথা শুনলো না। বললো, "কেন আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন সায়েব?"

ফোর্ডসন কোম্পানির বিরাট লোহার গেটের সামনে আমরা যখন এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আপিস অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে। আপিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের মেম্বাররাও ক্যারাম ও তাসের পাট চুকিয়ে বিদায় নিয়েছেন। শুধু গেটের কাছে দারোয়ান বসে রয়েছে। ইউনিফর্ম-পরা দারোয়ানের ছুটি নেই—ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী কেবল ডিউটি বদল হয়।

দারোয়ানের অনুমতি ছাড়া অপরিচিত লোকের এই সব আপিসে প্রবেশ নিষেধ। সনাতন একটু এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে চুপি-চুপি কী কথা বলে এলো।

"বাইরের লোককে তোমার ঘরে নিয়ে আসবার অনুমতি আছে তো? আমার জন্যে তুমি না বিপদে পড়ে যাও সনাতন।"

আমি একটু ভয়ে-ভয়ে সনাতনকে জিজ্ঞেস করলাম। সনাতনকে যা বলতে পারলুম না, তা হলো : এ-সংসারে আমাকে যারাই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তারাই বিপদে পড়ে যায়। আমার জীবনে বার বার তাই ঘটেছে।

আমার মাল-পত্তর নিজের ঘরের ভিতরে তুলে সনাতন বললো, "অফিসারস্ ক্যানটিনের কুক-বেয়ারার সঙ্গে দারোয়ান কখনও অসদ্ভাব রাখবে না, স্যার! আমার নিজের লোককে ঢুকতে না-দিলে দারোয়ানজীকে ওই খৈনি খেয়েই দিন কাটাতে হবে—পেটে চপ-কাটলেট আর পড়বে না। ফাউল কাটলেট পেলে হনুমান সিং একেবারে আনন্দে আটখানা হয়ে যায়

বেশীর ভাগ বাচ্চাই সব কিছু করবে

আমি অঙ্কের হোমওয়ার্কও করব যদি পাই- চেরী রেক্স জেলি

OBM-5472 BN

তৈরী করা সহজ।
চিনি বা দুধ মেশাবার দরকার নেই।
৫০০ মিঃলিঃ (½ লিটার) জল ফুটিয়ে নিন।
তারপর ১ প্যাকেট রেক্স জেলি ক্রিস্টালস
মিশিয়ে ভাল ক'রে নাড়ুন। ব্যস, এই টুকুই।
না চিনি না দুধ কিছুই মেশাবার প্রয়োজন নেই।
এরপর ঠাণ্ডা করুন। তারপর ফ্রিজে বা বরফের
ওপর রেখে দিন যতক্ষণ না জমছে। এভাবেই
খেতে দিন অথবা ফল, কাস্টার্ড, কেক, রাবড়ি,
আর ক্ষীরের সঙ্গেও দিতে পারেন।
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদানে; অতিশয় যত্নও সতর্কতার
সঙ্গে তৈরী—রেক্স জেলি ক্রিস্টালস্ আপনার অর্থের
বিনিময়ে সবচেয়ে ভাল জিনিষ। এক প্যাকেট আপনার
বাড়ীতে রাখুন···সবসময়!

জেলি ক্রিস্টালস

কর্ণ প্রডাক্টস্ কোম্পানী
(ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
শ্রী নিবাস হাউস, এইচ, সোমানী মা
বোম্বাই ৪০০০০১।

—অথচ খাতায়-কলমে একেবারে নিরামিষ বাবা!"

আপিস ক্যান্টিন বেশ সাজানো-গোছানো। সারি সারি গোদরেজের স্টীল চেয়ার ও টেবিল। দেওয়ালে কয়েকটি স্নিগ্ধ ছবি টাঙানো। হলের পাশে আধুনিক কিচেন। কিচেনের লাগোয়া ছোট্ট একটা ঘরে সনাতনের বসবাস। সনাতন সেখানেই আমাকে তুললো।

কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোরকমে একখানা খাটিয়া রাখার জায়গা আছে। দু'জন লোকের এখানে একত্রে আশ্রয় পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সনাতন কিন্তু আমাকে কোনো কথা তুলতে দিলো না। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এইভাবে বললো, "শোবার জায়গার এখানে কোনো অভাব নেই। এতবড় ক্যানটিন হলে গোটা দুয়েক বেড়াল ছাড়া রাত্রে কেউ থাকে না। দু'খানা করে টেবিল জোড়া দিয়ে দিব্যি শুয়ে পড়া যাবে। অনেক পাখা আছে—একেবারে ফাস্ট ক্লাস হোটেলের ব্যবস্থা, সায়েব।"

সব বুঝেও ব্যাপারটা মেনে নিতে হলো। এ ছাড়া এই মুহূর্তে আমার কী উপায় আছে?

কোনো আপিসের নির্ধারিত সময়ের বাইরে ক্যানটিন রুমে এইভাবে কখনও আশ্রয় নিইনি। বিরাট এই বাড়িটায় এখন লোকজন নেই।

সনাতন বললো, "স্নান সেরে নিন সায়েব। আপনার একটু অসুবিধে হবে, এখানে শাওয়ার নেই শাজাহানের মতন।"

সনাতন ঘর থেকে একটা প্লাসটিক পাইপের টুকরো এনে বেসিনের কলের মুখে লাগিয়ে দিলো। বললো, "এবার কল খুলে দিন। দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ ইচ্ছে শরীর ঠাণ্ডা করুন। এখানে জলের অভাব নেই।"

প্লাসটিক টিউবটা সাবধানে ধরে অনেকক্ষণ মাথায় জল ঢাললুম। ঠাণ্ডা জলের ধারা শ্রান্ত শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে দেহ-মন স্নিগ্ধ করে তুললো। স্নানটা আমার প্রয়োজন ছিল। নতুন এক পরিতৃপ্তির অনুভূতি দেহে প্রবাহিত হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত আশ্রয় খুঁজে পাবার এই আনন্দ একমাত্র তিনিই কল্পনা করতে পারবেন যিনি কোনোদিন আমার মতো নিরাশ্রয় হয়েছেন।

ভিজে গামছায় শরীর মুছে শান্তভাবে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি ইতিমধ্যেই যেন আমার অতীতকে বহু দূরে ফেলে এসেছি। সনাতনের এই আশ্রয়েই যেন আমি বহুদিন বসবাস করছি।

সনাতন ইতিমধ্যে আমার জন্যে চা বানিয়ে ফেলেছে।

"তুমি আবার কষ্ট করতে গেলে কেন?" সনাতনের আতিথেয়তায় আমি রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করলাম।

সহজভাবে সনাতন বললো, "কষ্ট কি সায়েব! চা করবার জন্যেই তো আমার জন্ম! এই আপিসের চারশ' জন লোকের জন্যে প্রতিদিন আটশ' কাপ চা এখানেই তৈরি করি। তাছাড়া সায়েবদের জন্যে কফি আছে। বাবুদের চায়ের টাইম বাঁধা—সকাল সাড়ে-ন'টা থেকে সাড়ে-দশটা আর বিকেল আড়াইটে থেকে তিনটে। কিন্তু কফির কোনো টাইম নেই—সায়েবরা টেলিফোনে হুকুম করলেই কফি বানাতে হবে। চা-কফি তৈরি করতে আমার কোনো কষ্টই হয় না, সায়েব। বরং ছুটির দিনগুলোতে অস্বস্তি লাগে। একদিন সকালে তো ভুল করে চায়ের জল ফুটিয়ে ফেলেছিলাম—তারপর খেয়াল হলো, রবিবার।"

সনাতন বললো, "আপনার নিজের জায়গা মনে করে, এখানে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করুন। আজ শুক্রবার—সুতরাং কাল পরশুও আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, আপিস বন্ধ থাকবে। হপ্তায় দু'দিন আপিস বন্ধ, এ এক মস্ত সুবিধে।"

শাজাহান হোটেলের কথা সনাতনের স্মরণে আসছে। আমার এঁটো কাপটা সরিয়ে নিতে নিতে সনাতন বললো, "আপনার মনে আছে সায়েব, শাজাহান হোটেলে আমাদের ছুটির বালাই ছিল না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ কাজ আর কাজ। নাম-কা-ওয়াস্তে একটা অফ্-ডে দেখানো থাকতো, কিন্তু ছুটি পাওয়া যেতো না।"

একগাল হেসে সনাতন বললো, "আপনাদের আশীর্বাদে জীবনের একটা হিল্লে হয়ে গিয়েছে। ক্যানটিনের বেয়ারা বটে; কিন্তু মাইনে পাই ছ'শ টাকা। তিন মাসের বোনাস আছে পুজোর সময়। তা ছাড়া 'পার্মেণ্ট' ফাণ্ডে মাসে-মাসে টাকা কাটে। এ-এক ভারি মজার জিনিস সায়েব, মাইনে থেকে যত টাকা কাটে তার ডবল জমা পড়ে। মাসে মাসে সুদসমেত এই টাকা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত যে কত হয়ে যাবে, হিসেব করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।" শাজাহান হোটেলে যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ছিল না সে-কথা সনাতন মনে করিয়ে দিল।

নিজের সংসারের খবরাখবর দিল সনাতন। ছেলেকে গ্রামের ইস্কুলে পড়াচ্ছে। ইচ্ছে আছে, ওকে কলেজে পড়াবে সনাতন।

সনাতন বললো, "আপনি বসুন সায়েব, আমি একটু ফ্লিটের ব্যবস্থা করি—না হলে মশার জ্বালায় রাত্রে আপনার শোবার কষ্ট হবে।"

দারোয়ানের কাছ থেকে ফ্লিটের টিন ও স্প্রে-গান নিয়ে সনাতন ঘরের মধ্যে ছড়াতে লাগলো। রাত্রে শোবার আগে বললো, "আমার মশারিটা বড় নোংরা, তাই আপনাকে দিতে পারলাম না, সায়েব। আপনার খুব কষ্ট হবে।"

সামান্য পরিচিত এক বেয়ারার দরদে আমি মুগ্ধ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি সনাতনের সামনে ধরা পড়তে চাই না। ভিজে গলায় আমি কোনোরকমে বললাম, "সনাতন, তোমাকে আমি অনেক অসুবিধেয় ফেলেছি। তুমি শুধু-শুধু আমার জন্যে কেন এত কষ্টে পড়তে গেলে?"

সরল হৃদয় সনাতনের মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠলো। সে আমার কথাবার্তার অর্থ বুঝতে পারছে না। সনাতন এবার বললো, "এসব কী বলছেন, সায়েব? এই চাকরি, এই কোয়ার্টার এ সবই তো আপনার জন্যে।"

সনাতনের কথা শুনে আমি তো তাজ্জব। সনাতন বললো, "আপনি ভুলে গেলেন সায়েব? এই চাকরির দরখাস্ত তো আপনিই টাইপ করে দিয়েছিলেন। অত ভাল করে আপনি না লিখে দিলে আমার কিছুই হতো না।"

এ সংসার তা হলে এখনও মরুভূমি হয়নি। সনাতনের মতো মানুষরা আজও সামান্য উপকারের কথা স্মরণ রাখে।

সনাতন আমার মুখের অবস্থা লক্ষ্য করলো না। সে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলো। (ক্রমশ)

গানের আসর

রবীন্দ্রনাথ বলতেন নন্দনতত্ত্ব, আমরা অনেকে বলি সৌন্দর্যতত্ত্ব। এসথেটিকস্-বলে বিশেষ কোনও দর্শন আমাদের নেই, কিন্তু তা বলে বিষয়টা আমাদের চিন্তার একেবারে বাইরে রয়ে গেছে এমন নয়। আমরা 'রস' আখ্যা দিয়ে যা বোঝাতে চাই তাই হচ্ছে নন্দনতত্ত্বের একেবারে গভীরের কথা। আর রসতত্ত্ব বলে কোনও বিশেষ তত্ত্ব বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নেই।

আমাদের সমস্ত সঙ্গীতসৃষ্টিতে এবং তার রূপায়ণে যে বস্তুটি আমাদের উপলব্ধিকে আনন্দময় করে তুলছে,—তা হচ্ছে এই রস। অনেকে এই আনন্দকে একেবারে সাবজেকটিভ স্তরে নিয়ে গেছেন—সেটা আর এক দর্শন, যার এলাকা অধ্যাত্মচিন্তা, কিন্তু নৃত্যগীতের যে রসোপলব্ধি তা আমাদের ইন্দ্রিয়কে স্নিগ্ধ করে,—তা এমন এক বস্তু যা আমাদের শরীরে মনে পুলক বলে একটি গ্রাহ্য অনুভূতির সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথই তো ব্যবহার করেছিলেন—'পুলক পুজাঞ্জলি'—এই কথাটি। আজ রবীন্দ্রজন্মোৎসবে বহুবিধ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে এই 'রস' শব্দটি আমার মনে গভীর প্রশ্ন তুলেছে। যাঁরা গাইছেন তাঁরা এই 'রস' বলে বস্তুটি উপলব্ধি করেছেন কতটা?

রবীন্দ্রনাথ যখন গাইতেন তখন তাঁর কণ্ঠে, দেহভঙ্গীতে, প্রকাশশৈলীতে সমস্ত গানটা তার সমস্ত সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠত। শুধু গানে নয়, তাঁর আবৃত্তিতেও এই একই প্রকাশরীতি লক্ষ করা যেত। এমন কয়েকটি কবিতায় এমনকি গদ্যাংশেও তিনি সুর দিয়েছেন যার মাধ্যম সুর হলেও ফুটিয়ে তোলার আর্ট হচ্ছে তার পঠনভঙ্গীতে। একদা এইরকম একটা ভঙ্গী আমাদের কথকতায় কীর্তনে ছিল,—এখনও যে নেই তা নয়। এইটা আয়ত্ত না হলে তা গান হয়ত হবে, কিন্তু তার অবস্থিতি হবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে দূরে। এই যে আর্ট,—একি শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের বেলাতেই প্রযোজ্য? তা নয়, সব ক্ষেত্রেই এই সত্য প্রযোজ্য। টপ্পাকে আমরা রাগ-সঙ্গীতের মধ্যেই ফেলি। নিধুবাবুর গানকে এই টপ্পাই মহিমান্বিত করেছিল। টপ্পার যে নমনীয় একটা শৈলী আছে সেটি পরিমিতভাবে প্রয়োগ করে গানকে যতক্ষণ শ্রোতার মর্মে পৌঁছে দেওয়া যায়, ততক্ষণই তা নন্দন কার্যে সার্থক হয়, কিন্তু সেই ভঙ্গীটি, করে, নিছক ওস্তাদি বা কেবল টপ্পার টেকনিকটাই প্রধান হয়ে ওঠে, তা হলে তার সাঙ্গীতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। বিশেষত্বহীন সঙ্গীত কোনও দিক থেকেই অর্থবহ নয়, তাতে সুর থাকতে পারে, তাল থাকতে পারে, কিন্তু থাকে না রসের স্পন্দন,—তাই নীরস শব্দটি আমাদের কাছে পরম অতৃপ্তিকর।

নিধুবাবুর টপ্পার দুটি লাইন উদ্ধৃত করিঃ—

চন্দ্রাননে কি শোভা কমলনয়ান
ভুরুভৃঙ্গ ভঙ্গী করি করে মধুপান।

নিপুণ গাইয়ে সুন্দর সুন্দর টপ্পার কাজ দিয়ে চন্দ্রাননের শোভা, ভুরুভৃঙ্গের ভঙ্গীকে অপূর্ব করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, কিন্তু যে শিল্পী কেবল ওস্তাদি জানেন তিনি ওই চন্দ্রাননের শোভাকে বা ভৃঙ্গের ভঙ্গীকে বিকৃতির চরমে তুলে ছাড়বেন। আর যে শিল্পী শুধু গাইতে জানেন, রসের উদ্দীপনা বা চেতনা যাঁর নেই, তাঁর গানটা গান অবশ্য হবে কিন্তু সে-গানে চন্দ্রাননের চন্দ্র সম্পূর্ণ অস্তমিত থাকবে এবং ভৃঙ্গটি নিষ্পন্দভাবেই মধুপান নামক কার্যটি সমাধা করবে। সংস্কৃত সাহিত্যে একটা কথা আছে,—অজাত, মৃত এবং মূর্খের মধ্যে অজাত এবং মৃত বরং ভাল কিন্তু মূর্খ সন্তানের মত অবাঞ্ছিত আর কিছু নেই। কারণ, সে চিরজীবন পরিতাপের হেতু হয়। সেইরকম অগায়ক বা গানে অক্ষম এমন ব্যক্তি বরং ভাল, কিন্তু মূঢ় গায়কের মত বিরক্তিকর আর কেউ নেই—কারণ, সে যতদিন গাইবে ততদিনই নীরস গানে শ্রোতাদের অবসন্ন করে তুলবে। আজ এই রকম একটি বৃহৎ শ্রেণীর তথাকথিত শিল্পীর অভ্যুদয় হচ্ছে যাঁরা গান গেয়ে থাকেন কিন্তু তাঁদের নির্গুণ গায়নভঙ্গী শ্রোতাদের একান্ত-ভাবে ক্লান্ত করে তুলছে।

রবীন্দ্রনাথের গান কেবলমাত্র সুরে তালে গেয়ে যাবার গান নয়, তার প্রতিটি ইঙ্গিত রূপে রসে এবং রাবীন্দ্রিক ব্যক্তিত্বে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে তার মত

অসার্থকতা আর কিছুতে নেই। এছাড়াও আছে পরিমিত বোধ। এর অভাবও অত্যন্ত ক্লান্তিকর। কোনও কোনও গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠে 'কোথা যে উধাও হল'—এত দীর্ঘ সময় ধরে উধাও হতে থাকে যে গান শোনবার সমস্ত স্পৃহাটাই উধাও হয়ে যায়। 'ঐ বুঝি কালবৈশাখী'—এই গানে কাল বৈশাখীর রুদ্রভঙ্গী যদি প্রকাশ না পায় তাহলে গানের তাৎপর্য বলে কোনও বস্তু থাকে না। কয়েকদিন আগে আকাশ-বাণীতে 'মরি হায় চলে যায় বসন্তের দিন' গানটি শুনছিলাম। বোধ করি গ্রামোফোন রেকর্ডে। যে গান আমরা শুনেছিলাম তার কী নিষ্প্রাণ পরিণতি! 'পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনের তাপে, মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে'—এই সঞ্চারীর ওই পুলক এবং মধুপ গুঞ্জরণের আনন্দিত উপভোগটুকু যদি একটুও সোচ্চার হত ওই গায়কের কণ্ঠে। আরও একটা বিখ্যাত গান শুনলুম এই কদিন আগে, সেও এক গ্রামোফোন রেকর্ড—'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে'। গানের নেই কোনও আবেদন, নেই কোনও উচ্ছ্বাস, নেই কোনও ছন্দ। এ'রা হয়ত জনপ্রিয় শিল্পীই হবেন (শিল্পীদের নাম প্রায়ই মনে থাকে না বা মনে রাখা প্রয়োজনও বোধ করি না)। কিন্তু এ'দের কি কোনও সৌন্দর্য চেতনা বা অনুভূতিও নেই? মনে হয় একটা চলনসই মেলডিকে শ্রোতাদের কাছে ধরে দিতে পারলেই কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন তাঁর গানকে বাঙালী চিরকাল মনে রাখবে তখন কি তিনি উত্তরকালের শিল্পীদের কাছে এইরকম মনে রাখা প্রত্যাশা করেছিলেন?

শুধু রবীন্দ্রনাথের গান বলে নয়, প্রত্যেক রচয়িতার গানেই স্থায়ী রস একটি হলেও নানারকম ভাব তার মধ্যে মাঝে মাঝেই সঞ্চরণ করে যায়। সেগুলিও অবহেলার নয়। কারণ, তারাই গানকে বৈচিত্র্যে সমন্বিত করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এইগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতেন এবং এর জনাই তাঁর কণ্ঠে গান এত রসে এবং মাধুর্যে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। আজকালকার শিল্পীরা এই দীক্ষা গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের বৈদগ্ধ এমন স্তরে পৌঁছেছে বলেও মনে হয় না যে ই চেতনাগুলি আপনা থেকে বিকাশ করে। তাই একটা সমস্ত অংশ কেবল একটা melody বা সুরে তুলতে পারেন, কিছু নয় এবং এই স্থূল রীতিটাই র কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এরই ফলে এ'দের একটির বেশ দুটি গান শুনলে য় লাগে এবং স গানই একটা প্রক্রিয়া তীক হয়ে দেখ দেয়। এই রসোপাল নিয়ে এ'রা একক অনুষ্ঠান করে থাকে বং তা যথার্থ একক হয় কারণ, গলায় আ দ্বিতীয় কোনও কি প্রকাশ নেই। এ একই কারণে আজ দ্রনাথ, অতুলপ্রসা দ্বিজেন্দ্রলাল, নজ সব এক হ গেছেন। গানের ব্যাপ্তই যেখানে বন্ধ সেখানে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা কর আপত্তি কিসের? বোধশক্তি থাকলে পার্থক্য নিরূপণ, নইলে পরোয়া কিসের?

বছর বছরই রবীন্দ্রজন্মোৎসব পনে কুড়িদিন ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কি রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে চেতনা কিছুম বাড়ছে না। ভালর মধ্যে এইটুকু যে ত রবীন্দ্রকাব্যটুকুও লোকের কানে পৌঁছে এবং তাঁদের শান্তি প্রদান করে।

কণ্ঠস্বর

কণ্ঠস্বর নামক একটি পত্রি এবৎসরের বিশেষ রবীন্দ্র জয়ন্তী সং আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সম্পাদনা করেছেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীশৈলজারা মজুমদার এবং শ্রীযুক্তা অমিতা ঠাকুর। য যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আ শ্রীহিমানীশ গোস্বামী, শ্রীশ্যামল গঙ্গো পাধ্যায়, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীঅনি চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন। কয়ে কবিতাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে, ব স্বরলিপিগুলি বিশেষ করে চিত্তাকর্ষ

ঘরের কথা

মিহির মুখোপাধ্যায়

শিবলার বউ যমুনা ভর সন্ধ্যেবেলা এক ডেলা আফিম খেল। পুরো নাম শিবলাল।

লোকের মুখে মুখে, শিবলা। ভ্যান-রিকশা চালায়। আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে এই তিন চাকার গাড়ির খুব চল হয়েছে। তখন টিপটিপ বৃষ্টি। আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার।

ভ্যান-রিকশা চালিয়ে বউকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে শিবলা।

তিন মাইল মাটির রাস্তা। তারপর যশোর রোড। পাকা রাস্তা বটে, কিন্তু পাক্কা পাঁচ মাইলের মাথায় বারাসাত হাসপাতাল। পৌঁছুতে বোধ হয় ঘণ্টা দুই লেগে যাবে।

এই দুটি ঘণ্টা যমুনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। ঘুমুলেই মরণ আফিম-খাওয়া রোগীর খালি ঘুম পায়। কাল ঘুম। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর জাগবে না। সুতরাং, ঘুমুতে দিও না। শুধু জাগিয়ে রাখো। যেভাবে হোক কালঘুমকে কাছে ঘেঁষতে দিও না।

সামনে চোখ রেখে গাড়ি চালাচ্ছে বটে, কিন্তু শিবলার মন রয়েছে পেছনে। মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে ডাকছিল, "দ্যাখ্ তো শ্যাম, ঘুমিয়ে পড়ল নাকি।"

ছোট ভাই শ্যামলাল গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছিল। আঠালো কাদার রাস্তায় চাকা বসে গেলে মধ্যে মধ্যে ঠেলে দিতে হচ্ছে।

এক একবার চেঁচিয়ে ডাকছিল—"ও বউদি, বউদি, ঘুমুলে নাকি, ঘুমিও না।"

না, চিমটি কাট, চুল ধরে ঝাঁকুনি দে।" কিন্তু বউদির গায়ে হাত তুলতে সঙ্কোচ শ্যামলালের।

অগত্যা গালাগাল দিতে দিতে গাড়ি থামিয়ে নামল শিবলা। ভ্যানের তক্তার উপর একটা ছেঁড়াছেঁড়া মাদুর পাতা। তেল-চিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়েছিল যমুনা।

ঘাড়ের নীচে হাত দিয়ে টেনে তুলে বসিয়ে দিল শিবলাল।

আঠারো বছরের আঁটোসাঁটো গড়ন যমুনার। সরু কোমর, ভরা বুকের আঁচল খসে পড়েছে। একটা ছেঁড়া ব্লাউজ জলে ভিজে কোনরকমে লেপটে রয়েছে। একপিঠ কোঁকড়া চুল এখন এলোমেলো। রঙ শ্যামলা বটে, কিন্তু মুখখানি ভারী মিষ্টি। সামান্য চাপা নাক, টানা টানা চোখ, ভুরু।

সুন্দরী মেয়ে দেখে শিবলার মা পছন্দ করে যমুনাকে ঘরে এনেছিল। কিন্তু বছর না ঘুরতেই মাথায় হাত। শিবলার বউ ঝগড়াটে। শাশুড়ীর সঙ্গে, ননদদের সঙ্গে গলা ছেড়ে ঝগড়া করে। সংসারের কুটোগাছ নাড়বে না। খালি সেজেগুজে পটের বিবি হয়ে বসে থাকবে। ছোট দুই ননদকে দু চোখে দেখতে পারে না। শুধু সবার ছোট ওই দেওর শ্যামলালকে যা একটু পছন্দ করে। ছ' মাস যেতে না যেতেই শিবলাকে আলাদা হতে বললো যমুনা। কিন্তু বিধবা মা, ছোট ভাই, বিয়ের যুগ্যি দুই বোন, এদের ছেড়ে শিবলা এখন আলাদা হয় কি করে! পাশেই জ্যাঠামশাইর ঘর। জ্যাঠা, জেঠি, জ্যাঠতুতো দাদা, বউদি। হাঁড়ি আলাদা হলেও বাপ মরার পর জ্যাঠামশাই

এখন বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই আলাদা হলে ওরাই বা কি বলবে!

কিন্তু দিনের বেলা এই সব বিচার-বিবেচনা মাথায় থাকলেও রাত্তিরে যমুনার কাছে কাহিল হয়ে পড়ে শিবলা। রাত্তিরে শুতে যাবার আগে আরেক প্রস্থ সাজগোজ করে যমুনা। চোখে কাজল, পানের রসে ঠোঁট লাল। নরম শরীর, নিটোল বুক। শিবলার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরে যায়। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় কেমন নেশার মত লাগে।

সে সময় যমুনা বলে—"ছাড়ো আমাকে, অমন সোহাগের মুখে ঝাঁটা মারি।"

"কেন কি হয়েছে?"

"আমাকে ঝিকড়া পাঠিয়ে দাও।"

ঝিকড়া বাপের বাড়ি।

"হয়েছে কি বল্ না।"

"হবে আবার কি, তোমাদের সংসারে খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল, তোমার মায়ের ছুঁচিবাই, খালি এটা কাচো,

ওটা কাচো, বাসন মাজো, হাঁড়ি ধোও, গোবর জল দাও, উঠোন ঝাঁটাও, চাল বাছো, কাঁড়ি কাঁড়ি কাপড় সেদ্ধ করো—"

"কেন, টুনি-পুটি তো তোমার সঙ্গে কাজ করে।"

"আহা, তোমার বোনদের গুণের কথা আর বলো না, খালি ঘুরেঘুরে করবে, কখন বউদির গন্ধ তেল, বউদির সাবান, বউদির পাউডার মাখবে, কখন বউদির ভাল শাড়িখানা পরে পাড়ায় টহল দিয়ে আসবে।"

"চুপ করো, শুনতে পাবে।"

"কেন, চুপ করবো কেন, আমি কি ভয় পাই, না মিছে কথা বলছি।"

দরমার বেড়া, টালির ঘর। রাত্তিরের কথা অনেক দূর শোনা যায়, আর যমুনা খুব আস্তেও কথা বলতে পারে না। সুতরাং, পাশের ঘরে শিবলার মা আর বোনেরা কিছু কিছু শুনতে পায়। তাই নিয়ে পরের দিন আরো অশান্তি। টুনি-পুটি বউদিকে মুখোমুখি কিছু বলে না বটে, কিন্তু শিবলার মা ছেড়ে দেয় না—"তুই আমার ছেলের কানে বিষ-মন্তর দিস, ঘর-ভোলানি, ঘর-জ্বালানী—"

তারপর দুজনে তুলকালাম কাণ্ড। শিবলা তখন বাড়ি থাকে না। খুব ভোরে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে আবার খেতে আসে। আবার বেরোয়। ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-নটা। আবার রাত্তির বেলা রাগ দেখায় যমুনা। শিবলার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ফোঁপায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে—"তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।"

—"কেন, কি হয়েছে?"

"হবে আবার কি, রোজ যা হয় তাই হয়েছে।" মুখ তুলে তাকায় যমুনা—"আমার একটা কথা রাখবে।" ওর ভেজা ভেজা দুই গালে ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে শিবলা—"রাখবো, রাখবো, কথাটা কি বল্।" দুহাতে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। ঠিক তখন বলে যমুনা—"আলাদা বাসা করো তুমি, আমি আর এদের সঙ্গে থাকতে পারছি না।" এক মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায় শিবলা। বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে।

হাত বাড়িয়ে শিয়রের লণ্ঠনটা নিবিয়ে দেয়। অন্ধকারে ফোঁস ফোঁস করে যমুনা—"না ওসব কিছু হবে না, ছাড়ো আমাকে আগে বলো আলাদা বাসা করবে।"

চারদিক অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে নেশায় আচ্ছন্নের মত যমুনার নরম শরীরের মধ্যে ডুবে যা শিবলা।

দিনের বেলা কিন্তু অন্যরকম। মায়ে মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না মাকে ছেড়ে, টুনি-পুটি-শ্যামকে ছে সে আলাদা হবে কি করে! যমুনা যা বলুক।

এখন এই টিপটিপ বৃষ্টির ম যমুনাকে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল শিবলা।

"এই, এই যমুনা, ঘুমুস নে, তাক আমার দিকে তাকা।"

"আঃ ছাড়, ছেড়ে দে"—জড়িয়ে জড়ি বলে যমুনা। মাথায় ভার, শরীরে ভা চোখের পাতা সীসের মত ভারী। ঠাস ঠ করে দুই গালে দুটো চড় মারল শিব হাউমাউ করে উঠল যমুনা।

"না না, মারিনি, তোকে মারিনি বুকের মধ্যে টেনে এনে গালে চুমু দে শিবলা—"ঘুমুস নে, ঘুমুস নে, জেগে থ জেগে থাক, তাকা আমার দিকে।" ঠা গাল, ঠান্ডা শরীর। কেমন অবশ, ছে দিলেই পড়ে যাবে। কিন্তু এভাবে দে হচ্ছে। ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে ডাকল শিবলা—"শ্যা শ্যাম, এদিকে আয়।"

দাদা-বউদির ব্যাপার দেখে সঙ্গে গিয়ে-
ছেল শ্যাম। চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে। লজ্জা-শরম বলে কথা। বউদির গায়ে কাপড় নেই, কোন হুঁশ নেই। দাদারও পাগলের মত অবস্থা।

এসব দেখে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছেল শ্যাম। আরো পেছনে জ্যাঠতুতো দাদা গোবিন্দ আর দাদার বন্ধু বলাই আসছিল। কটা নড়বড়ে ছেঁড়া ছাতা ভাগাভাগি করে মাথায় দিয়েছে দু'জনে।

বলাইয়ের হাতে একটা টর্চলাইট। টিমটিম করে মধ্যে মধ্যে জ্বলছে। কার্তিক মাসের অকাল বৃষ্টি। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। প্যাচপেচে কাদার রাস্তায় পা টিপে টিপে আসছে দু'জনে।

গোবিন্দ এখানকার হাইস্কুলে দপ্তরীর কাজ করে। কাঁচা তরিতরকারির ব্যবসা বলাইয়ের।

গোবিন্দ বাড়িতেই ছিল। বলাইকে সে ডেকে এনেছে। এসব ব্যাপারে বেশি লোক জানাজানি ভাল নয়। কেলেঙ্কারী ছাড়াও পুলিসের ভয়। ঠান্ডা মাথার হুঁশিয়ার লোক গোবিন্দ।

সন্ধ্যের মুখে দত্তপুকুরের বাজারে এক-ঝা চাল-কুমড়োর চালান পৌঁছে দিয়ে ... আড়াইটে টাকা পকেটে নিয়ে সবে ...তুল তলার আড্ডায় এসে গাড়ি থেকে নেমেছিল শিবলা।

এমন সময় শ্যামলাল এসে ডাকল— দাদা শিগগির বাড়ি চলো।"

"কেন রে, কি হয়েছে?" চমকে উঠেছিল শিবলা। একটু তফাতে নিয়ে চাপা গলায় বলেছিল শ্যাম—"বউদি আফিম খেয়েছে।"

"সে কি রে! আফিম পেল কোথায়?"

—"জ্যাঠামশাইর ডিবে থেকে চুরি করেছে।"

গোবিন্দর বাবা, শিবলার বুড়ো জেঠামশাইর অনেককালের আফিমের অভ্যাস। রোজ সন্ধ্যেবেলা আফিম খেয়ে ঝিমোয়। রোজ একপো দুধের বরাদ্দ বুড়োর জন্য। সরকারী অফিসে চাপরাশির চাকরি করত। সেই সুবাদে সাতাশ টাকা পেনশন পায়। ওই টাকায় দুধ আসে, আফিম আসে।

ছেলের কাছে হাত পাততে হয় না। চোখে ছানি, ভাল দেখে না।

কিন্তু শিবলার বিয়ের পর দুটো রুপোর টাকা দিয়ে নতুন বউ-এর মুখ দেখেছিল।

ন্যাড়ামাথা এক বিলিতি রাজার মুণ্ডু আঁকা সেই ভারী রুপোর টাকা দু'টি প্যাঁজের তোরঙ্গে তুলে রেখেছে যমুনা। এই কারণে বাড়ির অন্য কারো সঙ্গে বনিবনা না হলেও জেঠশ্বশুরকে সাধ্যমত সেবা যত্ন করে। সময়-অসময় এসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া দেয়, তামাক সেজে আনে, বাপের বাড়ির গল্প করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বুড়ো। ঝিকড়ার হাটে কেমন কেনাবেচা হয়। আলু-পটলের দর কি রকম। বাপের বাড়ির আট বিঘে জমিতে কি কি চাষ হয়। সব বলে যমুনা।

ঝিকড়ার হাটে আলুর আড়ত যমুনার বাবার। এছাড়া আম কাঁঠাল আর খেজুরগাছ আছে দশটা। কিন্তু একটিও নারকেল গাছ নেই শুনে অবাক হয় তারক সামন্ত। বুড়োর নিজের অংশে ছ'টি নারকেল গাছ, শিবলার বাবার চারটি। কলাবাগান, বাঁশঝাড় এজমালি। এছাড়া একটা পুকুর এজমালি। ছোটবেলায় শিবলা একবার ওই পুকুরে ডুবে যাচ্ছিল। ওর জ্যাঠাইমা ঘাটে বসে বাসন ধুচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেছিল। এসব গল্প অনেকবার শুনেছে যমুনা। গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করেছে পুরনো একটা জর্দার কৌটোয় তরিখানেকের মত আফিম মজুত থাকে জ্যাঠামশাইর।

বৃষ্টির মধ্যে এখন গাড়ি টানছে শ্যাম। দাদার ডাকাডাকি শুনে কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল।

শিবলা বলেছিল—"তুই গাড়ি চালা, আমি ওকে ধরে বসছি।"

কিন্তু দু'জন সমর্থ মানুষের ওজন নিয়ে এই আঠালো কাদার রাস্তায় গাড়ি চালানো রোগা-পটকা শ্যামের পক্ষে সম্ভব নয়। দু'চারবার প্যাডেল চালাবার চেষ্টা করে নেমে পড়ল। তারপর হ্যান্ডেল ধরে

ঠেলতে ঠেলতে চললো। আর যমুনাকে ধরে ভ্যানের উপর উঠে বসল শিবলা।

"ও শ্যাম, তাড়াতাড়ি চল, তুই না পারিস বড়দা'কে ডাক, বলাইকে ডাক।" ঘন ঘন তাড়া দিচ্ছিল শিবলা।

বড়দা অর্থাৎ গোবিন্দ এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডেল ধরল।

রাস্তার একপাশে বাঁশবাগান, দু'একটি গেরস্থ বাড়ি। আরেক পাশে নাবাল জমি, চষা ক্ষেত।

গোবিন্দ বেশ জোরেই টেনে যাচ্ছে। পাশে পাশে শ্যাম। গাড়ির পেছনে ছাতা মাথায় বলাই। যমুনা খালি বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়তে চায়। শিবলা ওকে জোর করে ধরে বসিয়ে রেখেছে।

"ছাড়, ছেড়ে দে আমাকে।" কোন হুঁশ নেই যমুনার। শিবলাকে তুই-তোকারি করছে। বারবার হাতড়ে হাতড়ে বালিশটা কাছে টেনে নিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বালিশটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল শিবলা। ক্ষেপে উঠে যমুনা শিবলার জামা ধরে টানে। হাত অবশ, আঙুলে জোর নেই। তথাপি পুরনো ছেঁড়া জামাটা ফ্যাসফ্যাস করে খানিকটা ছিঁড়ে গেল। ওর চুলের মুঠি ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয় শিবলা। হাউমাউ করে ওঠে যমুনা, তারপর ফোঁপাতে থাকে। শিবলার বুকে মাথা রেখে ফোঁপায় আর বলে—"বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, আমার বড়ডো ঘুম পাচ্ছে।"

চোখের জল মুছিয়ে দেয় শিবলা। ওর গালে কপালে আলতো চুমু খেয়ে বলে, "ঘুমসনে, ঘুমসনে, ঘুমুলেই মরবি।"

শিবলার বুকের মধ্যে কেমন করে। নিজেরই এখন কান্না পাচ্ছে। নিজের গালেই এখন ঠাসঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করছে। সকালবেলা শাশুড়ীর সঙ্গে এক প্রস্থ খিটিমিটি করেছে যমুনা।

তখন বাড়ি ছিল না শিবলা। দুপুরে যখন বাড়ি এসেছিল, তখন যমুনার ভাব ভাল লাগেনি। গোমড়া মুখে বা প্যাটরা গোছাচ্ছিল। কোন কথা বলে শিবলা। আন্দাজ করেছিল কিছু এক হয়েছে। হয় মায়ের সঙ্গে, নয় টুঁ পুঁটির সঙ্গে। চুপচাপ পুকুর থেকে চ করে এল।

ঘরে ঢুকে বাঁশের খুঁটির সা ঝোলানো ছোট আয়নার সামনে দাঁ লম্বা চুলে যখন চিরুনি চালাচ্ছিল, ত ফেটে পড়ল যমুনা।

"আমি এখুনি ঝিকড়া যাব, আমাকে পৌঁছে দিয়ে এস।"

খিদের সময়, খেতে যাবার মুখে এ ভাল লাগে! একেই তো দিনটা ভাল

সকাল থেকে মেঘ, বৃষ্টি, কনক হাওয়া। তার ওপর, রোজ রোজ ঝামেলা।

প্রথমে কোন কথা বলেনি শিব পাশের ঘরের দাওয়ায় মা ভাত বেড়ে রয়েছে। মন ছিল সেই দিকে। চুপচাপ আঁচড়ে বেরিয়ে আসছিল।

পথ আটকে দাঁড়াল যমুনা, "কি, বলছো না যে?"

—"কি বলবো?"

"আমি এখুনি ঝিকড়া চলে যাব।"

"কেন, এখুনি চলে যাবার হয়েছে?"

"কি হয়েছে, তুমি জানবে কি ক তুমি তো কানে তুলো দিয়ে থাকো, তো মা আমাকে যা মুখে আসে তাই ব তোমার বোনদের ঠেস মা কথা শু হয়, আমি এদের সঙ্গে করবো না, থাক না, থাকবো না।" মাটিতে পা ঠুকে ঠ চেঁচাল যমুনা। শিবলারও মেজাজ গেল।

"যা খুশি কর, যেখানে খুশি যা।" দরজার মুখ থেকে যমুনাকে সরিয়ে বেরিয়ে এল। সোজা গিয়ে বসল। পেছন থেকে চেঁচাল যমুনা—" ঠিক আছে, আমার মরা মুখ দে তুমি—"

ওই শেষের কথাটাই শিবলার ম ঘুরছিল। "আমার মরা মুখ দেখবে আমার মরা মুখ, মরা মুখ।"

এমন জেদি মেয়ে, ঠিক একটা বাধিয়ে ছাড়ল। এই মুহূর্তে মা-বোন উপর অসম্ভব রাগ হ'ল শিবলার। ওরা একটু সহ্য করতে পারত না, একটু নিতে পারত না। যখন জানে যে, ব বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে। পাঁচ ভাই পর ওরা দুটি বোন। গঙ্গা, যম যমুনা সকলের ছোট। বাপের অবস্থা বেশ ভাল। ঘর-গেরস্থালির

দাদাই তো দেখেশুনে ঘরে এনেছিল যমুনাকে। এখন এরকম হ'ল কেন? দোষ কি একলা যমুনার। মায়ের কোন দোষ নেই? টুনি, পুঁটি কি ধোয়া তুলসীপাতা?

এখন কি উপায় হবে? যমুনা যদি মরে যায়? ওর বাপ-ভাইয়েরা কি ছেড়ে দেবে? বাড়িসুদ্ধু সকলের হাতে দড়ি পড়বে না? লোকে মুখে থুথু দেবে না? তাই দিক। থুথু দিক, দড়ি পড়ুক, জেল হোক, তাহলে যদি শিক্ষে হয়। আর যমুনা যদি মরেই যায়, তাহ'লে কার জন্য এই খাটাখাটুনি, কিসের ঘর-গেরস্থালি। সব শূন্য হয়ে যাবে শিবলার। সব ফাঁকা। সামনের ওই রাস্তাটার মত ফাঁকা আর অন্ধকার।

"ও যমুনা, যমুনা, ঘুমুসনে, ঘুমুসনে, তাকা, আমার দিকে তাকা।"

দু' আঙ্গুলে যমুনার চোখের পাতা টেনটান করে খোলার চেষ্টা করে শিবলা। তারপর ঘাড়ের কাছে চিমটি কাটে, চুল ধরে ঝাঁকায়—"ঘুমুসনে, ঘুমুসনে।"

আরো যেন অবশ হয়ে পড়েছে যমুনা। আচ্ছন্নের মত দু'একবার উঃ আঃ করল। বিড়বিড় করে কি যেন বললো। চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে শিবলার। সামনে অন্ধকার, পেছনে অন্ধকার। গাছ-গাছালির মাথায় বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকার জমে আছে।

"ও, বড়দা, আরো জোরে চলুন, বড্ডো দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"এই যে এসে গেছি, রসমুদির আলো দেখা যাচ্ছে।"

সামনে কিছুদূরে রসময় সাহার মুদির দোকানে হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। তারপর ছোট একটা বাঁক ঘুরেই যশোর রোড। দূর থেকে গাড়ির শব্দ আসছে। বাস কিংবা লরি। যশোর রোড দিয়ে যাচ্ছে। কোন দিকে যাচ্ছে। বনগাঁ, না বারাসাত। এখন তাড়াতাড়ি বাসে উঠতে পারলে ভাল হ'ত। বাস কিংবা লরি, যাই হোক।

নয়তো আরো দেরি হয়ে যাবে। এই তিন মাইল রাস্তা আসতেই প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। সামনে আরো পাঁচ মাইল। যদি বরাত জোরে একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। অনেক সময় খালি ট্যাক্সি আসে বনগাঁ থেকে। ফিরে যায় কলকাতার দিকে।

রসমুদির দোকানের আলো পড়েছে সামনের রাস্তায়। রসময়ের ছোট ছেলেটা একপাশে বসে পড়া মুখস্থ করছিল। অন্যদিন এসময় কিছু খদ্দের থাকে। আজ কেউ নেই। সে কারণে লক্ষ করার সুযোগ পেল রসময়—"কে ও, গোবিন্দ নাকি, গাড়ি ঠেলছ যে, আরে শিবলা নাকি, ওরকম বসে কেন, যাচ্ছ কোথায়?"

একটু বেশি কথা বলে লোকটা। বিরক্ত হ'ল শিবলাল। কোন জবাব দিল না।

চলতে চলতে বললো গোবিন্দ—"হাসপাতালে যাচ্ছি"

"কেন, কি হয়েছে?" জোরালো হ্যাজাকের পাশ দিয়ে মুখ উঁচু করে তীক্ষ্ণ চোখে ওদের দেখার চেষ্টা করছিল রসময়। ততক্ষণে দোকান পেরিয়ে আবার অন্ধকারে ঢুকে পড়েছে ওরা।

রসমুদির শেষ কথাটার কোন জবাব দিল না কেউ। সামনে রাস্তার বাঁক। বাঁকের উপর বিষ্টুপদর চায়ের দোকান। তারপর ওদের তেঁতুলতলার আড্ডা। একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের নিচে দুটো ভ্যান-রিকশা। একটা হরেরামের, আরেকটা রজব আলির। কিন্তু ওরা কেউ তেঁতুলতলায় নেই। বিষ্টুপদ চায়ের দোকানে আরো চার-পাঁচজনের মধ্যে বসে রয়েছে। ঘণ্টা দুই আগেও ওদের সঙ্গে ছিল শিবলা। কিন্তু এখন কেমন আলাদা হয়ে গেছে। ওদের কিছু বলা যাবে না। এখন এড়িয়ে চলতে হবে। গোবিন্দ আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। পথে চেনাশোনা কারো কাছে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না। কার মনে কি আছে, কে জানে। সামনে যশোর রোড। চাদর মুড়ি দেয়া মানুষের মত সব জানালা বন্ধ একটা ভেজা বাস হুড়মুড় করে ওদের পঞ্চাশ হাত তফাৎ দিয়ে চলে গেল বারাসতের দিকে।

একটুর জন্য ফসকে গেল। এই গাড়িটার শব্দই ওরা আসতে আসতে শুনেছিল।

গোবিন্দ মন্তব্য করল—"ইস্‌, গাড়িটা ধরতে পারলে ভাল হত।",

দিশেহারার মত শিবলা বললো—"এখন কি হবে?"

কি যে হবে, কেউ বলতে পারছে না। পরের বাস অন্তত পঁচিশ মিনিট পরে।

অতক্ষণ দেরি করতে রাজি নয় শিবলা, "টেনে চালিয়ে গেলে ভ্যান নিয়ে আধঘণ্টায় পৌঁছে যাব।"

আপত্তি করল গোবিন্দ, "এই বাতাস বৃষ্টির মধ্যে টেনে চালাতে পারবি না, অন্ধকার রাস্তা, কিসে থেকে কি হবে—"

গোবিন্দর কথা শেষ হবার আগেই

চেঁচিয়ে উঠল বলাই, "আর একটা গাড়ি আসছে, মনে হচ্ছে লরি।"

দুটো হেডলাইট জ্বালিয়ে হুহু করে চলে আসছে গাড়িটা। তিনজনে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে হই-হই করে থামাল। অবাঙালী ড্রাইভার ডান পাশে মুখ বার করে বাংলায় জিজ্ঞেস করল—"কি হইয়েছে?"

হাত জোড় করে জবাব দিল গোবিন্দ—"এজ্ঞে রোগী নিয়ে বারাসাত হাসপাতালে যাব, যদি পৌঁছে দ্যান দয়া করে।"

"পেছনে উঠুন, জলদি উঠে পড়ুন।"

লরির পেছন দিকে ভ্যান-রিকশাটা ঠেলে নিয়ে গেল গোবিন্দ। যমুনাকে পাঁজা কোলে করে ভ্যানের উপর উঠে দাঁড়াল শিবলা। বলাই টর্চের আলো ফেলল। দু'-জন কুলি-কামিন গোছের লোক পাশাপা উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে। গাড়ি বোধহয় কোথাও ইঁট পৌঁছে দিয়ে ফি আসছে। কিছু ভাঙা ইঁট আর লাল ইঁ ধুলো জলে ভিজে কাদা কাদা হয়ে আ

ওর মধ্যেই কোনরকমে যমুনাকে শু দিয়ে নিজেও উঠে পড়ল শিবলা। পে পেছন গোবিন্দ। বলাইকে লক্ষ্য করে বল

শিবলা—"তুই গাড়িটা রজব আলির কাছে জমা রেখে পরের বাসে শ্যামকে নিয়ে চলে আয়। রজবকে দেখলুম বিশুদার দোকানে বসে আছে।"

গোবিন্দ সাবধান করে দিল—"কাউকে কিছু বলবি না।"

গাড়ি ছুটল। সামনে আলো। পেছনে দ্রুত সরে যাচ্ছে, অন্ধকার পথ। মাথার উপর উঁচু উঁচু গাছ। যশোর রোডের দু'পাশেই এরকম মস্ত মস্ত পুরনো গাছের সারি। জারুল, মেহগিনী, মহানিম, সেগুন, তেঁতুল। হেডলাইটের আলোয় হঠাৎ হঠাৎ দু'একটা ঝাঁকড়াচুলো খেজুর গাছ সাং সাং করে পেছনে ছুটে যাচ্ছে। বৃষ্টি নেই, কিন্তু কনকনে হাওয়া। উবু হয়ে বসে দুই হাতের আড়ালে হাওয়ার হামলা বাঁচিয়ে কোনরকমে একটা বিড়ি ধরাল গোবিন্দ। আরেকটা ধরিয়ে শিবলার মুখে গুঁজে দিল।

যমুনাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসেছিল শিবলা। অনেকক্ষণ পরে বিড়িতে টান দিয়ে যেন স্বস্তি পেল। গলার মধ্যে বিড়ির ধোঁয়ায় আরাম লাগে। কিন্তু কপালে আরাম নেই।

শিবলার ডান কাঁধে মাথা রেখে সামান্য কাত হয়ে কেমন এলিয়েছিল যমুনা। একটু বাদেই চমকে উঠতে হল। বিড়ির সামান্য লালচে আলোয় আবছাভাবে লক্ষ্য হল যমুনার দুই ঠোঁটের ফাঁকে সাদা সাদা ফেনা জমেছে। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি বিড়িটা ফেলে দিয়ে ওর শাড়ির আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিল। জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল—"এই যমুনা, যমুনা, ঘুমুসনে, তাকা আমার দিকে তাকা।"

ঘাড়ে, হাতে কোমরে কয়েকটা চিমটি দিল। উঃ আঃ করে বড় বড় চোখে তাকাল যমুনা।

আবছা অন্ধকারে মনে হল সাদা সাদা চোখের মণি দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছে গেল ওরা। গলায় বুক দেখার নল ঝোলানো লম্বা-চওড়া চেহারার ডাক্তারবাবু মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন—"ওই টেবিলের উপর শুইয়ে দাও" তারপর আরো গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হয়েছে, সাপে কামড়েছে, না ফলিডল খেয়েছে?"

"এজ্ঞে ভুল করে আফিম খেয়ে ফেলেছে।" আমতা আমতা করে জবাব দিল গোবিন্দ।

শিবলা কোন কথা বলতে পারছিল না। কোনরকমে যমুনাকে পাঁজাকোলা করে লম্বা টেবিলটার উপর শুইয়ে দিল।

—"কি বললে? ভুল করে আফিম খেয়ে ফেলেছে, হুঁঃ বুঝো সব—" হাতের সিগারেটটায় লম্বা টান দিয়ে ছাইদানে গুঁজে দিলেন ডাক্তারবাবু। পাশে দাঁড়ানো মাথায় রুমাল বাঁধা ধবধপে পোশাকের নার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিস্টার, এই নিয়ে আজ ক'টা হল, তিনটে, না? এরা ভুল করে আফিম খায়, ভুল করে ফলিডল খায়, হুঁঃ যতো সব—" ধীরে সুস্থে উঠলেন ডাক্তারবাবু। যমুনার নাড়ি দেখলেন, চোখের পাতা টেনে দেখলেন, বুকে পিঠে নল লাগিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন—"সিস্টার, একে এখুনি স্টমাক ওয়াশ দিতে হবে, এগারো নম্বর বেড বোধ হয় খালি হয়েছে, নিয়ে যান, তাড়াতাড়ি, এই রামদেও, রামদেও—"

চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গোঁফ গালপাট্টাওয়ালা জোয়ান চেহারার একজন এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। হুকুম দিলেন ডাক্তারবাবু—"এগারো নম্বর বেড মে লে যাও।"

তারপর বেসিনে হাত ধুয়ে আবার আগের জায়গায় বসলেন। মোটা একটা খাতা টেনে কলম তুলে গোবিন্দকে লক্ষ্য করে বললেন—"নাম বলো, বয়স কত?"

"এজ্ঞে আমার নাম গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত, বয়স? বয়স বত্রিশ।"

"তোমার মুণ্ডু, ইডিয়েট কোথাকার, তোমার নাম কে জিজ্ঞেস করেছে, এই মেয়েটার নাম বলো।"

"এজ্ঞে ওর নাম যমুনা, যমুনা সামন্ত।"

"বয়স কত?"

"ওর বয়স, বয়স কত হবে?" শিবলার দিকে তাকাল গোবিন্দ।

"আঠারো-উনিশ।" জুড়ে দিল শিবলাল। এবার শিবলাকে নিয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু—"তোমার কে হয়?"

"আজ্ঞে আমার ইস্ত্রী।"

"হুঁ, বুঝতে পেরেছি, খুব ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে বুঝি, মারধোর করেছ।"

"কই, না তো।"

"তাহলে, আফিম খেল কেন?"

"আজ্ঞে আমি কিছু জানি না, আমি বাড়ি ছিলুম না, এসে শুনি ভুল করে—" প্রায় হাউমাউ করে উঠল শিবলা।

"চুপ করো, এখানে চেঁচাবে না।" ধমক দিলেন ডাক্তারবাবু। সেই মন্তব্য, "ভুল করে আফিম খেয়েছে, হুঁশ নেই। সব—" তারপর খাতার উপর ঝুঁকে বললেন—"যাকগে, তোমার নাম বলো, ঠিকানা বলো।"

"আজ্ঞে, আমার নাম শিবলাল সামন্ত।" গড় গড় করে কলের পুতুলের মত আউড়ে গেল শিবলাল—"গাঁয়ের নাম সাতগাছি, দক্ষিণপাড়া, পোস্টাফিস দত্তপুকুর, জিলা—"

"আহা, আস্তে আস্তে, অত চড়বড় করে ব'লো না, কি নাম বললে, শিবলাল সামন্ত, গাঁয়ের নাম সাতগাছি।"

বিড়বিড় করে বলতে বলতে সামনে ঝুঁকে লিখছিলেন ডাক্তারবাবু। চওড়া কপালে ইলেকট্রিক আলো পড়ে চকচক করছিল। সেইদিকে তাকিয়ে মনে হল শিবলার, ডাক্তারবাবু যেন হাইকোর্টের হাকিম, এখুনি রায় দেবেন, যমুনা বাঁচবে কি মরবে। এদিকে সেই রামদেও এবং সঙ্গে আরেকজন স্ট্রেচারে করে যমুনাকে ভেতরে নিয়ে গেল। লেখা শেষ করে মুখ তুলে বললেন ডাক্তারবাবু—"তোমরা এখন বাইরে যাও, এখানে ভিড় করো না।"

"ডাক্তারবাবু, ও কি বাঁচবে?" ককিয়ে উঠল শিবলা।

"বারো ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাবে না, কান্নাকাটি চেঁচামেচি করে কোন লাভ নেই, বাইরে গিয়ে বসো, এখানে ভিড় ক'রো না, আমাদের কাজের অসুবিধে হয়।" ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হবার আগেই একটি দশ-এগারো বছরের ছেলেকে ধরাধরি করে কয়েকজন নিয়ে এল। জামাকাপড়ে রক্ত। মাথা ফেটে গেছে। কাঁকিনাড়ার কাছে একটা লরী ধাক্কা দিয়ে পালিয়েছে। ছেলেটি কাঁদছে না, কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবু। গোবিন্দ বললো—"চল্‌, বাইরে বসবি।"

এই চোট খাওয়া ছেলেটির মত শিবলাও কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। ওর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল গোবিন্দ। বাইরে লম্বা বারান্দায় খানকয়েক বেঞ্চি পাতা। এদিক-ওদিক অপেক্ষা করছে অনেক লোক। বাইরে সিঁড়ির কাছেও জটলা। একটা বেঞ্চির এক পাশে বসলো শিবলাল। কেমন আচ্ছন্নের মত বসে রইল।

"এক কাপ চা খাবি শিবলা।" জিজ্ঞেস করল গোবিন্দ।

"কিছু খাব না, কিছু ভাল লাগছে না।"

"শোন, অস্থির হয়ে তো কোন লাভ নেই, মাথা ঠাণ্ডা কর।"

"কি হবে, দাদা?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবিস নে।" ওদের কথার মধ্যেই বলাই আর শ্যাম এসে পৌঁছল। পয়ের বাস ধরে এসেছে ওরা। ওদের একপাশে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় কি সব বোঝাতে লাগল গোবিন্দ।

কিছুই শোনার ইচ্ছে নেই শিবলার। সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চুপ বসেছিল। দেয়ালে কয়েকটা ইংরেজি-বাংলা নোটিশ। গায়ে আগুন লাগলে কি করা উচিত, (পরপর কয়েকটা ছবির সঙ্গে) সে বিষয়ে উপদেশ। পাশেই জলে ডোবা মানুষের শুশ্রূষার বিবরণ (এর সঙ্গেও কয়েকটি ছবি)।

কিন্তু কোথাও আফিম খাওয়া মানুষ সম্পর্কে কোন নির্দেশ নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে সব কটা দেয়ালের লেখাই দেখল শিবলা। বসন্তের টিকা নিন। বসন্ত রোগীর সম্পর্কে খবর দিলে পুরস্কার, কিংবা ছোট পরিবার সুখী পরিবার ইত্যাদি অনেকরকম লেখা রয়েছে, কিন্তু শিবলা যা খুঁজছে, তা নেই। (ক্লাশ এইট অবধি পড়েছিল, সুতরাং বাংলা বেশ পড়তে পারে, ইংরেজিও কিছু কিছু।)

এমন সময় চোখে পড়ল রামদেও নামের লোকটি ভেতর থেকে এল। সঙ্গে আরেকজন।

দু'জনে স্ট্রেচার নিয়ে এসেছে। এবার ওরা সেই আহত ছেলেটিকে ভেতরে নিয়ে গেল। ছেলেটির মাথায় এতক্ষণে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ডাক্তারবাবুও ওদের সঙ্গে ভেতরে গেলেন।

শিবলার ইচ্ছে হল ওদের পেছন পেছন যায়, যমুনাকে একটু দেখে আসে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। ভেতরে কি হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গোবিন্দ এসে বললো—"শ্যাম আর বলাই বাড়ি চলে যাক।"

"আপনি যা ভাল বুঝবেন।"

"তুই যাবি ওদের সঙ্গে কিছু খেয়ে আসবি?"

সর্বনাশ! কি বলছে বড়দা! এই বারান্দা ছেড়ে এখন এক পাও নড়বে না শিবলা।

মনে হচ্ছিল এখান থেকে সরে গেলেই যমুনাকে আর ফিরে পাবে না।

"ফিরে যাবি ওদের সঙ্গে?" বড়দার কথা শুনে অসম্ভব রাগ হচ্ছিল। কঠিন চোখে তাকালো শিবলা—"না কোথাও যাবো না।"

"অবুঝ হোস না, সারা রাত থাকতে হবে, এইবেলা গিয়ে—"

"কেন বিরক্ত করছেন, আপনারা গিয়ে খেয়ে আসুন।" ঝাঁঝিয়ে উঠল শিবলা। অগত্যা সরে গেল গোবিন্দ। এমন সময় সেই রামদেও আবার বাইরে এল। এবার আর তেমন ব্যস্ত ভাব নেই। গায়ে নীল রঙের হাফ সার্ট, খাকি হাফপ্যাণ্ট, পায়ে টায়ারের স্যাণ্ডেল। পকেট থেকে লম্বা মত একটা কৌটো বার করল। কৌটোর দুইদিকে দুটি ঢাকনি। একদিক খুলে খইনি বার করে বাঁ হাতের তেলোয় ঢেলে নিল। সেদিকটা বন্ধ করে, আবার আরেকদিক খুলে আঙুলের ডগায় একটু চুন নিল।

তারপর কৌটোটা পকেটে রেখে খইনি ডলতে ডলতে একটা বেঞ্চির এক কোণে বসল। গোবিন্দ কাছে এসে ওর সঙ্গে

আলাপ জুড়ে দিল। কি বিষয়ে আলাপ খানিকটা দূর থেকে শিবলা ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না। শোনার ইচ্ছেও ছিল না। খানিকবাদে শুধু লক্ষ করল, গোবিন্দর ইশারা মত বলাই গিয়ে এক ছোকরা চা-ওয়ালাকে ডেকে আনল। হাসপাতালের গেটের সামনে রাস্তার উলটো দিকে চায়ের দোকান। সেখান থেকে এক কেটলি চা আর কয়েকটি মাটির ভাঁড় নিয়ে এসেছে ছেলেটি।

রামদেওর হাতে ভাঁড় দিল গোবিন্দ। ছেলেটি চা ঢালল। তারপর বলাই আর শ্যাম নিল।

কেমন ফোকা চোখে তাকিয়েছিল শিবলা। শ্যাম এদিকে এসে ওর সামনে চায়ের ভাঁড় ধরে বললো,—"দাদা, চা নাও।"

"তোরা নে।" শিবলার কথার জবাবে বললো শ্যাম—"আমরা তো নিচ্ছি, বড়দা, বললো তোমাকে দিতে।"

অনিচ্ছার সংগে চায়ের ভাঁড়টা নিল শিবলা। কিন্তু চুমুক দিয়ে আরাম পেল। গলা থেকে বুক অবধি এতক্ষণ যেন শুকিয়ে ছিল। চায়ের পর বিড়ি চাই। নিজের পকেট হাতড়ে কিছু পেল না। গোবিন্দ, বলাই, শ্যাম আর রামদেও কাছা-কাছি বসে চা খাচ্ছিল। বলাইকে ডেকে বিড়ি আর দেশলাই নিল শিবলা।

গোবিন্দ কাছে এসে বললো—"ওই লোকটার নাম রামদেও, এখানে কাজ করে, ও বলছিল, তুই যদি বউমাকে দেখতে চাস্, তাহলে কিছু সময় পরে ও তোকে ডেকে নিয়ে যাবে, ভেতরে যেতে পারবি না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে আসতে পারবি।"

চায়ের পর আরেক টিপ খইনি ডলতে ডলতে সামনে এল রামদেও। বিড়িটা ফেলে দিয়ে এমন ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল শিবলা, যেন যমুনার বাঁচামরার মালিক এসেছে।

গোবিন্দ বললো—"এই আমার ভাই শিবলাল।"

খইনি টিপতে টিপতে শিবলার পা থেকে মাথা চোখ বুলিয়ে বললো রামদেও—"আপনার জেনানা আছে? রামজীকে ডাকুন, রামজীর কিরপায় সোব ঠিক হোয়ে যাবে।"

শিবলার ইচ্ছে হ'ল লোকটার পা জড়িয়ে কাঁদে আর বলে—"বাঁচান, ওকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।"

কিন্তু সাহস পেল না। বুকের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট পুষে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিক থেকে ডাক্তারবাবুর ডাক শোনা গেল—"রামদেও, রামদেও—"

"কি হইলো আবার, খালি রামদেও আর রামদেও।" চট্‌পট খইনির টিপটা মুখের মধ্যে চালান করে ব্যস্তভাবে চলে গেল রামদেও। গোবিন্দ বললো—"বলাই আর শ্যাম বাড়ি চলে যাক—"

"আপনিও চলে যান, এখানে বেশী লোক থাকার কি দরকার।" শিবলা বললো।

"তুই একা থাকবি, সেটা ঠিক হবে না, তুইও বরং চল আমাদের সংগে, আমি আর তুই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবো।"

"আমি কোথাও যাবো না, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না, আপনারা চলে যান।"

"আমি ফিরে আসবো, যত রাতই হোক, চলে আসবো।"

ওরা যাবার মুখে পা বাড়াতে পেছন থেকে ডাকল শিবলা—"বড়দা, একটা কথা শুনুন।"

তারপর গোবিন্দর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললো—"ঝিকড়ায় ওর বাপের বাড়িতে একটা খবর দেওয়া উচিত না?" আপত্তির সুরে জবাব দিল গোবিন্দ—"আজ রাত্তিরটা কাটুক, কাল সকালে দেখা

যাবে, যদি তেমন কিছু হয় খবর দিতে হবে, নয়তো ভগবান করুন, ভালো হয়ে গেলে পুরো ব্যাপারটা চেপে যেতে হবে, হাজার হোক কুটুম বাড়ি। নিজেদের ঘরের কথা ওসব জায়গায় বলার দরকার কি, নানান্-রকম কথা উঠবে, কি হয়েছে, কেন হয়েছে, বুঝিস্ না।"

ওরা চলে গেল। একা একা বসে রইল শিবলা। লম্বা সময় আরে, লম্বা হতে হতে ডাক্তারবাবুর ঘরের দেয়াল ঘড়িটায় টং-টং করে নটা বাজিয়ে দিল।

ভেজা সার্ট আর ধুতি। বেশ শীত-শীত করছিল। আধভেজা ধুতির খুট গায়ে জড়াল।

বলাই চারটে বিড়ি আর দেশলাই রেখে গিয়েছিল। পর পর বিড়ি কটা শেষ হতে হতে দশটা গুনল। আশেপাশে আর ভিড় নেই। বেঞ্চিগুলি প্রায় ফাঁকা। রামদেও এল। সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন অদ্ভুত চাউনি। উঠে দাঁড়াল শিবলা। রামদেও বললো —"আপনার জেনানাকে দেখবেন, আসুন হামরা সাথ্—" কথা বলার সংগে সংগে দিশি মদের কটু গন্ধ নাকে এল। জিনিসটার আস্বাদ জানে শিবলা। কিন্তু যমুনার চেঁচামেচির ভয়ে বিয়ের পর এই এক বছরের মধ্যে তার গলা ভেজাবার সাহস হয়নি। এখন এক চুমুক পেলে হত। "আপনি কিন্তু কাছে যেতে পারবেন না, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এমনি উঁকি মেরে দেখে লিবেন।" গলা বাড়িয়ে উঁকি মারার ভঙ্গিটা দেখাল রামদেও। একটু নেশা হয়েছে মনে হল। আরো খানিকটা বক্‌বক্ করলো, "আমার আখন ডিউটি খতম্, এবার গুলাবচাঁদের ডিউটি, ওকে চা-পানি খেতে দু-চার আনা দিবেন।"

বাইরের বারান্দা থেকে রামদেওর পেছন পেছন লম্বা একটা করিডরে ঢুকল শিবলা। রামদেও বলে দিল, ডাইনে মর্দানা, বাঁয়ে জেনানা ওয়ার্ড। বাঁ পাশের দুটি দরজা ছাড়াবার পর তৃতীয় দরজাটার সামনে দাঁড়াল রামদেও। হাত তুলে বললো—"ওহি দেখুনে।"

দরজার পাশে একটি বেড। তারপর এগারো নম্বরে বসে আছে যমুনা। ওকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অবাক হয়ে দেখল শিবলা। লম্বা কাপড়ের ফালি দিয়ে যমুনার কোঁকড়া চুলের গোছা উঁচু করে মশারি টানাবার দড়ির সংগে বাঁধা। সুতরাং শুয়ে পড়ার উপায় নেই। ঝি[illegible] ঝোঁকে সামনে ঢুলে পড়তেই চুলে টা[illegible]গে চমকে সোজা হয়ে বসছে। শিবলার [illegible]খের সামনেই দু-তিনবার এ রকম হ[illegible]ক একবার বড় বড় চোখে তাকাচ্ছে যমু[illegible]। কাছাকাছি কেউ নেই। একেবারে একা।

একা-একা কষ্ট পাচ্ছে যমুনা। সেই কষ্টটা যেন শিবলার বুকের ভেতর চোখ ফেটে জল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। এমন সময় একজন সিস্টার নিঃশব্দে এসে যমুনার হাতে একটা সুঁই ফুটিয়ে গেল। নাকমুখ কুঁচকে একবার উঃ-আঃ করে উঠল। তারপর আবার আগের মত ঝিম হয়ে বসে রইল। শিবলার ইচ্ছে হ'ল ওর কাছে গিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—"ঘুমসে নে যমুনা, ঘুমসে নে, ঘুমুলেই মরণ।" বোধ হয় দশ বারো মিনিট দাঁড়িয়েছিল শিবলা। ওর পাঁজরে আঙুলের খোঁচা মেরে চাপা গলায় বললো রামদেও—"চলে আসুন, আর কি দেখবেন, আখন সারারাত ওহি চলবে, শুধু রামজীকে ডাকুন।"

আবার বাইরের বারান্দায় ফিরে এসে লম্বা বেঞ্চির এক পাশে বসল শিবলা। তখন প্রায় ফাঁকা। দু-চারজন যারা ঘোরাঘুরি করছে, তারা হাসপাতালের লোক। বাইরের তেমন কেউ নেই। ডিউটি বদলের সময়। নাইট ডিউটির নার্স, আয়া, ওয়ার্ডবয়রা আসছে। রামদেও চলে গেল। তার জায়গায় এল গোলাপচাঁদ। তাকে চা-পানি খেতে আট আনা পয়সা দিল শিবলা। আরো এক ঘণ্টা পরে গোবিন্দ এল। সাইকেল চালিয়ে এসেছে। বুদ্ধি করে দুখানি চাদর, শিবলার একটা গেঞ্জি, অ্যালুমিনিয়মের কৌটোয় আটার রুটি, আলুভাজা, আখের গুড় নিয়ে এসেছে। কিছু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না শিবলার। গোবিন্দ অনেক বলে কয়ে খাওয়াল। টিউবওয়েল থেকে নিজেই টিফিন কৌটোয় জল নিয়ে এল।

সাইকেলটা বারান্দায় তুলে পেছনের চাকায় লোহার চেন দিয়ে আটকালো। তার-পর ওধারের একটা বেঞ্চিতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। ছেঁড়া জামাটা খুলে রেখেছিল
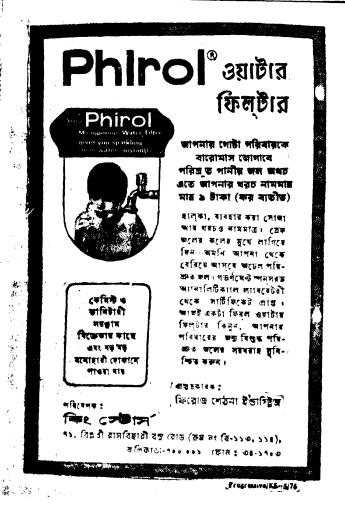
শিবলা। গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে চাদর জড়িয়ে বেঞ্চিতে পা তুলে বসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

রাত এগারোটা বাজল। কানের কাছে মশা বিন্‌বিন্‌ করছে। হঠাৎ নজরে এল বাইরের সিঁড়ির সামনে সাত-আটজন লোক একটা দড়ির খাটিয়া আর কিছু ফুল এনে রাখল। কাউকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। ভীত চোখে তাকিয়ে রইল শিবলা। শিরদাঁড়ার ভেতর একটা শিরশিরানি ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে নতুন কাপড়ে ঢেকে একটি আধবুড়ো মানুষকে খাটিয়ায় চাপিয়ে নিয়ে গেল ওরা। গেটের বাইরে রাস্তায় উঠে চাপা গলায় হরিধ্বনি দিল। জড়োসড়ো হয়ে বেঞ্চির উপর বসে রইল শিবলা। বসে বসেই সমস্ত ব্যাপারটা দেখল। টং টং করে বারোটা গুনল। ওপাশের একটা বেঞ্চিতে হাঁটুভাঙা দ হয়ে শুয়ে আছে গোবিন্দ। মশার জ্বালায় আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। অনেকক্ষণ বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে এক সময় শুয়ে পড়ল শিবলা। পাতলা ঘুমের মধ্যে আবছা স্বপ্ন দেখল। একটা মাটির রাস্তা ধরে যেন সে হাঁটছে। আগে আগে যাচ্ছে যমুনা। রাস্তায় জল। জলস্রোত। কোথা থেকে এত জল আসছে বোঝা যাচ্ছে না। জল বাড়ছে। হাঁটুজল বুক সমান হল। প্রবল স্রোত ঠেলে এগোন যাচ্ছে না। যমুনা ডুবে যাচ্ছে। যমুনা চেঁচাল—"বাঁচাও, বাঁচাও।" কি করবে এখন শিবলা। প্রাণপণেও এগোতে পারছে না। হাত-পা পাথর। যমুনার কাছে যেতে পারছে না। অথচ কাছে যাওয়া দরকার। খুব দরকার। এমন সময় কে যেন ডাকল —"এই, এই শিবলা।" কে ডাকছে, মা নাকি? মা ডাকছে। না, বড়দার গলা। গোবিন্দ ডাকছে। চোখ মেলে তাকাল শিবলা। মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে গোবিন্দ। পাশে সাদা রুমাল মাথায় একজন নার্স। ধড়মড় করে উঠে বসল শিবলা। গোবিন্দ বললো—"দিদি কি বলছে, শোন।"

নার্সদিদি বললেন—"ভয় নেই, আপনার স্ত্রী বেঁচে যাবে, এখন বাড়ি চলে যান, বিকেল চারটের পর এসে দেখা করবেন। এখন এখানে বসে থেকে কোন লাভ নেই।"

কিছুই মাথায় ঢুকল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শিবলা। গোবিন্দ বুঝিয়ে দিল—"বউমা, বেঁচে গেছে, আর ভয় নেই, এখন দেখা করা যাবে না, দিদি আমাদের বাড়ি চলে যেতে বলছেন, বিকেলে দেখা করার সময় আসতে বললেন।"

রাত ফুরিয়ে এসেছে। ভোর রাতের তরল অন্ধকারে অনেকটা হাল্কা মনেই ওরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। গোবিন্দর সাইকেলে বাড়ির দিকে রওনা হল দুজনে।

বিকেল চারটের সময় শিবলার মা, টুনি-পুটি-শ্যাম এল। সঙ্গে বলাই, গোবিন্দ আর শিবলা। শাশুড়ীকে দেখে কেঁদে ফেলল যমুনা। শিবলার মাও কাঁদতে লাগল। টুনি-পুটির চোখেও জল।

কাঁদতে কাঁদতে বললো যমুনা—"মা আমাকে বাড়ি নে যাবেন না?"

"নে যাবো বইকি মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষী, নিশ্চয় নে যাবো।" শিবলার মা আঁচল দিয়ে যমুনার চোখের জল মুছিয়ে দিল। চোখের জল বড় পবিত্র। চোখের জলে সব ময়লা মুছে যায়।

বাইরের বারান্দায় গোবিন্দ, বলাই আর শিবলা অপেক্ষা করছিল। বলাই উঁকি মেরে দেখে এসে হাসিমুখে মন্তব্য করল—"শাউড়ী-পুতের বউ কেঁইদে ভাসাচ্ছে।"

শিবলাকে লক্ষ্য করে বললো গোবিন্দ —"কাকিমাকে কান্নাকাটি করতে বারণ কর, আর বউমাকে বলগে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে যেন বলে, ভুল করে খেয়ে ফেলেছে।"

শিবলা এসে গোবিন্দর শেখানো কথা বলতেই মাথার আঁচল টেনে জবাব দিল যমুনা—"থাক তোমাকে আর শিখুতে হবে না, যাও তো এখান থেকে, আমি মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলি।" বলতে বলতে ওপাশ ফিরে শাশুড়ীর শির-ওঠা হাতের ক্ষয়া-ক্ষয়া আঙুলগুলি আঁকড়ে ধরল যমুনা।

বিশ্ববিজ্ঞান

বছরে এক লক্ষ পরমাণু বোমা

২০০০ খৃষ্টাব্দের শুরু থেকে সারা পৃথিবীতে প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে বছর প্রতি পনের লক্ষ কিলোগ্রামের মত। একটি পরমাণু বোমা তৈরির জন্যে দরকার পনের কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম। আর তা যদি হয়, তাহলে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ ইচ্ছে করলে ওই প্লুটোনিয়ামের সাহায্যে বছরে এক লক্ষ পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষমতা অর্জন করবে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'এ শর্ট হিসটোরি অভ্ নন প্রোলিফারেশন' নামে একটি পুস্তিকায় প্লুটোনিয়াম উৎপাদন সংক্রান্ত এই তথ্যটি উল্লেখ করেছে খোদ ইনটারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি বা আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা।

আন্তর্জাতিক এই সংস্থার আর একটি প্রতিবেদন : ১৯৭৪ সালে সারা পৃথিবীতে মোট সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২০৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সামগ্রিক পৃথিবীর গড় জাতীয় উৎপাদনের ছয় শতাংশেরও বেশি। সামরিক গবেষণা এবং উদ্যোগের দরুন বছরে ব্যয়ের পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলার। বলা বাহুল্য, পরবর্তী দুই বছরে এ ব্যয় আরও বেড়েছে। আর এর বড় রকমের একটি অংশ কাজে লাগান হয়েছে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার ব্যাপারে। যারা জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড কার্যকর। বিস্ফোরক হিসেবে যাদের অনেকেরই ডগায় স্থান পেয়েছে পরমাণু বোমা। যে সব বোমার পারমাণবিক বিস্ফোরক হিসেবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থান পেয়েছে প্লুটোনিয়াম। কোন ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম—২৩৫।

কোন দেশ কি কি ধরনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে তার যৎসামান্য পরিচয় দিই।

প্রথমে মার্কিন দেশের কথাই ধরা যাক। ১৯৫৪ নাগাদ এরা তৈরি করেছিল রেগুলাস-১ নামে এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। বিস্ফোরক সহ এই ক্ষেপণাস্ত্রের ওজন ৬৫৮৭ কিলোগ্রাম। বিস্ফোরক হিসেবে যে পরমাণু বোমা এর ডগায় বসান হয় তার ওজন প্রকাশ করা হয় নি। এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৯২৫ কিলোমিটার। ১৯৫৮ সালে ওরা তৈরি করে রেগুলাস-২ নামে আর এক ধরনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র। ওজন ১৩,৬০০ কিলোগ্রাম। পাল্লা ১৫০০ কিলোমিটার। ওই একই বছর তৈরি করা হয় নাভাহো ক্ষেপণাস্ত্র। পাল্লা ৮০০০ কিলোমিটার। পরে এদের বাতিল করে দেয়া হয়।

ওদের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরমাণু বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে পড়ে স্নার্ক। ওজন ২২,৭০০ কিলোগ্রাম। পাল্লা ১০,১৪০ কিলোমিটার। এদের কার্যকর করে তোলা হয় ১৯৫৮ সালে। ১৯৬১ সালে বাতিল করা হয়। ক্যাড আর এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। পাল্লা ১০০০ কিলোমিটার। এটিও বাতিল করা হয়েছে ১৯৭৩ সালে। এখন ওরা তৈরি করছে এ এল সি এম নামে বিশেষ এক ধরনের পরমাণু বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্র। যার পাল্লা ১৮০০ কিলোমিটার।

সোভিয়েত দেশের ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কাইপার, পাল্লা ২১০ কিলোমিটার, ক্যাংগারু, পাল্লা ৭৪০ কিলোমিটার, স্যাডক, পাল্লা ৪৬০ কিলোমিটার, এস এস—এন-১২, পাল্লা ৭৫০ কিলোমিটার। এটি বর্তমানে প্রস্তুতির পথে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সব অস্ত্র সম্পর্কিত বেশির ভাগ তথ্যই গোপন করা হয়। বিশেষ করে কোন ক্ষেপণাস্ত্রের ডগায় কি ধরনের পারমাণবিক বোমা বসান রয়েছে, তাদের সঠিক বিস্ফোরণ ক্ষমতাই বা কত, এ সব কথা মুক্ত পৃথিবীর কাছে সম্পূর্ণ অজানাই রয়ে গেছে। শুধু সত্য এই, যত গোপন করার চেষ্টাই করা হোক না কেন, পরমাণু বিজ্ঞান প্রকল্পে মুষ্টিমেয় যে কয়টি দেশ সারা পৃথিবীতে এখন বড় ভাই-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ, পরমাণু বোমা তৈরির ব্যাপারে কেউ যে তাই বসে নেই, বলাই বাহুল্য।

এ সম্পর্কে সদ্য পরলোকগত (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬) নোবেল বিজ্ঞানী এবং আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের অন্যতম

প্রবক্তা ভার্নার হাইজেনবার্গ (এঁর সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব) আর একজন নোবেল বিজ্ঞানী এবং পরমাণু বোমার জনক এনরিকো ফের্মির কাছে একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'জৈবিক এবং রাজনৈতিক কারণে পরমাণু বোমা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করা হোক।' ১৯৫৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরাও এ ব্যাপারে প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮—এই ছয় বছর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৮টি সদস্য দেশ নিয়ে যে নিরস্ত্রীকরণ কমিটি তৈরি করেন, ওই কমিটি এ ব্যাপারে নানা রকম বিধিনিষেধের ওপর পরিকল্পনা রচনায় হাত দেয়। এই কমিটিতে রয়েছে ভারত, ব্রাজিল, বুলগারিয়া, বার্মা, ক্যানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, ইটালি, মেকসিকো, নাইজেরিয়া, পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, সুইডেন, সোভিয়েত দেশ, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব নেয়া হয়। যার শিরোনাম নন-প্রোলিফারেশন অভ নিউ-ক্লিয়ার ওয়েপনস বা পারমাণবিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ। প্রস্তাবটি গৃহীতও হয়েছে।

এই প্রস্তাবের এক, দুই এবং তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পৃথিবীর কোন দেশ অপর কোন দেশের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র, পারমাণবিক বিস্ফোরক এবং ওই ধরণের বিস্ফোরককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন কোন যন্ত্রাদি বিনিময় করবে না। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত থাকবে এবং যে সব দেশে পারমাণবিক প্রকল্প গড়ে ওঠে নি তাদের ওই ধরনের অস্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করবে না। তবে পরমাণু বোমা তৈরি করতে সক্ষম হয় নি এমন সব দেশ মানবিক কল্যাণের জন্যে যাতে পারমাণবিক গবেষণার কাজ চালাতে সক্ষম হয় তার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। প্রস্তাবে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, যে সব দেশ পারমাণবিক অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছে তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাদির ভাণ্ডার ফাঁকা করে দেবেন। এবং ইত্যাদি।

প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট কল্যাণকর সন্দেহ নেই। কারণ ফের্মির কাছে হাইজেনবার্গের মন্তব্য যে কত বাস্তব তার পরিচয় ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি। দীর্ঘ তিন দশক ধরে পরমাণু বোমাকে নিয়ে যথেষ্ট রাজনৈতিক চাল চালা হয়েছে। মানবিক

সমস্যাও দেখা দিয়েছে। হাইজেনবার্গ যাকে বলেছিলেন বাইওলজিকেল কনসিকুয়েন্সেস। পারমাণবিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন উৎপাদন করা হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। পারমাণবিক বিজ্ঞানের কল্যাণে তৈরি করা হচ্ছে নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা সংস্থানিক পদার্থ। এই সব আইসোটোপের বিকিরণকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হচ্ছে নানা রকম অধিক ফলনশীল বীজ। ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে কাজে লাগান হচ্ছে পারমাণবিক বিজ্ঞান। ওষুধ শরীরের কোন অংশে গিয়ে কি ধরনের বিক্রিয়া করে সে সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারেও আজ পারমাণবিক বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিসীম। কৃত্রিম হৃৎচালক যন্ত্র বা পেস মেকারকে সক্রিয় রাখার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তির যোগানদার হিসেবে কাজ করছে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এমন উদাহরণ অনেক বরং এ ধরনের উদাহরণের তালিকা দিন দিন বাড়ছে।

এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সমস্যাও। পৃথিবীর নানান দেশে গত কয়েক বছরে গড়ে উঠেছে একের পর এক বড় বড় পারমাণবিক চুল্লি। আরও গড়ে উঠবে। মুখ্যত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্যেই এই সব চুল্লি তৈরি করা হয়েছে। পারমাণবিক প্রজ্জ্বলনের পর এদের থেকে বেরিয়ে আসে প্লুটোনিয়াম সহ নানা রকম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। প্রজ্জ্বলনের পর পারমাণবিক ভস্ম বলতে যা অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যেই থাকে-এই সব বস্তু। ভস্ম থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্লুটোনিয়াম এবং আরও কিছু কিছু আইসোটোপ পৃথক করে নেয়া হয়। পৃথক করার পরেও ভস্মের অবশেষের মধ্যে আরও নানা রকম তেজস্ক্রিয় কণা থেকেই যায়। এই তেজস্ক্রিয় কণা সমেত ওই ভস্ম ভেতর থেকে বিকিরণ বেরিয়ে আসতে পারে না, বা পারলেও তার মাত্রা খুবই কম, এমন ধরনের আধারের মধ্যে পুরে দুর্গম মরুভূমির গভীর ভূস্তরের নিচে অথবা সমুদ্রের গভীরে রেখে দেয়া হয় যাতে করে অপ্রয়োজনীয় ওই ভস্মের বিকিরণ জীবজগতের না ক্ষতি করতে পারে। যদিও এই ব্যবস্থা কতটা নিরাপদ সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণও করছেন কেউ কেউ। এরা মনে করেন, যদি কোনভাবে ওই আধারগুলি ভেঙ্গে যায় অথবা তাদের ভেতর থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণী জগতের কাছে নিশ্চয় তা কল্যাণকর হবে না। জলের মাছ, উদ্ভিদ এবং সমুদ্রের ধারে যাদের বাস, তারা তেজস্ক্রিয়জনিত রোগে আক্রান্ত হবে। মাটির প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীরে ঘটবে তেজস্ক্রিয়জনিত প্রতিক্রিয়া। এমনও হতে পারে, এক দেশ তার নিজের চৌহদ্দির মধ্যে পারমাণবিক বিকিরণজনিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল, কিন্তু অনিবার্য কারণে সে নিরাপত্তা রক্ষা করা গেল না। জল এবং বাতাস কলুষিত হল। তেজস্ক্রিয় বিকরণের উৎসগুলি ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য দেশে। তখন?

নানা রকম তেজস্ক্রিয় বস্তু নিয়ে এখন গবেষণা হচ্ছে নানান শিল্পে তাদের কাজেও লাগান হচ্ছে। এ সব কাজ করতে গিয়ে মানুষ যে ঝুঁকি নিচ্ছে না, নিলেও কতটা ঝুঁকি নিচ্ছে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেই এ ধরনের সমস্যা এখন বড় রকমের গবেষণার বিষয়।

হাইজেনবার্গের মন্তব্য শুনে ফের্মি বলেছিলেন কি অপূর্ব সুন্দরই না এই পরীক্ষার কাজটা। বলেছিলেন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে। ফের্মি কোন ভুল বলেন নি। প্রকৃতির অজ্ঞাত রহস্যের অন্তর্দেশে গিয়ে এভাবে তার উদ্ধার এবং পরবর্তীকালে তার সাহায্যে মানবিক কল্যাণ নিশ্চয় আশীর্বাদ। কিন্তু হাইজেনবার্গের সেই যে সাবধানবাণী বাইলজিক্যাল কনসিকুয়েন্সেস—তার কথা ভেবেও পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানী এখন শঙ্কিত। অন্তত বিশ্বমানব প্রীতি যাঁদের মধ্যে রয়েছে তাঁরা তো বটেই।

এক লক্ষ পরমাণু বোমা তৈরির মত প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করার কথা শুনে অনেকেই আজ শঙ্কিত। অথচ এটা যেন এক অনিবার্য ঘটনা। কারণ পৃথিবীময় শক্তির আগ্রাসী চাহিদা মেটানর জন্যে পারমাণবিক চুল্লির ওপর পৃথিবীর মানুষকে ভবিষ্যতে আরও বেশি নির্ভর করতে হবে। আর ওই সব চুল্লি থেকেই তৈরি হবে প্লুটোনিয়াম। অত বেশি প্লুটোনিয়াম।

নৈতিক কথাটা থাক। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে নৈতিক নামক এই শব্দটি বড় বেশি আপেক্ষিক। ব্যক্তি এবং সময় বিশেষে এবং সুবিধেমত এর অর্থটি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কথাটির ওপর আস্থাও এখন অনেকের কম। বরং বলা চলে নিরাপত্তা নৈতিকতার কথা তুলে এখনকার মানুষকে যতটা না সামলান যায়, তার চেয়ে বেশি সামলান যাবে নিরাপত্তার কথা তুলে। বলা বাহুল্য, পারমাণবিক বোমা যে কতখানি ক্ষতিকর জাপানের কাছাকাছি দ্বীপাঞ্চলে তার প্রমাণ (১৯৪৫-এর ঘটনা) এখনও বর্তমান। কত মানুষ, কত প্রাণী, সমুদ্রের মাছ এখনও তার বলি হয়ে কাল গুনছে। এবং এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, পরমাণু বোমা যাদের উদ্দেশেই তৈরি করা হোক না কেন, যারা তৈরি করবে এবং কাজে লাগাবে তার হাত থেকে শেষ পর্যন্ত তারাও রেহাই পাবে না। এটা নিজের এবং অপরের সমগোত্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। এ প্রশ্ন পৃথিবীর কোন মানুষই এড়িয়ে যেতে পারেন কি?

সমরজিৎ কর

ঘরে বাইরে

মহিলা ইমদাদ কমিটি

সম্প্রতি মহিলা ইমদাদ কমিটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা খোলা হয়েছে। মায়া রায় তার চেয়ারম্যান। কমিটিতে অনেকেই আছেন। বিশেষ করে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী কর্মধারার সমন্বয়মূলক আয়োজনে অন্যান্য মহিলা সংস্থা থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে। যেমন অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন থেকে রমলা সিংহ, নারী সেবা সঙ্ঘ থেকে সীতা চৌধুরী—এইভাবে সংযুক্ত ও মিলিত অভিযানে অবিরুদ্ধ সমন্বয় ব্যবস্থাই শাখার বিশেষত্ব। কাজ কেবল শুরু হয়েছে। উৎসাহের অন্ত নেই। প্রেরণার উৎসাহ এবং উৎস দুটি বৈশিষ্ট্যময়ী মহিলা। বেগম আবিদা আহমেদ এবং প্রিয়লতা বড়ুয়া। দুই জনই অনন্যসাধারণ বা অসাধারণ। আমাদের জাতীয় জীবনের গর্বের বিষয় যে রাষ্ট্রের প্রথম মহিলা এবং ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পত্নী দু'জনই মহিলা সমাজেরই আদর্শমাত্র নয়, সর্বসাধারণের কাছেও আদর্শস্থানীয়া।
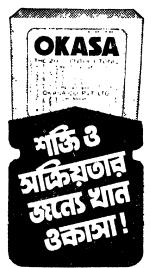
কেন্দ্রীয় ইমদাদ কমিটির প্রেসিডেন্ট বা ফাউন্ডার চেয়ারম্যান বেগম আবিদা। ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী বড়ুয়া। শ্রীমতী বড়ুয়ার অন্যান্য অনেক সংস্থার সঙ্গে যোগ থাকা সত্ত্বেও ইমদাদ কমিটিই বোধ হয় প্রথম তাঁর মনোযোগের বিষয় হয়। পূরবী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বউদি (প্রিয়লতা বড়ুয়া পূরবীর বউদি তো বটেই এবং আরও অনেকের বউদি) ইমদাদ কমিটির হিসাবপত্র একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে রাখেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টাও যদি কেটে যায় তবু একটি পয়সারও গরমিল হবার জো নেই।' এমন দারুণ নিষ্ঠা সত্যই অশ্চর্যের ব্যাপার। কোটি কোটি, লক্ষ লক্ষ টাকাও যেখানে খরচ হয় সেখানেও বোধ হয় এত খুঁটিয়ে নিখুঁত হিসাব রাখা হয় না।

বেগম সাহেবারও প্রাণ ইমদাদ কমিটি। একদিন তাঁর সঙ্গে বসে চা খাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সময় অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়! ছবির কথা, নানা ধরনের পুষ্পসজ্জার কথা, তাঁর প্রতিষ্ঠিত "আইওয়ানে গালিবের" কথা, যা তাঁর সংস্কৃতি ও সাহিত্যানুরাগের বিশেষ নিদর্শন। হঠাৎ দেখলাম আবিদা বেগম বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন। "প্রথম দিনই যদি এমন দুর্ঘটনা হয় তবে পরে কি হবে?" ভাবলাম বাড়ির কোন বাচ্চা বুঝি আঘাত পেয়েছে। শান্ত সংযত আভিজাত্যপূর্ণ মানুষটি এমন আকস্মিক বিক্ষুব্ধ হলেন কেন? সাবধানে সন্তর্পণে প্রশ্ন করলাম, কেউ কি আহত হয়েছে? বাড়ির আপনজনের কোন শিশু কি? বেগম সাহেবার উত্তর শুনে আমার মনে হলো আজকের এই কঠিন দুনিয়ায় এমন মানুষ কি হয়?

"বালিকা চমন" পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য গৃহ। বাড়িটি নতুন নেওয়া হয়েছে। তার সংস্কার এবং মেরামতের কাজ চলছে। নানা জিনিসের পিপে চারদিকে ছড়ানো। একটি পিপের উপর চড়তে গিয়ে একটি অনাথা বালিকা পড়ে গেছে। আঘাত লেগেছে বিষম। তাই বেগম আবিদা এতো বিচলিত, শঙ্কিত। ঠিক যেন নিজের ঘরের শিশুটির জন্য উদ্বেগ আর ভাবনা।

প্রিয়লতা বড়ুয়াও ঠিক অমনই স্নেহপ্রবণ। 'বালিকা চমন' সংলগ্ন কর্মী মেয়েদের আবাস হচ্ছে। কেমন করে নিষ্ঠুর শহরের আবহাওয়ায় নিম্নবিত্ত মেয়েরা উপযুক্ত আশ্রয় পাবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। মিটিং-এর পর মিটিং চলে। প্রিয়লতা বড়ুয়ার ক্লান্তি নেই। মহিলা ইমদাদ কমিটি যে তাঁর আদর্শ সংস্থা। কোন সম্প্রদায়কে তাঁদের পরিবার আলাদা করে কখনও দেখেন নি। বড়ুয়া সাহেবের মা সেকালে সব সংস্কৃতির সমন্বয়ের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। একুশ বছর বয়সে প্রিয়লতার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সামান্য ক'দিন পরে দারাং জেলার ব্রহ্মপুত্রের বালুকাবেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশ্রয়প্রার্থীদের ছাউনিতে এক রাত কাটিয়ে ছিলেন। কর্দমাক্ত পথ, গো-শকটই একমাত্র চলাচল ব্যবস্থা। তাঁর উদার স্বামী সাম্প্রদায়িক শান্তির উদ্দেশ্যে যাবেন

সেখানে। সঙ্গে গেলেন প্রিয়লতা। মিষ্টি হেসে বললেন, 'বোধ হয় সেই দিনটি আমার জীবনে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করেছে।' বেগম সাহেবাও বলেন, মহিলা ইমদাদ কমিটির মহিলা কথাটি হিন্দী বা সংস্কৃত, ইমদাদ মানে সাহায্য, মদত শব্দটির যে শব্দমূল ইমদাদেরও তাই। কাজেই সমন্বয়ের সমান রূপের সাধনা এই মদত্ত সমিতি। প্রিয়লতাও একই কথা বললেন। 'বালিকা চমন' অর্থাৎ বাগান। বালিকা হিন্দী বা সংস্কৃত শব্দ, উর্দু শব্দ "চমন" মানে বাগান; ফার্সী শব্দ 'বাগ'-এর একই মানে। প্রিয়লতা বললেন দুয়ের সমন্বয় এভাবে আগাগোড়া হয়েছে। কোথাও ভিন্ন নয়। 'বালিকা চমনে' প্রায় পঞ্চাশটি ফুল আছে। এম আই সি বা মহিলা ইমদাদ কমিটি দুটি বালিকাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। তারা সুযোগ পেলে জীবনে সার্থকতা লাভ করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটি মেয়ে হিন্দু আর একটি মেয়ে মুসলমান। যাতে তাদের মনে নিশ্চিন্ত নির্ভয়তা আসে এজন্য স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা ও যত্ন দিয়ে তাদের ঘিরে রাখা হয়েছে। তারিকুনের বয়স চোদ্দ বছর। আলিগড়ে মুসলিম গার্লস স্কুলে সে পড়ে। তার ইচ্ছা সে একদিন ডাক্তার হবে। কলা পড়ে হরিয়ানাতে কমলা নেহেরু স্কুলে। প্রিয়লতা বড়ুয়া বললেন, মহিলা ইমদাদ কমিটি এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট-এ রেখেছেন। তারিকুন ও কলার পড়ায় কখনও যাতে ব্যাঘাত না হয় সেজন্য এই এক লাখ টাকা রাখা। তারই সুদ থেকে তাদের সব প্রয়োজন মিটবে। পড়ার খরচাও আসবে এই সুদ থেকে। তাই ভাবনা নেই তারিকুনের বা কলার। তারা এম আই সি র স্নেহধন্য বালিকা-কুসুম।

মহিলা ইমদাদ—শাখা খুলেছেন বহু প্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া, হয়েছে আসামে, গোয়াতে, উত্তর প্রদেশে, অরুণাচল প্রদেশে, বিহারে, সিকিম এবং পাঞ্জাবে। সর্বত্র কাজ আরম্ভ হয়েছে পুরোদমে। অনেক জায়গাতেই গভর্নরের পত্নীরা চেয়ারম্যান। ব্যতিক্রমও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মায়া রায়, পাঞ্জাবে মালেরকোটলার সাজদা বেগম (উনি পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি। তাঁর সম্পর্কে আমরা চণ্ডীগড় কংগ্রেস অধিবেশনের বিষয় আলোচনা করবার সময় উল্লেখ করেছি), সিকিমে আছেন কাজিনী লেনডুপ দোরজি। কাজিনী লেনডুপ দোরজির কথাও আমরা অনেক আগেই আলোচনা করেছি। তিনিও বেশ কাজের মানুষ। এই বয়সেও উৎসাহের অন্ত নেই। বেলজিয়ামের এলিজা মারিয়া 'ব্যকু' পরে পুরোপুরি সিকিমি মেয়ের মত সেখানে মিশে গেছেন। এবার আস্তে আস্তে অন্যান্য প্রদেশেও শাখা হবে এবং এম আই সি বা

মহিলা ইমদাদ কমিটি সর্বতোভাবে সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

প্রিয়লতা বড়ুয়া আরও বললেন যে, মহিলা ইমদাদ কমিটি দুটি অনেক রকম কাজের মহিলা সমবায় খুলেছেন। এখানেও যাঁরা সাধারণত সম্যক সুযোগ পান না তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। পুরোনো দিল্লির অলিগলিতে মেয়েরা আবদ্ধ আবহাওয়ায় যেখানে জীবনের মুক্ত বাতাস পায় না সেখানে হয়েছে একটি সমবায়। কুচা পণ্ডিতের আলি মঞ্জিল এখন মহিলা কর্মীদের কর্মব্যস্ততায় মুখর। হাতের ব্লক ছাপা, মোমবাতি তৈরি করা, সেলাই ও এম্ব্রয়ডারির কাজ চমৎকারভাবে চলে। আর একটি রয়েছে প্রেসিডেন্টের বডিগার্ড এলাকায়। এখানেও নিম্নবিত্ত মেয়েরা দু পয়সা উপার্জনের উপায় খুঁজে পায়।

১৯৭৪ সালের ১ ডিসেম্বর ইমদাদ কমিটির প্রথম মেলা বসেছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রথম রাষ্ট্রপতি ভবনের বিস্তীর্ণ বাগানে এ ধরনের মেলা বসলো। রাষ্ট্রপতি নিজে এসে মেলার উদ্বোধন করেছিলেন। দলে দলে মানুষ এসেছিল মেলায়। দু লাখ টাকা উঠেছিল। দেশের যেখানে খরা বা যেখানে বন্যা, যেখানে দুঃখ, যেখানে চরম দুর্দশা সেখানেই গেল এই টাকা।

গত ২২শে থেকে ৩০শে নভেম্বর একটি আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। অঙ্কন পটে তুলির রেখা টেনে রাষ্ট্রপতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। হোসেন, সতীশ গুজরাল ও ধনরাজ ভাট ছিলেন বিচারক। প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদক পেলেন কলাম্বিয়ার সিসিনিয়া ডেলগাডো।

কয়েক দিন আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে আবার মেলা বসেছিল। বাজারটি ইতিহাসের মীনাবাজারকে মনে পড়িয়েছিল। তফাৎ এটুকু যে, একমাত্র বাদশাহ সেখানে পুরুষ ক্রেতা ছিলেন না। ছোট বড়, সাধারণ ও উচ্চকোটির মানুষ সবাই এসেছিলেন। পশ্চিম বাংলার তাঁতের শাড়ি তো সকাল গড়িয়ে দুপুর হবার আগেই প্রায় শেষ। ঢুকতেই সাজপোশাক পরা হাতী। তারপর একপাশে চুড়ি আর অন্যদিকে পান নিয়ে বসেছেন মেয়েরা। কি চমৎকার বাহার। অতীত যুগের উপকথার মত। বেগমসাহেবা এবং প্রিয়লতা বড়ুয়া এদিক থেকে ওদিক ঘুরে দেখছেন কোথায় কেমন চলছে।

মঞ্জু চৌধুরী সেক্রেটারী। গত ১৭ই মার্চ রিপোর্ট পেশ করেছেন। ৫.০৬.৬০৯ এখন ওঁদের জমা ও খরচের বাকী রয়েছে। আশা করা যায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান ফলে ফলে ভরে উঠে সারা ভারতের কল্যাণ, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুকল্যাণ সাধন করবে। তাই তাঁদেরও প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীমাধবী

আলোচনা

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী

"দেশ" পত্রিকার মাধ্যমে হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না এই বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে ঐ মত প্রমাণাভাবে দুষ্ট। তাঁহাদের কথা কতকটা শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি ও পরোক্ষ জীবনের ঘটনাবলী। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় এই কথা তুলিতে কেহ সাহস করেন নাই, এমনকি হিরণ্ময়ী দেবীর জীবৎকালেও।

১৯১৬ সাল হইতে শরৎচন্দ্রের এবং তার পরে হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁহারা আমাদের বাটীর সন্নিকটে বাজে শিবপুরে ভাড়া আসিলেন ১৯১৬ সালে। আমার বয়স তখন ১১ বৎসর। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধেই তিনি শরৎ[illegible] অরক্ষণীয়া গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়[illegible]। তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের [illegible]যোগ লইয়া আমরাও শরৎচন্দ্রের [illegible]রের একজন বলিয়া গণ্য হইতাম। [illegible]রণ্ময়ী দেবী আমাদের বাটী আসিতে[illegible] আমার পিতামহী এবং মাতার সহিত কথা[illegible]য় যোগ দিতেন। শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনিলা দেবীর দেবর কন্যা রানু দেবী ও বনমালা দেবীর আমাদের বাটীর সন্নিকটে বিবাহ হইয়াছিল। তাই সেদিন যে কথা ভাবি নাই আজ সেই কথা মনে হইতেছে যে, বিবাহ না-করা কোন স্ত্রীলোককে লইয়া এই আত্মীয়দের বাটীর সন্নিকটে তদানীন্তন সমাজে বসবাস করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল কি? ঐ রানু দেবীর ভাশুরপুত্র ইন্দুদাই তো ওঁদের বাজে শিবপুরে আনিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনিলা দেবী ও তাঁহার স্বামী পঞ্চানন মুখুজ্জে মহাশয় ও কন্যা পারুল দেবীকে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাসা বাটীতে সহজভাবেই মেলামেশা করিতে দেখিয়াছি; একত্রে খাওয়া দাওয়া তো ছিলই।

১৯২[illegible] সালে, শেষে শরৎচন্দ্র তো অনিলা দেবীর বাটীর কাছেই সামতাবেড়ে বাটী করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন সমাজে ইহাও কি সম্ভব ছিল?

তাহার পর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাটীতে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে লইয়াই বসবাস করিতে লাগিলেন এবং সে সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র তাঁহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা সকলে একত্রে বসবাস করিতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁহার উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলিয়াই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন, বাজে শিবপুরে থাকাকালে আমি তো বহুবার শরৎচন্দ্রের শ্বশুরে (হিরণ্ময়ী দেবীর পিতাকে) শিবপুর পোস্ট অফিস হইতে মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়াছি। মনিঅর্ডার ফর্ম শরৎচন্দ্র নিজ হস্তে লিখিয়া দিতেন আর কুপনের নীচে বাবাকে প্রণাম জানাইয়া হিরণ্ময়ী দেবীও দু-এক ছত্র লিখিয়া দিতেন। ইহা তো একবার নয়, বহুবার এইজন্য আমি পোস্ট অফিসে গিয়াছি।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুস্থতায় হাওড়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ও মিউনিসিপ্যালিটির

ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শরৎচন্দ্রের পত্র লইয়া চিকিৎসার জন্য দুই একবার ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছি। সেই পত্রে এবং ডাক্তারবাবুকে, হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দিতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।

আমাদের কলিকাতায় ২, গোয়াবাগান স্ট্রীটে যে ভিক্টোরিয়া প্রেস ছিল তাহাতে শরৎচন্দ্রের বহু পুস্তক ছাপা হইয়াছে। আমি শরৎচন্দ্রের লেখা পাণ্ডুলিপি লইয়া কোনদিন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অথবা জলধর সেন মহাশয়কে দিয়া আসিয়াছি, প্রুফ লইয়া আসিয়াছি, আমার মারফতে বহুদিন পত্রের আদানপ্রদান হইয়াছে, আমি তখন স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। নিজের অসুস্থতা ও হিরণ্ময়ী দেবীর অসুস্থতার জন্য নিজের ও স্ত্রীর খবর চিঠিতে জানাইতেন। ভারতবর্ষের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বসুমতীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাটীতে আসিতেন এবং শরৎচন্দ্রের নিকটেও যাইতেন। তাঁহাদের কথাবার্তায় ও আলাপ-

আলোচনায় হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দিতেন, এবং শরৎচন্দ্র নিজে তো সর্বদাই হিরণ্ময়ী দেবীকে বড় বউ বলিয়াই সম্বোধন করিতেন।

আমার শরৎ পরিক্রমা গ্রন্থে রেঙ্গুনে মিস্ত্রি পাড়ায় শরৎচন্দ্র দুর্গাপূজার পৌরোহিত্য করিয়াছেন এবং হিরণ্ময়ী ভোগরন্ধন করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এ কথা হিরণ্ময়ী দেবী আমাদের শরৎচন্দ্রের সাক্ষাতেই বলিয়াছেন এবং তখন তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই দেখি নাই।

হিরণ্ময়ী দেবী বিবাহিতা ও ব্রাহ্মণ কন্যা না হইলে এই ব্যাপারে তিনি কি হাত বাড়াইতেন? এতো বড় দুঃসাহস তাঁহার নিশ্চয়ই হইত না। আমাদের বাটীতে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের মাতা বসুমতী গিন্নী আসিলে আমার পিতামহী (পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের পত্নী) শরতের বউ বলিয়া হিরণ্ময়ী দেবীকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিতও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার কাছেও শুনিয়াছি হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী।

এত কথার অবতারণা করিতেছি এই জন্য যে, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, ১৯১৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী একত্রে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করিয়াছেন এবং একথা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও স্বীকার করেন। তাঁহাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন যে তাঁহারা কি জ্ঞাত আছেন যে ভারতবর্ষের আইনের বিধান অনুসারে বহুদিন যাবৎ যাঁহারা স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রে বসবাস করেন আইন তাঁহাদের বিবাহিত বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য করে? Indian Evidence Act-এ ১১৪ ধারা মতে এই Presumption-এর একটি আইনসম্মত ব্যাখ্যা আছে।

এই আইনবলে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী পরস্পর বিবাহিত ছিলেন বলিয়া ধরা আইনসম্মতও বটে। ইহার সহিত Hindu Marriage validity Act, 1949 and Hindu Marriage disabilities removable Act, 1946 বিবাহ সংক্রান্ত অনেক বাধাই দূর করিয়াছে। ১৯৫৬ সালের Hindu Marriage act প্রযুক্ত হইবার পূর্বে শাস্ত্রীয় হিন্দু বিবাহে কোন লিখিত নথিভুক্তির বিধান ছিল না। এখন কিন্তু শাস্ত্রমতে হিন্দু বিবাহও চলে ও ভবিষ্যৎ প্রমাণের জন্য ঐরকম বিবাহ নথিভুক্ত হইবার নিয়মও প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন যদি কেহ নালিশ রুজু করেন এবং বিরুদ্ধপক্ষ বিবাহ না হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারেন তাহা হইলে আইনবিরুদ্ধ উক্তি ও চরিত্র হননের জন্য তাঁহারা কি দোষী সাব্যস্ত হইবেন না? তাঁহারা কি এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন?

আমার শেষ অনুরোধ, প্রমাণ হাতে না লইয়া অযথা কোন মানুষের চরিত্রে নিজে বাহাদুরি কিনিবার জন্য কলঙ্ক লেপন যেন কেহ না করেন। ইহা অত্যন্ত মানহানিকর ও রুচিপূর্ণও বটে।

বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বইয়ের আয়ু

সিরিল কনোলী একবার লিখেছিলেন, আজকালকার লেখকরা কোনো রকমে বছর দশেক টিকে থাকতে পারলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। মনে করেন, যথেষ্ট হয়েছে।

কথাটায় নানা রকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে, এ-কালের লেখকদের মধ্যে এমন কিছু থাকে না যা স্থায়ী হবার যোগ্য। আবার অন্য ব্যাখ্যা এমন হতে পারে, পাঠকের রুচি, সমাজের চেহারা, প্রকাশকদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি এত দ্রুত পালটে যাচ্ছে যে, কোনো লেখকই বিশ্বাস করতে পারেন না—তাঁর লেখা দশ পনেরো বছর পরেও সমাদৃত হবে।

সাধারণভাবে কনোলীর এই কথাটির নিশ্চয় কিছু মূল্য আছে। কিন্তু তিনিও অনাদের মতন জানতেন, আধুনিক কালের সব লেখাই দশ বছরের আয়ু নিয়ে দেখা দেয়নি, এমন লেখক একাধিক রয়েছেন যাঁরা লেখায় দীর্ঘজীবী হয়ে থাকার যোগ্য। অবশ্য বহুর মধ্যে এঁদের সংখ্যা নিশ্চয় কম।

কেউ কেউ বলেন, সাহিত্য শিল্পের একটা বৃহৎ অংশ থাকে যা কখনোই স্থায়ী হয় না, স্থায়ী হয় স্বল্প কয়েকজনের কীর্তি। অথচ এই বৃহৎ অংশ যেন পর্বতশ্রেণীর মতন—উচ্চশৃঙ্গ নয়, পার্বত্য ভূমি। এই অংশই যেন, সাহিত্যিক যুগকে ধরে রাখে নানা ভাবে। কথাটা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এমন কথাও আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে, কোনো লেখক কিংবা শিল্পী কোনো দিন সজ্ঞানে স্থায়ী হবেন বলে শিল্পকর্মে হাত দেন না। কেননা ভাগ্যের মতন সেটাও রহস্যময়, জোর করে আগে থেকে বোধ হয় সে বাসনা পোষণ করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যে এমন লেখক একাধিক রয়েছেন যাঁদের আমরা স্থায়ী হিসেবে স্বীকার করি। কেউ যদি বলেন, মধুসূদন আর পঞ্চাশ বছর পরে বিস্মৃত হবেন, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র অজ্ঞাত নাম হয়ে যাবেন—তা হলে নিশ্চয় আপত্তি তুলব আমরা। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভুলে যাব—এ-কথা কল্পনাও করা যায় না। ভাবতে ভাল লাগে না যে, শরৎচন্দ্র আর পড়া হচ্ছে না।

এই রকমই আরও অনেকে আছেন—তিনি সুকুমার রায় হোন অথবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জীবনানন্দ অথবা তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁদের ভুলে থাকা বাঙালী পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য লেখক—সেই রকম আরও কিছু লেখক আছেন—যাঁদের আমরা আশ্চর্যভাবে ভুলে যাচ্ছি। যেমন মণীন্দ্রলাল বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী—এবং আরো অনেককে। এমন কথা আমি বলছি না যে, এই সব লেখকের সমস্ত রচনাই নতুন করে পড়া দরকার। তবে, আমার মনে হয়েছে, এঁদের কোনো কোনো গ্রন্থ অবশ্যই আমাদের সাহিত্যে নানা কারণে স্থায়ী হবার যোগ্য। 'রমলা' কজন এ-কালের পাঠক পড়েন? ক'জন আধুনিক পাঠক 'মহাস্থবির জাতক' পড়েছেন? 'কালো ঘোড়া' আজকাল কতজনের মনে আছে?

দুঃখের বিষয়, এ-সব গ্রন্থ আজকাল কম পাঠকই পড়েন। কাউকে কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, বই পাওয়া যায় না, পুরোনো বই প্রকাশকরা ছাপতে রাজী নন, তাই পড়া হয়ে ওঠে না।

প্রকাশকরা বলেন, বই বিক্রি হলে কেন তাঁরা ছাপবেন না? আসলে এক হাজার বই যদি মশাই পাঁচ বছর ধরে বেচতে হয়—তবে সে বই আমরা ছাপব কেন? পাঠক বই পড়লেই বই বিক্রি হয়, না পড়লে দোকানে পড়ে থাকে। দোষ পাঠকের, আমাদের নয়।

কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে কোনো কোনো গ্রন্থ আছে যার মূল্য থাকলেও পাঠক তা পড়তে চান না, প্রকাশকও তা ছাপতে রাজী নন। পাঠকের রুচির প্রশ্নটি এখানেই এসে পড়ে। শুনেছি সব দেশের প্রকাশকই আগে ব্যবসার দিকটা দেখেন, পাঠক দেখেন তাঁর ব্যক্তিগত রুচি। কোথায় যেন পড়লাম, বাজারে যাঁর যত কাটতি সেই লেখককে ওদেশে 'বোনাস মানি'-ও দেওয়া হয়। এককালে নাকি সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও প্রাপ্য দক্ষিণা ছাড়াও এরকম দেবার রেওয়াজ ছিল। ভয় হয়, বাংলা দেশেও এর রেওয়াজ না এসে পড়ে!

বাঙালী প্রকাশকরা ইদানীং বহু বই ছাপছেন যার কাটতি প্রচুর। লেখককে দক্ষিণাও দিচ্ছেন সাধ্যমত। প্রশ্ন হল, এই সব বইয়ের দিকে তাকিয়ে কেউ যদি বলেন, বছর দুই তিনের মধ্যে এ-সব লেখার আয়ু ফুরিয়ে যাবে তা হলে দোষ কি! কনোলী মোটামুটি ভাল বইয়ের আয়ু নির্ধারণ করেছিলেন দশ বছর। আমরা বাংলা সাহিত্যে আজকাল রাশি রাশি বই যা দেখছি তার আয়ু নিশ্চয় পাঁচ বছরের বেশী বলে মনে করতে পারি না। অথচ কিছু বই আমাদের বাংলা সাহিত্যেও রয়েছে যা স্থায়ী হবার যোগ্য। কেমন করে তা স্থায়ী রাখা সম্ভব সেটাই সমস্যা।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এমন কোনো প্রকাশক যদি থাকেন যিনি শুধুমাত্র এই ধরনের বই ছাপবেন স্থির করে নেন তবে তা হতে পারে। আজকাল অগ্রিম গ্রাহক করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। অগ্রিম গ্রাহক করেও দেখা যেতে পারে—কতজন পাঠক পুরোনো বইয়ের ব্যাপারে উৎসাহী। পাঠকদেরও উচিত ভাল বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করা। লাইব্রেরীতে বহু ভাল পাঠকের সন্ধান মেলে। তাঁদেরও উচিত ভাল বই যতটা সম্ভব বেশী লাইব্রেরীতে রাখা।

পরলোকে রবিউদ্দীন আমেদ

রবিউদ্দিন আমেদ অতিপরিচিত ব্যক্তি হয়তো নয়, কিন্তু বঙ্গসংস্কৃতির যাঁরা বিশেষ অনুরাগী তাঁরা এই মানুষটির নাম নিশ্চয় জানেন। রবিউদ্দিনকে নিভৃত সাধক বলা যায়। সাহিত্যের, শিল্পের, মানবতা-বোধের। খুবই দুঃখের কথা, গত ৫ মে রবিউদ্দিন হৃদ্‌রোগে মালদার হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। শিলং থেকে কলকাতা আসার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, মালদা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়, সেখানেই তিনি মারা যান।

রবিউদ্দিনের কর্মজীবন ছিল বহু-বিস্তৃত। সবচেয়ে যেটা উল্লেখযোগ্য, রোমের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে (ওরিয়েন্টাল ইনসটিটিউট অব রোম) দীর্ঘ আট বছর রবিউদ্দিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, গালিব ও নজরুলের বহু কবিতা তিনি ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। রোমের প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীতে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয় রবিউদ্দিন তার সম্পাদনা করেন এবং কবির কয়েকটি কবিতারও অনুবাদ করেন তিনি।

সিনেমা-শিল্পের সঙ্গে রবিউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ইটালীতে তিনি সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করেন। ভারতীয় কয়েকটি ছবির সঙ্গে সেখানকার দর্শক ও গুণিজনের তিনি পরিচিতিও ঘটান।

রবিউদ্দিনের মৃত্যুতে আমরা দুঃখ বোধ করছি।

অভিনন্দ

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

দ্বৈতকণ্ঠে গান

তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনী দেখতে বেশ ভাল লাগে আমার। বিশেষত যেসব তরুণের কাজে প্রতিশ্রুতি থাকে। অভিনবত্ব বা চমকের ওপর আমার খুব একটা আস্থা নেই। শিল্পীর কাজের মধ্যে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্যক্তিগত শৈলী থাকলে দেখতে ভাল লাগে।

রাধাবল্লভ মণ্ডল এবং নীতিনকুমার বিশ্বাসের প্রদর্শনী বেশ ভাল লেগেছে (আকাদমী অব ফাইন আর্টস: ১৫—১৬ মে)। এঁরা দুজনেই [illegible]। রাধাবল্লভ এখনও ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের চিত্র-বিভাগের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। নীতিন পুলিসে কাজ করেন। উভয়ের দেশ বসিরহাট।

আমার কাছে একটা জিনিস অবাক লাগে খুব। গ্রাম বা মফঃস্বল থেকে এসেও কেন বেশির ভাগ শিল্পী উগ্র শহুরে হয়ে পড়েন? অবশ্য সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা গল্প ও উপন্যাসও শহর বা নগরকেন্দ্রিক নাগরিকতায় ভরপুর। চিত্রকর স্বভাবতই একজন সাহিত্যিকের চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক মানুষ। বিশেষত তেলরঙ ব্যবহার করলে তো কথাই নেই। এটা কোনো দিশী মাধ্যম নয় এবং গত শতাব্দীর শেষ থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় এর ব্যবহার হয়েছে বহুভাবে। একজন কিউবিস্ট এবং কিউবিজমোত্তর শিল্পী তেলরঙ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। শিল্প আন্দোলন-গুলোর ইতিহাস আমাদের জানাতে পারে। বর্তমানেও ওসব দেশে কী ধরনের কাজ হচ্ছে তারা পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে জেনে ফেলে। সুতরাং উপায়?

সুনীল দাস আমাকে একবার বলেছিলেন, আমাদের সমস্যাটা হলো তেলরঙকে কী করে দিশী একটা মাধ্যম করা যায়। আর যতদূর মনে পড়ে, নীরদ মজুমদার বলেছিলেন কোনো সময়, আর্ট কলেজে পাঁচ বছর ধরে শিখবে। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচ বছর ধরে যা মাস্টার মশাইদের কাছে শিখেছ তা ভুলতে হবে। কেবল তারপর তুমি আঁকতে পারবে।

রাধাবল্লভ আর নীতিনের ছবির মধ্যে যেমন মুনশীয়ানাটাও নজরে পড়ে, তেমনি ছবিগুলোর ইউরোপীয় মেজাজ দেখে চমকে উঠতে হয়। আমাদের আধুনিক নগর পরিকল্পনা, জীবন যাপনের উপকরণ, নাগরিক ব্যবস্থা, কল-কারখানার অর্থনীতি—সবই তো এসেছে ওদিক থেকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চিন্তা ভাবনা সবই এরই উপযোগী এবং পশ্চিম থেকে আমদানী। শিল্পী তো এই সমাজের মানুষ। ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের। আর্ট কলেজে সেই ঐতিহ্যের মূল্যায়ন শেখায় না। যাঁরা শিল্পীর পূর্বসূরী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় থেকে বিনোদবিহারী—তাঁদের কাজের সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটে না। অন্যদিকে তার অগ্রজ সমসাময়িকদের অধিকাংশ—যদি তিনি তেলরঙে এঁকে থাকেন—তবে পশ্চিমী শিল্প ঐতিহ্যকে নিজস্ব করে নিয়েছেন। সুতরাং তরুণ চিত্রকর মনে মনে নিজেকে অসহায় মনে করেন।

রাধাবল্লভ বা নীতিনের কাজ দেখে মনে হয়েছে তাঁরা এসব নিয়ে চিন্তা করার সময়ই পাননি। তাঁরা কলেজে মন দিয়ে শিখেছিলেন—ভালই শিখেছিলেন—আর মনের আনন্দে এঁকেছেন।

নীতিন সদর্থে সমাজ-সচেতন শিল্পী। নিরন্ন, অবজ্ঞাত, দুঃখী মানুষদের কথা বলেছেন তিনি। অন্যদিকে এক ধরনের ছবিতে তিনি ক্ষোভ আর যন্ত্রণার আবেগ-রুদ্ধ জ্বালা চালিয়েছেন। ক্যানভাসের ছক ঘন রঙের গাঢ় আবেশে ঢাকা। কখনো সাজিয়ে গুছিয়ে বিশুদ্ধ ছবিকে মিষ্টি মিষ্টি কাব্যিক বা মরমী করার চেষ্টা করেননি। কলাকৌশল দেখিয়ে চোখ

তৈলচিত্র — রাধাবল্লভ মণ্ডল

ধাঁধাবার চেষ্টাও নেই। বরং তাঁর আঁকার মধ্যে এক ধরনের রূঢ় পুরুষালী ব্যাপার আছে। এক ধরনের খয়েরী অন্ধকার মিশ্র রঙ ব্যবহার করেছেন, সেখানে হঠাৎ কোনো শুভ্র সমতল রঙ এসেছে। রঙ টিনটে করে ফাটিয়ে একটা পুরানো ছবির ভাব এনেছেন। মৃতদেহ, কঙ্কাল, উলঙ্গ রুগ্ন দেহ এইসব চিত্রকল্প মাঝে মাঝে নিছক আন্তরিকতার জোরে রসসৃষ্টি করেছে, অধিকাংশ সময় বক্তব্যের ভারে পঙ্গু হয়েছে। কখনো কখনো মনে হয় অতিরিক্ত কাজ করেছেন, আবার কোথাও ছবি এমনই অসম্পূর্ণ যে তাকে রঙীন রেখাচিত্রের বেশি কিছু বলা যায় না। তবু তাঁর কব্জীর জোর সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

রাধাবল্লভ একেবারেই ভিন্ন মেজাজের

মানুষ। আবছা দুধ্যো ঘাস সবুজ, হালকা নীল, ধূসর—এইসব স্নিগ্ধ রঙ মোটা ক'রে লাগান। তুলির কাজ দেখা যায় কিন্তু রঙ মিলিয়ে লাগান। এ'র জগত মধ্যযুগের ইউরোপ এবং রোমক ক্যাথলিক। তিনজন নান, দুটো মানুষের মাঝখানে একটা ঘোড়া এবং এদের একজনের হাতে ম্যান্ডলীন, কখনো দুজনের মধ্যে বিবস্ত্র পেশীবহুল মানুষ। বিষয়গুলো স্পষ্টত বাইবেল-কেন্দ্রিক এবং পুরাণকল্প রচনার জন্যে স্নিগ্ধ ঈষদুষ্ণ রঙ দিয়ে আঁকা। কখনো আবার আধুনিক চিত্রকল্প আসে—হয়তো বাড়ির ছাদের ওপর দেখা পুরচিত্র। আবার কখনো সিকুয়াস বা রিঞ্জিয়ারার কাছে উপস্থিত হন রাধাবল্লভ। পেশীবহুল যূথচারী মানুষ চক্রসদৃশ কী যেন ঠেলে নিয়ে যায়, আর অন্যপাশে মাথার খুলি বেরিয়ে আসে। রাধাবল্লভের কাজের মধ্যে বড় দরের শিল্পীর সম্ভাবনা আছে।

দুজনকেই হয়তো আরেকটু দেশকাল জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে তৈলচিত্র আঁকার সম্বন্ধে ভাবতে হবে।

ছবি কেনা

বাঙ্গালীরা শিল্পীদের বিষয় উদাসীন। তাঁরা লেখক, কবি, অভিনেতা, চিত্র ও নাট্য পরিচালক, গায়ক বাজিয়েদের আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। শিল্পীদের পাত্তাই দেন না। কলকাতায় সারা বৎসর প্রায় প্রতিদিনই একটা-না-একটা প্রদর্শনী লেগেই থাকে। সেখানে অল্পসংখ্যক লোক যান। আকাদমী অব ফাইন আর্টসে নাটক দেখতে এসে কেউবা প্রদর্শনী-কক্ষ এক চক্কর ঘুরে যান, কেউবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে এসে বা ময়দানে হাওয়া খেতে এসে ঘুরে যান। অথচ প্রদর্শনী দেখতে কোনো পয়সা লাগে না।

শিক্ষিত বাঙ্গালী অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং যামিনী রায়ের নাম শুনেছেন। শহর সাজানোর জন্যে মূর্তি স্থাপনের ফলে ও অন্যান্য কারণে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রামকিংকর, প্রদোষ দাশগুপ্ত এবং চিন্তামণি করের নাম শুনেছেন। কিন্তু সমকালীন ক'জন শিল্পীর নাম তিনি জানেন সেটা বেশ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

কলকাতায় আধুনিক শিল্পকলার সংগ্রহশালা নেই। অন্যদিকে শিল্পসামগ্রীর বিক্রেতা নেই। হ্যান্ডিক্রাফট শিল্প নয়। এখানে বড় বড় বাড়ি উঠলে ইন্টিরিয়ার ডেকরেটারদের ডাক পড়ে। ভুলক্রমে দু একবার শরদিন্দু সেনরায়ের মতো কোনো শিল্পীর ডাক পড়ে দেওয়ালচিত্র আঁকার জন্যে, কিন্তু সেটা নেহাৎ ব্যতিক্রম।

কলকাতায় বহুতল বাড়িতে ইদানীং ফ্ল্যাট কিনছেন সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী। ড্রইংরুম সাজানো চলছে। খাবার ঘরে ডাইনিং টেবিল ফ্রিজ ইত্যাদি থাকছেই। রান্নাঘরে গ্যাস ছাড়াও অন্যান্য গ্যাজেট। গাড়ি থাক না থাক, টেপরেকর্ডার, রেডিওগ্রাম বা রেকর্ডপ্লেয়ার থাকবে। কিন্তু তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজুন—দেওয়ালে শিল্পীর আঁকা ছবি পাবেন না। বড় জোর দুএকটা ক্যালেন্ডার, মা-বাবার ছবি ইত্যাদি পেতে পারেন। দেওয়াল ডিস্টেম্পার করা, সুরুচিপূর্ণ আসবাব, কিন্তু ছবি নেই।

বাঙ্গালী কিন্তু রুচির বড়াই করে। পরীক্ষামূলক নাটক, আর্ট ফিলম, ফিলম ক্লাব, রুচিশীল লিটল ম্যাগাজিন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসা—এসব ব্যাপারে ভারতবর্ষে তার মতো, তাহার মতো, আর কে আছে?

ছবি? বড় দাম—ক্যানভাসের দাম তিন শ' থেকে দু হাজার টাকা। কিন্তু ছবির দাম বাড়ে। আমারই পরিচিত একজন ত্রিশ সালে পঁচিশ টাকা দিয়ে যামিনী রায়ের ছবি কিনেছিলেন, এখন তার দাম পাচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকা। আমি পরামর্শ দিয়েছি ধ'রে রাখতে। ছবির দাম বাড়বে। এন্টেনা বাড়ির মাথায় লাগানো এক ধরনের স্টেটাস সিমবল। সে জায়গায় পাল্লা দিতে গেলে মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধীর কাছে পরাজয় অনিবার্য। ছবি বা ভাস্কর্য কেনা যেমন রুচির পরিচয় দেবে, তেমনি চুরুট মুখে ভারিক্কী চাল মারার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে ভাবুন—বছরে বছরে দাম বাড়ে। দিল্লি বোম্বাইয়ের লোকরা বুঝেছে এটা বেশ।

তৈলচিত্র না কিনতে পারেন, ড্রইং কিনুন, জলরঙ কিনুন। বই আর ছবি হলো ঘরের বউয়ের মতো, তার সঙ্গে আমরণ ঘর করা চলে। সিনেমা থিয়েটার নিয়ে বাড়ির বাইরে ফুর্তি হুল্লোড় চলে। এগুলোকে ঘরে আনা যায় না।

সন্দীপ সরকার

তেইশ

এর পর সতীর্থের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল; চিন্তা রইল না আর কেমন নিদ্রালু ভাবালু হয়ে পড়ল সে : ওদের একজন হয়ে পড়ার ভেতর বিশেষ কোনো মানে নেই। কি হবে অনন্তরাম হামিদ ঘনশ্যামের মতন হয়ে? মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবহার ও লক্ষের কাছে এরা ও এদের এই প্রাণান্তকর ধর্মঘটের সার্থকতা নিতান্তই স্থূল—ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু তবুও নানারকম আঘাটার ভেতর দিয়ে চলতে হয় মানুষকে দৃষ্টি শুদ্ধ করে নেবার জন্যে, জীবন ঠিক করে তৈরি করে নেবার জন্যে। এই দার্শনিক সত্যের জন্যেও—কিন্তু তার চেয়ে বেশী ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে অর্থনৈতিক কল্যাণস্থাপনায় কেমন যেন একটা অব্যয় উত্তেজনায় এই ধর্মঘট নিয়ে পড়েছে সে। প্রাণকল্যাণের সমুদ্র রচনা করতে গিয়ে এখানকার এই ছোট্ট সংগ্রামটুকু তো এক ঝিনুক জল; ঝিনুকটাকে স্বাতীর শিশিরের মত সেই জলে ভরে ফেলতে হবে। সৃষ্টির বড় সময়ের পারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ছোট সময়ের দিকে তাকালে, পৃথিবীর বড় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিককার প্রাদেশিক ছোট সময়ের ছিটেফোটার দিকে চাইলে, ওদের ভেতর একজন হয়ে পড়ার কোনো মানে নেই; কি হবে হামিদ ঘনশ্যাম ইয়াসিন অনন্তরামের মত হয়ে?

কিন্তু তবুও এখানকার এই এক ঝিনুক প্রাণপ্রবাহী জল সংরক্ষণ উৎসারণ করা দরকার প্রাণকল্যাণের সমুদ্র সৃষ্টি করতে গিয়ে। দরকার? এইসব এক কাড়ির ছাঁদার ভেতর থেকে সমুদ্র বেরুবে বুঝি?

'আপনি শুয়ে পড়লেন সতীর্থবাবু?' হামিদ বললে।

'একেবারে চিত হয়ে মাটির ওপরে যে, একটা চাটাই এনে দিই—'

বঙ্কু বললে।

'তোমার তো সর্দি হয়েছে বঙ্কু—' সতীর্থ অন্ধকারের ভেতর চোখ বুজে থেকে বললে, 'গলা ভারি হয়েছে তোমার। নাক ফোঁসফোঁস করছে। ক' রাত জাগলে?

'বঙ্কু কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল। সত্যিই সর্দিতে ঠাণ্ডায় সে বড় কাবু হয়ে পড়েছিল।

'ঘুমিয়ে পড়লেন সতীর্থবাবু।'

'আকাশের তারা দেখছি।'

'যদি ঘুমিয়ে পড়েন হোথা ঐ ক্যাম্পে রেখে আসব আপনাকে পাঁজাকোলা করে—'

'ওটা কাদের ক্যাম্প?'

'আমাদেরই; ধর্মঘটীদের।'

'না। এইখানেই থাকব আমি।'

'নিমুনিয়া হবে—ঠাণ্ডা লেগে—শিশিরে শুয়ে—'

'সমুদ্রে যার শয্যা, তার আবার শিশিরে ভয়,' দূরের থেকে বললে বঙ্কু। চুপচাপ পড়েছিল সকলেই—রাত আর একটু থমথমে হলে একজন দুজন করে উঠে চলে যেতে লাগল, কে কোনদিকে যায় অনন্তরাম আর হামিদ কড়া নজরে পাহারা দিয়ে দেখছিল।

সতীর্থ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আধঘণ্টা পরে দূরে টর্চলাইট দেখা গেল।

'হ্যাঁ পুলিসই আসছে হামিদ', অনন্ত বললে।

'ঘনশ্যাম কোথায়?' হামিদ জিজ্ঞেস করল।

'দেখছি না তো। এই বঙ্কু! বঙ্কু!'

'অত জোরে ডাকিসনেরে অনন্ত।'

'আমরা কি লম্বা দেব নাকি হামিদ?'

হামিদ মাথা নেড়ে বল্লে, 'পার্টি হয়ে

আঃ...কি
মনমাতানো
তাজা স্বাদ!
NOGA
ORANGE SQUASH

বসে থাক যে যার জায়গায় আছিস।'

'তারপর?'

'পেটালে পড়ে পড়ে মার খাবি; গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে যাবি সঙ্গে চলে, কাঁদুনে গ্যাস যদি ছাড়ে তবে কাঁদবি।—'

'আর গুলি করে যদি—'

'তাহলে পিলচুত খাবি—'

'পিলচুত?'

'স্ট্রেচার আছে, হাসপাতাল আছে, মরলে আধপোড়া হয়ে গঙ্গা পাবি তো;— মোচলমানকে মাটি দেওয়া হবে; এ সবের জন্যে ভাবনা করিসনে। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।'

কর্তৃপক্ষ ও পুলিস গ্যাস-গুলির ধার দিয়েও গেল না। হেসে খেলে কয়েক-জনকে ধরে নিয়ে গেল শুধু, সুতীর্থকেও।

বাকি সবাইকে পুলিসের হেপাজতে চালান দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুখার্জি সুতীর্থকে নিয়ে ফ্যাক্টরির তেতলায় তার খাস কামরায় গিয়ে উঠল।

'আসুন, বসুন, আপনিই তো সুতীর্থবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি তো কমার্শ্যাল ফার্মে কাজ করেন?'

'কাজ করতুম—'

'আপনার চাকরী তো বহাল আছে—'

'আমি ছেড়ে দিয়েছি—'

'নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে আমি নাচার। কিন্তু আজো ফোনে মল্লিক আপনার কথা বলছিলেন—'

কি বলছিলেন জিজ্ঞেস করতে গেল না সুতীর্থ। কোনো ঔৎসুক্য ছিল না তার।

'আপনি অফিস অ্যাটেণ্ড করলেই পুরো মাইনেতে আপনাকে এ কদিনের ছুটি দিতে রাজি। মল্লিক বললেন। আসুন—'

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে সুতীর্থের দিকে এগিয়ে দিয়ে মুখার্জি বললে—'আসুন, নিন, আপনিই বেঙ্গল সাপ্লাই কর্পোরেশনের সুতীর্থবাবু— সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের এই ফ্যাক্টরির কি সম্পর্ক সুতীর্থবাবু?'

'আমি তা জানব কি করে বলুন।'

'ওটা হল কলকাতার এক প্রান্তে, এটা হল আরেক কিনারে। প্রায় মাইল দশেকের ব্যবধান দুটোর মধ্যে। আপনি হলেন সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন ডিপার্ট-মেণ্টাল হেড—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক সাহেবের—ইয়ে—মার্গ সঙ্গীত; আবার আপনিই এখানকার কুলিকামিন হামিদ অনন্তরামের গোঁসাই। এ সব দশঘাটের জল এক পীরের ঘাটে কি করে আনলেন দাশগুপ্ত মশাই?'

'জল নেমেছে জলে এক হয়ে গেল সব।'

মুখার্জি একটু চুপ থেকে বললে, 'মল্লিক সাহেব আপনাকে সমীহ করেন কেন জানেন? আপনার কাজের নিপুণতার জন্যেও বটে, তাছাড়া গভর্নমেণ্টের একজন বড় মিনস্টার আপনার ডাকসাইটে ইয়ার।' মুখার্জি বললে।

'আমার ইয়ার? না তো। কোনো ডাক-সাইটে পৃথিবীতে আমার লোভ নেই। কোনো মিনস্টারকে আমি চিনি না; তাদের কেরানীদেরও কৃপার পাত্র আমি মুখার্জি সাহেব। এগুলো কি?'

'বোতল। হোয়াইট লেবেল।'

'হোয়াইট লেবেল? এ সব ডুমুরফুল পেলেন কোথায় আপনি? এ বাজারে তো এ অপয়াগুলোকে চোখেই দেখা যায় না। দুজনের জন্যে সরঞ্জাম দেখছি—'

'আপনি আর আমি—'

'আমি না—আমি ও সব খাইনে কোনোদিন।'

'এখন নয়—একুনি নয় সুতীর্থবাবু। গলা শুকিয়ে এলে ভিজিয়ে নেবেন গলা। যদি না শুকোয় নাই বা ভেজালেন। বমি হবে না, বন্দোবস্ত করে দেব। যদি তিতো লাগে, ম্যাজম্যাজ করে, মানুষ কি মেয়ে মানুষকেও ছুঁতে যায়? এ তো হোয়াইট লেবেল শুধু। ভোগের জিনিস আনন্দ দেবে বইকি।'

মুখার্জি বললে, 'দু হপ্তা ধরে এই স্ট্রাইক নিয়ে কুঁদছেন কেন আপনি—'

'বেছে বেছে আপনাদের ফ্যাক্টরির ওপরই যে আমার বিদ্বেষ তা নয় মুখার্জি সাহেব। আমাদের নিজেদের ফার্মেই ধর্মঘট হবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হল না।'

'কেন?'

'সেটা পরে হবে। দৈবচক্রে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আমি—'

'কবে বলুন তো?'

'দিন পনেরো ষোলো আগে।'

'সাহেবী পোশাক?'

'হ্যাঁ, বেশ জাঁকানো সুট পরে।'

'মাথায় হ্যাট ছিল তো? বলুন তারপর—' মুখার্জি বললে।

সুতীর্থ সিগারেটটা পুরোপুরি না খেয়েই অ্যাশট্রের ভেতর ফেলে দিল।

'একটা জিনিস হয়তো আপনি লক্ষ করেননি সুতীর্থবাবু।'

'কি, বলুন তো।'

'আপনি আমারি মতন লম্বা।'

সুতীর্থ আপাদমস্তক মুখার্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'ঘাড়েগর্দানে একটু বেখাপ্পা হয়েও আপনি লম্বা বইকি মুখার্জিসাহেব—খুব লম্বা। মুখার্জি সাহেব—খুব লম্বা।

'আমি সব সময়েই সাহেবি পোশাকে চলিফিরি। আপনি হ্যাটকোট পরে যখন হাঁটে চলেন পেছন থেকে ঠিক আমারই মতন দেখায় আপনাকে।'

'কবে দেখলেন?'

'মুখের ছাঁদও আপনার কতকটা আমার মত। কিন্তু তাকালেই পার্থক্য ধরা পড়ে। কারু মতে আপনার মুখ বেশি সুন্দর, আমার বেশি পুরুষোচিত। এই দেখুন আমার ফোটো।

সুতীর্থ ফোটোর দিকে তাকাল না। 'আপনাকেই তো দেখছি।'

'নানা মানুষের নানারকম মত থাকে বইকি। কিন্তু সে যাকগে, আসল কথা হচ্ছে সাহেবী পোশাকে মেজাজী চালে চললে আপনাকে যদি কেউ মুখার্জিসাহেব বলে ভুল করে থাকে, তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না। নিন, আসুন, এইবারে শুরু করা যাক।' মদের বোতলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুখার্জী।

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না খাই যে তা নয়, কিন্তু খোঁয়াড়ি ভেঙে খাই নেই আজ আর।'

'নেই আজ? সাধব না তবে। আমি যদি একা পেরে না উঠি দয়া করে সাহায্য করবেন এই ভরসায় থাকব।'

বোতল ভেঙে খানিকটা মদ ঢেলে নিল সাহেব; খেল না, রেখে দিল এক পাশে সরিয়ে। 'সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন অফিসার আপনি। এখানে এসে মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে মিশে তাদের মড়ার ফ্যান খেয়ে রাঁড়ির ইজ্জৎ বাঁচিয়ে স্ট্রাইক করছেন আপনি। লোকে শুনলে বলবে কি!

সিগারেটের খোলা টিনটা টেবলের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল। একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আমি ওদের ধর্মঘটে যোগ দেওয়াতে এটার খুব জোর বেড়েছে মনে করেন?'

'যারা সব সময়েই নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলতে চায় সে সব বিজ্ঞ লোকদের চারদিকে বসিয়ে বেশ ঘোড়া ঘোড়া খেলা দেখাচ্ছেন আপনি। কিন্তু আপনার মাথা আছে আবেগ আছে আপনি ঝামেলা যে না বাধাতে পারেন তা নয়।'

'দুর্ঘটনার কোনো লক্ষণ দেখছেন? ফ্যাক্টরির ক্ষতি হবে মনে করছেন?'

'ক্ষতি! ফ্যাক্টরির জীবনমরণ নির্ভর করছে এই স্ট্রাইকের মীমাংসার ওপর।'

মুখার্জি বললে, 'ও সব গুহ্য তত্ত্ব আপনার জানবার কথা নয়। কিন্তু আপনি তো আমাদের লোক। আপনার কাছে রেখে ঢেকে কি আর লাভ।

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে মুখার্জি বললে, 'অনন্তরাম, হামিদ ইয়াসিনও জানে।'

'কি করে?'

'ওরা সব জানে।'

শুনে সুতীর্থ ভরসা পেল খানিকটা, দেশলাইয়ে সিগারেটটা জেলে নিল।

ঘুষ কবুল করছি, কিন্তু বাগে আনতে পারছি না কাউকে।'

'কাকে চান বাগে আনতে?'

মুখার্জি মদের গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে না খেয়ে নামিয়ে রেখে বললে, 'একে একে সকলকেই। আপনাকেও। আপনাকেই প্রথম। কান টানলে তবে তো মাথাশুদ্ধু চলে আসবে। মারপিট করব না, মন মেজাজ ভেঙে দিতে যাব না। চেষ্টা করলে দুটোই পারি; কিন্তু সেরকমভাবে কতগুলো ন্যাস্ত-ন্যাস্ত মানুষকে দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানোও যা অন্ধকার রাতে একটা বালিশকে ধানজমি ভেবে ক্ষেত প্রস্তুত করাও তাই। সে সব করে কে আর সোনার সন্তানদের বাপদাদা হতে পেরেছে—'

এবারে এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেলে মুখার্জি বললে, 'তাছাড়া আধুনিক যুগের মানুষ মানে মানুষবাদ আমার ভালো লেগেছে। ওরাও মানুষ, আমারও মানুষ। তাই তো।'

'কি করবেন তাহলে?'

'ওদের বাইশ দফা দাবি আপনিই বেঁধে ঠিক করে দিয়েছিলেন?'

'ওদের সবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে খসড়া তৈরি করেছি।'

'ওদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শীলমোহর সেঁটে রেখে দিন।'

'তাহলে কি করে স্ট্রাইক ভাঙে?'

'ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো আমরা মেটাব, কিন্তু অনেক দাবিই অন্যায়।'

'এ আমরা মনে করি না। আমরা ভালো করে বিচার বিবেচনা করেই দাবিগুলো ঠিক করেছি।'

'কিন্তু বাইশটা দাবি থাকলে যদি এগারোটা মেটে সেই কি যথেষ্ট নয়?'

সুতীর্থ বললে, 'আখখুটে ছেলের বায়না হলে তা হত, আমি বুঝি মুখার্জি; কিন্তু এতো তা নয়, নুন-ভাতের—বাঁচা মরার জিনিস—'

'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন সুতীর্থবাবু?'

সুতীর্থ তৎ নগদ কোনো উত্তর দিল না।

মুখার্জি কিছুক্ষণ চুরুট টেনে তার পরে বললে, 'কোন পথে যাব আপনি দয়া করে নির্দেশ দেবেন নাকি? ওদের বাবা মা-গোসাই তারাই আমাদের গুরু গোসাই। তাই বলছি একটা পথ বলুন।'

'পথ চান, মেনে নিন দাবিগুলা।'

'কটা?'

'সব কটাই।'

'এই মন নিয়ে আপনি পলিটিকস করছেন সুতীর্থবাবু?'

'আমি পলিটিক্সের বাইরে।'

'তাই বুঝি? খিড়কীর ছাঁচা দিয়ে একেবারে সদরে প্রবেশ করেও এই কথা? হেঃ হেঃ হেঃ—' মুখার্জি পাইপ বের করে বললে, 'অগত্যা এটা আপনার না বুঝলে চলবে না যে কিছু খেতে হলে কিছু ছেড়ে দিতে হয়। কমপ্রোমাইজ ছাড়া পলিটিকস ইকনমিকস সামাজিক জীবন কিছুই চলে না।'

'একথা আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি মুখার্জি। কিন্তু ঐ বাইশটে দফাই তো কমপ্রোমাইজ—না বি গুলো কে পঞ্চাশের কোঠায় ওঠাতে পারতুম।'

'পঞ্চাশের কোঠায়—একশোর কোঠায়—মানে ইয়াসিন হামিদ অনন্তরম বিশ্বম্ভর—সকলের জন্যেই এক একটা বাগানবাড়ি করে দিতে হবে, সাতটা করে বাঁদী রেখে দিতে হবে, চোদ্দটা করে বেশ ফর্সা রাঁধবেনো দাবনা—ভদ্দরঘরের থেকে যোগাড় করে—'

'আমি উঠলুম।'

'শুনুন আরো কথা আছে।'

ক্রমশঃ

নীললোহিতের চোখের সামনে

সিঁড়িতে দেখা হলে ভুরু নাচিয়ে বলতে হয়, 'হ্যালো'—

আমি মাঝে মাঝে এমন একটি বাড়িতে যাই যে বাড়িতে বিরাশীটা দরজা, একশো ছাপ্পান্নটা জানলা, নব্বই জন দাস-দাসী, আটচল্লিশটা মোটর গাড়ির জন্য ছত্রিশজন ড্রাইভার। না, এটা কোনো রাজা মহারাজার বাড়ি নয়, আজকাল সেরকম রাজা মহারাজাই বা কোথায়? শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাড়িতে তাঁর একার জন্যই একশো সতেরো জন দাসদাসী ছিল, সে সব দিন আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। আজকাল যাকে বলে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে হু হু করে উঠছে এই রকম সব বাড়ি, শহরের আকাশ রেখা বদলে যাচ্ছে। এগুলিকে ঠিক বাড়ি না বলে নাম দেওয়া উচিত গৃহপুঞ্জ, কারণ প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টেরই মালিক আলাদা আলাদা পরিবার। এই সব গৃহপুঞ্জে গড়ে উঠছে এক নতুন সমাজ।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যেতে শুরু করেছে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই। এখন ছোটখাটো ছিমছাম সংসারই সবার পছন্দ। অনেক পুরোনো আমলের বাড়িতে এখনো এক পরিবারের লোক একই ছাদের নীচে থাকে অবশ্য, কিন্তু সে সব বাড়িতেও অনেকগুলি রান্নাঘর। অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা ঢোকার দরজা। বাইরে দেখা হলে হেসে কথা হয় বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে চলে পরস্পরের ঐশ্বর্য বা অহংকার নিয়ে খুব মুখরোচক নিন্দে।

এই আকাশচুম্বী গৃহপুঞ্জগুলিতে আবার গড়ে উঠছে এক নতুন রকমের যৌথ পরিবার। এখানে প্রতিটি ফ্ল্যাটই স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কিন্তু সিঁড়ি একটা, লিফটও একই। যাওয়া আসার পথে দেখা হয় এবং দিনের পর দিন কারুর সঙ্গে দেখা হলে নিরেট মুখ করে থাকা যায় না, দুটো একটা ভদ্রতার কথা বলতেই হয়, ক্রমশ আলাপ পরিচয়, কার কোন্ চাকরি বা ব্যবসা সেই খোঁজ খবর, তারপর একদিন চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

এই সব বাড়িতে আলাপ পরিচয়ের ভাষা ইংরেজি। প্রথম প্রথম সিঁড়িতে দেখা হলে ভুরু নাচিয়ে বলতে হয়, হ্যালো—! যারা একটু আমেরিকান-মনস্ক, তারা বলে, হাই! এবং এর পরই পাক্কা সাহেবদের মতন আবহাওয়া আলোচনা। 'ভেরি সাল্ট্রি ওয়েদার টু-ডে' কিংবা 'ইটস্ গোয়িং টু বি রেইনিং এগেইন...' ইত্যাদি। বাঙালী ছাড়াও এই সব বাড়িতে থাকে মাদ্রাজী, কেরালিয়ান, পাঞ্জাবী, হরিয়ানী, বিহারী, গুজরাতী, মারোয়াড়ী— না, ভুল বললাম, মারোয়াড়ী নয়! মাড়োয়ারীরা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে যাবে কোন দুঃখে? পুরো চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউই তো তাদের ইজারা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মধ্যে আরও বেশী নিবিড় যোগাযোগ ঘটে বাচ্চাদের মাধ্যমে। বাচ্চারা ভাষার ব্যবধান মানে না, এবং অন্য কেউ ইনট্রোডিউস না করিয়ে দিলে কথা না বলার বৃটিশ কায়দা জানে না। দু-একদিনেই তাদের ভাব হয়ে যায়, তারপর তারা সিঁড়িতে দৌড়োদৌড়ি করে, নীচতলায় খেলে এবং বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টেই অন্যের ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়। বাচ্চাদের মধ্যে বেশী ভাব হয়ে গেলে, তাদের মায়েদের মধ্যেও ভাব হয়। এবং কান টানলে মাথা আসার মতন তাদের বাবারাও কাছাকাছি আসে।

আবার সমস্যার শুরু করে এই বাচ্চারাই। মায়েরা নিজেদের বাচ্চার দোষ চট করে দেখতে পায় না। প্রেমের চেয়েও মাতৃস্নেহ বেশী অন্ধ। তিনতলার সাউথ ফেসিং মা ভাবলেন ছ তলার ইস্ট ফেসিং-এর বাচ্চাটা বড় পাকাপাকা কথা বলে, ওর সঙ্গে তাঁর ছেলের না মেশাই ভালো। আবার ছ-তলার সেই মা ভাবলেন আটতলার বাচ্চাটা বই চুরি করে। তিনতলার ছেলে

Creative Unit-A 1830 Ban.

যখন ছ-তলার ফ্ল্যাটে [illegible] একটু বাদেই কোনো না কোনো ছুতোয় তাকে ফিরিয়ে আনেন। আবার আটতলার বাচ্চাটি অন্য কোনো ঘরে এসে তার খেলার সাথীর বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই মায়েরা তার দিকে খর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এইসব কথাও চাপা থাকে না, ছড়িয়ে যায় এক সময়। তারপর সিঁড়িতে বা লিফটে সংশিলষ্ট মায়েদের দেখা হয়ে গেলে মুখ গোমড়া থাকে। চেঁচিয়ে ঝগড়া করা উঠে গেছে কিনা আজকাল!

একদিন আমি ঐ বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখলাম একটি তরুণ ও একটি তরুণী গল্প করতে করতে হাত ধরাধরি করতে করতে উঠছে। আমাকে দেখেই তারা হাত ছেড়ে দিল, সেটা লক্ষ করেই আমি তাদের মুখের দিকে ভালো-ভাবে তাকিয়ে দেখলাম। সিঁড়িতে হাত ধরাধরি করে ওঠা দোষের কিছু নয়, আর আমিও কোনো গুরুঠাকুর নই যে আমাকে সমীহ করতে হবে! তা হলে নিশ্চয়ই ওরা প্রেমিক প্রেমিকা, কেননা খাঁটি প্রেমিক প্রেমিকারাই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ছেলেটি বাঙালী মেয়েটি দক্ষিণ ভারতীয়। আমি খুব সঙ্কুচিতভাবে ওদের পাশ দিয়ে নেমে গেলুম।

তখনই আমার মনে হলো, একটা বাড়িতে যদি চল্লিশটি অপরিচিত পরিবার থাকে, তাদের মধ্যে অনেক কিশোর-কিশোরী, তরুণ তরুণী এদের মধ্যে তো প্রেম হতেই পারে। ট্রেনের কামরায় কিংবা জাহাজে কয়েকদিনের যাত্রায় প্রেম হতে পারে, আর এ তো এক বাড়িতে মাসের পর মাস থাকা। এই সব প্রেমের পরিণতি হিসেবে নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিয়েও হবে–তাহলে একই ছাদের তলায় শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি? সেও না হয় হলো, কিন্তু তারপর যদি বিচ্ছেদ হয়? তখনও একই বাড়িতে দু-জনের প্রেমের মাঝখানে এলো তৃতীয় ব্যক্তি, প্রেম ভেঙে গেল—এর পর দুঃখ অভিমানে কেউ কারুর মুখ দেখে না সাধারণত। কিন্তু এখানে তো তার উপায় নেই। সিঁড়িতে বা লিফটে কখনো না কখনো দেখা হবেই। এমনকি কোনো মেয়ে হয়তো দেখবে তার প্রাক্তন প্রণয়ীর পাশে অন্য কোনো মেয়ে। সে যে বড় মর্মান্তিক! জানি না, এরা কীভাবে মানিয়ে নেবে।

আমি যাই আটতলায় বিনায়কদার কাছে। উনি বহুকাল মেসে হোস্টেলে মানুষ, বিয়ে করার পরও মনোমতন ফ্ল্যাট পান নি কখনো। অফিস থেকে ধার নিয়ে গুরুসদয় রোডে এই ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। আটতলা শুনে বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই আঁতকে ওঠে—যদি যখন তখন লিফট

বন্ধ হয়ে যায়! সিঁড়ি ভেঙে আটতলায় উঠতে হবে? বিনায়কদা ভয় পান না, উনি বলেন, কত জায়গায় কত উঁচু উঁচু পাহাড়ে উঠেছি, কাঠমাণ্ডুতে একটা মন্দিরে উঠতে গেলে সাড়ে পাঁচশো সিঁড়ি ভাঙতে হয়, আর এই সামান্য আটতলায় উঠতে পারবো না।

বিনায়কদার ফ্ল্যাটে বসে চা খেতে খেতে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি, এমন সময় দরজার কাছে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে এসে দাঁড়ালো। তাদের হাতে নির্ভুল ভাবে চাঁদার খাতা।

আমি নীচু গলায় বিনায়কদাকে জিজ্ঞেস করলাম, আটতলার ওপরেও চাঁদার উৎপাত। আমি তো ভেবেছিলাম এত উঁচুতে ভিখিরি, মশা মাছি আর চাঁদা থাকবে না!

আমাকে চোখের ইশারায় চুপ করিয়ে দিয়ে বিনায়কদা বললেন, এরা এখানকারই। ফ্ল্যাটের ছেলেরাই পুজো করছে।

বউদি হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কত দিতে হবে ভাই?

ছেলেরা বললো, তিরিশ টাকা।

বউদি বিনায়কদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খুচরো তিরিশ টাকা আছে?

বিনায়কদা বললেন, দ্যাখো, শার্টের পকেটে!

ছেলেরা চাঁদা নিয়ে চলে গেল। আমি স্তম্ভিত। কোনো রকম দরাদরি পর্যন্ত নেই। এক কথায় তিরিশ টাকা চাঁদা, তাও কালী পুজোয়! বিনায়কদা বিখ্যাত সাম্যবাদী নাস্তিক, কলেজে থাকতে উনি আমাদের নাস্তিকতায় দীক্ষা দিয়েছেন—কখনো কোনো পুজো আর্চায় যোগ দেননি, তাঁর এই পরিবর্তন।

বিনায়কদা বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। মুখ নীচু করে বললেন, এখানে সবাই মিলে একটা কিছু ঠিক করলে তাতে আর আপত্তি করা যায় না, বুঝলি! সবাইকে সমান ভাবে থাকতে হবে তো!

আমি বুঝলাম। উনি কম চাঁদা দিলে বা চাঁদা না দিলে সবাই ওকে ভাববে কৃপণ কিংবা গরীব। সেটা তো সাংঘাতিক ব্যাপার। সবাইকে সমান ভাবে থাকতে হবে তো।

পরের মাসে গিয়ে দেখলাম, বিনায়কদার ফ্ল্যাটে টেলিভিসান এসে গেছে। এটাও একটা অবাক কাণ্ড। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত উনি ছিলেন টেলিভিসানের ওপর খড়্গহস্ত। সাহেবদের অনুকরণে ওটিকে বলতেন ইডিয়েট বক্স! তাঁর ঘরে এই জিনিস?

মুখ বেজার করে বিনায়কদা বললেন, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে শেষ পর্যন্ত এটা কিনতে হলো। এত ঝামেলা!

—লোন নিয়ে কিনলেন? কেন? আপনার নিজের কোনো প্রোগ্রাম ছিল নাকি টেলিভিসানে?

বিনায়কদা বললেন, না, সে জন্য নয়। টেলিভিসানে প্রত্যেক সপ্তাহে দুটো করে সিনেমা দেখায় জানিস তো। তোর বউদি সন্ধে বেলা একা একা থাকে, তাই নীচতলার ফ্ল্যাটে টেলিভিসান দেখতে যেত, শুধু শনি আর রবিবার—কিন্তু ওরা অভদ্র, গত রবিবার ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, একবার বলেও যায়নি।

আমি বললাম, তা [illegible] অন্য কোনো ফ্ল্যাটে গেলেও তো [illegible]—আরো তো অনেকের টেলিভিসান [illegible] আছে নিশ্চয়ই।

তা আছে। গিয়েও ছিল—তা সেই ভদ্রমহিলা টেলিভিসান সেট চালালেন না, তাঁর ছেলের পড়াশুনো নষ্ট হবে। তোর বউদি তো অপমানে মুখ লাল করে উঠে এসেছিল! আসলে তো কারুর সঙ্গে কারুর আত্মীয়তা নেই, কেউ কারুর সুখ দুঃখের সাথী হবে না—সকলকেই সমান সমান হয়ে থাকতে হবে—যাতে কেউ কারুকে ছোট না করতে পারে, বুঝলি না?

আমি পুরো বুঝলাম না অবশ্য। এই সব প্রাসাদতুল্য বাড়িগুলিতে কি এসে গেছে সমাজতন্ত্র? সকলেই এখানে সমান, না সমান হবার প্রতিযোগিতা? জানি না, ভবিষ্যতে এর সামাজিক রূপ কী হবে!

পুস্তক পরিচয়

কবিতা : প্রবীণ ও নবীন কবি ॥

মণীশ ঘটকের নির্বাচিত কবিতা। বাসন্তী লাইব্রেরী/২২।১, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম : পাঁচ টাকা।

তিরিশ বসন্তের ফুল (প্রথম পর্ব)। আশরাফ সিদ্দিকী, ফারুক প্রকাশনী/৭১, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-৮, বাংলাদেশ। দাম : কুড়ি টাকা।

জন্মই আমার আজন্ম পাপ। দাউদ হায়দার। প্রগতি প্রকাশনী /ঢাকা-১। মূল্য : সাত টাকা।

কবি মণীশ ঘটকের প্রায় পঞ্চাশ বছরের রচনা থেকে বেছে নেওয়া পঁচাত্তরটি কবিতার এই সংকলন হাতে পেয়ে একালের কবিতা পাঠক এক নজরে প্রবীণ কবিকে দেখবার সুযোগ পেয়ে খুশী হবেন। কবিতাগুলিও কবি নিজে বেছেছেন এবং তারিখ চিহ্নিত, সেটাও একটা আকর্ষণ।

কবি তিনি, সন্দেহ নেই। ১৯২২ থেকে পাঁচ-পাচটি দশক ধরে ব্যক্তিগত, সামাজিক নানা অনুভব ও উপলক্ষ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন কখনো পদ্যে, কখনো বা —না, একালের নির্মেদ ও নগ্ন গদ্যে নয়—গদ্য-ছন্দে। অবশ্য ছন্দোবন্ধ পদ্যেই তিনি বেশি লেখেন, এবং সেখানেও তিনি পুরোনো, কিছু-বা নির্জীব হয়ে আসা ছন্দ কাঠামোর একালের মতন কোনো নতুন মোচড়, কি সামান্য ভাঙচুর সঞ্চারিত করতে চান না। পুরোনো ছন্দ-কাঠামো আর ক্লান্ত বাঙালীর স্বাভাবিক স্বরভঙ্গি একই বিন্দুতে টেনে ধরে ছন্দের জোর আর ছন্দোহীনতার জোরকে মিলিয়ে কবিতাকে আরো প্রাণবান শরীর দেবার যে-চেষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ কি সুনীল-শক্তিদের মধ্যে দেখতে পাই, মণীশ ঘটকের ষাটের দশকের কবিতাতেও তার কোনো চিহ্ন না-দেখে আমাদের মন একটু উশখুশ করে। কবিতা পড়বার একটা অনিবার্য শর্তই তো এই যে নতুন কালের কবিতাপাঠের সব অভিজ্ঞতা মন থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখা যাবে না।

অবশ্য এই আফসোস নিয়ে বেশিক্ষণ মুখ ফিরিয়ে থাকা অসম্ভব। একটার পর একটা কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মণীশ ঘটকের নিজস্ব জগতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখতে পাই। এই কবি তাঁর আবেগ ও যখনকার-যেমন প্রতিক্রিয়া সরাসরি তুলে আনেন ছন্দ-মিলে, আর পঞ্চাশ বছরের আবেগ ও ভাবনা এক ধরনের সমগ্রতা পেয়েই যায়। পাঠকের সেই পুরস্কার কিছু কম নয়। আর যখন ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস-প্রবণতাকেও তিনি নতুন কাঁসার বাসনের মতন ঝকঝকে করে তুলতে পারেন, যেমন 'আগুন ওদের প্রাণ' কবিতায়—'কি রুদ্দুরে কি রুদ্দুরে আগুনের সমুদ্দুরে যেন''—তখন কবিতার স্মরণযোগ্যতায় পাঠক মুগ্ধ না-হয়ে পারেন না। কিংবা তাঁর রচনার মাধুর্যময় সরলতা, এমন কী কিছু-বা নবীন ধরন—'অনেক বেলা ছিল কখন বেরিয়েছিলাম বনে/একা একা, একেবারে একা/ আশা ছিল নিরালাতে একান্তে নির্জনে/হয়ত তোমায় পেয়ে যাব দেখা।'—চিনতে পেরে এই কবিকে আমরা সত্যিকার কবি বলেই চিনে নিই।

সেই সুযোগ দিয়েছেন বলে প্রকাশককে ধন্যবাদ। কিন্তু বইয়ের নাম নামপত্রে কেন 'একচক্রা'? আর লেখকের নাম যুধাজিৎ কেন? ওই ছদ্মনাম বেশি পরিচিত বলে? কবি-রচিত ভূমিকা থেকে জানতে পারছি, সংকলনটির 'একচক্রা' নাম তাঁরই দেয়া। তাহলে প্রচ্ছদে কেন 'মণীশ ঘটকের নির্বাচিত কবিতা'?

আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতা সংকলনে

তার তিরিশ বছরের ফসল তোলা হয়েছে। 'দেশ', 'কবিতা', 'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি কলকাতার বহু পত্রিকায় লিখেছেন আশরাফ সিদ্দিকী, সেই হিসেবে তাঁর 'তালের মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা', 'সাত ভাই চম্পা', 'বিষকন্যা' ও 'উত্তর আকাশের তারা'—এই চারটি কবিতা-বইয়ের সমষ্টি 'তিরিশ বসন্তের ফুল' আমাদের কাছে খুব একটা অপরিচিত নয়। ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন: 'যে পরিবেশে আমার বাল্যজীবন কেটেছে তা' হল উচ্ছল নদী মেখলা চিরন্তনী লোকায়ত বাংলা, বিচিত্র রসের লোক-গীতি, কথা, যাত্রা, কথকতা, জারী, সারী, পল্লী-মেলা, উৎসব-অনুষ্ঠান, হিন্দু-মুসলমানের প্রেম-প্রীতি-পূর্ণ-সহ-অবস্থান-এর লোকায়ত বাংলা; যুগ-যুগান্তর, কাল-কালান্তরের এই সনাতন ঐতিহ্যে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি।'

এটাই তাঁর কবিতার মূল সুর, তাঁর কবিতার জগৎ। তাঁর উচ্চারণের গ্রাম্য সরলতা, প্রাকৃতিক রংচং ও এক ধরনের খোলামেলা শৈথিল্য আমাদের কাছে টানে ও দূরে ঠেলে দেয়, একই সঙ্গে। সে-তুলনায় দাউদ হায়দার শুধু বয়েসে তরুণই নন, তিনি নাগরিক এবং নিজের সময় ছুঁয়ে আছেন। বইয়ের নাম যেমন চমকে দেয়, তাঁর কবিতাও তেমনি নতুন ও নিজস্ব চমকে ভরা। কলকাতায় তরুণ কবিদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাও স্পষ্ট। দাউদ কথা বলছেন খুব নিজের ধরনে এবং আরো কথা বলবেন বোঝা যায়। তাঁর ব্যথা-বেদনা, ঘৃণা-ভালোবাসা, মান-অভিমান নিয়ে তাঁর যে ব্যক্তিগত জগৎ, তার সঙ্গে এসে মিলেছে তাঁর দেশের সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও রক্তপাত, নানান ঐতিহাসিক ঝড়ঝাপটা। এ-বইয়ের ১৯৭১-এ লেখা 'আন্দোলন : বারবার ফিরে আসে বাংলাদেশে যুদ্ধের বেশে' ও ১৯৭২-এ লেখা নাম-কবিতা—দুটি অসাধারণ কবিতা। আবার 'আমি ভালো আছি, তোমরা?' অন্যভাবে আমাদের আবিষ্ট করে। তাঁর উচ্চারণ জ্যান্ত, ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক এবং আগেই বলেছি, নিজস্ব চমকে উজ্জ্বল। আবার, এই চমকে দেবার অত্যধিক আসক্তিই কখনো-কখনো তাঁর কবিতার কাল হয়। এ-রকম ছোটো নালিশ আরেকটা উল্লেখ করি। 'কেন', 'কেমন', 'যেন', 'যেমন', তিনি 'ক্যা' 'য্যা' দিয়ে লেখেন কেন? তাহলে তো 'খ্যালায়', (ঝড়ের খেলায় খুন হয় ঘরবাড়ি/পৃঃ ২৯) 'ভ্যালা' (আমার দুঃখপূর্ণ ভেলা/পৃঃ ৪৭) লিখতে হয়! আর 'যাবোনা', 'জানিনা', 'আমিতো'—এরকম জুড়ে দেয়া কেন? 'কখোন', 'কোরে' কেন লেখেন? তিনি কি 'এমন', 'তেমন'-এর বদলে 'এমোন', 'তেমোন'—'ব'লে', 'ম'রে'-র বদলে 'বোলে', 'মোরে' লিখতে চান? তা-ই কি হয়!

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"বক্তব্য বলতে যা কিছু আমার—গল্পতেই"—জানিয়েছেন প্রভাস ভদ্র তাঁর গল্পসংকলন **স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী** (দীপিকা, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা)-এর ভূমিকায়। লেখক হিসেবে তরুণ হলেও শিল্পের একটি চরম কথা তিনি যে জেনে গিয়েছেন, এই স্বীকৃতি তারই প্রমাণ। বক্তব্য যদি আলাদা করেই বলতে হয়, তা হলে গল্প লেখা কেন? আরেকটি ব্যাপারও বোঝা গেল, প্রভাসবাবু গল্পের বক্তব্যেও বিশ্বাসী।

এই সংকলনের ছ'টি গল্পেই সে বিশ্বাসের প্রমাণ প্রভাসবাবু রেখেছেন। খুব নাটকীয় কোনো উপাদান নেই তাঁর লেখায়। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে সহজভাবে তুলে নেওয়া যে-কোনো একটি দুটি দিন, মলিন ও উজ্জ্বল মুহূর্ত, একান্ত গূঢ় কিছু ভাবনা—এই তাঁর গল্পের বিষয়। 'দূরত্বের বস্তু থেকে' এই সংকলনের সেরা রচনা। মধ্যবিত্ত জীবনের সীমারেখা কোনখানে—সীমার শেষ অনুরোধের মধ্য দিয়ে তা যেন অঙ্কিত হয়ে ফুটে উঠেছে। 'স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের বক্তব্যও খুব জোরালো। কিন্তু দ্বিতীয় সত্তাটির বর্ণনায় (আমরা দুজনে যমজ ভাইয়ের মত, শ্বেত ভূমিকায় নায়কের মতো কিংবা মূর্তি ও প্রতিমূর্তির মতো) ক্লিশের ছাপ

পড়েছে। আরেকটু আঁটসাঁট করে বললেই তো ভাল ছিল। আরো কিছু খুচরো কাঁচামিও নেই, এমন নয়।

বক্তব্য যেহেতু রয়েছে, রচনাভঙ্গিও মোটামুটি তরতরে, আশা করা যায়, প্রভাসবাবু প্রথম সংকলনের দোষ-ত্রুটি পরবর্তী কালে নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

*

দেবারতি মিত্র, অমিতাভ গুপ্ত, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল কি রণজিৎ দাস—এঁরা কেউই প্রচলিত অর্থে 'সত্তরের' কবিকুলভুক্ত নন। অথচ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত সত্তর দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতায় (পরিবেশক : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, তিন টাকা) এঁদের নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। তবে সম্পাদক যেহেতু 'হলফ' করে বলেছেন যে, 'কবি নির্বাচনকালে সম্পাদকের উদ্দেশ্য সৎ ছিল'—সুতরাং বিতর্কের অবকাশ নেই। বরং, সব মিলিয়ে বলতে গেলে, এঁদের অন্তর্ভুক্তি সংকলনের পাঠযোগ্য কবিতার সংখ্যা যে বাড়িয়েছে, স্বীকার করতেই হবে।

নতুনদের মধ্যে অজয় সেন, অঞ্জন সেন, অরুণি বসু, অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়, শম্ভু রক্ষিত, শ্যামলকান্তি দাশ, সুব্রত রুদ্র প্রমুখ এখন আর তত নতুন নন। এঁদের কবিতা সম্পর্কে ইতাবসরেই পাঠকের কিছু ধারণা তৈরী হয়ে গিয়েছে। অনন্য রায়ের কি দু পৃষ্ঠায় দেবার মতো ছোট কবিতা ছিল না? একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ তুলে সেটিকেই স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে রস গ্রহণ করতে বলায় মা সম্পাদকের রসবোধের পরিচয় কিন্তু মেলে না। যেহেতু সম্পাদক নিজেও কবিতা লেখেন।

স্বল্পপরিচিতদের মধ্যে জামিল সৈয়দ (সারাংশের মতো অৎ বহু মনে হয় তার দীঘল চোখ), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (আমার কৈশোরকাল অন্ধ হয়ে ছুটে আসে রহস্যের জটিল ধাঁধাতে), ধূর্জটি চন্দ (পায়ের তলায় মাটি মানে স্বাস্থ্য, মানুষের হৃদি), নিশীথ ভড় (প্রেতসন্ধিক্ষণ আবার এসেছে ফিরে হাল্কা ফুর্তি ইয়ার্কিতে), প্রদীপচন্দ্র বসু (আমার রক্তের স্মৃতি, জয়ের বিস্ময় তোমার সান্নিধ্য পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক), রমা ঘোষ (অর্ধেক চাঁদের নিচে মধ্যরাতে আমার চোখের জল জ্যোৎস্নার জলে মেশে, পৃথিবীর সব গাছ আমাদের শোকে মুহ্যমান) এবং সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রত্যেক নারীই তার গূঢ় মন্দ্রে প্রেমিকের সবটুকু নেয়)—ইতস্তত পঙক্তিতে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে লিখেছেন সৈয়দ কওসর জামাল, শিবাজী গুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য, প্রদীপ রায়গুপ্ত ও বীতশোক ভট্টাচার্য, প্রদীপ রায়গুপ্ত।

অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত হল

অসম প্রতিযোগিতা খেলাধুলার মান উন্নয়নের প্রতিকূল। কি ফুটবল, কি ক্রিকেট, কি অন্যান্য খেলা। সমশক্তিসম্পন্ন প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খেলার মান উন্নত হয়—এটা বিশেষজ্ঞদের অভিমত। শুধু খেলা কেন, সর্বক্ষেত্রেই এই নীতি। সংগ্রাম না থাকলে জীবনে বড় হওয়া শক্ত। বিশ্বখ্যাত সাঁতারু, জনি উইসমুলার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, জীবনে বহু রেকর্ড করেছি, অলিম্পিকে সোনা পেয়েছি। অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। কিন্তু একবার সমুদ্রের মধ্যে হাঙরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি যেভাবে সাঁতার কেটেছিলাম তার গতিবেগ কেউ ঘড়িতে ধরে রাখেনি। যদি রাখা সম্ভব হত তবে দেখা যেত আমার অতীতের রেকর্ড অনেক ম্লান হয়ে গেছে। উঁচু মানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুফল উপলব্ধি করাবার জন্যই উইসমুলার ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

আমাকে এত কথা লিখতে হচ্ছে কলকাতার ফুটবলে অসম প্রতিযোগিতার কুফলের জন্য। বহু ফুটবল বিশেষজ্ঞ, বহু বিজ্ঞ কোচ বহুবার বলেছেন, কলকাতা ফুটবলের মান উন্নত করতে হলে প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা কমাতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র জোরালো করতে হবে। শক্তিশালী দলের সঙ্গে দুর্বলের প্রতিযোগিতায় খেলার মান বাড়ে না, বরং কমে যায়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রথম দিকে সংখ্যা বাড়িয়েছেন আই এফ এ-র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিচক্র, কখনো পেটোয়া ক্লাবকে অবতরণ না করিয়ে, কখনো খেলোয়াড়দের বুটরপ্ত করার অছিলায় বা জরুরী অবস্থার দোহাইয়ে প্রোমোশন-রেলিগেশন বন্ধ রেখে। এখন দল বাড়ছে ঘটনাচক্রে। গতবার আদালতের আদেশে বালি প্রতিভাকে প্রথম ডিভিসনে খেলাতে হয়েছিল। বেড়েছিল একটি দল। বালি আবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গেলেও প্রথম ডিভিসনে স্থান পূরণ করেছে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন সাল্কিয়া ফ্রেন্ডস। সুতরাং বাড়তি স্থান বজায় রয়েছে। এ বছর সেনা দলকে খেলার সুযোগ দেওয়ায় বাড়ল আর একটি দল। এখন প্রথম ডিভিসনে ক্লাবের সংখ্যা তেইশ।

সেনা দলকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে লিখছি না। দেশ রক্ষার কাজে যাদের জীবন উৎসর্গ জীবনের আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে তারা কিছু বাড়তি সুযোগ দাবি করতে পারে। ব্রিটিশ আমলে প্রথম দিকে তো প্রথম ডিভিসনে দুটি সেনা দলের আসন সংরক্ষিত ছিল। একটি ফোর্ট উইলিয়ামের পল্টনী দল, আর একটি ব্যারাকপুরের গোরা দল। নিয়ম ছিল এরা দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবে না। পরে শুধু ফোর্ট উইলিয়াম দলেরই আসন সংরক্ষিত ছিল। তখন অবশ্য গোরা টিমগুলিও ছিল ফুটবলে যথেষ্ট শক্তিশালী। যাই হোক রেজিমেণ্ট অফ আর্টিলারি নামে যে সেনা দলটি প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেয়েছে ফুটবলে তাদের কতখানি দক্ষতা আমার জানা নেই। সম্প্রতি প্রথম ডিভিসনের কয়েকটি দলের সঙ্গে তাদের ছয়-সাতটি প্রদর্শনী খেলার ফল কিন্তু আশাব্যঞ্জক। তা ছাড়া শারীরিক পটুতায় অবশ্যই তারা লড়িয়ে শক্তির অধিকারী। প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেয়ে ভারতের নানা কেন্দ্রের সামরিক ঘাঁটি থেকে তারা গুণী খেলোয়াড়দের সমাবেশ ঘটাবে বলেও আশা করা যায়। উপযুক্ত ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং অনুশীলনেরও তাদের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সেনা দলের আগমনে আপত্তির কিছু নেই। আপত্তি তাদের সম্পর্কে যারা প্রথম ডিভিসনে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হিমসিম খেয়ে ওঠে এবং অসম প্রতিযোগিতার আসর জাঁকিয়ে থেকে খেলার মান উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটায়।

বহু বছর থেকে শুনে আসছি, দুটি টিম নামবে একটি টিম উঠবে—এই নিয়ম প্রবর্তন করে প্রথম ডিভিসনে দলের সংখ্যা কমানো হবে। ঘটনচক্রে কিন্তু দলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দুটি নামবে, একটি উঠবে এ নিয়ম যখন এ বছরও পাস হল না তখন আগামী বছরও দলের সংখ্যা তেইশই থাকবে। লীগ শুরু হবার পর তো আর নিয়ম পাস করানো যাবে না। কারণ প্রতিশ্রুতি ভাঙলে কোর্টকাছারী হতে পারে।

অলিম্পিকে ভারত দল

মন্ট্রিল অলিম্পিক শুরু হতে আর মাত্র মাস দেড়েক বাকি। জুলাইয়ের ১৭ তারিখে অলিম্পিকসের উদ্বোধন। বেশ কিছু টালবাহানার পর ঠিক হয়েছে ভারতের ২৭ জন প্রতিযোগী ও ১১ জন কর্মকর্তা মন্ট্রিল অলিম্পিকে যাবেন। নামের চূড়ান্ত তালিকাটি এখনো প্রকাশ করা হয়নি। হকি দলে ১৮ জন খেলোয়াড় আগেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। কোন দুইজন বাদ পড়লেন তাও লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়নি।

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এয়ার চীফ মার্শাল ও পি মেহেরা (নির্বাচিত লোক দা মিলন) পরিষ্কার করেই বলেছিলেন, ২০ থেকে ৩০ জন সদস্যের একটি ছোট দল মন্ট্রিল অলিম্পিকে যাবে। এবং ১৬ জন হকি খেলোয়াড় ছাড়া দলে থাকবে কয়েক জন অ্যাথলীট ও শুটার। গত ৮ মে আই ও এ কর্ম পরিষদের সভার পর তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন দুই এক দিনের মধ্যে দল সম্পর্কে চূড়ান্ত করে অলিম্পিক সংগঠন সমিতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যাতে ১৭ মে-র মধ্যে নামের তালিকাটি তাঁদের হস্তগত হয়। নামের তালিকাটি কি আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে? নাকি দিল্লির উঁচু মহলে বক্সিং, ওয়েটলিফটিং, রেসলিং ও সুইমিং ফেডারেশনের তদ্বির তাগাদার জন্য দেরি করা হয়েছে? এখন দেখা যাচ্ছে আই ও এ মন্ট্রিলে ছোট দল পাঠাবেন বলে প্রথম দিকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত বক্সার ও ওয়েটলিফটারকে দলে ঢুকিয়েছেন। কুস্তিগীরদের পাঠানো সম্পর্কেও সুপারিশ করেছেন নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ ও শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে।

আমরা জানি হকি ছাড়া অলিম্পিকে কোন দলের কোন সম্ভাবনা নেই। এবং একজন অ্যাথলীটও এ পর্যন্ত যোগ্যতামানে পৌঁছতে পারেনি। সম্ভাবনা তো দূরের কথা। যোগ্যতামান নিরূপিত হয়েছে বিগত মিউনিখ অলিম্পিকে ষষ্ঠস্থান অধিকারীর সময় দূরত্ব ও উচ্চতার পরিমাপে। সেই পরিমাপে যাঁরা পৌঁছতে পারল না তাঁদের পক্ষে সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ পাওয়া আকাশকুসুম কল্পনা।

অবশ্য, জয় নয়—অলিম্পিকে অংশ গ্রহণই বড় কথা—আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তাঁর এই আদর্শ বাণী অনুযায়ী যদি চলতে হয় তবে সব দলকেই মন্ট্রিলে পাঠানো উচিত।

বিভিন্ন ক্রীড়া দলের মধ্যে বাদবিচার না করলেই বোধ হয় ভাল হত।

একটি দুঃসংবাদ, হকি দলে নির্বাচিত ১৬ জনের মধ্যে পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাক মাইকেল কিণ্ডো মন্ট্রিল যেতে পারছেন না, তাঁর ভাঙা পা ভাল করে জোড়া লাগেনি বলে। কিণ্ডোর বদলে দলভুক্ত হয়েছেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ব্যাক বলদেব সিং। অনেক ক্ষেত্রে নামী খেলোয়াড়ের চেয়েও পরিবর্ত খেলোয়াড় বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। আশা করব বলদেব তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেবেন।

একলব্য

ল্যাকমে
এক্সোটিকা
ট্যাল্ক এক্সোটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাকমে

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সব নামজাদা খেলোয়াড়—ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার, যোহান ক্রুইফ, ভগটস, সেফ মাইয়ার প্রভৃতি। সবার উপর টেক্কা দিয়ে গত মরসুমে ইউরোপের বেস্ট ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের ওলেগ ব্লখিন।

কারণ কি? না, গত তিন মরসুম ধরে তিনি অসাধারণ ভাল খেলছেন। বিশেষ করে যে মরসুমের ভূমিকার নিরিখে নির্বাচন সে মরসুমে ইউরোপের সব খেলোয়াড়ের চেয়ে তাঁর দক্ষতাই বেশী করে ফুটে উঠেছে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায়।

ইউরোপের বেস্ট ফুটবলার নির্বাচিত হয় ফুটবল বিশেষজ্ঞ ক্রীড়া-সাংবাদিকদের ভোটে। ভোট পরিচালনা ও ফল ঘোষণা করে ফুটবল সম্পর্কে একটি ক্রীড়া-পত্রিকা 'ফ্রান্স ফুটবল'। বিজয়ীর পুরস্কার একটি সোনার বল। দীর্ঘ ১৩ বছর পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের আর একজন খেলোয়াড় এই পুরস্কারের অধিকারী হলেন। ১৯৬২ সালে পেয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গোলকিপার লেভ ইয়াসিন।

২৩ বছর বয়সী নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী ওলেগ ব্লখিন কিয়েভ ডায়নামোর খেলোয়াড়। খেলেন লেফট আউটে। তবে ফরোয়ার্ড লাইনের কোন নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা থাকা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ পি এন-এর সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন—'যে ফরোয়ার্ড শুধু নিজের লাইনে খেলতে চেষ্টা করে, কোন দিনই সে খেলোয়াড় হিসাবে বড় হয়ে উঠতে পারে না।' তারপর বলেছেন, আধুনিক ফুটবল সম্পর্কে নেদারল্যান্ডসের যোহান ক্রুইফই তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার ওলেগ ব্লখিন ফুটবলের ছক-বাঁধা ব্যাকরণকে বাতিল করে দিয়েছেন। ওঁর খেলার মধ্যে আগামী শতাব্দীর সর্বজনীন ছক, যে ছকে শুধু গোলকিপার ছাড়া প্রয়োজনে দলের দশজনই ফরোয়ার্ড, দশজনই লিংকম্যান, দশজনই ডিফেন্ডার।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ফুটবলে ওলেগ ব্লখিন গত তিন বছর ধরে টপ স্কোরার, গত দু' বছর বেস্ট প্লেয়ারের সম্মান। ওঁর টিম কিয়েভ ডায়নামো দু' বছর আগে ইউরোপের উইনার্স কাপ পেয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের একটি দলের ওই প্রথম কৃতিত্বে ব্লখিনের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। ফাইনালে ফেরেন ক্যাভারোস দলের বিরুদ্ধে তিনটি গোলের মধ্যে দুটি করেছিলেন ব্লখিন। তার আগে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় আরও তিনটি। ১৯৭৫-এ সুপার কাপ জয়ী হয়েছে কিয়েভ। সেখানেও ব্লখিনের অসাধারণ কৃতিত্ব।

ইউরোপের বেস্ট ফুটবলার

পশ্চিম জার্মানীতে বেয়ার্ন মিউনিখকে কিয়েভ ডায়নামো হারিয়েছিল ১—০ গোলে, নিজেদের দেশের মাঠে ২—০ গোলে। তিনটি গোলই করেছিলেন ব্লখিন। দুটি খেলার পর বেয়ার্নের নামী মিডফিল্ড খেলোয়াড় জর্জ শোয়ার্জেনবেক বলেছিলেন, ব্লখিনকে আটকাবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ফুটবলের সমস্ত গুণে দক্ষ এমন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে আমি জীবনে খেলিনি।

পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞ ফুটবল কোচ ডেটার ক্র্যামার বলেছিলেন, ব্লখিন বিশ্ব ফুটবলের এক বড় সম্পদ। বেয়ার্ন মিউনিখ

ওকে কেনার জন্য দু' লক্ষ পাউন্ড (প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা) দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। ইউনাইটেড ইউরোপীয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আর্টেমিস্যো ফ্রাঞ্চির মতে, ব্লখিন এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবলার, অব্যর্থ গোলসন্ধানী এবং গোলদাতা।

ব্লখিনের বিশেষত্ব, নেহাত সাদামাটা আক্রমণ ওঁর পায়ের ছোঁয়ায় ধারালো হয়ে ওঠে। যে আক্রমণে গোলের সম্ভবনা নেই সেই আক্রমণ থেকেই স্বর্ণ-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। যেখানে কুশলী ডিফেন্ডার ওঁর সঙ্গে ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকে সেখানে পায়ের জাদুতে জোঁকের মুখে নুন ছিটিয়ে দিতে জানেন। জীবনে একবার রেফারীর আদেশে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল ব্লখিনকে। কারণ, এক ডিফেন্ডারের অবৈধ ফাউলের উত্তর দিয়েছিলেন অবৈধ পদ্ধতিতে। এখন অবৈধ খেলা ভুলেই গেছেন। পায়ে স্কিল এত বেশী এবং গতি এত তীব্র যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডিফেন্ডারকে বোকা হতে হয় ওঁর মোকাবিলা করতে গিয়ে।

এই ওলেগ ব্লখিন-এর কিন্তু ফুটবলের চেয়ে অ্যাথলীট হবার সম্ভাবনা ছিল বেশী। মা ছিলেন ইউক্রেনের স্প্রিন্ট-কুইন। মার ইচ্ছাও ছিল তাঁর ছেলে তাঁরই মত দ্রুত দৌড়ে নাম করুক। বালক বয়সে অ্যাথলেটিক্সের চর্চাও শুরু হয়েছিল। এবং ফুটবল শুরু হয়েছিল বাড়িরই উঠোনে। দেখা গেল, অ্যাথলেটিক্সের চেয়ে ফুটবলেই যেন ওলেগের সহজাত দক্ষতা। দশ বছর বয়সে মা ভর্তি করে দিলেন কিয়েভ ডায়নামোর বয়েজ টিমে। সেটা ১৯৬৪ সালের কথা। ৯ বছর পরে কিয়েভের বড় দলে খেলার সুযোগ এল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ এল সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় দলে খেলার। ব্লখিনের গোলেই ফিনল্যান্ডকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল এক আন্তর্জাতিক খেলায়। ওই বছর মিউনিখ ওলিমপিকে ব্রোঞ্জ জয়ী দলেরও অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন।

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ১১৫টি খেলায় ব্লখিন এ পর্যন্ত ৭০টি গোল করেছেন। ২৯টি আন্তর্জাতিক এবং ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার ২৫টি ম্যাচে গোল করেছেন ১১টি করে। কিয়েভ ইন্সটিটিউট অব ফিজিক্যাল কালচার থেকে গত বছর গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছেন।

'শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে সোনার বল তো পেলে। সোনার ফুটবলবুট পাবে কবে?' এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন ওলেগকে।

সোনার বুট সোভিয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে ৫০টি গোলদাতার পুরস্কার। ওলেগ জানান, তিনি কোনবার ২০টির বেশী গোল করতে পারেননি। কারণ, তাঁদের চ্যাম্পিয়নশিপে সব দলই প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন। ব্যাকরা কঠোর সংগ্রামী। সব সময় কড়া নজর রাখে। বিশেষ করে তাঁর প্রতি। তা ছাড়া তিনি সাধারণত পেনাল্টি কিক করেন না।

'তোমার শ্রেষ্ঠ গোল কোনটি?'

ব্লখিনের উত্তর, অনেক গোলের কথাই মনে আসছে। বিশেষ করে মনে আসছে ১৯৭৩-এ জাতীয় কাপে মসকো ডায়নামোর বিরুদ্ধে এবং মিউনিখে বেয়ার্নের বিরুদ্ধে গোলের কথা। একে একে বেয়ার্নের চারজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোলকিপার সেফ মাইয়ারকে পরাভূত করেছিলাম।

উল্লেখ্য, ওই মাইয়ার ছিলেন ইউরোপের বেস্ট ফুটবলার নির্বাচনে ওলেগ ব্লখিনের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

কত কত সোনা!
নেমে পড়ো পাইলট!
সাবধানে নামবে!

বিদেশী! কী করব?
অরণ্যদেবকে খবর পাঠাও, সুইলমান।

বিয়ের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে মিটল তো?
মিটেছে গুরান, দুশোটা বিয়ে হল!
তুমিও বিয়ে করে নিলে পারতে রাজা-কাকা।

তুমি সাংকেতিক খবর পাঠাও ... আমি ওদের আটকে রাখছি।
হুঁশিয়ার!
কিল্লাউইয়াতে উড়োজাহাজে বিপদ...

স্যামবুড, বিদেশীদের এখানে এনে তুমি অরণ্যদেবের আইন ভেঙেছ।
কী বলছে লোকটা?
বলছে, এখানে আমাদের আসার হুকুম নেই!

ওকে সরে পড়তে বলো। নয়তো মারা পড়বে!
ও বলছে, এখান থেকে ও এক পাও নড়বে না।

আঃ...
ঠিক করেছিস, ওয়ং...
কিন্তু ঢাক বাজছে কেন?
সাংকেতিক খবর পাঠাচ্ছে!

এবারে বোঝো মজা!
!
!
চলবে ১০

ফটো : দেশ

…বিকা মুখোপাধ্যায়, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় /**নাগারক**/ পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী
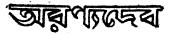
…পুনা ইনস্টিটিউটের ছবি

পুনার ফিলম অ্যানড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের যাঁরা …ক্ষার্থী তাঁরা কতটা কি কাজকর্ম শিখলেন সে সম্পর্কে …নেকেরই কৌতূহল আছে। বিশেষ করে ফিলম ইনডাসট্রির। …স্টিটিউটের ছেলেমেয়েদের … ফিলম ই… স্ট্রিতে …চুর। বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতের বেশ খানিকটা এখন …দের দখলে। সে দখলের সীমানা ক্রমাগতই প্রসারিত হচ্ছে। …মাদের দেশের চলচ্চিত্র এর ফলে কতটা কী লাভবান

…লচ্চিত্র

…য়েছে সেটা অন্য প্রশ্ন। তবে এটা ঠিক, ওঁরা আসছেন, …সবেন।

১৯৭৫ সালে ইনস্টিটিউট থেকে যাঁরা ডিপ্লোমা …য়েছেন তাঁদের তোলা কয়েকটি ছবি দেখানো হল …সাইটি সিনেমায়। শিক্ষার্থীদের তোলা ছবি, সুতরাং …টিবিচ্যুতি কিছু থাকবে। তা সত্ত্বেও তাঁরা যেসব ছবি …রেছেন তার স্বাদ ভিন্ন, দৃষ্টিভঙ্গিও ভিন্নতর। শিক্ষার্থীরা …বারে অ্যাবসট্রাকটের দিকে তেমন ঝোঁকেননি, তেমন কোন …কসপেরিমেনটেও হাত দেননি। উগ্রপন্থী যুবকদের …নসিকতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা আছে খান দুই ছবিতে **…শ্বমেধ** এবং **আনটাইটলড**)। অন্যান্য ছবিতে গল্পেরই …ধান্য।। এত কম দৈর্ঘ্যের মধ্যে গুছিয়ে গল্প বলাও …ত্বের। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে ভিসুয়াল দিকটির প্রতি তাঁদের নজর ছিল। ফলে একই সংগে চোখ ও মন বেশ কিছুটা তৃপ্তি পেয়েছে সন্দেহ নেই। কাহিনী-চিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীদের ঝোঁক যে বেশি তার অন্য কারণও থাকতে পারে। পরবর্তী কর্মজীবনে এই কাহিনী-চিত্রই তো তাঁদের ভরসা। কে আর তাঁদের টাকা দিয়ে একসপেরিমেনটের সুযোগ করে দেবে।

যে কটি কাহিনী-চিত্র দেখানো হয়েছে তার মধ্যে দুখানি ছবি মনে ছাপ রেখে যায়। দক্ষিণ ভারতের ঘরোয়া জীবনের এক টুকরো ঘটনা নিয়ে তোলা **অবশেষ** (পরিচালনা : কে জি গিরিশ) একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। বাড়ির প্রবীণ কর্তার মৃত্যু হয়েছে। গ্রামে বড় ছেলের কাছে তিনি থাকতেন। শহরবাসী ছোট ছেলে অতঃপর মাকে—যাঁর বয়স সত্তর কিংবা আশি—নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চায়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংসারে বিষাদের ছায়া। ঘটনা যৎসামান্য, কিন্তু কী গভীর, কত মর্মান্তিক। পরিচালক ওই ছোট্ট ঘটনাটুকুকে কেন্দ্র করে পাঁচ-ছটি চরিত্রের মানসিকতার সঠিক সন্ধান দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের মধ্যবিত্ত সংসারের চেহারা চমৎকার ফুটে উঠেছে। সংসারের এই পাকচক্রে নেই দুটি মানুষ। ওই বৃদ্ধা এবং তাঁর নাতি। ছবি শেষ হয়েছে ওদের উপর। রাত্রে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার পাশে এসে নাতি বসে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। বৃদ্ধার লোলচর্ম একখানি হাত আস্তে আস্তে ভারাক্রান্ত নাতির মাথায় চুলগুলি স্পর্শ করে। হয়তো একটি দীর্ঘশ্বাস নিজের অজান্তে বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

আর একখানি উল্লেখযোগ্য ছবি **কাজললতা** (পরিচ…

রচনা : অরবিন্দ দত্ত রায়)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে ছবিটি তোলা। পশ্চিম বাংলার এক দরিদ্র গ্রামের দরিদ্রতর একটি সংসারের ছবি। কাজললতা ওই সংসারের বড় মেয়ে। বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে, কিন্তু তার মনটা এখনো শিশুর মত। মা তার দস্যিপনায় বিরক্ত। ওই মেয়েটি হঠাৎ একদিনের অসুখে মারা গেল। কিন্তু

কাজললতা/পুনা ইনসটিটিউটের ছবি

সংসারে কেউ কোনদিন মেয়েটিকে ভুলতে পারল না। বাপ-মায়ের মাথার চুলে আরও বরফ জমেছে, পরের বোনেরা আরও বড় হয়েছে, কিন্তু ওই মেয়েটির স্মৃতি তাদের অনুক্ষণ ঘিরে রেখেছে। কাজললতার নিজের হাতে লাগানো লতাগাছটি এখন শাখায় শাখায় পল্লবিত। সবই আছে, কেবল নেই সেই দস্যি মেয়েটি।

ছবিটি বড় করুণ। কেমন যেন একটা কান্নাজড়ানো। গ্রাম বাংলার ছবিটিও যেমন নিখুঁত তেমনি নিখুঁত সব কটি চরিত্র। পরিচালক ডিটেলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিয়েছেন, আবেগের দিকটিও উপেক্ষা করেননি। দেখতে দেখতে পথের পাঁচালী আর দুর্গার কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছিল। —রবি বসু

উপভোগ্য/বিরক্তিকর

একুশ ঘণ্টার ব্যবধানে পর পর দুখানি হিন্দী ছবি দেখার পর ছবিগুলির আন্তরিক দৈন্য সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উপায় থাকে না। ওই দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টায় রঙীন ছবির বর্ণময় চাকচিক্যের অনেক কিছুই চোখে পড়ে বটে, কিন্তু চারুকলার প্রশ্ন বিবেচনা করার মনটা যে বিবর্ণ হয়েই থাকে সে কথা অস্বীকার করার উপায় কই!

বালাজী কলামন্দিরের **সবসে বড়া রুপাইয়া** ছবিতে তবু খানিকটা উপভোগ্যতার আস্বাদ আছে। মেহমুদের ভাঁড়ামি আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, কিন্তু তার সবটাই নিছক ভাঁড়ামি নয়। রঙ্গের মধ্যে দিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গ এবং কিছুটা মানবতার ছোঁয়া মনে ধরিয়ে দিতে পেরেছেন পরিচালক এস রামনাথন। মেহমুদ যে ছবির প্রযোজক সে ছবিতে তিনি যে ভিলেনের ভূমিকা নিতে পারেনই না সে সম্পর্কে দর্শক নিঃসন্দেহ ছিলেন। তবু কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে, সেটা আবরার আলভির চিত্রনাট্যের গুণ। চিত্রনাট্যে মেহমুদেরই বেশি প্রাধান্য। নায়ক-নায়িকা বিনোদ মেহরা ও মৌসুমীর তেমন বিশেষ কিছু করার ছিল না। বরং জনি ওয়াকার সুযোগ পেয়েছেন খানিকটা। হিন্দী ছবির অনুপাতে এ-ছবিতে গান সত্যিই কম। বাসু মনোহারির সুর রচনাও ভাল। ছবিতে রাগ-অনুরাগ এবং আবেগের অংশ ততটা রাশছাড়া নয়। আর মারামারি? ওটা না থাকলে চলে নাকি!

ঊষা প্রোডাকশনের **রাখী বন্ধন** একটি যন্ত্রণাদায়ক ছবি। ভাই-বোনের ভালবাসা নিয়ে গল্প। সে আবার যে-সে ভাই নয়, নাগলোকের যুবরাজ মানুষের রূপ ধরে বোনের হাতে রাখী পরতে আসে। বোনকে সুখী করার জন্য সে অনেক কিছু অলৌকিক কাণ্ড করতে পারে, কেবল জ্যাঠাইমার সংসারে দাসীবৃত্তির হাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে না। সেটা পারলে চোদ্দ রিলের এই নিদারুণ যন্ত্রণার হাত থেকে পরিচালক শান্তিলাল সোনি দর্শককে মুক্তি দিতে পারতেন। নায়ক-নায়িকা রূপে শচীন আর সারিকার প্রেম ও পরিণয় আছে। 'গীত গাতা চল' ছবিতে এই জুটির যে সুনাম হয়েছিল, এ-ছবির পর সেটা কোথায় দাঁড়াবে বলা মুশকিল। গোটা সাতেক গান আছে ছবিতে। গানের সিচুয়েশনের কোন বালাই নেই। যেখানে সেখানে গান ঢুকে পড়ে যন্ত্রণার মাত্রা বাড়িয়েছে আরও। দু-তিনখানি গানের সুর সি অর্জুন অবশ্য ভালই দিয়েছেন। ওইটাই এ-ছবির একমাত্র প্রাপ্তি। —রবি বসু

প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

এমন নয় যে জন-অরণ্যের বিপুল পরিশ্রম পেরিয়ে এসে এমন কি সত্যজিৎ রায়ও কিছুটা ক্লান্ত। এবং সেই কারণেই প্রায় এক বছরের জন্যে ফিচার ফিলম থেকে সরে এসে তিনি যেন তাড়াহুড়োহীন আলগা মেজাজের এক তথ্যচিত্র তৈরির ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে একটু আরামদায়ক বিশ্রামের মধ্যে সেঁকে নিচ্ছেন, এমন ধারণাও জল ধরবে না। কেননা তাঁর সাম্প্রতিকতম তথ্যচিত্র 'বালা'র কিছু অংশ আমি ইতিমধ্যে মুভিওলাতে দেখেছি। এবং যে বিস্তীর্ণ ভাবনার উপত্যকা পেরিয়ে এই ছবিটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারল তার

বালাসরস্বতী /বালা/ নির্দেশনায় সত্যজিৎ রায় ফটো : সন্দীপ রায়

ঙ্গে আমি অন্তত কিছুটা পরিচিত।

প্রায় খেলার ছলে, রোদ এবং ছায়ায় ঘেরা বারান্দায় বসে বসে, গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর আলতো দাঁতের চাপে মুখের মধ্যে ভেঙে দিতে দিতে, লিওনার্দো তৈরি করেছিলেন তাঁর 'মনালিসা', প্রায় স্বপ্নাবিষ্ট [illegible] ভাবে (দ্রষ্টব্য—ফ্রয়েড : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি)। আর উইলিয়াম ব্লেক যখন তাঁর কাব্যিক উন্মাদনার তুঙ্গে, এবং ক্রমেই যখন তাঁর সমস্ত পঠন এবং ধারণার জট তাঁকে একটু একটু করে পাকে পাকে গ্রাস করে ফেলছে, ঠিক সেই সময়ে অন্যভাবে তাঁর মুক্তি এল। ব্লেক ছবি আঁকলেন, প্রায় খেলার ছলে, অজস্র সাবলীল ছবি। কিংবা আমাদের রবীন্দ্রনাথ। কত অসংখ্য তীব্র রেখাচিত্রকে তিনি কত সহজে, প্রায় খেলতে খেলতে আবিষ্কার করেছিলেন কবিতার খাতায় কাটাকুটির ফাঁকে ফাঁকে।

কিন্তু এমন নয় যে এই সহজ ঘটনাগুলো সহজে ঘটেছিল। এর পিছনে ছিল সুদূর বিস্তীর্ণ ভাবনার জমি। মনে মনে তৈরি হয়ে ওঠা। এবং এক ক্লান্তিহীন, সৃষ্টিশীল কল্পনা। আর এরই ফলে হঠাৎ একদিন পিকাসো ছবি আঁকার পরিশ্রম থেকে মুক্তি নিয়ে লিখে ফেলেন একটি চমকলাগানো স্ক্রিন প্লে কিংবা হুসেন এবং স্যামুয়েল বেকেট তৈরি করেন তাঁদের প্রথম ছবি।

'বালা' ছবিটির পিছনেও আছে তেমনি এক দীর্ঘ অনুদ্ঘাটিত পরিশ্রমের ইতিহাস। ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, ছুটি নয়, হাত পা ছড়িয়ে এলোমেলোভাবে আরাম করে নেয়া নয়, আরও বেশি সংহতি, আরও বেশি ঘনবদ্ধতা। অথচ জন-অরণ্যের এক্সিজেসটেনশিয়ালিজম থেকে কত সহজে সত্যজিৎ রায় সরে এলেন 'বালা' ছবির ট্রান্সেনডেনটালিজম-এ। কোথাও একটু হোঁচট খেলেন না। কেমন করে এটা সম্ভব হল?

এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে 'বালা' নামক পঁয়ত্রিশ মিনিটের ছবিটির পেছনে আছে দীর্ঘ দিনের উপাদান সংগ্রহ, ভাবনা, পরিশ্রমের দীর্ঘ উপত্যকা এবং ক্লান্তিকর অতিক্রমণ। ঠিক একই ভাবে রেনো ফিচার ফিলম-এর নিশ্চিত সাফল্য থেকে সরে গেছলেন 'ড্যানিউব' এবং 'গঙ্গা'-র মতো দুটি

বালাসরস্বতী ফটো : সন্দীপ রায়

[illegible] চিত্র-ভাষার কিছু কিছু অনাবিষ্কৃত অনুপুঙ্খের উন্মোচনের জন্য রেনোর পক্ষেও সত্যজিতের মত এই সরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

কেমন করে 'বালা' ছবিটিকে ভেবেছেন তিনি? উত্তরে সত্যজিৎ জানালেন, "ছবিটি সম্পূর্ণ রঙিন। বালাসরস্বতীর ওপর এই ছবিটা হয়তো সাধারণত যাকে ডকুমেন্টারি বলে তা নয়। ভারতের এক শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর প্রতি এটাকে বলতে পার আমার ট্রিবিউট।

"ছবিটাতে একটা তের মিনিটের নাচের দৃশ্য আছে। ভারতনাট্যমের 'বর্ণম' অংশটা বালা নেচেছেন। বালার বয়স হয়েছে। সুতরাং উনি নাচতে পারবেন কিনা, সে-বিষয়ে আমার প্রথম প্রথম একটু সন্দেহ ছিল। তাই ছবিটা করবার আগে আমি ও'র সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা একটু বোঝবার চেষ্টা করি। তখুনি বুঝতে পারি, বালা এখনো একজন সুপ্রিম আর্টিস্ট। তবুও আজ থেকে তের বছর আগে বালা যেমন নাচতেন ঠিক ততোটা আজও পারবেন এটা আমি আশা করিনি।

"কিন্তু বালার 'বর্ণম' দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আগের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমি তো বোধ হয় এত ভাল নাচ ও'র আগেও দেখিনি।

"এ ছাড়া ভারতনাট্যমের 'অভিনয়ম'-এর অংশটাও আমার ছবিতে খানিকটা আছে", বললেন সত্যজিৎ রায়। 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ইনার আই'-এর পরে আমরা আরও একটি রঙিন বিস্ময়ের জন্য প্রতীক্ষিত রইলাম। —রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেনসরশিপের নতুন বিধিতে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পে প্যানিকের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী সূত্রে জানা গেছে যে ১৭টি ছবিকে প্রদর্শনের জন্য একেবারেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। ঠিক অনুরূপ সংখ্যক ছবিকে প্রচণ্ডভাবে কাঁচিকাটা করা হয়েছে। ছবি রিলিজের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। গত তিন সপ্তাহ যাবত একটিও নতুন ছবি মুক্তি পায়নি।

প্রযোজকদের যে দলটি দিল্লি গিয়েছিলেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লার সঙ্গে আলোচনা করতে তাঁরা একেবারে শূন্য হাতেই ফিরেছেন। শ্রীশুক্লা তাঁদের স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, গত দু বছর ধরে বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও প্রযোজকরা তা কানে তোলেন নি। উন্নত এবং সদর্থক ছবি তৈরীর আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য কিছু লোককে আপাতত ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। উপায় নেই।

শৈবাল, সোনালী গুপ্ত /সানাই/ পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত

ছবির শুটিং এখন প্রায় বন্ধ। নতুন সেনসর বিধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গল্প এবং চিত্রনাট্য ঢেলে সাজানো হচ্ছে। গত বছর জানুয়ারী মাসে বিশিষ্ট প্রযোজক জে ওমপ্রকাশ রাজেশ খান্না আর হেমা মালিনীকে নিয়ে একটি ছবির কাজ শুরু করেছিলেন। দু রীল শুটিং-এর পর "আঁধি" এবং "আক্রমণ" ছবি দুটিকে মুক্তি দিতে গিয়ে ওই ছবির কাজ স্থগিত থাকে। প্রথম ছবিটি মোটামুটি গেলেও দ্বিতীয় ছবির বাণিজ্য তেমন সুবিধের হয়নি। চিন্তিত ওমপ্রকাশ তখন রাজেশ-হেমার গল্পে নতুন 'মশলা' যোগ করে কাজ শুরু করেন। পাঁচ রীল শুটিং করার পর এই নতুন সেনসর বিধি। ফলে ওমপ্রকাশজীর ছবি এখন আবার অন্ধকারে।

"শঙ্করদাদা" নামে একটি ছবি সেনসর থেকে 'এ' সার্টিফিকেট পেয়েছিল গত মার্চ মাসে। প্রযোজক রিভাইজিং কমিটির কাছে আবেদন করেন 'ইউ' সার্টিফিকেটের জন্য। এখন ছবিটিকে তাঁরা আদো মুক্তির জন্য ছাড়পত্র দিতে নারাজ।

শ্রীশুক্লা যে বলেছেন, প্রযোজকরা এই অবস্থার জন্য নিজেরাই দায়ী—সেটা খুব খাঁটি কথা। এখন অবস্থা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। আদ্যন্ত মারদাঙ্গার দৌলতে "শোলে" ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেক প্রযোজকই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছিলেন। এমন কি 'কড়ি কড়ি'-র মত একটি মোটামুটি বিশ্বাস্য ছবিও শেষ পর্যন্ত মারপিট দিয়ে শেষ হয়েছে।

• • •

বোম্বাইয়ের প্যানিকের প্রথম কারণ যদি হয় নয়া সেনসরবিধি, তবে দ্বিতীয় কারণ কিশোরকুমার। আকাশবাণী এবং টেলিভিশন যে কিশোরকুমারকে কালো-তালিকাভুক্ত করেছেন একথা আর কারও অজানা নেই। ইন্ডিয়ান মোশান পিকচার প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনও তাঁর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। ফলে গত পনের দিন সমস্ত রেকর্ডিং ক্যানসেল হয়েছে। জনরব : কিশোরকুমার নাকি দিল্লি গিয়ে তাঁর পূর্বে ব্যবহারের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখনো বিবিধ ভারতী বা দূরদর্শন তাঁর কোন গান বাজাচ্ছেন না।

• • •

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সঞ্জীবকুমার নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি এখন মধ্য বোম্বাইয়ের জাসলোক হাসপাতালে স্থানান্তরিত এবং বিপন্মুক্ত।

—কপিল পাল

সংগীত

দুটি সকাল : রবীন্দ্র সদনে

রবীন্দ্র সদন আয়োজিত বাইশ দিন-ব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অন্যতম অঙ্গ রবীন্দ্র সংগীতের আসর। চারটি রবিবার সকালের এই অনুষ্ঠানের প্রথম দুটি অধি-বেশন শুনে কান যত ভরেছে, মন যেন তত ভরলো না। সারা বছর ধরে রবীন্দ্র-সংগীতের যে-জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলি হয়, তার সঙ্গে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না কবিপক্ষের এই পবিত্র আসরের। দু দিনে শোনা গেল ২৮ জন শিল্পীর একক সংগীত, সকাল দশটা থেকে মধ্য-দুপুর পর্যন্ত। কিন্তু 'আমারে দিই তোমার হাতে/নূতন করে নূতন প্রাতে'—আত্মনিবেদনের এই বিশিষ্ট প্রত্যাশিত ভঙ্গিটি অধিকাংশ নামী … অনুষ্ঠানেই যেন অনুপস্থিত ছিল। … তোলা গানের বদলে তাই তাঁরা … ছেন তাঁদেরই কণ্ঠে বহুশ্রুত … ফাংশন-জমানো গান। শ্রোতাদের নতুন আগ্রহ ফোটাবার দিকে মন …

ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। যেমন … দিনের অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী … মিত্র। বয়স … কে অবসাদ দেয়নি … পরিণতি … ও পূর্ণতা। সতেজ স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে তিনি যে-চারটি … শোনালেন দীর্ঘকাল মনে লেগে … তার রেশ। বিশেষ করে 'আমার … ভালো'। ওই দিনের আসরেই … শিল্পী কৃষ্ণা মিত্র চমকে দিয়ে … 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' … স্বচ্ছন্দ সুরেলা কণ্ঠের এই … অনুষ্ঠানে অনাগত দিনের … চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। … শিল্পীদের মধ্যে সত্রাজিৎ বসুর … খোলা হাওয়ায়' এবং মঞ্জুলিকা … 'আজি মম মন চাহে' খুব সুষ্ঠু … পরিবেশিত। অরুন্ধতী হোমচৌ … কণ্ঠসম্পদ ঈর্ষনীয়, কিন্তু র … সংগীতের গায়কী তাঁর কণ্ঠে পু … ফোটেনি। 'আলোয় আলোকময়' গা…

সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় /নিমন্ত্রণ/ পরিচা… স্বদেশ সরকার

'মিলালো' বা 'বুলালো' উচ্চারণে আধুনিক গানের অনুযোগ জড়িত। এই দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী মনোশ্রী লাহিড়ী তার অন্তর্ভুক্তির যথার্থ্য প্রমাণ করতে পারেননি। খ্যাতি অনুযায়ী গান শোনাতে পারেননি বাণী ঠাকুর এবং প্রতিমা মুখোপাধ্যায়। প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের গান কড়াই-ভোর ভাঙা ফুটে উঠছিল, বাণী ঠাকুরের কণ্ঠে অস্বাচ্ছন্দ্য। সুমিত্রা সেনের পরিশীলিত পরিবেশন মনে দাগ কাটে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সাগর সেন ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা (যার যতটুকু) অক্ষুণ্ণ রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় কেন হঠাৎ শ্যামা'র একটি গান (ক্ষমিতে পারিলাম না হে) স্থানকালপাত্র ভুলে গেয়ে উঠলেন, কিংবা সাগর সেন কেন গাইলেন দেবব্রত-প্রতিষ্ঠার গান (তৃষ্ণার জল এসো এসো) এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। জনপ্রিয়তা বড়ো শ্লাঘাকর বস্তু। বরং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের পরিবেশনে আন্তরিকতার স্পর্শ বড়ো হয়ে ফুটেছে—এই সত্য জানানো ভালো।

রঞ্জিত মল্লিক, রীতা ভাদুড়ি /দিন আমাদের/ পরিচালনা : অগ্রদূত

দ্বিতীয় দিনের বিস্ময় ছিলেন মালতী ঘোষাল। সত্তর-উত্তীর্ণা এই পুরনো দিনের অনন্যা শিল্পীর কণ্ঠে সূক্ষ্মতম কাজ এখনো সতর্ক পোষা পাখির মতো খেলা করে। তারই প্রমাণ রেখে গেলেন স্বল্পতম যন্ত্রানুষঙ্গের কণ্ঠে 'অশ্রুভরা বেদনা' ও 'এরা পরকে আপন করে' গান দুটি গেয়ে। নিজেকে ছাপিয়ে উঠে গান শুনিয়েছেন আরেকজন শিল্পী সেদিন তাঁর নাম অদিতি সেনগুপ্ত। বস্তুত, দু-দিনের এই অনুষ্ঠানে একমাত্র অদিতি সেনগুপ্তকেই শ্রোতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চতুর্থ গানের জন্য। তিনি বিহ্বলভাবে তাকিয়ে দেখলেন পরদা টেনে দেওয়া হচ্ছে, ফলে উঠে পড়তে হয়েছে তাঁকে। অথচ শ্রোতাদের প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে নীলা মজুমদার শুনিয়েছেন তাঁর তৃতীয় গানটি। রবীন্দ্র সংগীতে এই শিল্পীর স্বাচ্ছন্দ্য প্রশ্নাতীত নয়। পরিণত শিল্পীদের মধ্যে বনানী ঘোষ, মায়া সেন ও পূরবী মুখোপাধ্যায়-এর গানে অনায়াস লাবণ্য সঞ্চারিত হয়েছিল। গীতা সেনের 'মনে যে আশা লয়ে এসেছি' মনে থাকবে। বীরেন বসুর গানে প্রার্থিত পরিণতি ছিল না। গৌতম মিত্রর কণ্ঠ সুরেলা, কিন্তু ইচ্ছেমতো কোনো-কোনো কলির অনুবৃত্তি অনুমোদনযোগ্য নয়। গৌতম সেনগুপ্তের কণ্ঠ চাপা, অতনু সান্যাল চলনসই। মেখলা দাশগুপ্তের কণ্ঠ শত্রুতা করেছে সেদিন। উজ্জয়িনী সেনের গায়কী সুন্দর, কিন্তু পর-পর দুখানি তালভাঙা গান বাছা উচিত হয়নি। নূপুর সেনের কণ্ঠ খুব পরিষ্কার নয়, তবু 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' উৎরে দিয়েছেন। এ-দিনের শেষ শিল্পী ছিলেন স্বপন গুপ্ত। জনপ্রিয় এই গায়কটির কণ্ঠে সুর ক্রমশই যেন বিলীয়মান। তিনি যখন দ্বিতীয় গানে (কাছে ছিলে, দূরে গেলে) গাইছিলেন, 'কে জানে তোমার বীণা সুরে ফিরে যাবে কিনা' তখন মনে হচ্ছিল নিজের কাছেই নিজের এই নিষ্ঠুর প্রশ্ন তাঁর। শেষ গানে অবশ্য প্রভুর কাছে ক্লান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তিনি। শুধু বাংলায় নয়, ইংরেজীতেও!

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

উত্তর-দক্ষিণের শাস্ত্রীয় সংগীত

দক্ষিণী ও উত্তর ভারতীয় মার্গ-সংগীত উভয়েই সুমিত্রা গুহর সমান অধিকার। সুমধুর হংসধ্বনি নামে একটি সংস্থা তাঁর গান শোনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন কলামন্দিরে। সুমিত্রা গাইলেন শুদ্ধ কল্যাণ ও হংসধ্বনিতে খেয়াল। এছাড়া জয়দেবের দু-একটি অষ্টপদী ও কবীরের ভজন। চমৎকার মিষ্টি গলা। গাইবার ঢংটিও মনোরম, সুচারু। মালবিকা কাননের আদল আছে। খুবই স্বাভাবিক, কারণ সুমিত্রা মালবিকার কাছেই গান শিখেছেন। সুমিত্রার শুদ্ধ কল্যাণ ব্যাকরণকে আঘাত করেনি—ভাবরসে ঘুলিয়ে তোলেনি। তবে বিলম্বিত বিস্তার আর অন্তরার দ্রুত সমাপন অনাবশ্যক মনে হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় শ্রোতার আধিক্য ছিল বলেই কি উত্তর ভারতীয় রাগের অমন ত্বরান্বিত সমাপ্তি? সুমিত্রার হংসধ্বনিতে দ্রুত খেয়ালে পারিপাট্যের অভাব ছিল না। তবে সবচেয়ে মন ছুঁয়েছে তাঁর অষ্টপদী আর ভজন। সুমিত্রাকে সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন মহেশ প্রসাদ আর তবলায় কেরামত

...বী চক্রবর্তী /অবতার/ পরিচালনা : ...কত ভট্টাচার্য

খাঁ। দুজনেই গায়িকাকে সস্নেহ আতিথ্য দিয়েছিলেন। সেদিনের আসরে পুরোপুরি জাজ্বলী গান শোনালেন বাল মুরলী কৃষ্ণ। মুরলী কৃষ্ণর প্রতিভা বহুমুখী। তাঁর নিবেদনেও ছিল বৈচিত্র্য। পূর্ণচন্দ্রিকা রাগে ত্যাগরাজের একটি কৃতি দিয়ে তাঁর অনুষ্ঠানের সূচনা। সম্পূর্ণপ্রয়ার আল্পনা এবং নিজের কিছু রচনা পরিবেশনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। স্বর বিন্যাসের চাতুর্য, রূপায়ণের নান্দনিক সৌকুমার্য, রাগ স্বভাবের সানুভব উদ্ঘাটন—মুরলী কৃষ্ণর কাছে সব কটিই মিলে গেল। বেহালায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করেন রাধা নারায়ণ। মৃদঙ্গ সঙ্গতে ছিলেন শ্রীনাম মূর্তি। প্রশংসা উভয়েরই প্রাপ্য।

—আশিস চট্টোপাধ্যায়

উপভোগ্য বৃন্দগান

ক্যালকাটা কোরাল গ্রুপ নামাঙ্কিত একটি নতুন গোষ্ঠী সম্প্রতি গোর্কি সদনে লোক-নৃত্য, লোকসংগীত এবং গণ-সংগীত-সহ একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রধানত বৃন্দগান পরিবেষণই এ'দের লক্ষ্য, প্রতিষ্ঠানের নামেই যার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। প্রসাধনকলার চাতুর্যের আড়ালে লোকসংগীতের খাঁটি মাটির আঘ্রাণ হয়ত কিছুটা আচ্ছন্ন। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। নাগরিক পরিবেশে, নাগরিক মনের উপযোগী করে তুলতে হলে সেটুকু পরিমার্জনা বোধহয় অপরিহার্য। কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড়ো কথা, উদ্দীপনাময় ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। এই নবজাত সংস্থার শিল্পীদের কৃতিত্ব এই যে, বহু-শ্রুত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যেও একটা প্রাণের স্পন্দন এ'রা আগাগোড়া বজায় রাখতে পেরেছেন।

লোকসংগীতের মধ্যে রোটাকের গান 'সাপেরা বীন' এবং গোয়ার 'কাই বারেলো' নতুন স্বাদযুক্ত। মৈমনসিংহের গান 'আমার নাম গয়া বৈদ্য' নৃত্যগীতের সুষ্ঠু সংযোগে উপভোগ্য। সর্বশেষে পরিবেষিত পাঞ্জাবী গানও নৃত্যসহ সুনিপুণ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। গণসংগীতের মুখে ওয়াই এস মুলকি সুরারোপিত 'ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম' সুপরিকল্পিত আলোকসম্পাতের সহায়তায় এবং সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরের সমাহারে অনির্বচনীয় পরিবেশ রচনা করেছিল। অনুষ্ঠানের গানের দিকটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এবং রীণা মুখোপাধ্যায়। সম্মেলক কণ্ঠ অবশ্য আরও বলিষ্ঠ হতে পারত, বিশেষত হার্মনি-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন কোন স্বর সঠিক শ্রুতি যেন স্পর্শ করতে পারে নি অথবা আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে অস্পষ্ট ছিল। নৃত্যাংশ মোটামুটি উন্নত মানের। এই অনুষ্ঠানের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ ভাষ্যকার দেবাশিস বসুর বলিষ্ঠ, ব্যঞ্জনাময় এবং সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

—ভাস্কর মিত্র

বিবিধ

রাধাপুরের রাধিকা

প্রথম প্রযোজনা, তাই কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক। তবুও 'মন্দিরা' নিবেদিত 'রাধাপুরের রাধিকা'-র বিষয় নির্বাচন, সংগীত এবং নৃত্য পরিকল্পনা সমবেত দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছিল। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে ওই সংস্থা তাঁদের প্রথম বার্ষিক উৎসবে পূর্ববাংলার ভাটিয়ালি, আসামের লোকসংগীত এবং উত্তর বাংলার সংগীত সমৃদ্ধ গারো-খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলের দুই যুবক-যুবতীর (রাধা-জানকী) প্রণয় কাহিনী নিয়ে রচিত 'রাধাপুরের রাধিকা' পরিবেষণ করলেন। নাটকের প্রয়োজনে অন্য অঞ্চলের কিছু লোকসংগীতও এখানে স্থান পেয়েছে।

রূপ উজাড় করা পাহাড়তলীর নিসর্গ প্রকৃতিতে মাহুতে গ্রামের মানুষের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বেদনার যে কান্না ভেসে আসে, মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে—সেই নিঃশব্দ ব্যথা নিয়েই এই কাহিনী—'রাধাপুরের রাধিকা'। কাহিনীটি রসগ্রাহী।

প্রধান কয়েকটি চরিত্রের সংগীত পরিবেষণ করেন ডঃ ভূপেন হাজারিকা, দীনেন্দ্র চৌধুরী, অংশুমান রায়, সুবীর ভট্টাচার্য, বুলা সাহা এবং সুজাতা মুখোপাধ্যায়। নৃত্যে বটু পাল, সাধন গুহ, পলি গুহ, এবং মন্দিরার সংগীত ও নৃত্য-শিল্পীরা। সুরসংযোজনা, নাট্যরূপ (মিন্টু মুখোপাধ্যায়) এবং নৃত্য পরিকল্পনা ও নির্দেশনা (বটু পাল) প্রশংসা করার মতন।

সাংস্কৃতিক

মধ্য কলকাতার এক ঘরোয়া পরিবেশে ২৫ বৈশাখে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে নাচ, গান, কবিতাপাঠ এবং গীতি আলেখ্য "হে কবি লহ গো প্রণাম" বেশ বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছিল। ছোট ছোট শিল্পীদের নাচের সঙ্গে আগুনের পরশমণি গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। অন্যান্য গান গেয়েছেন লালমোহন মান্না, অরবিন্দ বসু, কান্তি মুখার্জী, কার্তিক ব্যানার্জী, কৃষ্ণা মল্লিক। আবৃত্তি করেন সীতা মুখার্জী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন সাধনা মুখোপাধ্যায়। গীতি-নাট্যের সংগীতাংশে ছিলেন রেখা দাশগুপ্ত, পলি দাশগুপ্ত, যশস্বতী ঘোষ, তাপসী গাঙ্গুলি, মাধবী মুখার্জী, শোভনা মুখার্জী, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, নিতা শা। ছোট্ট দুটি মেয়ে সুস্মিতা ঘোষ ও কৃষ্ণা ঘোষ এইসঙ্গে নাচলেন ও গাইলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেখা দাশগুপ্ত। গ্রন্থনায় ছিলেন পরিতোষ মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাষিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লন্ডন অফিস মাধ্যমে (লনডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

"ও পাঁচটা দিন আমি সকলকে এড়িয়ে চলতাম
এখন পেয়েছি 'কেয়ারফ্রী'– মাসে
গোটা ৩০ দিনই এখন আমি নিশ্চিন্ত।"
নতুন "কেয়ারফ্রী" স্যানিটারী ন্যাপকিন
আর সেই সঙ্গে ওয়াটাররাপ স্ত্রীলোকদের শরীর
পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে।
মাসে পাঁচ দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্যে বিশেষ
ব্যবস্থার দরকার হয়। সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি
এখন পাচ্ছেন "কেয়ারফ্রী"।
অদ্ভুত ওয়াটাররাপ সব জলীয় পদার্থ ভেতরের
স্তরের মধ্যে টেনে নেয় নিমেষে। তাই আপনার
গায়ের ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে আর কোন
অস্বস্তিও বোধ হয় না।
একমাত্র "কেয়ারফ্রী" এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা
সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরে সমানভাবে
ছড়িয়ে দেয়। তাই ন্যাপকিনের এক জায়গায় সব
জমে থাকে না। নীল রঙের একটি রক্ষা কবচ এর পুরো
তলা আর দু'পাশ ঘিরে থাকে। তাই আপনার
কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।
"কেয়ারফ্রী" ফেলে দিতেও কোন অসুবিধা নেই—
বাথরুমে ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেই সব অদৃশ্য।
বাইরে কাজে বেরুলে কিম্বা বেড়াতে গেলে আর
কোন চিন্তার কারণ নেই আপনার।
তাছাড়া "কেয়ারফ্রী" আপনার শরীরের গঠন
অনুযায়ী ঠিক ক'রে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারবেন।
এই সঙ্গে প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি
"কেয়ারফ্রী" বেল্ট।
এখন আপনি মাসে গোটা
৩০ দিনই নিশ্চিন্ত
এখন
নতুন ধরনের
ছোট পরিবারের
মধ্যে
তাছাড়া, বেসমস্ত মহিলাদের পছন্দ
বিশেষ ধরনের তাঁদের জন্য নতুন লাক্সারী
অ্যাডজাস্টেবল বেল্টও আলাদাভাবে পাওয়া
যায়। কেয়ার ফ্রী স্যানিটারী ন্যাপকিন
যে দোকানে বিক্রী হয় সেখানে এটিও পাবেন।
Carefree
জনসন অ্যাণ্ড জনসন একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে
* Trade Mark © Johnson & Johnson India Ltd.

কেয়ো-কার্পিন
ঠিক যে তেলটি
আমি চাই।

একমাথা সুস্থ চুলের সুখানুভূতি... আপনার প্রেয়সীর আকাঙ্ক্ষা!
আপনার দরকার একমাথা সুস্থ চুল। সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। প্রাণোচ্ছল! যে চুল থাকবে—আপনি যেমনটি চান ঠিক সুবিন্যস্ত! আপনার দরকার প্রোটিন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম। এ হল একমাত্র কেশ প্রসাধন যা যত্ন নেয়: চুলের সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্য, দুয়েরই। ব্রিলক্রীম চটচটে না তেলা নয়। আপনার চুলকে সুন্দর, সুবিন্যস্ত রাখে। আপনার চুলে বিলি কাটার জন্যে ওঁর আঙুলগুলো অস্থির হয়! আপনার চুলের গোড়া শক্ত করতে আর চুলে পুষ্টি যোগাতে ব্রিলক্রীমে প্রোটিন আছে। চুল সুস্থ হলে তবেই তো তা সুন্দর করে তোলা সম্ভব! ফিটফাট থাকুন। ব্যবহার করুন প্রোটিন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম।
PROTEIN-ENRICHED
BRYLCREEM
PROTEIN-ENRICHED
BRYLCREEM
প্রোটিন-সমৃদ্ধ ব্রিলক্রীম
সুন্দর চুলের স্বাস্থ্যকর প্রসাধন।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

PRICES SLASHED
Prestige
দাম
অনেক কমানো হ'ল!
আসুন সকলে উজ্জ্বল
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলি
Prestige
প্রেস্টিজ, নিঃসন্দেহে—
ভারতের সর্বাধিক প্রিয় সর্বাধিক
বিক্রীত প্রেশার কুকার।
প্রেস্টিজ—সর্বাধিক সাশ্রয়
করে ও সর্বাধিক নিরাপত্তা
দেয় এবং উত্তম বিক্রয়-পরবর্তী
সেবা দান করে।
ইহাতে সর্বদা ISI চিহ্ন দেওয়া
থাকে—যা আপনাকে উৎকর্ষতার
গ্যারান্টী দেয়।
প্রেস্টিজই সাশ্রয়ের
প্রতীক
Prestige
PREETT
উন্নততর দেশ গড়ে
তুলতে সাহায্য করুন।
টিটি. (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০১৬
SAA/TTP/2/22 BN

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মহিম রুদ্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি: 'তোমারো অসীমে' (১৭"×২৭" তৈলচিত্র, ঋতুপর্ণা সরকারের সৌজন্যে)। দুটি প্রাথমিক বর্ণ—হলুদ আর লাল নিয়েছেন। আর রয়েছে লালের সম্পূরক বর্ণ সবুজ। একটি বৃত্ত, দুটি বৃত্তাংশ ও ত্রিভুজের ওপর ভারসাম্য বজায় রেখে ছেড়ে দিয়েছেন। বৃত্তের ভেতর সাদার ওপর কমল। আর বাদামীর ছিট রঙের অন্তবসুর মঙ্গলচিহ্নের মতো দেখতে একটি মানুষ। যেন নিখিল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ কতো নগণ্য ও নশ্বর তাই দেখাতে চেয়েছেন শিল্পী।

৪৩ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা
শনিবার ১২ আষাঢ় ১৩৮৩

রূপরম্য নগরায়তন

পরিবেশের শুদ্ধতার ও পরিচ্ছন্নতার মান উন্নত করবার জন্য, এবং পরিবেশের স্বাভাবিক প্রসন্নতাকে নিদারুণ বিকারের প্রকোপ থেকে রক্ষা করবার জন্য ইকোলজির আধুনিক পন্ডিতেরা নানারকমের গবেষিত তত্ত্বের ও তথ্যের সাহায্য নিয়ে সতর্কতা এবং ব্যবস্থার সুপারিশ করছেন। এটা প্রাকৃতিক পরিবেশের তথা জল ও বাতাস এবং ভূমি ও অরণ্যের 'নৈসর্গিক সুস্থতা' বিহিত করবার নানাবিধ উদ্যমের প্রস্তাব। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া আরও একটি পরিবেশ আছে, যেটা ইকোলজির প্রত্যক্ষ বিষয় না হলেও এবং মানুষের জৈবিক স্থিতি স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ পরিণামের সূত্রে সংযুক্ত না হলেও মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে থাকে। মানুষের উপলব্ধি অনুভব বুদ্ধি ও বোধির সৃষ্টি যে সাহিত্য ও রম্যকলা, তারা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি মহান্ পারিবেশিক সত্য। এক্ষেত্রেও মানবীয় আদর্শের দাবি এই যে, জনজীবনের পরিবেশ সাংস্কৃতিক আবেদনের নানা রূপময় সৌকর্যে চিহ্নিত হবে। না হলে জনজীবনের সাংস্কৃতিক আচার-বিচারের রম্যতা ও সৌষ্ঠব বিড়ম্বিত হবে। জনপদের 'ব্যক্তিত্ব' স্থূলতায় অভিভূত হবে, এবং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব শ্রীহীন হবে। এধরনের একটি অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার ভয় আছে বলে অতি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত মানবীয় বসতির রূপ ও পরিবেশ সুন্দর করে রাখবার নীতি ও বিধি নগর-পরিকল্পনার এবং নগরায়তনের স্থাপত্যের শাস্ত্রে উল্লেখ লাভ করে এসেছে।

অগাস্টাস সীজারের সম্পর্কে ইতিহাসের একটি প্রশস্তির উক্তি এই যে, ইষ্টকের রোমকে তিনি শ্বেতপাথরের রোমে পরিণত করেছিলেন। এটা জনপদের সাংস্কৃতিক পরিবেশের আত্যন্তিক পরিবর্তনের ঘটনা বলে অভিহিত হতে পারে। এবং এই সিদ্ধান্তও করা যেতে পারে যে, ইঁটের তৈরী রোমের অধিবাসীদের তুলনায় শ্বেতপাথরের রোমের অধিবাসী নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব চরিত্র ও অভিরুচির গুণগত মান নিশ্চয়ই পরিবর্তিত করেছিল। এটা বস্তুত স্থাপত্যের রূপ ও রম্যতার সামাজিক ক্রিয়াফল। যেমন স্থাপত্য, তেমনই ভাস্কর্য ও নগরের পারিবেশিক রূপের উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলতে পারে। নগরের পথচারী মানুষ যদি পথে যেতে যেতে সহসা দেখতে পায় যে, ধ্যানী শিবের একটি মূর্তি পথিপার্শ্বের বেদীর উপর বসে রয়েছে, তবে সেই আকস্মিক দর্শন পথিকের মনের ভাব ও অনুভবের উপর একটি সুখকর বিস্ময়ের আবেশ সঞ্চারিত করবেই করবে। মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দিত করে বলতে পারা যায়, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সহরের পরিবেশ ভাস্কর্যের ও রূপশিল্পের রম্যতা দিয়ে সাজিয়ে রাখবার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নত করবার একটি প্রত্যক্ষ কার্যবিধির প্রস্তাব। স্বর্ণময়ী লংকা রামচন্দ্রকে বিমুগ্ধ করতে পারেনি। লংকার সেই স্বর্ণমন্ডিত রূপের মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ যতটা ছিল, সাংস্কৃতিক রম্যতার প্রকাশ ততটা ছিল না। তাই তাঁর উক্তি : লক্ষ্মণ, এই স্বর্ণময়ী লংকাপুরীকে আমার ভাল লাগছে না। আমার জননী জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী।

বলা বাহুল্য রাজ্য সরকার এবং তাঁদের পক্ষে কাজ করবার যে প্রতিষ্ঠান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই প্রস্তাব রূপায়িত করবার দায়িত্ব নেবেন, তাঁদের পক্ষে বিশেষ সাবধান হবার প্রয়োজন আছে যে, ভাস্কর্যের ও রূপকলার নামে যেন অন্য কোন আগ্রহের আতিশয্য রূপায়িত হবার সুযোগ না পায়। জাতি জনতা ও জনপদের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের প্রকাশ ও আবেদন থাকবে, প্রধানত এমনতর ভাস্কর্যেরই সমাবেশ দরকার। ভাবের স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ যে ভাস্কর্যে লীলায়িত হবে, সেই ভাস্কর্য বেশী করে চাই। টেকনিকের ও টেকনিক্যাল কীর্তির প্রচণ্ড অভিনবত্ব এবং 'দুরূহ' রূপ নিয়ে কোন ভাস্কর্য সাধারণ জনজীবনের সাংস্কৃতিক প্রসন্নতা সার্থক করে তুলতে পারে না। শুধু মনীষী এবং কীর্তিমান ব্যক্তিদের মূর্তি নয়, সাংস্কৃতিক জীবনের বহু বিচিত্র রূপের ও ঐতিহ্যের পরিচয় যদি ভাস্কর্যে রূপায়িত হয়ে সহরের স্থানে-স্থানে চমৎকার সমাবেশ সম্ভব করে তুলতে পারে, তবে সহরের পারিবেশিক রূপ সুন্দরতর বলে বোধ তো হবেই, নাগরিক ব্যক্তি সচেতন অথবা অচেতনভাবে তাঁর জীবনের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক পিপাসার পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারবে।

লণ্ডনের মাদাম তুসোদ-এর প্রদর্শনী ভবনে মোমের যে-সব মূর্তির সমাবেশ আছে, তার মধ্যে ঐতিহাসিক রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের নানা ঘটনার মূর্তিও আছে। রূপকথার মূর্তিও আছে। যথা অ্যালিস ইন ওয়া-ণ্ডারল্যাণ্ড এবং গালিভারের ভ্রমণ কাহিনীর কয়েকটি উপভোগ্য অধ্যায়ের রূপ ভাস্কর্যে নিবেদিত করা হয়েছে। আমাদের দেশের কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীদের পক্ষে এধরনের সাংস্কৃতিক ঘটনা মাটির উপাদান দিয়ে বিমূর্ত ও প্রতিমূর্ত করবার প্রতিভা তুসোদীর মোমের মূর্তি নির্মাণ করবার প্রতিভার তুলনায় মোটেই কম যায় না। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার গ্যালারির জন্য ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী ও উপজাতি মানুষের যে নমুনা-মূর্তি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা নির্মাণ করে দিয়েছেন, সেগুলি নৃতাত্ত্বিক শিক্ষার নিখুঁত উপাদান, এবং বাস্তব রূপের নিখুঁত প্রতিরূপ। পশ্চিমবঙ্গের সহরে এধরনের মৃৎ-ভাস্কর্যের প্রশস্ত স্থানাধিকার সম্ভব কিনা, সেটা বিশেষজ্ঞরা বুঝে দেখতে পারেন। পাথর ব্রোঞ্জ ও মাটি, ভাস্কর্যের উপাদান হিসাবে এরা তিন ভিন্ন ব্যঞ্জনার সম্পদ। শিল্পীরা জানেন, সব আবেদন ও সব আবেগ এবং সব বিস্ময় শুধু পাথরে, শুধু ব্রোঞ্জে এবং শুধু মৃন্ময়তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রূপায়িত করা যায় না। সুতরাং, এক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনার কমিটি যদি কৃতী শিল্পীদের সমাবেশ হয়, তবু ভয় থেকে যায় যে, নিছক পেশাদারী দক্ষতার প্রাধান্যে নব-নির্মিত ভাস্কর্যের রূপে ও প্রকারে নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, ভারতীয় অভিরুচির ঐতিহ্য যদি লক্ষ্য করা হয় তবে স্বীকার করতে হবে যে, শুধু ভাস্কর্য নয়, চিত্রকলাও সহরের পৌর রূপের সৌষ্ঠব উন্নত করবার প্রয়োজনে সার্থক প্রকারে প্রযুক্ত হতে পারে। জন-সমাগমের বিশেষ ও বৃহৎ স্থানে, যথা বাপী কূপ তড়াগের নিকটে এবং নগরের তোরণে ও প্রাচীরে বর্ণাভিরাম চিত্র-শোভা সমাবিষ্ট করে রাখা একদিন প্রাচীন ভারতেরই জনপদরুচির একটি আবশ্যিক কর্তব্য ছিল।

বৈদেশিকী

না ঘরকা না ঘাটকা

উগান্ডার হাওয়া কী মালাউইর গায়ে লাগলো এদ্দিন পরে? উগান্ডার রাষ্ট্রপতি ইদি আমিনের দেখাদেখি মালাউইর রাষ্ট্রপতি ডঃ হেস্টিংস কামুজু বান্ডাও কী চাইছেন দেশটায় খাঁটি আফ্রিকান ছাড়া আর কেউ থাকবে না? এশিয়ার নানা দেশ থেকে যারা এসে উগান্ডায় ঘর বেঁধেছিল তাদের বিদেয় করেছেন চিরদিনের মতো ইদি আমিন। সংখ্যায় যারা কাটিয়ে তাদের অনেকেরই পাড়ি দিতে হয়েছে বিদেশে। অর্থশূন্য পিছুটান ছিল। উগান্ডায় জাঁকিয়ে বসেও তাঁরা তাদের বিলিতী পাসপোর্ট বাতিল হতে দেয়নি। উগান্ডা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। সেই সুবাদে উগান্ডার বাসিন্দারা পেয়েছিল বিলিতী পাসপোর্ট দেশ কিংবা জাত তাদের যাই হোক না কেন। দেশটার মধ্যে যারা আফ্রিকানই লোক তারা স্বাধীনতার চিহ্ন মুছে ফেলে দিয়েছিল বিলিতী পাসপোর্ট। এশিয়ানরাও কেউ কেউ তাই করেছিল কিন্তু সকলে নয়। ব্রিটিশ পাসপোর্টধারীদের বিদেশী বলে বের করে দিতে অসুবিধে হয়নি রাষ্ট্রপতি আমিনের। তবে সেটা নেহাতই ছুতো। এশিয়ার দেশ থেকে আসা উগান্ডা পাসপোর্টধারীদেরও তিনি রেহাই দেননি।

ডঃ বান্ডা ঠিক যে কী চান তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে তাঁর মতলব যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট যে মালাউইতেও এশিয়ার দেশ থেকে আসা লোকেদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এদের বেশির ভাগই এসেছে ভারত উপমহাদেশ থেকে। এদের হওয়া উচিত হয় ভারতীয় নয় পাকিস্তানী নয় বাংলাদেশী। ভারতবর্ষ যখন ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্য তখন বিস্তর লোককে তারা নিয়ে গিয়েছিল পূর্ব আফ্রিকায় কুলিকামিনগিরি করতে। তাদের বংশধররা অধিকাংশ এখন আর মুখ্যু কুলি নেই। তারা লেখাপড়া শিখেছে, ভালো ভালো চাকরি করছে, ব্যবসা ফেঁদেছে টাকা জমিয়ে, কারখানা বানিয়েছে, চাষবাসও চালাচ্ছে। তাদের বাড়বাড়ন্ত দেখে স্বদেশ থেকে আত্মীয়স্বজনও অনেকে এসেছে বরাত ফেরাতে। বেশ কিছু গোয়ানিজও ওদের মধ্যে আছে। গোল বেধেছে ওই গোয়ানিজদের নিয়েই। এপ্রিল মাসে মালাউই সরকার যে ২৮০ জন ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী এশিয়ার লোককে দেশ ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিয়েছেন তারা সবাই জাতে গোয়ানিজ। পরে কোপ তাদের ওপর পড়লেও বাকীরা যে রেহাই পাবে এ ভরসা এশিয়া থেকে আসা মালাউই প্রবাসীদের নেই। তারা এখন দিন গুনছে ভয়ে ভয়ে কখন কার পালা আসে। কম করে ৬৮০০ এশিয়ার লোকের বাস মালাউইতে।

এদের অধিকাংশই নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। সত্যি কথা বলতে কী কোনো দেশের মাটিতেই এরা শেকড় গাড়তে পারেনি। দুনিয়াতে এরা সার চিনেছে টাকা। এরা তাই না ঘরকা না ঘাটকা। যাদের অধিকাংশ কুলিকামিন বানিয়ে ইংরেজ মনিবরা নিয়ে এসেছিল তাদের কথা আলাদা। তারা স্বেচ্ছায় আসেনি, দেশেও তারা ছিল অচ্ছুৎ। তাদের বংশধররা ইচ্ছে করলে ঘরে ফিরতে পারতো। তা তারা করেনি দেশঘরের ওপর তাদের কোনো টান ছিল না বলে। যারা পরে এসেছে টাকা কামিয়েছে দুহাতে। ভেবেছে চিরকাল এইভাবেই চলবে, মালাউইকে ভালো তো বাসেইনি বরং ঘেন্না না করলেও উপেক্ষা করেছে পেছিয়ে পড়া গরিব দেশ ভেবে। আফ্রিকাতে তাদের কদর ছিল। তাদের মতো খাটিয়ে কিংবা ব্যবসাবুদ্ধি খাস আফ্রিকার লোকেদের মধ্যে ছিল না বললেই হয়। এশিয়ার লোকেদের আফ্রিকার লোকেরা খাতির করেছে বাইরে যদিও মনে মনে করেছে হিংসে। দু' জাতের লোকেরা একসঙ্গে বসবাস করলেও মনের দিকে কাছাকাছি আসতে পারেনি।

দুর্গ পাকা করেছে এশিয়া থেকে আসা লোকেদের পাসপোর্ট। বাপ পিতেমোর দেশের পাসপোর্ট তারা বিশেষ কেউ নেয়নি — কদাচিৎ নিয়েছে আফ্রিকার যে দেশ ঠাঁই দিয়েছে সেখানকার পাসপোর্ট। রক্ষাকবচ হিসেবে নিয়েছে বিলিতী পাসপোর্ট। যে পাসপোর্ট যার আছে তাকে আশ্রয় দিতে ব্রিটিশ সরকার ন্যায্যত ধর্মত তো বটেই আইনতও বাধ্য। ঠেকায় পড়লে এই পাসপোর্টের জোরেই তরে যাবে এই ভরসাতেই তারা বেছে নিয়েছে বিলিতী পাসপোর্ট। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল — একে একে যখন স্বাধীন হলো ব্রিটেনের উপনিবেশগুলো — তখন সব উপনিবেশের বাসিন্দাদেরই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বিলিতী পাসপোর্ট নেবার। যার ইচ্ছে হবে সে খুশীমতো আফ্রিকা কী এশিয়ার তার স্বদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক বনে যাবে, সেখানকার পাসপোর্ট পাবে, আবার যার ইচ্ছে হবে সে সাবেক বিলিতী পাসপোর্ট রেখে দেবে, ব্রিটিশ নাগরিক অধিকার সবই সে পুরোপুরি পাবে। আফ্রিকা প্রবাসী এশিয়া ছেড়ে আসা লোকেরা ইচ্ছে করেই ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়েছে।

বিস্তর গোয়ার লোকের বাস মালাউইতে। ৪৫০ বছর গোয়া ছিল পর্তুগীজ উপনিবেশ। সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিত না — বাইরের লোকেও তাদের পর্তুগীজ তালুকের প্রজা বলেই চিনত। ১৯৬১ সনে গোয়া যখন স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলে গেল তখন গোয়ার বাসিন্দারাও বনে গেল ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু যারা ছিল প্রবাসী তারা সবাই বাস্তবকে মেনে নিলে না। পরে আফ্রিকায় তারা পরবাসীই রয়ে গেল। মালাউইর নাগরিকত্ব না নিয়ে নিলে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব রেখে, তারই চিহ্ন হিসেবে বিলিতী পাসপোর্ট। গোড়ায় তাতে তাদের অসুবিধে কিছু হয়নি বরঞ্চ সুবিধেই হয়েছে। ছেলেমেয়েদের তারা এশিয়ার নাগরিক করে গড়ে তোলেনি। আফ্রিকার নাগরিক করে তো নয়ই। তাদের বানিয়েছে খাস সাহেব। বিলেতে তারা স্কুলে পড়েছে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছে। কিন্তু বিলিতী সমাজে তাদের ঠাঁই হয়নি। তাদের কালো রং তো তারা ঢাকতে পারেনি। সাদা সাহেবমেমরা তাদের মনে করে ময়ূরের পেখম পরা দাঁড়কাক। আফ্রিকার লোকেদের মনের ভাবও তাই।

এদ্দিন তবু এশিয়ানদের নিয়ে দিব্যি ঘর করছিলো আফ্রিকানরা। হঠাৎ কী হলো যে তাদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন মালাউই সরকার? শোনা যাচ্ছে কারণটা তুচ্ছ। ১২ এপ্রিল যখন রাষ্ট্রপতি বান্ডা ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন একটা বিয়ের আসরে সকলের সামনে তাচ্ছিল্য করে একজন গোয়ানিজ নাকি বেতার বন্ধ করে দেয়। ওসব দেশে দেওয়ালেরও কান আছে। খবরটা বান্ডার কানে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। তিনি আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা চটে আগুন। সে আগুনে পুড়লো প্রবাসী এশিয়া থেকে আসা লোকেদের কপাল। চাটিবাটি তুলতে হলো গোয়ানিজদের। ভারতেও তাদের ঠাঁই নেই, পর্তুগালেও নয়। তারা পাড়ি দিচ্ছে ব্রিটেনে। সেখানেও তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে না সেখানকার লোকেরা। তবে সরকার তাঁদের কথা রেখেছেন, বিলেতে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন মালাউই থেকে চলে আসা গোয়ানিজদের। বান্ডাকে তাঁরা হুমকি দিয়েছেন এই বলে যে সব এশিয়া লোকেদের তিনি যদি তাড়ান তাহলে যে ৯০ লক্ষ পাউন্ড ব্রিটিশ সাহায্য তাঁর পাবার কথা তা তিনি এক পয়সাও পাবেন না। কিন্তু ভবী কি তাতে ভুলবে?

দেবরাজ

এই সপ্তাহ

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েট ইউনিয়নে পাঁচদিন সফরের পর দেশে ফিরেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে ইন্দিরা গান্ধীর এটি দ্বাদশ সফর। অন্য কোন কমিউনিসট দেশের প্রধানমন্ত্রী এতবার সোভিয়েট ইউনিয়নে গেছেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য এই বারো বারই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যাননি; নেহরু-কন্যা হিসাবে গেছেন তিনবার, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী হিসাবে একবার, আর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আটবার।

ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবার সোভিয়েট ইউনিয়নে যান ১৯৫৩ সালে। স্তালিনের মৃত্যুর পর তাঁর নির্বাচিত উত্তরাধিকারী ম্যালেনকভ যখন প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে সোভিয়েট ইউনিয়নে আমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণের রাজনৈতিক গুরুত্ব যে অনেক তা ভারত সরকার তখনই বুঝেছিলেন। স্তালিনের সঙ্গে শেষ বিদেশী প্রতিনিধি যাঁর সাক্ষাৎ হয় তিনি আমাদের কৃষ্ণ মেনন। মেননের কাছে এবং তার আগে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কাছে স্তালিন যা বলেছিলেন তাতে আভাস পাওয়া গিয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা ও নেহরু সরকার সম্বন্ধে স্তালিন মত বদলাচ্ছেন। ম্যালেনকভের নিমন্ত্রণ থেকে বোঝা গিয়েছিল স্তালিনের মৃত্যুর পরও সেই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত আছে। ইন্দিরা গান্ধীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল নেহরুকে নিমন্ত্রণের অগ্রদূত হিসাবে। নেহরুর সেই সফর হয় ১৯৫৫ সালে; তখন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ততদিনে অবশ্য ম্যালেনকভ প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত হয়েছেন; সোভিয়েট ইউনিয়নে বুলগানিন ও ক্রুশ্চফের যৌথ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেই হিসাবে বলা যেতে পারে, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সম্পর্কের সূচনা ইন্দিরা গান্ধীর সোভিয়েট সফর থেকে। তার পর তাঁর প্রতিটি সফরে সেই সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছে। ১৯৭৩ সালে সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভের ভারত সফরের পর এই অঞ্চলের একটি বড় ঘটনা, ভারত সরকারের চীনে অ্যামবাসাডর পাঠানোর সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনা হবে, এ ধরনের জল্পনাও বার বার সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। মস্কোয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে, কেননা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনার সময় চীনের মত দেশকে বাদ দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, চীনের সঙ্গে অ্যামবাসাডর বিনিময়ের সিদ্ধান্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বের অন্তরায় হবে না। প্রধানমন্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, সোভিয়েট নেতারা এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন কি না, তখন তিনি উত্তর দেন, তাঁর ধারণা সোভিয়েট নেতারা ভারতীয় পরিস্থিতির কারণ বেশ বোঝেন। বলা বাহুল্য, চীন সম্বন্ধে আলোচনা কেবল ভারত-চীন সম্পর্কেই আবদ্ধ থাকেনি; চীনের সাম্প্রতিক ঘটনা, নেতৃত্ব বদল ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব, এসব বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এবার মস্কোয় প্রধানমন্ত্রীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ক্রেমলিনে। এটি একটি বিশেষ সম্মান। সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁকে আরও একটি বিরল সম্মান দেখিয়েছে। সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এই উপাধি দেওয়ার সময় অ্যাকাডেমির সহ-সভাপতি কোতেলনিকভ বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সুদৃঢ় করবার জন্য ও জাতীয় অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী ও সহযোগিতার উন্নয়নের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর প্রচেষ্টাকে সোভিয়েট জনসাধারণ খুব মূল্যবান মনে করেন।

ইন্দিরা গান্ধীর সফরের শেষে মস্কো ও নয়াদিল্লি থেকে একটি যুক্ত ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, ভারত উপমহাদেশের দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের পূর্ণ সমর্থন আছে। এবং দুটি দেশই এই এলাকার পরিস্থিতিতে জটিলতা আমদানির জন্য বহিঃশক্তির যে কোন প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী। এই উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য ও এই এলাকার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সম্প্রতি যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলিকে এই ঘোষণায় স্বাগত জানানো হয়েছে; বলা হয়েছে, সোভিয়েট কমিউনিসট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্রেজনেভ এ বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধীর চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন। গত মাসে ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যে চুক্তি হয়েছে তার উল্লেখ করে যুক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছে, এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বোঝাবুঝির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে।

ঘোষণায় দুই দেশের মধ্যে সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের যৌথ ঘোষণায় দু দেশের বাণিজ্য ১৫০ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশ বাড়ানো স্থির হয়েছিল; এবার বলা হয়েছে ওই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সহযোগিতা নতুন ক্ষেত্রে ও নতুন ধরনে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয় ১১ই জুন মস্কোতে; স্বাক্ষর করেছেন ব্রেজনেভ ও ইন্দিরা গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের তিন নেতা, ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও রাষ্ট্রপতি পদগর্নিকে ভারত ভ্রমণে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁরা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আকাশপথ পুনর্বহাল ও বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য আলোচনা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের অসামরিক বিমান দপ্তরের যুগ্ম সচিব মহসিন কামালের নেতৃত্বে আট-জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এই উপলক্ষে ইসলামাবাদ থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন।

পশ্চিম বাংলার সিনেমা হলগুলিতে বছরের ২৬ সপ্তাহ এ-রাজ্যে তোলা ফিলম দেখানো আবশ্যিক করবার জন্য রাজ্য সরকার একটি অর্ডিন্যান্স অনুমোদন করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছেন, এখানে আরও সিনেমা হলের দরকার। পশ্চিম বাংলায় সিনেমা হলের সংখ্যা ৪০০-র কিছু বেশী, অন্য সব রাজ্যে এক হাজারের উপর। অর্ডিন্যান্সটি রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হচ্ছে।

ভারতের নানা স্থান থেকে এই সপ্তাহে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর পাওয়া গেছে। গুজরাটের উপকূলবর্তী এলাকায় এক ভয়াবহ সাইক্লোনে ৫৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এই ঝড়ের জন্য বোম্বাইয়ে সমুদ্র থেকে তেল তোলার কাজ কয়েকদিন বন্ধ ছিল। আসাম, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ থেকে বন্যার খবর এসেছে। আসামে এক লক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছেন। কাছাড়ে বন্যাত্রাণে সেনা-বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে; তাঁরা জল-বন্দী ২০০ পরিবারকে ইতিমধ্যে উদ্ধার করেছেন। ত্রিপুরায় ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার, ফসল নষ্ট হয়েছে তিরিশ হাজার একর জমির।

সোস্যালিস্ট নেতা জর্জ ফারনানডেজকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

১৪।৬।৭৬

শংকর ঘোষ

যেন আশ্বিনের মেঘ

সুধেন্দু মল্লিক

যেন আশ্বিনের মেঘ ওই যায় জননী আমার
নিবিড় মমতা তবু উদাসীন দেখেও না ফিরে;
মা আমি ব্যাকুল ওই পদশব্দে ছিঁড়েছি সংসার
নে আমাকে সঙ্গে তোর আজ জন্ম জন্মান্তের তীরে।

কতোদিন পরে দেখা মা কি তোর মনেও পড়ে না!
রাতের ফুলের মতো দুঃখ ঝরে যায় পায়ে পথে—
শত পরিত্যক্ত হই, ও চোখ কি কখনো অচেনা
মনে হয়? আমি যে জন্মেছি তার ভালোবাসা হতে।
মা কি ভুলে যায় সব, মা কি ভোলে রক্তের বেদনা
এ হাতেও অবিশ্বাস, ভুলে গেছে সন্তানের মুখ!
বিস্মৃতির সাপ এসে গ্রাস করে গিয়েছে চেতনা
এখন কেবল কান্না রৌদ্রহীন আবিষ্ট অসুখ।
আমি তো স্বপ্নের মধ্যে খেলা করি কুড়োই উপল
মা দ্যাখো মা দ্যাখো বলে মাথা রেখে অপেক্ষায় হাসি
মা তোর অভয় কোলে, দেখি দুটি নয়নের জল,
কি হয়েছে মাগো বলে নতমুখ উঠে চলে আসি।

সে শুধু ফেরার জন্যে সে শুধু আহ্বান পাবো বলে,
মা আমাকে কাছে ডাকবে—আকাঙ্ক্ষার মৌন দীপশিখা;
এবার মায়ের জন্যে সবকিছু, পুজো শুধু ক্রন্দন কল্লোলে
মা মা ডাক নিংড়ে নেবে অস্তিত্বের আকাশ মৃত্তিকা।

মা তবু বোঝে না ব্যথা। নিষ্কলুষ মেঘ চরাচরে
ভেসে ভেসে চলে যায় যেন স্রোতোময় প্রতিধ্বনি
ম্লান ছায়া পড়ে থাকে, থাকে দেহ ঃ বিষণ্ণ অন্তরে
লুপ্তস্মৃতি মাকে ডাকি আত্মলীন—জননী! জননী!

ধূপ জ্বলে

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ধূপ জ্বলে বন্ধ ঘরে, শাদা ধোঁয়া সোজা উঠে ভেঙে ভেঙে যায়
সুরভি ছড়ায় যত্নে, যা লালন করেছিল গোলাপ চামেলি চন্দনের
সমস্ত ছড়িয়ে দেয় ঘরময়, গোপন আর্তির ঢেউ ক্রমশ ছড়ায়
যেন সে প্রার্থনা করে, বলে, কেউ এসো, ঘ্রাণ নাও, মুখে বলো
বাঃ কি সুন্দর!

প্রথম চুম্বন দাও প্রেমিকের ওষ্ঠে, দেবতা প্রসন্ন হোক
ছুঁড়ে দিক পারিজাত তারিফ জানিয়ে ; ধূপ এই বলে যেন
পোড়ায় আগ্রহ তার,
যদি জানে কিশোরীর ক্ষীর-হাত মুছে দেবে ছাই
ফুঁ দিয়ে সরাবে কিছু বিহ্বল আবেশে
ক্ষীণ পুষ্পস্মৃতি, নির্মাণের কষ্ট ভুলে
ধূপ পারে মিলনের ভূমিকা সাজাতে, ধূপ জানে...সব জানে...

দুটো ধূপ যতক্ষণ জ্বলে, আমি কেবল তোমার কথা ভাবি
ধূপ মানে প্রতীক্ষার, ধূপ মানে দহনের আয়ু

জীবন

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

একদিন নিশ্চয়ই মনে পড়বে আমাদের
একদিন আমাদের কথা ভেবে
একশো বছর
ভাতের থালার কাছে হাঁ-করে বসে থাকবে
ছোট্ট ছোট্ট মানুষ,
তাদের ছোট্ট ছোট্ট দুঃখ, ছোট্ট ছোট্ট লাফ
ছোট্ট ছোট্ট লেখা চিঠি থ' হয়ে পড়বে
আরো একশো বছর পরের
আরো ছোট্ট মানুষ, যারা
ভাতের থালার ভেতর ভাত হয়ে
অপেক্ষা করবে বিশাল একটা হাঁ-এর জন্য—
ফিরে আসবো আবার, সবসময় হাঁ-করে থাকা
আজকের আমরা,
কালো, মস্তাপচা এই পৃথিবী
তখনো সেই এক মহাকাশের ভেতর
শুধু আরো অনেক পৃথিবীর ভেতর জেগে উঠেছে প্রাণ
যারা আমাদেরই মত নোংরা, ঠান্ডা, যারা স্বপ্ন দেখে
ব্যাঙের জীবন
লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে হাজার হাজার মহাকাশের দিকে।

অলক্ষ্যে

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলমারি ভর্তি ধুলো, দাগ দেওয়া বই
হলুদ ফাইল কপি, সমালোচকের চো
কবিতার ছিন্ন-ভিন্ন শ
এই ঘরে মাঝে মাঝে আমি
প্রদর্শক হয়ে আসি ছবি তুলবো ক

কতদিন কবিতা পড়ি না
কতদিন কবিতা লিখি না
ভ্রূ কুঁচকে চশমা খুলে কতদিন শব্দ প্রতীক্ষায়
আমি আর একলা থাকি

তবুও জ্যোৎস্না থাকে, পোড়ো বাড়ি জুড়ে থাকে ঝিঁঝিঁর ম
নদীর শিয়রে চাঁদ ঝুঁকে পড়ে
ছিন্ন মেঘ শিল্প হয় আকাশ ই
ভাঙে পাড়, ভাঙে নদী, প্রথানুগ শব্দ ভেঙে পড়ে
গভীর অরণ্য থেকে উড়ে আসা হাওয়ার মতন এলোমেলো
আমার অল

আমারই অলক্ষ্যে বুঝি বাড়ে
কবিতার স্বাস্থ্য দেবদারু

৪
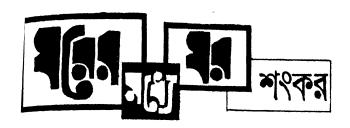
গণপতিবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, টাইপের পর চেকিং হয়েছে ?"

মেলানো হয়নি শুনে গণপতিবাবু মিষ্টি ভাষায় বললেন, "খুব ব্যস্ত আছেন নাকি ভাই ? না-হলে কপিটা ধরতেন, হুস করে কয়েকটা পাতা মিলিয়ে নিতাম। কখন যে কী বাদ পড়ে যায় ঠিক নেই।"

মেলানো শুরু হলো। কোনো একটা সম্পত্তি বেচা-কেনার খসড়া দলিল মনে হচ্ছে। তবে কোন্ সম্পত্তি, কে কিনছে, কে বেচছে তা বোঝবার উপায় নেই। বিশেষ বিশেষ জায়গায় নামধামের বদলে কেবল ড্যাস-ড্যাস, ডট-ডট।

দু পাতা মিলিয়ে গল্পবাজ গণপতিবাবু হাতে-লেখা কপিটা টেবিলে ফেলে রাখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "খুব তো রেসের ঘোড়ার মতো টাইপিস্ট আপনারা—বলুন তো, টাইপ-করার সময় কোন্ শব্দটা বাদ পড়ে যাওয়া সবচেয়ে ডেঞ্জারাস ?"

উত্তরটা দিতে আমার এক-মিনিটও দেরি হলো না। বললাম, "ইংরিজী শব্দটা হলো 'নট্'—যার ফলে দলিলের মানে পাল্টে 'না' হয়ে যেতে পারে 'হ্যাঁ' এবং 'হ্যাঁ' হয়ে যেতে পারে 'না'।"

চটপট জবাব পেয়ে গণপতি সামন্ত অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রশংসা জানিয়ে বললেন, "আমার পরীক্ষায় একশর মধ্যে একশ দশ পেয়ে গেলেন! কিন্তু উত্তরটা এত তাড়াতাড়ি দিলেন কী করে ?"

এবার আমাকে সত্য কথা স্বীকার করতে হলো। উত্তরটা আমাকে মাথা-খাটিয়ে বার করতে হয়নি। আমার বাবা জেলা কোর্টে টাইপিস্টকে সাবধান করে দিয়ে ওই 'নট'-এর কথা বলতেন—একবার নাকি কোন্ মামলায় মূল্যবান ওই তিনটে অক্ষর বাদ পড়ায় খুব ভুগতে হয়েছিল।

গণপতি সামন্ত মধুর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। "কী বলছেন মশাই! আমার একটা মামলায় এগজ্যাক্টলি এই বিপদ ঘটেছিল। আপনার বাবার ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল ?"

"অ্যাঁ! হাওড়া কোর্টে ?" গণপতিবাবু আমার উত্তর শুনে আরও কৌতূহলী হচ্ছেন। "আমার ব্যাপারটাও তো হাওড়ায় ঘটেছিল। আপনার বাবার নাম কী ?"

আমার বাবার নাম শুনে গণপতি সামন্ত তিড়িং করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। "তুমি হরি উকিলের ছেলে!" এবার তিনি আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর শান্তভাবে নিজের চেয়ার পুনর্দখল করে গণপতি বললেন, "তোমাকে বহুবার দেখেছি আমি—তখন তুমি ছোট ছিলে। হাফপ্যান্ট পরে হাওড়া জেলা ইস্কুলে পড়তে আসতে হরিপদবাবুর সঙ্গে! তোমাদের মুহুরীর নাম ছিল যোগেন মান্না।"

অজানা পরিবেশে একজন পরিচিত-জনকে আবিষ্কারের সম্ভাবনায় আমি নিজেও মধুর উত্তেজনা অনুভব করলাম।

গণপতি সামন্ত তাঁর সরু স্টীল ফ্রেমের চশমার মধ্য দিয়ে আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে বললেন, "আমাকে চিনতে পারছো না তুমি ?"

সত্যিই চিনতে পারছি না আমি; তবু বন্ধু হারানোর ভয়ে বললাম "একটু একটু—ঠিক মনে করতে পারছি না।"

গণপতিবাবুর দলিল মেলানো মাথায় উঠলো। সমস্ত কগজ-পত্তর টেবিলে কাচের পেপারওয়েটে চাপা দিয়ে তিনি বললেন, "তুমি আমাকে চিনবে কী করে? আমি যে একেবারে পাল্টে গিয়েছি। অকালে এই ভ্রু-জোড়া পেকে গিয়ে আমার মুখের আদল একেবারে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে—আমার মেজ-শালকই অনেকদিন পরে আমাকে দেখে সেবার চিনতে পারেনি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, অন্য কিছুতেই বার্ধক্য এলো না—প্রথমেই পাক ধরলো এই ভুরুতে!"

ভ্রু-যুগল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললেন গণপতিবাবু। "এই ভ্রু-জিনিসটা ডেনজারাস—সামান্য একটু চেঞ্জ করলেই মুখের আদল অন্যরকম হয়ে যায়। এই জন্যেই তো ইংরেজ আমলে আমাদের

থানার হালিম দারোগা রাস্তায় ভ্রূ-কামানো ছোকরা দেখলেই ফেরার স্বদেশী ডাকাত সন্দেহ করে সোজা নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতো!"

ভ্রূ থেকে নানাপ্রকার ভ্রান্তি হতে পারে বুঝতে পারছি। গণপতিবাবু বললেন, "হিসট্রি সবার ওপর রিভেঞ্জ নেয়। সেদিন হালিম দারোগার মেয়ের সঙ্গে পাকসার্কাসে দেখা হয়ে গেল। এমনই সময় যে হালিম দারোগার মেয়ে ভ্রূ কামিয়ে ফেলেছে—চোখের চুল নাকি সৌন্দর্যকে বাধা দেয়।"

মনের আনন্দে গণপতিবাবু গল্প করে চলেছেন। আমার পিতৃপরিচয় পেয়ে গণপতিবাবুর ব্যবহার একেবারে পাল্টে গিয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, চাকরির সন্ধানে কয়েকঘণ্টা আগে এই পিতৃপরিচয় পরিবর্তনের ফাঁদেই আমি পা-দি
চলেছিলাম।

গণপতিবাবু আমার জন্যে চা-টোস্
অর্ডার দিলেন। বললেন, "নাম-ক
লোকের ছেলে তুমি! আমার এই হ
লাইফে হরি উকিলের মতো বু
এবং সৎ মানুষ আমি গাদা-গাদা দেখি
গত রাত্রের পর এতোক্ষণ গরম

ছাড়া পেটে অন্য কিছুই পড়েনি। প্রচণ্ড খিদের মাথায় চিনি-মাখানো এক জোড়া টোস্ট যেন অমৃত মনে হলো।

আমার খাওয়ার ধরন দেখেই গণপতিবাবু বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝলেন। বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "ওরে আরও দুখানা মাখন-টোস্ট ঝটপট নিয়ে আয়।"

আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না।

গণপতিবাবু বললেন, "এই যে আজ করে খাচ্ছি, এ-তোমার বাবার দয়ায়। আর তুমি দুখানা টোস্ট খেতে লজ্জা পাচ্ছো!"

আমাকে ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে গণপতি সামন্ত প্রশ্ন করলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই আমার গপ্পো শুনতে। হরি উকিল নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছিলেন আমাকে—তাই আজও কাউকে তোয়াক্কা করি না আমি। ভগবান যদি দু'একখানা পরীক্ষা পাশ-এর রবারস্ট্যাম্প পাইয়ে দিতেন তা হলে এতোদিনে এ্যাডভোকেট হয়ে চড়চড় করে কোথায় উঠে যেতাম।"

গণপতিবাবু বললেন, "আমাকে তাহলে তোমার মনেই পড়ছে না। অথচ তোমার বাবার কাছে কতবার গিয়েছি। তাহলে শোনো আমার গপ্পো এবং তোমার বাবার গপ্পো।"

কাজকর্ম ফেলে রেখে গণপতিবাবু শুরু করলেন—"জেলা কোর্টে তখন দুই হরিপদ মুখুজ্জে উকিল। প্লেন-হরি এবং গুঁফো-হরি। তোমার বাবার তখন মস্ত গোঁফ ছিল।

তোমার বাবা বেশী বয়সে ভাগ্য সন্ধানে বনগাঁ কোর্ট থেকে বেরিয়ে এই হাওড়ায় হাজির হয়েছেন। একবার একটা কেসে তোমার বাবা রিসিভার অ্যাপয়েন্ট হলেন। জজসায়েব তোমার বাবার ভক্ত ছিলেন। দিন-আনা দিন-খাওয়ার দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যেই গুণগ্রাহী জজ সায়েব তোমার বাবার জন্যে এই জমিদারী এস্টেটের রিসিভারির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এমনই কপাল, পেয়াদা সেই হুকুম ভুল করে প্লেন-হরির সেরেস্তায় দিয়ে এলো।

বিকেলবেলায় জজ সায়েব গুঁফো-হরিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জমিদারী এস্টেটের রিসিভারির অর্ডারটা পেয়েছেন তো?'

তোমার বাবা খবর পাননি শুনে হৈ-হৈ কাণ্ড। জজসায়েব পেস্কারকে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল প্লেন-হরি ইতিমধ্যে কাগজপত্র সই করে নিয়োগপত্র নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই কাজটা তোমার বাবার কাছে ফিরে এলো।"

গণপতিবাবু বললেন, "তার কিছুদিন পরেই বন্ধ বাঁধলো। এবং সেই সময়েই আমার সঙ্গে হরি উকিলের আলাপ হলো।"

একটু থেমে গণপতিবাবু প্রশ্ন করলেন, "আমার তখন কী কাজ বুঝতে পারছো?"

আমি কী করে বুঝবো? উকিলের কাছাকাছি কাজ হচ্ছে মুহুরীর—ভদ্রভাষায় যাকে বলে 'মোহরার'।

মুহুরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় বিরক্ত হলেন গণপতি সামন্ত। "কোন্ দুঃখে আমি মুহুরী হতে যাবো? আমাকে বলতে পারো থ্রি-ফোর্থ উকিল। আমাদের কোনো স্ট্যাটাস নেই—লোকে তাই বলে তদ্বিরকারক।"

আমি শুনেছি গণপতি সামন্তর কথা। কিন্তু তিনি আমার হাবভাবে সন্তুষ্ট না-হয়ে বললেন, "হাসপাতালে যেমন নার্স, আদালতে তেমনি এই তদ্বিরকারক। ডাক্তার যত বড়ই হোক, নার্সিং-এর দোষে রোগী যেমন রাতারাতি পটল তুলতে পারে; তেমনি যত বড়ই উকিল থাক, ছোক এক্সপার্ট তদ্বিরকারক না থাকলে কেস গোল্লায় যেতে বাধ্য।"

গণপতি সামন্ত এবার ব্যাখ্যা করলেন: "উকিল তো কেস উঠলে হাকিমের সামনে গাউন পরে ইওর-অনার অথবা মিলার্ড মিলার্ড করবে। কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ, দলিল-দস্তাবেজ, প্রমাণ এবং অপরপক্ষের হাঁড়ির খবরাখবর কে জোগাড় করবে? শুধু মন্তর পড়লেই তো রথ চলবে না—জগন্নাথের রথের চাকায় তেল দেবার লোকও তো দরকার! তার নামই তদ্বিরকারক।"

"কিন্তু..." গণপতিবাবু এবার মুখে এক খিলি পান গুঁজলেন। "কিন্তু তদ্বিরকারক বলে যারা জেলা কোর্টে ঘুরে বেড়ায় তাদের বেশীরভাগ তদ্বিরের 'ত'ও জানে না—তারা আসলে উকিলবাবুদের

টাউট। বাংলায় যাকে বলে দালাল। সরল লোকদের ভাতিয়ে ভাতিয়ে এরা মামলায় নামায়। তারপর গ্রামগঞ্জ থেকে সেইসব কেস নিয়ে এসে তারা জজেস এবং উকিলবাবু দু'পক্ষের কাছ থেকেই টাকা কামায়।"

"সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম দিকে আমি নিজেও ওইরকম টাউট ছিলাম। কাজকর্ম কিছুই বুঝতাম না। গাঁয়ের লোকদের সুবুদ্ধি দিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় নামাতাম। তারপর গরম গরম সেইসব ব্রীফ নিয়ে সোজা উকিলবাবুদের কাছে চলে আসতাম। জিজ্ঞেস করতাম ফী-এর কত পার্সেন্ট আমাকে দেবেন?

তারপর তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ হলো। হরিপদ উকিলের তখনও খুব পসার হয়নি। কিন্তু একরোখা লোক। গম্ভীরভাবে বললেন, গণপতি, কাজকর্মের তুমি কিছুই জানো না। এই বিদ্যে নিয়ে তুমি সারাজীবনই টাউট থেকে যাবে। তোমার জেনে রাখা ভাল, কোনো ভদ্র উকিল টাউটের দ্বারা দিয়ে কেস জোগাড় করে প্র্যাকটিস জমাবে না।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

গণপতিবাবু পানের খিলিটা বাঁদিক থেকে ডান গালে ট্রানসফার করে বললেন, "তখন ওঁর কাছে সারেনডার করলাম। ওঁর কাছে বসে বসে ক্রমশ অনেক কায়দাকানুন শিখলাম।

"কয়েক বছর পরে আমি বেশ একস-পার্ট হয়ে উঠলাম। হরি উকিল আমার কাজকর্মে এতো সন্তুষ্ট হলেন যে নিজেই বললেন, 'গণপতি তোমার যদি স্কুল কলেজের লেখা-পড়া থাকতো তা হলে সহজেই উকিল-মোক্তার হতে পারতে।'

"কথাটা তখনও আমি তেমন সিরিয়াসলি নিইনি। গাঁয়ের ছেলে, সিকসথ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে—সে আবার বিএ-এমএ পাশ করে উকিল হবে!

"কিন্তু তোমার বাবাই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। হরি উকিল একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি আমার মুহুরি হতে পারো। কিন্তু এখানে দলিল নকল করে আর হাজরে জমা দিয়ে কত টাকা পাবে? আর তুমি সারাজীবন তুমি এইভাবে নষ্ট করো তাও আমি চাই না।'"

[illegible] মাকের উপায় নেমে-আসা চশমাটা যথাস্থানে তুলে দিলেন। বললেন, "তোমার বাবার কথাগুলো মনে থাকে যেন। ওঁরই পরামর্শমতো কাশীপুরের আমিরবাবুদের ট্রাম্বিরকারদের কাছে ঢুকলাম। ওখানে মাত্র কয়েক বছর। ওখান থেকে বলতে এক পার্টির কাজ জুটে গেলো।"

ফিসফিস করে সেই বিখ্যাত পার্টির নাম বললেন গণপতিবাবু। "বেজায় বড়লোক। কত যে টাকা আছে, কত যে কোম্পানি আছে, কত যে শেয়ার আছে কত যে গহনা আছে—তা বাবুরা নিজেরাও জানেন না! একমাত্র আমিই বোধ হয় কিছুটা জানি।"

আমি বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলাম। গণপতিবাবু বললেন, "বেশী টাকা, বেশী ব্যবসা, বেশী সম্পত্তি থাকলে কী হয় বলো তো?"

"অশান্তি," আমি সরল মনে উত্তর দিলাম।

"কচু জানো তুমি," বেশ বিরক্ত হলেন গণপতি সামন্ত। গরীবরা ওইসব স্তোক-বাক্যে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। ওই সুখেই থাকো যে, বড়লোকদের বড় অশান্তি। যেমন আমাদের গ্রামে বলতো সুন্দর ছেলের কালো বউ হয়। এক মিথ্যে কথা! বড়লোকদের বাড়িতে যাও—যেমন সুন্দর বউ, তেমন সুন্দর বর—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ!"

"বেশী টাকা থাকলে তাহলে কী হয়?" গণপতিবাবুর প্রশ্নটা তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম।

গণপতিবাবু উত্তর দিলেন, "বিষয়-সম্পত্তি থাকলেই থানা-পুলিস, কোর্ট-কাছারি, উকিল-ব্যারিস্টার এসব একটু-আধটু লাগবেই। এসব কাজের জন্যে বিশ্বাসযোগ্য লোক চাই। সেই কাজই আমি করছি।"

একটু হেসে গণপতিবাবু বললেন "কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে আমার বিদ্যে সিকসথ ক্লাশ পর্যন্ত। হরি উকিলের ট্রেনিং-এর জোরে ওই বিদ্যে নিয়েই আমি বাঘা-বাঘা এটর্নি এবং ব্যারিস্টারকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছি।"

গণপতিবাবু বললেন, "ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটে, সিটিসিভিল কোর্টে, আলীপুরে, বারাসতে, হাইকোর্টে আমার কাজক

সেনেই আছে—আমরা ভাগ্যিদের জন্যে ভাকির মতো সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। বাড়িতে অথবা বাবুদের অফিসে আমাকে ধরাই যায়। কাজেই অফিসেও বাসাই নেই আমার—কর্তারা জানেন গণপতির ঘোরাঘুরি [illegible] নেই।"

এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে গণপতিবাবু বললেন, "এই সিনহা এন্ড ল্যাজন, এটাই অফিস। আমি প্রায়ই এসে থাকি। আমার মতো ভোলাভালাদের এইটাই বেস্ট জায়গা। এখানে এই টেবিলে লোকে আমার চিঠিপত্তর কাগজ-টাগজ সব রেখে যায়। এটার্নি শিবেন্দু সিনহার সঙ্গে আমার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা আছে।"

মনে হচ্ছে অনিশ্চিত জীবনের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে এবার আমি শক্তিমান শুভানুধ্যায়ীর সন্ধান পেয়েছি।

গণপতিবাবুকে আমার সব কথা বললাম। গণপতিবাবু সেই বৃত্তান্ত শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন।

তাঁর প্রিয় হরি উকিলের ছেলের যে এমন অবস্থা হতে পারে তা গণপতিবাবু এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

রুমালে কপাল মুছে গণপতিবাবু বললেন, "বড় ডিফিকাল্ট কেস। এই বিদেশে সবচেয়ে দরকারী তিনটে জিনিস—চাকরি, আশ্রয় এবং অর্থ—তিনটের কোনোটাই নেই তোমার।"

গণপতিবাবুকে আমি আর কিছুই বলতে পারছি না—পারিবারিকভাবে পরিচিত কারও কাছে নিজের দুঃখের কথা আবেদন-নিবেদন করতে লজ্জায়, অপমানে আমার মাথা নিচু হয়ে আসে।

গণপতিবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, "আজকাল-নাকি আমার ব্রেন ঠিক কাজ করছে না। [illegible] আমার মনে হচ্ছে তুমি বরং আজকে কিছুক্ষণ বটকৃষ্ণ বটব্যালের দোকানে কাজ করতে যাও। বটব্যালের পরে আমি নিজেই খোঁজ করবো'খন।"

বটকৃষ্ণ বটব্যাল আমাকে অনেকক্ষণ না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এতোক্ষণ কী করছিলে? আমি তো ভাবলাম গণপতি সামন্ত নিশ্চয় তোমাকে ধরে কাপি মেলাতে বসে গিয়েছেন। কপি মেলানো আমাদের কাজ নয়—যে-দামে আমরা টাইপ করি তাতে কোনো টাইম নষ্ট দেওয়া সম্ভব নয়।"

বটকৃষ্ণ খবর দিলেন, "লালবাজারের কাছে একখানা ইটালিয়ান টাইপিস্টের ভেকান্সি আছে।"

ইটালিয়ান মানে যে রাস্তার ওপর ইটে বসে টাইপ করা তা আমি জানি।

বটুবাবু বললেন, "কিন্তু মুশকিল হলো, অনেক টাকা সেলামী চাইছে। অত টাকা কী জোগাড় করতে পারবে?"

রাস্তার ওপর ইটে বসে টাইপ করবার জন্যেও নভোস্পর্শী রাজপ্রাসাদের এই নগরীতে এখন মূলধন এবং সেলামীর প্রয়োজন হয়। হে ঈশ্বর, হৃদয়হীন এই কলকাতায় আমার মতো সহায়হীনরা কেমন করে বেঁচে থাকবে?

বটুকবাবু বললেন, "দু'পাতায় এই এফিডেভিটখানা টাইপ করে দাও—তারপর তোমার ছুটি। আমিও আজ বেশীক্ষণ থাকবো না। এক্ষুণি [illegible] কাজকর্মে একটুও মন থাকে না—মেয়েটার কথা মনে পড়ে যায়।"

কাজকর্মে আমারও মন বসছে না। প্রায়ই ঘড়ির দিকে নজর দিচ্ছি এবং গণপতিবাবুর আবির্ভাব প্রত্যাশা করছি। এক-একবার মনে হচ্ছে আমার কিছুই হবে না—গণপতিবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতেই আসবেন না। আবার মনে হচ্ছে, একদিকে যেমন আমি অভাগা, অন্যদিকে তেমনি আমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। সংসারের নিষ্করুণ পথে একলা বার হয়ে বারবার কত সহজে স্বল্প পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষের সাক্ষাৎ-সান্নিধ্যে এলাম—তাঁদের অপ্রত্যাশিত অকৃপণ ভালবাসাইতো আমাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। হে উদাসীন ও পরমশক্তিমান ভাগ্যবিধাতা, তুমি আমার স্বল্পপরিসর জীবনে মেঘ ও রৌদ্রের যে বিচিত্র লীলা ক্রমান্বয়ে খেলে চলেছো তার জন্যে আমার অভিমান ও কৃতজ্ঞতা দুই-ই গ্রহণ করো।

গণপতিবাবু সম্বন্ধে আমার অধীর প্রত্যাশা বিফল হয় নি। ঘণ্টা দুয়েক পরে সিনহা এন্ড কোম্পানির চাপরাসী স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া চটি কোনোক্রমে পায়ে টানতে টানতে হাজির হলো। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, "আপনিই কি শংকর বাবু?"

বটুবাবু বেয়ারার বার্তার উগ্র ভঙ্গীতে বিরক্ত হয়ে বললেন, "উনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর যে-বাবুই হোন, কী দরকার তোমার?"

বেয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে খবর দিলো, "গণপতিবাবু আপনাকে এখনই ডাকছেন।"

"এখনই ডাকলে এখনই যেতে হবে এমন কোনো আইন নেই," বিরক্ত বটুবাবু তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করলেন।

তারপর আমাকে বললেন, "যান, একবার দেখে আসুন। নিশ্চয় টাইপের কোনো পাতায় দু'একটা লাইন ছাড় গিয়েছে। পয়সা দিয়ে টাইপ করালে এ-পাড়ার কর্তাব্যক্তিরা মুলো হয়ে যায়! একটি কথা হাতে লিখবে না। কম্পিটিশনের বাজার—মুখের ওপর কিছু বলাও চলে না। দেখুন আপনাকে দিয়ে ঠিক বিনা পয়সায় দু'একখানা পাতা রিটাইপ করিয়ে নেবে, সেইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছে।"

[ক্রমশ]

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

...হু পুনরাবৃত্তি

একটা প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ বা জাদু-
...রের কথাই মনে করা যাক। একটা কক্ষে
...কলেন, সেখানে রয়েছে সংগৃহীত
...কালের বিচিত্র পুঁথি, সাজানো রয়েছে
...লানুক্রমিকভাবে, পাশে লেখা আছে
...তব্য তথ্য। দেখা শেষ করে গেলেন
...শের কক্ষে। এই ঘরটির আকার, মাপ-
...াক, দরজা জানলা ধরন-ধারণ একটু
...ন্য রকম। ওটার দরজা যদি ছিল দক্ষিণে,
...টার আবার রয়েছে পূর্বদিকে। ওটার যদি
...ল বিচিত্র জাফরি, এটার রয়েছে বড় বড়
...লঘুলি। এটা অস্ত্রাগার। এখানে রয়েছে
...র্ম, বর্ম—নানা মাপের শিরস্ত্রাণ, ছোরা
...রি, ঢাল তরোয়াল, পিস্তল, গাদা-বন্দুক
...ত্যাদি প্রভৃতি। পাশের কক্ষটি মহাফেজ-
...না—চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ রয়েছে
...সংখ্য। এমনি কক্ষের পর কক্ষ। একটা
...ক্ষ শেষ হলে দরজা—লম্বা দালান
...পেরিয়ে আরেকটা কক্ষ।

শিল্পীদের প্রদর্শনীতে এমনই দরজা
...লে নতুন কিছু আবিষ্কার করতেই দর্শক
...য়।

এই তো কিছুদিন আগে করুণা
...হার রেখাচিত্রের প্রদর্শনীর সমালোচনা
...লখেছি। সে প্রদর্শনীর সঙ্গে ৩২
...চারঙ্গী রোডের ডেকর সার্ভিস গ্যালারীর
...ফাৎ নেই। রবিবার সকালের শোতে
...পুরনো ইংরজী ছবির সঙ্গে যেমন
...দু-একটা অন্য টুকরো ফিলম জুড়ে দেওয়া
...য়, এও তেমনি (৮ই—১৮ই জুন)। এমন
...কি তৈলচিত্রগুলোর মধ্যে দুটো ইতিপূর্বে
প্রদর্শিত।

তাঁর তৈলচিত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য
হলো জোরালো রেখার বাঁধন। যুবতী
'নারী' সাদা রঙ দিয়ে এঁকে একদিকে
রেখেছেন প্রধানত সিঁদুর রঙের মধ্যে ছোপ
ছোপ নীল, আর অন্যদিকে কালোর মধ্যে
লাল। ছবিটার সরল রচনাভঙ্গীর মধ্যে
ভূমি বিভাজনের সহজ কৌশলটা চোখে
পড়ে। এর মধ্যে লোকশিল্পের ছাঁচে করা
ঘোড়াটাও বেশ। করুণা তরল পাতলা রঙ
দিয়ে ভূমি ভরান না। যখন রঙ ব্যবহার
করেন তখন ঘন করে রঙ লাগান। তুলি
টানেন কৌশলে।

পরের বারে নতুন ছবি দেখব আশা
করি।

নারী — করুণা সাহা

ডনা পাওলা

ডনা পাওলা। নামটা খুবই মিষ্টি। আইবেরিয়ান উপদ্বীপের জলপাই আর আঙুরের গন্ধ যেন ভেসে আসে। ভূমধ্যসাগরীয় সফেন ঢেউ। গারসিয়া লোরকার কবিতা এবং কাব্য-নাটকের কথা মনে পড়ে। উষ্ণ রোদমাখা কোনো মেয়ে স্বপ্নের মধ্যে যার প্রেমে পড়া যায়।

না, স্পেন পর্তুগালের মেয়ে নয়। ভারতীয়। এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে থাকতো সে। গোয়ায়। জেলেদের মেয়ে। মৎস্যগন্ধা এই কন্যার প্রেমে পড়েছিল এক রাজকুমার। কিংবদন্তী অনুসারে রাজবাড়ির সকলে মিলে রাজকুমারকে সপ্তসিন্ধুর ওপারে কোনো এক অজুহাতে পাঠিয়ে দেয়। ডনা পাওলাকে সহ্য করতে হয় সকলের বিদ্রূপ

আর ভাঙ্গিলা।

একদিন রাগে সহ্য করতে না পেরে ডনা চলে যায় সমুদ্রের কিনারে। চাঁদ ছিল তখন আকাশে। ঈষৎ মত্ত রুদ্র একটু টলে পড়েছিল একদিকে। তখন ঢেউফেনিলতার মধ্যে ডনা জলে আত্মবিসর্জন দিল।

গোয়ার উপকূলের একটা জায়গার নাম তাই ডনা পাওলা।

দিল্লির কলাসদনের অধ্যাপক ফাল্গুনী দাশগুপ্ত ছাত্রদের সঙ্গে গোয়া পরিভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্রের এই মনোরম পরিবেশে এই লোকশ্রুতি কানে আসে তাঁর। সুতরাং তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে ছবি আঁকলেন।

ফাল্গুনীর প্রদর্শনীতে (বিড়লা আকাদমী ৯লা—৬ই জুন) বহু ছবি ভাল লেগেছে আমার। জলরঙের বড় বড় কাজ। খেটে জমিয়েছেন। বস্তুত এমন পরিতাক্ত একটা মাধ্যম, যা আর কোনো শিল্পী সহজে ছুঁতে চান না, তাই দিয়ে তাঁর কাজ করার দুঃসাহস। চার ফুট × চার ফুট কাগজ পাওয়া যায় না। কিন্তু উনি দমবার পাত্র নন। কাগজ সাইজ মতো কেটে নিয়ে বোর্ডের ওপর জোড়া দিয়ে

ডয় ফাল্গুনী দাশগুপ্ত
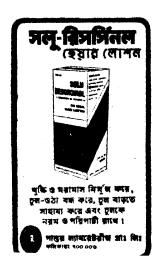
ছবি এঁকেছেন। তার উপর পাতলা ক'রে টেনেছেন ফেবিকল। এমন একটা টেকনিক দিচ্ছে যে অনেক সময় পোড়-খাওয়া সমালোচককেও খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছে এটা জলরঙ না তেলরঙ।

ডনা পাওলা ছবিটা বেশ বড়। দরদ দিয়ে আঁকা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে শুয়ে আছে ডনা। নগ্ন নিষ্পাপ ব'লেই তাকে দিয়েছেন শ্বেতশুভ্র দেহ। আর হিংসার দোত্যনা আনার জন্যে তাকে শুইয়েছেন তির্যকভাবে রক্ত লাল একটা চাদরে। এক-পাশে চাঁদ টলে প'ড়ে ভেসে যাচ্ছে জলে। সমুদ্রের শ্যাওলা, স্যাঁতসেঁতে জলজ সবুজ নীল পরিবেশে একটা মাছ ভাসে। দুয়েকটা শামুক চলে। ছবিটা দেখতে দেখতে মনে আসে ইংরজী কবিতার দু-একটা চরণ। হয়তো ছবির বিদেশী এই নামের জন্যেই। বার্নের লেখা—

The white moon is setting behind
the white wave,
And Time is setting with me, O!

হয়তো 'me' শব্দটার পরিবর্তে এক্ষেত্রে 'her' ব্যবহার করলে ভাল হতো। বা ন্যাশের একটা পংক্তি যার আগ পিছু কিছু মনে করতে পারছি না 'Dust hath closed Helen's eye'। ধুলো নয় জল। তরল উচ্ছ্বসিত ফেনা ফেনা জল।

ফাল্গুনীর ছবিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিসর্গ এবং পৌরাণিক। তাকে কালী ও শক্তিসাধনার প্রতীক ও উপচার উদ্বুদ্ধ করেছে। বেশ জমিয়ে কাজ-গুলো করেছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক কিছুদিন তান্ত্রিক ছবি আঁকার ফ্যাসন হয়েছিল ব'লে এসব ছবি আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া শিল্পীরা বিদেশী পরিব্রাজকদের দিকে নজর রেখেই এসব ছবি এঁকেছেন—তথা-কথিত ভারতীয় ছবি কিনে এঁরা সংক্ষিপ্ত পরবাস শেষ করেন। ফাল্গুনীর নীল রঙে আঁকা 'শক্তি' ছবির রচনাসৌকর্য কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে 'গণেশ' ছবিটা আমাকে টেনেছে। যোগেন চৌধুরী বিখ্যাত 'গণেশ' ছবিতে আছে বণিক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ। গণেশ এঁর কাছে দেবতা নন, কিন্তু চাতুরী ও দুর্নীতির প্রতীক। যোগেন সেনাবাহিনী মতো তাঁর কৌশল ও শক্তিকে সংহত ক'রে পটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নিন্দা আর ঘৃণায় কম্পমান তাঁর তুলি কিন্তু ফাল্গুনীর 'গণেশ' অধিকতর মানবিক। রেখা আর ভারতীয় রূপারোপের জাদুবলে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন। তিনি 'স্রষ্টা' বা 'সর্বশক্তিমান' নাস্তিককে কিছুক্ষণের জন্যে রূপমায়ায় টলিয়ে দেয়।

ফাল্গুনীর সাগরচিত্র আমাকে বিশেষ ক'রে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে গোপন রুদ্রভাব নিহিত আছে তা যেন তাঁর ছবি দেখতে গেলে মনে হয়। এই সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটলে সব কিছু যে তছনছ হয়ে যাবে এমন একটা কথা যেন মনে হয়। তাঁর ছবির টেকনিক, রঙ, বুনোট, বিচিত্র সব বর্ণময় বক্ররেখা পটের ওপর আমাদের নিয়ে নানাভাবে খেলা করেছে। হয়তো ওলন্দাজ নৌকা আর পালের সর্পিল রেখার ছন্দ, কালচে নীল ঢেউ বেগুনী আকাশ একটা খোলামেলা বিমূর্ত মায়া তৈরী করেছে। তাঁর নিসর্গ চিত্রের পুরোনো পাথর, গাছপালা, সাগর জলের ঢেউয়ের কেমন যেন সোঁদা একটা গন্ধ আছে। এখন সূর্য চন্দ্র নিয়ে কেউ ছবি আঁকে না। বড় বেশী এসব বাজে অজুহাত ফাল্গুনী হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন।

বরং যখন তিনি স্টুডিওতে বসে ছবি এঁকেছেন মানুষজন নিয়ে, তখন একটা কৃত্রিমতা এসেছে। চায়ের পাতা তোলার ছবিটাতে যেন বিজ্ঞাপন শিল্পের ভাব আছে—বিশেষত রূপারোপে তো ফলিত চিত্রকলার ভাবটা স্পষ্ট। আবার নর্তকী, ফুল, চোখ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর 'রচনা-২' তেমন বিশেষত্বপূর্ণ কিছু নয়।

তবু ভাল কাজ অনেক ছিল। ভরা মন নিয়ে বেরিয়ে এলাম মৎস্যগন্ধা নারীর ছবিটা আরেকবার দেখে—

The white moon is setting behind
the white wave,
And Time is setting with me, O!

সন্দীপ সরকার

ত্রুটি স্বীকার : ৫ জুন সংখ্যায় ৫৬৫ পৃষ্ঠার ছবিটির বাঁদিকের প্যানেলে বিশ্বরূপ দত্তের আঁকা 'মা ষষ্ঠী'। বাকি অংশ 'দিব্য-সঙ্গীত'।

আপস

অজিত দে

শেষ পর্যন্ত এক সময় শ্যামলকে একা ...ও গৌতমও উঠে পড়ে। একেবারে সঙ্গে ...গই অবশ্য চলে যায় না ও। যেন ধুলো ঘাস-টাস লেগে থাকলে সেগুলো উড়িয়ে ...য়ার জন্যে গৌতম কাপড়ের কোঁচাটা ...বার ঝেড়ে নেয়। 'ফট' শব্দে বাতাসটাকে ...ক দেওয়ার পর ও দু' আঙুলে তুড়ি ...চয়ে হাই তোলে। বেশ লম্বা হাই. এ ...। হাঁ-করা মুখ ও চোয়াল যথাস্থানে ...র এসে ঠিকঠাক হতে খানিকটা সময় ...গ। ততক্ষণে গৌতমের খেয়াল হয় ...াসের হুটোপাটিতে চুলগুলো এলো-...লো হয়ে আছে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে ...নি বের করে মাথা আঁচড়ায় ও। ওতেও ...টা সময় যায়। এর পর গৌতম অবশ্য ...ঃ এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, কাপড়ের ...চাটা পকেটে পুরে দ্রুত হাঁটতে শুরু ...র। প্রতিদিন ইচ্ছে করেই পিচের রাস্তাটা ...ড়িয়ে যায় গৌতম। চটি পায়ে ঘাসের ...র দিয়ে চলতে থাকে ও। নরম ঘাসে ...ডুবিয়ে হেঁটে যাওয়া গৌতমের বরাবরই ...বড় পছন্দ।

একটি দিনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ...ন কোনো দিন হয়নি যে গৌতম কে চাটা ...ত ভুলে গেছে কিংবা হাইটা সময় ...া আসেনি, কি দু' আঙুলে তুড়িটা না ...জে ফসকে গিয়েছে। অথবা ঘাসে পা ...বয়ে হেঁটে যাওয়ার বদলে পিচের ...স্তাটাই পছন্দ করে ফেলেছে গৌতম কোন ...ন। যেন সব কিছুই কোনো নির্দিষ্ট ছকে ...ন্ত্রিক পরম্পরায় বাঁধা। ঠিক ওই রকম ...মাফিকই শরদিন্দু আর অনুপও প্রতি-...ন রাত আটটা নাগাদ নির্ভুল নিয়মে ...নখাস করতে থাকে। 'ধুর, আর জমছে না' ...ল ওরা উঠে যায়।

ওদেরও ওই এক বাঁধা বুলি। উঠে ...ওয়ার সময় প্রতিদিন একই রকম গলায় ...ক ঘেয়ে শব্দগুলো আওড়ায় ওরা। 'ধুর, ...র জমছে না' ওদের ওই কথাগুলো শুনলে ...জ্বলে যায় শ্যামলের। বাড়ি যাওয়ার ...ন্য মন উতলা হয়েছে, চলে যা। জমছে ...টমছে না ওসব নকশা কেন বাবা! তোরা ...ায়ান মন্দ, ঘরে যুবতী বউ থাকতে ...খানে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বসে নীরস ...ড্ডায় সন্ধ্যেটা নিষ্ফল করবি কেন? বরং ...উয়ের সঙ্গে একটু খুনসুটি ঢলাঢলি ...রলেও সময়টা বেশ কাটবে, মন-মেজাজটাও ...লো লাগবে। এতে দোষেরও কিছু নেই, ...জ্জারও না। কিন্তু তোরা এমন একটা ভাব ...খাস যেন এখানে জমছে না বলে চলে ...চ্ছিস। কেন, বউয়ের জন্যে মন কেমন ...রছে সেটা বললেই তো পারিস, অত ছল ...তো রাখ-ঢাকের কী দরকার, তোরা ...বাবমানুষ তো না কি? শ্যামল আপন ...ন খানিকক্ষণ গজরায়।

ওরা চলে যাওয়ার পর গৌতম আরো কিছুক্ষণ থাকে। সেটা যে নিছক শ্যামলকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে এমন না। আসলে বাড়ির প্রতি গৌতমের আকর্ষণ আপাতত কম। ওর বউয়ের ফের বাচ্চা-কাচ্চা হবে। গর্ভবতী স্ত্রীর বেঢপ বিশ্রী চেহারাটা সম্ভবত গৌতমের কাছে খুব নয়ন সুখকর না। শ্যামলের ধারণা, এ অবস্থায় ও যতটা সম্ভব ওর বউয়ের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে চায়। অগত্যা নিরুপায় গৌতমকে শ্যামলের মত একটা আধা-বাউণ্ডুলে মানুষের সঙ্গে বসে বসে সময় কাটাতে হয়। শেষে পার্কটা প্রায় এক রকম জনশূন্য হয়ে আসে যখন গৌতমও উঠে পড়ে। 'আর বেশি রাত পর্যন্ত পোয়াতি বউটাকে জাগিয়ে রাখা উচিত হবে না বোধ হয় এই ধরনের একটা কর্তব্যবোধের তাগিদেই স্ত্রীর সম্বন্ধে ওর সচেতনতা ফিরে আসে। ও আর তখন ঠিক যেন বন্ধু গৌতম থাকে না, নিমেষে কী এক রূপান্তর ঘটে যায় ওর, রীতিমত ডিউটিফুল হাজব্যাণ্ডের মতো লাগে ওকে। এমনিতে গৌতমের চেহারাটা চোয়াড়ে টাইপের। কুদে কুদে চোখ দুটোর সামান্য ওপরে রোমশ জোড়া ভুরুর সুতীক্ষ্ণ বঙ্কিমতা এবং অমসৃণ ভাঙা গালে প্রকট-ভাবে জেগে ওঠা চোয়ালের জন্যে ওকে সচরাচর বদরাগীর মতো দেখায়। কিন্তু এ সময় স্ত্রীর প্রতি গাঢ় মমতায় ওর ওই রুক্ষ মুখখানাও এক ধরনের কোমল লাবণ্যে টলটল করে। চোখের নিচে কালি-পড়া ফ্যাকাশে পাণ্ডুর মুখ কি বিসদৃশ গড়নের জন্যে স্ত্রীর প্রতি ওর কখনো কোনো বিরূপতা জেগেছিল এখন আর এমন মনে হয় না। কেননা এই মুহূর্তে ভিন্ন এক আবেগের জোয়ারে ওর সমস্ত চেতনা ভেসে যাচ্ছে। অনুরাগে মমতায় স্ত্রীর স্নিগ্ধ মুখের আদলটাও তাই এখন ওর বড়ো মধুর, বড়ো অপরূপ মনে হচ্ছে। দুর্বার আকর্ষণে সেই মায়াবী মুখখানা ওকে এমনভাবে টানছে যে ঘাসের ওপর দিয়ে ভীষণ দ্রুত হাঁটতে থাকে ও, যাওয়ার সময় শ্যামলকে কিছু বলে যাওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। এই মুহূর্তে স্ত্রী ছাড়া ওর চেতনায় আর কিছু নেই। এই ঘাস-বিছানো পার্ক, গাছ-গাছালি শ্যামল সহ তাবত পারিপার্শ্বিক ওর কাছে অবান্তর হয়ে গেছে এ সময়। অর্থাৎ আসলে অখণ্ড স্বামীসত্তার প্রত্যাবর্তন ঘটে গেছে গৌতমের। ও আর এখন উইলসন অ্যাণ্ড পার্কিনসন কোম্পানীর জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট না, শ্যামল কি শরদিন্দুদের ইয়ার-বন্ধুও না, ও একজন আইডিয়াল হাজব্যাণ্ড—যার জন্যে তার তন্বী স্ত্রী সংসারের কাজকর্ম রান্নাবান্না সেরে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে এবং এই মুহূর্তে যার কাছে হাজির হওয়া ছাড়া গৌতমের আর দ্বিতীয় কোনো কর্তব্য

নেই।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শ্যামল গৌতমের চলে যাওয়া দেখল। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে যে দুঃখটা চাপা থাকে এই-বার একা পেয়ে সেটা শ্যামলকে আক্রমণ করল। পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার শিকার এখন সে, কথাটা ভাবতেই হঠাৎ ওর বুকের ভিতরটা কেমন শূন্য ফাঁকা হয়ে এল। আচ্ছন্নের মতো ও আরো খানিক বসে রইল তারপর এক সময় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। পার্কের নরম ঘাস ওর পিঠের নিচে. চোখ আকাশের দিকে মেলা। এই ভাবেই ও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকবে। রোজই থাকে। রোজই পায়ের কাছে গুলমোহর গাছটা রাস্তার লাইটপোস্ট থেকে চুঁইয়ে আসা ফ্লোরেসেন্ট আলোর নীলাভ দ্যুতি সারা শরীরে মেখে মোহিনী রূপসী সেজে দাঁড়িয়ে থাকে, এক বুক নক্ষত্র নিয়ে বিশাল আকাশ ঝিলমিল করে চোখের ওপর. সামান্য দূরে বোগেনভিলিয়ায় মোড়া পার্কের গেটের গায়ে মাথায় থোকা থোকা ফুল কখনো কখনো চলন্ত মোটরের হেড-লাইট থেকে ছিটকে আসা আলোয় কচি শিশুদের মত নির্মল হাসিতে চলকিয়ে ওঠে. কোনো কোনো দিন বা জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ ভেসে যায়—অমল আলোয় ঘাস ফুল গাছের সবুজ পাতা সব কিছু চিকচিক করতে থাকে, গোটা পার্কটাই অলৌকিক লাবণ্যে মায়াবী হয়ে যায় তখন। কিন্তু শ্যামল এ সব কিছুই দে[illegible] না। দেখার মতো চোখটাই যেন [illegible]হারিয়ে ফেলেছে আজকাল। ইচ্ছেও। [illegible]লে তার মনটাই অন্য রকম হয়ে গেছে[illegible]বে না-ই বা কেন, মনের আর দোষ কি[illegible] জীবনের রকমটাই যে আলাদা হয়ে গেছে এখন। জীবনের একটা মস্ত বড়ো ক্ষেত্রে গৌতম শরদিন্দু অনুপ সকলের সঙ্গেই তার ভীষণ গরমিল। ওরা প্রতিদিন যে যার সময় বা খেয়াল খুশি মাফিক এখান থেকে উঠে যার যার স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়, হর রোজ চুটিয়ে দাম্পত্য জীবনের বিচিত্র স্বাদ নেয় ওরা। আর নিরুপায় শ্যামল সেই সময় এখানে নিঃসঙ্গ শুয়ে চিন্তার জাবর কাটে। অথচ শ্যামল বিবাহিত। কিন্তু ইচ্ছে মতন খুশি মতন প্রতিদিন স্ত্রীর কাছে তার যাওয়ার উপায় নেই। এমন না যে স্ত্রীর সঙ্গে তার ডিভোর্স হয়ে গেছে কিংবা অ-বনিবনা বা কোন রকমের মনোমালিন্য চলছে। সুতরাং স্ত্রীর সাহচর্য পেতে শ্যামলের আইনগত নৈতিক সামাজিক বা মানসিক কোনো বাধা নেই। তবু মাধুরীকে রোজ শ্যামলের পাওয়া হয় না। এক সর্বনাশা বাধা পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাম জীবিকা। মাধুরীর চাকরি—একমাত্র প্রতিবন্ধক এটাই। এই চাকরির জন্যেই আজ মাধুরী ধানবাদে আর শ্যামল কলকাতায়। দিনান্তে বারেকের জন্যেও তার মাধুরীকে কাছে পাবার উপায় নেই। মাধুরী ধানবাদে ট্রান্সফার হবার পর তিন তিনটে বছর এইভাবেই কাটছে। প্রতিদিন মাধুরীর জন্যে শ্যামল ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শস্যহীন শূন্য মাঠের মত তার বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ রিক্ততায় হা হা করে। ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখগুলোর দিকে তাকিয়ে অধীর অপেক্ষায় একটার পর একটা দিন কাটে। একমাত্র ওই সব ছুটির দিনগুলিই এখন যা কিছু বর্ণময়, ওই দিনগুলোতেই কেবল শ্যামল আর মাধুরী পরস্পরকে কাছে পায়। বছরে সামান্য কয়েকটা দিন শুধু ওরা

...র করে, দাম্পত্য জীবনের ছিটেফোঁটা ... নেয়। কলকাতার অফিস থেকে মাধুরী ...ফার হবার পর প্রথম দিকে শ্যামল ...তন যেদিন খুশি ধানবাদে চলে যেত। ...রীর ওখানে গেলে কলকাতায় ফিরতে ... তার দু' চারদিন দেরী হত। অনেক ... পাওনা ছিল, কাজেই ঘন ঘন অফিস ...হলেও অসুবিধে ছিল না তখন। ... পাওনা ছুটি তো আর অফুরন্ত নয় ...ের, সুতরাং ছুটি নিলেই বেতন কাটা ...র সমস্যা এসে গেল এক সময়। এখ থেকে ইচ্ছে হলেই হুট করে ধানবাদে ... বন্ধ হয়ে গেল শ্যামলের। মাধুরীর ... তার ব্যাকুলতা আগের মতই আছে, ... তেজী ঘোড়ার মতো তীব্র আবেগ ... ধানবাদের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে ... কিন্তু যাওয়া হয় না। বেতন কাটা ...র প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়ায়। ছুটি ...লে শুধু যে মাইনে কাটা যাবে তা নয়, ... ঘন ছুটি নেওয়াটা কর্তব্যে গাফিলতি ... অফিসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে গণ্য ...ত পারে এবং এভাবে তার সার্ভিস ...র্ড খারাপ হয়ে যাবে। এর ফলে শাস্তি-...পে তার বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে ...ওও বিচিত্র কিছু না। ভবিষ্যতে ...োমোশনের কোনো সম্ভাবনা থাকলে তাও ...কে যেতে পারে। কাজেই রূঢ় বাস্তব-...ধের লাগাম পরিয়ে আবেগের রাশ টেনে ... ছাড়া শ্যামলের উপায় কি!

একে একে সবাই চলে যাওয়ার পর ...নে পার্কে এভাবে পড়ে থাকতে ...মলের যে খুব একটা ভালো লাগে তা ... তবু থাকে সে। কেমন একটা অভ্যেসের ... হয়ে গেছে যেন। তা ছাড়া বাড়ি যেতে ...র মন চায় না। গিয়ে করবেই বা কী। ...খানেও তো সেই একাই। আরো দুটি ...লো অবশ্য আছে। কিন্তু তাদের সাড়া ... কম। শ্যামলের একমাত্র সন্তান চার ...রের ছেলে বাবু সন্ধ্যে হতে না হতেই ...িয়ে পড়ে। মা'র বাতের ব্যারাম, ...কেলের পর থেকেই তিনি আর শরীরে ...ল জুত পান না। প্রায়ই জ্বর আসে, ...ের ব্যথা হয়। ঠিকে লোক আছে ...কটা। ...সন মাজা, ঘর ধোয়া মোছা, রান্না-... সেরে সাতটার মধ্যেই লোকটা চলে ...। ও চলে যাওয়ার পর মা-ও বিছানা ...ন।

--বাবু!

মাথার দিকে কে এসে দাঁড়িয়েছে যেন। ...জর করতে ছায়ার মত একটা মানুষের ...বয়ব চোখে পড়ল শ্যামলের। লোকটা ...শ ঢ্যাঙা, হাতে কিসের একটা চোকো ...ক্স যেন।

—মাচিস হোবে বাবু!

কী জ্বালাতন! শ্যামল বিরক্ত হল। চোখ মুখ কুঁচকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পকেটে হাত গলিয়ে দেশলাইটা বের করে এগিয়ে ধরল ও। মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই। তোমাকে দেবার জন্যেই তো পকেটে দেশলাই নিয়ে এতক্ষণ আমি এখানে অপেক্ষা করছি শালা।

ফস করে কাঠি জ্বলার শব্দ হল একটা। পলকের জন্যে হাল্কা আলোর একটু স্পর্শ লাগল শ্যামলের চোখে।

দেশলাইটা ফিরিয়ে দিতে দিতে লোকটা বলল, শির মালিশ করাবেন বাবু! দিমাগ আচ্ছা হয়ে যাবে আপনার।

শোয়া অবস্থাতেই মাথা নাড়ল শ্যামল।

লোকটা তবু গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়িতে গোটাকয়েক টান দিল তারপর এসে শ্যামলের কাছাকাছি বসে পড়ল। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গলা নামিয়ে লোকটা বলল, বড়িয়া লড়কী আছে বাবু। বহুত খাবসুরত। কলেজ গার্ল, বিলকুল ফ্রেস।

রাগে বিরক্তিতে শ্যামলের কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। সামান্য চমকও লাগল

ভিতরে ভিতরে। কি ব্যাপার, শালা কি জ্যোতিষী নাকি! মাধুরী ধানবাদে থাকে এই হেতু শ্যামল যে স্ত্রী-সঙ্গ বঞ্চিত এসব ও টের পেয়েছে নিশ্চয়। না হলে, ও হঠাৎ শ্যামলকে নারী মাংসের সম্ভাব্য খদ্দের ভাবল কেন? এই সময় নিজেকে কেমন অপমানিত লাগল শ্যামলের।

—হরকিসিম কা লড়কী হ্যায় বাবু। মাদ্রাজী পাঞ্জাবী বাংগালী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—

লোকটা তখনো সমানে ঘ্যান ঘ্যান করছিল। শ্যামল আর সহ্য করতে পারল না, কড়া গলায় ধমকে উঠল, ভাগো। যাও হিঁয়াসে। আর একটা কথা বলেছ কী আমি পুলিস ডাকব।

থতমত খাওয়া লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে শ্যামল নিজেই উঠে পড়ল। আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। সমস্ত মেজাজটাই নষ্ট করে দিয়েছে লোকটা।

এখান থেকে শ্যামলের ফ্ল্যাটটা বেশি দূরে না। পার্কের গেট বরাবর রাস্তাটা ধরে মিনিট চারেক হাঁটলে তিন কামরা ফ্ল্যাটের তেতলা বাড়িগুলোর ব্লক শুরু। ব্লকের দ্বিতীয় সারির সাত নম্বর বাড়ির দোতলায়

...লের ফ্ল্যাট।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে শ্যামল ...কে। অন্যান্য দিন ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ...কে, আজ একেবারে হাট করে খোলা। ...ঘরে, বারান্দা মতন ছোট খাবার ...আলো জ্বলছে। সাঁ সাঁ আওয়াজ ... ভিতর থেকে, কিচেনে স্টোভ ...রয়েছে কেউ।

...উত্তেজনায় শ্যামলের বুকের ...ধড়াস করে উঠল। তবে কি—

প্রায় দৌড়ে শ্যামল ভেতরে ঢুকল। কী ...র্য। কিচেনে স্টোভের ওপর কী একটা ...চাপিয়ে সেই দিকে চোখ রেখে স্বয়ং ...ধুরী দাঁ...

শ্যামল ...তে চেঁচিয়ে উঠল, আরে ...মি!

মাথা তুলে মাধুরী শ্যামলের দিকে ...খ ফেরাল, ওর মুখ ভার। বলল, জানো ...মি কখন এসেছি? সাতটাও বাজেনি ...খন। সেই থেকে পথ চেয়ে বসে আছি ...আছিই। তোমার পাত্তা নেই। কী কথ ...মি এত রাত অবদি বাইরে বাইরে?

—কী আর করব, পার্কে বসে ছিলাম। ...ড়ি ফিরে তোমাকে পাবো জানলে কি ...রে—

শ্যামল এগিয়ে গিয়ে মাধুরীর কোমরে ...দিয়ে ওকে কাছে টানল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যেতে ...চোখ পাকিয়ে মাধুরী বলল, আঃ, ...হচ্ছে!

—কেন, কেউ তো দেখছে না এখন।

—পরে ঢের সময় পাবে ও সবের, আমি ...তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না। মুখ টিপে ...হেসে স্টোভের ওপর থেকে তরকারির ...কড়াইটা নামাতে নামাতে মাধুরী বলল, ...অনেক রাত হয়েছে, এখন হাত-মুখ ধুয়ে ...খেতে বোসো দিকি।

শ্যামল হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসার পর ওরা একসঙ্গে খেতে বসল। মাধুরীর খাওয়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, ওর খুব খিদে পেয়েছে। পাওয়াই স্বাভাবিক অবশ্য। সেই কখন দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়েছে তারপর এতটা পথ ট্রেন জার্নি। কিন্তু সে জন্যে ওর সারা শরীরের কোথাও কষ্ট বা ক্লান্তির কোনো ছাপ দেখতে পেল না শ্যামল। বরং ওর চোখ দুটো নতুন এক উজ্জ্বলতায় চকচক করছিল, ওর চাহনিতে একটা খুশি ঝিকিয়ে উঠছিল বারংবার। এখন একটা সাধারণ আট-পৌরে শাড়ি মাধুরীর পরনে, সামান্য একটু প্রসাধনও হয়তো সেরে নিয়েছে কখন, কিন্তু ওতেই মাধুরীকে দারুণ লাবণ্যময়, রীতিমতো অ্যাট্রাকটিভ লাগছিল। শ্যামলও নিজের ভিতর এখন আর কোনো অবসাদ টের পাচ্ছিল না, সন্ধ্যায় ঝাঁক বেঁধে পাখিদের ঘরে ফেরার মতন একই রকম সুখে তারও শরীরের প্রতিটি কোষে সতেজ প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসছিল। খাওয়া থামিয়ে এক সময় শ্যামল জিজ্ঞেস করল, তুমি হঠাৎ চলে এলে যে?

—হঠাৎ আবার কি! ইচ্ছে হল চলে এলাম। ক'দিন ধরেই ভীষণ মন কেমন করছিল তোমার জন্যে। মাধুরী সামান্য ...সল।

—বেশ করেছ। আমি তো ভাবতেই পারিনি বাড়ি এসে তোমাকে পাবো।

—কেমন একটা সারপ্রাইজ দিলাম, চোখ নাচিয়ে মাধুরী বলল, ভালো লাগছে না?

—লাগছে না আবার! তবে সারপ্রাইজটা একটু ঘন ঘন হলে আরো ভাল লাগতো।

—তা ঠিক। কিন্তু এই যে অনেক দিন পর পর আমাদের দেখা হয় এরও একটা আলাদা মাধুর্য আছে।

—কি রকম?

—আমরা কেউ পুরোনো একঘেয়ে হয়ে যাইনি, দু' জনেই দু' জনের কাছে এখনও বেশ নতুন-নতুন আছি।

পলকের মধ্যে শ্যামলের বুকের ভিতর সেই পুরনো হাহাকারটা জেগে উঠল। অন্যমনস্ক চোখে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় ও বলল, এমনভাবে চিরদিন নতুন থাকতে ভালো লাগে না আমার। বড়ো একা লাগে, বড়ো কষ্ট হয়।

—আমার বুঝি হয় না! মাধুরীর ঠোঁট কাঁপছিল, হাতও। কাঁপা হাতে ভাত মাখতে মাখতে ও আবার বলল, আমারও পুরনো হয়ে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে, একসঙ্গে ঘর-সংসার করতে সাধ হয়। কিন্তু উপায় তো নেই। কাজেই কেমন বেশ নতুন-টতুন আছি ভেবে সান্ত্বনা খুঁজি।

ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল বোধ হয় তাই প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্যে একেবারে অন্য রকম গলায় ও হঠাৎ বলল, ডিমের ডালনাটা নেবে আর একটু? নাও না, এত কষ্ট করে রাঁধলাম তোমার জন্যে।

খাওয়া-দাওয়ার পর খাটে বসে শ্যামল একটা সিগারেট ধরাল। মাধুরী তখনো বিছানায় আসেনি। ও সারা ঘরময় ঘুরে ঘুরে এটা ওটা নাড়া-চাড়া করে দেখছিল। আয়েস করে সিগারেট টানতে টানতে শ্যামল মাধুরিকে লক্ষ্য করছিল। আলনার ওপর রাখা কাপড় চোপড় ঠিকঠাক করার পর ও টেবিলটা ধরল এতক্ষণে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অধৈর্য গলায় শ্যামল বলল, আর কত রাত করবে, শোবে না?

শ্যামলের কথায় কান না দিয়ে দ্রুত হাতে টেবিলটা গোছ-গাছ করতে করতে মাধুরী বলল, ইস্, ঘর-দোরের কি ছিরি করে রেখেছ তোমরা, সারা রাত ঘাটলেও

শেষ করাতে পারব না। জানো, এ্যাস্ত্রো ধুলো বের করেছি খাটের তলা থেকে। বাইরের লোক দিয়ে কি আর ঠিক ঠিক কাজ হয়!

শ্যামল মুখ বেজার করে বসে রইল। খানিক পরে একটা শিশি তুলে ধরে মাধুরী বলল, নতুন দেখছি, এটা আবার কিসের ওষুধ? —ওটা হচ্ছে ঘুমের বড়ি। একটু রসিকতা জুড়ে দিয়ে শ্যামল পরে আবার বলল, আমার নৈশ-সঙ্গিনী।

উদ্বিগ্ন গলায় মাধুরী শুধোল, রোজ খাও নাকি?

—না। শ্যামল মাথা নাড়ল, যেদিন আর কিছুতেই ঘুম আসে না, মাথা ভীষণ গরম হয়ে যায় শুধু সেদিন খাই।

কী মনে করে কৌতুকের গলায় মাধুরী বলল, দেখো বাবা, মনের দুঃখে আবার সব বড়িগুলো একসঙ্গে খেয়ে ফেল না যেন কোন দিন।

হাল্কা গলায় শ্যামলও পাল্টা কৌতুক করে বলল, খেলেই বা। তোমার আর অসুবিধে কি? তুমি তো আর অবলা নও। রীতিমত লোভনীয় একটা চাকরি রয়েছে তোমার হাতে।

শ্যামলের কথাগুলো নিছক রসিকতা হিসেবে যেন নিতে পারল না মাধুরী, ওর বুকের ভিতরে কোথায় আচমকা ঘা লাগল একটা। মুখ কালো করে মাধুরী বলল, আর যাই কর, চাকরির খোঁটা দিও না। আমি যে এভাবে চাকরি করতে আদৌ চাইনি তা এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে যাওনি নিশ্চয়?

নিশ্চয়ই না। শ্যামল মনে মনে বলল। জীবনে কোনোদিনই সেই সময়কার কথা ভুলতে পারবে না সে। বুবু তখন সবে এক বছরের, সেই সময় কলকাতা অফিস থেকে মাধুরীর ধানবাদে বদলির অর্ডার হল। অফিস থেকে বাড়ী ফেরার পর শ্যামলের হাতে ট্রান্সফারের চিঠিটা গুঁজে দিয়ে মাধুরীর সে কি কান্না! বুবুকে ছেড়ে, শ্যামলকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। অমন চাকরিতে মাধুরীর দরকার নেই। কেঁদে কেটে একসা হয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে রাতে না ঘুমিয়ে মাধুরী শ্যামলকে প্রায় পাগল করে তোলার উপক্রম করেছিল। মাধুরীকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে শ্যামলেরও বুকটা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে তখন নিরুপায়। মাধুরী এখন চাকরি ছেড়ে দিলে আর্থিক অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভাবতেই তার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছিল। ফ্ল্যাটের ভাড়াই দেড়শো টাকা। এ-ছাড়া আছে খাওয়া দাওয়া সংসারের অন্যান্য খরচ। এর পর শ্যামলের ঘাড়ের ওপর তখন মস্ত ব একটি দায় ছিল তার বোন রুমা। ও পাত্রস্থ করতে হবে। রুমা বি-এ প করেছে, ওর গড়ন স্বাস্থ্য মুখশ্রী স ভালো কিন্তু রঙটা ময়লা। সুত ময়লা রঙের উপশম খেসারত দি হবে। সেজন্য ...ক টাকা চাই। টা জোগাড় করতে পারলে তখন ও ময়লা রঙের জন্যে রুমার বিয়ে আটকা না, টাকায় সব ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ হ যায়। কাজেই অনেক সাধাসাধনা ক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাধুরীকে চ ব করার জন্যে রাজী করাতে হয়ে শ্যামলকে। স্পষ্ট মনে আছে মাধুরী শ্যামল বলেছিল, খালি নিজের কষ্টটাই করে দেখো না, আমাদের দিকটাও একবার। অন্তত রুমার কথাটা ভাবো, দেখ ওর জীবনটার কী হবে? টাকা না হ ওর আর বিয়ে হবে না। কথা দিচ্ছি, বিয়েটা হয়ে গেলেই তোমাকে আর চাকরি করতে বলব না।

কী একটা শব্দে, সম্ভবত মাধুরী কোনো কিছু ঠক করে টেবিলের ওপর রাখল এই সময়, শ্যামল বর্তমানে ফিরে এল। মাধুরীর দিকে তাকাতে শ্যামল দেখল, ও এখনো টেবিলটা গোছ-গাছ

করছে। ওর মুখটা ম্লান, চিবুকটা অভিমানে কঠিন।

শ্যামল বিছানা ছেড়ে উঠে মাধুরীর কাছে গেল তারপর আস্তে একখানা হাত ওর পিঠের ওপরে রেখে নরম গলায় বলল, আমি ঠাট্টা করেই কথাগুলো বলেছি। বিশ্বাস করো মাধু, তুমি কষ্ট পাবে জানলে আমি কক্ষনো ওসব বলতে যেতাম না।

মাধুরী কিছু বলল না কিন্তু ওর মুখের ওপর থেকে ছায়াটা সরে যাচ্ছিল। সেটা দেখতে দেখতে শ্যামল বলল, অনেক কাজ করেছ, আর না। বাকিটা কাল হবে। এখন শোবে চলো।

সকালে বেলা অনেকটা গড়িয়ে যাওয়ার পরও শ্যামলের ঘুম ভাঙছিল না। ঘন আঠার মত ঘুমে তার দু' চোখের পাতা বারংবার আটকে যাচ্ছিল, অনেকদিন এমন একটানা ঘুম আসেনি তার চোখে, আরো কিছুক্ষণ ঘুমোবার জন্যে তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু বেশ প্রস্তুত ছিল কিন্তু মাধুরীর ঠেলাঠেলিতে আর বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকা সম্ভব হল না শ্যামলের পক্ষে। গরম এক কাপ চা ওর হাতে তুলে দিয়ে মাধুরী বলল, যদি অফিসে যেতে হয় তাহলে চা খেয়ে চট করে যা হোক কিছু নিয়ে এসো বাজার থেকে। অনেক বেলা হয়ে গেছে, একদম সময় নেই কিন্তু।

মাধুরী চলে যাচ্ছিল, কী মনে হতে শ্যামল ওকে ডাকল। বলল, শোন, তোমাকে আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও। এবারে থাকছ ক' দিন?

—আজ তো বৃহস্পতিবার, বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে আঙুলের কর গুণে মাধুরী বলল, তাহলে শনিবার পর্যন্ত আছি। রোববার সকালে চলে যাব।

মাধুরী যেমন বলেছিল তেমন যা-হোক কিছু বাজার করতে শ্যামলের মন উঠল না। ধানবাদে মাধুরী ওদেরই অফিসের আরো কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে একটা মেস মত করে আছে। ওখানে নিশ্চয়ই ভালো-মন্দ খাওয়া হয় না মাধুরীর, হওয়া সম্ভবও না। তাই ওর মুখ বদলাবার জন্যে একটু বেশি পয়সা খরচ করে ভাল মতনই বাজার করল শ্যামল। খানিকটা সময়ও বেশি লাগল তার। বাড়ি এসে মাধুরীর সামনে বাজার নামিয়ে শ্যামল বলল, একটু দেরি হয়ে গেল কেনাকাটা করতে। তা হোকগে। না হয় অফিসে ঘণ্টাখানেক লেট করব আজ।

দু' রকমের মাছ এনেছিল শ্যামল। পাকা রুইয়ের কয়েকটা পিস আর কিছু পারশে। কেটে কুটে আঁশটাঁশ ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মাছগুলো ঠিকে লোকটাকে দিয়ে মাধুরী প্রায় ঠেস দেওয়ার মতন করে শ্যামলকে বলল, খাওয়ার তো বহর দেখছি খুব। এসব মনেও থাকে বেশ। খালি বাড়ি দেখবার কথাটাই যা ভুলে যাও।

মাধুরীর কথায় অনুযোগ ছিল। থাকাটা অযৌক্তিক কিছু না। রুমার বিয়ে হয়ে গেছে তাও প্রায় ছ' মাসের ওপর হতে চলল অথচ এর মধ্যে শ্যামল একটা বাড়িরও খোঁজ আনতে পারল না। তার অবশ্য সস্তায় বাড়ি চাই। বাড়ি ঠিক না, দুখানা ঘর আর তার সঙ্গে একটু রান্নার জায়গা। পাওয়া খুব মুশকিল, তবু এক-আধটা খবর কখনো সখনো আসছে। কিন্তু তারও যা চড়া রেট আর ঘর দোরের যা ছিরি! দেখে শুনে মন গুটিয়ে আসে। এদিকে মাধুরী কলকাতায় এলেই বাড়ির জন্যে তাগাদা দেয়। রুমার বিয়ে হলেই মাধুরী চাকরি ছেড়ে দেবে আগে এ-রকম কথা ছিল। রুমার বিয়ের পর মাধুরী আর ধানবাদে যাবে না বলে বেঁকেও বসেছিল খুব। আবার এক দফা মাধুরীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সস্তায় বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত ওকে চাকরিটা করতে রাজী করিয়েছে শ্যামল। ও হুট করে চাকরি ছেড়ে দিলে ফ্ল্যাটের দেড়শো টাকা ভাড়া টেনে শ্যামলের একার আয়ে সংসার চালানো যে খুবই কঠিন হবে হিসেব করে দেখানোর পর মাধুরী নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছে।

শ্যামল বিব্রত ভাবে একটু কাশল। যেন কেশে গলাটা সাফ করে নিল তারপর বলল, ভুলব কেন! অনেককে বলে রেখেছি ঘরের কথা। সন্ধানও আছে একটা। দুখানা ঘর, সত্তর টাকা ভাড়া। তবে একটু দোনা-মোনা করছি। খবরটা যে এনেছে, সে-ই বলছে, বাড়িটা নাকি তেমন সুবিধের নয়।

—হুঁ। এই একটি শব্দ ছাড়া মাধুরী আর দ্বিতীয় কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করল না।

সারাটা দিন শ্যামল অফিসে ছটফট করে কাটাল। সময় আর যেন কাটেই না। এমন কি ঘড়িতে মিনিটের কাঁটাটা পর্যন্ত অনড় থাকতে চাইছে এমন মনে হচ্ছিল। ছুটির পর তাড়াহুড়ো ও বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। যে কোনো মুহূর্তে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে এমন বিপজ্জনক ভাবে বাসে ঝুলে আসতেও ওর আজ এতটুকু আটকাল না, বুক কাঁপল না একবার। মাধুরীর সঙ্গ লাভের মুহূর্ত-গুলো ওর কাছে ভীষণ মূল্যবান।

বাড়ি ফিরে শ্যামল দেখল, মাধুরী নেই। মায়ের কাছে শুনল, ও কোথায় বেরিয়েছে। মনে মনে বেশ আহত হল শ্যামল। কোথায় যেতে পারে মাধুরী, ও ভাবল। সিনেমা-টিনেমা কিংবা কোনো বান্ধবীর বাড়ি। কিন্তু শ্যামলের সঙ্গের চাইতেও এসব কি এখন বেশী মূল্যবান হয়ে উঠল মাধুরীর কাছে?

রাত আটটা নাগাদ মাধুরী ফিরল। কোলের কাছে বুবুকে নিয়ে শ্যামল ওকে আদর করছিল তখন।

মাধুরীর হাতে [illegible] মতন গোটা দুই প্যাকেট ছিল। সেগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ও শ্যামলকে বলল, বাব্বাঃ, কী ভিড় ট্রামে-বাসে আর কী জ্যাম বিকেল

থেকে! আমার দেরি হচ্ছে দেখে রাগ করোনি তো?

মাধুরীর কথার উত্তরে শ্যামল কিছু বলল না। একটু পরে বুবুকে মাধুরীর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, যাও বাবা, মা এসেছে, মায়ের কাছে যাও এবার।

বুবু কিন্তু গেল না, শ্যামলের কোল ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রইল। লেডিজব্যাগ থেকে চকোলেট বের করে মাধুরী বুবুর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, এস মানিক আমার, সোনা আমার।

বুবু চকোলেটটা হাতে নিল। মাধুরী ওকে কোলে তুলে নিয়ে ওর গালে মুখে চুমু খেতে খেতে বলল, আচ্ছা সোনা, তুমি কাকে বেশী ভালবাসো? আমাকে না তোমার বাবাকে?

বুবু চকোলেট খাওয়ায় মন দিয়েছিল। মুখ থেকে চকোলেটটা নামিয়ে ও শ্যামলের দিকে চেয়ে অবলীলায় বলল, বাবাকে।

—কেন? আমি কী খারাপ, আমি যে তোমাকে চকোলেট দিলাম?

—তুমি তো একদিন, আদুরে গলায় বুবু বলল, বাবা তো রোজ রোজ দেয়।

মাধুরী হেসে ফেলল। পরে কী ভেবে

বিষণ্ণ গলায় শ্যামলকে বলল, দেখেছ, বুবু ও কেমন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দিন দিন।

মাধুরীর বিষণ্ণতা শ্যামলকেও স্পর্শ করল। এই মুহূর্তে মাধুরীর জন্যে মমতা অনুভব করল ও। কথাটা ঠিক। বুবু শ্যামলকে যতটা চেনে, আপনার ভাবে মাধুরীকে ততটা না। তেমন একটা কৌতূহল ছিল না, তবু প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যে মাধুরীর আনা প্যাকেটগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে শ্যামল বলল, ওগুলো কী?

—আমার জন্যে দুখানা শাড়ি আর, প্যাকেটগুলো নিয়ে মাধুরী শ্যামলের কাছে এগিয়ে এল, তোমার জন্যে একটা প্যান্টের পিস, টেরিনের। অলিভ গ্রীন রংটা তো তোমার ভীষণ পছন্দ, তাই না?

—অনেক প্যান্ট রয়েছে আমার, শ্যামলের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি, ফের এতগুলো টাকা খরচ করে প্যান্টের কাপড় কেনবার কী দরকার ছিল?

—কী করব, এমন পছন্দ হয়ে গেল পিসটা। লোভ সামলাতে পারলাম না, কিনে ফেললাম।

—এখন কোথায় একটু সমঝে চলবে তা না, শ্যামল গজগজ করতে লাগল, দু হাতে টাকা ওড়াতে শুরু করে দিয়েছ। চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে ভেবেও তো দুটো পয়সা হাতে রাখা দরকার।

—হুঁ, তাচ্ছিল্য এবং অবিশ্বাসের গলায় মাধুরী বলল, আমার আর চাকরি ছাড়া হয়েছে!

—কেন, ঘর-টর পেলেই—

—থাম, মাধুরী যেন ধমক দিল, তোমার মুরোদ আমি বুঝে গেছি। ওসব স্তোক-বাক্য ছেড়ে দিয়ে এক কাজ করো বরং। তুমি, বুবু, মা—তোমরা সবাই ধানবাদে চলো। সেখানে আমি চাইলে কোয়ার্টার্সও পাবো।

—আর আমার চাকরিটা?

—ছেড়ে দেবে। নির্দ্বিধায় মাধুরী বলল।

বসে-যাওয়া গলায় শ্যামল বলল, ছেড়ে দেব?

—হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে। একই তো কথা, তীক্ষ্ন শরের মতো কথাগুলো দিয়ে শ্যামলের হৃদপিণ্ড বিদ্ধ করতে করতে মাধুরী বলল, শুধু আমার বদলে তোমারটা। ভেবে দেখলে তোমারটা ছাড়াই বুদ্ধিমানের কাজ, আমার চাকরিতে মাইনেটা অনেক বেশী।

ঘোলাটে চোখে হতভম্বের মত শ্যামল মাধুরীর দিকে চেয়ে রইল। মাধুরী যে এত নিষ্ঠুরভাবে কথা বলতে পারে এ যেন শ্যামলের জানা ছিল না। ইদানীং মাধুরী অবশ্য একটু অন্যরকম হয়ে উঠছে, শ্যামলকে ঠেস দিয়ে কথা বলার অভ্যেসটাও বেশ বেড়ে গেছে ওর কিন্তু তা বলে মাইনের তুলনামূলক প্রসঙ্গ তুলে ও কোনো দিন শ্যামলকে খোঁচা দিতে পারে এ যেন শ্যামলের ধারণার অতীত ছিল। আজ এই মুহূর্তে বছরখানেক আগেকার একটা ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। শ্যামলের কেমন মনে হয় আজকের মাধুরী আর সেই ছবির মাধুরী যেন এক না। ওই ছবিটার সঙ্গে এখনকার মাধুরীর কোনো সঙ্গতি নেই, কোনো মিল নেই। মাধুরী ছিল আপার ডিভিসন ক্লার্ক, বছরখানেক আগে ও প্রোমোশন পেয়ে অফিস-অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়। প্রায় একশো টাকার মত মাইনে বেড়ে যায় ওর। সেই প্রোমোশনের খবরটা শ্যামলকে দেবার সময় ও কেঁদে ফেলেছিল। ওর কান্না দেখে স্তম্ভিত শ্যামল অবাক গলায় বলেছিল, এ কি, আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি নে। লোকে প্রোমোশন পেলে খুশি হয়, আনন্দ করে। আর তুমি উল্টে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে?

কান্না-ভেজা গলায় মাধুরী বলেছে, প্রোমোশন! ছাই বোঝো তুমি। এ যে আমার কী সর্বনাশ হল সে আমিই জানি।

—কী যে হেঁয়ালি করো বুঝি না। এর মধ্যে আবার সর্বনাশ কোথায় দেখলে তুমি? সামান্য বিরক্তির সঙ্গে শ্যামল বলল।

—সর্বনাশ না! এতগুলো টাকা মাইনে বাড়ল আমার, সেই লোভ কি তুমি সামলাতে পারবে? আর কি তুমি চাকরি-ছাড়তে দেবে আমায়?

সেই মাধুরী আজ ভিন্ন সুরে কথা বলছে, নিজের চাকরির গুরুত্ব জাহির করছে জোর গলায়।

ক্ষুব্ধ শ্যামল উঠে পড়ল। বারান্দায় গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মুখ ভার করে।

খানিকক্ষণ পর পিঠে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে মুখ ফিরিয়ে শ্যামল দেখল। মাধুরী।

বারান্দায় অল্প পাওয়ারের লাইট ছিল, সেই আলোয় শ্যামল লক্ষ করল, মাধুরীর চোখে জল। ধরা গলায় মাধুরী বলল, রাগ করো না। আমি তোমাকে সত্যি সত্যি চাকরি ছাড়তে বলিনি। ও সব আমার মনের কথা নয়। আসলে ঘর-দর দেখছ না বলে আমি ভীষণ রেগে আছি তোমার ওপর।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে কী ভেবে শ্যামল বলল, ঠিক আছে। সকালে যে দুখানা ঘরের কথা বলছিলাম সেটা এখনো হাতে রয়েছে। ওটাই দেখা যাক তবে। কাল দুপুরের পর রেডি থেকো। বাড়িতে জরুরী দরকার আছে বলে আমি না হয় একটু সকাল-সকাল বেরিয়ে আসব অফিস থেকে।

পরদিন বিকেলের একটু আগে ওরা বাসা দেখতে গেল। উল্টোডাঙায় একটা পুরোনো গলির মধ্যে বাড়িটা। ঘর-টর দেখে-শুনে ওদের বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বড় রাস্তায় এসে শ্যামল মাধুরীকে জিজ্ঞেস করল, কী রকম দেখলে?

—মন্দ কি! থাকা চলে।

—কলতলাটা দেখেছ, শ্যামল নাক কুঁচকে বলল, কী নোংরা, কী গন্ধ! শ্যামলের কথায় তেমন আমল দিল না মাধুরী, বলল, ভাড়াটে বাড়িতে অমন এক-আধটু হয়ই।

—তারপর ঘরগুলোও বাজে। কেমন চাপা, অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে।

—অত দেখলে চলে না, কম টাকায় এর চেয়ে ভালো বাড়ি আবার হয় না কি!

মাধুরীর কথাবার্তা শুনে শ্যামল বুঝল, এই বাড়িটা নিতে ওর বিশেষ আপত্তি নেই। অথচ শ্যামলের বাড়িটা তেমন পছন্দ হয়নি। শুধু যে ঘরগুলো অস্বাস্থ্য-কর এবং শ্রীহীন তা নয়, বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের হাব-ভাবও যেন কেমন কেমন। পরিবেশটা আদৌ ভদ্রগোছের না। চট করে এমন বাড়িটা মাধুরীর পছন্দ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও বেশ সন্দেহজনক। বরাবরই মাধুরী একটু ভাল পরিবেশে সাজিয়ে গুছিয়ে থাকতে চায়। একরকম মাধুরীর তাড়াতেই বেনিয়াপুকুরের ভাড়াটে বাড়ি থেকে শ্যামলরা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল। কাজেই শ্যামলের ধারণা, এ-বাড়িটা মাধুরীর পছন্দ হয়ে যাওয়ার পিছনে জেদ যতটা, মনের ইচ্ছে ততটা নয়।

—কী ঠিক করলে, নেবে বাড়িটা? চলতে চলতে মাধুরী শুধলো একসময়।

—দেখি। একটু ভাবতে দাও আমাকে।

পরদিন অফিসে এসে শ্যামল কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারছিল না। অনুগামী ছায়ার মতো চিন্তাটা এখানে পর্যন্ত ধাওয়া করেছে তাকে। বাসাটা শ্যামলের আদৌ পছন্দ হয়নি কিন্তু সরাসরি সেকথা মাধুরীকে বলতে শ্যামলের বাধছে। অপছন্দ হওয়ার যুক্তিগুলো কতখানি জোরালো সে বিষয়ে শ্যামল নিজেও সন্দিহান। এক্ষেত্রে বাসা নেওয়ার প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলে মাধুরী অন্যভাবেও নিতে পারে সেটা। ওর এখন যা মনের অবস্থা, ও হয়তো ভাববে, মাধুরী চাকরি ছেড়ে ঘর-সংসার করুক শ্যামল আসলে সেইটাই চায় না।

আজ শনিবার। হাফ-ডে অফিস। একটা লঘু খুশির মেজাজ সারা অফিসময়। এই পরিবেশে শ্যামলের নিজেকে কেমন খাপ-ছাড়া, বে-মানান লাগছিল। বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে নিজের চেয়ারে ও বসে রইল চুপচাপ।

অনেকক্ষণ থেকে ওর ডানদিকের সীটে বসে সহকর্মী পরমেশ চ্যাটার্জি শ্যামলকে লক্ষ্য করছিল। এক সময় ও হঠাৎ বলে উঠল, সরকারদা কী অত ভাবছেন?

ওদের মুখোমুখি টেবিলে বসে অঞ্জন মিত্র। হালে এই অফিসে ঢুকেছে, ছোকরা বয়েস। লঘু গলায় ও বলল, বউদি, সেরেফ বউদির কথা ভাবছেন শ্যামলদা। এছাড়া শ্যামলদার আর ভাবনাটা কী? দুজনে মিলে রোজগার করছেন, মোটা একটা অ্যামাউণ্ট হাতে, আসছে ফি মাসে।

অঞ্জনের কথায় আবার নতুন করে টের পেল শ্যামল, অফিসশুদ্ধ সবাই ওকে ঈর্ষা করে। ওরা স্বামী-স্ত্রী রোজগার করে, মাস গেলেই অনেকগুলো টাকা ওদের হাতে আসে এইজন্যে।

অন্য অন্য সময় এ ধরনের কথাবার্তা উঠলে শ্যামল যা করে এখনও তাই করল। এক টুকরো আলগা হাসি ঝুলিয়ে দিল ঠোঁটের ওপর।

সাড়ে বারটা নাগাদ শ্যামল এক কাপ চা খেতে ক্যাণ্টিনের দিকে যাবে ভাবছিল এমন সময় টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল নির্মল চক্রবর্তী। নিষ্কর্মা টাইপের লোক। অফিসের সকলের কাছেই একটি উপদ্রব বিশেষ। সমানে বকতে পারে লোকটা, একবার শুরু করলে আর সহজে থামে না।

নিজে থেকেই সামনের চেয়ারখানা টেনে বসে পড়ে নির্মল বলল, শুনেছেন তো দাদা—

ভাবলেশহীন মুখে শ্যামল একবার নির্মলকে দেখল, কোনোরকম আগ্রহ

দেখাল না। কিন্তু তাতে নির্মলের কিছু আসে যায় না, গুরুগম্ভীর ঢঙে যতটা সম্ভব উদ্দীপনতা গলায় মিশিয়ে ও বলল, সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

অসহ্য বিরক্তিতে শ্যামলের ভেতরটা জ্বলে গেল। একে আজ তার মন-মেজাজ এমনিতেই ভাল নেই, চিন্তায় কষ্টে তার কপালের পাশে রগ দুটো সেই কখন থেকে টিপটিপ করছে, তার উপর এই উৎপাত। অসহায় রাগে মনে মনে নির্মলের মুন্ডুপাত করল ও। তোর অত কী, তুই একা ব্যাচেলর মানুষ মেসে থাকিস, পরিবারের দায় দায়িত্ব বলতে তো কিছু নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবত ভাবনা তুই ভাবগে যা। সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটলে আমার কী?

নির্লিপ্তভাবে শ্যামল বলল, ঘটুক গে।

—বলেন কী? এই বিস্ফোরণের পরিণাম সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনার তো সায়েন্স ছিল।

—ছিল। কিন্তু এখন আর ওসবে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। উঠে দাঁড়িয়ে শ্যামল বলল, চা খেতে ক্যান্টিনে যাচ্ছি। আপাতত ওখানে কোনো বিস্ফোরণ ঘটে না থাকলেই আমি খুশি।

ক্যান্টিন দোতলায়। নামবার সময় তেতলায় সিঁড়ির মুখে সুবিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা। ওপরে উঠে হাঁপাচ্ছিলেন, টেনে টেনে বললেন এই যে ভাই শ্যামল তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। শ্যামল মুখ গোমড়া করল, গলা ভারী করে বলল, তা আসুন। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি টাকা-কাকা চাইবেন না। দিতে পারব না।

—কিন্তু আমার যে না চেয়ে উপায় নেই শ্যামল!

মুখের ভাব আগের মতই শক্ত রেখে শ্যামল বলল, এখনো তিরিশ টাকা পাই আপনার কাছে।

সে কথা ঠিক। তবু আর একবার হাত পাতছি ভাই তোমার কাছে। তবে এই শেষবার, ধরা গলায় সুবিনয়বাবু বললেন, ও আর বাঁচবে না। আর আমার টাকা চাইবার দরকারও হবে না তোমার কাছে।

আজ অনেক দিন ধরে সুবিনয়বাবুর স্ত্রী অসুস্থ। অসুখ মাত্রেই দুঃখজনক, কিন্তু ওঁর স্ত্রীর অসুখের নেপথ্য ইতিহাসটা বড়ো বেশি করুণ বড়ো বেশি মর্মান্তিক। অনেকগুলি পোষ্য নিয়ে সুবিনয়বাবুর সংসার, ওঁর একার আয়ে খরচ কুলিয়ে ওঠা দায়। সুবিনয়বাবুর আর্থিক ভার লাঘব করতে এগিয়ে এলেন ওঁর স্ত্রী। চাকরি-বাকরি জোটাতে পারলেন না, সেলাই কল চালিয়ে উপার্জনে নামলেন। কিন্তু হাড় ভাঙা খাটুনি সহ্য করতে পারলেন না বেশি দিন। বুকে পিঠে প্রথমে ব্যথা পরে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল। স্ত্রীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন সুবিনয়বাবু। এক্স-রে হল, ইলেকট্রো কার্ডিয়োগ্রাম হল। ধরা পড়ল, হার্টের অসুখ হয়েছে সুবিনয়বাবুর স্ত্রীর। সেই থেকে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে এতদিন। সুবিনয়বাবুর কথা শুনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওঁর স্ত্রী আর বাঁচবেন না। সব শেষ তাহলে এইবার।

সুবিনয়বাবুর দুঃখে শ্যামলের মনটা সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে এল। পকেট হাতড়ে দশ টাকার দুখানা নোট বের করে ওঁর হাতে দিয়ে শ্যামল বলল, নিন। এর বেশি আমার কাছে নেই এখন।

নিঃশব্দে টাকাটা হাতে নিলেন সুবিনয়বাবু তারপর চোখ তুলে শ্যামলকে একবার দেখলেন। কী সেই দৃষ্টি! যেন শুধু দেখলেন না, দুটো কৃতার্থ করুণ চোখ শ্যামলের বুকের ভেতর গেঁথে দিলেন চিরকালের মতো।

ছুটির পর বাড়ি ফিরল শ্যামল। উদাস অন্যমনস্কের মতো। শোবার ঘরে ঢুকে দেখল মাধুরী শাড়ি ভাঁজ করছে। খাটের ওপর ফাইবারের স্যুটকেসটা খোলা।

শ্যামলকে দেখে মাধুরী অল্প একটু হাসল তারপর বলল, সব গোছ-গাছ সেরে রাখছি, সকালে উঠে এসব ঝামেলা ভালো লাগে না। তা বাড়িটার কি করবে, নিচ্ছ না নিশ্চয়?

—না না। ওটা থাক। অন্য আরো দু'একটা দেখি।

—দেখতে পারো, তবে পছন্দ হবে না কোনোটাই আমি জানি, নিষ্কম্প গলায় যেন কোনো অমোঘ সত্য ঘোষণা করতে লাগল মাধুরী, আসলে আমরা ভীষণ লোভী হয়ে উঠেছি, মাস গেলে এতগুলো টাকার লোভ সামলানো তো আর সহজ না সুতরাং এইভাবেই হয়তো চলতে হবে আমাদের।

শুধু কি লোভ? শ্যামল কথাগুলো মনে মনে নেড়ে চেড়ে দেখল। না, শুধু লোভ না, ভয়ও আছে। অভাবের ভয়, অসচ্ছলতার ভয়। সুবিনয়বাবুর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। একার আয়ে সংসার চলছিল না ওঁর। সেলাইকল চালিয়ে ওঁর স্ত্রী ওঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু কী পরিণাম! উদয়াস্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল ওঁর স্ত্রীর। হার্টের অসুখ হল। তারপর ভিখিরির মতো সুবিনয়বাবুর শ্যামলের কাছে হাত পাতা। আর কী অদ্ভুত সুবিনয়বাবুর চোখের সেই দৃষ্টিটা! যেন বুকের ভেতর থেকে সেই কৃতার্থ করুণ চোখ দুটো এখনো শ্যামলকে দেখছে।

অনেকটা সময় চুপচাপ কেটে গেল। ভাঁজ করা শাড়িগুলো স্যুটকেসে রাখতে রাখতে এক সময় মাধুরী বলল, জানো আজকাল আমারও তোমার মতন হয়। ঘুমোতে পারি না। তোমার কথা, বুবুর কথা ভেবে প্রায়ই সারা রাত ছটফট করি।

শ্যামলের হৃদপিণ্ডে একটা মোচড় দিল যেন কেউ। অসহায়ের মতো করুণ চোখে ও মাধুরীকে দেখল একবার। তারপর কী মনে হতে শ্যামল যন্ত্রচালিতের মত টেবিলের ওপর থেকে ঘুমের ওষুধের শিশিটা নিয়ে মাধুরীর দিকে বাড়িয়ে ধরল, এটা রাখো তোমার কাছে। মাঝে মাঝে একদিন খেয়ে ঘুমিয়ে নিয়ো একটু।

শিশিটা নিতে মাধুরী একটুও আপত্তি করল না, স্যুটকেসে একটা ভালমতন জায়গা দেখে রেখে দিল।

পরদিন সকালে মাধুরীকে ট্রেনে তুলে দিতে গেল শ্যামল। ট্যাক্সিতে স্টেশন অবধি সারাটা রাস্তা মাধুরী একটাও কথা বলল না, মুখ ভার করে রইল। যাওয়ার সময় প্রতিবারই ও এরকম করে।

গাড়িতে উঠে জানলার পাশে বসতে পেয়েছিল মাধুরী। ওর মুখের কাছেই প্ল্যাটফরমের ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল শ্যামল। নির্ধারিত সময়ে সিগন্যালের লাল আলোটা নীল হয়ে গেল আর ঠিক তখনই কাঁপা-কাঁপা গলায় মাধুরী বলে উঠল, আমার আর সহ্য হয় না এরকম। তুমি দেখো, একদিন আমি সব ঘুমের বড়িগুলো এক সঙ্গে খেয়ে ফেলব।

শ্যামল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

স্টেশনের গেটের দিকে এগোতে এগোতে শ্যামল মাধুরীর কথাগুলো ভাবল। ও কি সত্যি সত্যিই একদিন ঘুমের ট্যাবলেটগুলো এক সঙ্গে খেয়ে ফেলবে না কি?

খানিক বাদে কী মনে হতে আপন মনেই হাসল শ্যামল। ধুস পাগলের মত এসব ছাইপাঁশ কি ভাবছে সে। মাধুরী নিশ্চয় ওরকম করবে না। শ্যামল নিজেও তো মাধুরীর মতো একই যন্ত্রণার শরীর। কিন্তু কই, শ্যামল তো কোনদিন একসঙ্গে ঘুমের বড়িগুলো খাওয়ার কথা ভাবেনি। সে বা মাধুরী কেউই এখন আর অত সেন্টিমেন্টাল আছে না কি?

স্টেশনের বাইরে এসে একটা চেনা দোকান থেকে এক শিশি ঘুমের ওষুধ কিনল শ্যামল। এইটেই এখন সবচেয়ে জরুরী তার কাছে। মাধুরীর কথা ভেবে আজ নিশ্চিত তার ঘুম আসবে না। অথচ তার ঘুমোনো দরকার। কাল আবার অফিস আছে।

এবার রোগ সারাতে জ্বর

নানা রকম ওষুধ বা অনুপানের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু তথাকথিত ওষুধ বা অনুপান ছাড়াই শুধু কৃত্রিম উপায়ে জ্বর সৃষ্টি করেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ কাজটি সহজতর করা যেতে পারে। এবং বিনা ঝুঁকিতে। সাম্প্রতিক এই দাবি ফ্রাইবুর্গে অবস্থিত ম্যাকস প্লাঙ্ক ইনসটিটিউট ফর ইম্যুনলজির কয়েকজন বিজ্ঞানীর।

আমরা জানি, দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলেই চিকিৎসকরা বলে থাকেন, আপনার জ্বর হয়েছে। একটু সাবধানে থাকবেন। কিন্তু অনেকেই জানেন, জ্বর কিন্তু আসলে রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই যদি হয়, রোগ ছাড়াই এই উপসর্গটি আপনারা তৈরি করবেন কি করে?

ওঁদের বক্তব্য, টাইফাস এবং কোলি ব্যাকটেরিয়া থেকে আমরা এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ সংগ্রহ করেছি। বস্তুটি ব্যাকটেরিয়ার গায়ের ওপর লেগে থাকে। কারোর শরীরে ওই সব ব্যাকটেরিয়া সংক্রামিত হলে তাদের গা থেকে ওই বস্তুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মেশে তার রক্তে। আর তার পরই তার দৈহিক তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ওই বস্তুই মানুষের জ্বর সৃষ্টি করার ব্যাপারে যথেষ্ট।

অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। কারণ পদ্ধতিটি পুরনো। প্রথম শতাব্দীর শেষে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ায় এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানী এবং এফেসাসের অধিবাসী রিউফাস। তাঁর ধারণা ছিল, যে সব রোগে জ্বর হয় না, যেমন মৃগী, খিঁচুনি, হাঁপানি প্রভৃতি সেইগুলি কৃত্রিম উপায়ে জ্বর সৃষ্টি করে নিরাময় করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় মানুষের দেহে কৃত্রিম উপায়ে জ্বর সৃষ্টি করে রোগ নিরাময়ের প্রথম নজির স্থাপন করেছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক। নাম জুলিয়াস ভেগনার-জারেগ। শোনা যায়, কখনও কখনও রোগীদের শরীরে ইনজেকশনের সাহায্যে তিনি টাইফাস এবং ম্যালেরিয়ার মৃত-জীবাণু ঢুকিয়ে দিতেন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে তিনি সিফিলিস, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ সারিয়ে তুলতে সমর্থ হন। এ-ছাড়া কোন কোন মানসিক রোগও।

ওই একই সময়ে নিউ-ইয়র্ক শহরের অার একজন ডাক্তার, নাম উইলিয়াম বি কোলে, মৃত ব্যাকটেরিয়া ইনজেকশন করে টিউমার (ক্যানসার?) সারিয়ে তোলেন। এবং সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, ডাঃ কোলে লক্ষ্য করেন, মৃত ব্যাকটেরিয়া রোগীর শরীরে ঢোকার পরই তার দৈহিক তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। আর এই তাপমাত্রা যত বেশি বাড়ে, রোগের উপশম ঘটে তুলনায় অনেক বেশি।

বলতে বাধা নেই, কৃত্রিম উপায়ে এইভাবে জ্বর ঘটিয়ে চিকিৎসকরা এক সময় নানা রকম রোগের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু পরে, বলা যেতে পারে বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই, পেনিসেলিন, কর্টিসোন প্রভৃতি অ্যান্টি-বাইওটিক ওষুধের চল হওয়ার পর এই 'জ্বরে চিকিৎসা' পদ্ধতিটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়।

প্রশ্ন, তা যদি হয়, তাহলে নতুন করে এই 'জ্বর চিকিৎসা'র কথা আপনারা কেন ভাবছেন? অন্তত অ্যান্টিবাইওটিকস যখন প্রায় 'সর্বরোগহরণ' মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন?

ম্যাকস প্লাঙ্ক ইনসটিটিউট-এর বিজ্ঞানীদের উত্তর : অ্যান্টিবাইওটিকস পৃথিবীর তাবৎ চিকিৎসককে দুটি কারণে চিন্তিত করে তুলেছে। একই শরীরে বার বার অ্যান্টিবাইওটিক প্রয়োগ করলে শেষ পর্যন্ত ওই শরীরেই অ্যান্টিবাইওটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে, রোগ সারিয়ে তুলতে এ ধরনের ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হয় অনেক বেশি। আর যেই অ্যান্টিবাওটিকের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন, মূল রোগটির হয়ত তার ফলে নিরাময় ঘটতে পারে, কিন্তু তার সাথে সাথে রোগী-দের মধ্যে নানা রকম বিরূপ উপসর্গও দেখা দেয়। অনেক সময় এ সবের দরুন

এক নজরে

জীবাণুর আক্রমণ মনুষ্যেতর প্রাণীদের আচরণ কিভাবে পাল্টে দেয়, ছবিতে দেখান হল। একটি বাক্সের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে মরুভূমির পরিবেশ। বাক্সের মধ্যে ঝোলানো বৈদ্যুতিক বাল্ব। বাল্বের আলো যেখানে পড়েছে সেখানকার তাপমাত্রা প্রায় ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। বাক্সের মধ্যে প্রথমে দুটি গিরগিটি নেয়া হয়। তারপর একটির শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয় রোগ জীবাণু। অপরটিকে স্বাভাবিকভাবে রেখে দেয়া হয়। জীবাণুর আক্রমণে যে গিরগিটিটির দৈহিক তাপমাত্রা বাড়ে সে সরে গিয়ে দাঁড়ায় জ্বলন্ত বাল্বের নিচে। কিন্তু অপরটির দেহ সুস্থ থাকায় তার আর বাল্বের উত্তাপের প্রয়োজন হয় না। যাঁরা ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন এই দৃশ্যটি হয়ত তাঁদের পুরনো দিনের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দেবে। হি হি জ্বরে তখন মধ্যাহ্নের মাথাফাটা রোদ কি মিষ্টিই না লাগত?

রোগীর জ্বরের চেয়ে কষ্টই হয় বেশি। এ-সব কথা ভেবেই তথাকথিত ওষুধ প্রয়োগ না করে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রেখে, অথবা তার উন্নতি ঘটিয়ে রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি না, পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীরা তার উপায় অনুসন্ধানে এখন মাথা ঘামাচ্ছেন। আমাদের ধারণা, 'জ্বর চিকিৎসা' পদ্ধতি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

*

বলা প্রয়োজন, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক দায়িত্ব যার ওপর ন্যস্ত তার নাম হাইপোথ্যালামাস। এটি মস্তিষ্কেরই একটি অংশ। আমাদের চারপাশের পরিবেশে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালামাস তৎপর হয়ে ওঠে। স্নায়ুর মাধ্যমে সে তখন সংকেত পাঠায় শরীরের ঘাম উৎপাদনকারী গ্রন্থিদের। শরীর তখন ঘামতে থাকে। বাইরের তাপমাত্রায় ঘাম বাষ্পীভূত হয়। ফলে শরীরের তাপমাত্রা কমে গিয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা দূর হয়। এ ছাড়াও ওই সময় হাইপোথ্যালামাস বিপাকীয় কাজকর্মকেও খানিকটা নিয়ন্ত্রণ

করে। যাতে করে বিপাকীয় পদ্ধতিতে শরীরে না বেশি পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয়ে দৈহিক তাপমাত্রায় হেরফের ঘটায়। খানিকটা অজ্ঞাতসারে অথবা অভ্যাসবশত তখন আমরা ছায়াশীতল কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়ারও চেষ্টা করি। এতেও বাইরে থেকে দৈহিক তাপমাত্রা বাড়ানোর ব্যাপারটা অনেকটা কমে।

শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ঠান্ডা পরিবেশে ঘটনাটি ঘটে ঠিক উল্টো। হাইপোথ্যালামাসের সংকেতে তখন ঘাম হয় কম। ফলে বাষ্পীভবনের দরুন দৈহিক তাপমাত্রা তত বেশি কমতে পারে না। বিপাকীয় যন্ত্রাবলী আরও সচল হয়ে শরীরে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হয়। আর অভ্যাসবশত তখন আমরা আশ্রয় খুঁজি উষ্ণতর কোন পরিবেশে।

তবে জ্বরের ব্যাপারটা অন্যরকম। এ ক্ষেত্রে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে প্রথমে। রক্তের শ্বেতকণিকা ওই ব্যাকটেরিয়াদের গ্রাস করে। ব্যাকটেরিয়ার গায়ে থাকে এক ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ। এই যৌগের প্রভাবে শ্বেতকণিকাদের দেহ থেকে নির্গত হয় এক ধরনের প্রোটিন যৌগ। যাদের বলা হয় পাইরোজেন বা জ্বর সৃষ্টিকারী বস্তু। এই বস্তুই রক্তের সঙ্গে মিশে বাহিত হয় হাইপোথ্যালামাসে। হাইপোথ্যালামাস উদ্দীপ্ত হয়ে তখন শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

সম্প্রতি কোন কোন বিজ্ঞানী এ কথাও বলছেন, জ্বরসৃষ্টিকারী ওই বস্তু নাকি বিশেষ এক ধরনের বস্তু উৎপাদনে সাহায্য করে। যাদের বলা হয়, প্রোস্টাগ্ল্যানডিনস। এই প্রোস্টাগ্ল্যানডিনই নাকি হাইপোথ্যালামাসকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে।

অবশ্য কেউ কেউ এমন প্রশ্নও তুলেছেন. জ্বর কমানোর জন্যে যে নানা রকম ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে. যেমন অ্যাসপিরিনের কথাই ধরুন, শরীরে এদের ভূমিকা কি রকম?

এর উত্তরে বলা হচ্ছে, অ্যাসপিরিনের কাজ শরীরে, (এখানে মস্তিষ্কে) প্রোস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া। এর ফলে হাইপোথ্যালামাসের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সেই সঙ্গে দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়।

*

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা আরও একটু বিশদ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলছেন, জ্বর সৃষ্টির পেছনে কাজ করে নানা রকম সামগ্রী। রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড বা আর এন এ (R N A) কোন কোন হরমোন, অ্যালকলয়েড প্রভৃতি। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা যেন অনেক বেশী

আপনারা কি বলেন?

কলকাতার লোক এবার সি এম ডি এ-র ওপর আরও চটে যাবেন। কথাতেই তো বলে 'পেটে ভাত নেই, রাজকন্যাকে বিয়ে করার শখ'—কলকাতার যা অবস্থা তাতে আবার 'কালচার', তার আবার 'বিউটি' তার আবার সাজানো। কিন্তু না সাজালেও তো চলছে না। কারণ এখানে এত শিল্পী আছেন, এত স্থপতি আছেন, ভাস্কর আছেন, আর শিল্পরসিকের সংখ্যাও তো কম নয়। বরং বেশী। তবু শহরটার একটা বদনাম আছে। এখানে লোক নাকি সৌন্দর্য ভালবাসে। খালি পেটে কবিতা লেখে, ডাস্টবিনে ফুলের গন্ধ পায় আর শিল্পীর হাত নিশপিস করে শহীদ মিনারকে রাঙিয়ে দিতে, হাওড়া ব্রীজের ওপর দৈত্য দাঁড় করাতে। কলকাতাকে সুন্দর করতে হলে এঁদের দরকার।

আসল কথায় আসি। আমরা ঠিক করেছি যে, ডিসেম্বর মাস নাগাদ একটা ভাস্কর্য প্রদর্শনী করব। ভাস্কররা সেখানে নিজেদের সৃষ্টির নমুনা রাখবেন, শিল্পরসিকরা কয়েক দণ্ড তাকাবেন, আর সম্ভব হলে, সি এম ডি এ বা অন্যরা পরে কিছু ভাস্কর্যের নমুনা সংগ্রহও করতে পারেন। নবীন, প্রবীণ সব শিল্পীকেই আহ্বান জানানো হচ্ছে, সি এম ডি এ-র জনসংযোগ (পাবলিক রিলেশন) দফতর থেকে নিয়মাবলী সংগ্রহ করুন।

একটা প্রশ্ন করবো? এ ব্যাপারে আর কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা আর কারও কি কোন দায়িত্ব নেই? তাঁরা একটু শহরটার সৌন্দর্যের দিকে নজর দিতে পারেন না?

* * * *

আর একটা কাজ সি এম ডি এ করতে যাচ্ছে—সেটা শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়, শহরটার বাঁচবার তাগিদে। সেই বহু বিতর্কিত 'হকার', যাঁরা রাস্তা অবরোধ করে আছেন তাদের সমস্যা। থানা থেকে ফর্ম বিলি করার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, অন্ততঃ দশটি জায়গায় বাজার তৈরির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। যাঁরা 'সত্যিকারের' হকার, তাঁদের আস্তে আস্তে সেই সব বাজারে সরে যেতে হবে। অনেক দিক ভেবে, অনেক চিন্তা করে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

এটা ঠিক যে, কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগে বাজার না বাড়ার জন্য যত্র তত্র সর্বত্র বেচাকেনা চলছে। কিন্তু এভাবে কদিন চলবে? অনেক জায়গায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না, গাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা। অস্বাস্থ্যকর, বিশ্রী পরিবেশ, দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কতদিন থেকেই তো শোনা যাচ্ছে, একটা কিছু করা দরকার। সেই 'একটা' কিছু এবার হচ্ছে রাজ্য সরকার, সি এম ডি এ, কলকাতা কর্পোরেশন আর পুলিশের যৌথ চেষ্টায়।

একটা জিনিস বুঝে দেখুন—এত বড় শহরে, যেখানে লোক এত বেশী, গাড়ি এত বেশী, রাস্তা এত কম, সেখানে অরাজক কেনা-বেচা আর কতদিন চলবে? আজ হোক কাল হোক, এটা বন্ধ করতেই হবে। আর যদি সত্যিকারের হকার আর জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে গড়ে উঠবে নিয়মিত বাজার। প্রথম অবস্থায় কয়েকটি পরে আরও বেশী। প্রথম অবস্থায় কাঁচা অস্থায়ী ব্যবস্থা, পরে পাকাপাকি সুন্দর ব্যবস্থা। কাজ আরম্ভ হয়েছে, থেমে থাকবে না।

জানি বেশীর ভাগ লোকই খুশী হবেন, কেউ কেউ আবার খুশী হবেন না। তবে বৃহত্তর কলকাতার স্বার্থে, পরিবহনব্যবস্থা অটুট রাখতে হলে, দুর্ঘটনা বন্ধ করতে, আর সর্বোপরি পরিবেশটা একটু স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলতে, এছাড়া আর কি পথ আছে? প্রশ্নটা আপনাকে। যাঁরা 'হকার' তাঁদের, যাঁরা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটেন, রাস্তা দিয়ে চলেন, যাঁরা কেনেন, যাঁরা বেচেন—সবাইকে প্রশ্ন করছি। কলকাতার রাস্তা, ফুটপাথ বাধামুক্ত হোক, এটা চান কি না? নিয়মিত বাজারে হকাররা কেনাবেচা করুন, এটা চান কি না?

তাহলে নিজেরাই এগিয়ে আসুন—নিয়মিত বাজারে জিনিস কেনা-বেচার ব্যবস্থা আর অভ্যাস করুন।

সি এম ডি এ-র সবচেয়ে বড় দোষ শুধু চ্যাটাং চ্যাটাং কথাই বলে না, যা সবাই জানে, সেই কথাই বলে।

আপনারা তো সবাই জানেন যে, রাস্তায় ফুটপাথে বাজার ব'সে কি অবস্থা হয়েছে শহরটার। তাহলে নতুন কথা আর কি বলবো?

নতুন কথা হ'ল—বেলেঘাটা মেন রোড হেম নস্কর রোড, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, উল্টোডাঙ্গা মেন রোড, ঋষি দেবেন্দ্র রোড, সর্বমঙ্গলা লেন, ভুমায়ুন অ্যাভিন্যু আর দমদমে নর্দার্ন অ্যাভিনিউতে অস্থায়ী বাজার বানানো হচ্ছে। আরও হবে।

আর একটা কথা বিশ্বাস করুন। কলকাতার রাস্তা-ফুটপাথ বাধামুক্ত হ'লে কলকাতার ছাই-চাপা সৌন্দর্য কিছুটা প্রকাশ পাবে। লোকের চলাফেরার সুবিধে হবে, দুর্ঘটনা কমবে, জঞ্জাল কম জমবে। এই একটা পরিকল্পনায় কলকাতার চেহারা পাল্টে যাবে। সেটাকে বাধা দেবেন কি?

সক্রিয়। এদের মধ্যে টাইফাস, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের ব্যাকটেরিয়াও পড়ে।

ক্লাইবর্গের বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়ার গায়ের সেই বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ বিশ্লেষণও করেছেন। বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে, বিষাক্ত এই বস্তুর মধ্যে রয়েছে মুখ্যত দুই ধরনের রাসায়নিক যৌগ। প্রথমটি চিনির মত (পলিস্যাকারাইডস)। দ্বিতীয়টি চর্বি বা তেল জাতীয় যৌগ। যাদের বলা হয় লিপইডস (lipoids)। যৌগ দুটি পৃথক করার পর দেখা গেছে, জ্বর হওয়ার পেছনে যে অংশটি পলি-স্যাকারাইড তার কোন ভূমিকা নেই। লিপইডসই জ্বর সৃষ্টির মুখ্য নায়ক।

দেখা গেছে, সব রকমের ব্যাকটেরিয়ার বিষেই একই ধরনের যৌগিক গঠন বিশিষ্ট লিপইড থাকে। যার নাম রাখা হয়েছে লিপইড-এ।

প্রশ্ন: 'লিপইড-এ'-ই যে জ্বরের কারণ, এমন নাও তো হতে পারে?

গবেষকদের উত্তর: ঠিক কথা। 'লিপইড-এ'-ই জ্বরের মুখ্য কারণ এ কথা আমরাও বলছি না। সরাসরি তারাই যে

দৈহিক তাপমাত্রা বাড়ায়, অর্থাৎ হাইপো-থ্যালামাসকে নিয়ন্ত্রণ করে—এটা হয়ত ঠিক নয়। বরং বলা চলে, ব্যাকটেরিয়ার বিষ রক্তে এসে মেশার পর রক্তের শ্বেতকণিকা তাদের গ্রাস থেকে, শরীরকে বিষক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই দেয়, এবং সেই সঙ্গে ওই সব কণা থেকে নির্গত হয় অ্যালবুমিনজনিত এক ধরনের বস্তু। এই বস্তুই শরীরের অন্যান্য বস্তুকণা, যাদের এক কথায় বলা চলে রাসায়নিক যৌগ—তাদের সঙ্গে জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে দৈহিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হাইপোথ্যালামাসের উদ্দীপ্ত হওয়ার পেছনে এই বিক্রিয়াই হয়ত কাজ করে।

কিভাবে, তার কলাকৌশল অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। ব্যাকটেরিয়ার বদলে ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগৃহীত বিশুদ্ধ, 'লিপইড-এ'-র সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে জ্বর সৃষ্টি করে গবেষণার কাজ চালান হচ্ছে। গবেষকদের ধারণা লিপইড-এ শরীরে রোগপ্রতিরোধী বস্তুকণা বা অ্যান্টিবডি তৈরি করে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাই হোক, এই গবেষণা থেকে একটা প্রশ্নের মীমাংসায় যেন খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রশ্নটি এই, রোগ নিরাময়ের পেছনে জ্বরের কি কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে? নাকি, নেহাৎই এটা কাকতালীয় ব্যাপার?

গবেষকরা দেখেছেন, কোন কোন রোগের জীবাণু উচ্চতর দৈহিক তাপমাত্রায় মারা যায়। উদাহরণ, সিফিলিস এবং গনোরিয়া। এরা মারা পড়ে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। সম্ভবত এর জন্যেই পুরনো আমলের কোন কোন চিকিৎসক রোগীদের শরীরে ইনজেকশনের সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে রোগীর দৈহিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতেন। অর্থাৎ তার শরীরে জ্বর ঘটাতেন। তখন সিফিলিস বা গনোরিয়ার জীবাণু গরমের ফলে সাবাড় হয়ে যেত। উল্লেখ্য, কোন কোন ভাইরাসও অতিরিক্ত দৈহিক তাপমাত্রায় মারা পড়ে। যেমন, পলিওমাইয়েলাইটিস, গুটি বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি, প্রভৃতির ভাইরাস। এ থেকে মনে হয়, শরীরে কোন জীবাণু সংক্রমিত হলে তাদের ধ্বংস করার জন্যে একদিকে যেমন শ্বেতকণিকারা এগিয়ে আসে, সেই সঙ্গে ওইসব জীবাণুর গায়ে লেগে থাকা বিষ হাইপোথ্যালামসকে উদ্দীপ্ত করে শরীরের তাপমাত্রা এমনভাবে বাড়িয়ে দেয় যার ফলে শরীরে জীবাণুরা আর বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। বরং মারা যায়। অর্থাৎ এক কথায় এইভাবে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

অতএব আসল কথা দাঁড়াচ্ছে এই, জ্বর সৃষ্টি করে রোগ নিরাময়ের এই ধারণাটি যদি সত্যিই একদিন ব্যাপকভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, মানুষকে রোগ নিরাময়ের জন্যে তখন হয়ত আর নানা রকম রাসায়নিক ওষুধ এবং অ্যান্টিবাইওটিকের ওপর নির্ভর করতে হবে না। তখন শুধু চাই জ্বর। লিপইড-এ'র একটি করে ইনজেকশন। অথবা কোন মৃত ব্যাকটেরিয়ার। তারপর হি হি করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। লেপের নীচে ঘাম। অবশেষে রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি। আর তা যদি হয়, আগামী দিনে চিকিৎসার ব্যাপারটা হয়ত সহজতর হবে। সেই সঙ্গে কম ব্যয়বহুলও।

সমরজিৎ কর

এ-বিষয়ে এত লেখালেখি হয়েছে যে, নতুন করে যোগ যে দেব, আমার তেমন রণসাধ একদম ছিল না। ঝরিয়াতে আরও কয়েক বস্তা কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কী-ই বা অর্থ, কী-ই বা ফল? তা ছাড়া, লিখলে কোনও কোনও চতুরতর কলমবাজ ব্যাপারটাকে আঙুর ফল টক বলে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে পারেন। বস্তুত একটা ইংরেজী সাপ্তাহিকে ঠারেঠোরে করা হয়েছেও। আমার স্বপক্ষে খালি এইটুকু বলতে পারি, উঁচু আঙুরের সবগুলো না পাই, একটা-দুটোর নাগাল তো পেয়েছি। অতএব আমার বক্তব্য শুধু এক খারিজ লেখকের তেতো জিভের উদগার-উচ্চারণ বলে ঠাওরানো অন্যায় হবে। একটু-আধটু স্বাদ পেয়েছি বলেই নির্ভয়ে বলতে পারছি, রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে এবারের রায় দেখে সপ্তকোটি বাঙালীর অমৃতের সন্তানদের একজনমাত্র হয়ে আমিও যৎকিঞ্চিৎ মজা পাচ্ছি।

রায় তো ঝেরোল, যেন বন থেকে বেরোল টিয়ে। এমন কত রায়ই তো বেরিয়ে থাকে, কত টিয়াই তো ডালপালা আর পাতার ছায়া থেকে আখছার সুড়ুৎ বেরিয়ে আসে। কিন্তু তা নিয়ে এত কথা কই; কখনও তো ওঠে না! এবার উঠল কেন? কোনও আউটসাইডার ঘোড়া বাজিমাৎ করেছে বলেই কি? খতিয়ে দেখছি, না, তাও তো না। যাঁর নামে এই পুরস্কারটি ধন্য, সেই রবীন্দ্রনাথও এই শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় আন্তর্জাতিক আসরে নিজেই ছিলেন একজন আউটসাইডার। সুইডিশ আকাদেমি তাঁদের সম্মানপত্রে আমাদের কবিকে একজন "অ্যাংলো ইনডিয়ান" লেখক বলে উল্লেখ করেন, তবু কই তা নিয়ে তো অব্যবহিত পরে এমন কোনও অপাত্রে অর্পণের নালিশ ওঠেনি! ইংরেজী গীতাঞ্জলি তার প্রাপ্য পাওনাটা আদায় করে নেয় নিজেরই জোরে।

এইবার রবীন্দ্র পুরস্কারের কথা। বলছি না যে, প্রত্যেকবারই সুবিচার হয়েছে। কিন্তু এবারের প্রাপকের যে মোক্তারেরা গলা বাড়িয়ে বলতে শুরু করেছেন বিতর্ক আর ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেকবার, তাঁদের মিথ্যাকে—এক কোনও না কোনও রকম স্বার্থে বাঁধা—থোথা মুখগুলোকে ভোঁতা করে দেওয়ার ভাষা অন্তত আমি তো জানি না। খালি জিজ্ঞাসা করি, আর কোনওবার রায়ে স্বাক্ষরদাতা জজেরা নিজেরাই পরস্পরকে ডাক করে চাঁদমারি চালিয়েছেন কি? এত হোলি হায় মারকা সা-রা-রা-রা-রা-রা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে? এই কাজে একলা খালি খবরের কাগজগুলিই লিপ্ত হয়নি—তারা অজস্র অসংখ্য পাঠকের অবাক-বিহ্বল মতামতের প্রতিধ্বনি করেছে মাত্র, বড়জোর আয়না হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুঁ দিয়ে এই পর্বতপ্রমাণ প্রতিবাদকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, "আগেও অনাচার হয়েছে" এই তথ্যহীন, নাথহীন কিফেদ্গোর দিয়ে এবারের অনাচারের সাফাই চলে না। হই-হল্লায় যাঁদের সংবেদন-শীল অন্তর লজ্জাবতীর ন্যায় মুহ্যমান, সেই সুরুচি-অভিমানী লিখিয়েদের খালি এইটুকুই বলি, "আগেও খুন হয়েছে" বললেই কি টাটকা একটা খুন মাফ হয়ে যায়? হালফিল যা ঘটল, তার একটা কিনারা প্রত্যেকেই চায়—কেননা, এই পুরস্কার এই দেশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের নামধারী, এবং এবারের দানটি এমনই, বুঝিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

এই ব্যাখ্যা এবারের প্রাপকের উকিল-মোক্তারদের তথা লিটেরারি কোনও সারবান গহ্বরে থলিতে নিহিত আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, তবে তাঁদের হিতার্থে শুধু এই উপদেশটুকু দিই, তাঁরা চুপচাপ থাকলেই বেশী শালীন-শোভন-নিরাপদ হত। বোবার শত্রু নেই, আর চোরের মায়েদের যে বড় গলা, এই সাদামাটা সত্যটা কার জানা নেই?

[illegible] কিন্তু বাদ। [illegible] ছিল বিতর্কমূলক? [illegible], কালিদাস রায়, [illegible], বিভূতিভূষণ, বনফুল, [illegible], [illegible], আইয়ুব, প্রথমনাথ বিশী, [illegible], বিভূতি মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, রমাপদ চৌধুরী ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক নামেরই মানহানি ঘটানো হয়। আসলে এবারকার নবাবপুত্তরদের রজিত বিক-ধারীরা তাহা বিবেকহীন এবং মিথ্যাবাদী। রবীন্দ্র পুরস্কারের যে কয়টি নাম র‍্যানডম স্যামপলিং রীতিতে দাখিল করেছি, সেই জ্বলজ্বলে নামকটিই ওদের বেহায়া অনৃত ভাষণের নমুনা। উপরে পেশ করা তালিকায় অবশ্য গজেন্দ্র মিত্রের নামও যোগ করা যায়। তিনিও প্রবীণ, পরিজ্ঞাত এবং প্রতিষ্ঠিত।

অপরিজ্ঞাত নামের সাফাই হিসাবে তবে কি বাচাল বক্তিয়ারেরা সতীনাথ ভাদুড়ী জ্যোতির্ময়ী দেবী অথবা উমাপ্রসাদকে দেখিয়ে দেবেন? এঁরা জন অরণ্যে পুরস্কারের পূর্বে তাদৃশ পরিচিত ছিলেন না ঠিক। কিন্তু এঁদের কেউ কি কোনও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান চালাতেন বা চালান? কিংবা পৃষ্ঠপোষকতার ছাতার ছায়াটি মানাবর মাথায় মাথায় মেলে ধরেছেন? বোধ হয় নয়—যতদূর জানি।

এবারের উচ্চরোল প্রধানত এই কারণে।

আসল যে কথাটা বলবার সেটা এখনও বলাই হয়নি। অন্য কোনওবার বিচারক মহলে এত বচসা শোনা যায়নি। যেমন একজন বিচারক বললেন, ফুল বেঞ্চের যিনি প্রধান, তিনি তাঁকে "ওপেন মাইনড" নিয়ে আসতে বলেছিলেন। আর এক বিচারক জানালেন, খোলা মন নিয়ে চেয়ারম্যান নিজেই আসেননি। হয় কেউই বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক সৃষ্টির খোঁজ খবর রাখার দরকার মনে করেন না, নয়ত গূঢ় গুহ্য কোনও কারণে বিশেষ একটি বইকে শিরোপা দেবেন, সেটা সাব্যস্ত করেই এজলাসে বসেছিলেন। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, কথায় বলে। কিন্তু মুনিরা (সেকালের) সচরাচর মৌন থাকতেন, তাই বাঁচোয়া। একালের এই "মুনি"রা মৌনব্রত ভঙ্গ করছেন বলেই বিপাকে পড়ছেন। এযাবৎ প্রকাশিত স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে যতটুকু দৃশ্য তাতে এই সত্যটাই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, জনৈক বিচারক ওই গ্রন্থ-বিশেষকে ঝাণ্ডার মতো উঁচা করে ধরে রেখেছিলেন, আর অন্য কোনও প্রবীণ ন্যায়শীল দাবিদার আছি বড় কেষ্টুর কৃতকর্ম

কথে নাকচ করে দিয়েছেন। কেন, সে রহস্য অনুসন্ধানসাপেক্ষ—আদৌ যদি কোনও তদন্ত হয়, তবেই।

আবার এও ঠিক, অধিকাংশ জজ যথাবিহিত তথা ন্যায়-দানের কাজটি যশংকের সেরেছেন। অর্থাৎ তাঁরাও প্রত্যাশিত কর্তব্যটি পালন করেননি। সোজা কথায় তাঁদের কীর্তি দুর্যোধনের দুঃশাসনের মত না হোক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতির নির্বিকার নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে তো তুলনীয় নিশ্চয়। প্রত্যেকে এক একটি ধৌত তুলসী-পত্র সেজে এখন একটি ধৃতরাষ্ট্রের দিকে নালিশের অঙ্গুলি-নির্দেশ করছেন কেন? এক্ষেত্রে "হোলিয়ার দ্যান্ দাউ" আস্ফালনটা একদম খাটছে না। অতএব ইনি ওকে এবং উনি একে তাক করে শর সন্ধানের পাঁয়তারা বিলকুল নিষ্ফল। খবরের কাগজকে লক্ষ করে কটূক্তি তো আরও হাস্যকর। কোনও কোনও সংবাদপত্র এঁরা যা বলেছেন তাই বিনা টিপ্পনিতে ছেপেছে, কোনও কোনও সংবাদপত্র মতামতের জন্য এঁদের দ্বারস্থও হয়েছে। তবু যদি কেউ কেউ (যা করেছি সেটা আঠারো আনা সাচ্চা, এই অভিমতে বিচারকদের যে দু-একজন এখনও অটল-অবিচল, তাঁদের কথা আলাদা) আবার বলি, তবু যদি কেউ কেউ ঝেড়ে কাশতে ইতস্তত করে থাকেন, সেই দোষ আর দায় কি খবরের কাগজের? আর মসীজীবীদের যাঁরা প্রতিবাদ আর আপত্তির মূল কথাটা কায়দা করে এড়িয়ে গিয়ে আগেকার কল্পিত নজির দর্শিয়ে সব কসুর মাফ করিয়ে নিতে চাইছেন, তাঁরা ঘৃণারও অযোগ্য। তাঁদের প্রাপ্য বড়জোর উপেক্ষা আর ক্ষমা। ছারপোকার গায়ে অনেকেই হাত দেন না। তার কারণ এই নয় যে, ছারপোকারা নিষ্পাপ, নিরপরাধ। আসল কথা এই যে, ছারপোকারা একে তো ছার, উপরন্তু তাদের গায়ে যে বেজায় গন্ধ।

পুনশ্চ: আমার সর্বশেষ একটা চ্যালেনজ বা প্রশ্ন: এ যুগে যখন সর্ববিষয়ে জন-মতের নামে শপথ নেওয়ার ব্যাপারটা জলচল, তখন বিচারকবৃন্দ একটি জনসভা আহ্বান করুন না কেন! এইবার জিজ্ঞাস্য, এমন কোনও জনসভায় প্রকাশ্যে গ্রন্থটি গড় গড় পড়ে যেতে রাজী আছেন তাঁদের কে, কে, কে? এমন সাহস আছে কার, কার কার? তবে আমার কিন্তু দৃঢ় ধারণা, দু-চার পাতার পরে গলা খুলে পড়তে পারবেন না এঁদের কেউই, কারণ হয় সমাগত জনতা চেঁচিয়ে পাঠকের মুখ বন্ধ করে দেবে, নয়তো পাঠক-বিচারকের মাথা লজ্জায় নত হবে নিজে থেকেই। আমার বিশ্বাস, লজ্জার লেশ এঁদের সকলেরই কিছু না কিছু অবশিষ্ট আছে, কান দুটি যথাস্থানে থাক কিংবা না-ই থাক।

আলোচনা

রবীন্দ্র সংগীতে স্বরলিপি বিভ্রাট

দেশ পত্রিকার ৪৩ বর্ষ ৩০ সংখ্যা এবং ৪৩ বর্ষ ৩১ সংখ্যায় শ্রীশান্তিদেব ঘোষের "রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি বিভ্রাট" নামে যে প্রবন্ধটি দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের বক্তব্য এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে সেটি যথা সত্বর সম্ভব দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করলে কৃতজ্ঞ হব।

কোনো গীত রচয়িতা তাঁর নিজের গানের স্বরলিপি নিজেই করলে তার সুরের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে তা হয়নি, কেননা রবীন্দ্রসংগীতের প্রকাশিত স্বরলিপির প্রায় সবই করেছেন অন্যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ও তাঁর গানের অন্যকৃত স্বরলিপিতে একটা মূলগত পার্থক্য আছেই। প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির মধ্যে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত স্বরলিপিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিতে যে সম্পাদনার আবশ্যকতা আছে তারও পথ প্রদর্শন করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার প্রমাণ আছে 'কেতকী' স্বরলিপি গ্রন্থে। কেতকী প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩২৬ সালে— এই গ্রন্থে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটির স্বরলিপি ত্রিমাত্রিক ছন্দে লিখিত ও দিনেন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত। কেতকীর পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে শ্রাবণ ১৩৩৫ সালে এবং এই সংস্করণে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয় চতুর্মাত্রিক ছন্দে দিনেন্দ্রনাথেরই নামে এবং সেই স্বরলিপিই তো স্বরবিতান-১১ (কেতকী) খণ্ডে অপরিবর্তিতরূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই তথ্যটি সম্পূর্ণ না জেনে তাঁর প্রবন্ধে এত বিস্তারিত ব্যাখ্যার বৃথা চেষ্টা কেন করলেন তা বোঝা গেল না। দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথকৃত সম্পাদনা ও সংস্কার সাধনের আরো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। 'বিশ্ববীণা রবে' গানটির স্বরলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই মন্তব্য আছে চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে। তাছাড়া এই গানের পাণ্ডুলিপি-আকারে রক্ষিত প্রথম স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী-কৃত এবং সেই কারণেই স্বরবিতান-১১ (কেতকী) গ্রন্থে ওই স্বরলিপি এবং দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি উভয়ই মুদ্রিত। শ্রী ঘোষ এই প্রসঙ্গটিই বা কী কারণে উত্থাপন করলেন তা বোঝা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

তখন দিনেন্দ্রনাথ পরলোকগত, রবীন্দ্রসংগীত পিপাসুদের রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে অথচ স্বরলিপি-গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে না এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ উদ্যোগী হয়ে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে একটি স্বরলিপি সমিতি গঠন করেন। এই উদ্যোগের মধ্যমণি ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন। সমিতির সদস্যভুক্ত হন শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার;
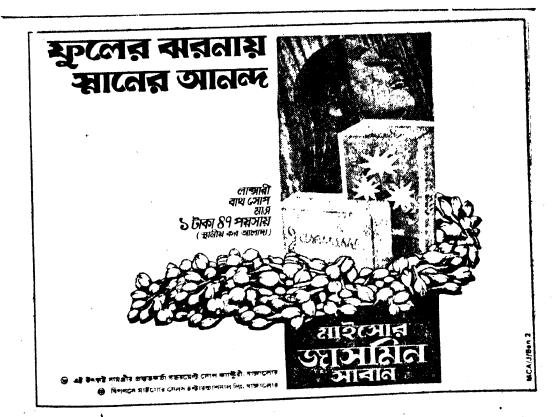
শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। এই স্বরলিপি সমিতির সূচনা থেকেই শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার সমিতির সঙ্গে নির্লিপ্ত ছিলেন। সমিতি গঠনের ক' বছর পরে (২৮।৭।৫২) শ্রীশান্তিদেব ঘোষ পদত্যাগ করেন। স্বরলিপি সমিতির সভানেত্রীরূপে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও স্বরলিপি সমিতির সম্পাদকরূপে অনাদিকুমার দস্তিদার স্বরবিতান গ্রন্থমালার রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি প্রকাশনের দুরূহ কাজ অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করেন। তিনটি পর্যায়ে এ কাজ হয়—

(১) রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ,

(২) সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির সংকলন ও প্রকাশ এবং

(৩) অপ্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সংগ্রহ ও প্রকাশ। তার মধ্যে প্রথমোক্ত পর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনার ফলে কোনো কোনো স্বরলিপির অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গের সঙ্গে সমগ্র রবীন্দ্র-

সংগীত স্বরলিপি সংশ্লিষ্ট নয়, তার কতকাংশ মাত্র সংশ্লিষ্ট।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপির সম্পাদনা ও সংস্কার সাধনে পথপ্রদর্শক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই পন্থার সংগে সংগতি রেখেই স্বরলিপি-সমিতির সভানেত্রী ও সম্পাদক সম্পাদনা-কার্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'আমার সোনার বাংলা' ও অন্যান্য অনেক গানের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সম্পাদনা ধারায় জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সংগে মিল ছিল। অনাদি-কুমার দস্তিদারের নিকটে দিনেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত বহু স্বরলিপি ছিল যা তিনি তাঁর সম্পাদনা-কার্যে ব্যবহার করেছিলেন। সম্পাদনার ফলে যে-ক্ষেত্রে স্বরলিপির অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছে সেক্ষেত্রে সম্পাদিত পাঠই মূল গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সম্পাদিত পাঠ মূল গ্রন্থে মুদ্রিত হয়—এটাই রীতি। রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপির কাজ এত বিপুল যে পরিবর্তন স্থলে পূর্ব প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি গ্রন্থের পাঠ এক-কালে স্বরবিতান গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ এ-কাজ খুব সময়সাপেক্ষ, এবং তৎকালে দ্রুত স্বরবিতান প্রকাশ করে স্বরলিপি-পাঠকের চাহিদা মেটানো জরুরি ছিল। কিন্তু এখন সে প্রশ্ন ওঠে না। কারণ পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থের ভিন্ন স্বর-পাঠ ও অন্যান্য বিষয় স্বরবিতানের যে-যে খণ্ডে দেওয়া আবশ্যক তা দেওয়া হয়েছে এবং এরূপ ৫৩খানি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তৎসংগে সংগৃহীত তথ্যাদিও যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে ও হবে। সম্পা-দনা যিনি করেন তার দায়দায়িত্ব তাঁরই। সম্পাদনার কার্যকারণ তিনিই বিস্তারিত বিবৃত করতে পারেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্বরলিপি সমিতির সভানেত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও সম্পাদক অনাদিকুমার দস্তিদার উভয়েই পরলোকে। তাঁদের জীবিতকালে যে প্রসঙ্গের মীমাংসা করলে সমীচীন হত, প্রবন্ধ লেখক শ্রীঘোষ এত-কাল পরে সেই বিতর্ক সাময়িক পত্রে তুললেন—এটি বিস্ময়কর। তা ছাড়াও তিনি বিশ্বভারতীর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করিনি।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পুনর্গঠিত স্বরলিপি সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর উপস্থিতিতে গৃহীত ৩ই সমিতির প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লিখেছেন :—

২২।৪।৬৭ তারিখের সমিতির অধি-বেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তা হল :—

"It was suggested that in case of variations in notations, formerly printed versions should be indicated and reasons thereof defined in the appendix of the respective volumes of Swarabitan." (22.4.67)

১৮।৫।৬৭ তারিখে আরেকটি প্রস্তাবে বলা হয় :—

"It was decided in the last meeting that in case of variations in notations, formerly printed versions should be indicated and reasons thereof defined in the appendix of the respective volumes of Swarabitan." (18.5.67)

স্বরলিপি-সমিতির এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই স্বরবিতানের পরবর্তী কাজ হয়েছে। কোনো সভায় কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে সর্বসম্মতিক্রমে অথবা অধিকাংশের সম্মতি অনুসারেই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে। অথচ শ্রী ঘোষ স্বরলিপি-সমিতির অন্যতম সদস্যের লেখা ৮।৪।৬৯ তারিখের চিঠি থেকে এই অংশ "স্বর-লিপির ক্ষেত্রে Revised পাঠই মূল পাঠ-রূপে এবং পূর্বে প্রকাশিত পাঠ স্বর-বিতান গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হওয়াই সমী-চীন।..." উদ্ধৃত করে প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : "ইংরাজি ১৯৬৭ সালে নতুন স্বরলিপি সমিতির অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, উপরোক্ত ৮।৪।৬৯

তারিখের চিঠিতে উত্তরে তা গ্রহণ করতে যে ইচ্ছুক নন তা জানাচ্ছেন।...”

একথা ঠিক নয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার পরেই শ্রীঘোষ ৮.৪.৬৯ তারিখের একই চিঠি উদ্ধৃত করতে গিয়ে লিখলেন, “স্বরলিপির ক্ষেত্র Revised পাঠই মূল পাঠরূপে গ্রন্থ শেষে মুদ্রিত হওয়া সমীচীন।” যা মোটেই সঠিক নয়। একই চিঠি দু জায়গায় সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে উদ্ধার করে তিনি কি মূল বক্তব্যটিকেই অবোধগম্য করে ফেললেন না?

১২-২-১৯৭০ তারিখে স্বরলিপি সমিতির যে অধিবেশন হয় তা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য. ঐ অধিবেশনে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে ওই অধিবেশন বা তাতে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সে বিষয়ে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নি। উক্ত অধিবেশনে গৃহীত দুটি সিদ্ধান্ত হল এই :

“বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বর্তমানে যেভাবে সাজিয়ে স্বরলিপির বই প্রকাশ করছেন তাই করা হোক...”

“শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ তাঁহার ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র প্রত্যাহার করেন।”

প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত উল্লেখিত হলে পাঠক সমাজ প্রকৃত বিষয় আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে গঠিত স্বরলিপি-সমিতি যে তিনটি পর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি প্রকাশনের বিপুল কাজ আরম্ভ করেছিলেন বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে কাজ বহুলাংশে সম্পন্ন হয়েছে। সেজন্য স্বরলিপি-সমিতির কাজের পর্যায় ও পরিমাণ বর্তমানে সীমিত। পুনর্মুদ্রণ অব্যাহত রেখে স্বরবিতান খণ্ডগুলি রবীন্দ্রসংগীত রসিকদের পক্ষে সহজলভ্য রাখাই গ্রন্থন বিভাগের পক্ষে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শ্রীঘোষ তাঁর প্রবন্ধে স্বরবিতান-২ ভুক্ত ৬টি গানের স্বরলিপিতে পরিবর্তন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। ১৩৪৩ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থে দিনেন্দ্রনাথকৃত ওই স্বরলিপিগুলি তালবদ্ধরূপেই মুদ্রিত ছিল। ১৩৫৯ সালে শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের সম্পাদনায় এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে গীতরূপের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বরলিপিগুলি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। সম্পাদকের নাম বর্তমানে স্বরবিতানে দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত আছে। এই ৬টি গানের মধ্যে কোনোটির শ্রীঘোষ-গীত গ্রামোফোন রেকর্ড আছে। তাতে কি তিনি পূর্ব-প্রকাশিত দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি যথাযথ অনুসরণ করেছেন? এই প্রশ্নের সঙ্গে উচ্চারিত নীতি ও সেই নীতিকে সনিষ্ঠ অনুসরণের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

গীতবিতানের বিভিন্ন সংস্করণে পাঠ-ভেদ সম্বন্ধে আমরা অবহিত আছি। গীত[illegible] চলছে। তাতে পাঠভেদ ইত্যাদি যথাকালে প্রকাশিত হবে।

প্রফুল্লকুমার দাস
স্বরলিপি অধীক্ষক, বিশ্বভারতী
গ্রন্থন বিভাগ

দেশ সাহিত্য সংখ্যা

বছর কয়েক আগে একটি সংকলন গ্রন্থ আমার হাতে আসে—“Motives : Why do you write?” জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদিত এই বইটিতে সমসাময়িক কয়েকজন জার্মান লেখকের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে উপলব্ধির কথা বিবৃত হয়েছে। পড়ার সময় কেবলই মনে হয়েছে আমাদের দেশের লেখকদের কাছ থেকেও যদি এই ধরনের আত্মানুসন্ধানের মানস-চিত্র পেতাম! গত বছর এমনি দিনে আমার সেই মনোবাসনা পূরণ হয়। দেশ সাহিত্য সংখ্যায় পেলাম আমাদের যুগের কয়েকজন দিকপাল লেখকের অন্তরঙ্গ নিজস্ব কথা। দেশ-এর এ বছরের সাহিত্য সংখ্যাতেও দেখি শক্তিমান তরুণ লেখকেরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের আত্মবিশ্লেষণের কথামালা নিয়ে। এর জন্যে আপনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। দেশকেও ধন্যবাদ—মাঝে মাঝে সে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ওপর দূরপ্রসারী আলোকপাতে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। আর নেয় বলেই লেখকেরাও হয়ে ওঠেন আমাদের খুব কাছের মানুষ। সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে লেখকদের উপলব্ধির ছবিটা কেমন, এ সম্বন্ধে সাহি[illegible]রাগী-দের কৌতূহলী হওয়া স্বাভা[illegible] এবং তাঁদের সৃষ্টির মূল্যায়নকালে [illegible]ভেতরকার এই এক্স-রে ছবিটার কতো যে প্রয়োজন!

সুরেশ দাশগুপ্ত
আসানসোল

ভ্রম সংশোধন : ৫ জুন সংখ্যার ‘আলোচনা’-তে ৪৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ‘নীললোহিতের চোখের সামনে’ পত্রের লেখিকার নাম সুচেতা মৈত্র। মুদ্রণ প্রমাদে সুচেত্রা মিত্র ছাপা হয়েছে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

শংকর চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

কোনো কোনো শোকসংবাদ আমার পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে। শংকর চট্টোপাধ্যায় মারা গিয়েছেন—এই সংবাদ শোনার পর বিশ্বাস করতে আমার বাধছিল। তাঁর মারা যাবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না; বয়স হয়েছিল বছর বিয়াল্লিশ, স্বাস্থ্য ছিল

সুন্দর, উদ্দাম স্বভাব, অফিসের কাজে কলকাতা ছেড়ে গৌহাটি গিয়েছিলেন কয়েক দিনের জন্যে, গৌহাটিতেই অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এমন মৃত্যু আমরা সচরাচর গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুর এই পরিহাস নতুন কিছু নয়, অনেক সময়েই আমাদের বিস্মিত ও বিমূঢ় করে সে আসে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্ষোভ, রাগ যতই থাক, মানুষের পক্ষে করার কিছু নেই।

শংকর চট্টোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানতাম। অন্তত গত ত্রিশ বছর। প্রথম যখন দেখেছি তখন শংকরের কতই বা বয়েস, একেবারে তরুণ। কবিতা লিখত, গল্প লিখত; আজ যেসব কবি ও গল্প উপন্যাস লেখকেরা, পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছেন, সেই তরুণ লেখকদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন শংকর, তাঁদের সঙ্গেই লেখা শুরু করেন। শংকর তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন লেখার দিক থেকে হয়ত অতিপরিচিত হয়ে ওঠেন নি, কিন্তু তাঁর সাহিত্যচর্চা যে ক্রমশই পরিণত ও নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে তিনি আরও উল্লেখযোগ্য হতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস।

শংকর সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি রচনার স্থান এটা নয়, সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। শুধু বলা দরকার, শংকরের চরিত্রের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তাঁর জীবনীশক্তি। এই জীবনীশক্তি ছিল অফুরন্ত। তাঁর মজবুত স্বাস্থ্য, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, প্রবল হাসি, পরিহাসপ্রিয়তা যে কোনো মানুষকেই আকৃষ্ট করত। কবিতা রচনার বেলায় শংকরের মধ্যে যে আবেগ, আকুলতা এবং কখনো কখনো জ্বালা চোখে পড়ত তা যেন তার চরিত্রের নিভৃত অংশ। গল্প লেখার সময়ও শংকর এর দ্বারা প্রভাবিত হতেন। আজকাল তাঁর লেখা অনেক পরিণত ও উজ্জ্বল হয়েছিল।

বহু পত্রপত্রিকায় শংকর লিখেছেন, এবং বোধ করি কলেজে পড়ার সময় থেকেই। দেশ পত্রিকায় শংকরের কয়েকটি গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে; 'জনমেজয়' ছদ্মনামে তিনি কিছুদিন নিয়মিত একটি লেখা লিখেছিলেন। বড় বড় কাগজ ছাড়াও লিটল ম্যাগাজিনে শংকর বেশী লিখতেন। কলকাতার বহু তরুণতম কবি, গল্পকার শংকর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডায় বসতেন, সাহিত্যালোচনা করতেন। সাহিত্যিকদের আড্ডা হিসেবে শংকরের বাড়ি কার কাছে না পরিচিত!

শংকর চট্টোপাধ্যায় একটি পুরস্কারও পেয়েছিলেন: "ত্রিবাক্ষ" পুরস্কার। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: 'কেন জন্ম কেন নির্যাতন'।

শংকরের এই অকাল-বিয়োগ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ও তাঁর বহু গুণমুগ্ধকে ব্যথিত করেছে। আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

উল্টোরথ পুরস্কার

কবি আনন্দ বাগচী এবার 'উল্টোরথ' পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এই পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার এক টাকা। আনন্দ বাগচীর এই পুরস্কার লাভের জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

অভিনন্দ

॥ ২৬ ॥

জয়তী ক্ষেমেশের বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে ঠিক করেছে। একদিন তো কাটল। পরদিন সকালবেলা ক্ষেমেশের পড়ার ঘরে, (এইটেই বসার ঘরও ক্ষেমেশের) বসে চা খাচ্ছিল জয়তী আর ক্ষেমেশ।

'বাড়ি ভাড়া দাও না, তোমার কোনো আয় নেই তা হলে?'

'না।'

'চলে কি করে?'

'ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে এখনও।'

চাকর বিস্কুট ও সন্দেশের হাঁড়ি ও দুটো বড় দুটো ছোট চীনেমাটির রেকাবি একটা তেপয়ের ওপর সাজিয়ে জয়তীর কাছে রেখে গেল। চায়ে টাগরা গলা টনসিল পুড়িয়ে (ভালো লাগল জয়তীর, ঠান্ডায় কেমন ব্যথা করছিল গলার ভেতরটা) একটা দুটো চুমুক দিয়ে জয়তী বললে, 'ব্যাংকে কত টাকা?'

'হাজার পঞ্চাশেক হবে।'

'সুদ খাচ্ছ?'

'আসলে হাত দিতে হয়।'

'প্রতি মাসেই।'

'হ্যাঁ। বিরূপাক্ষের তো পঁচিশ লাখ আছে।'

'কি জানি।' অনেক দূরে যে নির্ঝর ঝরে পড়ছে সে তো রক্তের, আমি জলের খোঁজে যাচ্ছি : মনে হল যেন জয়তীর কণ্ঠ শুনে।

'ক্ষেমেশ, তোমার নিজের রোজগারের কোনো পথ নেই?'

'না, কোনো ব্যবসা-ট্যাবসা করছি না। চাকরি করব না।'

'ইচ্ছে করে কি মানুষ চাকরি করে? তোমার চেয়েও অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষের চাকরি করে খেতে হচ্ছে। অবোধ অবুঝের গোলামী করে জীবন পণ্ড হয়ে যাচ্ছে তাদের। ইশাকেও ভেড়ার পাল চরাতে হয়েছিল। কি করবে—এ ছাড়া উপায় নেই তো। খাওয়া-পরার স্বাধীনতা চাই তো মানুষের।'

'স্বাধীনতা আছে আমার', ক্ষেমেশ জয়তীর মনকে ঠেক ধার দিয়ে বললে, 'ব্যাঙ্কে টাকা আছে। দায়ে পড়লে আমারও চাকরি করতে হত। সে রকম দায়ে এখনও পড়িনি আমি। পড়তে হবে একদিন : তখন ঠিক করে নেব পথ। চা খাচ্ছ না? সন্দেশ রেকাবিতে সাজিয়ে দাও।'

'তুমি খাবে?'

'খাব বইকি! তুমি কি একাই খাবে সব?'

'ক'টা এনেছে?'

'গোটা পঞ্চাশেক হবে। একা খেতে পারবে?'

'এত সন্দেশ কি হবে?'

'ও-বেলা খাব, রজনকে দেয়া যাবে, কালও খেতে পাওয়া যাবে, এক-আধ দিনে সন্দেশ নষ্ট হবে না।'

রেকাবিতে সন্দেশ সাজাতে সাজাতে জয়তী মনে মনে ভাবছিল : কেমন একটা ভাঙা সোঁদা সোঁদা জমিদারি মেজাজ এখানকার সবদিকেই। বড় হাঁড়ি—অঢেল সন্দেশ—নিঃসাড় ঘরদোর পুরী—মুনাফা নেই, ব্যাঙ্কের টাকা আছে, তবুও নেই; ব্যবসা নেই, চাকরীর মত গোলামী কে করে; পাখি উড়ছে; বাড়িটা এত বেশি বন-জঙ্গল আগাছায় ভরে আছে যে, সে সবের ভেতর দিয়ে একটা গোরু বা বাছুর চলে গেলে বিদ্ঘুটে সবজির গন্ধ ছড়ায় চারদিকে, বিশৃঙ্খলভাবে জন্মেছে সব গাছপালা, এবড়ো-খেবড়ো ফসল, অদ্ভুত সব আগাছার চাঁদমারি : সবুজ বটে, কিন্তু তবুও এগুলো সত্যিই কি সেই সবুজ? প্রকৃতি বটে, কিন্তু তবুও কি প্রকৃতি? ক-খ লাহার বা গ-ঘ পালচৌধুরীর সাজানো বাগানবাড়ির প্রকৃতির ভক্ত নয় অবিশ্যি জয়ন্তী, কিংবা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের, কিন্তু তবুও ক্ষেমেশের বাড়িতে কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি যেন প্রকৃতিকে; অরণ্যের মাহাত্ম্য নেই এখানে, বাগানবাড়ির কাঁচিছাঁট।

শৌখিনতা নেই। প্রকৃতি নেই। আছে? ভালো করে তাকাল আবার অনেক গাছ, অনেক লতা, আগাছার বিস্তর সমৃদ্ধির জয়াবহতার শোকাবহতার দিকে; কেমন যেন মনটা লাগল জয়ন্তীর। জীবনের গল্প ফুরিয়ে গেলে এ-সব ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এদেরই ভেতর মিশে যেতে হয় একদিন; সময় কাজ করতে থাকে তারপর, নিওলিথ মানুষের কথা আর মনে থাকে না কারু।......ক্ষেমেশ তো আট বছর আগেও অকসফোর্ডে যাবে ঠিক করেছিল, ডিগ্রী আনবার জন্য। গ্র্যাজুয়েট হয়ে ফিরে এসে একটা কলেজে প্রফেসারি পেত হয়তো। সেও তো এই জিনিসেরই রকমফের; কিংবা ব্যারিস্টারি পাশ করে এলে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার হয়তো বড় জোর পাঁচ লাখে দাঁড়াত। কী হত তাতে। জীবনে একটু অদ্ভুত বলাধান হত হয়তো; মন আকাশের বিদ্যুতের মত নয়—এ-সি ডি-সি কারেন্টের মত চমকে হুমকি দিয়ে বসত; বেশি দৌড়-ঝাঁপ করলে কর্মিতকর্মা পুরুষ হয়তো ওরা বলত ক্ষেমেশকে; কেউ কেউ বলত লোচ্চা বদমায়েশ—ক্ষেমেশের ব্যক্তিক জীবনের এক ঝুড়ি কেলেঙ্কারি রটিয়ে বেড়াত ওরা। কী

হত এই সবে। পরের দিন সকালবেলা এল। ক্ষেমেশের বসবার ঘরেই বসেছিল দুজনে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির হতচ্ছাড়া নষ্টচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নয়—এই অনেক দিনকার উইয়ে কাটা ঘুণে খাওয়া ভালো খারাপ সুন্দর কাতর পৃথিবীটার কথা মনে করে নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। ক্ষেমেশ যাতে টের না পায় এমনি করে হাল্কা নিঃশ্বাস ছাড়তে চেষ্টা করল জয়তী ; কিছু পারল, কিছু পারল না।

'তোমাকে কেমন গম্ভীর দেখছি।'

'আমি কথা ভাবছিলুম ক্ষেমেশ; এক-আধটা কথা এসে পড়ল—দেখছি—হাসি-মুখে ভাবতে পারি না।'

'কথা ভেবে কোনো কিনারা পাবে না, দেখ কেমন চমৎকার রূপশালি ধান-দূর্বোর পাড়াগাঁর মত রোদ্দ চারদিকে; আকাশে কত যে সাদা মেঘের পাল চিকচিক করছে; সুষির হাতে থোকা থোকা বকফুলের পাপড়ির মত ছিঁড়ে পড়ছে লোটন পায়রা-গুলো। ভোগবতী দেখনি কোনোদিন, দেখবে না। কিন্তু আকাশ-গঙ্গা দেখ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ জয়তী। কবেকার কথা মনে পড়িয়ে দেয় এজন্মের ওজন্মের কত দেশের দূর দেশের।

'কই, তুমি তো অক্সফোর্ডে গেলে না?

'না, সে আর যাওয়া হল না। বাবা মোকদ্দমায় আটকে গেলেন—'

'চাকরী না কর ব্যবসায় আপত্তি কি?'

'টাকা নেই।'

'পঞ্চাশ হাজার তো রয়েছে।'

'আজকালকার বাজারে ওতো চণ্ডুর পাশে তামাকের ছিলিম, ওতে কোনো কাজ হয় না। ব্যবসার কথা পাড়লে যখন, আমি একটা কথা তোমাকে বলি—'

ক্ষেমেশের মস্ত বড় সোফাটার এক কিনারে গিয়ে বসল জয়তী, দু' রেকাবি সন্দেশ সাজিয়ে তে-পায়টায় রাখল দুজনের মাঝখানে। সন্দেশ নিয়ে সাধতে গেল না সে ক্ষেমেশকে। নিজে তুলে নিল গোটা দুই। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আমি বুঝেছি কি করতে হবে আমাকে। বিরূপাক্ষের লাখ পাঁচেক টাকা বার করে ক্যাপিটালের জোগাড় করে দিতে হবে তো?'

ক্ষেমেশ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুরে একটা উড়ন্ত পাখির পানে—পাখি ফুরিয়ে গেলে—নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমরা তো দুতিন বছর ধরে এই জিনিসটাই চাচ্ছ।'

'আমরা কারা?'

'আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ি যারা আনাগোনা করত, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে মাঝে; কিন্তু তাদের সমস্ত কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষের তিন-চার-পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়া, পঁচিশ লাখের ভেতর পাঁচ লাখের দাবি তাদের; বিরূপাক্ষের ভাণ্ডারী আমি; আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খাজাঞ্চির সঙ্গে মাছির যা। মাছি মধু খায়? না খাজাঞ্চিকে?'

ক্ষেমেশ একটা সন্দেশ মুখে গলিয়ে দিল (আগের দুটো হয়ে গেছে তার), একটু সময় কাটিয়ে আর একটা; বললে, 'খাজাঞ্চিকে খায় মাছি।'

জয়তী মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে, 'কেন?'

'তবে কি খাজাঞ্চিকে ছেড়ে মধু খাবে মাছি? মাছি কখনো টাকা ছেড়ে মধু খায় শুনেছি কি?'

ঘরের পাশেই বুনো বেগুনের ছড়ানো পাতার ওপর একটা ছোট্ট পাখি এসে বসে-ছিল : এত হাল্কা যে পাখিটা নুয়ে পড়ছিল না, কাঁপছিল না। পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ : কি নাম পাখিটার? খুব গাঢ় সবুজ, ল্যাটিমের মত ছোট; শীতের সকালে খুব চমৎকার আনকোরা সবুজ মখমলের জামা পরে এসেছে মনে হয়। কি নাম? উড়ে গেল পাখিটা।

ক্ষেমেশ বললে, তুমি বিরূপাক্ষের খাজাঞ্চি হয়ে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি? ওরা সেইজন্যেই তোমার কাছে যেত? যেত. একে-বারে কেটে পড়েনি তো: সম্পর্ক একটা রেখেছে শেষদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে।'

'তা রেখেছে ক্ষেমেশ। রঞ্জনকে আর এক কাপ চা করে দিতে বলবে?'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' ক্ষেমেশ এক টি-পট চায়ের হুকুম দিল।

'এক টি-পট বলেছি আমি? চাকর বাকরের সামনে গে'জেল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।'

'রঞ্জন গে'জেলদের খুবে শ্রদ্ধা করে।'

'খুব বড় টি-পট তো তোমার। ওরকম চাউস টি-পটের গে'জেল আমি নই।'

'তুমি খাবে, আমি খাব, বাকি থাকলে রঞ্জন খাবে। চা-খাও, চা-খাও। শীতের সকালে চা।'

চা এল। জয়তী ক্ষেমেশের কাপে ভরে দিল, নিজের পেয়ালাও ভরে নিল।

'টি-পটে অনেক চা আছে ক্ষেমেশ।'

'খাচ্ছি। ওটা পরে খাব।'

চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'রোজগার করবই এরকম একটা হন্তদন্ত-ভাবে না চলে মানুষ যদি খুব স্থির মনে ধীরে সুস্থে টাকা উপায়ের পথে যায়, তাহলে তার অভাব হয় না। মন দিয়ে ভালো করে লিখে একটা ইংরেজি আর্টিকেল তৈরি করতে আমার তিনচার দিনের বেশি সময় লাগে না। এজন্যে আমি পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশো টাকাও পাই, বেশিও পাই।'

'ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখ, বাংলায় লেখ না?'

'লিখব ভাবছি।'

'এইবারে শুরু করে দাও। বিরূপাক্ষের কাছ থেকে কি পাঁচ লাখ চাইছ তুমিও?'

'যোগাড় করে দিতে পারলে সুবিধে হত।'

'কি করতে?'

'গোটা চারেক প্রেস কিনতাম।'

'এত টাকা লাগে তাতে?'

'শুধু জব প্রিণ্টিঙের প্রেস তো নয়।'

'ওঃ, বির্লাটির্লার চালে; খবরের কাগজও বেরুতে একটা?'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে পেয়ালাটা ডান হাতে ধরে রেখে বললে, 'না, না, খবরের কাগজ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমি পড়ি না ও-সব।' তাচ্ছিল্য বেদনা করুণা ঘেন্নায় কেমন কঠিন হয়ে উঠল যেন তার মুখ। ক্ষেমেশের পেয়ালার চা ফুরিয়ে গেছে টের পেয়ে জয়তী টি-পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'বল কি হে খবরের কাগজ পড় না, আমি তো চায়ের পেয়ালা মুখেই তুলতে পারব না একদিন কাগজ না পেলে।'

'পৃথিবীর সব খবরই আমার জানা। মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে; ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার রোখ, অশান্তির দিকেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। তবুও উৎরে যাবে—হয়তো শ্মশানের শান্তিতে কিংবা অন্য কোনো এক ঠাণ্ডা—আগেরটার চেয়েও ঢের ঠাণ্ডা ইন্ডাজ ভ্যালির সভ্যতায়। মৃত্যুতে? না, জীবনেই; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে ও-সব হবে না কিছু। আমাদের আজকের হইচই যা নিমেষে চোখ ধাঁধিয়ে মনে হয়, সে সভ্যতার কোনো রং নেই—অর্থ নেই—কিন্তু শান্তি আছে।'

নিজের পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জয়তী বললে, 'কাগজও বের করবে না, এত প্রেস কিনতে চাচ্ছ?—'

'পাঁচ লাখ যোগাড় করে যদি দিতে পার আমাকে—'

'না। অসম্ভব। কাউকেই দিই না।'

'তাহলে—'

'তোমার এখানে থাকব বলেই আমি এসেছি।'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষ কলকাতায় আছে? তুমি যে এখানে এসেছ তা জানে? না কি না জানিয়ে এলে। অবিশ্যি তোমার নিজের ব্যাপারে কেমন যেন শিশুর মতন ঠেকছে ভদ্রলোককে আজকাল।'

'তুমি ওকে আমল দিতে না, তবুও বিয়ে করলে। বিয়ে করে ঘর সংসারে ঢুকে গেলে বলেই তো মনে হল; একদিন নয়—কটা বছর। এ-সব কি করে সম্ভব হল আমাদের কুশপুত্তুলের মত মাথা ঘামিয়ে যদি তা বুঝে দেখতে চেষ্টা করতুম—' বললে, ক্ষেমেশ।

আরো বলত, কিন্তু বাইরে শূন্যের স্তরে কি যে কি দেখে চুপ করে থেমে গেল!

'কি হত তাহলে?'

সমস্ত রাত ভরে যেখানে ছায়াপথ ছিল—ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সেই কোটি কোটি শতাব্দীর কোটি কোটি মাইল আকাশের দিকে চেয়ে থেকে পৃথিবীর—জয়তীর দিকে ফিরে বললে তারপর, 'জয়তী এসেছ।'

ক্ষেমেশের গলায় অনেকদিনকার আগের মোমশিখার কাঁপুনি যেন—কেমন যেন গভীর, স্নিগ্ধ শান্ত এবং সংকল্প উজ্জ্বল; কিন্তু অভিজ্ঞ ও সমাহিতও বটে; তবুও একটু চিড় খেতে আপত্তি নেই। সেই ছ্যাঁদার পথ ধরে যে বালি ঢুকে পড়তে পারে সেদিকেও লক্ষ যে নেই তা নয়।

জয়তীর চোখ ঠোঁট থুতনি আঁটসাঁট হয়ে উঠল খানিকটা।

'আমি এ বাড়িতে এসেছি।'

'তা তো দেখছি।'

'ও-পাড়ার বিরূপাক্ষ আছে তার নানান গরম নিয়ে; আমি চলে এসেছি বলেই যে সে আমাকে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না। দেখে নেবে সে। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। তুমি না থেকে কোনো শক্ত লোক যদি এ বাড়ির ছেলে হত, তাহলেই স্বস্তি পেতাম।'

জয়তীর কথা শুনে ক্ষেমেশ ভালো বোধ করল না, কেমন একটা আক্ষেপের হাসি ফুটে উঠল তার মুখের ভেতর। ক্ষেমেশ যে শক্ত মানুষ নয়—নরম মানুষ নয়—মানুষ—তা জানে জয়তী। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে (এক সুতীর্থ ছাড়া), মিতভাষী জয়তী। কিন্তু ক্ষেমেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ক্ষেমেশের মত মিতভাষী নয়। এই মেয়েটি যদি ক্ষেমেশের যৌন ও জীবন সাহচর্যে এসে পড়ে—যেমন ক্ষেমেশের মা এসেছিল তার বাবার জীবনে তার চেয়েও প্রাণঘন ও ধীসরস গভীরতায়—তাহলে তা আর কি—ভালোই হয়—খুব ভালো হয়। এর চেয়ে বেশি ভালো— এক ঝাঁক সাগর-গামী হরিয়াল সারস যদি আজ সকালবেলা এখানে এসে পড়ে, তাতেও হবে না। ক্ষেমেশ কে কি বিয়ে করবে—শুধু কাঁচা শুধু কালো—রাত্রির অপরিমেয় প্রহরের মত চুলের গুচ্ছ নিয়ে যে মেয়েটি বসে আছে রাত্রিকে যা দেবার দিনের উজ্জ্বলতাকে যা দেবার : কারণ শরীরের ভেতর থেকে যা দান করে? ভাবতে ভাবতে সাগযানী হাওয়া আলোর—হরিয়ালদের কথা মনে পড়ল আবার ক্ষেমেশের। সে সব হরিয়ালের রৌদ্র কোলাহল যদি এসে পড়ে এখন—

'তোমাকে একটা আলাদা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি জয়তী; যেটা খুশি। কিন্তু কি করে একা থাকবে তুমি? একজন ঝি আনিয়ে নেবে? আমি তোমাকে যোগাড় করে দেব?'

'ঝির ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এক্ষুনি না পেলে জলে পড়ব না আমি। জ্যান্ত বা মড়া ভূত চিমড়ে মামদোর ভয় নেই আমার। সন্দেশ খাচ্ছ না তো।'

'আমার গোটাদশেক হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকছ তবে।'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন—'

'বুঝেছি।'

'বসবাস করতে এসেছি তোমার এখানে। বিরূপাক্ষের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কেন হল?'

'হয়ে গেল।'

'আর যাবে না তার ওখানে?'

'খোকার মত কথা বলছ কেন ক্ষেমেশ?'

'একেবারেই ছেড়ে এলে, অথচ বিয়ে করেছিলে। বিয়ে করবার সময় মানুষের মন সমুদ্রের ফিনফিনে কাঁকড়ার মত পথ খুঁজে পায় না—ফেনাজঙ্গমে ওড়ে?'

'সেই রকমই উড়েছিল ক্ষেমেশ, দেখছ তো।"

টিপট থেকে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে জয়ন্তী বললে, চলে এসেছি। চলে এসেছি কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আইনের মারপ্যাঁচ আপাতত সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু আইন বেআইন সবের ওপরেই মানুষের মন। আমি ওখানে আর যাব না।' না।'

ক্ষেমেশ চায়ের পেয়ালা একবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আবার কি মনে করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাথায় ঘুরছিল যেন অনেক পাখি অনেক ছবি ক্ষেমেশের। সেই সাত সকালে রানী সারসদের কথা মনে পড়েছিল তার। মনে হতেই কেমন বোশেখী বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেছিল তারা; অন্য সাংসারিক দশ কথার চাপে পড়ে। ছ্যাঁৎ করে রাজ-সারসদের কথা মনে পড়ল ক্ষেমেশের আবার। এখানে যদি একপাল রানীসারস চলে আসে এখন! তা যদি হয়, তাহলে আর কিছুই চায় না, কেমন যেন এক মন্ত্রসিদ্ধি জানা আছে ক্ষেমেশের যাতে সে সমুদ্র হতে পারে, হতে পারে সিন্ধু-ফেনা, উজ্জ্বল সূর্যের দিন, কত শত সারস শরীর মনের কত বিস্ফোরণ আগুনে বাতাসে নক্ষত্রে কাঁপিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

জয়ন্তী চা খাচ্ছিল—টি-পটের থেকে শেষের তলানিটুকু ঢেলে নিয়ে—মাথা হেঁট করে। ক্ষেমেশের মুখের দিকে তাকাবার কথা মনেই ছিল না তার। নিজেরই নিতান্ত সব—কি যেন ভাবছিল জয়ন্তী। ক্ষেমেশ এখনও সারসদের কথা ধ্যান করছিল—জয়ন্তীরও কথা। ও সব রানী সারস বাংলার পাখি নয়, কিন্তু অলোকসামান্য পাখি : জঙ্গল পাহাড় ভেদ করে যেসব বহতা নদীর জল ছলকে জলছানি দিয়ে নীলিমাকণিকা সূর্যগুঁড়ির উজ্জ্বলে উৎফালিত হয়ে পাথর উল্টে, শ্যাওলা ছিঁড়ে পায়রাচাঁদা চাপেলী নাচিয়ে শরবন কাঁপিয়ে কলরোল করে চলেছে সে সব অবিরল জলঠান্ডার দেশে জলগন্ধের দেশে—জলঠাকুরানীর—জলদেবীর—নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের ভেতর এইসব পাখি থাকে। ভাবতে ভাবতে ভাবনার মোড় ঘুরে গেল ক্ষেমেশের, অর্থ ও অন্তঃসার বদলে গেল, এতক্ষণ যে ক্ষেমেশের ভাবনা অয়তা অবাস্তব ছিল তা নয়, কিন্তু তাকেই যাকে বাস্তব বলি প্রায় সেই প্রদেশে ফিরে এল ক্ষেমেশের মন। সাগর সূর্য পালক পশম কি এক দিব্য ফোকাসের আলো অন্ধকার থেকে উদ্গত হয়ে যে জয়ন্তীর সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে হঠাৎ তা টের পেয়ে মনের ভাবনার খেইয়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল—একটু শব্দ করে হেসে ফেলল ক্ষেমেশ।

জয়ন্তী ঘাড় হেঁট করে নিজের মনের পথে হেঁটে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল যেন—ক্ষেমেশের হাসির শব্দ শুনতে পেল না সে হয়তো—ক্ষেমেশের দিকে ফিরে তাকাল না। কেমন সুন্দর সব—পাঁচটিকে—এমন কি ছটিকে ছাড়িয়েও কেমন যেন এক সপ্তম ইন্দ্রিয় দেখাচ্ছিল যা এতক্ষণ ক্ষেমেশকে;—সুন্দর জয়ন্তীও : ভাবছিল ক্ষেমেশ; কিন্তু তবুও দুটো মনচ্ছবি যদি ওরকম ওতপ্রোতভাবে মিশে যায় (জয়ন্তীর শাড়িটা রোদে ছায়ায় যে রকম, কমলা বাসন্তী সাদা গেরুয়া আভার দেখাচ্ছে তাতে না মিশে পারে না আর) জয়ন্তীকে তাহলে পাখিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার শক্তি থাকে না আর—দৃষ্টিভঙ্গির গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায় ক্ষেমেশের, এমনই স্খলন হয়, যে সুন্দর জিনিস দেখেও হাসি পায় তার; হাসি মুছে যায় আস্তে আস্তে, ছায়া পড়ে হৃদয়ে—কেমন কেমন যেন করুণার পাত্র মাঠ বন পাহাড় মৃত্যুর পাখি—আর এই জয়ন্তী পাখি—দেখ, কেমন মাথা উপুড় করে চুপচাপ কথা ভাবছে। হাসল না এবার ক্ষেমেশ, মন করুণ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তার। তবুও তারপর আগাগোড়া এইসব পাত্রপাত্রীর দিকে এবং এই সকলের দিকে তাকিয়ে আছে যে ক্ষেমেশ তার দিকে তাকিয়ে পরিহাস বিশুদ্ধি পেল তার—দুর্নিবার ব্যাপ্তি পেল হাসির জন্য। এই

সচ্ছল, অনুপম বিযুক্তি না থাকলে করুণ। এসে মানুষকে বেশি নিস্তব্ধ করে ফেলে—নিজেকে এই পৃথিবী গ্রহের উপযুক্ত মনে হয় না আর।

'আমি মাকে এলাহাবাদ থেকে এখানে নিয়ে আসব। তোমরা এক সঙ্গে থাকবে। আমি আজই যদি এলাহাবাদে যাই রঞ্জন তোমার ঘরের রেস্তোরাঁকে শোবে।'

'না, মাসিমাকে এখানে আনতে পারবে না।'

'কেন?'

'ও'রা হলেন সেকালের লোক। মুখ দেখাতে পারব না।'

'কিন্তু মুখ দেখাবার দরকার হবে তো—পৃথিবীতে থাকতে হলে। চেড়ীরাজ্যে অশোকবনে ছিলে—চলে এসেছ। তোমাকে ঘিরেছে কেমন একটা আচ্ছন্ন অশোকবন-গ্রন্থি—সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

জয়ন্তী একটু হেসে বললে, 'সত্যিই কোনো গ্রন্থি নেই আমার—পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন। মাসিমাকে এখন এলাহাবাদ থেকে আনার দরকার নেই।'

'এক-একটা পুরোনো দালানে নাগকন্যা থাকে। চোখে না দেখলে বুঝতে পারা যায় না যে রূপ মানে অত রূপ। কিন্তু চোখে তাকে দেখা যায় না। জয়ন্তী, তোমাকে তো দেখেছি। তুমি কি করে মানুষের চোখ এড়িয়ে নাগকন্যা হয়ে থাকবে?'

'চোখে তো দেখছ,' রোদের ভেতর ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ঘুম এল না—আলাদা পটভূমি এল, আলাদা সূর্য জেগে উঠল জয়ন্তীর মনে: কিন্তু পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন নয়, এই সূর্যই তো: আকাশের দক্ষিণ কিনারে—দূরত্বে—কাছেই; জয়ন্তী আস্তে আস্তে বললে, 'সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ কে?'

'সুতীর্থ গুপ্ত—চেন না?'

'ওঃ, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কয়েক-দিন আগে। কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম।'

'বিরূপাক্ষের একটা বাড়ি আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'কটা বাড়ি ওর?'

'গোটা তিনেক।'

'এর ভেতর একটা তোমার?'

'হ্যাঁ, আইনত, দলিলপত্র আমার কাছে আছে।'

কথাটা ক্ষেমেশের কানেই গেল না যেন—কাছেই একটা সজনে গাছের হালকা ডালে ঘাসের চেয়েও বেশি গাঢ় সবুজ একটা পাখি এসে বসেছিল। সচরাচর এরকম পাখি দেখা যায় না—কেমন একটা হেমন্তগভীর দৃষ্টিলাবণ্য নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ: কি নাম এই পাখিটার? বাংলা নাম কি?

'পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে এসেছি।'

'ব্যাংকে তোমার নামে রেখেছিল বিরূপাক্ষ?'

'রাখিয়েছিলুম।'

'কোন ব্যাংকে? গিয়ে খতিয়ে দেখেছ তো নিজের চোখে—'

'লয়েডসে, চার্টার্ড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে আরো আছে এদিকে সেদিকে। ঠিক আছে।'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ?'

'না। ভেকেন্ট পজেশন।'

'বাড়িটা কোথায়?

'বালিগঞ্জে। ভাড়াটে বসাব নিচের তলায়। ওপরে তিনটে কোঠা আছে—আমি থাকব।'

ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে একটা উড়ন্ত আগন্তুক পাখির দিকে নিমগ্ন হয়ে তাকিয়েছিল; কি প্রগাঢ় নীলের বেল কেমন ফিকে নীলে মিশে গেছে; কমলা লেবুর রং সোনালি হয়ে যাচ্ছে; বুকের কাছে দুধের মত সাদা পালক। কী নাম এই পাখির?

'বিরূপাক্ষের টাকা তুমি না নিলেও পারতে হয়তো জয়ন্তী।'

"কেন?'

'টাকাই কি সব?'

'সব নয়? মাস্টারী করে খেতে বলছ হয়তো আমাকে, অথচ নিজে তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার বাবার পঞ্চাশ হাজারে তো চালাচ্ছ।'

'বিরূপাক্ষের মতন একটা মানুষ—ওর টাকা তো ভদ্র অভদ্র সব ধরের বাটি চেলে আদায় করা।'

'তার মানে?'

'মানে—ওটা আমার একটা উপমা।'

'উপমাটা বেয়াল্লিকের মত হল। বিরূপাক্ষের টাকা ছুঁলে আমার কুষ্ঠ হবে না। পঁচিশ লাখ টাকা—তিনটে বাড়ি—বাড়িগুলো—সমস্ত সম্পত্তিই তো আমার প্রাপ্য। টিঁকে থাকলে পেতুম সব—কিন্তু সবই প্রায় ছেড়ে দিয়েছি: মানুষের প্রাণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায় বলে।'

জয়ন্তীর কথা শুনে সেই পাখিটার দিকে ক্ষেমেশ ফিরে তাকাল আবার। পাখিটা একা কেন? ক্ষেমেশের বাড়িতে—সমস্ত বেলগাছিয়া অঞ্চলটে—সময়ের প্রবাহের ভেতরেই কেমন একটা অপরিচিত যেন পাখিটা। এসব পাখি তাহলে জন্মলাভ করে! হাওয়ার ভেতর থেকে? কেউ আছে? কাছে লুকিয়ে? সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

'তুমি বড় ভালগার ক্ষেমেশ।'

ক্ষেমেশ চমকে উঠে জয়ন্তীর দিকে তাকাল। 'আমি? কেন, কি করেছি বলতো জয়ন্তী?'

'কি করেছ তুমি? যা করতে পার তাই করেছ। ভেবেছিলুম বন্ধু হবে,—এড়িয়ে যাবে। ছি, ছি, বড্ড নোংরা। গা ঘিন ঘিন করছে আমার।'

'কিন্তু কয়েকটা বছর বিরূপাক্ষের সঙ্গে কাটিয়ে এলে তো তুমি। তা যদি সম্ভব হল—'

জয়ন্তীর কান্নার সাড়া—খুব অস্ফুট—টের পেয়ে ক্ষেমেশ কথা বলতে বলতে থেমে গেল।

(ক্রমশ)

প্রকৃতির যত্নেই চুলের বাহার
কেএমপি
খাঁটি নারকেল তেল
চুলের পুরোপুরি
যত্নের পক্ষে
এক অপরিহার্য
উপাদান
KMP
BRAND
COCOANUT OIL
PABITRA HINDU OIL MILLS, CALCUTTA 700007
kmp
কেএমপি নারকেল তেল
বিশুদ্ধ ও তাজা
খাঁটি তেলের রাজা
কেএমপি নারকেল তেল একেবারে খাঁটি। আপনার চুলের
পক্ষে ক্ষতিকর কোনো কৃত্রিম রঞ্জক বা অন্য কোনো দ্রব্য
এতে মেশানো নেই। সেরা নারকেল থেকে অত্যন্ত
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই তেল তৈরি। কেএমপি নারকেল
তেল ব্যবহারে চুলের গোছ ঘন হয়, চুল ওঠাও বন্ধ
হয়। চুল ঘন করবার, চুলে বাহার ও চাকচিক্য
আনবার এই গোপন রহস্য চলে আসছে
পুরুষানুক্রমে। কেএমপি—১৯০৭ সাল
থেকে সকলের গভীর আস্থা

বেনারসে একবার এক সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন সবেমাত্র সাহেবরা জাত খোয়াতে শুরু করেছে। পরাধীন ভারতে যাদের জন্ম, তারা যেসব সাহেব দেখেছে, তাদের সঙ্গে এইসব সাহেবের কোনো মিলই নেই। তখন সাহেবরা ছিল আসল সাহেব, নিখুঁত স্যুট টাই পরা, গ্যাটম্যাট করে ইংরেজি বলতো, আমাদের মতন নেটিভদের মনে করতো মানুষের চেয়ে কিছু ছোটো জাতের প্রাণী। হ্যাঁ, সত্যিকারের ভয় ও ভক্তি হতো সেইসব সাহেবদের দেখে।

আমি পরাধীন আমলের শিশু। হাতিবাগান বাজারের কাছে এক সাহেব পুলিসের হাতে গলাধাক্কা খাওয়ার পর থেকে ওই জাতটির প্রতি আমার মনের মধ্যে একটা ঘৃণা ও আক্রোশের ভাব ছিল অনেকদিন। দন্তী, নখী ও শৃঙ্গীদের মতন আমি এদেরও পরিহার করে চলতুম। সুতরাং কাশীতে সেই সাহেবটির সঙ্গে আমি সহজে আলাপ করতে চাইনি।

যখনকার কথা বলছি, তখনো আমাদের দেশে হাজারে হাজারে হিপি-হিপিনীদের আবির্ভাব শুরু হয়নি। এখন সাহেবরা আমাদের চোখে জলভাত হয়ে গেছে। নোংরা পোশাক, খালি পা, জটলা চুল মাথার সাহেব মেম দেখলে এখন আর কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু তখন রাস্তায় বিস্মিত লোকের ভিড় জমে যেত।

ঐ সাহেবটি এবং তার বন্ধুবান্ধবরা ছিল হিপিদের পূর্বসূরী। এদের নাম ছিল বীট, কেউ কেউ বলতো বীটনিক, এদের উদ্ভব আমেরিকায়—এরা সকলেই কবি বা ঔপন্যাসিক বা শিল্পী বা ধর্মপিপাসু—বুদ্ধদেব বসু প্রথম এদের সম্পর্কে বাংলায় প্রবন্ধ লেখেন। ইংলণ্ডে এর কিছু আগে শুরু হয়েছে অ্যাংরি ইয়ংমেনদের যুগ। এরা হিপিদের মতন নিছক ছন্নছাড়া নয়, তখনো ভিয়েৎনামে মার্কিন যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হয়নি বলে নিছক নামকাটা সেপাইরা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েনি। বীটরা চাইতো শুধু শিল্প সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে, তাই অন্য কোনোরকম কাজকর্মে তারা বিশ্বাসী ছিল না, জীবন কাটাতো খুব সরলভাবে ও কম খরচে।

বেনারসে প্রথম সেই সাহেবটিকে দেখে আমিও চমকে উঠেছিলাম। একটা সাদা নোংরা পাজামা, তার ওপর টকটকে লাল রঙের পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের চটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথাভর্তি বাবরি চুল, গালে বিশাল গোঁফদাড়ির জঙ্গল—অনেকদিন রোদ বৃষ্টিতে ঘুরে রংটা পোড়া পোড়া, প্রথমে সাহেব বলে চেনা যায় না, আবার একটু পরেই চেনা যায়, কারণ জলের মধ্যে তেলের মতন সাহেবরা অন্য মানুষদের মধ্যে কিছুতেই লুকোতে পারে না।

আমি প্রতিকর্ষণের বাটীর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সাহেবটি সরাসরি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি সংস্কৃত জানো?

আমি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, সাহেবেরা বিনা পরিচয়ে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলে না, শুধু ধমক বা গালাগালি দেওয়া ছাড়া। তা ছাড়া আমেরিকানদের উচ্চারণ আমি ঠিক ভালো বুঝতে পারি না।

সুতরাং একটু থেমে, আগে মনে মনে বাক্যটা তৈরি করে নিয়ে, তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনি কী বললেন?

—তুমি সংস্কৃত জানো?

—হ্যাঁ জানি।

উত্তর দিয়েই আমি মনে মনে জিভ কাটলাম! সংস্কৃত? স্কুলে পড়ার সময় আমি বরাবর সংস্কৃত পরীক্ষার দিন নাকের জলে চোখের জলে এক হয়েছি। শব্দরূপ মুখস্ত করতে গেলেই মনে হতো কে যেন আমার মাথায় হাতুড়ি মারছে! সেই আমি এ কি বললাম? সংস্কৃতের ব্যাপারে সাহেবদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়, কারণ সাহেবরাই

আমাদের দেশে নতুন করে সংস্কৃতের চর্চা শুরু করে গেছে। এ যদি এখন আমার পরীক্ষা নেয়? সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলির মন্ত্রটুকু ছাড়া আর তো কিছুই আমার মুখস্ত নেই!

সাহেবটি একটি সাধুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, তুমি ওঁকে আমার দু' একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে?

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ছাড়া, আমি আর কোনো সাধুকে কখনো সংস্কৃতে কথা বলতে শুনিনি। ভাঙা হিন্দীতে দিব্যি কাজ চলে যায়। উৎসাহের সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই পারবো।

সাধুটির চেহারা একেবারে বাঘের মতন। বাঘের সঙ্গে ঠিক কোন্ জায়গায় মিল তা আমি বলতে পারবো না, তবে তাকে দেখলে ঐ কথাই মনে হয়। জল-কাদার ওপর জোড়াসনে ঋজুভাবে বসে আছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তরুণ বয়স্ক, দারুণ সবল চেহারা, শরীরে এক ছিটে মেদ নেই, চোখ দুটি খোলা—এবং জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। সাহেবটির সঙ্গে আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সাহেবটি বললো, তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, আমি জানতে চাই, এই যে উনি শীতের মধ্যে খালি গায়ে জল-কাদার মধ্যে বসে আছেন, তা কেন, কিসের জন্য? মানুষ কি করে নিজের চেতনার সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারে?

আমি সাধুটির সামনে হাঁটুগেড়ে বসে বললাম...

আমি সাধুটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললাম, বাবা এই সাহেব অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে, আপনার কাছ থেকে দু' একটা কথা জানতে চায়। আপনি দয়া করে একটু শুনবেন কি?

সাধুটি কোনো উত্তর না দিয়ে কটমট করে আমার দিকে তাকালো।

সাহেবটি ভাবলো, আমি বুঝি তার কথাই সাধুটিকে জিজ্ঞেস করেছি। সে আবার বললো, তুমি ওঁকে বলো, আমি একটি শিশু, শিশু যেমন বাবার হাত ধরে অচেনা জায়গায় যায়, সেই রকম আমিও ওঁর নির্দেশ নিয়ে চেতনার সীমানা ছাড়ানো সেই রহস্যময় গহনলোকে যেতে চাই।

আমি এবার সাহেবটিকেই আগে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এরকম কথা চট করে শোনা যায় না তো। তার ব্যবহারে কোনো হালকা ভাব নেই। বরং তাঁর চোখে মুখে একটা উঁচু জাতের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সাহেবটি সাধারণ নয়।

সাধুটিকে আবার বললাম, বাবা, ইনি জানতে চাইছেন...

সাধু জলে হাত ডুবিয়ে কাদার ওপরে একটা গোল চিহ্ন আঁকলো। তারপর তার চার পাশে আরও কয়েকটি দাগ কাটতে লাগলো। হতে পারে এটা কোনো সাঙ্কেতিক ভাষা, কিন্তু এর মানে বোঝা আমার সাধ্য নয়।

সাধুটিকে খুশী করবার জন্য আমি তার পা ছুঁতে যেতেই সে দড়াম করে আমাকে এক লাথি কষালো। সাধু সন্ন্যাসী-দের এরকম ব্যবহার দেখলে লোকের আরও ভক্তি বাড়ে। আমার রাগ হলো। উল্টে আমিও একটা লাথি ঝাড়বো কিনা ভাব-ছিলুম, তখনই বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা কথা আমার মনে পড়লো। সাধুটি আসলে মৌনী। আমরা শুধু শুধু ওকে বিরক্ত করছি। সংস্কৃত বা হিন্দী—কোনো ভাষাতেই ওকে কথা বলানো যাবে না, অন্তত আজ!

সাহেবটিকে সেই কথা বলতেই সে প্রভূত পরিমাণে ক্ষমা চাইলো। লজ্জিত ও অনুতপ্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাঁটতে লাগলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। একটু বাদে সে তার কাঁধে ঝোলানো চটের থলে থেকে দুটো কলা বার করলো। আমাকে দিয়ে বললো, খাও।

আমার পূর্ব পুরুষদের মতন কলা সম্পর্কে আমার কোনো আসক্তি নেই। ফল পাকুড়ই আমি পছন্দ করি না। তবু প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। এত অল্প চেনা লোককে কেউ ফট করে একটা কলা খেতে দেয় না।

খোসা ছাড়িয়ে কলায় একটা কামড় বসিয়ে সে বললো, অপূর্ব! অতীব মহৎ বস্তু!

সত্যিই সেই মর্তমান কলা, ঠিকঠিক পাকা, খুবই সুস্বাদু ছিল।

সাহেবটি বললো, ঈশ্বর একজন ভালো পাচক।

একটু থেমে সে আবার বললো, না, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ পাচক। তাই না?

(তার অবিকল ভাষা ছিল, গড ইজ আ গুড কুক...উমমম, নো, গড ইজ দা বেস্ট কুক! ইজ নট ইট?)

সেই থেকে সাহেবটির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তার নাম

অ্যালেন। আর এক বন্ধুর সঙ্গে সে একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। তারা দুজনেই কবি। আমি মাঝে মাঝে যেতাম ওদের ঘরে। একটা জিনিস দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যেতাম, কত কম উপকরণে ওরা জীবন কাটাতে পারে। খাওয়াদাওয়ার কোনো ঠিক নেই, যখন খিদে পায়, বেরিয়ে গিয়ে কিছু ফলটল বা দু'চারখানা হাতে গড়া রুটি কিনে নেয়। দুটি মাত্র কম্বল ছাড়া ওদের শয্যা বলতেও আর কিছু নেই। নানান বইতে পড়েছি, চিত্রশিল্পীরা দেশ বিদেশের নানান জায়গায় গিয়ে বহু রকমের জীবন কাটিয়েছে—কিন্তু কবিদেরও যে সে রকম জীবন কাটাবার দরকার থাকতে পারে, তা ওদের দেখে বুঝলাম। তখন আমাদের দেশের কবিদের এই সুযোগের অভাবের কথা ভেবে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়েছে।

অ্যালেনের আগ্রহ ঠিক ঈশ্বর বা ধর্ম সম্পর্কে নয়—বরং ধ্যান বা সাধনায় মানুষের চেতনার আরও বিস্তার হতে পারে কিনা, তাই ও জানতে চায়। ও চায় ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আরও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করতে—এটা কবির যোগ্য অনুসন্ধান নিশ্চিত।

যাই হোক, এই রচনাটি শুধু ঐ অ্যালেনের পরিচয় দেবার জন্যই নয়। রচনাটির নাম হওয়া উচিত, সাহেব ও শিবুর মা। শিবুর মা সম্পর্কে একটু পরেই বলছি।

অ্যালেনের সঙ্গে আমার পরে আরও অনেক জায়গায় অনেকবার দেখা হয়েছে। ও দেশে ফিরে গিয়ে আবার হঠাৎ চলে এসেছে। আমি ওদের দেশে গিয়ে ওর বাড়িতে থেকেছি। চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে, কলকাতায় বসে হঠাৎ ওর টেলিফোন পেয়েছি, ইত্যাদি।

সেই রকমই, অ্যালেন একবার হঠাৎ কলকাতায় এসেছে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারে ঘরভাড়া নিয়ে সেখানে জিনিসপত্র রেখে তারপর সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে এসেছে আমাকে খুঁজতে।

সন্ধেবেলায় আমি কি করে বাড়িতে থাকবো? তাহলে তো মাধ্যাকর্ষণের নিয়মই উল্টে যায়। সেই সন্ধেবেলা আমার আমাদের বাড়িতে আর কেউই ছিল না। শিবুর মা ছাড়া।

শিবুর মা আমাদের বাড়ির রাঁধুনি। বয়েস হয়েছে অনেক এবং বিশ্ব সংসারে তার কেউ নেই। এমন কি শিবুর মা নামটা এখনো থেকে গেলেও তার শিবু মরে হেজে গেছে বহুদিন। শিবুর মা বিধবা হয়েছে মাত্র আঠারো বছর বয়েসে, তারপর এতগুলো বছর ধরে বহু দুঃখ কষ্ট পেয়েছে কিন্তু কোনোরকম তিক্ততা নেই। সব সময় হাসিখুশী মুখ, আমাদের পাড়ার সবাই শিবুর মাকে ভালোবাসে।

শিবুর মায়ের বাড়ি সুন্দরবনের কাছা-কাছি, সেখানে তার দু'তিনটি পালিত পুত্র-কন্যা আছে। তার মাইনের টাকা সেখানেই পাঠায়। আমরা কতবার সৎ উপদেশ দিয়েছি, টাকাগুলো তার অথর্ব দশার জন্য জমাতে, কিন্তু সে তা শোনে না। হাসিমুখে বলে, ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই।

শিবুর মা তার স্বামীর মৃত্যুটাও ভাগ্য হিসেবেই মেনে নিয়েছিল। তার স্বামীর পেশা ছিল সুন্দরবন থেকে মধু এনে বিক্রি করা। এ জন্য লাইসেন্স লাগে, কিন্তু শিবুর বাবার লাইসেন্স ছিল না, লুকিয়ে চুরিয়েই কাজটা চালাতো। এর ফলে একদিন বাঘের পেটে প্রাণ হারানোই ছিল তার পক্ষে অতি স্বাভাবিক নিয়তি—কিন্তু সে মরেছিল গুলি খেয়ে। বনবিভাগের সাহেবরা এসেছিল একটা গন্ডা বাঘ মারতে, এক আনাড়ি সাহেবের বন্দুক থেকে উল্টোদিকে গুলি ছুটে গিয়ে শিবুর বাবার পেট ফুটো করে দেয়। ঘরে আঠারো বছরের প্রসবিতী বউ ও একটি তিন বছরের শিশু রেখে সে জঙ্গলের মধ্যে চিৎপাত হয়ে মরে পড়ে থাকে। দায়িত্বজ্ঞানহীন আর কাকে বলে!

যে-সাহেবের বন্দুক থেকে গুলি ছুটে-ছিল, সে ছিল একজন খাঁটি গোরা। কিন্তু তার কোনো শাস্তি হয়নি আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায়। এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় শিবুর মা চোখ বড় বড় করে আমাদের বলেছে, শিবুর বাপের যে লাইসিন ছিলনি, মা! লাইসিন না নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, তাই সাহেবরা বললো, আমরা কি জানি! কেন সে এয়েছিল, আগে তার হিসেব দাখিল করো!

যেন প্রকৃতির জঙ্গলে জীবিকা অর্জনের জন্য গিয়ে শিবুর বাবা মস্ত এক অপরাধ করে ফেলেছিল। এই জন্য যে শিবু এবং শিবুর মাকেও মেরে ফেলা হয়নি, এটাই তো মস্ত বড় ভাগ্যের কথা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বন বিভাগ থেকে দয়াকান্ত চৌদ্দ শো টাকা দেওয়া হয়েছিল শিবুর মাকে। এই কাহিনীর এই অংশটাই আমি কখনো বুঝতে পারিনি। ঠিক কোন হিসেবে, কোন বিশেষ কায়দায় যে একটা লোকের জীবনের দাম ঠিক চৌদ্দ শো টাকা নির্দিষ্ট করা হয়, তা বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য।

স্বামীর হত্যাকারীকে তো নয়ই, জীবনে কোনো সাহেবকেই শিবুর মা দেখেনি সামনা-সামনি। দেখলো সেদিন সন্ধেবেলা।

বাড়িতে আর কেউ না থাকলে শিবুর মা অতিথিদের দরজা খোলে না। খুব সাবধানে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলে দেয়, বাড়ি নেই কেউ!

অ্যালেনের গায়ে সেদিন গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, গলায় সেই রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা চুল আর মুখ ভর্তি দাড়ি দেখে ভেবেছে কোনো সাধু সন্ন্যাসী। সিঁড়ির আবছা আলোয় তাকে সাহেব বলে চিনতে পারেনি। দুজনে কেউ কারুর কথা বোঝে না। শেষ পর্যন্ত অ্যালেন হাতের ইশারায় জানিয়েছে যে সে একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাবে।

অনেক চিন্তা করে দরজা খুলে দিয়েছে শিবুর মা। সাধু হলে তখন ভয় নেই। অ্যালেন হয়তো শিবুর মাকে ভেবেছে আমার মা, কিংবা রাঁধুনি হিসেবে বুঝতে পারলেও কিছু আসে যায় না—সব মানুষকে সে সমান শ্রদ্ধা করে। দরজা খোলার পর সে সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায় শিবুর মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছে, মাই রিগার্ডস ম্যাম! কোনো সাধু প্রণাম করতে আসছে দেখে শিবুর মা ধড়ফড় করে তাকে বাধা দিতে গেছে, তখন বুঝেছে, শুধু সাধু নয়, সাহেব!

আমরা রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে দেখি, দরজা খোলা, তার সামনেই মাটিতে বসে আছে শিবুর মা, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

কী হয়েছে, কী হয়েছে শিবুর মা? আমাদের বারবার প্রশ্নেও সে কোনো উত্তর দেয় না। যেন তার ঘোর লাগা অবস্থা। তারপর এক সময় সে ডুকরে বলে উঠলো, ওগো, সে এয়েছিল, একজন সাহেব, ঠিক সাধুর মতন, কত তার ভক্তি, কত তার মায়া......

তারপর শিবুর মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কাঁদছো কেন? সাহেব এসেছিল বলে কাঁদছো কেন শিবুর মা? আমরা সবাই জিজ্ঞেস করলাম।

—সে আমার পায়ে ধরেছিল! সে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছিল, সে বলে-ছিল, আমি এসেছি, মা! সে বোধ হয় তার ছেলে, আমার কান্না দেখে সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিল—ওগো আমি কোথায় রাখবো, এত সুখ আমার ভাগ্যে ছিল......

আমরা নির্বাক হয়ে রইলাম। অ্যালেন কোনোদিন জানতেও পারবে না সে সামান্য একটু সৌজন্যে শিবুর মায়ের দুঃখী জীবন কতখানি ধন্য করে দিয়ে গেছে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে, শিবুর মায়ের স্বামীহন্তার জাতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ : চলচ্চিত্রের নানা বিষয়

বিষয় চলচ্চিত্র। সত্যজিৎ রায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯। মূল্য ১০·০০।

চলচ্চিত্র-শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত ইতস্তত ছড়ানো বাঙলা রচনাগুলি একত্রিত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেই দিক থেকে প্রকাশক সংকলনের দায়িত্বভার নিয়ে অবশ্যই এক মহৎ কর্তব্য করলেন।

সংকলনটির মধ্যে তেরোটি প্রবন্ধ আছে। এর মধ্যে এগারোটি প্রবন্ধ 'দেশ' পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি দুটি তাঁর ছবির বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতিবাদে লেখা।

ইতস্তত এই রচনাগুলি থেকে চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে বা চলচ্চিত্র-শিল্পী সম্পর্কে বিশদ ধারণা হবে এটা আশা করা যায় না, লেখকও আশা করেন না। সাহিত্য নাটক ছবি গান ইত্যাদির প্রভাব সত্ত্বেও চলচ্চিত্রের যে এক বিশেষ শিল্প-মূল্য আছে এবং এই শিল্পের গুণাগুণ বিচারে যে বিশেষ বোধশক্তির প্রয়োজন—প্রধানত এই দুটি ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্যেই লেখাগুলি সংকলিত হয়েছে। সংকলনের পরিকল্পনায় যত্নের কোনো ত্রুটি দেখি না।

প্রথম প্রবন্ধটি 'চলচ্চিত্রের ভাষা : সেকাল একাল'। চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটিকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে প্রসঙ্গত ক্লোজ আপ, মিড-শট, লঙ-শট, মিক্স বা ফেড, সুপার ইম্পোজিশন, ট্র্যাকিং-শট, মন্তাজ ইত্যাদি টেকনিক্যাল বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া ক্যামেরা ও অভিনয়ের যথাযোগ্য সম্মিলন, চলচ্চিত্রের সাংগীতিক গুণ ও সাহিত্যিক গুণ, বিভিন্ন প্রতিভাবান পরিচালকের ক্যামেরার কৌশল ও নতুন নতুন চিত্রভাষা ইত্যাদির আকর্ষণীয় বর্ণনা প্রবন্ধটিকে চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা দিয়েছে। কেবল চলচ্চিত্রের সংগীত-ব্যবহার ব্যাপারটি আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থেকে গেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিন্যস্ত চলচ্চিত্র সংগীত-গুণান্বিত। অন্যত্র বলা হচ্ছে ছন্দ, গতি, কণ্ট্রাস্ট ইত্যাদির সমন্বয়েই সাংগীতিক গুণ ফুটে ওঠে। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছন্দ-তাল-লয়ের সুসমঞ্জস প্রয়োগই কি সাংগীতিক গুণ? যে-কোনো শিল্পেই তো এই গুণ থাকবার কথা। বোধ হয় তাই বুঝিয়েছেন। এই গুণে ধ্বনি ছাড়া আরও কি কি কৌশল ভূমিকা নিয়ে থাকে তার একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রয়োজন ছিল।

ঠিক এই জাতেরই আর একটি প্রবন্ধ 'চলচ্চিত্র রচনা : আঙ্গিক, ভাষা ও ভঙ্গি'। বোধ হয় এখানে ছবি তৈরির কাজটুকুকে ব্যাখ্যা করে 'পথের পাঁচালি' ছবির একটি দৃশ্য-পর্যায় নিয়ে যে সুন্দর আলোচনা করেছেন—শটগুলি ব্যাখ্যা সূত্রে—তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে, শব্দ-ধ্বনি-ক্লোজ আপ, মিড ও লং শট, ডিজলভ, ফেড আউট ইত্যাদির মাধ্যমে কিভাবে সাংগীতিক সৌষম্য পেয়ে যায় চলচ্চিত্র। বোধ হয় এই দুটি প্রবন্ধ এবং তার সঙ্গে 'ডিটেল সম্পর্কে দু-চার কথা', 'চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গ', 'আবহসংগীত প্রসঙ্গে'—এই তিনটি প্রবন্ধকে যুক্ত করে নিলে মোটা-মুটি চলচ্চিত্র-শিল্প-তত্ত্বের গভীর কথাগুলি একত্র পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়

সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই যেন উপভোগ করছি। কেননা চিত্রনাট্যকারকে কাহিনীর চরিত্রের সংলাপ, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, পরিবেশগত ডিটেল্স্ সবই বুঝতে হয়। আর সেই সব বোঝাতে সত্যজিৎবাবু অনেক সময়েই সাহিত্যের বিশ্লেষণে নেমে গভীর ও সূক্ষ্ম তারে ঘা দিয়ে ফেলেছেন। সেটা আমাদের উপরিপাওনা।

এ ছাড়া আছে 'অপুর সংসার' ও 'চারুলতা' প্রসঙ্গে দুটি বিতর্কের উত্তর। রঙীন ছবি 'অশনি সংকেত' সম্পর্কে সত্যজিৎবাবুর বক্তব্য—দারিদ্র্যেরও রঙ আছে—সত্যিই ভেবে দেখার মতো। আর 'দুই চরিত্র', 'একথা সেকথা' উপভোগ্য দুটি সাহিত্যিক স্কেচ। 'বিনোদ'-দা'ও তাই। চলচ্চিত্রের অভিনয়-প্রতিভা কিংবা অভিনয়-কৌশল, কিংবা কোনো তথ্য—যাই থাক না কেন—চরিত্র-চিত্রণ হিসেবে এই তিনটির তুলনা নেই।

বিষয় চলচ্চিত্র ঠিকই, কিন্তু আর্টের অনেক গোড়ার কথাই চমৎকার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক স্কেচগুলিও কৌতূহলী পাঠকের উপরি-পাওনা।

উজ্জ্বল মজুমদার

গল্প সংকলন

মানুষ যেদিন হাসবে না। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। ব্লু-বেল পাবলিশার্স, ১২৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। সাত টাকা।

'ওহে, শোন, শোন, এটা শুনেছো নাকি? সেই যে কুতবমিনারের উপরে [illegible] লোকটির হাত থেকে রিস্টওয়াচ নীচে পড়ে গেছে। সে তো হুড়তে পড়তে নেমে এসে উপরের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই জিজ্ঞেস করে ব্যাপারখানা কি? কুতবমিনারের নীচে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছ কেন? না, আমার ঘড়িটা ওপর থেকে পড়ে গেছে। ঘড়ি পড়ে গেছে তো এখন এমনিভাবে দাঁড়িয়ে কেন? সে কি এখনও পড়ছে নাকি? পড়বেই তো, আসলে আমার ঘড়িটা দশ মিনিট স্লো ছিল কিনা।' শম্ভু মেননের এই গল্প শুনে কেউ কেউ হো হো করে হেসে উঠলেও তার তৈরি বিশাল যন্ত্রগণক, যার তিনি নাম রেখেছেন 'অচিন্ত্য'—তার কারবার দেখে মনে হয় মানুষ ভবিষ্যতে সত্যিই কি আর হাসতে পারবে?

একটি নয়। আটটি গল্পের সঙ্কলন **মানুষ যেদিন হাসবে না** বইটির পাতায় পাতায়। বর্তমান যুগের মানুষকে এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন উঁচু এবং খাড়া সমুদ্রপারের ধারে। দাঁড় করিয়ে পেছন

থেকে ধাক্কা মেরেছেন এমনভাবে যেন মানুষটি সমুদ্র গর্ভে পড়ে না যায়, অথচ পড়ে যাওয়ার রোমাঞ্চ এবং ভয় দুই-ই অনুভব করতে পারে।

যেমন 'অমরাবতী' গল্পে ভিন্ন নক্ষত্রে যাত্রা করতে গিয়ে যাত্রীদের সংশয়, 'অর্ধেক মানবী তুমি' গল্পে হাজার হাজার দর্শককে যে রূপমুগ্ধ করে রেখেছিল সেই নয়নতারাকে নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অথবা জলভরা মেঘ গল্পে বাবা মারা যাচ্ছেন শ্রীরঙ্গপট্টমে সেখানে গঙ্গাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা—বলা বাহুল্য, এণাক্ষীর প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই যেন পাওয়া যায় খেয়ালিপনা কল্পনার এমন সব নিদর্শন—যা পাঠক-পাঠিকাকে মুহূর্তে কৌতূহলী করে তুলবে, কখনও হাসাবে, অবশেষে খানিকটা ভাবিতও করবে। সব কিছু মিলে নতুন স্বাদের এই বইটি সকলের ভাল লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গত কুড়ি বছরে লেখা নানা ধরনের কবিতার একত্র-সংকলন ভাস্বতী চট্টোপাধ্যায়ের শব্দের বুলেটে ক্ষত (কারেন্ট বুক শপ, কলকাতা ১২, তিন টাকা)। তুলনায় প্রাচীন রচনাগুলিকে তিনি 'যে-কোন কোরকের স্বপ্ন : শ্রাবণ' নামে একটি পৃথক পর্বে সন্নিবিষ্ট করেছেন। ভালোই করেছেন। কেননা 'সহিয়াছি' 'মোর' 'বুঝিতে' প্রমুখ শব্দ-ব্যবহার এখন কানে লাগে। তবে প্রাক্তন চেতনায় 'ধানসিঁড়ি নদী' বা 'বিদিশার নিশা' যে-ভাবে সঞ্চারিত, নতুন পর্বের রচনাতেও তার ছায়া। যেমন, 'মাঝে-মাঝে আমার মগ্ন চেতনায়/এক বিপন্ন বিস্ময় কাজ করে' স্পষ্টতই জীবনানন্দকে মনে পড়িয়ে দেয়। 'তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি' 'সুন্দর অজিনের জন্য কস্তুরী হল নিবাদনিহত' মনে পড়ায় সুকান্তকে ('এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি') অথবা চর্যাপদের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটিকে : 'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী।' অবশ্য এ প্রভাব সর্বদা খারাপ তা বলব না। বিশেষ করে এ সমস্ত কিছুকে ছাপিয়েই যখন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু ঝকঝকে কবিতা লিখতে পেরেছেন। তাঁর ছন্দ-ব্যবহার দু-এক ক্ষেত্রে শিথিল। যেমন 'আর কি কখনও কলকণ্ঠ হবে?' পঙ্‌ক্তিটিতে 'কখনও'-কে চার মাত্রার মূল্য দিয়েছেন তিনি। অথচ তিন মাত্রার বেশী মূল্য কোনো মতেই দেওয়া যায় না।

*

বলার কথাকে খুব সহজ করে বলতে

চান অমূল্যকুমার চক্রবর্তী। **স্বদেশে ঈশ্বর** (সংস্কৃতি পরিক্রমা, কলকাতা ১৯ তিন টাকা)। কাব্যগ্রন্থে '৬২ থেকে '৭১ পর্যন্ত দশ বছরে লেখা রচনার সংকলনে। এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ।

সহজ করে বলা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু কতটা সহজ? 'আমি গড়তে চাই ঈশ্বর যার এখনো/জন্মই হয়নি'—'স্বদেশে ঈশ্বর' সম্পর্কে অমূল্যবাবু প্রথমেই সরাসরি ব্যক্ত করেছেন তাঁর মনোগত ইচ্ছাকে। কিন্তু এর মধ্যে অতিরিক্ত কোনো ব্যঞ্জনা নেই। তাঁর রচনার এটাই প্রধান দুর্বলতা। তিনি বলতে চান, 'বলার বিষয়ও কম নেই, এবং সহজ সুরে গভীর কথা বলার সাধনাই চরমতম সাধনা—তবু যে অমূল্যবাবুর কোনো কবিতা তেমন দাগ কাটে না তার কারণ তিনি 'আধেক ধরা-পড়া ও আধেক বাকী রাখায়' বিশ্বাসী নন। ফলে প্রতিধ্বনিহীন মনে হয় তাঁর রচনা।

তবে ছন্দের কিছু সু-ব্যবহার করতে পেরেছেন অমূল্যবাবু। ছন্দোজ্ঞানও যে কবিতা রচনার একটা বড়ো ভিত্তি এ-কথা কে না স্বীকার করবে!

বিবিধ

জগদ্‌গুরু স্বামী স্বরূপানন্দ। শ্রীহরি প্রামাণিক। ২·৫০। প্রাপ্তিস্থান : পূর্ব মাধবপুর। মেদিনীপুর (দীঘা)।

স্বামী স্বরূপানন্দের মহিমা এক একজন ভক্তের কাছে এক এক রকম ফলে। দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীহরি প্রামাণিক তাঁর স্বরচিত কবিতায় গুরুর প্রতি তাঁর অমলিন হৃদয় অর্ঘ তুলে ধরেছেন। প্রেমমাহাত্ম্যে বর্ণিত আধ্যাত্মিক লীলায় বিশ্বাসী ভক্তের কাছে এই বইয়ের কবিতাগুলি যে অনুরণন পৌঁছে দেয় তা গুরুভক্তির, ঈশ্বর বিশ্বাসের।

অগ্রগতির পথে ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন শাখা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। রাজভবন। কলিকাতা।

ঝাড়গ্রামের উন্নয়ন শাখা ঝাড়গ্রামের উন্নতির সুন্দর সচিত্র এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করে সর্বসাধারণের ঝাড়গ্রাম সম্পর্কে কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছেন। বহু পূর্ব থেকেই আদিবাসী অঞ্চল ঝাড়গ্রাম স্বাস্থ্যান্বেষীদের কাছে একটি আকর্ষণের নিসর্গ-কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে সেখানকার শিক্ষা, রাস্তাঘাট, কৃষি, যোগাযোগ সড়ক, শিল্প কাজ, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়ন সম্পর্কে এই সুন্দর পুস্তিকাটিতে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

খেলার মাঠে

ইংলণ্ডের টেস্ট ক্রিকেটে দীনতা

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হলেও ব্যাটে-বলে বেশি বাহাদুরী দেখিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা। খেলার ধারায় বলা যেতে পারে ইংলণ্ড আত্মরক্ষা করে গেছে। এক সময় তাদের ফলো-অন করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, ফলো-অনের বিধানে পড়লে হয়তো পরাজয়ও এড়াতে পারত না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ইংলণ্ডকে জয়ের চ্যালেঞ্জও দিয়েছিলেন। সময় ছিল ৩১৫ মিনিট। জয়ের জন্য রানের প্রয়োজন ছিল ৩৩১। অর্থাৎ ঘণ্টায় ৬৫ রান করতে হত। সত্যিই স্পোর্টিং ডিক্লারেশন। অতীতে এই অবস্থায় ইংলণ্ডের টেস্ট জয়ের একাধিক নজির আছে। কিন্তু বর্তমানে ইংলণ্ডের টেস্ট ক্রিকেটাররা এত বিচলিত যে, জয়ের ঝুঁকি নেওয়া দূরের কথা, হার এড়ানোর জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেছে।

এই টেস্ট প্রসঙ্গে অবশ্য নয়—এর আগে ইংলণ্ডের খ্যাতকীর্তি ফাস্ট বোলার ফ্রেড ট্রুম্যান মন্তব্য করেছিলেন, টেস্ট ক্রিকেটে ইংলণ্ডের এখন প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। ৪৫ বছর বয়সী ব্রায়ান ক্লোজকে এই টেস্ট খেলতে ডাকায় ক্রিকেট লিখিয়েরাও নির্বাচকদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। 'ডেলী মেল' পত্রিকায় অ্যালেক্স ব্যানিস্টার লিখেছিলেন—পাঁচ টেস্ট সিরিজে একটি বল হওয়ার আগে এই ব্যাপার যেন পরাজয় মেনে নেবার নিদর্শন এবং আমাদের ক্রিকেট মানের হতাশাজনক চিত্র।

দারুণ ঠাট্টা করেছিলেন জন উডকক 'লণ্ডন টাইমস'-এর কলমে। লিখেছিলেন—আমি বুঝতে পারছি না কারা বেশি অট্টহাস্য করবে? ইংলণ্ডের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা? না, ইংলণ্ডের দেউলিয়া অবস্থা দেখে অস্ট্রেলিয়ানরা।

সব চেয়ে মর্মান্তিক মন্তব্য করেছেন 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় মাইকেল মেলফোর্ড। তিনি লিখেছিলেন—ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ৪৫ বছর বয়সী ক্লোজের ভাগ্য দেখে ৪৩ বছর বয়সী কলিন কাউড্রে নিশ্চয়ই ভাবছেন এত তাড়াতাড়ি কেন ক্রিকেট থেকে অবসর নিলাম।

যদিও ওই ব্রায়ান ক্লোজ দ্বিতীয় ইনিংসে এডরিচের সঙ্গে ভালই ঠ্যাকা দিয়েছেন, তবু প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড কোন-ঠাসা হয়েই হার বাঁচিয়েছে। তবু তো অসুস্থ থাকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তরুণ ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিং প্রথম টেস্ট খেলতে পারেনি। এ টেস্টে দুই দলে দুজনের অভিষেক হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে গোমেজ এবং ইংলণ্ড দলে মাইক ব্রিয়ারলি এই প্রথম টেস্ট খেলল। কিন্তু প্রথম ইনিংসে দুজনেরই নামের পাশে শূন্য। উল্লেখ্য মাইক ব্রিয়ারলির বয়স ৩৪। কাউন্টি ক্রিকেটে বহুদিন থেকে বেশ ভাল রান করেছে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের শুরুতেই বিপর্যয়। নিজের এবং ইংলণ্ড দলের শূন্য রানে তাকে বিদায় নিতে হয়।

গত মরসুমে ভারত সফরে এসে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পাবার পর ধারা-বাহিকভাবে অসাধারণ ক্রিকেট খেলছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৪ বছর বয়সী ব্যাটস-ম্যান ভিভিয়ান রিচার্ডস। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নেমেই সে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরী এবং জীবনের বড় রান (২৩২ রান) করল। বৃষ্টির ফলে আউট-ফিল্ড ভিজে ছিল। তবু রিচার্ডসের ব্যাট থেকে বল বাউণ্ডারির বাইরে ছুটে গেছে গোলার মত। কখনো ফিল্ডারদের হাত থেঁতলে। প্রথম শত রানে পৌঁছয় মাত্র ২১৫ মিনিটে বাউণ্ডারি ও ওভার বাউণ্ডারির ছররাপে। গত ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২৩টি ইনিংসে রিচার্ডস ১৮০০-র মত রান করেছে। শুধু টেস্ট খেলায় করেছে ১১৭৬ রান আলোচ্য টেস্টে

২৩২ ও ৬৩ নিয়ে। এক বছরে সবচেয়ে বেশি টেস্ট রানের রেকর্ডের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন। সিম্পসন করেছিলেন ১৩৮১ রান। সুতরাং রিচার্ডস এখন মাত্র ২০৫ রান পেছনে। আশা করা যায় বাকি ৪টি টেস্টে সিম্পসনের রেকর্ড পার্ করে দিয়ে রিচার্ডস অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

রিচার্ডস ও কালীচরণের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৩০৩ রান সংগ্রহ উল্লেখ করার মত। দুর্ভাগ্য কালীচরণের—মাত্র ৩ রানের জন্য সে অষ্টম টেস্ট সেঞ্চুরি করতে পারেনি।

টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বড় ইনিংসের ভিত গড়ে ওই রিচার্ডস ও কালীচরণ। এক সময় ওদের ছিল ২ উইকেটে ৪০৮ রান। তারপর ৮৬ রানের মধ্যে ৮টি উইকেট হারায় দ্রুত রান তুলতে গিয়ে। স্পিনার ডেরেক আন্ডারউড অবশ্য বন্দি খাটিয়ে বল করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৪৯৪ রানের উত্তরে এক সময় ইংলণ্ড করেছিল ৮ উইকেটে ২৭৯ রান। অর্থাৎ ফলো-

ভিভিয়ান রিচার্ডস
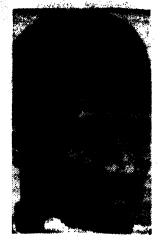
অন বাঁচাতে তখনো ১৬ রানের দরকার ছিল। আহত খেলোয়াড় ক্রিস ওল্ডের দৃঢ়তার ফলো অন বেঁচে যায়।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ডেভিড স্টিল ও বব উলমার এবং দ্বিতীয় ইনিংসে জন এডরিচ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস বোলারদের মোকাবিলা করেছে প্রশংসনীয় দৃঢ়তায়। ৩৬৭ মিনিটে স্টিল ১০৬ রান করে আউট হয়। সাড়ে ৪ ঘণ্টা টিকে থেকে ১০ বাউণ্ডারি সহ উলমার করে ৮২ রান।

এই টেস্টে ইংলণ্ডের উইকেট কিপার অ্যালান নটের ২০০ ক্যাচ [illegible] হয়। এডরিচের পূর্ণ হয় পাঁচ হাজার [illegible] রান। এখন তাঁর মোট রানের স[illegible] ৫১০৬। ইংলণ্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগ একটি ইনিংসেই খেলেছেন। কিন্তু রান করতে পারেননি। ৬৮টি টেস্ট ইনিংসে এই তৃতীয়বার তিনি শূন্য রানে বিদায় নিয়েছেন। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ৪৯৪ (ভিভ রিচার্ডস ২৩২, আলভিন কালীচরণ ৯৭, রয় ফ্রেডেরিকস ৪২, বার্নার্ড জুলিয়েন ২১; ডেরেক আণ্ডারউড ৫—৮২, ক্রিস ওল্ড ৩—৮০)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩৩২ (ডেভিড স্টিল ১০৬, বব উলমার ৮২, জন এডরিচ ৩৭, ক্রিস ওল্ড ৩৩, জন স্নো নট আউট ২০)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ৫ উই: ডিক্লে: ১৭৬ (রিচার্ডস ৬৩, কালীচরণ নট আউট ২৯, গ্রিনিজ ২৩; স্নো ৪—৫৩)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২ উই: ১৫৬ (জন এডরিচ নট আউট ৭৬, ব্রায়ান ক্লোজ নট আউট ৩৬)

একলব্য

ফুটবলার লতিফুদ্দিন

নামী খেলোয়াড়ের পুত্র সাধারণত ভাল খেলোয়াড় হয় না। আবার পিতৃপদাঙ্কের খেলাধূলায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের দৃষ্টান্তও প্রচুর। আমাদের চোখের সামনেই তো কত দৃষ্টান্ত। ক্রিকেটার লালা অমরনাথের দুই পুত্র সুরিন্দার ও মহিন্দার এবং ভীনু মানকড়ের পুত্র অশোক মানকড় তো টেস্ট ক্রিকেটেই খ্যাতি পেয়েছে। পাতৌদিদের নজির তো সর্বাবিদিত। হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদের পুত্র অশোককুমার এবং আমের শেরখার পুত্র আসলাম শেরখাঁ খেলছে বিশ্বকাপে এবং অলিম্পিকে। ফুটবলেও প্রচুর নজির। অতীতে আমরা মোহন বাগানের অধিনায়ক বিমল মুখার্জীর খেলা দেখেছি—যাঁর পিতা ছিলেন ঐতিহাসিক ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী দলের অন্যতম খেলোয়াড়। দেখেছি উমাপতি কুমারের পুত্র বাবলী কুমারের খেলা, বাঘা সোমের পুত্র তাপস ও নাটকীর (পরলোকগত) খেলা। কলকাতা ময়দানের হাল্ফিল ফুটবলারদের মধ্যে সম্ভবত পিতৃগৌরবের প্রধান উত্তরসূরী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের আউট সাইড খেলোয়াড় লতিফুদ্দিন।

লতিফুদ্দিন হায়দরাবাদের বিখ্যাত খেলোয়াড় মইনুদ্দিনের পুত্র। পঞ্চাশের দশকে মইন ছিলেন ভারতের নামী সেন্টার ফরোয়ার্ড। ১৯৫১ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম এসিয়ান গেমসে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরের বছর খেলেন হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের একবছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে হায়দরাবাদে লতিফের জন্ম। ফুটবলের পায়েখড়িও বাবার কাছে।

হায়দরাবাদে ওদের প্রতিষ্ঠা নানা কারণে। প্রথম—সৈয়দ পরিবার হিসাবে সামাজিক মর্যাদা। দ্বিতীয়—সম্পন্ন পরিবার। তৃতীয়—ফুটবল খেলায় ঐতিহ্য। লতিফকে নিয়ে ফুটবলে ওদের তৃতীয় পুরুষ চলছে। লতিফ বলল, আমাদের সৈয়দ পরিবার থেকেই একটি টিম বার করতে পারি এবং সে টিম খুব দুর্বলও হবে না।

—"হায়দরাবাদে তোমাদের এত প্রতিষ্ঠা তবু কলকাতায় এলে কেন?" —বাবার জন্য। হাবিব ও আকবরের বড় ভাই আজমকে জানেন তো। বড় খেলোয়াড় ছিলেন। ওকে আমি চাচা বলি। উনি বাবাকে বোঝালেন কলকাতা হচ্ছে ফুটবলের মক্কা। লতিফ যখন ভাল খেলছে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও। তোমার চেয়েও নাম করবে। বাবা রাজি হয়ে গেলেন। মার প্রথমে অমত ছিল। আমার বয়স তো তখন সবে আঠারো। প্রথমে কান্নাকাটি করেছিলেন। পরে বাবার ইচ্ছায় মত দিলেন। আমিও ১৯৭১-এ চলে এলাম কলকাতায়।"

ওই বছর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলার পর ১৯৭২ সালে লতিফুদ্দিন চলে যায় ইস্ট বেঙ্গলে। আবার ৭৩-এ

মহমেডানেই ফিরে আসে। সেই থেকে খেলছে মহমেডান দলে।

হায়দরাবাদের সিটি কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় ছোটদের ফুটবলে লতিফের কিছুটা নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুবাদে ১৯৬৯-এ অল ইন্ডিয়া স্কুল দলে স্থান পায় সিংহলের বিরুদ্ধে। প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসাবে তখন অনেকেরই চোখ পড়ে ছেলেটির উপর। ১৯৭১-এ মহমেডান স্পোর্টিংয়ে এসে খুব ভাল খেলতে না পারলেও ওই বছর মহমেডান দল আই এফ এ শীল্ড জয় করায় পয়মন্ত খেলোয়াড় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। খেলার মধ্যে কলাকৌশলেরও নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। না হলে পরের বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ওকে টানবে কেন? কোচদের ধারণা ছিল কলকাতার নতুন মাঠের নতুন পরিবেশে ছেলেটি তার যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। লতিফুদ্দিন নিজেও স্বীকার করেছে—কলকাতায় এত দর্শক আর দর্শকদের হই-চইয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এখানকার গরম আবহাওয়াও আমি প্রথমদিকে সহ্য করতে পারিনি।

যাই হোক, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে নামী খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেশি থাকায় লতিফুদ্দিনকে বেশিদিন মাঠের বাইরেই বসে থাকতে হয়েছে। খেলার সুযোগ পেয়েছে খুবই কম। আবার মহমেডান স্পোর্টিংয়ে ফিরে যাবার ওটাই মুখ্য কারণ।

৭৩ থেকে লতিফ অনেক পরিমার্জিত খেলোয়াড়। যার জন্য কোচিনে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলে ডাক পায়। পরের বছর বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করে জলন্ধরের জাতীয় ফুটবল আসরে। স্কুল ফুটবলে ভারত দলের জার্সি পরা ছাড়াও জাতীয় দলে খেলেছে দুবার। ১৯৭৪-এ ব্যাঙ্ককে, ১৯৭৫-এ কোয়েতে অনুষ্ঠিত এসিয় ইউথ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে। কোয়েতে লতিফ ছিল ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

পাতলা গড়নের খর্বকার ছেলেটির খেলায় ধারাবাহিকতার অভাব আছে। কোনদিন খুবই ভাল খেলে। আক্রমণের উৎস হয়ে ওঠে। ক্ষিপ্রগতি এবং পায়ের কাজে প্রতিপক্ষ রক্ষণ-ব্যূহকে বিব্রত করে তোলে। আবার কোনো কোনোদিন মিইয়ে পড়ে। লতিফ লেফট-রাইট—দুই আউটেই প্রায় সমান দক্ষ। ডান পায়ের শট বাঁ-পায়ের চেয়ে অনেক জোরালো। কেটে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা। বল টানেও ভাল। গতি প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রকৃত সুযোগ সন্ধানী খেলোয়াড় বলতে যা বোঝায় নিশ্চয়ই তা নয়। তাই অনেকের ধারণা, প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় বাংলা দলে ওর স্থান পাবার মূলে দলমাহাত্ম্যই মুখ্য, দক্ষতা গৌণ। কোটা হিসাবেই ওকে রাখা হয়।

কিন্তু লতিফুদ্দিন যেদিন ফর্ম পায় সেদিন সত্যি সত্যিই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। লতিফের মতে ওর শ্রেষ্ঠ ম্যাচ ব্যাঙ্ককে এশীয় যুব ফুটবলের ফাইনালে ইরানের বিরুদ্ধে। অসম্ভব থ্রিলিং ম্যাচ ছিল। ইরানের করা গোলটি লতিফই শোধ করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২—২ গোলে খেলা ড্র হওয়ায় ভারত ও ইরান যুগ্মজয়ী হয়েছিল। দুই দলের খেলোয়াড়ের মধ্যে লতিফ ছিল শ্রেষ্ঠ নায়ক।

মুকুল

অরণ্যদেব
লী ফক
সোনা - বোঝাই হচ্ছে, সমুদ্রে...
সত্যি সোনা রয়েছে ক্যাপটেন! এই হচ্ছে প্রথম বস্তা!
খুলে দেখাও তো!
সোনা - বেলায়.....
জেড পাথর! সোনার মতই দামী! কিন্তু এটাকে নেব কী করে?
ভেঙে টুকরো টুকরো করে নেব।
না, এটা পবিত্র!
ব্যাটা স্যাম্বর ভূ তুই থাম তো!
উঃ..!
চলো হে পাইলট, ওদের ফাঁকি দিয়ে আমরা সরে পড়ি!
মাত্র আট বস্তা নিয়েই! দাঁড়াও, আটশো বস্তা তুলি! তখন যা করবার করব।
কী, স্যাম্বরকে এর অর্ধেক ভাগ দেবে নাকি?
ব্যাটাকে এইখানেই কবর দেব!
লোভী শয়তানের দল! ওদের ক্ষমা নেই!
!!!
১৩

রাজবংশ/ছায়া দেবী, উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য/পরিচালনা : পীযূষ বসু

প্রদর্শন সংক্রান্ত যে সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গের মুমূর্ষু চলচ্চিত্রশিল্পকে মুমূর্ষুতর করে তুলেছিল, এতদিনে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। গত তিন-চার বছর ধরে সরকার এখানকার চলচ্চিত্রশিল্পের নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কিছু কিছু সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা তাঁরা ইতিমধ্যে করেওছেন। কিন্তু বাংলা ছবির অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা বিপন্ন করে তুলেছিল প্রদর্শনের সমস্যা! বাংলা ছবির সমস্যা সমাধান করতে রাজ্য সরকার যে এগিয়ে এসেছেন এটা নিছক প্রাদেশিকতার ব্যাপার নয়। মহারাষ্ট্র সরকার, পাঞ্জাব সরকার, গুজরাট সরকার, অন্ধ্র সরকার এবং আরও কোন

প্রসঙ্গত

কোন রাজ্য সরকার তাঁদের রাজ্যের চলচ্চিত্রের সমস্যা দূরীকরণে ইতিমধ্যে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নামটিও সেই তালিকায় যুক্ত হল।

প্রদর্শন সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার একটি অর্ডিনানস জারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওই অর্ডিনানসটি মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ করেছে। খুব শীঘ্রই তা কার্যকরী করা হবে। এই অর্ডিনানসে রাজ্যের সবকটি সিনেমা হলকে বছরের অর্ধেক দিন বাধ্যতামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত ছবি দেখাতে হবে। কোন কোন সিনেমা হলের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হতে পারে চিত্রগৃহটির পারিপার্শ্ব বিবেচনা করে। অনেকে সন্দেহ করছেন এমন কিছু সিনেমা হল আছে

যেখানে বাংলা ছবি আদৌ চলবে না। সেক্ষেত্রে ওই সব হলে পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হিন্দী ছবি দেখানো যেতে পারে। প্রদর্শনের সুবিধা পেলে এখানে নিয়মিত হিন্দী ছবি তৈরীর কথাও প্রযোজকরা বিবেচনা করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ছবি তোলার খরচ কম। ভাল গল্প নিয়ে উপভোগ্য হিন্দী ছবি এখান থেকে তৈরী হলে সর্বভারতীয় বাজার পাবার সম্ভাবনাও থাকে। যেমন ছিল নিউ থিয়েটার্সের যুগে।
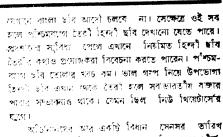
অর্ডিনানসের আর একটি বিধান সেনসর তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তি। প্রযোজক এবং পরিবেশকরা দীর্ঘকাল এই দাবি করে আসছিলেন। এতদিন ছবি বাছাই করার একতরফা অধিকার ছিল হলের মালিকদের। স্টারবিহীন অথবা নতুন ধারার ছবি তাদের তেমন মনোনয়ন পেত না। এই সমস্যার সুরাহা এবার হবে। ছবি ব্যবসা করবে কি করবে না সে সম্পর্কে শেষ কথা বলার মালিক দর্শক—প্রদর্শক নয়।

অর্ডিনানসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান : ছবি মুক্তির পর ছবির প্রদর্শনী থেকে যে টাকা আসবে তা থেকে প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক শতকরা কত টাকা পাবেন তা স্থির করে দেবেন রাজ্য সরকার। এই বিধানের ফলে ছবি যত খারাপই হোক প্রযোজক অন্তত কিছু টাকা ফেরত পাবেন। ফলে নতুন ছবির কাজ তাঁরা শুরু করতে পারবেন। চলচ্চিত্র-কর্মীদের আধা-বেকার সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে তার ফলে।

কলকাতার ১৪টি হলে এখন বাংলা ছবি দেখানো হয়।

নতুন অর্ডিনানসে ওই সংখ্যা বাড়িয়ে ২১ করা হয়েছে। যতদূর জানা গেছে তাতে লোটাস, দর্পণা, বীণা, বসুশ্রী, মিত্রা, প্রিয়া ও গ্রেস চিত্রগৃহকে নিয়মিত বাংলা চেইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উত্তম কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষী পাড়ায় অবস্থানকারী পূর্ণশ্রী, মেনকা, নবীনা, জেম এবং ছিন্দ সিনেমারও কি নিয়মিত বাংলা চেইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়?

অর্ডিনানসে নতুন সিনেমা হাউস নির্মাণের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এটাও একটা অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত।

—রবি বসু

সত্যজিৎ রায়/এ পর্যন্ত চারটি তথ্যচিত্র ও টি ভি'র জন্য 'দুই' নামের একটি ছোট্ট ছবি

ফটো : দেশ

মেয়েদের জুতোর গড়নের মতো যে-দেশটি মেডিটেরেনিয়ান-এর বুকে উদ্ধতভাবে বিঁধে আছে সেখান থেকে যেন কোনো জাদুকরের মুগ্ধ ইঙ্গিতে রঙিন রুমালের মত উড়ে আসছে এক-একটি দিশারি নাম : রোসেলিনি আর ফেলিনি; ডিসকোনতি, আনতোনিয়নি আর ডি সিকা; পাসোলিনি, গ্রিফি আর ওলমি। এবং প্রতিটি নামের সঙ্গে ওলোট-পালোট নতুন বাতাস! কোন কোন নামের রুমাল কোন দিকে উড়ন্ত কোথাতে গিয়ে কোনো এক সময়ে আনতোনিয়নি বাদামের খোলায় পুরে দিয়েছিলেন ছোট্ট আবহাওয়াবার্তা : "ফেলিনি বাস্তবকে করে তোলেন নগ্ন প্রকট; ভিসকোনতি বাস্তবের বিন্যাসে আনেন নাটকীয়তা; আর আমি বাস্তবের ওপর রং চড়াতে একেবারে ভালোবাসি না।"

যে-কথাটা কিন্তু এই মুহূর্তে স্মর্তব্য তা হল এই যে, এই তিন-মুখী স্রোতের উৎস সন্ধানে আমাদের চলে আসতে হয় ফ্রানসে। এবং যে-অপারেশন টেবিলে আমরা সবচেয়ে প্রথম আটপৌরে প্রত্যহকে কখনো খোলাখুলি নগ্নভাবে, কখনো পোশাকি ভঙ্গিতে কিংবা কখনো ফ্যাকাশে আর শ্লথভাবে শায়িত দেখি, তার-ই নাম হল ফ্রানস-এর খুদে ফিলম। আধুনিক অর্থে শর্ট-ফিলম-এর এই হল সূচনা। এবং যে তিনজন ফরাসি পরিচালক এই নতুন প্রবাহের উৎসে বরফ গলিয়েছিলেন তাঁরা হলেন : ফ্রাঁজু, রেনে আর ত্রুফো।

আবিষ্কারটা কি চমকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? কেননা খুদে ফিলম-এর

শান্তি চৌধুরী/এ দেশে ডকুমেনটারির কোনো কদর নেই ফটো : দেশ

অতীত সন্ধানে—যার সঙ্গে আধুনিক ডকুমেনটারির আশ্চর্য চরিত্র সাদৃশ্য দেখা যায়—ফিতের অপর প্রান্তে যে রেনে কিংবা ত্রুফোকে দেখতে পাব, এ-কথা আশা করে না কখনো। এবং এই তথ্যটুকুইও যখন আমরা অতীত ইতিহাসে ছিপ ফেলে তুলে আনি যে রেনে এবং ফ্রাঁজুকে খুসে ছবি তৈরিতে দীর্ঘ বছর হাত পাকাতে হয়েছিল তাঁদের নিজেদের ব্যাকরণে ফিচার-ফিলম করবার অধিকারটুকু রোজগার করে নেবার জন্যে, তখন আমাদের অনভ্যস্ত মনে একটা আচমকা ধাক্কা লাগে। এবং এই সত্যটুকু বুঝে নিতে আমরা একটু বেশি সময় নিয়ে

অনিল মুখোপাধ্যায়/তথ্যচিত্রে গোঁজামিল চলে না ফটো : দেশ

ফেলি যে এদেশের ফিচার-ফিলম-এর পরিচালকেরা নিজেদের এত বেশি ক্রিয়েটিভ ভাবেন (এ ছাড়া শর্ট-ফিলম-এর জন্যে অর্থ সংগ্রহও আমাদের দেশে এখনো এক হাঁপ-ধরানো লম্বা দৌড়) যে তাঁরা খুদে-ফিলম-এ শিক্ষানবিশী করে ফিচার-ফিলম-এ অধিকার অর্জনের তোয়াক্কা করেন না, এবং খুদে ফিলম-এর সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁদের কিছুটা ক্লসট্রোফোবিক লাগে! আট কিংবা দশ রীল-এর ফিচার ফিলম-এর কথা এখনো এদেশে অধিকাংশ পরিচালক ভাবতে পারেন না—'সমাপ্তি' কিংবা 'পোস্টমাস্টার' কিংবা 'কাপুরুষ' এবং 'মহাপুরুষের' পরেও না। আমরা অবশ্য এ কথা ভুলে যাচ্ছি না যে 'পথের পাঁচালী'র সুমিত সংহতির জন্যে শর্ট-ফিলম কিংবা ডকুমেনটারিতে হাত-পাকানোর প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু প্রয়োজন হয়নি শুধু এই জন্যে নয় যে জগৎ-কাঁপানো প্রতিভার মাপা-রীতিতে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে চলতে শেখার প্রয়োজন হয় না কোনো এবং কিছু অভ্যস্ত সিঁড়ি টপকে যাবার অধিকার তার সব সময়েই থাকে। প্রয়োজন হয়নি অন্য যে কারণে তা হল পরিচালনায় আসার আগে সত্যজিৎ রায় এক দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে দিয়ে গেছলেন, যে-সময়ে তিনি যে-সব সুদূর-প্রসারী চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতায় গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তাঁদের নাম, ফোর্ড, ওয়াইলার, ওয়াইলডার, আর কেপরা; এলিয়া কাজান, এডোয়ার্ড ডিমিট্রীক, ফ্রেড জিনেম্যান আর মার্ক রবসন; রেনোয়া, কার্নে, আর দুভিভিয়ে; জাক বীকার, জর্জ ক্রুজো, জাঁ দেলানয় আর ক্লদ ওঁতা-লারা রোসেলিনী, ডি সিকা, লাতুয়াদা আর ভিসকোনতি! এই সম্যক পরিপুষ্টির ফলশ্রুতি শুধু যে 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'চারুলতা'র মত ফিচার-ফিলম, তা নয়। এই দীর্ঘ বিদেশী নিমজ্জন ছাড়া সম্ভব হত না 'সমাপ্তি' কিংবা 'কাপুরুষ'-এর মত শর্ট-ফিলম এবং চারটি মেদবর্জিত, টানটান, বাস্তবনিষ্ঠ এবং রসোত্তীর্ণ তথ্যচিত্র—'রবীন্দ্রনাথ', 'সিকিম', 'দি ইনার আই' এবং 'বালা'। কিন্তু যেহেতু 'সমাপ্তি' কিংবা 'কাপুরুষ'কে আমাদের দেশে অন্তত শর্ট-ফিলম হিসেবে আলাদা করে দেখা হয়নি কখনো, এবং যেহেতু উল্লিখিত চারটি তথ্য-চিত্রই আমাদের চলতি ব্যাকরণকে পাশ কাটিয়ে একেবারে ক্লুজোর 'পিকাসো', কিংবা রেনের 'ভ্যান-গ্যা' পর্যায়ের মাপ-রেখা অনায়াসে ছুঁয়ে আসে, সে জন্য এ আলোচনা থেকে সত্যজিৎ রায়কে ইচ্ছে করেই সরিয়ে রাখা হল।

এর পরে প্রথমেই যে মানুষটিকে আমাদের চোখে পড়ে তিনি চিদানন্দ দাশগুপ্ত। সেই চল্লিশ দশক থেকে বিদেশী ছবি দেখা এবং ছবি-সমালোচনার এক

চিদানন্দ দাশগুপ্ত/কলম ও সেলুলয়েডের ভাষায় এ'র সমান দখল

সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে তিনি আজকের চিদানন্দ। এবং প্রায় বিশ বছরের ফিলম-ভাবনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি করেছিলেন তাঁর প্রথম এবং এক অপূর্ব তথ্যচিত্র : 'পোর্ট্রেট অব এ সিটি'। এবং তাঁর পরের তথ্যচিত্রটি ইংল্যানড এবং আমেরিকায় বহু-আলোচিত 'অ্যাকরস্ দি রিভার'। এবং এ দেশে অনেক ভাল জিনিসের মত নিন্দিত, উপেক্ষিত।

চিদানন্দ মূলত তথ্যচিত্র তৈরি করেন। কিন্তু তাঁর ছবি শেষ পর্যন্ত নেহাত ফরমায়শি বেগারখাটার পর্যায়ে থাকে না। এদের বিন্যাসের পেছনে এমন একটি মন

সুব্রত লাহিড়ী/শর্ট-ফিলম-এর জগতে একটি নতুন মুখ ফটো : দেশ

বোম্বাই শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে।
শুধু শহরে নয়, শহরতলীতেও।
মুগ্ধ, বিস্মিত, অভিভূত, অনুপ্রাণিত।
শুধু বিদগ্ধরাই নয়, দর্শক সাধারণও
শুধু নাক উঁচুরাই নয়, সাদামাটারাও।
দায়িত্বশীল নাট্যকর্মীরাই নয়,
দায়িত্বজ্ঞানহীন নিষ্কর্মারাও।
বোম্বাই শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে।

বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক বললেন:
'Professional-দের কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই। যা কিছু ভরসা এরাই। ভবিষ্যতটা এদেরই হাতে।'

গুজরাটি থিয়েটারের
প্রখ্যাত নাট্য-প্রযোজক বললেন:
'I have never seen such a production in Bengali Stage',

প্রথিতযশা চিত্রপ্রযোজক বললেন:
'সামাজিক সমস্যা যে এইভাবে মঞ্চে প্রতিফলিত হতে পারে আমার এ ধারণাই ছিলো না।'

নাট্য-সমালোচক বললেন:
'The group deserves unreserved praise'

প্রখ্যাত নৃত্য-পরিচালক বললেন:
'আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে'

আর দর্শকরা বললেন:
'f-a-n-t-a-s-t-i-c'

শুধু একটি সমালোচনায় প্রকাশিত:
'এদের সবই ভাল,—রাজনৈতিক বক্তব্যটুকু ছাড়া'

'ইণ্ডিয়া কালচার লীগ' সংস্থার ব্যবস্থাপনায় গত ২৭—৩০ মে বোম্বাইয়ের রবীন্দ্র নাট্য মন্দিরে চেতনার 'মারীচ সংবাদ' ও 'রাজরক্ত' নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয় এবং অভাবনীয় সাফল্যলাভ করে।

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বাংলা দেশের গ্রুপ থিয়েটারগুলির সংগ্রামী ভূমিকা ও 'ঠিক' নাটকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়। এছাড়া স্থানীয় নাট্যকর্মীদের সাথে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়।

উদ্যোক্তাদের ও স্থানীয় দর্শকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে চেতনা।

চেতনা

চেতনা। ১০/১, সাহাপুর মেন রোড, কলিকাতা-৩৮

স্পষ্টতই কাজ করে যেখানে অন্তত উপযুক্ত মার্জনার অভাব দেখি না কখনো। এবং 'পোর্ট্রেট অব এ সিটি'তে নানান 'ভিশুয়াল' এবং 'সনিক' পরীক্ষানিরীক্ষায় যে প্রতিশ্রুতি আমরা দেখতে পাই তারই ক্রমিক বিবর্তনের ফলে আমরা শেষ পর্যন্ত পেলাম তিনটি শর্ট-ফিলম—'ষাঁড়', 'গাধা' আর 'রক্ত' (যাদের একত্র দেখা যায় 'বিলেতফেরৎ' ফিচার ফিলম-এ) এবং 'দি ডানস অব শিভা' নামের কুমারস্বামী প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ রঙীন তথ্যচিত্রে। 'সমাপ্তি', 'মণিহারা' কিংবা 'কাপুরুষে'র পর বাংলা ভাষায় শর্ট-ফিলম আবার যেন নিজেকে খুঁজে পেল।

"'ষাঁড়' ছবিটিতে ষাঁড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষঙ্গকে ধরবার চেষ্টা করেছি। প্রাচীন ভারতের অ্যানিমিসটিক রিচুয়ালস-এর কথা নিশ্চয় মনে পড়ে। এ সব থেকেই তো ফারটিলিটি কাল্টটা এসেছিল। ষাঁড়কে মেল ভিরিলিটির সিমবল ভাবা হত। প্রথম দিকে আমার ফিলম-এ একটা জাম্প-কাট আছে—পেপার ওয়েটের ওপর ষাঁড়, সেখান থেকে মহেঞ্জোদারোর অরিজিনাল ষাঁড়ের মূর্তিটা, আবার কাট করে সেখান থেকে নায়িকার উরুতের কিছুটা অংশ দেখিয়ে ষাঁড়টাকে সেকস-সিমবল হিসেবে এসট্যাবলিশ করা হচ্ছে।

"আমার দ্বিতীয় ছবি 'গাধা'য় আমি

সাধক কবি রামপ্রসাদ/পম্পা/পরিচালনা : বিমল রায়

'ফারটিলিটি' থেকে 'স্টেরিলিটি'তে সরে আসছি। এবং গাধাটাকে অবশ্যই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছি। তৃতীয় ছবি 'রক্তে' আবার ফারটিলিটি থিমটাই আসছে। কেননা, এখানে নায়ক এমন একটা সারের (রক্ত) ব্যবসা করছে যাতে জমিকে আরও বেশী উর্বর করা যায়। কিন্তু শেষটা আসছে রক্তের অনুষঙ্গে। এবং তিনটি ছবিতেই ফারটিলিটি থিমটাকে নিয়ে কন্টাক্ট করা হয়েছে", বললেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। সাউন্ড ট্রাক-এ কিছু নতুন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তিনটি ছবিতেই। যেমন 'ষাঁড়' অংশে জয়দেবের পদাবলীর কিছু অংশ ছবির মূল সুরটাকে প্রতিষ্ঠা করছে, 'গাধা' অংশের একটি দৃশ্যে সেকসের থিমটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ইউরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের নানান ক্রস রেফারেন্স-এর মাধ্যমে, আর তৃতীয় অংশে হেরাল্ড গাড়ির শব্দ, প্রভৃতির সঙ্গে অরুণিমা সান্যাল নামটা হঠাৎ ধাক্কা খায়—বিশেষ করে আপনার যদি সেই বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে।

ঠিক এ ধরনের শর্ট ফিলম-এর পিঠে আমাদের দেশের পরিচালক-প্রযোজকেরা বাজি ধরেন না। সম্প্রতি সুব্রত লাহিড়ী 'রিংকি অ্যানড দি প্যারট' নামের একটি ছোট্ট রঙীন ছবি করে এক নতুন উপত্যকার আরও কিছু অংশ আবিষ্কার করলেন। শোনা যাচ্ছে ছবিটি উনি করেছেন জাপানী টি ভি'র জন্যে। সুতরাং, কিছু বিদেশী মুদ্রা ঘরে আনার সম্ভাবনাটা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একেবারে অথৈ জলের ব্যাপার নয়। আরতি ভট্টাচার্য অভিনীত এই রঙীন 'শর্ট'টিকে আমি চোখের সামনে একটু একটু করে হয়ে উঠতে দেখেছি। আমার ধারণা সুব্রতর খুদে ফিলম সাহসিকতায় অনেক বড় মাপের।

বাংলা শর্ট-ফিলম আর ডকুমেনটারির জগতে শান্তি চৌধুরী একটি প্রোজ্জ্বল নাম। তাঁর তৈরি 'লিটল-সিনেমা' থেকে এ পর্যন্ত সাদা-কালো এবং রঙিন অনেক ছবি আমরা পেয়েছি। এবং যেটা বড় কথা, পেয়ে মনে রেখেছি। "আমি সব মিলিয়ে প্রায় শ'দেড়েক ছবি করেছি। কিন্তু বেশির ভাগই তো ফরমায়শি ছবি। সুতরাং সব সময়ে যে খুব ক্রিয়েটিভলি কাজ করা যায় এমন তো নয়। যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম, সেটা হল এদেশে তথ্যচিত্র এবং শর্ট-ফিলম-এর কোনো কদর নেই। তাছাড়া নিজের ভালো লাগার কোনো বিষয় নিয়ে ছবি করতে গেলে প্রথমে নিজের খরচাতেই করতে হয়। তারপর সেটা ফিলম ডিভিশনকে বেচা যায় হয়তো, কিন্তু প্রথম খরচাটা তো নিজেরই। এবং একটা এলিমেনট অফ রিসক থেকেই যায়। যেমন ধরুন, হুসেনের ওপর আমার রিসেণ্ট ছবিটা, 'এ পেনটার অফ আওয়ার টাইম'—ওটা তো ঐভাবেই করা। ভীষণ একসপেনসিভ ছবি। সমস্তটা পকেট থেকে দিতে হয়েছিল। এ সব ছবি আমি অবশ্য আনন্দের জন্যে করি, ব্যবসার জন্যে নয়। আমার অনেক ফিলম-ই শর্ট-ফিলম-এর পর্যায়ে পড়ে। যেমন ধরুন, 'ভিরসা অ্যানড দি ম্যাজিক ডল'। ছবিটা '৫৯ সালে প্রেসিডেনটস সারটিফিকেট অফ মেরিট পেয়েছিল। আমার একটি উল্লেখযোগ্য ছবি 'টু লাইট এ ক্যানডেল'। এতে করুণা ব্যানার্জি একটি মুসলমান মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। আমি 'ফোক' কালচারে খুব ইনটারেসটেড। সেটা বোঝা যাবে আমার 'সংস অফ পাঞ্জাব' এবং 'এনটারটেনার অফ রাজস্থান' ছবিতে। বলতে ভুলে গেছলাম, লীলা মজুমদারের 'বকধার্মিক' গল্পটা নিয়ে আমি ৬৯ সালে 'হীরের প্রজাপতি' বলে একটা শর্ট-ফিলম করেছিলাম যাতে রাজলক্ষ্মী দেবী, রবি ঘোষ, শেখর চ্যাটার্জি, সুব্রতা চ্যাটার্জি বিনতা রয় এবং অনুপকুমার অভিনয় করেছিলেন। ছবিটা প্রেসিডেনটস গোল্ড মেডেল পেয়েছিল। এ ছাড়া আমি টি ভি'র জন্যে রাজস্থানের 'ফোক' কালচার নিয়ে একটা সিরিজ করেছি। আমার আর একটা ছবি করতে খুব ভাল লেগেছে—সেটা হল আমার বন্ধু পরিতোষ সেনের চিত্রকলা নিয়ে। একদিক থেকে দেখতে গেলে ছবিটার বিষয়বস্তু এভোলিউশান অফ এ মর্ডান স্টাইল অফ পেনটিং। তবে এতদিন ধরে তথ্যচিত্রের লাইন-এ থেকেও মনে হয় এখানে সিকিউরিটির একান্ত অভাব সরকারী পেট্রোনেজ উপযুক্তভাবে নেই এ ছাড়া আমাদের এখানে যদি খুব শীগগির কালার ল্যাবরেটরি না খোলা হয় তাহলে বাংলা ফিলম-এর ভবিষ্যৎ

খুবই অন্ধকার", বললেন শান্তি চৌধুরী।
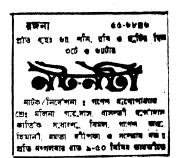
বাংলা তথ্যচিত্রের জগতে আর একজন যাঁকে পাশ কাটিয়ে যাবার জো নেই—তিনি হলেন আশীষ মুখোপাধ্যায়। আশীষবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আজকের যুবকদের মধ্যে অনেকেই তথ্যচিত্রের লাইনে আসতে চান। কিন্তু টাকা পয়সা এবং চেনাশোনা নেই বলে হয়তো আসতে ভরসা পান না। এঁদের উদ্দেশে আপনার কিছু বলার আছে?" উত্তরে শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, "আজ আমি যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে আসতে আমার প্রচুর স্ট্রাগল করেত হয়েছে। আমরা চার ভাই। এক সময়ে এত অভাবের মধ্যে পড়েছিলাম যে আমাদের মা একটা ডিম সুতো দিয়ে চারভাগ করে চারজনকে দিতেন। সেই অবস্থা থেকে আজকের আশীষ মুখার্জি—বুঝতেই পারছেন। একথা অবশ্যই সত্যি যে শ্রীদেবেশ মুখার্জির আর্থিক সাহায্য এবং শুভ গুহঠাকুরতার সহযোগিতা ছাড়া কখনই আমি আজকের জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। কিন্তু একথা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, যদি কিছুটা ট্যালেন্ট এবং খানিকটা আনকম্প্রোমাইজিং অনেস্টি থাকে, তাহলে টাকা পয়সাটা খুব একটা বড় বাধা নয়, বিশেষ করে বর্তমানে যখন সরকারী সাহায্য সহজে পাওয়া যায়। আমি অনেস্টি মানে বলতে চাইছি, তথ্যচিত্রে মিথ্যে কথা বলা চলবে না। যেমন ধরুণ 'দি ফ্লেমস বার্ন ব্রাইট' বলে নেতাজীর ওপর যে তথ্যচিত্রটি আমি করি তাতে কয়েকটি শর্টের অথেনটিসিটির জন্যে আমাকে জাপান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হয়েছিল। 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' দিয়ে ৫৭ সালে আমার কেরিয়ারের শুরু। এবং সেই থেকে 'মুর্শিদাবাদের ইতিকথা', 'শাঁখারি', 'রেশম শিল্পী' 'ঢোকরা' 'রূপপতি নন্দলাল', 'ওস্তাদ আলাউদ্দিন' 'সুন্দরবন' প্রভৃতি যেসব ছবি করলাম সেখানে সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে আমার অনেস্টি। বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করি না। এবং গোঁজামিল দিই না। এবং আমার বিশ্বাস যাঁরা নতুন এ লাইনে আসবেন, তাঁরা যদি এই দুটো কথা মনে রাখেন, এবং একসপেরিমেন্টের নামে গিমিক-এর আশ্রয় না নিয়ে সহজ এবং ডিরেক্ট তথ্যচিত্র করেন, তবে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সফল হবেনই। তবে আসল বাধাটা কোথায় জানেন? এখানে, মানে কলকাতায়, ৩৫ এম এম এর অ্যানিমেশন ক্যামেরা, ৩৫ এম এম এর জুম লেনস সহ অ্যারিফ্লেক্স কামেরা এবং ক্লিপ ও নাগ্রা সাউন্ড মেশিন সহ অ্যারিফ্লেক্স পাওয়া যায় না। এ ছাড়া চার কিংবা পাঁচ চ্যানেল-এর মুভিওলা একান্ত প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কালার ল্যাব। কিন্তু কোথায় পাব? হয়তো কোনোদিন সরকারের সাহায্য আসবে।"

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

এই লেখকের পক্ষে নাটক সম্পর্কে কিছু বলা একটু বিচিত্র। পর পর দু' সপ্তাহ ধরে নাট্যাভিনয় দেখবার পর সে সম্পর্কে কিছু না বলেও পারা যায় না। প্রথম সপ্তাহে ছিল কলকাতার 'চেতনা' নাট্যগোষ্ঠী। পরের সপ্তাহে শরৎচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় অ্যামেচার গোষ্ঠী 'নটমহল' রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ করেন 'বৈকুণ্ঠের উইল'।

অ্যামেচার দলের মস্ত দোষ হচ্ছে সময়ানুবর্তিতার অভাব। নটমহলের ক্ষেত্রেও এত ব্যতিক্রম ঘটেনি। পর্দা উঠেছিল বিজ্ঞাপিত সময়ের আধ ঘণ্টা পরে। তবে প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়ায় নটমহলের দেরী করে পর্দা তোলার একটা বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত জুটে যায়।

এঁদের অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যার মধ্যে নাটকটির পরিচালক জ্যোতির্ময় মুখার্জীর গোকুল চরিত্রটিই সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। বাঙলার এক জনপ্রিয় অভিনেতাকে অনুকরণ করার প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট ফুটে উঠলেও বিনোদের চরিত্রটিকে উদয়ন ভট্টাচার্য বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শান্ত বসু, শরদিন্দু রায়চৌধুরী এবং তপন মুখোপাধ্যায়। প্রধান দুটি স্ত্রী চরিত্র, মায়া ও মনোরমাকে রসগ্রাহ্য করে তোলেন যথাক্রমে মালা মুখার্জী ও মুন্না ভাদুড়ী।

দুর্যোগ মাথায় করে যাঁরা সেদিন উপস্থিত হতে পেরেছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে কিছু উপরি কৌতুকও উপভোগ করার সুযোগ ঘটেছিল—যে ধরনের কৌতুক দৃশ্য প্রায়ই নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রথমটি ঘটে বিন্দুর গানের অংশে আলো ক্রমশ স্তিমিত হয়ে সময়ের অতিক্রমণ বোঝানোর দৃশ্যে। বিন্দুর গান টেপ-রেকর্ডারে বাজানোর ব্যবস্থা ছিল। বিন্দু প্রস্তুত। সময় বয়ে যেতে থাকে, কিন্তু টেপ-রেকর্ডার আর বাজে না। শেষে বিন্দুই ব্যাপারটা সামলে নেয় গানটা নিজের মুখেই গেয়ে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি অপ্রত্যাশিতভাবে মায়ার গৃহে গোকুলের প্রবেশ। মনে হলো গোকুল বুঝি তার ভাইয়ের খোঁজে নিজেই সশরীরে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু নিমেষেই ওর অন্তর্ধান দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, গোকুল ভুল করে ওই সেটে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা দুটি এমন স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের সৃষ্টি করেছিল যে পরবর্তী অভিনয়ে এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে দর্শকরা খুশীই হবেন। এ নিয়ে সমালোচনা অবাঞ্ছনীয়।

বাঙলার সংস্কৃতিকে সামনে তুলে ধরার তিন-চারটি অ্যামেচার নাট্যগোষ্ঠী বেশ ভাল কাজ করে যাচ্ছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে থার-এর মুক্তাঙ্গন মঞ্চে বিবেকানন্দ ক্লাব রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' পরিবেষণ করেন। অধিকাংশ গোষ্ঠীই সক্রিয় হয়ে ওঠেন দুর্গাপুজোর সমাগমে। শিবাজী পার্কের পুজো প্যান্ডেলে এতদিন যে নাট্য প্রতিযোগিতা হয়ে আসছিল, বেঙ্গল ক্লাবের তা পরিহার করাটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এই প্রতিযোগিতাটা আন্দোলনকে জোরদার করায় সহায়ক ছিল। বোমবাইয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নটমহল অপেক্ষাকৃত নবাগত। তবুও শিল্পামোদীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের তারা যোগ্য।

—সুরঞ্জন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুলে
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদলচন্দ্র রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রার সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লন্ডন অফিস মারফতে (লন্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

আমূল মাখন

আমূল খেলে মালুম হবে মাখন